। প্রচার করিবার জন্য, সমাজের বা বন্ধুবর্গের
গঞ্জনা সহিতে হয় সহিব। কিন্তু তবু সত্যকে
জব, বুঝিব, গ্রহণ করিব।' ঐতিহাসিকের এই
জ্ঞাকেই যিনি জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ
য়াছেন, ভারতবর্ষের বর্তমান ঐতিহাসিকগণের
আজ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত, সেই
মধন্য ইতিহাসবিদ্ 'ভারততত্ত্ব ভাস্কর' আচার্য
ণ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জীবনব্যাপী সাধনার
তম অবদান তাঁহার জন্মভূমির এই ইতিহাস।

বাংলা দেশের ইতিহাস

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত ও সম্পাদিত

বাংলাদেশের ইতিহাস—১ম খণ্ড (প্রাচীন যুগ) ১০'০০
বাংলাদেশের ইতিহাস—২য় খণ্ড (মধ্যযুগ) ২০'০০

বাংলা দেশের ইতিহাস

তৃতীয় খণ্ড

[আধুনিক যুগ]

ভারততত্ত্ব-ভাস্কর
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম-এ, পি-এইচ-ডি
প্রণীত

জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩

প্রকাশক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস
জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

প্রথম সংস্করণ
মাঘ, ১৩৭৮
পঁচিশ টাকা

গ্রন্থ পরিক্রমা প্রেস, ৩০/১ বি কলেজ রো, কলিকাতা-৯
হইতে শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ডে মুসলমান বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা—অর্থাৎ, ১৭৬৫ সনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি পর্যন্ত আলোচিত হইয়াছে। এই খণ্ডে ইংরেজের অধীনতা পাশ হইতে মুক্তিলাভ পর্যন্ত—অর্থাৎ, ১৭৬৫ হইতে ১৯৪৭ সনের ইতিহাস বর্ণিত হইবে এইরূপ পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু, গ্রন্থের কলেবর বর্ধিত হওয়ায় বর্তমান খণ্ডে ১৯০৫ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচিত হইল। এই বৎসর বাংলাদেশ দুই ভাগে বিভক্ত করায় দেশময় যে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহাই ভারতের মুক্তিসংগ্রামের প্রথম পর্ব বলিয়া অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। বাংলাদেশ যে কেবল বিয়াল্লিশ বৎসরব্যাপী এই সংগ্রামের অগ্রদূত ছিল তাহা নহে, ইহার সফলতালাভে বাংলাদেশের অবদান ভারতের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া চিরদিন গণ্য হইবে। এই স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙালী যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহার বিবরণ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবার যোগ্য। সুতরাং ৬৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী তৃতীয় খণ্ডের উপসংহারে সংক্ষেপে ইহার আলোচনা না করিয়া ইহার জন্য পৃথক একটি খণ্ড নির্দিষ্ট হইল।

এই তৃতীয় খণ্ডটি বাংলাদেশের আধুনিক যুগের ইতিহাসের প্রথম ভাগ মাত্র। পরবর্তী চতুর্থ খণ্ডে আধুনিক যুগের ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে। বাংলার বীর সন্তানেরা মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য যে সাহস, বীরত্ব, কারাবরণ, কঠোর নির্যাতন ও আত্মবলিদানের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে বহু বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং এই যুগের প্রকৃত ইতিহাস একখানি মহাকাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চতুরশীতি বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ গ্রন্থকারের পক্ষে এই মহাকাব্য রচনা সম্ভবপর না হইলেও ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক এই গুরু দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবেন, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে।

এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির কারণ, ইহা কেবলমাত্র বাংলাদেশের ইতিহাস নহে, ইহা বাঙালীর ইতিহাস। প্রথম খণ্ডে প্রাচীন যুগের ইতিহাসে বাঙালী জাতির কৃষ্টি ও সভ্যতা, তাহাদের চিন্তা ও ভাবনা, অভাব ও অভিযোগ, সামাজিক

ব্যবস্থা, ধর্মচিন্তা, ধর্মানুষ্ঠান এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীর আর্থিক অবস্থা প্রভৃতির কাহিনী ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যযুগে এই সমুদয় বিবরণ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইলেও সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য উপকরণের স্বল্পতানিবন্ধন সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙালী সম্প্রদায় সম্বন্ধে সমসাময়িক-কালে লিখিত বিবরণের প্রাচুর্যবশতঃ পূর্বোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা ও আলোচনা সম্ভবপর হইয়াছে। প্রধানতঃ সমসাময়িক বাংলা ও ইংরেজি সাময়িক পত্রেই এই ঐতিহাসিক উপকরণ পাওয়া যায়। সমসাময়িক বিখ্যাত কয়েকটি বাংলা পত্রিকা— সমাচার-দর্পণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, সংবাদ-প্রভাকর প্রভৃতি—সে যুগের বিশিষ্ট মনস্বীগণ দ্বারা সম্পাদিত হইত। সুতরাং এই সমুদয় পত্র-পত্রিকার সাহায্যে যে উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তাহার ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। উপরোক্ত পত্রিকাগুলি ছাড়াও আরও বহু সাময়িক-পত্র ছিল। বাঙালী-সমাজের এমন কোন দিক নাই যাহার উপর এই সমুদয় পত্রিকা উজ্জ্বল আলোকপাত করে নাই, এ কথা অনায়াসে বলা চলে। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপকরণের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং ইহাদের সাহায্যে বাঙালী জীবনের বিভিন্ন ধারার যে বিবরণ লেখা সম্ভবপর হইয়াছে এই গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডে তাহা হয় নাই। এই সব পত্রিকা বর্তমান কালে খুবই দুষ্প্রাপ্য। সৌভাগ্যের বিষয়, দুইজন বাঙালী পণ্ডিত বহু ক্লেশে পূর্বোক্ত বাংলা পত্রিকার প্রয়োজনীয় অংশগুলি সঙ্কলিত ও মুদ্রিত করিয়া অমূল্য ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের সুযোগ দিয়াছেন। স্বর্গত ব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তিন খণ্ডে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' এবং শ্রীবিনয় ঘোষ চারি খণ্ডে 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' নামে এই শ্রেণীর সঙ্কলন প্রকাশিত করিয়াছেন। বিনয়বাবু পঞ্চম খণ্ডে তাঁহার সঙ্কলিত অংশগুলির সাহায্যে 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা' নামে উনিশ শতকের বাংলা সমাজের একটি বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া তাঁহার গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি এবং এই যুগের ইতিহাস রচনার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। পূর্বোক্ত সাত খণ্ড সঙ্কলন-গ্রন্থের সাহায্যেই বর্তমান পুস্তকের সমাজচিত্র অঙ্কন সম্ভবপর হইয়াছে। এই সব গ্রন্থ হইতে বহু সংক্ষিপ্ত ও সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ইহার জন্য আমি মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের ঋণ স্বীকার ও তাঁহাদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পূর্বোক্ত সমসাময়িক পত্রিকাগুলি ব্যতীত বাংলা ভাষায় রচিত আলোচ্য যুগের

অনেক চিঠিপত্র ও দলিল প্রভৃতিও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল এইরূপ ৬৩২ খানি চিঠিপত্র সঙ্কলন করিয়া 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতেও অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি এবং এজন্য তাঁহাকেও বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

উনিশ শতকে বাংলাদেশ হইতে প্রকাশিত কয়েকখানি ইংরেজি পত্রিকাতেও বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ আছে। ইহার মধ্যে Hindoo Patriot, Amrita Bazar Patrika প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি প্রত্রিকার পুরাতন সংখ্যার কিছু কিছু সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা খুবই সংক্ষিপ্ত এবং তাহাতে রাজনীতিক তথ্য ও জাতীয়তার উদ্বোধন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্রবাবু ও বিনয়বাবুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কেহ যদি এই সমস্ত ইংরেজি পত্রিকাগুলির ঐতিহাসিক তথ্যহিসাবে প্রয়োজনীয় অংশগুলি সঙ্কলন করেন তাহা হইলে ভবিষ্যতে উনিশ শতকে বাংলাদেশের ইতিহাস আরও পূর্ণাঙ্গ হইবে এইরূপ আশা করা যায়।

উনিশ শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আছে। কিন্তু, বিশেষভাবে বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী নহে। দশ বৎসর পূর্বে আমি ইংরেজিতে "Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহার পর এ সম্বন্ধে অল্প কয়েকখানি ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু, এগুলি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নহে, কয়েকটি বিশিষ্ট বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও আলোচনামাত্র। যখন আমি এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই, তখন উনিশ শতকের বাংলার কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাতে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিবার সম্ভাবনা। তাহার জন্য পাঠকদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করি। আমার এই গ্রন্থ রচনা শেষ হইবার কিছু পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজিতে লিখিত একখানি এই যুগের পূর্ণাঙ্গ বাংলার ইতিহাস প্রকাশিত হয়।

আমার এই গ্রন্থে রাজনীতিক ইতিহাসের অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত। কারণ, রাজনীতিক ইতিহাসের দিক দিয়া এই যুগের বাংলার ইতিহাস ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী নাই। বাংলাদেশকে কেন্দ্র করিয়াই ইংরেজ প্রায় সারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল এবং উনিশ শতকের প্রথম ভাগ হইতেই বাংলাদেশ সমগ্র ভারতে বিস্তৃত ইংরেজ সাম্রাজ্যের অংশ মাত্র। ইহার

বিবরণ প্রধানতঃ ইংরেজের অথবা ভারতের ইতিহাস—বাংলাদেশ বা বাঙালীর ইতিহাস নহে।

উনিশ শতকের বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতীয় নবজাগরণের বিবরণই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ, ধর্মসংস্কার, শিক্ষা—বিশেষতঃ স্ত্রী-শিক্ষার—উন্নতি, সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, নূতন সাহিত্য ও সংবাদপত্রের উদ্ভব জাতীয় ভাবের উন্মেষ, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অগ্রগতির দাবি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির কাহিনীই বঙ্গদেশের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। উনিশ শতকে বাংলার এই জাগরণ যে সমগ্র ভারতকে, উদ্বুদ্ধ করিয়াছে এবং এই হিসাবে যে পূর্বোক্ত বিষয়বস্তুগুলি বাংলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ স্থান দাবি করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে এই সমুদয়েরই বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু, এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই সব আন্দোলন ও তাহার ফলাফল প্রথমে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার অধিবাসীদের শতকরা ৮০/৯০ জনের সহিত এই সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। বাঙালীর ইতিহাসে এই শেষোক্ত শ্রেণীর ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনীতিক অবস্থার বিষয়ও পর্যালোচনা করা আবশ্যক। তাহা না হইলে বাংলার বা বাঙালীর ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। প্রথম দুই খণ্ডে ঐতিহাসিক উপকরণের অভাবে এই শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পর্যাপ্ত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু, বর্তমান যুগে যে এই সব বিষয়ের বহু সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ধর্ম, সমাজ, আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা, আমোদ প্রমোদ, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট গণ-সম্প্রদায়ের বিবরণও দিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই খণ্ডে এইরূপ পৃথক প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী। কারণ এই যুগে ইংরেজী শিক্ষা ও তাহার সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এবং নাগরিক ও গ্রাম্য জনগণের মধ্যে যে গুরুতর ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছিল, প্রাচীন ও মধ্যযুগে তাহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং এই যুগে বাঙালীর সমাজ যে দুইটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহাদের পৃথক পৃথক বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। বিশেষতঃ উনিশ শতকে বাংলার জনসাধারণের ধর্ম ও নীতির জ্ঞান, ধারণা ও তদনুযায়ী অনেক আচার-ব্যবহার প্রভৃতি আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং তাহার সম্বন্ধে বিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর

জ্ঞান, ধারণা ও অভিজ্ঞতা খুবই অল্প। অনেকের পক্ষে নাই বলিলেও চলে। সুতরাং এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বিশিষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যে চিত্র আঁকিয়াছি, তাহা অনেকের বিস্ময় ও বিরাগ উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সত্যানুসন্ধানই ইতিহাসের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য এবং অতীতের ধর্ম, নীতি ও সামাজিক ব্যবস্থা যত অপ্রীতিকরই হউক না কেন, অজ্ঞতার আবরণে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহা গোপন করিয়া রাখা সম্ভব ও সঙ্গত নহে। কারণ, বর্তমান অবস্থার যথাযথ পরিচয়, বিচার ও সংশোধনের জন্য অতীতের জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইতিহাসের পারম্পর্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান না থাকিলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইতিহাসের শিক্ষা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

এই গ্রন্থের সমাপ্তিকাল ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দ। রাজনীতিক বিবর্তনের দিক দিয়া ইহা একটি বিশেষ যুগের শেষ ও নূতন যুগের আরম্ভকাল বলিয়া সীমা নির্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পের সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযোজ্য নহে। কারণ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ যে নবযুগ প্রবর্তন করেন এই তারিখে তাহার সূচনা হইয়াছে, কিন্তু পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। যে-কোন তারিখে সীমা নির্দেশ করিলেই ইতিহাসে এই প্রকার অসঙ্গতি অবশ্যম্ভাবী। অথচ, এই প্রকার সীমা নির্দেশ না করিলে বিভিন্ন খণ্ডে ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর নহে। এই জন্য প্রচলিত রীতি অনুসারে রাজনীতিক বিবর্তনের দিক বিবেচনা করিয়া ১৯০৫ সন এই খণ্ডের সীমারেখা নির্ধারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহিত্যিক ও শিল্পীদের বিবরণ কেবলমাত্র সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী খণ্ডে করা হইবে। বাংলাদেশে সংস্কৃত এবং আরবী, ফারসী ও ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা সম্বন্ধেও এই খণ্ডে পৃথক কোন বিবরণ নাই। পরবর্তী খণ্ডে ১৭৬৫ হইতে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ইহার আলোচনা করা হইবে।

এই গ্রন্থের শিল্প অধ্যায়ের অনেক বিবরণ এবং চিত্রগুলির জন্য শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাঁচালী গান সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্যের সন্ধান দিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের লিখিত কয়েকটি অংশের সংযোজনা করিয়াছি। আধুনিক সঙ্গীতের বিবরণ প্রধানতঃ শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত। ইঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

যে সকল মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি, পাদটীকায় তাহার বিস্তৃত উল্লেখ করিয়াছি।

এই গ্রন্থে 'সন', 'খ্রীঃ'—এই দুইটি খ্রীস্টাব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আমার বিশেষ স্নেহাস্পদ ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস যেভাবে এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ এবং ইহার নির্দেশিকা প্রস্তুতির সম্পূর্ণ কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন তাহার জন্য আমার বিশেষ ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই গ্রন্থের সাহায্যে যদি উনিশ শতকের বাঙালীর জীবনের সম্বন্ধে পাঠকের একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

২ পৌষ, ১৩৭৮
(১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১)
৪, বিপিন পাল রোড
কলিকাতা-২৬

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

রাজনীতিক ইতিহাস (১৭৬৫—১৯০৫)

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলার নবজাগরণ (১৮০০—১৯০৫)

প্রথম খণ্ড

রাজনীতিক ইতিহাস (১৭৬৫—১৯০৫)

প্রথম অধ্যায়

বাংলায় ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা

(১৭৬৫—১৭৮৫)

১। ইংরেজ আমলের আরম্ভ—দ্বৈত-শাসন

সিরাজউদ্দৌল্লাকে পদচ্যুত করিয়া নবাব হইবার জন্য মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১লা মে গোপনে যে সন্ধি করেন তাহার একটি শর্ত ছিল এই যে, সুবে বাংলাকে ফরাসী ও অন্যান্য শত্রুদের আক্রমণ হইতে রক্ষার নিমিত্ত ইংরেজ কোম্পানি উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত করিবে এবং তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত জমি কোম্পানিকে দিতে হইবে। মীরকাশিম ইংরেজদের সঙ্গে যে গোপন সন্ধির দ্বারা মীরজাফরকে সরাইয়া নিজে নবাব হইলেন তাহার শর্ত অনুসারে তিনি ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জিলার রাজস্ব কোম্পানিকে দিলেন। ইহার পর মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ বাধিলে মীরজাফর পুনরায় নবাব হইবার জন্য ইংরেজের সহিত যে সন্ধি করিলেন তাহার শর্ত অনুসারে ইংরেজ কোম্পানি ঐ তিনটি জিলা হস্তগত করিল এবং স্থির হইল যে বাংলার নবাব বারো হাজার অশ্বারোহী ও বারো হাজার পদাতিকের বেশী সৈন্য রাখিতে পারিবেন না। ইহার ফলে বাংলা দেশের সামরিক শক্তি ইংরেজদের হাতেই ন্যস্ত হইল। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও নবাব তাহাদের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষমতা হারাইলেন। ইংরেজের নির্দেশ অনুসারে চলা ভিন্ন তাঁহার কোন গত্যন্তর রহিল না।

মীরজাফরের মৃত্যুর পর ইংরেজ তাঁহার নাবালক পুত্র নজমুদ্দৌল্লাকে এই শর্তে নবাব করিলেন যে, তিনি নামে নবাব থাকিবেন, কিন্তু সমস্ত শাসনক্ষমতা একজন নায়েব-নাজিম বা নায়েব-সুবাদারের হস্তে থাকিবে এবং ইংরেজের অনুমোদন ব্যতীত নবাব কোন নায়েব-সুবাদার নিযুক্ত বা বরখাস্ত করিতে পারিবেন না।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অগস্ট সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম ইংরেজ কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া ফরমান দিলেন। ইহার ফলে সমগ্র দেশের রাজস্ব আদায়ের ভারও ইংরেজেরা পাইল। স্থির হইল যে প্রতি বৎসর আদায়ী রাজস্ব হইতে দিল্লীর সম্রাট ও বাংলার নবাব বার্ষিক নির্ধারিত বৃত্তি পাইবেন—বাকী টাকা ইংরেজেরা ইচ্ছামত ব্যয় করিবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মুর্শিদাবাদে ইংরেজের বৃত্তিভোগী একজন নামসর্বস্ব নবাব রহিলেন, কিন্তু সামরিক শক্তি, শাসনক্ষমতা ও ধনসম্পদ এ সকলই ইংরেজদের অধিকারে আসিল। সুতরাং একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় নবাবের রাজত্ব শেষ হইল এবং নামে না হইলেও কার্যত: ইংরেজ কোম্পানির রাজত্ব আরম্ভ হইল। ক্লাইব ১৭৬৫ সনে দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্নর হইয়া আসার পরই দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে পূর্বোক্ত দেওয়ানির সনদ লাভ করেন। সুতরাং পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্লাইব বাংলায় ইংরেজের যে প্রভুত্বের সূচনা করেন আট বৎসর পরে তিনিই তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ন্যায়সংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। দিল্লীর বাদশাহের বৃত্তি ২৬ লক্ষ টাকা কয়েক বৎসর পরেই বন্ধ করা হইল। বাংলার নবাবের বার্ষিক বৃত্তি ৫৩ লক্ষ টাকা কমাইয়া ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪১ লক্ষ এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩২ লক্ষ করা হইয়াছিল।

এইরূপে বাংলায় যে শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল তাহা সাধারণত: দ্বৈত-শাসন নামে অভিহিত হয়। কারণ প্রত্যক্ষভাবে ও নামত: নবাবের শাসনই বজায় থাকিল, কিন্তু কার্যত: পরোক্ষভাবে প্রকৃত ক্ষমতা রহিল ইংরেজদের হাতে। ক্লাইব ইচ্ছা করিলে নবাবকে সরাইয়া সরাসরি ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেন। কিন্তু সম্ভবত: তিনি মনে করিতেন যে এইরূপ করিলে স্বল্প সংখ্যক বিদেশী বণিকের আধিপত্যে দেশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া নানা প্রকার বিরোধ ও গোলযোগের সৃষ্টি করিবে এবং বিদেশী অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ও তাহাদের বিরুদ্ধে বাংলার অধিবাসীদের পক্ষ সমর্থন করিবে। এই জন্য তিনি ইংরেজ প্রভুত্বের উপর একটি আবরণ রাখিয়া দিলেন, যাহাতে প্রকৃত রাষ্ট্রবিপ্লবের চিত্রটি জনসাধারণের নিকট স্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হইয়া ক্রমশ: ধীরে ধীরে প্রকট হয়। ক্লাইবের এই বিচক্ষণ কূটনীতি অনেকেই সমর্থন করিয়াছেন।

• ক্লাইব দ্বিতীয়বার গভর্নর হইয়া মাত্র দুই বৎসর কাল এদেশে ছিলেন। কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যেই কোম্পানির আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার অনেক সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীরা অসৎ উপায়ে ব্যবসা করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করিত এবং প্রত্যেক নূতন নবাবের নিকট হইতে প্রচুর 'উপঢৌকন' অর্থাৎ উৎকোচ গ্রহণ করিত। বহু বাধা সত্ত্বেও ক্লাইব এই উৎকোচ প্রথা রহিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং কিছু পরিমাণে কৃতকার্য হন। কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের প্রথাও তিনি রহিত করেন। সৈনিক কর্মচারীরা বহুদিন যাবৎ বে-আইনী ভাবে বেতনের অতিরিক্ত যে ভাতা পাইয়া আসিতেছিল তাহাও তিনি বন্ধ করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কর্মচারীরা একযোগে কর্মত্যাগ করিল। কিন্তু ক্লাইব দৃঢ়তার সহিত এই বিদ্রোহ দমন করিলেন এবং শীঘ্রই সৈন্যদলে শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল।

১৭৬৭ সনের ফেব্রুআরি মাসে ক্লাইব স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তিনি যে অদ্ভুত সামরিক প্রতিভা ও শাসন কার্যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইবেন। উমিচাঁদকে প্রতারণা করিবার জন্য জাল উইল তৈরী করা তাঁহার চরিত্রে একটি দুরপনেয় কলঙ্ক। কিন্তু "জালিয়াৎ ক্লাইব" এই আখ্যা সত্য হইলেও তাঁহার চরিত্রের মহৎ গুণগুলিও স্মরণ রাখা উচিত। তিনি যে মীরজাফরের নিকট হইতে বহু অর্থ ও সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা কতটা বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অন্যান্য ইংরেজ গভর্নর ও কর্মচারীরা বাংলার নবাবের নিকট হইতে বহু অর্থ আদায় করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে মুর্শিদাবাদের রাজকোষে সঞ্চিত বিপুল সম্পদ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। এই সমুদয় কারণে বিলাতের কর্তৃপক্ষ ক্লাইবকে যথোচিত সমাদর বা সম্মান করেন নাই, বরং অন্যায় কার্য ও অসদুপায়ে স্বার্থ সিদ্ধির অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। এই অসম্মান অসহ্য হওয়ায় অবশেষে ক্লাইব আত্মহত্যা করেন (১৭৭৪ খ্রীঃ)। ক্লাইবের চরিত্রে দোষগুণ উভয়ই ছিল কিন্তু তাঁহার অসাধারণ প্রতিভাই যে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ক্লাইবের পর প্রথমে ভেরেলস্ট (Verelst) ও পরে কার্টিয়ার (Cartier)

১৭৬৯ সনে ইংরেজ কোম্পানির গভর্নর হইলেন। এই সময়ে ইংরেজ কর্মচারীরা নানা অসৎ উপায়ে প্রজাগণকে উৎপীড়িত করিয়া নিজেদের জন্য বহু অর্থ উপার্জন করিতে ব্যস্ত ছিলেন—দেশশাসনের কোন দায়িত্বই তাঁহারা পালন করিতেন না। কোম্পানি নামে দেওয়ান ছিলেন কিন্তু বাংলায় দেওয়ানির কাজ প্রকৃত পক্ষে করিতেন নায়েব-দেওয়ান মুহম্মদ রেজা খাঁ। কোম্পানি তাঁহার কুশাসন ও অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন প্রভৃতির জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিলেন, কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইল না। বরং বাঙ্গালীর দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছিল। কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী রিচার্ড বেচার ১৭৬৯ সনের ২৪শে মে বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিলেন: "কোম্পানির দেওয়ানি লাভের ফলে প্রজা সাধারণের যেরূপ দুর্দশা হইয়াছে ইহার পূর্বে কখনও সেরূপ হয় নাই। বহু স্বেচ্ছাচারী নবাবের আমলেও যে দেশ অতুল সুখ ও সম্পদের অধিকারী ছিল তাহা ধ্বংসের সীমানায় পৌঁছিয়াছে।" এই উক্তি যে কতদূর সত্য শীঘ্রই তাহা প্রমাণিত হইল। বাংলা ১১৭৬ সালে (১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বাংলা দেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইল। ইহার ফলে প্রায় এক কোটি অর্থাৎ মোট অধিবাসীর এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে ও পীড়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কৃষিযোগ্য জমির এক তৃতীয়াংশ জঙ্গলে পরিণত হয়। একজন ইংরেজ কর্মচারী ১৭৭০ সনে লিখিয়াছিলেন —'বাংলার দুরবস্থা কল্পনা ও বর্ণনার অতীত—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, বহুস্থানে মৃতের মাংস খাইয়া লোকে জীবন ধারণের চেষ্টা করিয়াছে।" এই দুরবস্থার সুযোগে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীরা চাউল কিনিয়া মজুত রাখিয়া পরে চড়া দামে বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ লাভ করিয়াছিল। অথচ এই দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের নিকট হইতে জোর জবরদস্তি করিয়া খাজানা আদায় করা হইয়াছিল। চরম দুরবস্থার অজুহাতেও শতকরা পাঁচ টাকার বেশি খাজানা মাপ করা হয় নাই এবং পরের বৎসর শতকরা দশটাকা খাজানা বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাধারণ গৃহস্থ সর্বস্বান্ত হইয়াছিল। প্রায় বিশ ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বাংলা দেশে এই দুর্ভিক্ষের চিহ্ন লোপ পায় নাই। এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই করাল দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'আনন্দমঠে'র কাহিনী রচনা করিয়া

ইহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতুলনীয় ভাষায় এই দুর্ভিক্ষের যে ভয়াবহ চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বাস্তব ঘটনা—কাল্পনিক নহে।

এই দুর্ভিক্ষের দুই বৎসর পরেই (১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ) ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hastings) বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির গভর্নর নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার আমলে বাংলার শাসন-ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়।

২। ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫)

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বিলাতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে কুশাসনের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিলেন এবং প্রধানতঃ 'দ্বৈতশাসন প্রণালী'ই যে ইহার জন্য দায়ী তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিলেন। সুতরাং অতঃপর যাহাতে এ দেশের শাসনভার ইংরেজ কর্মচারীর হস্তেই ন্যস্ত হয় এই নির্দেশ দিয়াই ওয়ারেন হেস্টিংসকে বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

বাংলায় ইংরেজী আমলের ইতিহাসে দুইটি কারণে হেস্টিংসের শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ এই সময়েই ইংরেজ কোম্পানি নিজের হাতে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়তঃ বাংলার বাহিরে যে সমুদয় স্বাধীন রাজ্য ছিল তাহাদের সহিত মিত্রতা ও সংঘর্ষের ফলে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতের অন্যতম প্রধান রাজশক্তিতে পরিণত হয়।

ক। শাসনসংস্কার

বাংলার নবাবেরা একাধারে নাজিম ও দেওয়ান ছিলেন। নাজিম হিসাবে তাঁহারা শাসন ও বিচারকার্য করিতেন, রাজ্যের আভ্যন্তরিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেন, এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিতেন। দেওয়ান হিসাবে তাঁহারা রাজস্ব আদায় করিতেন। নাজিমের ক্ষমতা নামে নবাবের হাতে থাকিলেও, নায়েব-নাজিমের নিয়োগ ইংরেজের হাতে থাকায় কিরূপে প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজের হাতে চলিয়া যায় পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ১৭৬৫ সনে ইংরেজ কোম্পানি দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ায় নবাবদের হাত হইতে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ইংরেজদের হাতেই গেল। কিন্তু এই সমুদয় ক্ষমতাই এতদিন পর্যন্ত ইংরেজের অধীনে এ দেশীয় কর্মচারীরাই পরিচালনা করিতেন। সুতরাং পুরাতন ঠাট বজায় থাকায় রাজ্য শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা যে নবাবের হাত হইতে বিদেশী ইংরেজ

কোম্পানির হাতে চলিয়া গিয়াছে সাধারণ লোকে ইহা সহজে বুঝিতে পারিত না। ইংরেজেরাও তাহাদের প্রকৃত রাজ-শক্তি একটি সূক্ষ্ম আবরণ দ্বারা লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সকল দেশের ইতিহাসেই দেখা যায় যে রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা একজনের হাতে ও নামমাত্র দায়িত্ব আর একজনের হাতে থাকিলে শাসনকার্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং ক্রমশ: শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া যায়। বাংলাদেশেও তাহাই ঘটিয়াছিল এবং ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এই ভীষণ অবস্থা বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং অনেক বিচার ও বাদানুবাদের পর ইংরেজ কোম্পানি নিজের হাতে শাসনভার গ্রহণ করা স্থির করিলেন। অতঃপর হেস্টিংস নানা উপায়ে ইহা কার্যে পরিণত করিলেন।

হেস্টিংস গভর্নর হইয়াই দেওয়ানী কার্যের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মুহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে বরখাস্ত করিলেন এবং প্রতি জিলায় কলেকটর (Collector) নামে ইহার জন্য একজন ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু রাজস্ব কার্যের খুঁটিনাটি বিষয়ে ইহাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। মুঘল আমলের শেষভাগে বাংলাদেশে প্রজাগণের জমি মাপিয়া নির্দিষ্ট হারে খাজানা বন্দোবস্ত করা হইত না। এক একজন জমিদারের নিকট হইতে থোক টাকা লইয়া তাহার হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইত। মীর কাশিমের পর এ ব্যবস্থা অচল হইল এবং তাঁহার প্রবর্তিত বর্ধিত হারে খাজানা দেওয়া দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে অসম্ভব হইল। তখন সরকারী তহশীলদারগণ প্রজাদের মারপিট করিয়া খাজানা আদায় করিত। হেস্টিংস জমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। প্রতি বৎসর নিলাম ডাকিয়া সর্বোচ্চ দরে এক এক জনকে এক এক জমিদারী ইজারা দেওয়া হইত। কেবল একবার মাত্র পাঁচ বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হইয়াছিল। ইজারাদারেরা তাঁহাদের মিয়াদের কালের মধ্যে প্রজাদের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল প্রজার উৎপীড়ন, চাষের অবনতি, জমিদারী প্রথার ধ্বংস এবং সরকারের বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ হ্রাস।

প্রত্যেক জিলায় একটি দেওয়ানী এবং একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইল। রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রতি জিলায় যে ইংরেজ কর্মচারী (Collector) থাকিতেন তিনিই দেওয়ানী আদালতের বিচারকার্যও

করিতেন। ফৌজদারী আদালতে নায়েব-নাজিমের অধীনে এ দেশীয় লোকই ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকের কার্য করিতেন। কলিকাতায় দেওয়ানী বিচারের জন্য সদর দেওয়ানী আদালত এবং ফৌজদারী বিচারের জন্য সদর নিজামৎ আদালত নামে দুইটি আপিল আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরেজ গভর্নরই সদর দেওয়ানী আদালতের অধ্যক্ষ ছিলেন। সদর নিজামৎ আদালতে একজন মুসলমান অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন।

১৭৭৩ সনে নভেম্বর মাসে কলেক্টরের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, দিনাজপুর, ঢাকা ও পাটনায় একটি করিয়া প্রাদেশিক সমিতি (Provincial Council) এবং কলিকাতায় একটি রাজস্ব কমিটি (Committee of Revenue) স্থাপিত হইল। প্রত্যেক প্রাদেশিক সমিতিতে একজন অধ্যক্ষ (Chief) ও চারিজন অভিজ্ঞ ইংরেজ কর্মচারী থাকিতেন এবং ইহার সহিত একটি বিচারালয় যুক্ত হইত। সমিতির সভ্যগণ পালা করিয়া এক মাসের জন্য ইহার তদারক করিতেন।

খ। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড

অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌল্লা মীরকাশিমের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইংরেজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ১৭৬৫ খ্রী: ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করেন, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অযোধ্যা রাজ্য বাংলার একেবারে প্রান্তে অবস্থিত সুতরাং মারাঠা বা আফগানদের আক্রমণ হইতে বাংলা দেশ রক্ষা করার জন্য অযোধ্যার রক্ষণাবেক্ষণ বাংলা দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই কারণে ইংরেজেরা অযোধ্যার নবাবের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিতে আগ্রহশীল ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রী: সন্ধি অনুসারে নবাব এলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশ ইংরেজদিগকে দিয়াছিলেন এবং ইংরেজ ইহা শাহ আলমকে দিয়া বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করিলেন। ঐ সন্ধির আর একটি শর্ত ছিল যে অযোধ্যা বা ইংরেজের রাজ্য কোন বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে অপর পক্ষ সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন, এবং ইংরেজ সৈন্য নবাবকে সাহায্য করিলে উহার অতিরিক্ত খরচ নবাব বহন করিবেন।

১৭৭২ খ্রী: বাদশাহ শাহ আলম মারাঠাদের হস্তে পরাজিত হইয়া এলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশ তাহাদিগকে দিতে স্বীকার করিলেন। অতঃপর

মারাঠা সৈন্য দোয়াব প্রদেশে প্রবেশ করিল এবং নবাব শুজাউদ্দৌল্লা হেস্টিংসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। একদল ইংরেজ সৈন্য গঙ্গা নদী পার হইবার পরেই মারাঠা সৈন্যদল দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেল। অতঃপর হেস্টিংস শুজাউদ্দৌল্লার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এক নূতন সন্ধি করিলেন (১৭৭৩ খ্রীঃ)। কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে নবাবকে ফেরত দেওয়া হইল। নবাব নিজের ব্যয়ে একদল ইংরেজ সৈন্য নিজ রাজ্যে রাখিতে সম্মত হইলেন। আরও স্থির হইল যে একজন ইংরেজের রাজদূত নবাবের রাজধানী লখনউ নগরে বাস করিবেন। এই সন্ধির ফলে হেস্টিংসকে আর একটি যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইল।

অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রোহিলখণ্ড অঞ্চলে রোহিলা নামে এক পাঠান উপজাতি রাজত্ব করিত। এই অঞ্চলটি স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌল্লা হেস্টিংসের নিকট একদল ইংরেজ সৈন্যের সাহায্য চাহিলেন। তিনি এই সৈন্যদলের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ করিতে এবং তদুপরি চল্লিশ লক্ষ টাকা হেস্টিংসকে দিতে স্বীকৃত হইলেন। হেস্টিংস এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া একদল বৃটিশ সৈন্য পাঠাইলেন। ইহাদের সহায়তায় শুজাউদ্দৌল্লা রোহিলখণ্ড জয় করিলেন।

গ। অবৈধরূপে অর্থ সংগ্রহ

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও কুশাসনের ফলে ইংরেজ কোম্পানির প্রচুর ঋণ হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকটা এই কারণেই হেস্টিংস নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে পূর্বোল্লিখিত রূপে অর্থ সংগ্রহ ছাড়াও তিনি এই উদ্দেশ্যে আর দুইটি উপায় অবলম্বন করিলেন। সম্রাট শাহ আলম মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন এই অজুহাতে তিনি তাঁহার প্রাপ্য বার্ষিক রাজস্ব ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বাংলার নবাবের বার্ষিক বৃত্তিও কমাইয়া অর্ধেক করিয়া দিলেন। এইভাবে সম্রাটের সহিত সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিয়া এবং রোহিলা জাতির ধ্বংস সাধন করিয়া হেস্টিংস কোম্পানির ঋণ শোধ দিলেন এবং তহবিলে কিছু অর্থও সঞ্চিত হইল। কিন্তু অনেকেই হেস্টিংসের এই সকল কার্যের অতিশয় নিন্দা করিয়াছেন।

৩। ইংরেজ কোম্পানির নূতন শাসন প্রণালী

এইরূপে কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।" এতদিন কোম্পানির প্রধান কার্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এক বিস্তৃত রাজ্য শাসনের ভার ও দায়িত্ব তাহাদের হাতে আসিল। সুতরাং কোম্পানির কার্য নির্বাহের জন্য ভারতে যে প্রণালী এতদিন প্রচলিত ছিল তাহার পরিবর্তন করার প্রয়োজন অনুভূত হইল। এই উদ্দেশ্যে বিলাতে ইংরেজ সরকার ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং আইন (Regulating Act) নামে এক নূতন বিধান প্রবর্তিত করিলেন।

রেগুলেটিং আইন দ্বারা সমগ্র ভারতে কোম্পানির অধিকৃত স্থানগুলির শাসন একজন গভর্নর জেনারেল বা বড়লাট এবং চারিজন সদস্যযুক্ত এক শাসন-পরিষদের উপর ন্যস্ত হইল। বাংলার গভর্নর বা লাটসাহেব এই শাসন-পরিষদের সভাপতি এবং গভর্নর জেনারেল হইলেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্নর এবং শাসন-পরিষদ বাংলার বড়লাট ও তাঁহার শাসন-পরিষদের অধীন হইল। কোম্পানির কর্মচারীদের অপরাধের বিচার করিবার জন্য কলিকাতায় একটি উচ্চ আদালত (সুপ্রিম কোর্ট) প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাতে একজন প্রধান বিচারপতি এবং অপর তিনজন নিম্নতর বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন।

এই নূতন আইনে বাংলার লাট ওয়ারেন্ হেস্টিংস্‌ই বড়লাট হইলেন এবং ফ্রান্সিস্, মন্‌সন্, ক্লেভারিং ও বারওয়েলকে লইয়া নূতন শাসন-পরিষদ্ গঠিত হইল। এই চারিজনের মধ্যে কেবল মাত্র বারওয়েলের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। অপর তিনজন সদস্য এই প্রথম বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের ন্যায়-অন্যায় ধারণা হেস্টিংসের ধারণা হইতে একেবারে ভিন্ন ছিল। সুপ্রিম কোর্ট নামক উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে হেস্টিংসের বন্ধু ছিলেন।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইল। প্রথম হইতেই ইংলণ্ড হইতে আগত নূতন তিনজন শাসন-পরিষদের সভ্য হেস্টিংসের বিরুদ্ধবাদী হইলেন, এবং তাঁহার অতীতের কার্যাবলী ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তাবিত কার্যসমূহ প্রায়ই তাঁহারা অনুমোদন করিতেন না।

শাসন-পরিষদের নূতন সভ্যগণের সহিত হেস্টিংসের বিরোধ আরও এক

বৎসরকাল চলিয়াছিল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মন্‌সনের মৃত্যুতে, এবং আরও এক বৎসর পরে ক্লেভারিং-এর মৃত্যুতে, হেস্টিংস্ আবার স্বাধীনভাবে পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালনা করিতে সমর্থ হইলেন।

লর্ড নর্থের রেগুলেটিং আইন প্রবর্তনের পর হেস্টিংসের শাসনকালেই ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা অনেক বাড়িয়া যায় এবং এই আইনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি পার্লামেণ্টের গোচরীভূত হয়। অপর দিকে হেস্টিংসের নানা কার্যকলাপ পার্লামেণ্ট সমর্থন করিতে পারে না। সুতরাং এই সকল দোষত্রুটি দূর করিয়া ভারতের শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব প্রধানভাবে পার্লামেণ্টের অধিকারে আনিবার জন্য ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট নামে এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের বলে বিলাতে বোর্ড অব্ কন্‌ট্রোল নামে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ এক শাসন-পরিষদ্ প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং কোম্পানিকে স্থায়িভাবে ও সম্পূর্ণরূপে এই পরিষদের অধীন করা হইল। এই পরিষদের ক্ষমতা শীঘ্রই উহার সভাপতির উপর ন্যস্ত হইয়া গেল। বোর্ড অব্ কন্‌ট্রোলের সভাপতি অতঃপর ভারতীয় ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। কোম্পানির কর্তৃপক্ষের হাতে সামান্য ক্ষমতা মাত্র রহিল।

গভর্নর জেনারেলের শাসন-পরিষদের সদস্য সংখ্যা কমাইয়া তিনজন করা হইল এবং যুদ্ধ রাজস্ব ও বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে বোম্বাই ও মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের অধীন হইল। আবশ্যক হইলে বড়লাট শাসন-পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়াও নিজ দায়িত্বে কার্য করিতে পারিবেন, এইরূপ বিধানও করা হইল। বোর্ড অব্ কন্‌ট্রোলের অনুমোদন ব্যতীত স-কাউন্সিল গভর্নর জেনারেল ভারতে রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধাদিতে লিপ্ত হইতে পারিবেন না, এই আইনে এইরূপ নির্দেশও দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থের 'রেগুলেটিং আইন' পাশ হইবার ফলে বাংলার আভ্যন্তরিক শাসন-ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। পাঁচ বছরের জন্য রাজস্ব ইজারা দেওয়ার ফলে ইজারাদার, জমিদার ও প্রজা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এইজন্য ইহা রহিত করিয়া ১৭৭৭ সন হইতে জমিদারদের সহিত প্রতিবৎসর দেয় রাজস্বের পরিমাণ বন্দোবস্ত করা হইত।

সদর দেওয়ানী আদালত উঠাইয়া দেওয়া হইল। ইহার অধীনে

যে সমুদয় মফঃস্বলের আদালত ছিল তাহাদের অধিকার ও ক্ষমতা লইয়া সুপ্রিম কোর্টের সহিত গভর্নমেণ্টের প্রায়ই বাদ বিসম্বাদ হইত। ইহা দূর করিবার উদ্দেশ্যে হেস্টিংস ১৭৮০ সনে পুনরায় সদর দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠা করিয়া সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পেকে এই আদালতেরও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। স্থির হইল যে ইহার জন্য তিনি মাসিক পাঁচ হাজার টাকা অতিরিক্ত বেতন পাইবেন। কিন্তু বিলাতের কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দিলেন এবং এই নূতন পদ গ্রহণের জন্য ইম্পেকে বরখাস্ত করিলেন। ইম্পে বিলাতে ফিরিয়া গেলেন।

১৮০৩ সনে সদর নিজামৎ আদালত আবার মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইল এবং নায়েব-নাজিম তাহার অধ্যক্ষতা করিতেন। তাঁহার অধীনে ফৌজদারী আদালতের বিচারকগণ ম্যাজিস্ট্রেটের এবং জমিদারগণ পুলিশের কাজ করিতেন। ১৭৮১ খ্রীঃ এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হইল। প্রাদেশিক সমিতি উঠাইয়া আবার রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কলেক্টর নিযুক্ত হইল।

কলিকাতার কাউন্সিল স্থির করিলেন যে অতঃপর প্রতি জিলার দেওয়ানী আদালতের ইংরেজ বিচারকই ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যও করিবেন এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ-পত্র সহ তাহাকে নিকটস্থ ফৌজদারী আদালতে বিচারের জন্য পাঠাইবেন। কলিকাতায় ইংরেজ গভর্নর জেনারেলের অধীনে একজন ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন—তাঁহার নিকট নায়েব-নাজিম প্রতিমাসে ফৌজদারী আদালতের কার্য বিবরণ পাঠাইতেন। সুতরাং প্রকারান্তরে ফৌজদারী বিচার বিভাগেও ইংরেজ গভর্নর জেনারেলই সর্বাধ্যক্ষ হইলেন। ১৭৯০ খ্রীঃ হেস্টিংসের পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস নায়েব-নাজিমের হাত হইতে ফৌজদারী বিচারের ভার একেবারে উঠাইয়া নিয়া ইহার জন্য ইংরেজ বিচারকের অধীনে নূতন এক শ্রেণীর ভ্রাম্যমাণ আদালত (Courts of Circuit) সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে নবাবী আমল শেষ হইয়া বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। ভূতপূর্ব নবাবী আমলের একমাত্র নিদর্শন রহিল মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত নবাব উপাধিধারী একজন ইংরেজের বৃত্তিভোগী মীরজাফরের বংশধর এবং বাদশাহ শাহ আলমের নামাঙ্কিত মুদ্রা। নবাবের ক্ষমতার মধ্যে রহিল উপাধি বিতরণ। মীরজাফরের পরবর্তী তিনজন নবাবের

সহিত সিংহাসনে আরোহণের সময় নূতন সন্ধি করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রীঃ নবাব মুবারকউদ্দৌল্লার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী নসির-উল-মুল্ককে কোম্পানি ও বাদশাহ শাহ আলমের পক্ষ হইতে একটি স্বীকারপত্র (Credential) মাত্র দেওয়া হইল। বাংলার শেষ নবাব নাজিম বহু বৎসর বিলাতে বাস করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ তিনি নবাব নাজিমের পদত্যাগ করেন এবং নিজামতের শাসন-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অধিকার থাকিবে না এই মর্মে এক দলিল সম্পাদন করেন। ইহার বিনিময়ে দশ হাজার পাউণ্ড তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারিত হইল; ইংরেজ সরকার আরও দশ লক্ষ টাকা নগদ দিলেন এবং বিলাতে তাঁহার যে সন্তানসন্ততি জন্মিয়াছিল তাহাদের ভরণ-পোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ হাসান আলি মুর্শিদাবাদের নবাব এই উপাধিতে ভূষিত হন এবং তিনি বাংলার অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার জন্য বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। ইংরেজরা দিল্লী অধিকার করার পর বড়লাট বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের সহিত কোন সন্ধি করেন নাই—কেবল তাঁহার জন্য একটি বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করেন। এইরূপে বাংলায় মুঘল রাজত্বের অবসান হইল।

৪। মহারাজা নন্দকুমার

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যে নূতন শাসন-পরিষদ (কাউন্সিল) নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার চারিজন সভ্যের মধ্যে তিনজনই যে হেস্টিংসের বিরোধী ছিলেন তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুযোগ বুঝিয়া হেস্টিংসের শত্রুপক্ষ শাসন-পরিষদে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আনয়ন করিল। নন্দকুমার নামে একজন সম্ভ্রান্ত প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ শাসন-পরিষদের নিকট অভিযোগ করিলেন যে, হেস্টিংস্ মীরজাফরের পত্নী মণি বেগমের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার অভিযোগের প্রমাণস্বরূপ তিনি লিখিত দলিলপত্রও উপস্থিত করিলেন। নূতন সভ্যগণ নন্দকুমারের পক্ষ লইলেন, কিন্তু হেস্টিংস্ এই অভিযোগ শাসন-পরিষদে উত্থাপিত হইতে দিলেন না। অবশেষে হেস্টিংস্ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করিলেন।

এই সময়ে মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি উচ্চ আদালতে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল করার অভিযোগ করিল। আদালতের বিচারে নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হইলেন এবং তৎকালে প্রচলিত ইংরেজী আইন অনুসারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল।

বর্তমান কালে বাংলা দেশে মহারাজা নন্দকুমার একজন দেশ-প্রেমিক ও ভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামের শহীদ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহার কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা তাহার বিচারের জন্য নন্দকুমার সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য জানা যায় তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

হেস্টিংসের শাসনকালে তাঁহার কাউন্সিলের সদস্য বারওয়েল ইংলণ্ডে তাঁহার এক বন্ধুর নিকটে লিখিত চিঠিতে নন্দকুমারের বাল্যজীবন সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার অতিরিক্ত এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই: "নন্দকুমার তাঁহার পিতার অধীনে রাজস্ব বিভাগে সামান্য একটি চাকুরী করিতেন, ক্রমে নবাব আলিবর্দির সময়ে হিজলী ও মহিষাদলের আমিন পদে নিযুক্ত হন। জমিদারদের উপর অত্যাচার ও ৮০,০০০ টাকা তহবিল তসরুফ করার অপরাধে তাঁহার উপরিওয়ালা তাঁহাকে বরখাস্ত করেন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কারাগারে রাখেন। সেখানে তাঁহাকে বহুবার বেত্রাঘাত করা হয়। নন্দকুমারের পিতা প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া তাঁহাকে খালাস করেন। পরবর্তীকালে সিরাজউদ্দৌল্লার হস্তেও তিনি বহু শারীরিক দণ্ড ভোগ করেন। কিন্তু বহু চেষ্টার ফলে আলিবর্দির মৃত্যুর পর নবাবের অনুগ্রহভাজন ও হুগলীর ফৌজদার পদে নিযুক্ত হন।"

বারওয়েলের এই বিবরণ কতদূর সত্য বলা যায় না; কারণ তিনি হেস্টিংসের বন্ধু ছিলেন, সুতরাং নন্দকুমারকে শত্রুজ্ঞানে ঘৃণা করিতেন। নন্দকুমারের পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে অনেকটা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। ১৭৫৭ সনে পলাশী যুদ্ধের পূর্বে যখন ক্লাইব ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করেন, তখন ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও ফরাসী সৈন্যদের সাহায্য করিবার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকে আদেশ করেন। কিন্তু নন্দকুমার ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা, নবাবের অপর একদল সৈন্যকে ঐ কার্য হইতে

প্রতিনিবৃত্ত করেন। তিনি যে ইংরেজের নিকট হইতে মোটা টাকা ঘুষ পাইয়া এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন ইহা কেবলমাত্র অনুমান নহে, সমসাময়িক ইংরেজ লেখকগণও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সেই সময়কার রাজনীতিক পরিস্থিতি আলোচনা করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা মোটেই অসঙ্গত নহে যে, নন্দকুমার ইংরেজদিগকে বাধা দিলে তাহারা চন্দননগর দখল করিতে পারিত না এবং পলাশীর যুদ্ধ ও সিরাজউদ্দৌল্লার পতনও ঘটিত না। সুতরাং ইংরেজের বাংলা দেশ বিজয়ের জন্য নন্দকুমারের বিশ্বাসঘাতকতা যে অনেক পরিমাণে দায়ী তাহা অস্বীকার করা কঠিন।

সিরাজউদ্দৌল্লার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ নন্দকুমার ক্লাইব ও মীরজাফর উভয়েরই খুব প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইলেন এবং ইংরেজের অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় বসবাস করিতে লাগিলেন।

অনেক ইংরেজ লেখকের মতে নন্দকুমার অতঃপর নানা উপায়ে ইংরেজ কোম্পানির অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন—এবং নবাব মীরজাফরের দেওয়ান নিযুক্ত হইবার পর ইংরেজদিগকে বাংলা দেশ হইতে তাড়াইবার জন্য রাজ্যভ্রষ্ট মীরকাশিম, কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ এবং অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এই সমুদয় অভিযোগ কতদূর সত্য, এবং সত্য হইলেও তিনি দেশপ্রেম অথবা স্বার্থসিদ্ধি এবং স্বাভাবিক ষড়যন্ত্রপ্রবণতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে ১৮৮-১৯০ পৃষ্ঠায় যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। জাল করিবার অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড যে অন্যায় বিচার হইয়াছিল প্রথমাবধি অনেকেই এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু নন্দকুমারের ফাঁসি হওয়ার পরবর্তী দেড়শত বৎসরের মধ্যে কেহ কল্পনাও করেন নাই যে তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন এবং দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। বর্তমান যুগের এই ধারণার সমর্থনযোগ্য কোন প্রমাণ নাই। আধুনিক কালে যে মনোবৃত্তির ফলে প্রাচীন যুগের মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কৈবর্তরাজ দিব্য অত্যাচারী রাজার দমনের নিমিত্ত জনগণের নির্বাচিত নায়ক বলিয়া পূজা পাইয়াছেন, এবং মধ্য যুগের মুঘলের অনুগত ও আজ্ঞাবাহকারী প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান নায়ক বলিয়া গণ্য

হইয়াছেন, সেই মনোবৃত্তির ফলেই নন্দকুমার শহীদের গদীতে স্থান পাইয়াছেন। বর্তমান যুগে ইঁহাদের স্মৃতিপূজার ব্যবস্থা বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর প্রকৃত ইতিহাস বিস্মৃতিরই পরিচয় দান করে।

৫। ইংরেজের রাজ্য বিস্তার

রেগুলেটিং আইন প্রবর্তনের ফলে হেস্টিংসের সময় হইতেই বাংলাদেশ ভারতে বৃটিশ রাজশক্তির কেন্দ্রে পরিণত হইল। এই সময় বাংলার বাহিরে চারিটি বড় স্বাধীন রাজ্য ছিল—মহারাষ্ট্র, মহীশূর, হায়দ্রাবাদ ও অযোধ্যা। প্রথম দুইটিকে একাধিকবার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এবং অন্য দুইটির সঙ্গে সন্ধি করিয়া ইংরেজ ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই ইহাদের সকলের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিল। তারপর ধীরে ধীরে অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যগুলিও ইংরেজের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। এইরূপে বাংলাদেশে রাজ্য স্থাপনের ফলে ইংরেজ ক্রমশঃ সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইল।

হেস্টিংসের আমলেই এই শক্তি বৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। প্রথম সংঘর্ষ বাধিল প্রবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্র রাজ্যের সঙ্গে। শিবাজীর বংশধর নামেমাত্র মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের নায়ক (ছত্রপতি) ছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল—মহারাষ্ট্রে পেশোয়া, গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া, বরোদায় গাইকোয়ার, ইন্দোরে হোলকার এবং নাগপুরে ভোঁসলা প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন।

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে (১৭৬১) পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি দুর্বল হইয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে নষ্ট হয় নাই। পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া বালাজী বাজী রাও ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার সপ্তদশ বর্ষীয় পুত্র মাধব রাও পেশোয়া হইলেন। এই অল্পবয়স্ক নূতন পেশোয়া পেশোয়াবংশের পূর্বগৌরব ও শক্তি অনেক পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইলেন। তিনি মহীশূরের রাজা হায়দার আলিকে দুইবার পরাজিত করিলেন এবং ভোঁসলা যে সমস্ত জায়গা জোর করিয়া দখল করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করিলেন। এই নবীন পেশোয়ার খুল্লতাত এবং অভিভাবক রঘুনাথ রাও তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন, কিন্তু পেশোয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াও ক্ষমা করিলেন।

এইরূপে নিজের রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া এই নবীন পেশোয়া উত্তর

ভারতে বিনষ্ট সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারে যত্নবান হইলেন। ১৭৬৯ সনে মারাঠা সৈন্য রাজপুত ও জাঠদিগকে পরাজিত করিয়া কর দিতে বাধ্য করিল। ইহার পর মারাঠাগণ দিল্লী অধিকার করিয়া শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইল। তাহারা গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব প্রদেশ অধিকার করিয়া যখন অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড জয় করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, সেই সময় ১৭৭২ সনের ১০ই নভেম্বর পেশোয়া মাধব রাওর মৃত্যু হওয়ায় তাহারা দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধেও মারাঠা সাম্রাজ্যের যে ক্ষতি হয় নাই, মাধব রাওর মৃত্যুতে তাহা হইল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হইলে (ডিসেম্বর, ১৭৭২) রঘুনাথ রাওর চক্রান্তে তিনি নিজের প্রাসাদেই ঘাতকের হস্তে প্রাণ হারাইলেন (অগস্ট, ১৭৭৩)। এই দুর্বৃত্ত রঘুনাথ তখন নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু নারায়ণ রাওর গর্ভবতী বিধবা পত্নী মাধব রাও নারায়ণ নামে এক পুত্র প্রসব করিলেন (এপ্রিল, ১৭৭৪) এবং এই শিশুই প্রকৃত পেশোয়া বলিয়া ঘোষিত হইলেন। তাঁহার অভিভাবক এবং তাঁহার পক্ষে প্রধান নায়ক ছিলেন নানা ফারনবিশ নামে এক ব্রাহ্মণ। ইঁহার মতো কূটনীতিবিদ্, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি মারাঠা রাজ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না। মারাঠা নায়কগণের মধ্যে সিন্ধিয়া ও হোল্‌কার মাধব রাও নারায়ণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গাইকোয়াড় পরিবারের কতক তাঁহার পক্ষে ও কতক রঘুনাথের পক্ষে রহিলেন।

অশুভ ক্ষণে রঘুনাথ নিজের বলবৃদ্ধির জন্য বোম্বাই গভর্নমেণ্টের সাহায্য চাহিলেন। বোম্বাই গভর্নমেণ্ট সল্‌সেটি দ্বীপ, বেসিন বন্দর এবং বোম্বাইর নিকটবর্তী আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিকার যদি পায়, তবেই রঘুনাথকে সাহায্য করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। রঘুনাথ এই সকল শর্তে স্বীকৃত হইয়া সুরাটের সন্ধি করিলেন (৬ই মার্চ, ১৭৭৫)। কিন্তু কলিকাতার শাসন-পরিষদ্ সুরাটের সন্ধি অগ্রাহ্য করিল, এবং মাধব রাও নারায়ণের পক্ষের সহিত সন্ধি করিবার জন্য কর্নেল আপ্‌টনকে পুণায় পাঠাইয়া দিল। আপ্‌টন পুরন্দরের সন্ধি করিয়া ইংরেজ কোম্পানির জন্য সল্‌সেটি লাভ করিলেন (১লা মার্চ, ১৭৭৬)। অল্পকাল পরেই কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষ সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করিয়া পত্র লিখিলেন। রঘুনাথ রাওকে তখন বোম্বাই নগরীতে প্রকাশ্যে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার উপযুক্ত মাসিক বৃত্তি

স্থির করা হইল। এদিকে পুণার মারাঠা নায়কদের মধ্যে বিবাদ বাধিলে বোম্বাই গভর্নমেণ্ট রঘুনাথকে পেশোয়া পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করিল। হেস্টিংস তাহা অনুমোদন করিলেন। বোম্বাই হইতে পুণার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠান হইল (ডিসেম্বর, ১৭৭৮)।

বৃটিশ সৈন্য পুণার কুড়ি মাইলের মধ্যে যাইয়া পৌঁছিলে একদল প্রবল মারাঠা সৈন্য তাহাদিগকে বাধা দিল। বৃটিশ সৈন্য অমনি পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল; কিন্তু মারাঠাগণ ওয়ারগাঁও নামক স্থানে তাহাদিগকে চারিদিক হইতে এমন করিয়া ঘিরিয়া ধরিল যে, অত্যন্ত অসম্মানজনক শর্তে সম্মত হইয়া ইংরেজদিগকে সন্ধি করিতে হইল (১৭৭৯)। সন্ধির শর্ত হইল, ইংরেজদিগকে রঘুনাথের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং এ যাবৎ তাহারা মারাঠাগণের নিকট হইতে যাহা কিছু লইয়াছে, সেই সমস্তই ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু বৃটিশ সৈন্য নিরাপদে বোম্বাইতে ফিরিয়া আসিবামাত্র বোম্বাই গভর্নমেণ্ট এই অপমানজনক ওয়ারগাঁওর সন্ধি অস্বীকার করিল এবং মারাঠাদের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। বাংলাদেশে হেস্টিংসও নিশ্চিন্ত ছিলেন না! তিনি গডার্ড নামক একজন সেনাপতির অধীনে পূর্বেই বঙ্গদেশ হইতে বোম্বাইতে একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই সৈন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুরাট পৌঁছিল। গডার্ড সেখানে উপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন, এই শর্তে গাইকোয়াড়ের সহিত এক সন্ধি করিলেন (জানুআরি, ১৭৮০)। সিন্ধিয়া এবং হোল্‌কারের অসতর্কতার জন্য গডার্ড আহম্মদাবাদ ও বেসিন অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। গডার্ড এবার পুণা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু শীঘ্রই মারাঠাদিগের সহিত সংঘর্ষে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন। এদিকে হেস্টিংস্ পপ্‌হ্যাম নামক সৈন্যাধ্যক্ষকে সিন্ধিয়ার রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। ইহাতে কতক মারাঠা সৈন্যের লক্ষ্য অন্যদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় গডার্ডের অনেক সুবিধা হইল। পপ্‌হ্যাম গোয়ালিয়রের দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করিলেন। তখন সিন্ধিয়া নিজে ইংরেজের সহিত পৃথক্ সন্ধি করিলেন এবং তাঁহার মধ্যবর্তিতায় ইংরেজ ও মারাঠা সরকারের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল (১৭৮২ খ্রীঃ)। এই সন্ধি সাল্‌বাই-এর সন্ধি নামে খ্যাত। ইহাতে পুরন্দরের সন্ধির পরে ইংরেজগণ যত জায়গা অধিকার করিয়াছিল, সমস্ত

ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল এবং রঘুনাথ রাও বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইবেন, এইরূপ স্থির হইল।

মারাঠা যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই ইংরেজের সহিত মহীশূরের যুদ্ধ বাধিল। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের সময়ে হায়দর নায়ক নামে এক ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী সৈনিক যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি মহীশূরের হিন্দু রাজাকে পদচ্যুত করিয়া মহীশূর অধিকার করেন (১৭৬৬)। তখন তাঁহার নূতন নাম হইল হায়দর আলি। তিনি মারাঠাদের ও নিজামের রাজ্যাংশ দখল করিয়া মহীশূর রাজ্যের আয়তন অনেক বাড়াইয়া ফেলিলেন। এইরূপে মহীশূর দাক্ষিণাত্যের একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হইল। হেস্টিংস্ গভর্নর নিযুক্ত হইয়া আসিবার বহু পূর্বে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মাদ্রাজ কাউন্সিলের অপদার্থ কর্মচারীরা ঠিকভাবে প্রস্তুত না হইয়াই হায়দরের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া বসিল। হায়দর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়া মাদ্রাজ শহরের নিকট পৌঁছিলেন এবং নিজের ইচ্ছামত শর্তে ইংরেজদিগকে সন্ধি করিতে বাধ্য করিলেন (১৭৬৯)। সন্ধির একটি শর্ত ছিল যে, মারাঠাগণ অথবা নিজাম যদি হায়দরকে আক্রমণ করে, তবে ইংরেজগণ তাঁহাকে সাহায্য করিবে। কিন্তু মাদ্রাজ শাসন-পরিষদ্ এই শর্ত পালন করে নাই। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে যখন হায়দর মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, তখন তাহারা কিছুই করিল না, এবং হায়দর এই যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। হায়দর ইংরেজগণের এই বিশ্বাসঘাতকতা কখনও ভুলেন নাই বা ক্ষমা করেন নাই। মাদ্রাজ গভর্নমেন্টের এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য মহীশূর রাজ্যের সহিত ইংরেজদের ত্রিশ বৎসরকাল বিবাদ চলিয়াছিল। হায়দর মারাঠাদের হস্তে পরাজিত হইলেও ধীরে ধীরে নিজের রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিলেন, এবং কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ সমস্ত ভূভাগ তাঁহার করতলগত হইল। অধিকন্তু তাঁহার সৈন্যদল অতিশয় সুশিক্ষিত ছিল, এবং তিনি তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিসমূহের অন্যতম ছিলেন।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসিতে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় ইংরেজগণ মালাবার উপকূলে ফরাসি-অধিকৃত মাহে অধিকার করিতে চাহিল। কিন্তু হায়দর বলিলেন, মাহে তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ও

তাঁহার আশ্রয়াধীনে আছে। হায়দরের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া ইংরেজগণ মাহে অধিকার করিল। ইহার ফলে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে হায়দরের সৈন্যদল মাদ্রাজ প্রদেশের ইংরেজ রাজ্য আক্রমণ করিল। দেড়মাস কাল হায়দরের সৈন্যগণ কামান ও তরবারির সাহায্যে সমস্ত দেশ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল এবং লুণ্ঠন করিতে করিতে তাহারা প্রায় মাদ্রাজের নিকটে পৌঁছিল। মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট হায়দরকে কোন প্রকারে বাধা দিতে পারিল না।

হায়দরের আক্রমণের সংবাদ বাংলাদেশে পৌঁছিবামাত্র হেস্টিংস্ সার্ আয়ার কুট্‌কে মাদ্রাজে প্রেরণ করিয়া নষ্টগৌরব কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুদ্ধার করিলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে হায়দর আলির মৃত্যুতে যুদ্ধের বেগ কতকটা কমিয়া গেলেও হায়দরের পুত্র টিপু সুলতান যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে বহুদিনব্যাপী যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট অনেক কষ্টে টিপুর সহিত বর্তমান দক্ষিণ কানাড়া জেলার অন্তর্গত মাঙ্গালোরে সন্ধি করিলেন (১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে)। পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থানগুলি ফিরাইয়া দিবে, এই শর্তে মাঙ্গালোরের সন্ধি হইল। এইরূপে ভারতে বৃটিশ শক্তি এক গুরুতর সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইল। এবং হেস্টিংসের কূটনীতির প্রভাবেই ইহা সম্ভবপর হইল।

৬। চৈৎসিংহ ও অযোধ্যার বেগম

মহীশূর ও মারাঠাদের সহিত সুদীর্ঘ যুদ্ধে হেস্টিংসের কোষাগার আবার শূন্য হইয়া গিয়াছিল, এবং অর্থাগমের পথও অনেকটা নষ্ট হইয়াছিল। বাধ্য হইয়া পুনরায় তাঁহাকে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইল। অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌল্লা বৃটিশ সৈন্যদলের যে খরচ দিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আসফউদ্দৌল্লা নবাব হইলে সেই খরচের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, এবং তাঁহার অধীন বারাণসী রাজ্যটিও ইংরেজদের অধিকারে আসিয়াছিল। এখন আবার হেস্টিংস্ বৃটিশ কর্মচারীর সাহায্যে নবাবের একদল সৈন্যকে সুশিক্ষিত করিবার ভার নিলেন। ইহার খরচের জন্য নবাব কতকগুলি জেলার রাজস্ব ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ ইংরেজ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব রীতিমত দিতেন এবং হেস্টিংসের দাবি অনুসারে বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত

দিয়াছিলেন ; কিন্তু এই দাবি মিটাইয়া দেওয়া মাত্র হেস্টিংস্ তাঁহাকে একদল অশ্বারোহী সৈন্য গঠন করিয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন। রাজা তাহা দিতে সমর্থ হইলেন না এবং এই অপরাধে হেস্টিংস্ তাঁহাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন। এই অন্যায় দাবি আবার অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত আদায় করিতে চেষ্টা করা হইল। হেস্টিংস্ নিজে বারাণসী গিয়া রাজাকে তাঁহার নিজের প্রাসাদে বন্দী করিলেন। রাজার সৈন্যগণ এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া হেস্টিংসের সৈন্যদলকে নিহত করিল। হেস্টিংস্ অতি-কষ্টে প্রাণ লইয়া চুনারে পলাইয়া গেলেন। বিদ্রোহ তখন সমস্ত জেলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; কিন্তু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হেস্টিংস্ শীঘ্রই এই বিদ্রোহ দমন করিলেন। হতভাগ্য চৈৎসিংহ বুন্দেলখণ্ডে পলাইয়া গেলেন এবং কাশীর সিংহাসনে একজন নূতন রাজা অধিষ্ঠিত হইলেন।

হেস্টিংসের পরবর্তী কার্যটি আরও গুরুতর। অযোধ্যার মৃত নবাব শুজাউদ্দৌল্লার মাতা ও বিধবা বেগম উত্তরাধিকার সূত্রে বিস্তর ধনসম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। হেস্টিংস্ যখন অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌল্লার নিকট কোম্পানির প্রাপ্য অর্থ চাহিলেন, তখন নবাব বলিলেন যে, তাঁহার পিতার সম্পত্তির অধিকাংশ তাঁহার মাতা ও পিতামহীর হস্তে পড়াতে তাঁহার নিজের কোষাগার শূন্য ; অতএব তিনি ইংরেজদিগকে নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে অর্থ দিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহা শুনিয়া হেস্টিংস্ বেগমদের ধনসম্পত্তি জোর করিয়া দখল করিবার জন্য অযোধ্যার নবাবকে আদেশ দিলেন, এবং যাহাতে কোন বাধা উপস্থিত না হয়, সেজন্য নিজের একদল সৈন্য নবাবের কাছে পাঠাইলেন। হেস্টিংসের ব্যবস্থানুসারেই বেগমদের উপর ভীষণ অত্যাচার করা হইল, এবং তাঁহাদের বিপুল ধনসম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইল।

৭। হেস্টিংসের প্রাচ্য শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা

ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ ভারতীয় শিক্ষা ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। মধ্য-যুগের ফারসী ভাষা বহুকাল পর্যন্ত ভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। হেস্টিংস্ নিজেও ফারসী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মধ্যযুগে প্রচলিত শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'কলিকাতা মাদ্রাসা' (Calcutta Madrasa) স্থাপন করিয়াছিলেন। হেস্টিংসের প্রাচ্য শিক্ষা প্রসারের

উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া সার্ উইলিয়ম জোন্স্ প্রাচ্য সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনার জন্য কলিকাতায় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' (Asiatic Society of Bengal) প্রতিষ্ঠা করেন, এবং সংস্কৃত শিক্ষা-বিস্তারের জন্য রেসিডেণ্ট জোনাথান্ ডান্কান্ ১৭৯২ সনে বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। হেস্টিংসের নির্দেশে হল্হেড সাহেব কর্তৃক একখানি বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়, এবং তিনি হিন্দু-মুসলমানদের আইনশাস্ত্রও ইংরেজীতে অনুবাদ ও প্রকাশ করেন। হেস্টিংসের সমর্থন ও সাহায্যেই চার্লস্ উইলকিন্স্ বাংলাদেশে ছাপাখানার পত্তন করেন এবং ইংরেজী ভাষায় তাঁহার অনূদিত গীতা মুদ্রিত হয়। বাংলা টাইপে হল্হেডের বাংলা ব্যাকরণই সর্বপ্রথম (১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। তবে একথা স্বীকার্য যে, হেস্টিংসের ভারতীয় শিক্ষা, ও সাহিত্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকিলেও, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ইংরেজ সরকার দেশবাসীর শিক্ষা-পরিচালনা বা উন্নতির জন্য তেমন কোনরূপ ব্যবস্থা বা দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই।

৮। হেস্টিংসের পদত্যাগ

এদিকে হেস্টিংসের নানাবিধ ঘোর অন্যায় অত্যাচারের বিবরণ ইংলণ্ডে পৌঁছিবামাত্র, সেখানকার কর্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতি বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন। চৈৎসিংহের প্রতি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উল্টাইয়া দিতে হেস্টিংসের উপর আদেশ আসিল। এমন কি, সর্বপ্রকারে হেস্টিংসের অনুগত শাসন-পরিষদও এতকাল পরে আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই সকল গোলযোগের ফলে হেস্টিংস্ পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন (ফেব্রুআরি, ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি ইংলণ্ডে গেলে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইল। নানা অভিযোগের মধ্যে গুরুতর অভিযোগের বিষয় ছিল তিনটি—রোহিলা জাতি ধ্বংস, চৈৎসিংহের উপর অত্যাচার এবং অযোধ্যার বেগমদের সম্পত্তিলুণ্ঠন। বিলাতে হাউস্ অব্ লর্ডসের সম্মুখে হেস্টিংসের বিচার (Impeachment) হয়, এবং হাউস্ অব্ কমন্স বাদী হইয়া হেস্টিংসের অপরাধ বর্ণনা করে। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে বার্ক, শেরিডন্ ইত্যাদি সেই যুগের শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদিগের জ্বালাময়ী বক্তৃতা তাঁহার এই বিচারকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সাত বৎসর ধরিয়া এই বিচার চলে এবং বিচারান্তে হেস্টিংস্ সমস্ত অভিযোগে নির্দোষ বলিয়া মুক্তিলাভ করেন (১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহার পরে হেস্টিংস্

আরও ২৩ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি ৮৫ বৎসর বয়সে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

ওয়ারেন হেস্টিংসের চরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী নানা মত প্রচলিত আছে। তৎকালীন বিখ্যাত বাগ্মী বার্ক, বিখ্যাত লেখক মেকলে ও ঐতিহাসিক মিল—এই বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হেস্টিংসের নানা অসৎকার্যের জন্য তাঁহাকে বহু নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী কয়েকজন লেখকের মতে হেস্টিংসের বিশেষ কোন অপরাধ ছিল না ; বরং তাঁহার অসাধারণ কর্মকুশলতা ও রাজনীতি-জ্ঞানের ফলেই বৃটিশ রাজশক্তি দৃঢ় ও সবল হইয়া উঠিয়াছিল।

৯। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী

হেস্টিংসের সময়কার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ'। রাষ্ট্র বিপ্লব ও অরাজকতার সুযোগে অনেক সময়ই দলবদ্ধভাবে দস্যুবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয়। মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা—এই দুইয়ের মধ্যবর্তীকালে বিহার ও উত্তর প্রদেশ হইতে আগত একদল নাগা সন্ন্যাসী উত্তর বঙ্গের নানা স্থানে লুটতরাজ করিয়া ফিরিত। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, ইহারা সাধুর বেশে নানা স্থানে ঘুরিত, হৃষ্টপুষ্ট ছেলে চুরি করিয়া দলবৃদ্ধি করিত, কেহ কেহ ব্যবসা-বাণিজ্যও করিত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর তাহাদের উপদ্রব বাড়িয়া চলে। নিঃস্ব কৃষক, সম্পত্তিভ্রষ্ট জমিদার ও বেকার সৈন্যদল তাহাদের সাথে যোগ দেয়। হিন্দুরা সন্ন্যাসীদের ভক্তি করিত, সুতরাং তাহাদের কোন সন্ধান গভর্ণমেণ্টকে দিত না। ফলে তাহারা অকস্মাৎ এক অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া গৃহস্থের নিকট অর্থ দাবি করিত, না দিলে বিনা বাধায় লুটপাট করিত। তাহাদের ভয়ে দিনাজপুর, মালদহ, রংপুর, বগুড়া, ঢাকা প্রভৃতি জিলার লোকেরা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। ১৭৭২ সনে তাহারা রংপুরের সিপাহী-দিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করে এবং ইহাদের নায়ক কাপ্তেন টমাসকে হত্যা করে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া সন্ন্যাসীরা নানা দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমণ করে। প্রতি দলে একজন নায়কের অধীনে প্রায় পাঁচ সাত হাজার নাগা সন্ন্যাসী ও অন্যলোক থাকিত। ১৭৭৩ সনে কাপ্তেন এডওয়ার্ডস্ ও সার্জেন্ট মেজর ডগলাস ৩০০ সিপাহী নিয়া তাহাদের

বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, কিন্তু পরাস্ত ও উভয়েই নিহত হন এবং মাত্র বায়োজন সিপাহী প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসে। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য হেস্টিংস্ ভুটানের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং হেস্টিংসের অনুরোধে কাশীর রাজা চৈৎসিংহ সন্ন্যাসীদের দমনের জন্য পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। কাপ্তেন ক্রুক একদল পদাতিক সৈন্য লইয়া সন্ন্যাসীদের দমন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সমুদয় সত্ত্বেও আরও কয়েক বৎসর পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের উৎপাত চলিতে থাকে। অবশেষে তাহারা বাংলা ও বিহার ত্যাগ করে এবং সম্ভবতঃ মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

নাগা সন্ন্যাসীদের মত একদল সশস্ত্র মুসলমান ফকিরও এই সময়ে উত্তর-বঙ্গে ডাকাতি ও লুটতরাজ করে। এই ডাকাতদলের সর্দার ছিলেন মদরি সম্প্রদায়ের ফকির মজনুন শাহ। বগুড়া জিলার ১২ মাইল দক্ষিণে গোয়াইল নামক স্থানের নিকট মদরগঞ্জে এবং মহাস্থানে তাঁহার প্রধান আড্ডা ছিল। দিনাজপুর ও রংপুরের দক্ষিণে এবং বগুড়ার পশ্চিমে তিনি তাঁহার দল লইয়া লুটতরাজ করিতেন। তাঁহার ভয়ে অনেক জমিদার ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হন। ১৭৭৩ সনে কাপ্তেন উইলিয়মস্ তাঁহাকে পরাজিত করেন। সন্ন্যাসীদের উপদ্রব কমিলে ফকিরদের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। ১৭৭৬ সনে উত্তরবঙ্গে পরাজিত হইয়া মজনুন পলাইয়া যান কিন্তু ১৭৮৩ সনে মৈমনসিংহে উপস্থিত হন। সেখানেও পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। কিন্তু ইহার পরেও মাঝে মাঝে রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুরে উপদ্রব করেন। ১৭৮৬ সন পর্যন্ত তাঁহার উপদ্রব চলিতে থাকে। ১৭৮৭ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মজনুনের একজন সহযোগী ছিলেন ভবানী পাঠক। তিনি সাধারণতঃ বগুড়া, রংপুর ও মৈমনসিংহ অঞ্চলে জলপথে ডাকাতি করিতেন। ১৭৮৭ সনে তাঁহার মৃত্যু হইলে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই সাতখানা বড় নৌকা ধরা পড়ে। তাঁহার সঙ্গে দেবী চৌধুরাণী নামে একজন স্ত্রীলোকও ডাকাতি করিতেন। তিনি নৌকায়ই বাস করিতেন এবং একদল বেতনভোগী বরকন্দাজ পোষণ করিতেন। সরকারী নথিতে এ দুজনেরই উল্লেখ আছে।

মজনুন বা ভবানী পাঠক কেহই বাঙ্গালী ছিলেন না। মজনুন শাহ আজোয়ার রাজ্যের লোক, এবং ভবানী পাঠক আরা জেলার বিহারী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের অনুচরগণও বাঙ্গালী ছিল না। কিন্তু সে যুগে যে

বাঙ্গালী জমিদারেরাও ডাকাতের সর্দার ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেবী চৌধুরাণী সম্ভবত বাঙ্গালী ছিলেন। এই সম্বন্ধে সমসাময়িক সরকারী দলিলে রংপুরের যে বিবরণ আছে তাহার সারমর্ম এই, : "১৭৮৭ সনে লেফটেনান্ট ব্রেনান ভবানী পাঠক নামে প্রসিদ্ধ দস্যু সর্দারের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি একজন দেশীয় কর্মচারীর অধীনে ২৪ জন সিপাহী পাঠান। তাহারা অতর্কিতে ভবানী পাঠক ও তাহার ৬০ জন অনুচরের নৌকা আক্রমণ করে। তাহারা যুদ্ধ করে। যুদ্ধে ভবানী পাঠক ও তাঁহার তিনজন অনুচর নিহত, আটজন আহত এবং বিয়াল্লিশ জন বন্দী হয়। লেফটেনান্ট ব্রেনানের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, দেবী চৌধুরাণী নামে একজন স্ত্রীলোক ডাকাতের সহিত ভবানী পাঠকের যোগাযোগ ছিল। দেবী চৌধুরাণী নৌকায় বাস করিতেন এবং তাঁহার বহু বেতনভোগী বরকন্দাজ ছিল। তিনি নিজে ডাকাতি করিতেন, এবং ভবানী পাঠক ডাকাতি করিয়া যাহা আনিতেন তাহার অংশও পাইতেন। চৌধুরাণী এই উপাধি হইতে মনে হয় দেবী চৌধুরাণী একজন জমিদার ছিলেন।"

"উল্লিখিত রিপোর্ট পাইয়া রংপুরের কলেক্টর লেফ্‌টেনান্ট ব্রেনানকে লেখেন (১২ই জুলাই, ১৭৮৭) যে আপাতত দেবী চৌধুরাণীকে গ্রেপ্তার করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাইলে এ সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া যাইবে।"

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণীকে অমর করিয়া গিয়াছেন। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের কাল্পনিক জীবনী ভিত্তি করিয়া উপন্যাস না লিখিলে আজ বাংলা দেশে কেহই তাঁহাদের নাম জানিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু আনন্দমঠে তিনি 'সন্তান'দের যে জীবন, আদর্শ চরিত্র ও অদ্ভুত স্বদেশ-প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

আচার্য যদুনাথ সরকার এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি : "প্রথমেই তো গোড়ায় গলদ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'সন্তানেরা' বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত ; কিন্তু যে সব 'সন্ন্যাসী ফকিরেরা' সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তরবঙ্গে

(বীরভূম নহে) ঐ সব অত্যাচার করে তাহারা এলাহাবাদ, কাশী, ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্‌গীতার নাম পর্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তান-সেনা বৈষ্ণব, আর আসল সন্ন্যাসীরা ছিল শৈব, আজ পর্যন্ত তাহাদের নাগা সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে, যদিও ইংরেজের ভয়ে তাহারা এখন অস্ত্র রাখিতে বা লুট করিতে পারে না।··· সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল, একেবারে লুঠেড়া ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারিও করিত; মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র।"

যদুনাথ আরও লিখিয়াছেন যে যদিও 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী' "কোন মতেই ঐতিহাসিক এই বিশেষণ পাইতে পারে না" ইহাদের মধ্যে "যে অমৃতরস আছে" তাহা ইহা "অপেক্ষা শতগুণ বেশী 'সত্য' ঐতিহাসিক কোন উপন্যাসে পাওয়া যায় না।"

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছাড়া রংপুরেও একটি ছোটখাট বিদ্রোহ হয়। রাজা দেবীসিংহ দিনাজপুর ও রংপুর জিলার ইজারাদার ছিলেন এবং বর্ধিত হারে জমিদারগণের নিকট হইতে জোর জুলুম করিয়া বহু অতিরিক্ত টাকা আদায় করিতেন। ফলে এই সমুদয় জমিদারেরাও প্রজাদের উৎপীড়ন করিয়া অতিরিক্ত খাজনা আদায় করিত। ১৭৮২ সনে ইদ্রাকপুরের জমিদার এবং দিনাজপুরের রায়ৎগণ গভর্নমেণ্টকে এ বিষয়ে অভিযোগ করে। মালদহ হইতে চার্লস গ্রান্ট (Charles Grant) রংপুরের কলেক্টরকে এই বীভৎস অত্যাচারের যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি: "দরজা খুলিয়া দেওয়ায় পাঁচ ছয়টি শীর্ণকায় কঙ্কালের আকৃতি মানুষ দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদের দুই পা বান্ধা, হাটিবার শক্তি নাই, মনে হইল কথা বলিতেও পারে না। ইহাদের অধিকাংশই আট দশদিন এইভাবে আটক ছিল এবং ইহার মধ্যে মাত্র দুই তিনবার দেবীসিংহের একটি চাকর দয়া করিয়া কিছু খাদ্য দিয়াছে। প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় তাহাদের প্রহার করা হইত, এবং পৃষ্ঠে তাহার দাগ পরিষ্কার দেখা যায়।"

বিদ্রোহীগণের আর্জিতে বর্ণিত হইয়াছে যে অন্যায্য অতিরিক্ত করের ভারে তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়াছে, ঘরদুয়ার এমন কি সন্তান পর্যন্ত

বেচিয়াছে, কিন্তু তবু আমলাদের দাবি না মিটাইতে পারায় এইরূপ কারাবদ্ধ হইয়া অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে।

এইরূপ অত্যাচারের ফলে নানা স্থানের রায়ৎগণ সমবেত হইয়া দুর্লভ নারায়ণের পুত্র দুর্জয় নারায়ণকে নবাব ঘোষণা করিল এবং ডাকালিগঞ্জের কয়েদখানার ফটক খুলিয়া কয়েদীগণকে মুক্ত করিল। ক্রমে আরও অনেক রায়ৎ তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং সকলে মিলিয়া প্রতীকারের জন্য ডিমলার গোমস্তার নিকট গেল। গোমস্তার বরকন্দাজদের গুলিতে কয়েকজন রায়ৎ মরিল কিন্তু লড়াই আরম্ভ হইল এবং গোমস্তা ধৃত ও নিহত হইল।

ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। দিনাজপুরে রায়ৎগণ আমলাদিগকে মারিয়া কাছারী লুট করিল। তাহারা অস্ত্রশস্ত্র হাতে করিয়া দল বান্ধিয়া অগ্রসর হইল এবং দলে দলে নানা পরগণার রায়ৎগণ তাহাদের দলে যোগ দিল। তখন সৈন্য পাঠাইয়া এই বিদ্রোহ দমন করা হইল। এই বিদ্রোহ দমনের পর যে সরকারী তদন্ত কমিশন বসান হয় তাহাতে দরিদ্র প্রজাদের উপর কি ভাবে উৎপীড়ন করিয়া ন্যায্য খাজনা ছাড়াও অনেক টাকা আদায় করা হইত এবং তাহার ফলে প্রজাদের চরম দুর্দশার কাহিনী পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। দেবীসিংহ হেস্টিংসের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি এতদূর অত্যাচার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টে যখন হেস্টিংসের বিচার হয় তখন বার্ক (Edmund Burke) অপূর্ব বাগ্মিতা সহকারে দেবীসিংহের অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন: "পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্টমিনিষ্টর হলে দাঁড়াইয়া এদমন্দ বার্ক সেই দেবীসিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্বতোদ্গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বার্ক দেবীসিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্ত কাল সমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজমুখে সে দৈববাণীতুল্য বাক্য পরম্পরা শুনিয়া শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—আজিও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত এবং হৃদয় উন্মত্ত হয়। সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্রভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল।"

'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি খুবই সত্য। এই

প্রসঙ্গে ভবানী পাঠকের মুখ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বের সন্ধিক্ষণে বঙ্গদেশে যে অরাজকতা ও অত্যাচারের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। "ভূম্যধিকারীর দুর্বিষহ দৌরাত্ম্য" নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে :

"কাছারির কর্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ী লুঠ করে, লুকান ধনের তল্লাসে ঘর ভাঙ্গিয়া, মেঝ্যা খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পূরিয়া বাঁধিয়া রাখে, যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্ব সমক্ষেই তাহা প্রাপ্ত করায়।"

ইহার মধ্যে উপন্যাসোচিত অতিরঞ্জন থাকিলেও ইহা যে অনেকাংশেই সত্য, সমসাময়িক বিবরণগুলি পড়িলে তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (১৭৮৬-১৮৫৪)

১। ভারতে রাজ্য বিস্তার

হেস্টিংসের পরবর্তী বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৬ হইতে ১৭৯৩ সন পর্যন্ত ভারত শাসন করেন।

মহীশূরের সুলতান অথবা মহীশূর রাজ্যের উপর কর্ণওয়ালিসের ভাল ধারণা ছিল না। একবার তিনি টিপু সুলতানকে উন্মত্ত বর্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। নিজামের নিকট কর্ণওয়ালিস্ যে সমস্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাঁহার মহীশূর-বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্ত জানিতে পারিয়াই টিপু ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের প্রান্তভাগ আক্রমণ করিলেন। ত্রিবাঙ্কুর-রাজ ইংরেজের মিত্র ছিলেন। তাই কর্ণওয়ালিস্ টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, এবং তাঁহাকে পরাজিত করিবার জন্য নিজাম ও মারাঠাদের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তিনি নিজেই সেনাপতিরূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালোর অধিকার করিলেন এবং টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অবরুদ্ধ করিলে টিপু সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৯২)। শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি অনুসারে টিপুকে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং তাঁহার অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিতে হইল। সন্ধি-শর্তের জামিনস্বরূপ টিপুর দুই পুত্রকে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কলিকাতায় আনিয়া রাখিলেন। টিপুর প্রদত্ত রাজ্য ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠারা সমান অংশে ভাগ করিয়া নিল। মালাবার, কুর্গ, দিন্দিগাল ও বড়মহল ইংরেজদের অধীনে আসিল। নিজাম ও মারাঠাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যের সংলগ্ন নানা ভূমিখণ্ড অধিকার করিলেন।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস্ চলিয়া গেলে সার জন্ শোর তাঁহার স্থানে বড়লাট হইলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌল্লার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র উজির আলি অযোধ্যার নবাব হন। তিনি দাসীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া শোর তাঁহাকে নবাবী পদ হইতে সরাইয়া

সাদৎ আলি খাঁকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাইলেন। সাদৎ আলি খাঁর সহিত নূতন সন্ধির শর্ত অনুসারে এলাহাবাদ ইংরেজদের হস্তগত হইল। সার্ জন্ শোর শান্তিপ্রিয় ও উদ্যমবিহীন ছিলেন। এজন্য তাঁহার শাসন-নীতিকে 'উদাসীন নীতি' বা 'নিরপেক্ষতা-মূলক নীতি' (Policy of Non-Interference) বলা হয়।

লর্ড ওয়েলস্‌লী বড়লাট (১৭৯৮-১৮০৫) হইয়া আসিয়া শোরের 'নিরপেক্ষতা-মূলক নীতি' একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। তিনি ভারতীয় শক্তিসমূহকে বৃটিশের অধীনতা-পাশে বদ্ধ করিবার জন্য যে নীতির প্রবর্তন করিলেন, তাহাকে 'অধীনতা-মূলক মিত্রতা' (Subsidiary Alliance) বলা যাইতে পারে। এই নীতি অনুসারে ভারতের রাজগণকে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া বৃটিশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আহ্বান করা হইত। তৎ-পরিবর্তে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের রাজ্যসীমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুতি দিত। ভারতীয় রাজগণের মধ্যে যিনি এই অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করিতেন, তাঁহাকে নিজের রাজ্যে নিজের খরচে একদল বৃটিশ সৈন্য পোষণ করিতে হইত, অথবা উহাদের পোষণের জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে খরচ যোগাইতে হইত। বৃটিশের সম্মতি ভিন্ন অপর কোন শক্তির সহিত কোন প্রকার রাজনীতিক সম্বন্ধ রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল।

মারাঠাদের সহিত এক ভীষণ যুদ্ধে নিজাম ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গুরুতর-রূপে পরাজিত হইয়া এক রকম মারাঠাদের অধীন হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি দুঃখ-দুর্দশায় অস্থির হইয়া ফরাসি সেনাপতিদের সহায়তায় ইউরোপীয় পদ্ধতিতে তাঁহার সৈন্য সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ওয়েলস্‌লী তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া 'অধীনতা-মূলক মিত্রতা' গ্রহণ করিতে স্বীকার করাইলেন। তাঁহার সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল, এবং নিজামের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া গেল।

এইবার টিপু সুলতানের পালা আসিল। তিনি কিন্তু বৃটিশের ক্রীতদাস হইতে অস্বীকার করিলেন, এবং ফরাসিদের সহিত মিলিত হইয়া নিজের বলবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। ইংরেজ সৈন্য বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে একযোগে মহীশূর আক্রমণ করিল এবং ৪ঠা মে তারিখে রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন

অধিকার করিল। দুর্গের এক সিংহদ্বারে অসিহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে টিপু প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

হায়দর আলি যে হিন্দু রাজবংশের হস্ত হইতে মহীশূর রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন, টিপুর পরাজয় ও মৃত্যুর পর মহীশূর রাজ্যের মধ্যভাগ সেই রাজবংশকেই ফিরাইয়া দেওয়া হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা বৃটিশের এক অধীন রাজ্যে পরিণত হইল। অবশিষ্টাংশ ইংরেজ ও নিজাম ভাগ করিয়া লইলেন। নিজামের অংশ কিন্তু শীঘ্রই নিজাম কর্তৃক রক্ষিত বৃটিশ সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থ ইংরেজের হস্তে ফিরিয়া আসিল। মহীশূরের নূতন হিন্দু রাজা অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্য কিছুকালের জন্য ইংরেজের অধীনে রহিল।

ওয়েলস্‌লী তাঞ্জোরের রাজা এবং সুরাটের নবাবকে বৃত্তি দিয়া তাঁহাদের রাজ্য বৃটিশ রাজ্যভুক্ত করিলেন (১৭৯৯)। কর্নাটের নবাবের বিরুদ্ধে টিপুর সহিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায় কর্নাট রাজ্যও বৃটিশ শাসনের অধীনে (১৮০১) আনা হইল। কিন্তু ওয়েলস্‌লী সর্বাপেক্ষা অধিক জবরদস্তি করিয়াছিলেন অযোধ্যা রাজ্যের উপর। কুশাসনের অজুহাতে তিনি হতভাগ্য নবাবকে বেশী সংখ্যায় ইংরেজ সৈন্য নিযুক্ত করিতে এবং ইহার ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত দোয়াবের এক অংশ, গোরখপুর এবং রোহিলখণ্ড বৃটিশের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন।

সাল্‌বাই-এর সন্ধির পরে মারাঠা রাজ্যসমূহের শক্তি ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই সময়কার মারাঠা নায়কগণের মধ্যে মাহাদজি সিন্ধিয়া এবং নানা ফাড়্‌নবিশ শক্তিশালী ও সুদক্ষ ছিলেন। উত্তর ভারতে মাহাদজি সিন্ধিয়ার বিস্তৃত রাজ্য ছিল, এবং এম. ডি. বয়েন নামক একজন ইউরোপীয় সেনাপতি কর্তৃক ইউরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত তাঁহার সৈন্যগণ ইংরেজ সৈন্যের সমকক্ষ ছিল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মাহাদজি সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে তাঁহার ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতুষ্পৌত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ইহার এক বৎসর পরে হোল্‌কার বংশের বিখ্যাত রানী অহল্যাবাঈর মৃত্যু হয়। এই মহীয়সী মহিলা অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া ইন্দোর রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

মারাঠা শক্তির কেন্দ্রস্থল পুণাতে নানা ফাড়্নবিশ শিশু পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণের নামে নিজেই মারাঠা রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সহিত টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে টিপুর নিকট হইতে গৃহীত রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ লাভ করিয়া তিনি মারাঠা রাজ্যের সীমানা তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শে সিন্ধিয়া, হোলকার ও অন্যান্য প্রধান প্রধান মারাঠা শক্তি মিলিত হইয়া নিজামকে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে খর্দা নামক স্থানে গুরুতররূপে পরাজিত এবং মারাঠাদের বশীভূত করে। কিন্তু নিজামের বিরুদ্ধে এই বিজয়ই মারাঠাদের শেষ বিজয়। ফাড়্নবিশের কঠোর শাসন অসহ্য মনে করিয়া বালক পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণ আত্মহত্যা করিলেন। অমনি মারাঠা রাজ্য ষড়যন্ত্রে ছাইয়া গেল এবং নানা ফাড়্নবিশ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অবশেষে রঘুনাথের পুত্র দ্বিতীয় বাজীরাও ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফাড়্নবিশ যখন পরলোক গমন করিলেন, তখন হইতেই মারাঠা রাজ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যেন বিলুপ্ত হইল। নূতন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওর মতো অযোগ্য ও অধম নরপতি খুব কমই দেখা যায়। দৌলতরাও সিন্ধিয়া তখন অল্পবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ ছিলেন। যশোবন্ত রাও হোলকারের বীরত্বের অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি মোটেই রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না।

এই সময়ে রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা, নায়কদের ষড়যন্ত্র ও অন্তর্বিদ্রোহ প্রজাসাধারণের জীবন দুঃখ-দুর্দশায় দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তারিখে রাজধানী পুণার নিকট এক খণ্ডযুদ্ধে পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার মিলিত সৈন্যদলকে যশোবন্ত রাও হোল্‌কার সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। পেশোয়া পলাইয়া গিয়া ইংরেজদের আশ্রয় লইলেন। ওয়েলস্‌লী তাঁহাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিয়া 'অধীনতা-মূলক মিত্রতা' গ্রহণ করিতে স্বীকার করাইলেন। তদনুসারে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পরাক্রান্ত মারাঠা জাতির নায়ক বেসিনের সন্ধিদ্বারা বৃটিশের অধীনতা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। বৃটিশ সৈন্যের সহায়তায় বাজীরাও পুনরায় সিংহাসন পাইলেন। কিন্তু অন্যান্য মারাঠা নায়কগণ বেসিনের সন্ধিপত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। কিছুদিন পরে পেশোয়া নিজেও

তাঁহার হঠকারিতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া উঠিলেন, এবং বৃটিশের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। অথচ মারাঠা নায়কগণ একত্র মিলিত হইয়া একযোগে কিছুই করিতে পারিলেন না। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার সহিত মিলিত হইতে অস্বীকার করিয়া হোলকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে মালবে চলিয়া গেলেন। এদিকে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা একত্র মিলিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ওয়েলস্‌লী তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

দাক্ষিণাত্যে ও উত্তরাপথে এক সঙ্গেই যুদ্ধ বাধিল। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ সেনাগণের নায়ক ছিলেন বড়লাটের ভাই সার্ আর্থার ওয়েলস্‌লী। ইনি পরে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। আসাই'র যুদ্ধক্ষেত্রে (সেপ্টেম্বর, ১৮০৩) সিন্ধিয়া এবং আরগাঁওর যুদ্ধক্ষেত্রে (নভেম্বর, ১৮০৩) ভোঁসলা সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। উত্তর ভারতে সেনাপতি লেক্ দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লাসোয়ারীর যুদ্ধক্ষেত্রে সিন্ধিয়ার সেনাগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন (অক্টোবর, ১৮০৩)। এইরূপে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার পরাজয় ঘটিলে সুরজী অর্জুনগাঁও এবং দেবগাঁওর সন্ধিদ্বারা উভয়েই 'অধীনতা-মূলক মিত্রতা' গ্রহণ করিলেন (১৮০৩)। সিন্ধিয়া রাজপুতানায় চম্বল নদীর উত্তরস্থ ভূখণ্ড, পশ্চিম ভারতের কয়েকটি স্থান ও দোয়াব প্রদেশ, এবং ভোঁসলা উড়িষ্যার কটক ও বালেশ্বর প্রদেশ এবং মধ্যভারতের একটি রাজ্যাংশ ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। আহম্মদনগর ও বেরার নিজামের ভাগে পড়িল।

নির্বোধ হোল্‌কার এই সঙ্কটের কালে নিরপেক্ষ থাকিয়া এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই তিনি কর্নেল মন্‌সনের অধীন একদল বৃটিশ সেনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন; কিন্তু অনতিকাল পরেই ডীগের যুদ্ধে (নভেম্বর, ১৮০৪) পরাজিত হইয়া তিনি পঞ্জাব অভিমুখে পলায়ন করিলেন। অতঃপর বৃটিশ সেনাপতি লেক্ ভরতপুরের দুর্গ অবরোধ করিলেন, কারণ ভরতপুরের রাজা হোল্‌কারের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু লেক্ ভরতপুর অধিকার করিতে পারিলেন না, বরং তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিতে হইল। অবশেষে ভরতপুরের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল।

এই সমুদয় জয়লাভ সত্ত্বেও ওয়েলেস্‌লী কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই। হোল্‌কার কর্ত্তৃক মন্‌সনের পরাজয়ের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিবামাত্র কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষগণ ওয়েলেস্‌লীকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। মহীশূর, নিজাম ও মারাঠাদের শক্তি বিনষ্ট করিয়া ওয়েলেস্‌লী ভারতে বৃটিশ শক্তিকে প্রবলতম ও প্রতিদ্বন্দ্বিহীন করিয়া তুলিয়াছিলেন। বহুদিনব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও তিনি সময় করিয়া নবাগত ইউরোপীয় কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন (১৮০০)। তাহারই অনুসৃত নীতি অনুসারে ভারত-শাসনার্থ নির্বাচিত কর্মচারীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিলাতে হেলিবেরি নামক স্থানে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল।

ওয়েলেস্‌লীর পর লর্ড কর্নওয়ালিস্ দ্বিতীয় বার বড়লাট হইয়া শান্তি-স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতে আসিলেন (১৮০৫)। তিনি আসিয়াই বিগত যুদ্ধে যে সমুদয় অধিকার লাভ হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি পুনরায় বিপক্ষকে ছাড়িয়া দিলেন। বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত কর্নওয়ালিস্ ভারতে আসিয়া তিন মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

কর্নওয়ালিসের মৃত্যুর পর শাসন-পরিষদের প্রাচীনতম সভ্য সার জর্জ বার্লো বড়লাটের কাজ চালাইতে লাগিলেন (১৮০৫-১৮০৭)। এই সময়ে লর্ড লেক্ হোল্‌কারকে পরাজিত করিয়া বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যান। কিন্তু বার্লো তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। বার্লোর সময় ভেলোরে অবস্থিত সিপাহীগণের বিদ্রোহ হয়। এ বিদ্রোহ সহজেই দমিত হয়। ভেলোরে টিপু সুলতানের আত্মীয়গণ বাস করিতেছিলেন। এই বিদ্রোহের সহিত তাঁহাদের যোগ আছে সন্দেহ করিয়া তাঁহাদিগকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়।

পরবর্তী বড়লাট লর্ড মিন্টো (১৮০৭-১৮১৩) একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইংরেজগণ ভারতীয় কোন রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। তখন ইউরোপে ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট নেপোলিয়নের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলিতেছিল। ভারত মহাসাগর হইতে ফরাসিদের প্রভাব লুপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে মিন্টো ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে মরীসাস্ ও বুরবন্ দ্বীপ অধিকার করেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসিদের অনুগত ওলন্দাজগণের অধিকৃত যবদ্বীপও ইংরেজদের অধিকারে আসিয়াছিল।

লর্ড মিন্টোর পরে লর্ড ময়রা গভর্নর জেনারেল হইয়া আসিলেন (১৮১৩-১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ)। পরবর্তী কালে তিনি মারকুইস্ অব্ হেস্টিংস্ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইতিহাসে তিনি লর্ড হেস্টিংস্ নামেই বিশেষ পরিচিত।

১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের অন্তর্গত গুর্খা নামক স্থানের পার্বত্য জাতি নেপাল উপত্যকা অধিকার করিয়াছিল। পঞ্জাব হইতে ভুটান পর্যন্ত হিমালয়ের দক্ষিণাংশ জুড়িয়া তাহাদের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। গুর্খাগণ প্রায়ই বৃটিশ রাজ্যে ঢুকিয়া লুটপাট করিত। সুতরাং ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস্ নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধের প্রথমভাগে বড়লাট নিজেই সেনাপতি হইলেন। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে অধস্তন সেনা-নায়কদের যুদ্ধ পরিচালনায় অযোগ্যতার জন্য প্রথম প্রথম ইংরেজ সৈন্যেরই পরাজয় ঘটিল। গুর্খাদের বিজয় কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হইল না। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি অক্‌টারলোনি সদর্পে গুর্খাদের রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। গুর্খারা তখন বাধ্য হইয়া সন্ধি করিতে সম্মত হইল। সগৌলির সন্ধির (১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ) শর্ত অনুসারে নেপালের গুর্খা-দরবার গাঢ়ওয়াল, কুমায়ুন এবং নেপাল তরাই-এর অধিকাংশ স্থান বৃটিশের হস্তে ছাড়িয়া দিল, সিকিমের উপর অধিকার পরিত্যাগ করিল এবং রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল। সেই সময় হইতে এখন পর্যন্ত নেপালের সহিত ভারতের শান্তি ও সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

মধ্যভারতে এই সময় ভয়ঙ্কর অরাজকতা ও গোলযোগ চলিতেছিল। দলবদ্ধ দস্যুগণ নির্ভয়ে দেশলুণ্ঠন, নরহত্যা ও অকথ্য নৃশংসতার অনুষ্ঠান করিত। এই দস্যুগণের মধ্যে পিণ্ডারিগণই ছিল সর্বপ্রধান। এই পিণ্ডারি দলে সকল জাতি ও সকল ধর্মের লোকই ছিল। সময় সময় পাঠান ও মারাঠাগণও দলবদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে চুরি-ডাকাতি করিত। ক্রমে ক্রমে সাহস বৃদ্ধি পাওয়ায় পিণ্ডারিগণ বৃটিশ রাজ্যেও লুটপাট আরম্ভ করিল। তাহাদের নানা প্রকার নিষ্ঠুরতার বিবরণ শুনিয়া অবশেষে বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাহাদিগকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সকলেই জানিত যে, মারাঠা নায়কগণ এই পিণ্ডারিগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। সুতরাং লর্ড হেস্টিংস্ নাগপুরের ভোঁসলা রাজার সহিত সন্ধি করিলেন। ভুপাল, উদয়পুর, যোধপুর এবং কোটার রাজার সহিতও মিত্রতা স্থাপিত হইল। অতঃপর লর্ড

হেস্টিংস্ প্রকাণ্ড একদল সৈন্য লইয়া পিণ্ডারিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং পিণ্ডারিগণ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল (১৮১৮)। পিণ্ডারিগণের প্রধান তিনজন নায়কের মধ্যে একজন আত্মহত্যা করিল, চিতু নামে আর একজন বনের মধ্য দিয়া পলায়নকালে ব্যাঘ্রের মুখে প্রাণ দিল এবং তৃতীয় করিম খাঁকে বস্তি জেলায় বাসস্থান দেওয়া হইল। পিণ্ডারিদের প্রধান পাঠান নায়ক আমির খাঁকে রাজপুতানার অন্তর্গত টঙ্ক নামক স্থানের আধিপত্য দেওয়া হইল। এইরূপে ভারতবর্ষ এক বিষম উৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

মারাঠাগণের সহিতও লর্ড হেস্টিংসের শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বৃটিশের অধীন হইয়া জীবন যাপন করায় পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওর মনে বিষম অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। তারপর ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন সন্ধি করিয়া লর্ড হেস্টিংস্ পেশোয়ার নিকট হইতে কোঙ্কন প্রদেশ এবং কয়েকটি দুর্গ কাড়িয়া লইলেন। দুর্দশার ভরা এবার পূর্ণ হইল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ছাব্বিশ হাজার সৈন্য লইয়া পেশোয়া পুণার নিকটবর্তী বৃটিশ প্রতিনিধিকে (Resident) আক্রমণ করিলেন। কিরকীতে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা তিন হাজারের অধিক ছিল না। কিন্তু তথাপি পেশোয়া গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর নূতন সৈন্য আসিয়া বৃটিশ সৈন্যের দলবৃদ্ধি করিবামাত্র তাহারা পুণা অধিকার করিল। পেশোয়ার সৈন্য আবার আষ্টি নামক যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইল (ফেব্রুআরি, ১৮১৮)।

আপ্পা সাহেব ভোঁসলাও পেশোয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ফল একই হইল। বৃটিশ সৈন্য বিপুল মারাঠা বাহিনীকে সীতাবলদি ও নাগপুরে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮১৭)। হোল্‌কারের সহিতও যুদ্ধ হইল। মাহিদপুরের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া হোল্‌কার ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিলেন (ডিসেম্বর, ১৮১৭)।

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, আপ্পা সাহেব ভোঁসলা, ও হোল্‌কার সকলেই বৃটিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। আপ্পা সাহেব সিংহাসনচ্যুত হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্যের যে অংশ নর্মদা নদীর উত্তরে অবস্থিত ছিল, তাহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। এক নূতন রাজা বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ শাসন করিতে লাগিলেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কানপুরের নিকটস্থ বিঠুরে যাইয়া আবার

স্থাপন করিলেন, এবং তাঁহার জন্য আট লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল। পেশোয়ার পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহার রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। শিবাজীর এক বংশধর বৃটিশের অধীনে থাকিয়া ক্ষুদ্র সাতারা রাজ্যের রাজা হইলেন। হোল্‌কার বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যের উপর সমস্ত অধিকার ও দাবি ছাড়িয়া দিলেন। নর্মদা নদীর দক্ষিণে যে সমুদয় স্থান তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহা ইংরেজকে সমর্পণ করিলেন, এবং 'অধীনতা মূলক মিত্রতা' গ্রহণ করিলেন।

এই সময় প্রধান প্রধান রাজপুত রাজ্য—উদয়পুর, জয়পুর, কোটা, বুন্দী, বিকানীর, কিষণগঞ্জ, জয়সলমীর, সিরোহী প্রভৃতি—ইংরেজের সহিত 'অধীনতামূলক মিত্রতা' বন্ধনে আবদ্ধ হইল। এইরূপে কোন কোন দেশের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এবং কোন কোন দেশের সহিত বিনা যুদ্ধেই সন্ধি স্থাপন করিয়া লর্ড হেস্টিংস্ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ বৃটিশের শাসনাধীনে আনিয়া ফেলিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর আরব্ধ কর্ম এতদিনে সম্পূর্ণ হইল। ভারতে ইংরেজগণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। পঞ্জাব ও নেপাল ব্যতীত এই সময়ে ভারতে এমন একটিও দেশীয় রাজ্য ছিল না, যাহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করিতে পারিত। লর্ড হেস্টিংসের শাসনকালে বৃটিশের সিঙ্গাপুর অধিকার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সিঙ্গাপুর পরে বৃটিশ নৌবহরের একটি প্রধান আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।

ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ এবং ওয়েলেস্‌লীর ন্যায় লর্ড হেস্টিংস্‌কেও অপদস্থ হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে হয়। পামার এণ্ড কোং নামক বিখ্যাত ব্যাঙ্কের নিন্দনীয় কার্যাবলী আলোচনা করিয়া ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষগণ লর্ড হেস্টিংসের বিরুদ্ধে এক ভর্ৎসনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাহাতেই তিনি পদত্যাগ করিয়া ভারত ছাড়িয়া যান।

২। পূর্বাঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় পূর্বাঞ্চলেও ইংরেজগণ রাজ্য অধিকার করিয়া সীমান্ত সুদৃঢ় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ভারত মহাসাগরে প্রভাব-প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সমুদ্রপথে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার অভিপ্রায়ে ইংরেজগণ সিংহল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং সিঙ্গাপুর ও মালয় উপদ্বীপ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার

করিয়াছিল। এই সমুদ্রপথে বিস্তৃত চীনদেশ ও প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্জের (East Indies) সহিত অবাধ বাণিজ্য করা তাহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

স্যার্ স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফেলস্ নামক কোম্পানির একজন বিশিষ্ট কর্মচারী ভারতের পূর্ব-দ্বীপাঞ্চল পর্যবেক্ষণ করিয়া মালয় উপদ্বীপের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত তরুগুল্মে আচ্ছাদিত বিস্তৃত জলাভূমি সিঙ্গাপুর দ্বীপে একটি ঘাঁটি স্থাপন করিতে পরামর্শ দেন। লর্ড ময়রা তাঁহার উদ্দেশ্যের গুরুত্ব বুঝিয়া ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে সিঙ্গাপুরে বৃটিশ প্রাধান্য স্থাপন করেন। যখন সিঙ্গাপুর তাহাদের অধিকারে আসে, তখন ইহাকে এক বিরাট নৌ-ঘাঁটিতে পরিবর্তিত করা হয়, এবং ইহা পূর্ব সমুদ্রাঞ্চলের একটি প্রধান সামরিক ও বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইহার ফলে একদিকে ভারতের সমুদ্রোপকূলবর্তী পূর্বাঞ্চল সুরক্ষিত হয়, অপর দিকে চীনদেশ ও পূর্ব দ্বীপাঞ্চলে অবাধ বাণিজ্য চলিতে থাকে।

পরবর্তী বড়লাট লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে (১৮২৩-২৮) ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ হয়। পলাশির যুদ্ধের অনতিপূর্বে আলোমপ্রার অধীনে ব্রহ্মদেশে একটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় (১৭৫০)। তাঁহার পরবর্তী রাজা বোডব্‌পায়া (১৭৭৯-১৮১৯) আরাকান (১৭৮৪) ও মণিপুর রাজ্য (১৮১৩) জয় করেন। ইহার পূর্বেই টেনাসেরিম প্রদেশ ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৭৬৬)। এইরূপে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব সীমান্তে একটি শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। ব্রহ্মরাজ কর্তৃক বিজিত রাজ্যের অধিবাসীরা দলে দলে ইংরেজ রাজ্যে পলাইয়া আসে এবং মাঝে মাঝে ব্রহ্মরাজ্যের সীমান্ত পার হইয়া উপদ্রব করে। ব্রহ্মরাজ ইহাদিগকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্য ইংরেজ সরকারকে অনুরোধ করেন এবং ইংরেজ সরকার ইহাতে সম্মত না হওয়ায় বিষম ক্রুদ্ধ হন। ফলে ইংরেজ যখন পিণ্ডারি যুদ্ধে ব্যস্ত তখন ব্রহ্মরাজ লর্ড হেস্টিংসের নিকট এক পত্রে দাবি করেন যে যেহেতু মধ্যযুগে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং কাশিমবাজার প্রভৃতি অঞ্চল আরাকান রাজ্যকে কর দিত, অতএব ঐ সমুদয় ব্রহ্মরাজকে ফিরাইয়া দেওয়া হউক। বড়লাট এই পত্র ফিরাইয়া দিয়া লিখিলেন যে ইহা সম্ভবতঃ কেহ জাল করিয়াছে। কিন্তু ইহার তিন চারি বৎসর পরেই ব্রহ্মরাজ আসাম জয় করিলেন (১৮২১-২২) এবং চট্টগ্রামের অনতিদূরে শাহ্‌পুরী নামে ইংরেজ অধিকৃত একটি দ্বীপ দখল

করিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। ইহার ফলে ১৮২৪ সনের ২৪ ফেব্রুআরি তারিখে আমহার্স্ট ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইংরেজ সৈন্য আসাম হইতে বর্মীদিগকে বিতাড়িত করিল, কিন্তু আরাকানে বর্মী সেনাপতি বান্দুলার হস্তে পরাজিত হইল। আমহার্স্ট সমুদ্রপথে মিমারে একদল সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। তাহারা রেঙ্গুন দখল করিল, কিন্তু ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকায় এবং সুবন্দোবস্তের অভাবে বহু সৈন্যের মৃত্যু হইল। এই সৈন্যের গতিরোধ করার জন্য আরাকান হইতে বর্মী সৈন্য আসিল। প্রথম প্রথম তাহারা সফলতা লাভ করিল, কিন্তু সহসা সেনাপতি বান্দুলার মৃত্যু হওয়ায় বর্মী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং ভারতীয় সৈন্য নিম্ন-ব্রহ্মদেশের রাজধানী প্রোম নগরী দখল করিল। ১৮২৫ সনের শেষভাগে এই সৈন্যদল ব্রহ্মদেশের রাজধানী আভা শহরের ৬০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিলে ব্রহ্মরাজ ইংরেজের সহিত সন্ধি করিলেন। ১৮২৬ সনে ইয়ান্দাবো নামক স্থানে এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার শর্ত অনুসারে ব্রহ্মরাজ আসাম, আরাকান, তেনাসেরিমের উপকূল ও মার্তাবানের এক অংশ ইংরেজকে দিলেন এবং এক কোটি টাকা দিতে এবং একজন ইংরেজ প্রতিনিধি তাঁহার রাজধানীতে রাখিতে সম্মত হইলেন।

এইরূপে ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত আসামে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রহ্মযুদ্ধের সময় আসামবাসীদের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের আশায় ইংরেজ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, বর্মীরা বিতাড়িত হইলেই আসাম পুনরায় তাহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবে। ব্রহ্মযুদ্ধ শেষ হইবা মাত্র ইংরেজ আসামের কিয়দংশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিল—এবং অবশিষ্ট অংশে কয়েকটি সামন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল। কিন্তু ১৮৩৪ সনে কাছাড়ের মধ্যভাগ, ১৮৩৫ সনে জয়ন্তিয়া, ১৮৩৮ সনে আসামের বাকী অংশ এবং ১৮৫৪ সনে কাছাড়ের বাকী অংশ নানা অজুহাতে বৃটিশের রাজ্যভুক্ত করা হইল।

৩। আফগান যুদ্ধ

এইরূপে ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংরেজ রাজ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ভারতে ইংরেজ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পঞ্জাব প্রদেশে শক্তিশালী শিখ রাজ্য এবং

তাহারও পশ্চিমে পর্বত-সঙ্কুল আফগান রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই উভয়ের সহিতই ইংরেজের সংঘর্ষ বাধিল। আফগানিস্থানে ও পারস্যে রাশিয়ার ক্ষমতার দ্রুত প্রসার দেখিয়া বৃটিশ মন্ত্রিসভা হইতে ভারতের বড়লাট লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের (১৮৩৬-১৮৪২) উপরে আদেশ আসিল, আফগানিস্থানে রাশিয়ার প্রভাবের প্রসার নিবারণ করিতে হইবে। তৎকালে আহম্মদ শাহ্ দুরানীর পৌত্র কাবুলরাজ শাহ্ সুজা ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া লুধিয়ানায় বাস করিতেছিলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে দোস্ত্ মুহম্মদ খাঁ নামক এক ব্যক্তি কাবুল ও গজনী অধিকার করিলে শাহ্ সুজা তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। এই সময়ে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড শাহ্ সুজাকে আবার কাবুলের সিংহাসনে বসাইয়া সেখানে বৃটিশের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিলেন। শাহ্ সুজার সহিত একদল বৃটিশ সৈন্য আফগানিস্থানে গিয়া ধীরে ধীরে কান্দাহার, গজনী ও কাবুল অধিকার করিল। দোস্ত্ মুহম্মদ পলাইয়া গেলেন এবং শাহ্ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে স্থাপিত করা হইল (১৮৩৯)। কিছুদিন পরে দোস্ত্ মুহম্মদ আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় কলিকাতায় লইয়া আসা হইল (১৮৪০)।

অক্‌ল্যাণ্ড দশ হাজার সৈন্য ও তাহাদের অসংখ্য অনুচরদিগকে আফগানিস্থানে রাখিয়া বাকী সৈন্য ভারতবর্ষে সরাইয়া আনিলেন। এদিকে শাহ্ সুজা আফগান জনসাধারণের বিরাগভাজন হওয়ায় চারিদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দোস্ত্ মুহম্মদের পুত্র আকবর খাঁ কাবুলে তিনজন ইংরেজ কর্মচারী নিহত করিলেও ইহার কোন প্রতিশোধ না লইয়াই কাবুলের ইংরেজ প্রতিনিধি ম্যাক্‌নটেন আকবর খাঁর সহিত সন্ধি করিলেন (১১ই ডিসেম্বর, ১৮৪১)। এই সন্ধির শর্ত হইল, ইংরেজ সৈন্য কাবুল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং দোস্ত্ মুহম্মদ পুনরায় কাবুলের সিংহাসনে বসিয়া আফগানিস্থানে রাজত্ব করিবেন। এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইবার বারো দিন পরেই আকবর খাঁর সহিত সাক্ষাতের কালে ম্যাক্‌নটেন ও তাঁহার একজন সঙ্গী নিহত হইলেন, এবং অপর দুইজন ইংরেজ বন্দী হইল। এই হত্যারও কোন প্রতিশোধ না লইয়াই বৃটিশ সৈন্য বন্দুক, কামান ও গোলাগুলি প্রভৃতি আফগানদের হস্তে সমর্পণ করিল এবং ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি তারিখে সাড়ে চারি হাজার সৈন্য ও তাহাদের বারো হাজার

অনুচর কাবুল ছাড়িয়া ভারত অভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু আফগানগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কেবল একজন মাত্র ইংরেজ জালালাবাদে পৌঁছিল, বাকী সমস্ত সৈন্য ও অনুচর পথেই নিহত অথবা বন্দী হইল।

এই দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই অক্ল্যাণ্ড ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং তাঁহার স্থানে লর্ড এলেন্‌বরা (১৮৪২-১৮৪৪) বড়লাট নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। জালালাবাদ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু গজনী-স্থিত বৃটিশ সৈন্য আত্মসমর্পণ করিল এবং শাহ্‌ সুজা আফগানদের হাতে নিহত হইলেন। এইবার জালালাবাদ হইতে একদল এবং কান্দাহার হইতে আর একদল বৃটিশ সৈন্য কাবুলের দিকে যাত্রা করিল। কাবুল অধিকার করিয়া তাহারা কাবুলের বিস্তৃত বাজার তোপে উড়াইয়া দিল এবং বৃটিশ বন্দীদিগকে উদ্ধার করিয়া পেশোয়ারে ফিরিয়া আসিল। গজনী নগরী ও দুর্গও ধ্বংস করা হইল। ইহার পর এলেন্‌বরা আফগানিস্থানের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত বোধ করিলেন না, এবং দোস্ত্‌ মুহম্মদকে বিনা শর্তে কাবুলের সিংহাসন ফিরাইয়া দিলেন (১৮৪২)। দোস্ত্‌ মুহম্মদ ইংরেজদের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতেন।

৪। সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাব

প্রথম আফগান যুদ্ধের পরই ইংরেজ সিন্ধুদেশ অধিকার করিল। আমির নামে পরিচিত বেলুচি নায়কগণ সিন্ধুদেশ শাসন করিতেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো এই আমিরগণের সহিত মিত্রতামূলক এক স্থায়ী সন্ধি করেন। ১৮২০ ও ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই সন্ধি আবার নূতন করিয়া করা হয়। কিন্তু ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অক্ল্যাণ্ডের সময়ে আফগানিস্থানের সহিত যখন ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন ইংরেজ সরকার সমুদয় সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া সৈন্যবাহিনী পাঠাইল এবং সিন্ধুদেশের কয়েকটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল। আফগান যুদ্ধের সময় সিন্ধুদেশের উপর অধিকার রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া লর্ড অক্ল্যাণ্ড ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আমিরগণকে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হইল। কিন্তু ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া সিন্ধুদেশ সম্পূর্ণরূপে জয় করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড এলেন্‌বরা স্যার চার্লস্‌

নেপিয়ার নামক একজন কর্মচারীকে প্রতিনিধিরূপে সিন্ধুদেশে প্রেরণ করিলেন। তিনি আমিরদের বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তিনি অবিলম্বে সিন্ধুদেশের কতকগুলি জায়গা দখল করিবেন। একদল বেলুচি নেপিয়ারের দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া কর্নেল আউটরামের আবাস-ভবন আক্রমণ করিল। অমনি আমিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল, এবং আমিরগণ মিয়ানি ও দাবো নামক দুই স্থানে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)। সিন্ধুদেশ ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত করা হইল, এবং আমিরগণ নির্বাসিত হইলেন। এই সিন্ধুদেশ অধিকার সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারেই ইংরেজগণ নানা ছল-চাতুরীর সাহায্য লয় এবং সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রণজিৎ সিংহের (১৭৮০-১৮৩৯) নেতৃত্বে পঞ্জাবে শিখ জাতি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। রণজিতের জন্মের সাত বৎসর আগেই শিখরা পূর্বে শাহারানপুর হইতে পশ্চিমে আটক ও দক্ষিণে মুলতান হইতে উত্তরে কাংড়া এবং জম্মু পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে আধিপত্য স্থাপন করে। যদিও শিখরা অমৃতসরে মিলিত হইয়া শিখ সম্প্রদায়ের নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও মুদ্রা প্রচার করে, তবু তাহারা তখন বারোটি মিস্‌ল অর্থাৎ ছোট ছোট দলে বিভক্ত ছিল। এই বিচ্ছিন্ন দলগুলিকে একতাবদ্ধ করিয়া একটি শক্তিশালী শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই রণজিৎ সিংহের সর্বপ্রধান কীর্তি। রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ একটি শিখ মিস্‌লের নায়ক ছিলেন। তিনি অপরাপর কয়েকটি শিখ মিস্‌লের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যু ঘটে। তখন রণজিতের বয়স মাত্র দশ বৎসর। ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আফগানিস্থানের আমির জমান শাহ্ পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া ইহার কতকাংশ অধিকার করেন। বালক রণজিৎ নানা ভাবে তাঁহাকে সাহায্য করায় জমান শাহ্ তাঁহাকে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন, এবং পরে 'রাজা' উপাধি দেন। ইহার কিছুকাল পরেই রণজিৎ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, এবং ক্রমে ক্রমে শতদ্রু নদীর পশ্চিমে অবস্থিত সমুদয় শিখ মিস্‌ল তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ইউরোপীয় সামরিক কর্মচারী দ্বারা সুশিক্ষিত তাঁহার বিখ্যাত খাল্‌সা সেনাবাহিনী শৌর্যবীর্য ও রণকৌশলে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

শতদ্রু নদীর পূর্বদিকের অধিবাসী শিখ-নায়করা সর্বদা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিতেন। তাঁহাদের একজনের অনুরোধে রণজিৎ শতদ্রু অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা অধিকার করিলেন (১৮০৬)। কিন্তু ঐ শিখ-নায়কগণের কেহ কেহ রণজিতের বিরুদ্ধে বড়লাট লর্ড মিন্টোর (১৮০৭-১৮১৩) নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে মিন্টো মেট্‌কাফকে রণজিতের সভায় দূত প্রেরণ করিলেন। তখন অমৃতসরের সন্ধি দ্বারা রণজিতের সহিত বৃটিশ সরকারের স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল (১৮০৯)। রণজিৎ শতদ্রুর পূর্বদিকস্থ শিখ-নায়কগণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, এবং ফলে ঐ সকল শিখ-নায়ক বৃটিশের অধীন হইয়া গেল। এইরূপে বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে বৃটিশ রাজ্যের সীমানা শতদ্রু পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

লর্ড মিন্টোর সহিত সন্ধি করিবার পর রণজিৎ সিংহ পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার করিতে না পারিয়া অন্যান্য অঞ্চল জয় করেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্থানের রাজা শাহ্ সুজা রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করিলে রণজিৎ তাঁহার নিকট হইতে জগদ্বিখ্যাত কোহিনুর হীরকখণ্ড আদায় করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুকালে শিখ রাজ্য সিন্ধু হইতে শতদ্রু পর্যন্ত সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশ এবং পেশোয়ার, কাংড়া ও কাশ্মীর জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ বাধিল। এই সময়ে কাশ্মীরের হিন্দু ডোগরা জাতীয় কয়েকজন নায়ক পঞ্জাব রাজ্যে খুব শক্তিশালী ছিলেন এবং তাহাদের ও কয়েকজন শিখ সর্দারের ষড়যন্ত্রে রাজ্যের শাসন ব্যাপারে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রণজিতের পুত্র ও উত্তরাধিকারী খরক সিংহ অতিশয় অপদার্থ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা রাণীর সহিত রণজিতের অপর পুত্র শের সিংহের বিবাদ বাধিল। শের সিংহ রাজ্য অধিকার করিলেন কিন্তু এই সমুদয় আভ্যন্তরিক বিপ্লবের ফলে রণজিতের প্রবল প্রতাপশালী খালসা সৈন্যই দেশের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। শের সিংহের মৃত্যুর পর তাহারা রণজিতের ছয় বৎসরের শিশুপুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসাইল (১৮৪৩)। তাঁহার মাতা ঝিন্দন একজন নর্তকী ছিলেন। বিস্তৃত শিখ রাজ্যের শাসন তখন প্রকৃতপক্ষে রাণী ঝিন্দন ও তাঁহার দুই মন্ত্রী লাল সিংহ ও তেজ সিংহের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। ইঁহাদের কেহই খালসা সৈন্যের বিশ্বাসভাজন ছিলেন

না। লাল সিংহ ও তেজ সিংহ গোপনে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতেন এবং সম্ভবতঃ রাণী ঝিন্দনও ইহা জানিতেন। শিখরাজ্যের আভ্যন্তরিক গোলযোগ ও প্রধান নায়কদের সহিত ষড়যন্ত্রের সুযোগ লইয়া ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট শিখ রাজ্য আক্রমণের জন্য ইহার প্রান্তদেশে বহু সৈন্য সমাবেশ করিল ও শতদ্রু নদী পার হইবার জন্য নৌকায় সেতু প্রস্তুত করারও ব্যবস্থা করিল। ইহা প্রতিরোধ করিবার জন্য শিখসৈন্যও প্রস্তুত হইল এবং একদল শিখ সৈন্য শতদ্রু নদী পার হইয়া অপর পারে শিখরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এক স্থানে সমবেত হইল (১৮৪৫ ডিসেম্বর)। অমনি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ—শিখ সৈন্য ব্রিটিশ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে এই অজুহাতে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

পর পর মুদ্‌কী, ফিরোজশা এবং আলিওয়াল—এই তিনটি যুদ্ধে শিখ সৈন্য ইংরেজ সৈন্যকর্তৃক পরাজিত হইল এবং শিখরা শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। শেষ যুদ্ধ হইল সোব্রাও নামক স্থানে। এই সমুদয় যুদ্ধে শিখ সৈন্যগণ অসীম বীরত্ব ও ধৈর্যের সহিত যুদ্ধ করিলেও অধিকাংশ সেনানায়কগণের অদূরদর্শিতায় এবং লাল সিংহ, তেজ সিংহ ও ডোগরা গোলাব সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় তাহারা সম্পূর্ণ পরাজিত হইল (১৮৪৫-১৮৪৬)। কিন্তু তাহাদের সাহস ও রণকৌশল শত্রু-মিত্র সকলকেই চমৎকৃত করিয়াছিল, এবং ইংরেজের পক্ষে দারুণ সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল। যুদ্ধের পরেই ৯ই মার্চ লাহোরের সন্ধি দ্বারা শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধির শর্ত ঐ বৎসর ১৬ই ডিসেম্বর আর একটি সন্ধি দ্বারা কতক পরিবর্তিত হইল। মোটের উপর শিখদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কাশ্মীর প্রদেশ, হাজরা জেলা, বিপাশা ও শতদ্রু নদীর মধ্যস্থিত জালন্ধর দোয়াব ও শতদ্রুর দক্ষিণদিকস্থ সমস্ত ভূভাগ ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইল। বালক দলীপ সিংহ নামে মাত্র রাজা রহিলেন, এবং আট জন শিখ সর্দার লইয়া গঠিত এক দরবারের উপর পঞ্জাবের শাসনভার অর্পিত হইল। কিন্তু পঞ্জাবের শাসনকার্য প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি স্যর্ হেন্‌রী লরেন্সের হস্তেই ন্যস্ত হইল। একদল বৃটিশ সৈন্য লাহোরে স্থাপিত হইল এবং শিখ সৈন্যের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইল। ইংরেজগণ কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যে লাহোর দরবারের ডোগরা সর্দার গোলাব সিংহের নিকট বিক্রয় করিল।

শিখদের সহিত সন্ধি বেশি দিন স্থায়ী হইল না। ইংরেজ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে রাণী ঝিন্দনকে লাহোর হইতে দেশান্তরে প্রেরণ করাতে তাহারা ভীষণ ক্রুদ্ধ হইল। অবশেষে মুলতানের শাসনকর্তা দেওয়ান মুলরাজকে লইয়া গোলযোগ বাধিল। লাহোরের দরবার আর্থিক সমস্যায় বিপন্ন মুলরাজের নিকট পঁচাত্তর লক্ষ টাকা দাবি করায় তিনি পদত্যাগ করেন এবং নানা কারণে বিদ্রোহী হন। ক্রমে অন্যান্য শিখ-নায়কগণ মুলরাজের সহিত যোগ দেন। এই বিদ্রোহের ফলে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬) শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ঝিলাম নদীর তীরে চিলিয়ান্‌ওয়ালা প্রান্তরে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুআরি শিখ ও ইংরেজ সৈন্যের ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না, কিন্তু ইংরেজ পক্ষে গুরুতর লোকক্ষয় হইল। কিছুদিন পরেই বৃটিশ সৈন্য মুলতান অধিকার করিল। ইহার পর চিনাবের তীরে গুজরাট নামক স্থানে শিখ সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল (২১শে ফেব্রুআরি ১৮৪৯)। লর্ড ডালহৌসী পঞ্জাব ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিলেন।

৫। ডালহৌসীর আমলে সাম্রাজ্য বিস্তৃতি

বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে আরও অনেক দেশ ইংরেজরাজ্যভুক্ত হয়। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অনেক ইংরেজ বণিক প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পর ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ উপকূলে বাস স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা ভারতের বড়লাটের নিকট অভিযোগ করিল যে, রেঙ্গুনের শাসনকর্তা তাহাদের উপর অত্যাচার করিতেছেন। বড়লাট লর্ড ডালহৌসী এই অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ এবং রেঙ্গুনের শাসনকর্তাকে সরাইবার দাবি জানাইয়া একজন নৌ সৈন্যাধ্যক্ষকে যুদ্ধজাহাজসহ ব্রহ্মরাজের নিকট পাঠাইলেন। ব্রহ্মরাজ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া রেঙ্গুনের শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করিলেন, এবং সন্ধির কথাবার্তার জন্য অন্য একদল লোক নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ইংরেজ দূত একটি তুচ্ছ কারণে নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া রেঙ্গুন বন্দর অবরোধ এবং ব্রহ্মরাজের একখানি জাহাজ আটক করিলেন। ইহাতে উভয়পক্ষ হইতেই গুলিগোলা বর্ষিত হইল। তখন ডালহৌসী এই কার্যের জন্য দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করিলেন, এবং ব্রহ্মরাজ ইহা নির্ধারিত

দিবসের পূর্বে না দেওয়ায় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইংরেজ সৈন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মার্তাবান, রেঙ্গুন, বেসিন, প্রোম ও পেগু অধিকার করিল। ডালহৌসী ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এক ঘোষণাপত্র দ্বারা পেগু অথবা নিম্ন-ব্রহ্মপ্রদেশ ইংরেজরাজ্যভুক্ত করিলেন। ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরের সমস্ত উপকূলভাগই ইংরেজের অধীন হইল।

বিনা যুদ্ধে ডালহৌসী ভারতের অনেক রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এগুলির মধ্যে অযোধ্যা রাজ্যটি আত্মসাৎ করা ডালহৌসীর শাসনের একটি গুরুতর কলঙ্ক। অযোধ্যার সহিত মিত্রতার সুযোগ লইয়া ওয়ারেন্ হেস্টিংস্, সার্ জন্ শোর ও ওয়েলেসলী কিরূপে ধীরে ধীরে অযোধ্যা রাজ্যে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ইংরেজ সরকার সমস্ত অযোধ্যা রাজ্যটি গ্রাস করিবার সংকল্প করিলেন। অযোধ্যার নবাবকে স্পষ্টভাবে বলা হইল যে, তাঁহার রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা খুবই খারাপ,—এই ব্যবস্থাকে উন্নত করিয়া না তুলিলে, তাঁহার রাজ্য ইংরেজরাই অধিকার করিবে। অযোধ্যা রাজ্যে যে অত্যাচার ও কুশাসন চলিতেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দুর্ব্যবস্থার জন্য প্রধানত ইংরেজরাই দায়ী ছিল। কারণ বৃটিশ সরকার অযোধ্যায় ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উহার খরচ বাবদ ও অন্যান্য অজুহাতে বহু অর্থ শোষণ করিতেন; ইহা ছাড়া সরকারের নিয়োজিত অনেক ইংরেজ কর্মচারী অযোধ্যায় যথেচ্ছ অত্যাচার করিত। দেশের সৈন্যবল ইংরেজের হাতে থাকায় নবাব কোন কার্যেই তাহাদিগকে বাধা দিতে বা প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না। এক নবাবের মৃত্যু হইলে ইংরেজ সরকার নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিকে নবাবী পদ দিয়া তাঁহার সহিত নূতন সন্ধি করিতেন, এবং অনেক নূতন নূতন অধিকার তাঁহাদের হস্তগত হইত।

বড়লাট লর্ড ডালহৌসীর প্রধান নীতি ছিল, যে কোন নূতন রাজ্য অধিকারের সুযোগ-সুবিধা উপস্থিত হইলে তিনি কিছুতেই তাহা ছাড়িবেন না। পেগু ও পঞ্জাব অধিকার এই নীতিরই নিদর্শন। অযোধ্যার ব্যাপারেও ডালহৌসী এই নীতিরই অনুসরণ করিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী বড়লাটগণ অযোধ্যার কুশাসন বিষয়ে নবাবকে সাবধান করিয়াছিলেন। ডালহৌসীও এই সুযোগই গ্রহণ করিলেন। তিনি অযোধ্যার ইংরেজ প্রতিনিধিকে আদেশ

দিলেন,—তিনি যেন সরজমিনে তদন্ত করিয়া সমগ্র অযোধ্যা প্রদেশের অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি বা রিপোর্ট লিখিয়া পাঠান। যথাসময়ে এই রিপোর্ট দাখিল হইল, এবং ইহাতে অযোধ্যার শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ মন্তব্য ছিল ! ইহাতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল—রাজ্যের প্রজাবর্গ নানা প্রকার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইতেছে; তালুকদারদের উৎপীড়নের কোন সীমা নাই; দেশে চুরি-ডাকাতি, খুনখারাপি লাগিয়াই আছে; লোকের ধন-প্রাণ মোটেই নিরাপদ নহে; নবাব বিলাসিতায় মত্ত, রাজ-কার্যের দিকে দৃষ্টিই দেন না, তাঁহার সভাসদ্ ও কর্মচারীরা লোকের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার ও লুটতরাজ করে, ইত্যাদি।—এই রিপোর্টের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। রিপোর্টের উপসংহারে লেখা ছিল,—অযোধ্যার সকল শ্রেণীর প্রজাবর্গেরই একান্ত ইচ্ছা যে, নবাবকে পদচ্যুত করিয়া এখানে ইংরেজ শাসন প্রচলিত হউক। একথাটি যে সত্য নহে, তাহার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে, অযোধ্যার নবাবকে যখন সত্য সত্যই পদচ্যুত করা হইল, তখন ঐ রাজ্যের সর্বশ্রেণীর লোকই খুব অসন্তুষ্ট হয়, এবং অনেকে মনে করেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় অযোধ্যায় যে ইংরেজদের দুর্দশা হইয়াছিল, প্রজাবর্গের অসন্তোষই ইহার প্রধান কারণ। অথচ ডালহৌসী এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়াই অযোধ্যা ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

নবাবকে বলা হইল, তিনি যদি সন্ধিপত্র দ্বারা বৃটিশের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করেন, তবে তাঁহাকে বাৎসরিক পনর লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইবে এবং তাঁহার নবাব উপাধিও বজায় থাকিবে। নবাব এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়ায়, এক ঘোষণা-পত্র দ্বারা তাঁহার রাজ্য অধিকার করা হইল (১৮৫৬)। নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্ কলিকাতায় নির্বাসিত হইলেন। তাঁহার জন্য বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্ধারিত হইল।

ইংরেজদের সহিত সন্ধির শর্ত অনুসারে হায়দরাবাদের নিজাম নিজের ব্যয়ে একদল ইংরেজ সৈন্য পোষণ করিতেন। ক্রমে ক্রমে এই সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, এবং ইহার ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ টাকা বাকি পড়িল। ডালহৌসী নিজামকে স্পষ্টভাবে জানাইলেন যে, বহু টাকা বাকি থাকায় অসুবিধা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইতেছে; সুতরাং সৈন্যের ব্যয় বহন করিবার জন্য তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত বেরার প্রদেশটি ইংরেজের হাতে ছাড়িয়া দিলে ভাল হইবে।

নিজাম তখন বলিলেন যে, আমার দেশে কোন যুদ্ধবিগ্রহ নাই, ইংরেজ সৈন্যেরও তেমন কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং সন্ধির শর্তানুযায়ী যে সৈন্য-সংখ্যা আমার পোষণ করিবার কথা, তাহার অতিরিক্ত ইংরেজ সৈন্য এখান হইতে ফিরাইয়া নেওয়া হউক। ইহার জবাবে ডালহৌসী বলিলেন,—আচ্ছা, ধীরে ধীরে আমাদের সৈন্যসংখ্যা কমানো যাইবে; কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন পর্যন্ত সমস্ত ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য বেরার প্রদেশটি ছাড়িয়া দিতেই হইবে। বড়লাটের এই দাবির ফলে নিজামকে বাধ্য হইয়া ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন সন্ধি করিতে হইল। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে বেরার প্রদেশ রাইচুর দোয়াব এবং আরও কয়েকটি গ্রামাঞ্চলের শাসনভার ইংরেজ সরকারের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। নিজাম নামেমাত্র ইহার স্বত্বাধিকারী রহিলেন।

পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে ভুটান, উত্তরে তিব্বত এবং দক্ষিণে দার্জিলিং জিলার মধ্যে ক্ষুদ্র পার্বত্য সিকিম রাজ্য অবস্থিত। ইহার বর্তমান আয়তন মাত্র ২৮১৮ বর্গ মাইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপাল ইহার অধিকাংশ দখল করিয়াছিল। ইংরেজের সহিত নেপালের যুদ্ধ শেষ হইলে ভারত সরকার নেপালের অধিকৃত অংশ সিকিমকে ফিরাইয়া দিয়া এক সন্ধি করে (১৮১৭)। সিকিম-রাজ দার্জিলিং অঞ্চল ভারত সরকারকে দান করেন (১৮৩৫)। ইহার জন্য ভারত সরকার সিকিমকে প্রথমে (১৮৪১) তিন হাজার টাকা ও পরে (১৮৪৬) ছয় হাজার টাকা বার্ষিক দেয়।

দার্জিলিংয়ের প্রথম সুপারইনটেনডেন্ট আর্চিবল্ড ক্যাম্পবেল (Dr. Archibald Campbell) ও সিকিমের রাজার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। ক্যাম্পবেল অভিযোগ করেন যে সিকিমের রাজা দার্জিলিং হইতে লোক ধরিয়া নিয়া তাহাদিগকে ক্রীতদাস করেন। সিকিমের রাজা বলেন যে, তাঁহার ক্রীতদাস দার্জিলিং পলাইয়া যায় কিন্তু ক্যাম্পবেল তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেন্ না।

১৮৪৯ সনে প্রসিদ্ধ উদ্ভিদবিদ্যাবিশারদ হুকার (Dr. Hooker) ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নির্দেশ অনুসারে হিমালয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য ক্যাম্পবেলের সঙ্গে সিকিম যান। সিকিমের রাজা তাঁহাদিগকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা সিকিম রাজ্যের বাহিরে তিব্বত বা ভুটানে যাইতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহারা ইহা সত্ত্বেও তিব্বতের সীমানা পার হন এবং

ইহার ফলে সিকিমের সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। অতঃপর সিকিমরাজ, হুকার ও ক্যাম্পবেল উভয়কেই গ্রেপ্তার করেন ও ক্যাম্পবেলকে কারারুদ্ধ করেন। হুকার স্বেচ্ছায় কারাগারে ক্যাম্পবেলের সঙ্গী হন।

সিকিমরাজ সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া গভর্নর জেনারেলকে চিঠি লেখেন এবং ইহাতে ক্যাম্পবেলের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেন। এই সমুদয় অভিযোগ যে অনেকাংশে সত্য এখন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু লর্ড ডালহৌসী এই সকল অভিযোগের সম্বন্ধে কোন বিচার না করিয়া বলপূর্বক সিকিমের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অধিকার করিলেন।

ইহা ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য ডালহৌসীর শাসনকালে ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। পোষ্যপুত্রের স্বত্বলোপ-নীতির (Doctrine of Lapse) ফলেই প্রধানত এই সকল রাজ্য অধিকার করা হইত, অর্থাৎ বৃটিশের প্রতিষ্ঠিত ও অধীন কোন দেশীয় রাজ্যের অপুত্রক রাজা মরিয়া গেলে, তাঁহার দত্তক বা পোষ্যপুত্রকে ডালহৌসী উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতেন না, এবং ঐ রাজ্য বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইত। এই নীতি কুড়ি বৎসর পূর্বে প্রথম সূচিত হয় এবং বিলাতের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু ডালহৌসীই প্রথম এই নীতি অনুসারে কাজ করেন। ইহার ফলে সাতারা, ঝান্সী ও নাগপুর রাজ্য, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত জৈৎপুর, এবং সম্বলপুর প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বৃত্তিভোগী পেশোয়া বাজীরাওর মৃত্যু হইলে তাঁহার দত্তকপুত্র ধুন্দুপন্থ বা নানাসাহেবকে ডালহৌসী বাজীরাওর বৃত্তি দিতে অস্বীকার করিলেন। কর্ণাটের নবাবের মৃত্যু হইলে ডালহৌসী নবাবী পদ উঠাইয়া দিলেন। তাঞ্জোর রাজ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ ব্যবস্থা হইল।

অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে ডালহৌসীর এই রাজ্য-অধিকার নীতি ভারতীয়গণের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। দত্তকপুত্র গ্রহণ ভারতবর্ষের চিরাচরিত প্রথা এবং ভারতে চিরদিনই দত্তকপুত্র দত্তক-গ্রহণকারীর আইন-সঙ্গত উত্তরাধিকারী-রূপে গণ্য হইয়া থাকে। ভারতের এই চিরন্তন প্রথা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ প্রত্যাখ্যান করায় জনগণ বিশেষ-ভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এই প্রধূমিত অসন্তোষ-বহ্নিই ভারতীয় বিদ্রোহে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন।

৬। শাসন ব্যবস্থা

ক। লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

কৃষিপ্রধান দেশে ভূমির রাজস্বই গভর্নমেণ্টের প্রধান আয়। হেস্টিংসের আমলে ভূমির রাজস্ব নিলামে দেওয়া হইত, এবং যিনি সর্বোচ্চ হারে ডাকিতেন, তাঁহাকে প্রথমে পাঁচ বৎসরের জন্য এবং পরে এক বৎসরের জন্য জমি বিলি করা হইত। ইহার ফলে ভূমির অস্থায়ী মালিকেরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া ঐ অল্পকালের মধ্যেই যতদূর সম্ভব টাকা আদায়ের চেষ্টা করিত, জমির উন্নতির জন্য কোন যত্ন করিত না। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই কর্নওয়ালিস্ জমিদারদের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। এই ব্যবস্থায় জমিদারদিগকে জমির স্থায়ী মালিক বলিয়া স্বীকার করা হইল। তাঁহারা শুধু গভর্নমেণ্টকে বাৎসরিক খাজনা দিতে বাধ্য রহিলেন, এবং সেই খাজনার অঙ্কও চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া গেল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহার এবং তাহার দুই বৎসর পরে বারাণসী প্রদেশে প্রবর্তিত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবলমাত্র আংশিকরূপে সফল হইয়াছিল। ইহা বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়াছিল এবং সরকারের রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ভূমিতে প্রজাদের অথবা মধ্যস্বত্ববান্‌দের স্বত্ব গভর্নমেণ্ট একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এজন্য তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জমিদারের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি নিয়ম ছিল যে, কোন ভূস্বামী নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে খাজনা দিতে না পারিলে তাঁহার জমি নিলামে বিক্রয় হইবে। ইহার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ জমিদারই সর্বস্বান্ত হইয়া ঘোর দুর্দশায় পড়িয়াছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ভূমির মূল্য ধীরে ধীরে বহুগুণে বাড়িলেও গভর্নমেণ্ট জমিদারদের যে রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, তাহার বেশি আর একটি পয়সাও দাবি করিতে পারিত না। এইজন্যই পরে জনগণের উপর নানারূপ ট্যাক্স বসাইতে হইয়াছিল, এবং তাহাদের দুঃখকষ্টও বাড়িয়াছিল। পরবর্তী কালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি-সংশোধক আইনের প্রবর্তনে জমিদার ও প্রজাদের অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছিল। বর্তমান স্বাধীন ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত এবং জমিদারী প্রথা উৎখাত করা হইয়াছে।

খ। শাসন ব্যবস্থা

কর্নওয়ালিসের সময় সমস্ত দেশ কতকগুলি জেলাতে বিভক্ত হইয়া জেলাগুলিই দেশের শাসনকার্যের কেন্দ্রস্বরূপ গঠিত হইল। প্রথমে জেলার সংখ্যা ছিল ৩৫, কিন্তু ১৭৮৭ খ্রীঃ ইহার সংখ্যা কমাইয়া ২৩ করা হয়। প্রত্যেক জেলায় এবং তিনটি শহরে ইংরেজ বিচারকের অধীনে এক একটি দেওয়ানী আদালত এবং কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা এই চারিটি বড় বড় কেন্দ্রে চারিটি আপীল আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালত সর্বোচ্চ আপীল আদালতে পরিণত হইল। ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের জন্য চারিটি সেসন আদালত স্থাপিত হইল। প্রত্যেক আদালতে দুইজন করিয়া ইংরেজ বিচারক থাকিতেন এবং তাঁহারা রাজ্যের সর্বত্র ঘুরিয়া বিচার করিতেন। এইজন্য ইহাদিগকে 'কোর্ট অব্ সার্কিট্' বা ভ্রাম্যমাণ আদালত বলিত। সদর নিজামত আদালত ও সপারিষদ্ বড়লাটের অধীন হইল। কালেক্টরগণের হাত হইতে দেওয়ানী বিচারের ক্ষমতা সরাইয়া লওয়া হইল। দেওয়ানী আদালতের ইংরেজ জজগণ ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিতেন এবং পুলিশও তাঁহাদের অধীন ছিল। প্রত্যেক জেলা আবার অনেকগুলি থানাতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক থানা একজন দারোগার অধীন করা হইল।

লর্ড কর্নওয়ালিসের পূর্বে দেশের শাসনকার্য নির্বাহের জন্য ভারতের সুযোগ্য অধিবাসীরাই দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে নিযুক্ত হইত। কিন্তু কোন ভারতীয়কে উচ্চ কার্যে নিযুক্ত না করাই ছিল কর্নওয়ালিসের মূল নীতি। ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের বিচারক, উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মচারী এবং অন্যান্য সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি ইউরোপীয়দিগকে নিযুক্ত করিতেন; অথচ এদেশের লোকের প্রকৃতি, রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে ঐসকল বিদেশীয় কর্মচারীদের অনেকেরই বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা থাকিত না। ইহার ফলে এবং অন্যান্য কারণে কর্নওয়ালিসের সংস্কারগুলি বিশেষ ফলদায়ক হইল না।

বড়লাট বেন্টিঙ্ক ভারতীয়গণকে বিচার ও শাসন বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত করিবার রীতি প্রবর্তন করেন। পূর্বে রেজিস্ট্রার (Registrar) নামে প্রতি জিলায় একজন অধস্তন ইংরেজ বিচারক ছিলেন—ইনি ২০০ টাকা পর্যন্ত দাবির মামলা বিচার করিতে পারিতেন। নিম্নপদস্থ ভারতীয় কর্মচারীরা

৫০ টাকা পর্যন্ত দাবির মামলা করিতে পারিতেন। বেন্টিঙ্ক রেজিষ্ট্রারের পদ ও কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চারিটি কেন্দ্রের আপীল আদালতগুলি উঠাইয়া দিলেন। ভারতীয় বিচারকদের ক্ষমতা বাড়ান হইল। মুনসিফ, সদর আমিন ও প্রধান সদর আমিন যথাক্রমে ৩০০, ১০০০ ও ৫০০০ টাকা পর্যন্ত দাবির মামলা করিতে পারিতেন। জিলা আদালতের ইংরেজ জজ যে কোন দাবির মামলা করিতে পারিতেন এবং তাঁহার রায়ের বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করা যাইত। জজেরা মুনসিফ ও সদর আমিনের কার্য পরীক্ষা করিতেন। পূর্বে মুনসিফরা কোন বেতন পাইত না—মোকদ্দমার ফী মাত্র পাইত—গড়ে ইহা মাসিক বিশ ত্রিশ টাকার বেশী হইত না। বেন্টিঙ্ক তাহাদের বেতন ও অফিসের অন্যান্য খরচ বাবদ মাসিক এক শত টাকা ধার্য করিলেন। সদর আমিন ও প্রধান সদর আমিন তাহাদের বেতন ও আফিসের খরচ বাবদ মাসিক যথাক্রমে ২৫০ ও ৫০০ টাকা পাইতেন।

পুলিশ, রাজস্ব আদায়, শুল্ক, লবণ, ও আফিং বিভাগে এবং আদালতে নিযুক্ত নিম্নপদস্থ ভারতীয় কর্মচারিগণ অত্যন্ত কম বেতন পাইত। দারোগা, লবণ বিভাগের অধ্যক্ষ দেওয়ান, মোহরের ও পিওন যথাক্রমে মাসিক ৩০, ৫০, ৫, ও আড়াই টাকা বেতন পাইত। সুতরাং সর্বত্রই ঘুষ দেওয়ার প্রথা খুব ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

কর্নওয়ালিসের সময় প্রতি জিলার দুইজন প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন—একজন কলেক্টর তিনি কলিকাতা বোর্ড অফ্ রেভিনিউর অধীনে কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রহ কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। আর একজন জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট এই উভয় পদের কার্য করিতেন এবং পুলিশও তাহাদের অধীন ছিল। পরে কলেক্টরও কতকটা বিচারের ভার পাইয়াছিলেন। ১৮০৮ সনে কলিকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ বিভাগের জন্য একজন করিয়া পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বেন্টিঙ্কের সময়ে (১৮২৯ সনে) এই পদগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল। কয়েকটি জিলা লইয়া একটি বিভাগের (Division) সৃষ্টি হইল এবং জিলার কালেক্টরগণ বিভাগীয় অধ্যক্ষ 'কমিশনার অফ রেভিনিউ ও সারকিট'-এর (Commissioner of Revenue and Circuit) অধীনস্থ হইলেন। অপরদিকে জিলাগুলিও সব-ডিভিসনে ভাগ হইল। বিভাগীয় কমিশনার পুলিশ বিভাগেরও কর্তা হইলেন। আপীল আদালত চারিটি উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং উক্ত কমিশনারই ভ্রাম্যমাণ সেসন

আদালতের জজের কার্য করিতেন। কিন্তু ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কমিশনারদের হাত হইতে সেসন জজের কাজ উঠাইয়া নিয়া জিলা জজের হাতে ন্যস্ত হইল, এবং জজদের হাত হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ তুলিয়া নিয়া কলেক্টরের হাতে দেওয়া হইল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টরের পদ পৃথক করা হইল কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার এই দুই পদে একজন নিযুক্ত হইলেন। এই ব্যবস্থায় অনেকে আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু ইহার আর পরিবর্তন হয় নাই। বেণ্টিঙ্কের সময় (১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) ডেপুটি কলেক্টরের ও নয় দশ বৎসর পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি হয়—এই দুই পদে ভারতবাসী নিযুক্ত হইতে পারিত। বেণ্টিঙ্ক জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করেন—ইহারা পরে সব-ডিভিশনাল অফিসার নিযুক্ত হইতেন।

১৮৩১ সনে রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার বিচারের ভারও কলেকটরের হাতে অর্পিত হয়। এইরূপে ম্যাজিস্ট্রেট কালেকটরই জিলার প্রধান কর্মচারী হন। জিলা জজের কার্যভার লাঘবের জন্য, অতিরিক্ত জজ, এবং ভারতীয়দের জন্য সদর আমিন, মুন্সেফ, ও আরও কয়েকটি অল্প বেতনের পদের সৃষ্টি হয়। তাহাদের বিচারের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় জিলা জজের নিকট এবং কোন কোন স্থলে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করা যাইত। জিলা জজের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধেও সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করা যাইত।

১৮০১ সনে সদর দেওয়ানী আদালতের সদস্যের অনেক পরিবর্তন হয়। সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের পরিবর্তে তিনজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কর্মচারী ইহার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮১১ সনে একজন প্রধান জজ (Chief Judge) পদের সৃষ্টি হয় এবং জজের সংখ্যা প্রয়োজন মত বাড়াইবার ব্যবস্থা হয়। ক্রমে ক্রমে সদর দেওয়ানী আদালত কেবল আপীল আদালতে পর্যবসিত হয় এবং ইহার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের ব্যবস্থা করা হয়।

বেণ্টিঙ্ক ভারতীয়গণকে বিচার ও শাসন বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত করিবার রীতি প্রবর্তন করেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদের কুড়ি বৎসরের মেয়াদ শেষ হইলে বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার কুড়ি বৎসরের জন্য এক নূতন সনদ দেওয়া হয়। এই নূতন সনদে বিশেষ জোর দিয়া ঘোষণা করা হইল যে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যোগ্য ভারতবাসীকে শাসনকার্যের সমস্ত বিভাগেই নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে।

এই সনদে শাসনকার্যেরও নানা পরিবর্তন করা হইল। বাংলার লাট এখন হইতে সমগ্র ভারতের গভর্নর জেনারেল বা বড়লাট এবং বাংলার লাট হইলেন। এতদিন ভারতের সর্বোচ্চ শাসন-কর্তৃপক্ষের নাম ছিল 'সপারিষদ বাংলার বড়লাট', এখন তাহার নাম হইল 'সপারিষদ ভারতের বড়লাট', (Governor-General of India in Council) এবং বড়লাট ও পূর্বোক্ত তিনজন সদস্য ছাড়া ভারতের সেনাপতিও ইহার একজন অতিরিক্ত সদস্য ছিলেন। এই পরিষদই এখন প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র ভারতের শাসনকর্তা হইল।

১৮৫৩ সনে যে নূতন সনদ দেওয়া হইল তাহাতে বাংলার জন্য লেফ্‌টেনান্ট গভর্নরের পদ সৃষ্টি হইল এবং বড়লাট আর বাংলা দেশের গভর্নর রহিলেন না; এখন তাহার পদবী হইল কেবলমাত্র গভর্নর জেনারেল অফ ইণ্ডিয়া। ১৮৩৩ সনের পূর্ব পর্যন্ত সপারিষদ গভর্নর জেনারেল এবং বম্বে ও মাদ্রাজ সরকারের আইন প্রণয়নের অধিকার ছিল। ১৩৩৮ সনের নূতন সনদে বম্বে ও মাদ্রাজের আইন প্রণয়ণের অধিকার রহিত হয়, এবং গভর্নর-জেনারেলের পরিষদে কোম্পানির কর্মচারী নহেন এমন একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তি চতুর্থ সদস্যরূপে নিযুক্ত হন। তিনি পরিষদের সকল সভায়ই উপস্থিত থাকিতে পারিতেন, কিন্তু কেবলমাত্র আইন প্রণয়ণ ব্যাপারে ইহার সদস্যরূপে বিবেচিত হইতেন। সুপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে সর্বপ্রথম এইরূপ আইন সদস্য নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বেকার আইনগুলিকে বলা হইত রেগুলেশন (Regulation), নূতন নিয়ম অনুসারে প্রণীত আইনের নাম হইল অ্যাক্ট (Act)। আর এই আইন সুপ্রিম কোর্ট ও ব্রিটিশ ভারতের সকল আদালতে বলবৎ হইল।

১৮৫৩ সনের আইন দ্বারা এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়। আইন সদস্য অন্য তিনজন সদস্যের ন্যায় গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের পুরাপুরি সদস্য হইলেন। আরও স্থির হইল যে উক্ত পরিষদ যখন নূতন আইন প্রণয়ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন তখন গভর্নর জেনারেল ও উক্ত চারিজন সদস্য ছাড়া ভারতের সেনাপতি, বাংলার চীফ জাস্টিস্‌, অন্য একজন জজ এবং বম্বে, মাদ্রাজ, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সরকারের একজন করিয়া প্রতিনিধি—মোট এই বারোজন লইয়া পরিষদ গঠিত হইবে। এই পরিষদে কোন বে-সরকারী ইংরেজ বা ভারতীয় সদস্য ছিল না এবং বড়লাট ইচ্ছা করিলে এই পরিষদের সিদ্ধান্ত নাকচ করিতে পারিতেন।

এই সময়ে উত্তর ভারতে ইংরেজ অধিকৃত সমস্ত প্রদেশই—অর্থাৎ বাঙ্লা, বিহার, উড়িষ্যা, বারাণসী ও ইহার সংলগ্ন অযোধ্যার নিকট হইতে প্রাপ্ত দোয়াব, রোহিলখণ্ড প্রভৃতি, এবং ব্রহ্মযুদ্ধের পর আসাম, আরাকান, টেনা-সেরিম, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি (North-Eastern Frontier Agency) বাংলা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ছিল। ১৮৩৬ সনে বারাণসী ও ইহার পশ্চিমস্থ ভূভাগ একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হইল। প্রথমে ইহার নাম ছিল আগ্রা প্রদেশ এবং পরে ইহার নাম হইল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। ইহা বাংলা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও একজন পৃথক লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর (Lieutenant-Governor) ইহা শাসন করিতেন। গভর্নর জেনারেলই বাংলা প্রেসিডেন্সীর গভর্নরের কার্যও করিতেন। ১৮৩৩ সনের পরে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার শাসন পরিষদের একজন সদস্য ডেপুটি-গভর্নররূপে বাংলা প্রেসিডেন্সি শাসন করিতেন। ১৮৪৩ সন হইতে বাংলা দেশ শাসনের জন্য একটি পৃথক সেক্রেটারিয়েট (Secretariat) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একজন সেক্রেটারি ও দুইজন আণ্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। কিন্তু এ সমুদয় সত্ত্বেও একই ব্যক্তির পক্ষে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও বাংলার গভর্নর এই দুইটি দায়িত্বপূর্ণ পদের কার্যনির্বাহ করা ক্রমশ অসম্ভব হইয়া ওঠে। এইজন্য ১৮৫৩ সনের ১২ই অক্টোবর বিলাতের কর্তৃপক্ষ-কোর্ট অব ডিরেকটরস—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের শাসনের জন্য একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর নিযুক্ত করার অনুমতি দিলেন। তদনুসারে ১৮৫৪ সনের ২৮শে এপ্রিল সার ফ্রেডারিক জেমস্ হ্যালিডে সাহেব (F. J. Halliday) এই পদে নিযুক্ত হইলেন (১৮৫৪)।

ইহা ছাড়াও লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-১৮৫৬) ভারতের আভ্যন্তরিক শাসন পদ্ধতির অনেক সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

এই সময়েই পূর্ত-বিভাগের (Public Works Department বা P. W. D.) সৃষ্টি হইল, এবং বড় বড় খাল ও রাস্তার কাজ আরম্ভ হইল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও এক আনা মাশুলে ভারতের সর্বত্র পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা ডালহৌসীর আমলেই প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত 'এডুকেশন ডেস্‌প্যাচ' বা 'শিক্ষানীতিসম্বন্ধীয় আদেশপত্র' এদেশে পৌঁছিল এবং ডালহৌসী উহা পাইবামাত্র এই নীতি অনুসারে কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি পৃথক একটি শিক্ষা-বিভাগের (Education Department)

সৃষ্টি করিলেন এবং নানা স্থানে স্কুল ও কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার ব্যবস্থার ফলেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ডালহৌসী স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতাও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের অধীনে বাংলা দেশ (১৮৫৪-১৯০৪)

১। বিক্ষোভ ও বিপ্লব

(ক) অসন্তোষ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লব

পলাশির যুদ্ধের ফলে যখন সিরাজউদ্দৌল্লার পরিবর্তে মীরজাফর বাংলার নবাব হইলেন, এবং ইংরেজের ক্ষমতা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন সাধারণ লোক বিশেষ ক্ষুণ্ণ বা বিচলিত হয় নাই ; কারণ এরূপ রাষ্ট্র-বিপ্লবে তাহারা অভ্যস্ত ছিল। মাত্র ১৭ বৎসর পূর্বে নবাব সরফরাজ খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া আলিবর্দি নবাব হইয়াছিলেন, তাঁহার দৌহিত্রকে বধ করিয়া মীরজাফর মসনদে আরোহণ করিলেন, মীরজাফরকে সরাইয়া মীরকাশিম নবাব হইলেন, আবার মীরজাফর নবাব হইলেন। এই সকলই স্বাভাবিক রাজনীতিক পরিবর্তন বলিয়া লোকে গ্রহণ করিল। তাহারা জানিত :—

এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে।
বাংলার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে ॥

মীরজাফরের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার উত্তরাধিকারীরা নামেমাত্র নবাব রহিলেন, প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজের হাতে চলিয়া গেল—তখন বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনে অসন্তোষ জন্মিল। মুসলমান নবাবের অধীনে মুসলমানগণ অনেক উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হইত, তাহাদের মক্তব মসজিদে, রাষ্ট্রের সাহায্য পাইত এবং হিন্দুর তুলনায় তাহাদের সামাজিক ও রাজনীতিক পদমর্যাদা অধিক উন্নত ছিল। ইসলাম ধর্ম ও আইনের প্রতিপত্তি ছিল। ইংরেজের শাসন যতই দৃঢ়তর হইতে লাগিল ততই এসকল সুযোগ ও সুবিধা হ্রাস পাইতে লাগিল। সুতরাং মুসলমানেরা ক্ষুব্ধ হইল।

ঠিক এই সমুদয় কারণেই হিন্দুরা ইংরেজরাজ্য প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। ইংরেজেরা তাহাদের ধর্মে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিত না, হিন্দুর ধর্ম ও আইনের মর্যাদা রাখিত, এবং কোন বিষয়েই মুসলমানকে হিন্দুর অপেক্ষা অধিক সুবিধা ও সম্মান দিত না। কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী ছিল। ইহার উর্বর জমিতে শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং নানাবিধ শিল্প-দ্রব্য ও ব্যবসায়ের দ্বারা বাঙ্গালী হিন্দুরা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে (একাদশ পরিচ্ছেদ—পৃঃ ২২৭-২৪১)।

ইংরেজ বণিক-কোম্পানি যখন বাংলার রাজশক্তি হাতে পাইল তখন কোম্পানি ও তাহার কর্মচারিগণ ব্যক্তিগত ভাবে জোর ব্যবসায় চালাইতে লাগিল। অনেক ব্যবসায় তাহারা একচেটিয়া করিয়া নিল। এদেশীয় বণিকদের উপর শুল্ক বসান হইল কিন্তু ইংরেজ ব্যবসায়ীদের শুল্ক দিতে হইত না। তাহারা রাজশক্তির অপব্যবহার করিয়া তাঁতিদের জোর করিয়া দাদন দিত এবং স্বল্পমূল্যে তাহাদের উৎপন্ন বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিত। এইরূপে নানা অসৎ উপায় অবলম্বন পূর্বক ইংরেজেরা এদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সর্বনাশ করিল। বাংলাদেশে বস্ত্র শিল্প বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল—কিন্তু বিলাতী মিলের কাপড়ের প্রতিযোগিতায় তাহা ধ্বংস হইল। পলাশির যুদ্ধের পর প্রত্যেক নবনিযুক্ত নবাবের নিকট হইতে তাহাকে মসনদ দিবার বিনিময়ে উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারীরা এত উৎকোচ বা উপঢৌকন আদায় করিত যে বাংলার নবাবের অতুল ঐশ্বর্য নিঃশেষিত হইল। যে বাংলা দেশ এতদিন ধন ঐশ্বর্যে ভারতে অতুলনীয় ছিল—এইরূপে সে দেশে অভাব ও দারিদ্র্য দেখা দিল। শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস হওয়ার ফলে অনেকেই কৃষিকার্যে যোগ দিল—ফলে কৃষকদের অবস্থাও খারাপ হইতে লাগিল। নূতন রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থায় সাময়িক ইজারাদারগণ প্রজাগণের নিকট হইতে অল্প-সময়ের মধ্যে যতদূর সম্ভব আদায় করিবার জন্য তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইহার কতকটা উপশম হইল। কিন্তু অনেক জমিদার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রাজস্ব দিতে না পারায় তাহাদের জমিঁদারি নিলাম হইল—নূতন নূতন জমিদার প্রজাদের স্বত্ব নির্ধারণ ও খাজানা সম্বন্ধে যে সব নিয়ম-কানুন ছিল তাহা পালন না করায় কৃষক প্রজাদের দুর্গতির সীমা রহিল না। অবশ্য আদালতে তাহারা নালিশ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ছিল বলিয়া অনেক প্রজাই কোন প্রতীকার পাইত না। ইংরেজেরা বাঙ্গালীদিগকে অসভ্য বর্বর মনে করিত এবং সাধারণ লোকের সহিত কোন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ রক্ষা

করিত না বরং অনেক সময় তাহাদের সহিত অভদ্র ব্যবহার করিত। ইংরেজ মিশনারীগণ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য হিন্দুধর্মের দেবদেবীকে গালাগালি দিত—তাহারা রাজার জাতি, সুতরাং ভয়ে কেহ তাহাদিগের প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইত না।

এই সমুদয় কারণে বাঙ্গালীরা ক্রমে ক্রমে ইংরেজের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। ইংরেজ সরকার যে নূতন শাসন প্রণালী ও নূতন আইনের প্রচলন করিল, বাঙ্গালীরা তাহাতে অভ্যস্ত না থাকায় ইহাও অসন্তোষ ও বিরাগের সৃষ্টি করিল।

কিন্তু বাংলা দেশে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ থাকিলেও জনসাধারণ নূতন রাজ্য শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নাই। তবে বিপ্লব যে একবারে হয় নাই তাহা নহে। কয়েকটি গুরুতর বিপ্লবের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

বাংলায় ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভাগে হেস্টিংসের আমলে 'সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ' ও রংপুরের বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

হেস্টিংসের পরেও এই শ্রেণীর বিপ্লব আরও অনেক হইয়াছে। বিষ্ণুপুর ও বীরভূম অঞ্চলে অসম্ভব খাজনা বৃদ্ধি ও রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাগণের দুর্দশার সীমা ছিল না—দায় ঠেকিয়া অনেকে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল। ১৭৮৪ সনে সৈন্য পাঠাইয়া এই সব ডাকাত দমন করিতে হয়। ইহা সত্ত্বেও ডাকাতেরা সরকারী কোষাগার পুনঃ পুনঃ লুট করে। ১৭৮৮-১৭৮৯ সনে সরকারী পুলিশের ব্যূহ ভেদ করিয়া দলে দলে দস্যুগণ গ্রাম বাজার লুট করে। নিঃস্ব উৎপীড়িত প্রজাগণও তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ইহার ফলে গুরুতর বিপ্লব নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং কিছুদিনের জন্য ইংরেজ শাসনের চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ক্রমে প্রজা ও দস্যুগণের মধ্যে বিরোধ হয় এবং প্রজারা গভর্নমেণ্টের সহায়তা করে। অবশেষে ১৭৯০ সনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। কিন্তু এই বিপ্লবের ফলে প্রায় সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়।

মানভূম জিলায় ও নিকটবর্তী স্থানে চুয়ার জাতি বহুবার বিদ্রোহ করে। বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত রায়পুরের জমিদার দুর্জন সিংহের রাজস্ব যথাকালে জমা না হওয়ায় তাঁহার জমিদারি নিলাম হয়। ইহাতে তাঁহার অনুচর

প্রায় ১৫০০ চুয়ার রায়পুর আক্রমণ করিয়া বাজার ও কাছারি বাড়ী পোড়াইয়া দেয়। ফলে যে ব্যক্তি নিলামে ঐ জমিদারি কিনিয়াছিল সে ইহার দখল নিতে পারিল না। দুর্জন সিংহকে গ্রেপ্তার করা হইল—কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে সাহস করিয়া কেহ সাক্ষী দিতে না আসায় সে খালাস পাইল। অতঃপর দুর্জন সিংহ চুয়ারদের সাহায্যে বাঁকুড়া জিলার বহু পরগণা লুটপাট করিয়া ফিরিতে লাগিল। ১৭৯৯ ও ১৮০০ সনে মেদিনীপুর জিলায় চুয়ারদের বিপ্লব এত গুরুতর ও বিস্তৃত হয় যে বহু সৈন্য পাঠাইতে হয়। স্থানীয় বহু জমিদার এই বিপ্লবের নায়ক ছিলেন এবং তাঁহাদের দমন করিতে গভর্নমেণ্টকে বহু বেগ পাইতে হইয়াছিল।

শ্রীহট্টের দুঃস্থ প্রজাগণ রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদিগকে বাধা দেয় এবং ১৭৮৭ সনে রাধারামের নায়কত্বে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। অনেক গ্রাম লুট ও অনেক লোক হতাহত হয়। রাধারামকে গ্রেপ্তার করার সময় একজন পুলিশ কর্মচারী ও তাহার কুড়ি জন লোক নিহত হয়।

১৭৯৯ সনে আগা মুহম্মদ রেজা শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া কাছার দখল করে এবং ১২০০ অনুচর সহ কোম্পানির একটি থানা আক্রমণ করে। সিপাহীদের সহিত যুদ্ধে তাহার পরাজয় ঘটে। তাহার ৯০ জন অনুচর ও পাঁচটি ছোট কামান ধরা পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে মৈমনসিংহ জিলার শেরপুর সহরে করম শাহ গারো ও হাজং জাতির নায়ক হইয়া সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে 'পাগল' বা 'ভাই সাহেব' নামে এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র টিপু দুঃস্থ উৎপীড়িত প্রজাগণের সাহায্যে লুটপাট করিয়া একটি বড় দল গঠন করেন এবং ঘোষণা করেন যে, জমির খাজনা বিঘা প্রতি এক আনার বেশী কোন প্রজা দিবে না। ১৮২৫ সনের জানুআরি মাসে প্রায় সাত শত অনুচর লইয়া তিনি শেরপুরের জমিদার বাড়ী আক্রমণ ও লুট করেন। জমিদার পলাইয়া যান। টিপু গড়জরিপা নামে এক দুর্গে নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। টিপু শীঘ্রই ধৃত হইলেন কিন্তু গভর্নমেণ্ট পাগলা ফকিরদের বিদ্রোহ সহজে দমন করিতে পারে নাই। বৃহৎ একদল সৈন্য পাঠাইয়া ১৮৩৩ সনে বিদ্রোহীদের দুর্গ ও আশ্রয়স্থানগুলি ধ্বংস করা হয় এবং পাগলা ফকিরদের বিদ্রোহেরও অবসান হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলায় মুসলমানদের দুইটি বিপ্লব জন-

সাধারণের মনে বিশেষ ভীতি ও উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছিল। আরবে আবদুল ওয়াহাব নামক এক ব্যক্তি (১৭০৩-১৭৮৭) মুসলমান ধর্মের সংস্কারের জন্য এক আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায় 'ওয়াহাবি' নামে প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষেও ওয়াহাবি ধর্মমত প্রচারিত হইয়াছিল (১৮২০-৭০) এবং প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। বেরিলি সহর নিবাসী সৈয়দ আহ্‌মদ (১৭৮৬-১৮৩১) ভারতে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু সমগ্র উত্তর ভারতে এই আন্দোলন শক্তিশালী হইবার পূর্বেই বাংলা দেশে দুইজন মুসলমান ইহার অনুরূপ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ধর্ম সংস্কারের জন্য আরম্ভ হইলেও ক্রমে ইহা ইংরেজ রাজ্য ও জমিদারদিগের বিরুদ্ধে প্রজাদিগকে উত্তেজিত করে। ইসলাম ধর্মমতে অ-মুসলমান রাজ্য (দার-উল-হার্ব) মুসলমানদের বাসের অযোগ্য, সুতরাং বিধর্মী ইংরেজকে তাড়াইয়া ভারতে মুসলমান রাজ্য (দার-উল-ইসলাম) পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা এই সমুদয় সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধেও তাহাদের অত্যাচার আরম্ভ হইল। প্রায় একই সময়ে যশোহর ও নদীয়া জিলায় তিতুমির নামে প্রসিদ্ধ মির নসির আলি এবং ফরিদপুর জিলায় শরিয়ৎউল্লা এই আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীর বহু লোক দলে দলে তাঁহাদের সাথে যোগ দেয়।

তিতুমির মক্কায় পূর্বোক্ত সৈয়দ আহ্‌মদের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার বহু অনুচর ছিল, অধিকাংশই তাঁতি ও জোলা সম্প্রদায়ভুক্ত। জমিদার কৃষ্ণ রায় ইহাদের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া তাঁহার রায়তদের মধ্যে যে কেহ ওয়াহাবী আন্দোলনে যোগ দিবে তাহাকে বার্ষিক আড়াই টাকা খাজনা দিতে হইবে এইরূপ আদেশ দেন এবং পুর্ণা নামক গ্রামের অধিবাসীদের নিকট হইতে ইহা আদায় করেন (১৮৩১ সন)। তিতুমির চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নারিকেলবেড়িয়াতে একটি সুদৃঢ় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন এবং পাঁচ শত অনুচরসহ জিহাদ ঘোষণা করিয়া পুর্ণা গ্রাম আক্রমণ করেন। সেখানে তাঁহার অনুচরেরা একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে হত্যা করে, গোহত্যা করিয়া গোরক্ত মন্দিরে ছড়াইয়া দেয়, দোকান-পাট লুট করে, হিন্দুদের উপর নানাবিধ অত্যাচার করে এবং যে সব মুসলমান তাহাদের সম্প্রদায়ে যোগ দেয় নাই তাহাদেরও নানা ভাবে লাঞ্ছনা করে। তাহারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, ব্রিটিশ রাজ্য শেষ হইয়াছে এবং মুসলমান

রাজ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিতুমিরের অনুচরগণ প্রায় বিনা বাধায় নদীয়া, ২৪ পরগণা ও ফরিদপুর জিলায় এইরূপ অত্যাচার করিতে থাকে। একজন ইউরোপীয় সেনানায়ক কলিকাতার মিলিশিয়ার একদল সৈন্য লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, কিন্তু তিতুমিরের সেনানায়ক গোলাম মসুম তাঁহাকে পরাস্ত করেন এবং তাঁহার বহু সৈন্য হত হয়। অবশেষে বহু অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য তিতুমিরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয় (১৮৩১)। নারিকেলবেড়িয়া দুর্গের সম্মুখে তিতুমির বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন এবং তাঁহার ৩৫০ জন অনুচর বন্দী হয়। তাঁহাদের মধ্যে একজনের প্রাণদণ্ড এবং ১৪০ জনের কারাদণ্ড হয়।

শরিয়তুল্লার সম্প্রদায়ের নাম ছিল ফরাজী। ইহার অধিকাংশই ছিল জমিদার কর্তৃক উৎপীড়িত প্রজা এবং বাংলার শিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে বেকার শ্রমিকদল। তাঁহার সম্বন্ধে ১৮৩৭ সনের ২২শে এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রথমে "তিতুমির নামক এজকন বাদশাহি লওনেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়া" কিরূপে প্রথমে "গোবরডাঙ্গা নিবাসী বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ধন প্রাণ আঘাত" ও পরে "আর হিন্দুদিগের জাতি প্রাণ ধ্বংস করণে প্রবর্ত্ত হইলে" কলিকাতা হইতে প্রেরিত "অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্যের" হাতে "এক কালীন নিপাত হইল" তাহার উল্লেখ আছে। ইহার পরের অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:

"ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে সরিতুল্লা নামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২০০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক সরা জারী করিয়া নিজ মতাবলম্বি লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছা খোলা কটি দেশে চর্ম্মের রজ্জু ভৈল করিয়া তৎচতুর্দ্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটী চড়াও হইয়া দেব দেবীর পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই, জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মলকতগঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোরাগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটীতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্মরাশি করিলে একজন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার

দওরায় অর্পিত হইয়াছে।··· আর শ্রুত হওয়া গেল সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট জবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণীচরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার বাটীতে দেবদেবী পূজার আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচার পূর্ব্বক কএক জন জবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয়, দুষ্ট জবনেরা মফঃস্বলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচার-গৃহ আমক্রণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল ফরিদপুরের মাজিস্ট্রেট সাহেবের হজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহারা সকলেই সরিতুল্লা জবনের মতাবলম্বি তাহারদিগের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয় তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ হাজার লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিয়াদী সাক্ষির ক্রটি কি আছে। শুনিয়া পরমা-প্যায়িত হইলাম ফরিদপুরের বর্ত্তমান মাজিস্ট্রেট ধর্ম্মাবতার শ্রীযুত রবার্ট গ্রট সাহেব এমত প্রকার কএক মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়া জবনেরদিগকে শাস্তি দিয়াছেন কিন্তু জবন দল ভঙ্গের কিছু উপায় উদ্যোগ করিয়াছেন কি না শ্রুত হই নাই···। আমি বোধ করি সরিতুল্লা জবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর উত্তর প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার জোটপাটের শত অংশের এক অংশ তিতুমির করিয়া ছিল না। অতএব আমরা শ্রীল শ্রীযুতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও দেশরক্ষার নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তির দল ভঙ্গের বিহিত আজ্ঞা করুন। ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৭ চৈত্র।

জিলা ঢাকা নিবাসি দুঃখি •
তাপিগণস্য।"

এই পত্রখানি হইতে জানা যায় যে ১৮৩৭ সনেও শরিয়তুল্লা জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুহম্মদ মুসিন (১৮১৯-১৮৬০) এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী ও বিধিবদ্ধ ভাবে গঠিত করেন। তিনি দুধু মিয়া নামে পূর্ববঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি বাহাত্বরপুরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পূর্ববঙ্গ কয়েক ভাগে বিভক্ত করেন, এবং প্রতি বিভাগে বা হল্কায় একজন ডেপুটি বা খলিফা নিযুক্ত করেন। তিনি কৃষক সম্প্রদায়কে অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ করেন। কোন রায়ৎ তাঁহার সম্প্রদায়ে যোগ দিতে অনিচ্ছুক হইলে তাঁহাকে একঘরে করা হইত। রায়ৎদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বাধিলে তিনি নিজেই তাহার বিচার করিতেন এবং হিন্দু, মুসলমান খ্রীষ্টান যে কোন রায়ৎ তাহার নিকট অভিযোগ না করিয়া আদালতে নালিশ করিত তাহাদের শাস্তি দিতেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে জমি ভগবানের, সুতরাং জমিদারদের খাজনা আদায় করার কোন অধিকার নাই। বিংশ শতাব্দীর অসহযোগ আন্দোলনের অনেক পূর্বাভাস দুধু মিয়ার আন্দোলনে পাওয়া যায়। জমিদার ও নীলকরেরা তাঁহার এই সমুদয় প্রচারের ফলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহার নামে লুটপাট, অনধিকার প্রবেশ, প্রভৃতি বহু অত্যাচারের জন্য বহুবার আদালতে অভিযোগ করে, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার লোক না থাকায় তিনি প্রতিবারই খালাস পান। অবশেষে ১৮৫৭ সনে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজবন্দীরূপে রাখা হয়। ১৮৬০ সনে বাহাত্বরপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাংলা দেশের এই দুই আন্দোলন এবং ওয়াহাবি আন্দোলনকে অনেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রথম জাতীয় আন্দোলন বলিয়া মনে করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের দিক হইতে ইহা সত্য হইলেও হিন্দু সম্প্রদায় যে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে অন্য চোখে দেখিত, এই পত্রখানি হইতে তাহার সম্যক ধারণা করা যাইবে। পরবর্তী কালে যখন ওয়াহাবি আন্দোলন উত্তর ভারতে প্রবল শক্তিশালী হইয়াছিল তখনও বাংলা দেশের মুসলমানেরা ধন-জনের দ্বারা ইহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু হিন্দুরা ইহাতে যোগ দান করে নাই। সে আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল বাংলা দেশ হইতে বহুদূরে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্য প্রদেশে। সুতরাং বাংলা দেশের ইতিহাসে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক।

(খ) সিপাহী ও জনসাধারণের বিদ্রোহ।

১। ভারতীয় বিদ্রোহের কারণ ও প্রক্রিয়া।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে ডালহৌসীর স্থানে ভাইকাউণ্ট

ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২) বড়লাট হইয়া আসিলেন। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই ভারতের নানা স্থানে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূচনা হইল। প্রায় শত বৎসরকাল বৈদেশিক ইংরেজগণের জবরদস্ত শাসনের ফলে ভারতব্যাপী সর্বসাধারণের মধ্যে এই সময় একটা ঘোর অসন্তোষের এবং নানা আশঙ্কার ভাব বিরাজ করিতেছিল। দেশের রাজারা দেখিতেছিলেন, একটির পর একটি করিয়া দেশীয় রাজ্যগুলি ইংরেজগণ অধিকার করিতেছে; ইহাতে প্রত্যেকেরই আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, এইবার বুঝি তাঁহার নিজের পালা আসিবে। ভারতীয় জনসাধারণ রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ, সামাজিক সংস্কার ও ইংরেজী শিক্ষা, এবং অন্যান্য নূতন বিধানের প্রবর্তনে ভীষণ সন্দিগ্ধ হইয়া ভাবিতেছিল যে, বৃটিশ সরকার সমস্ত ভারতবাসীকে খ্রীষ্টান করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল কার্য করিতেছে। অযোধ্যা ও অন্যান্য রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ঐ সমুদয় প্রদেশের বহু যুদ্ধব্যবসায়ী বেকার হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল লোক দেশের মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বিস্তারের সহায়তা করিতেছিল। এদেশীয় সিপাহীরা নানা অসুবিধা ও অবিচার ভোগ করিয়া বহুদিন হইতেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে সৈন্যদলের মধ্যে এন্‌ফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন সিপাহীদের বিদ্রোহের সাক্ষাৎ কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এই রাইফেলে টোটা ভরিবার পূর্বে তাহার একাংশ দাঁত দিয়া কাটিয়া লইতে হইত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে সৈন্যদলের মধ্যে গুজব রটিয়া গেল যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জাতি নষ্ট করিবার জন্য টোটার মধ্যে শূকর ও গরুর চর্বি মিশ্রিত হইয়াছে। পরবর্তী অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছিল যে, ঐ টোটা তৈয়ারি করিতে সত্যই শূকর অথবা গরুর চর্বি ব্যবহৃত হইত।

চর্বিমিশ্রিত টোটার বিবরণ প্রচারিত হওয়ার পরেই প্রথমে বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ) এবং পরে কলিকাতার নিকটবর্তী বারাকপুরের সৈন্যগণ ঐ টোটা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিল। মঙ্গল পাণ্ডে নামক বারাকপুরের একজন সিপাহী প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইল, এবং একজন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ বাধা দেওয়ায় তাহাকে আক্রমণ করিয়া আহত করিল (২৯শে মার্চ, ১৮৫৭ খ্রীঃ)। এখানকার বিদ্রোহ শীঘ্র দমিত হইলেও ইহা চারিদিকে ছড়াইয়া গেল। ১০ই মে মীরাটের কতক সিপাহী টোটা ব্যবহার

করিতে অস্বীকার করায় কারারুদ্ধ হইল। ইহাতে অন্য সিপাহীরা একযোগে বিদ্রোহী হইয়া কারারুদ্ধ সহকর্মীদের উদ্ধার করিয়া আনিল; সঙ্গে সঙ্গে বহু ইউরোপীয় কর্মচারীকে হত্যা করিয়া এবং তাহাদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিয়া দিল্লী অভিমুখে রওনা হইয়া গেল। সেখানেও সিপাহীরা ইউরোপীয়গণকে হত্যা করিল, এবং তাহাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করিয়া ফেলিল। তাহারা মুঘল সম্রাট্‌-বংশীয় বাহাদুর শাহ্‌কে ভারতের সম্রাট্‌ বলিয়া ঘোষণা করিল।

২। বিদ্রোহের প্রসার ও দমন।

শীঘ্রই অন্যান্য স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহ করিল এবং দিল্লীতে আসিয়া মিলিত হইল। তাহাদের সাফল্যের সংবাদ প্রচারিত হইলে বিদ্রোহ শীঘ্রই উত্তরপ্রদেশ, বুন্দেলখণ্ড ও মধ্য-ভারতের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলী ও ঝান্সী বিদ্রোহের প্রধান প্রধান কেন্দ্রস্থল হইল। আম্বালা হইতে ইংরেজ সৈন্য অগ্রসর হইয়া দিল্লীর উত্তরস্থ পাহাড় অধিকার করিল। পাঞ্জাব হইতে আরও সৈন্য আসিয়া যোগ দেওয়ায় দিল্লী অধিকার করা সম্ভব হইল। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীর কাশ্মীর ফটক বারুদে উড়াইয়া দেওয়া হইল এবং ২০শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ সৈন্য দিল্লী নগর অধিকার করিল। ইংরেজ সেনানায়ক জন নিকলসন্‌ এই যুদ্ধে নিহত হইলেন।

লক্ষ্ণৌর সিপাহীরা ৩০শে মে বিদ্রোহ করিলে চীফ কমিশনার সার্‌ হেন্‌রী লরেন্স ঐ স্থানের সমস্ত ইউরোপীয় অধিবাসীকে লইয়া ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির বাস-ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। একদল সিপাহী ইংরেজদের পক্ষে রহিল; কিন্তু বহু সিপাহী বিদ্রোহী হইয়া এই আবাস-ভবনে ইংরেজদিগকে অবরুদ্ধ করিল। একদিন হঠাৎ গোলার আঘাতে সার্‌ হেন্‌রীর মৃত্যু হইল, কিন্তু ইংরেজগণ বিশ্বস্ত সিপাহীদের সাহায্যে প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে একদল সৈন্য পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইল এবং এলাহাবাদ অধিকার করিল। এই সৈন্যদলের অধ্যক্ষ নীল সাহেব সারাপথে নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করেন। এই সৈন্যদলের এক অংশ কানপুর ও লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করিতে অগ্রসর হয়। হ্যাভ্‌লক্‌ ও আউটরামের নায়কতায় নূতন সৈন্যদল আসিয়া পৌঁছিলে এই

অবরুদ্ধ ইংরেজগণের দুঃখের অবসান হইল (২৫শে সেপ্টেম্বর)। নভেম্বর মাসে সার্ কলিন্ ক্যাম্বেল আসিয়া অবরুদ্ধ ইংরেজগণকে মুক্ত করিলেন এবং তাহারা লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অবশেষে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইলে লক্ষ্ণৌ পুনরধিকৃত হইল।

কানপুরের বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন দ্বিতীয় বাজীরাওর দত্তকপুত্র নানা-সাহেব। তিনি কানপুরের নিকট বিঠুরে বাস করিতেন, এবং নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কানপুরের প্রায় এক হাজার ইংরেজ সৈন্য ও ইংরেজ অধিবাসী একটা কাঁচা দেওয়ালের আড়ালে আশ্রয় লইয়া অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিতেছিল। নানাসাহেব আশ্বাস দিলেন যে, তিনি তাহাদিগকে নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে দিবেন। এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা নদীর ধারে যাইবামাত্র নীল সাহেবের অত্যাচারে উত্তেজিত সিপাহীরা গুলিবর্ষণ করিয়া তাহাদের অধিকাংশকেই হত্যা করিল; যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহারা সকলে বন্দী হইল। বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য কানপুরের নিকট পৌঁছিলে বিদ্রোহীরা দুই শতেরও অধিক বন্দী রমণী ও শিশুকে হত্যা করিয়া নিকটবর্তী একটি কূপে তাহাদের দেহ নিক্ষেপ করে (১৫ই জুলাই)। ১৭ই জুলাই তারিখে হ্যাভ্‌লক্ কানপুর উদ্ধার করিলেন এবং নানাসাহেব ও তাঁহার দলের সহিত মিলিত বিদ্রোহী সেনাগণের নায়ক মারাঠা ব্রাহ্মণ তাঁতিয়া টোপি সরিয়া গেলেন। পরে কানপুর আর একবার বিদ্রোহীদের হস্তগত হয়, এবং সার্ কলিন্ ক্যাম্বেল ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ইহা পুনরুদ্ধার করেন। পরাজিত তাঁতিয়া টোপি পলাইয়া গিয়া ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর সঙ্গে যোগ দিলেন।

রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত বেরিলীর সিপাহীরা মে মাসে বিদ্রোহী হইয়া হেস্টিংসের আমলে রোহিলা যুদ্ধে হত রোহিলা-নায়ক হাফিজ রহমৎ খাঁর পৌত্রকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। এক বৎসর পরে সার্ কলিন ক্যাম্বেল এই নগর পুনরায় অধিকার করেন (মে, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

জুন মাসে ঝান্সী অঞ্চলের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া ইউরোপীয়গণকে হত্যা করিল এবং দিল্লীর দিকে রওনা হইল। লর্ড ডালহৌসী ঝান্সী রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করায় ঝান্সীর ত্রয়োবিংশতিবর্ষ বয়স্কা বিধবা রাণী লক্ষ্মী-বাঈ ইংরেজ সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রথমে বিদ্রোহে

যোগ্য দেন নাই। তবু ইংরেজ সরকার তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি প্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে রাণী লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহীদের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁতিয়া টোপি তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে যত নায়ক দাঁড়াইয়াছিলেন সাহসে ও বীর্যবত্তায় লক্ষ্মীবাঈর সহিত তাঁহাদের একজনেরও তুলনা হইতে পারে না। ইংরেজ সৈন্য ঝান্সী আক্রমণ করিলে তিনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন। কিন্তু ঝান্সী ইংরেজের হস্তগত হইল এবং লক্ষ্মীবাঈ পলাইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি তাঁতিয়া টোপির সহযোগে গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়াকে বিতাড়িত করেন, এবং নানাসাহেব পেশোয়া বলিয়া ঘোষিত হন। কিন্তু অনতিবিলম্বে সার্ হিউ রোজ গোয়ালিয়র পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হন। এই সময় সৈনিক পুরুষের বেশে সজ্জিত হইয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে লক্ষ্মীবাঈ স্বয়ং সৈন্য চালনা করিতে করিতে সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন (১৭ই জুন, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ)। তাহার পরই গোয়ালিয়র পুনরায় অধিকৃত হয়।

সিপাহীদের বিদ্রোহের সফলতায় উৎসাহিত হইয়া বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের সাধারণ জনগণ ও জননায়কেরা, বিশেষত অযোধ্যার তালুকদার ও প্রজারা, বিদ্রোহ করে এবং বহুদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চালায়। ইহাদের কেহ কেহ এই সুযোগে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি করে। আবার কেহ কেহ ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। এই দলের মধ্যে বিহারের আরা জেলার অন্তর্গত জগদীশপুরের তালুকদার কুমার সিংহের (কুনোয়ার সিং নামেও তিনি পরিচিত) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি অসীম সাহসে ও অপূর্ব কৌশলে বহুদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে। ঝান্সীর রাণী ছাড়া বিদ্রোহের কোন যোগ্য নায়ক বা পরিচালক ছিল না। নানাসাহেব কানপুর হইতে নেপালের জঙ্গলে পলাইয়া গেলেন এবং তাঁহার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। তাঁহার সেনাপতি তাঁতিয়া টোপি ঝান্সীর রাণীর মৃত্যুর পরেও বহুদিন অপূর্ব বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে তাঁহারই এক সহচর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ইংরেজের হস্তে ধরাইয়া দিলে তাঁহার ফাঁসি হইল। যে বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে বিদ্রোহীরা দিল্লীতে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল, তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল রেঙ্গুনে নির্বাসিত

অবস্থায় কাটাইলেন। তাঁহার দুই পুত্র এবং এক পৌত্র লেফ্‌টেনাণ্ট হড্‌সন কর্তৃক ধৃত ও নিহত হইলেন।

৩। বিদ্রোহের স্বরূপ

প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যের রাজগণ কেহই বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই। বিদ্রোহ অবসানের পর এজন্য তাঁহারা উপযুক্ত প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। শিখগণ বিদ্রোহে যোগদান করে নাই। পঞ্জাবের শাসনকর্তা সার্ জন্ লরেন্স পঞ্জাব হইতে যে শিখ ও ইংরেজ সৈন্যদল পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদের সাহায্যে দিল্লী অধিকৃত হওয়ায় বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। মোটের উপর এই যুদ্ধ প্রধানত সৈন্যগণের বিদ্রোহ। পরে বর্তমান উত্তরপ্রদেশ এবং ইহার সংলগ্ন পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণস্থ কোন কোন অঞ্চলের জনসাধারণও ইহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। অনেকে মনে করেন ইহা ভারতের প্রথম জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম; কিন্তু ভারতের এক অংশে সীমাবদ্ধ এই সমুদয় খণ্ড খণ্ড বিপ্লবকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া গণ্য করা অনেকে সঙ্গত মনে করেন না। কারণ ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশ, বিশেষত শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিদ্রোহের প্রতি বিশেষ কোন সহানুভূতি দেখায় নাই। বিভিন্ন বিদ্রোহী নায়ক ও সৈন্যদলের মধ্যে একযোগে কার্য করার কোন ব্যবস্থা ছিল না, এবং জাতীয়তা ভাবে প্রণোদিত হইয়া দেশের স্বাধীনতা লাভ করাই যে তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তথাপি ১৮৫৭-৫৮ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কারণ ইহার স্মৃতি পরবর্তী কালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইয়াছিল।

এই বিদ্রোহে সিপাহীরা ও নানাসাহেবের মতো এদেশীয় নায়কগণ যেমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন, বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইংরেজ সৈন্য এবং সেনানায়করাও সেইরূপ পৈশাচিক নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু বিদ্রোহ-সংক্রান্ত সকল বিষয়ের ব্যবস্থায়ই লর্ড ক্যানিং অসাধারণ ধৈর্য ও বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। হীন প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া বিদ্রোহিগণের প্রতি তিনি কঠোর শাস্তিবিধান করেন নাই। কিন্তু ঐ যুগের অদূরদর্শী ইংরেজরা রক্তপাতের বিনিময়ে রক্তপাতের জন্য চীৎকার জুড়িয়া

দিয়াছিল, এবং তাহারা ক্যানিংকে উপহাস করিয়া 'দয়ার অবতার ক্যানিং' (Clemency Canning) এই আখ্যা দিয়াছিল।

৪। বিদ্রোহের ফলাফল

এই বিদ্রোহের ফলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসন-পরিচালনার ক্ষমতা চিরদিনের মত লোপ পাইল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২রা আগস্ট তারিখে বৃটিশ পার্লামেন্টের নূতন এক আইন অনুসারে বৃটিশরাজের হস্তে ভারত-শাসনের সম্পূর্ণ ভার অর্পিত হইল। বোর্ড অব্ কন্‌ট্রোলের প্রেসিডেন্টের স্থানে ভারতবর্ষের জন্য সেক্রেটারী অব্ স্টেট নামে একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন, এবং কোর্ট অব্ ডিরেক্টার্সের স্থান কাউন্সিল্ অব্ ইণ্ডিয়া বা ভারত-পরিষদ্ গ্রহণ করিল। এখন হইতে ভারতের বড়লাটের আখ্যা হইল ভাইস্‌রয় (Viceroy) বা রাজপ্রতিনিধি।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে ভারতশাসন-বিধানের এই সকল গুরুতর পরিবর্তন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাপত্র ভারতীয় জন-সাধারণ ও দেশীয় রাজন্যবর্গের নিকট বিজ্ঞাপিত করে। ইহাতে বলা হয়,—বড়লাট লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন। কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারীদিগকে নিজ নিজ পদে বহাল রাখা হইল। বিভিন্ন রাজ্যের সহিত প্রচলিত সমস্ত সন্ধি বলবৎ রহিল। ইংরেজরাজের যে আর রাজ্য বিস্তৃতির আকাজ্ক্ষা নাই, তাহাও বিশেষভাবে বলা হইল। ভারতীয় প্রজাগণের ধর্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না ; ভারতের প্রাচীন আচার-ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম এবং দেশ-প্রচলিত প্রথাসমূহের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শিত হইবে, এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে অপক্ষপাতে উপযুক্ত ভারতীয়গণকে সরকারী কর্মে নিযুক্ত করা হইবে। বিদ্রোহীরা অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কর্মে পুনরায় রত হইলে তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কেবল যাহারা ইংরেজ নরনারীর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল এবং বিদ্রোহের নায়কতা করিয়াছিল, তাহাদিগকে যথাযোগ্য শাস্তি দিবার ব্যবস্থা হইবে।

৫। সিপাহী বিদ্রোহ ও শিক্ষিত বাঙ্গালী

সিপাহী বিদ্রোহ বাংলা দেশে আরম্ভ হইলেও এখানে খুব বিস্তৃতি লাভ করে নাই। ১৮ই নভেম্বর চট্টগ্রামের একদল সিপাহী বিদ্রোহ করে কিন্তু অন্য একদল সিপাহী কর্তৃক পরাজিত হইয়া তাহারা শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে যায়।

সেখানে পুনরায় পরাজিত হইয়া তাহারা পূর্বদিকে অগ্রসর হয় এবং কাছারবাসী মণিপুরের কয়েকজন বিদ্রোহী নায়ক তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। ব্রিটিশের অনুরোধে মণিপুরের রাজা তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। একদল বিদ্রোহী সৈন্য বন্দী হয় এবং অবশিষ্ট সিপাহীরা পর্বতে ও জঙ্গলে পলাইয়া যায়। ২২শে নভেম্বর ঢাকার একদল সিপাহী বিদ্রোহ করে, কিন্তু পরাজিত হইয়া জলপাইগুড়ি প্রস্থান করে এবং সেখানে ও মাদারিগঞ্জে দুইদল অশ্বারোহী সিপাহী সৈন্য বিদ্রোহ করে। অবশেষে এই সকল দলই পরাজিত হইয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্ধমান বিভাগে ছোট নাগপুরের সীমান্তে প্যাচেতের জমিদার বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় দেয়। ইহা ভিন্ন বাংলাদেশে আর কোন উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ ঘটে নাই।

বাংলাদেশের জনসাধারণ বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি কোন সহানুভূতি দেখায় নাই। তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজও এই বিপ্লব কেবলমাত্র সিপাহীদের বিদ্রোহ বলিয়াই গণ্য করিয়াছে—ইহাকে কোন জাতীয় অভ্যুত্থান বা ইংরেজের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রাম বলিয়া মনে করে নাই। সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী নায়ক কিশোরীচাঁদ মিত্র, ১৮৫৮ সনে অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই লিখিয়াছেন: “এই বিপ্লব মূলতঃ সৈনিকদের বিপ্লব—এক লক্ষ সৈন্যের বিদ্রোহ—ইহার সহিত জনসাধারণের কোন সংশ্রব নাই। যাহারা এই বিদ্রোহীদলে যোগ দিয়াছে তাহাদের সংখ্যা গভর্নমেণ্টের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন লোকের সংখ্যার অনুপাতে অতিশয় নগণ্য। প্রথম দলের সংখ্যা কয়েক সহস্র—দ্বিতীয় দলের সংখ্যা কয়েক কোটি।” বাংলার আর দুইজন মনীষী—শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হরিশচন্দ্র মুখার্জীও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী বাঙ্গালীর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। যাঁহারা সিপাহী বিদ্রোহকে স্বাধীনতার সমর বলিয়া গৌরব বোধ করেন তাঁহাদের অবগতির জন্য ইহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ আবশ্যক। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন সৈনিক বিভাগের কর্মচারী বেরিলীতে বিদ্রোহের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সৈন্যবিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাঁহার পক্ষে প্রকৃত তথ্য জানিবার অনেক সুবিধা ছিল। তিনি বলেন যে বিদ্রোহী সিপাহীদের মধ্যে কোন প্রকার নিয়ম বা শৃঙ্খলা ছিল না। তাহারা দোকান-পাট এবং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের ধন-সম্পত্তি লুঠ করিত। অনেক সিপাহী এই

উপায়ে প্রভূত ধন উপার্জন করিয়া স্বীয় গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। লোকের উপর অকথ্য অত্যাচার ও শারীরিক উৎপীড়ন করিয়া তাহারা টাকা আদায় করিয়াছে। হিন্দুদিগকে গোমাংস এবং মুসলমানদিগকে শূকরের মাংস বলপূর্বক খাওয়াইবার ভয় দেখাইয়া গুপ্ত ধনের সন্ধান বলিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছে। কখনও কখনও ইহার জন্য গৃহস্থকে জ্বলন্ত তৈলপূর্ণ কটাহের উপর বসাইয়াছে। চুরি, ডাকাতি, লুঠ এবং নারীধর্ষণ নিত্যকার্য হইয়া উঠিয়াছিল। বেরিলী সহরে একজন ধনী নর্তকী পান্না সিপাহীদের হস্তে কিরূপ নিগ্রহ ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল তাহা পাঠ করিলেও নিদারুণ মনোকষ্ট হয়। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধও তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। মুসলমানেরা হিন্দুদের গায়ে থুথু দিত এবং প্রকাশ্য দিবালোকে হিন্দুদের গৃহপ্রাঙ্গণে গোরুর হাড় ফেলিত এবং গৃহের প্রাচীরে গোরক্ত ছড়াইত। ইহার ফলে হিন্দু সিপাহীদের সঙ্গে মুসলমান গুণ্ডাদের সংঘর্ষের কয়েকটি ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। মুসলমান কর্তৃক উৎপীড়িত হিন্দুগণ বিদ্রোহের সাফল্যের সম্ভাবনায় ভীত হইয়া প্রতিদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত, ইংরেজ যেন জয়ী হইয়া আবার ফিরিয়া আসে। অনেক মুসলমানও অনুরূপ প্রার্থনা করিত। বহুসংখ্যক লোক মাসিক পাঁচ, ছয় কি সাত টাকা বেতনের লোভে বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিত। বিদ্রোহীরা বেরিলীর বাঙ্গালী অধিবাসীদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিল। বিদ্রোহী সিপাহীরা বহু বাঙ্গালীকে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিত এবং কেবলমাত্র সন্দেহের বশে, কোনরূপ বিচারের ভান না করিয়া সাতজন বাঙ্গালীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিল।

যদুনাথ সর্বাধিকারী নামে একজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী, সিপাহী বিদ্রোহের সময় কাশীতে ছিলেন। তিনি তাঁহার 'তীর্থভ্রমণ' নামক গ্রন্থে কাশীধামে ও অন্যত্র বাঙ্গালী ও অন্যান্য লোকের উপর বিদ্রোহী সিপাহীদের অত্যাচারের অনেক বিবরণ দিয়াছেন।

ঋষি অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ লোক। বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণে তাঁহার অসামান্য অবদান পরে উল্লিখিত হইবে। তিনি বিদ্রোহের সময় মেদিনীপুরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার আত্মজীবন-চরিতে তিনি লিখিয়াছেন যে, 'স্থানীয় সিপাহীদের বিদ্রোহের সম্ভাবনা সমুদয় শহরবাসীর মনে বিষম

আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি নিরাপত্তার জন্য নিজের পরিবারবর্গ কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের অনেক ভদ্রলোক সদাসর্বদাই নৌকা প্রস্তুত রাখিতেন, যাহাতে বিদ্রোহের সূচনা দেখিলেই কলিকাতা পলায়ন করিতে পারেন। একদিন স্কুলের সময় সংবাদ আসিল যে সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছে। অমনি ছাত্রেরা আত্মরক্ষার জন্য টেবিল ও বেঞ্চের তলে লুকাইল। পরে শোনা গেল যে ইহা কোন ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে শোভাযাত্রা মাত্র। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

তখন কলিকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (British Indian Association) ও মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন (Mahammadan Association) এ দুইটিই ছিল হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। সিপাহী বিদ্রোহের প্রারম্ভে এই উভয় প্রতিষ্ঠানই সিপাহী বিদ্রোহের তীব্র নিন্দা করিয়া এই মর্মে মন্তব্য পাশ করিল যে, তাহারা আশা করে যে—বিদ্রোহীরা জনসাধারণের কোন প্রকার সাহায্য বা সহানুভূতি পাইবে না। সে যুগের প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকর' এবং পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সম্বাদ ভাস্কর' বাংলার সমসাময়িক পত্রিকার মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই দুইখানি পত্রিকায় সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যে সমুদয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালী জনসাধারণের মনোভাবই প্রকট হইয়াছিল এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার কবিতায়ও সিপাহী বিদ্রোহের যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন।

১৮৫৭ সনের ২০শে জুন সংবাদ প্রভাকরের সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কয়েকদল অধার্মিক—অবাধ্য—অকৃতজ্ঞ হিতাহিত-বিবেচনা-বিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্মিকতা প্রকাশ পূর্বক রাজবিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্যবাসি শান্তস্বভাব অধন সধন প্রজামাত্রেই দিবারাত্র জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, "এই দণ্ডেই হিন্দুস্থানে পূর্ব্ববৎ শান্তি সংস্থাপিত হউক, রাজ্যের সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ হউক। হে বিঘ্নহর! তুমি সমুদয় বিঘ্ন হর,—সকল উপদ্রব নিবারণ কর······যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত

জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছেন তাহার দিগ্যে দণ্ড দান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন অপরাধ-বৃক্ষের ফলভোগ করুক।"—ইহার কারণ কি তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন-- "এই রাজ্যইতো রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজ্য হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপ স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মান, বিদ্যা এবং ধর্ম্ম, কর্ম্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখি হইয়াছি ; কোন বিষয়েই ক্লেশের লেশমাত্র জানিতে পারি না, জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত ও পালিত হইয়া যদ্রূপ উৎসাহে ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্তঃকরণকে কৃতার্থ করেন, আমরাও অবিকল সেইরূপে পৃথিবীশ্বরী ইংলণ্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্ব্বমতে চরিতার্থ হইতেছি।· ··· যবনাধিকারে আমরা ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই নাই, সর্ব্বদাই অত্যাচার ঘটনা হইত। মহরমের সময়ে সকল হিন্দুকে গলায় "বদি" অর্থাৎ যাবনিক ধর্ম্মসূচক একটা সূত্র বান্ধিয়া দর্গায় যাইতে হইত, গমি অর্থাৎ নীরব থাকিয়া "হাঁসন" "হোঁসেনের" মৃত্যু জন্য শোকচিহ্ন প্রকাশ করিতে হইত। কাছা খুলিয়া কুর্নিস করিয়া "মোর্চ্চে" নামক গান করিতে হইত। তাহা না করিলে শোণিতের সমুদ্র প্রবাহিত হইত। এইক্ষণে ইংরাজাধিকারে সেই মনস্তাপ একেকালেই নিবারিত হইয়াছে, আমরা অনায়াসেই "চর্চ্চ" নামক খ্রীষ্টিয় ভজনামন্দিরের সম্মুখেই গভীরস্বরে ঢাক, ঢোল, কাড়া, তাসা, নহবৎ, সানাই, তুরী, ভেরী, বাদ্য করিতেছি ; "ছ্যাড্যাং" শব্দে বলিদান করিতেছি, নৃত্য করিতেছি, গান করিতেছি, প্রজাপালক রাজা তাহাতে বিরক্ত মাত্র না হইয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। এই কল্পে ছোটবড় সকলকে সমভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিতেছেন।" এই সঙ্গে সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটি সুদীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। ইহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

জয় জয় জগদীশ, জগতের সার।
লহ লহ লহ নাথ, প্রণাম আমার॥
করি এই নিবেদন, দীন দয়াময়।
বাঞ্ছাফল পূর্ণ কর, হয়ে বাঞ্ছাময়॥
চিরকাল হয় যেন, ব্রিটিশের জয়।
ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী, স্থির যেন রয়॥
... ...

বিদ্রোহি সেফাইগণ, করি নিবেদন।
ছাড় দ্বেষ রণবেশ, কর সম্বরণ॥
... ...
কার কথা শুনে সবে, সেজেছ সমরে ?।
পিপীড়ার পাখা উঠে, মরিবার তরে॥
এখনই ছেড়ে দেও, মিছে ছেলেখেলা।
আকাশের উপরেতে, কেন মারো ঢেলা॥

সম্বাদ ভাস্কর ঠিক ঐ তারিখেই লিখিয়াছে "হে পাঠক সকল, উর্দ্ধবাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য কর...... আমার দিগের প্রধান সেনাপতি মহাশয় সসজ্জ হইয়া দিল্লী প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন, শত্রুদিগের মোর্চ্চা সিবিরাদি ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছেন, তাহারা বাহিরে যুদ্ধে আসিয়াছিল আমার দিগের তোপমুখে অসংখ্য লোক নিহত হইয়াছে, রাজসৈন্যেরা নূন্যাধিক ৪০ তোপ এবং সিবিরাদি কাড়িয়া লইয়াছেন, হতাবশিষ্ট পাপিষ্ঠেরা দুর্গ প্রবিষ্ট হইয়া কপাট রুদ্ধ করিয়াছে, আমার দিগের সৈন্যেরা দিল্লীর প্রাচীরে উঠিয়া নৃত্য করিতেছে .... ব্রিটিসাধিকৃত ভারতবর্ষবাসি প্রজাসকল নির্ভয় হও 'ছেল্যেধরা' একটা কথামাত্র শুনিয়াছিলে, সিপাহি ধরা প্রত্যক্ষ কর, গত বুধবারে গঙ্গাতীরে বহুলোক দণ্ডায়মান ছিলেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন হাতে হাতকড়ী, পায়ে বেড়ী, পাঁচশত সিপাহী ধৃত হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতাবাসিদিগের আর ভয় নাই......যে সকল বিদ্রোহিরা দিল্লী প্রদেশে শিবির স্থাপন করিয়াছিল তাহারা দুইবার বাহির হইয়া গাজীউদ্দীন স্থানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, রাজসৈন্যেরা তাহারদিগকে কচুকাটা করিয়াছে, অবশিষ্টেরা রণে হারিয়া পলায়ন-পর হইয়াছে।"

কলিকাতার "সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা" ২৬শে মে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে এক প্রকাশ্য সভা করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতি ছিলেন এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ, হরেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সিপাহীদিগের নিন্দা ও গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি সূচক কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংবাদ প্রভাকরে এই সভার বিবরণ ও প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হয়।

বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে এই প্রকার মনোভাব কেবল বাঙ্গালীদের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান নায়ক বলিয়া যাঁহারা বর্তমান যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন সেই বাহাদুর শাহ, নানাসাহেব, এবং ঝান্সীর রাণী প্রভৃতি বিদ্রোহী সিপাহীদের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

বিংশ শতাব্দীতে রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে সিপাহী বিদ্রোহ সর্ব প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সমসাময়িক বাঙ্গালীরা ইহাকে কি চোখে দেখিত এবং ইহার তথাকথিত অন্য দেশীয় অনেক নায়কেরাও যে এই বিদ্রোহকে ঐরূপ কোন সম্মান দেন নাই পূর্বোল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইবে। সুতরাং অন্ততঃ বাংলাদেশের ইতিহাসে সিপাহী-বিদ্রোহের বিস্তৃত বর্ণনা অনাবশ্যক। অতএব খুব সংক্ষেপে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, বেরিলী, ঝান্সী প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান কেন্দ্রের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল।

(গ) নীল চাষীর বিদ্রোহ

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশের নীল-চাষীরা এক অভূতপূর্ব উপায়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও বিপ্লব ঘটায়। ইহার বিস্তার সীমাবদ্ধ এবং ইহা স্বল্পকাল স্থায়ী হইলেও নানা কারণে ইহা বাংলার তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। কারণ অর্ধশতাব্দী পরে মহাত্মা গান্ধী রাজনীতির ক্ষেত্রে যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন নীলচাষীদের বিদ্রোহে তাহার পূর্বাভাষ পাওয়া যায়।

ইংরেজেরা জাত-ব্যবসায়ী। বাংলায় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কিরূপে তাহার সাহায্যে বাংলার শ্রমশিল্পের ও বাণিজ্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল তাহা অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই বণিক-বুদ্ধি কৃষির ক্ষেত্রেও মহান অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাংলার উর্বর ভূমিতে সুলভ চাষী ও মজুরীর সাহায্যে খাদ্য-ফসলের পরিবর্তে বাণিজ্য-ফসল উৎপাদন করিলে বিপুল লাভের সম্ভাবনা তাহাদিগকে এ বিষয়ে আকৃষ্ট করে এবং ইহা হইতেই নীল চাষের সূত্রপাত হয়।

যতদূর জানা যায়, ১৭৭২ সনে প্রথমে চন্দননগরের কাছে গোঁদলপাড়া গ্রামে একজন ফরাসী প্রথমে নীল চাষ আরম্ভ করেন। ক্রমে ইংরেজ কোম্পানি ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা নানা স্থানে নীলকুঠী স্থাপন করেন —এবং বাংলাদেশে নীলের চাষ খুব বাড়িতে থাকে। কারণ যে দামে

এই ব্যবসায়ীরা এ দেশে নীল উৎপন্ন করাইতেন বা ক্রয় করিতেন লণ্ডনের বাজারে তাহার তিন চারিগুণ মূল্যে ইহা বিক্রয় হইত। ১৮১৯-২০ হইতে ১৮২৬-২৭ সনের মধ্যে প্রতি বৎসরে কোম্পানি প্রায় ১০।১২ লক্ষ টাকা লাভ করিতেন। সুতরাং বাংলার বহু স্থানে বিশেষতঃ নদীয়া, যশোহর, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, হাওড়া, হুগলী জিলায় নীলচাষ আরম্ভ হয়।

কিন্তু এই নীল চাষ উপলক্ষে নীলকর সাহেবেরা বাংলার কৃষকদের উপর যে অত্যাচার করেন, জমিদার, পত্তনীদার এবং ইজারাদার প্রভৃতির অত্যাচারও তাহার তুলনায় অনেক কম। এই অত্যাচারের যে সমুদয় কাহিনী সমসাময়িক পত্রিকা ও বিশ্বাসযোগ্য সরকারী তদন্তের রিপোর্ট হইতে জানা যায় তাহা একমাত্র নিগ্রোদাসদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বর্বর অমানুষিক অত্যাচারের সঙ্গে তুলনীয়। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ ইহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং মন্তব্য করিয়াছেন "উনিশ শতকের বাংলা ও ইংরেজী সাময়িকপত্রে নীলকরদের দৌরাত্ম্য ও দুর্বিনীত আচরণের কাহিনী এত প্রকাশিত হয়েছে যে শুধু বাংলা পত্রিকার রচনাগুলি সংকলন করলে একটি হাজার পৃষ্ঠার বড় বই হতে পারে।" প্রধানতঃ বিশ্বস্ত প্রমাণ ও সরকারী রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

দুইটি বিভিন্ন প্রণালীতে এই নীল চাষের কার্য চলে। নিজ-আবাদী প্রথায় নীলকর সাহেবেরা নিজেদের জমিতে নিজেদের খরচায় ও নিজেদের তত্ত্বাবধানে নীলচাষ করাইতেন। রায়তী-প্রথায় নীলকরেরা চাষীদের চুক্তিতে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের দ্বারা তাহাদের জমিতে নীল চাষ করাইতেন। চুক্তি অনুসারে চাষীকে দাদন অর্থাৎ অগ্রিম কিছু টাকা দেওয়া হইত এবং উৎপন্ন নীলের দাম চাষী কি হারে পাইবে তাহারও উল্লেখ থাকিত। এই চুক্তির শর্তগুলি প্রজাদের বিশেষ অনিষ্টকর হইলেও নীলকর সাহেবেরা পাইক বরকন্দাজের সহায়তায় চাষীদিগকে জোর করিয়া এই শর্ত অনুসারে নীল চাষ করিতে বাধ্য করিতেন। এই চুক্তি দ্বারা চাষী কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইত সরকারী নথিপত্র ও অন্যান্য বিশ্বস্ত প্রমাণ হইতে তাহার স্পষ্ট ধারণা করা যায়।

চাষীদিগকে যে হারে নীলের মূল্য দেওয়া হইত তাহা বাজারদর অপেক্ষা অনেক কম। সরকারী তদন্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে

যখন বাজারে নীলের দাম প্রতিমণ দশ হইতে ত্রিশ টাকা তখন চুক্তি অনুসারে চাষী পাইত মাত্র চারি টাকা। ইহা হইতে আবার বীজের দাম, চুক্তিপত্রের ষ্ট্যাম্পের মূল্য এবং নীল আনিবার গাড়ীভাড়া বাবদ অনেক টাকা কাটিয়া রাখা হইত এবং নীলকুঠীর নায়েব গোমস্তা পাইক প্রভৃতি চাষীদের নিকট হইতে তহুরী অর্থাৎ বক্‌সিস আদায় করিত; চাষীদের নীল ওজন করার সময় মাপের গোলমাল করিয়া তাহাদের ঠকান হইত—আর চুক্তিতে যে পরিমাণ জমিতে নীল চাষ করিবার কথা, অন্যায় রকমে মাপ করিয়া তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী জমিতে নীল চাষ করিতে হইত। চাষীদের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষ করিতে হইত। যে সকল ফসলে বেশী লাভ, জমিতে সেই সব ফসলের চাষ করিলে তাহা লাঙ্গল চষিয়া নষ্ট করিয়া পুনরায় নীল চাষ করিতে হইত। ফলে দাদনের সামান্য টাকা ছাড়া নীল-চাষীরা আর কিছুই পাইত না—অনেক সময় ঘরের কড়ি দিয়া গোমস্তা পাইকের ঘুষ জোগাইতে হইত, নচেৎ তাহাদের হাতে বহু লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। একজন সাহেবের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ১৮৫৮-৫৯ সনে বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির ৩৩,২০০ চাষীদের মধ্যে মাত্র ২,৪৪৮ জন, উৎপন্ন নীলের বাবদ দাদন ছাড়া সামান্য কিছু নগদ টাকা পাইয়াছিল।

চুক্তির শর্ত অনুসারে উৎপন্ন নীলের মূল্য হইতে দাদনের টাকা কাটিয়া রাখা হইবে। যে সকল চাষীদের উৎপন্ন নীলের মূল্য হইতে দাদনের টাকা শোধ হইবে না চুক্তির শর্ত অনুসারে ভবিষ্যতে অর্থাৎ আগামী প্রতি বৎসর নীল চাষ করিয়া সেই বকেয়া টাকা শোধ দিতে হইবে। ইহার ফলে একবার যে চাষী নীলের বাবদ দাদন লইয়াছে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে তাহাকে তাহার সর্বোৎকৃষ্ট জমিতে নীলচাষ করিতে হইত এবং বাজার দরের অর্ধেক বা তিন ভাগেরও কম মূল্যে তাহা নীলকরের নিকট বিক্রয় করিতে হইত।

এই সব সত্ত্বেও চাষীদের নীল চাষ করিতে হইত। কারণ তাহা না করিলে নীলকর সাহেবেরা তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। একদল লাঠিয়াল ও নিজেদের পাইক বরকন্দাজসহ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নীল চাষে অনিচ্ছুক চাষীদের ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া দিত, গরু বাছুর কাড়িয়া নিত, জোয়ান পুরুষদের ধরিয়া নিয়া নীল কুঠিতে অন্ধকার কক্ষে মাসের পর মাস

আটক করিয়া রাখিত ও বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিত এবং আরও নানাপ্রকার শারীরিক দণ্ড দিত ; চাষী মেয়েদের উপরও অত্যাচার করিত। আমেরিকায় নিগ্রো দাসদের যে লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন সর্বজনবিদিত, বাংলার নীল চাষীদের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিত। মফঃস্বলে—শহর, কাছারী, থানা হইতে বহুদূরে—সাহেবদের এই অত্যাচারে বাধা দিবার বা কোন প্রকার প্রতীকার লাভ করিবার উপায় চাষীদের হাতে ছিল না। অবশ্য কয়েকজন বাঙ্গালী নীল-চাষীদের উপর এই অমানুষিক অত্যাচারের কথা সর্বসাধারণের ও গভর্নমেণ্টের কর্ণগোচর করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ ও অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইত না। যে সব ইংরেজ কর্মচারী ঘটনাস্থলে তদন্তে যাইতেন তাঁহারা 'জাতভাই' নীলকরদের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়াই তদনুযায়ী রিপোর্ট দিতেন। অবশ্য কচিৎ কদাচিৎ দুই একজন নিরপেক্ষ কর্মচারীও তদন্ত করিতেন এবং প্রধানতঃ তাহাদের রিপোর্ট হইতেই আমরা এই অত্যাচারের বিবরণ জানিতে পারি।

দুইটি কারণে এই অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া যায় ও বিনা বাধায় চলিতে থাকে। প্রথমতঃ, অনেকস্থলে জমিদার তাঁহার রায়ৎ নীল-চাষীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। এই জন্য নীলকরেরা নানা উপায়ে ঐ সকল জমির জমিদারি স্বত্ব ক্রয় করে। দ্বিতীয়তঃ, গভর্নমেণ্ট অনেক সময় এই সমুদয় নীলকর সাহেবদিগকেই অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট করিতেন সুতরাং নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ হইলে অপর এক অত্যাচারী নীলকরই তাহার বিচার করিতেন।

নীলকরদের নিষ্ঠুর অত্যাচার কিরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার বহু সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। মিষ্টার টাওয়ার (E. W. L. Tower) নামক একজন ম্যাজিস্ট্রেট সরকারী নীল-তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন : "আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি কয়েকজন রায়ৎকে বর্শা দ্বারা বিদ্ধ করা হইয়াছে। অন্য কয়েকজনকে গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। আর কয়েকজনকে প্রথমে বর্শায় বিদ্ধ করিয়া পরে গুম করা হইয়াছে।"

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় নীলকরদের অনেক অত্যাচারের বিবৃতি প্রকাশিত হয়। সিরাজগঞ্জ মহকুমার এক নীলকর একশত লাঠিয়াল লইয়া গাবগাছি গ্রামে যান। সেখানকার লোকেরা নীল চাষ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহাদের শায়েস্তা করিবার আদেশ দিয়া সাহেব চলিয়া আসেন। লাঠিয়ালেরা বাড়ীঘর পোড়ায়, ১০০ গরু বাছুর নিয়া যায় এবং গ্রামবাসী-দিগকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে—ফলে একজন নিহত হয় ও দুইজন গুরুতর আঘাত পায়। ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল কিন্তু সাহেবের কিছুই হইল না, কেবল তিনজন লাঠিয়ালের সামান্য দণ্ড হইল। কৃষ্ণনগর হইতে ছয় মাইল দূরে এক নীলকুঠিতে রায়ৎ-দিগকে আটক করিয়া বেত্রাঘাত করা হইত তাহার বিবরণও হিন্দু পেট্রিয়টে আছে। এইরূপ ছয় জন কয়েদীর মধ্যে পাঁচজনকে ত্রিশ করিয়া ও একজনকে ষাট বেত্রাঘাত করা হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্র 'নীল-দর্পণ' নামক নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের যে চিত্র আঁকিয়াছেন রঙ্গমঞ্চে তাহা দেখিয়া লোকে এত উত্তেজিত হইত যে স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নীলকরের ভূমিকায় যে অভিনয় করিতেছিল তাহাকে উদ্দেশ করিয়া পায়ের চটি জুতা ছুঁড়িয়া মারিয়া-ছিলেন। এই গ্রন্থের একখানি ইংরেজী অনুবাদ মিশনারি লং সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হওয়ায় নীলকর সাহেবেরা ও অন্যান্য ইংরেজেরা বিষম ক্রুদ্ধ হন এবং আদালতে মোকদ্দমা করেন। ইহাতে লং সাহেবের এক হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাস কারাদণ্ড হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই জরিমানার টাকা আদালতে দাখিল করেন।

বাংলার নীল-চাষীগণ অর্ধশতাব্দী কাল নীলকরদের অত্যাচার সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ১৮৫৯-৬০ সনে তাহারা বিদ্রোহ করিল। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী যেরূপ অসহযোগ আন্দোলন করেন, বাংলার নীল চাষীদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) তাহার পূর্বাভাস বলা যাইতে পারে। যশোহর জিলার চৌগাছা গ্রামের বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা প্রথমে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন কিন্তু নীলকরগণের অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া প্রজাগণকে ইহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করিলেন। প্রথমে তাহাদের গ্রামের প্রজারা দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে তাহাদের গৃহ, সম্পত্তি এমন কি প্রাণ গেলেও তাহারা আর নীল চাষ করিবে না। তাহার পর আর একটি গ্রামের লোক

ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিল। নীলকর সাহেব হাজার লাঠিয়াল লইয়া ঐ গ্রাম আক্রমণ করিল। রায়তেরাও লাঠিয়াল নিযুক্ত করিয়াছিল কিন্তু তাহারা সংখ্যায় কম ছিল সুতরাং হারিয়া গেল। নীলকরেরা গ্রাম লুঠ করিল ও গ্রাম জ্বালাইয়া দিল। একজন গ্রামবাসী নিহত হইল। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরদের বিরুদ্ধে প্রজাদের পক্ষ লওয়ায় তাহাকে বদলি করা হইল। নীলকররা চুক্তি ভঙ্গ করায় রায়তদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইল। বিষ্ণু ও দিগম্বর এই খেসারতের টাকা দিল, রায়তদের স্ত্রী ও শিশুদের রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিল। ইহার ফলে আরও বহু গ্রামের চাষীরা নীলচাষের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে যোগ দিল। শিশিরকুমার ঘোষ নদীয়া জিলার ৯২টি গ্রামের প্রতিনিধিদের এক সম্মিলনের ব্যবস্থা করিলেন—ইহারা নীল চাষ করিবে না এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। নীলকরেরা রাজ-কর্মচারীদের সহায়তায় নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিল কিন্তু রায়তেরা প্রতিজ্ঞায় অটল রহিল এবং ক্রমে ক্রমে বিশ লক্ষ লোক এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। নীলকরদের সংঘ (Planters' Association) গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন করায় ১৮৬০ সনের ৩১শে মার্চ এক নূতন আইন পাশ করা হইল। প্রজারা শর্তের চুক্তি ভঙ্গ করিলে সরাসরি বিচারের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রায়তদের অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণ করার জন্য একটি তদন্ত কমিশন স্থাপনেরও ব্যবস্থা হইল।

এই নূতন আইন পাশ হওয়ায় রায়তেরা নীল চাষ করার বিরুদ্ধে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল এবং লাঠিয়াল সহ কয়েকটি নীলকুঠি আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিল। পাবনা জিলায় মিলিটারী পুলিশ সহ একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে হটাইয়া দিল। ১৮৬০ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বর লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর স্যার পিটার গ্রান্ট একটি মন্তব্যে (Minute) লিখিয়াছেন : "আমি জলপথে ষ্টীমারে কুমার ও কালীগঙ্গা নদী দিয়া নদীয়া, যশোহর ও পাবনা জিলার মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম—পথে নদীর দুই ধারে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৬০।৭০ মাইল রায়তেরা কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, তাহাদের যেন আর নীল চাষ করিতে বাধ্য করা না হয়। তাহাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক ও শিশুও ছিল। এই সকল লোকেরা দুই ধারের বহু দূর দূরান্তরের গ্রাম হইতে আসিয়াছিল।"

স্যার পিটার গ্রান্ট এই দৃশ্যে খুব বিচলিত হইয়াছিলেন। ইহার

অনতিকাল পরেই গভর্নমেণ্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে রায়ৎদিগকে জানান হয় যে, ভবিষ্যতে এমন ব্যবস্থা করা হইবে যাহাতে তাহারা ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীল চাষ করিতে বাধ্য না হয়।

কিন্তু চাষীদের প্রতিজ্ঞা অটল রহিল এবং উভয় পক্ষেই দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতে লাগিল। এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা করিয়া হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় ১৮৬০ সনের ১৯শে মে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়:

"এই বিদ্রোহে রায়তেরা অসীম কষ্ট সহ্য করিয়াছে। তাঁহারা প্রহৃত, কারারুদ্ধ, অপমানিত, গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে—তাহাদের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, অনেকদিন অনশনে কাটিয়াছে—কল্পনায় যত রকম অত্যাচার সম্ভব তাহা তাহাদের কপালে ঘটিয়াছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালান হইয়াছে, পুরুষদের ধরিয়া নিয়াছে, স্ত্রীলোকদের চরম লাঞ্ছনা করিয়াছে, ঘরের সঞ্চিত শস্য নষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু প্রজারা ইহাতেও দমে নাই—যে স্বাধীনতায় তাহাদের ধর্মত, আইনত ও জন্মগত অধিকার আছে তাহার লাভের জন্য আন্দোলন হইতে তাহারা বিরত হয় নাই।"

১৮৬১ সনে হরিশচন্দ্র মুখার্জীর মৃত্যু হইলে নিম্নলিখিত ছড়াটিতে বাঙ্গালীর সমবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"নীল বানরে সোণার বাংলা করলো এবার ছারেখার
অসময়ে হরিশ ম'ল, লঙের হল কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।"

ওদিকে নীল তদন্ত কমিশন ১৮৬০ সনের ২৭শে অগষ্ট তাহাদের রিপোর্ট পেশ করিলেন। ইহাতে রায়তদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার যাহাতে বন্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু নীলকরদের চুক্তি করিবার অধিকার এবং রায়তেরা ইহার শর্ত ভঙ্গ করিলে শাস্তির ব্যবস্থা অনুমোদন করা হইল। এই মর্মে একটি আইনও প্রস্তাবিত হইল—বিলাতের কর্তৃপক্ষ ইহা নাকচ করিয়া দিলেন। কিন্তু গভর্নমেণ্টের চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলায় নীল চাষ ক্রমে ক্রমে খুব কমিয়া গেল। সংঘবদ্ধ রায়তদেরই জয় হইল। ১৮৬৮ সনে নীলচুক্তি আইন রদ করা হইল। তারপর ১৮৯২ সনে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নীল ও অন্যান্য রং প্রস্তুত হওয়ার ফলে বাংলায় নীল চাষ প্রায় বন্ধ হইয়া গেল।

(ঘ) টালার হাঙ্গামা

নীল চাষীদের বিদ্রোহ ছাড়া সিপাহী বিদ্রোহের পর উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে গুরুতর কোন বিক্ষোভ বা বিপ্লব ঘটে নাই। ছোটখাট দাঙ্গা হাঙ্গামা অবশ্য ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, কলিকাতায় ও নিকটবর্তী টালায় মুসলমানদের হাঙ্গামা। মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া ডিগ্রী জারি করিবার জন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কর্মচারী টালায় একখণ্ড জমি দখল করিতে গেলে স্থানীয় মুসলমানেরা বাধা দেয়। তাহারা বলে যে এই জমির উপর যে ছোট একখানি চালাঘর আছে তাহা মসজিদ রূপে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহাদের ধর্মের অপমান হয়। ১৮৯৭ সনের ৩০শে জুন এই দখল নিবার সময় বহু সংখ্যক নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ,ঐ স্থানে সমবেত হইলে পুলিশ ও একদল ইংরেজ সৈন্য তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কিন্তু তাহাদের একদল নিকটবর্তী জলের কলের পাম্প ও চৌবাচ্চা আক্রমণ করে -পুলিশ যাইয়া ইহা রক্ষা করে। রাত্রিতে কলিকাতার হ্যারিসন রোডে একদল মুসলমান হাঙ্গামা করে এবং তাহাদিগের উপর গুলি চালাইতে হয়। ১লা জুলাই সকালেও পুলিশের ডেপুটি কমিশনার হাঙ্গামাকারীদের উপর গুলি চালাইতে বাধ্য হন। অতঃপর হাঙ্গামা থামিয়া যায়। এই দুই দিনে হাঙ্গামাকারীদের এগার জন নিহত ও প্রায় কুড়িজন আহত হয়। পুলিশ দলের ৩৪ জন আহত হইয়া হাসপাতালে যাইতে বাধ্য হয়। এই হাঙ্গামায় কলিকাতায় খুব ভীতির সঞ্চার হয় এবং ৩০শে জুন রাত্রে Calcutta Volunteer Light Horse শহরের নানা স্থানে পাহারা দেয়। হাঙ্গামা শেষ হইবার পর কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ক্ষুদ্র এক পুস্তিকার সাহায্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, যে কুঁড়ে ঘরখানি ভাঙ্গা লইয়া গোলমাল আরম্ভ হয় তাহা কোন কালেই মসজিদ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। হাঙ্গামাকারীদের ৮৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ৮১ জনের শাস্তি হয়।

২। যুদ্ধ ও রাজ্য বিস্তার

যদিও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রে বলা হইয়াছিল যে, ভারতে ইংরেজের আর রাজ্য বিস্তৃতির আকাঙ্ক্ষা নাই, তথাপি সিপাহী

বিদ্রোহের পরেও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার একেবারে বন্ধ হয় নাই।

(ক) দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ ও সীমান্ত অভিযান

ইংরেজদের সহিত আফগানিস্থানের আমীরের প্রথম যুদ্ধের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই যুদ্ধে প্রথমে কিছু সফলতা লাভ করিলেও পরিণামে ইংরেজ সৈন্যের বিপুল ক্ষতি ও চরম দুর্দশা হয় এবং পরাজিত ও বন্দী আমীর দোস্ত মুহম্মদ পুনরায় কাবুলের সিংহাসন অধিকার করেন (১৮৪২ খ্রীঃ)।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দোস্ত্‌ মুহম্মদের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসনের দাবি লইয়া যুদ্ধ হয়। ইঁহারা ইংরেজ গভর্নমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন ; কিন্তু বড়লাট সার্‌ জন্‌ লরেন্স (১৮৬৪-১৮৬৯) কাহাকেও সাহায্য করেন নাই। অবশেষে দোস্ত্‌ মুহম্মদের তৃতীয় পুত্র শের আলি প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে হারাইয়া সমগ্র কাবুলের অধিপতি হন (১৮৬৮)। তিনি রাশিয়ার আক্রমণ হইতে আফগানিস্থান রক্ষার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করেন, কিন্তু ইংরেজ সরকার ইহা প্রত্যাখ্যান করে। তখন বাধ্য হইয়া শের আলি রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। একদিকে মধ্য-এশিয়ায় রাশিয়ার রাজশক্তির দ্রুত প্রসার এবং অপর দিকে আফগানিস্থান ও রাশিয়ার মিত্রতা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলকর নহে, এই ধারণায় বিলাতের কর্তৃপক্ষের সহিত একমত হইয়া বড়লাট লর্ড লিটন (১৮৭৬-১৮৮০) প্রথম হইতেই আফগানিস্থানের দিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। তিনি খেলাতের খাঁর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সামরিক হিসাবে বিশেষ মূল্যবান কোয়েটা নামক স্থান অধিকার করিলেন (১৮৭৬)। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শের আলি রাশিয়ার রাজদূতকে অভ্যর্থনা করিয়া এবং ভারতের বড়লাট কর্তৃক প্রেরিত দূতকে প্রত্যাখ্যান করিয়া রাশিয়ার প্রতি তাঁহার মিত্রতার প্রকাশ্য প্রমাণ দিলেন। ইহার ফলে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল, এবং তিন দল বৃটিশ সৈন্য তিন দিক হইতে ঐ দেশের দিকে অগ্রসর হইল। শের আলি রাশিয়ায় পলাইয়া গেলেন এবং সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হইল। শের আলির পুত্র ইয়াকুব খাঁ বৃটিশের সহিত সন্ধি করিয়া যুদ্ধ শেষ করিলেন। গণ্ডামুকের এই সন্ধির শর্ত অনুসারে কাবুলে যাইবার গিরিসঙ্কটগুলি বৃটিশের অধিকারে

আসিল, এবং স্থির হইল যে, আফগানিস্থানের বৈদেশিক নীতি কাবুলে অবস্থিত ইংরেজ রাজপ্রতিনিধির পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হইবে (১৮৭৯)। এই বন্দোবস্ত অনুসারে ঐ বৎসর জুলাই মাসে সার্ লুই ক্যাভেক্‌নরী কাবুলে বৃটিশ প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইলে অনতিবিলম্বেই তিনি নিহত হইলেন। এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য লর্ড লিটন সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং কাবুল ও কান্দাহার বৃটিশ সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হইল। এই সময়ে বিলাতে গ্লাড্‌স্টোন প্রধান মন্ত্রী হইয়া আফগান নীতি উল্টাইয়া দিলেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া লর্ড লিটন পদত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার স্থানে লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪) বড়লাট হইয়া আসিলেন। কিন্তু তখনই মাইবান্দ নামক স্থানে শের আলির পুত্র আয়ুব খাঁ ইংরেজ সৈন্যকে পরাজিত করিলেন। ইহার ফলে ইংরেজ সৈন্য কান্দাহারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলে (জুলাই, ১৮৮০) সেনাপতি রবার্টস্ কাবুল হইতে কান্দাহারে আসিয়া দুঃস্থ সৈন্যদলকে উদ্ধার করিলেন। অবশেষে শের আলির ভ্রাতুষ্পুত্র আব্‌দুর রহমান আফগানিস্থানের সিংহাসন লাভ করিলে তাঁহার সহিত ইংরেজ সরকারের নূতন এক সন্ধি হইল। কাবুলে যাইবার গিরিসঙ্কটগুলিতে বৃটিশের অধিকার স্বীকৃত হইল। স্থির হইল, ইংরেজ সরকার কাবুলের আমীরকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিবে এবং আমীর ইংরেজ গভর্নমেন্টের উপদেশ অনুসারে তাঁহার বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করিবেন (বৃত্তির পরিমাণ পরে বাড়াইয়া ১৮ লক্ষ টাকা করা হইয়াছিল)। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আফগানিস্থান রক্ষা করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের পর প্রায় ৪০ বৎসর পর্যন্ত আফগানিস্থানের সহিত ইংরেজদের মিত্রতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু আফগানিস্থান ও বৃটিশ শাসিত ভারতের মধ্যবর্তী ভূভাগে যে সকল দুর্ধর্ষ পার্বত্য পাঠান জাতি বাস করিত তাহারা চিরকালই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ঢুকিয়া লুঠতরাজ করিত। তাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টায় এই সীমান্তে ইংরেজদের বহু যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কাবুলের আমীর এই সকল স্বজাতীয় ও মুসলমান পাঠানদের উপর প্রভুত্বের দাবি করিতেন—কিন্তু বস্তুতঃ এই সকল স্বাধীনতা-প্রিয় পার্বত্য জাতি কাহারও অধীনতা স্বীকার করিত না। তথাপি তাহাদের উপর ইংরেজের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা আমীর ভাল চক্ষে দেখেন নাই এবং ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা দূর

করিবার অভিপ্রায়ে আমীর ও ইংরেজ রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমান্ত-রেখা নির্দিষ্ট করা হইল। ইংরেজের পক্ষে সার মর্টিমার ডুরাণ্ড কাবুলের আমীরের সম্মতিক্রমে এই সীমারেখা নির্দেশ করেন; এই জন্য ইহাকে ডুরাণ্ড লাইন বলা হয়।

এই সীমারেখার অনুসারে যে সমুদয় পার্বত্য জাতি ভারতের অধীনস্থ হইল তাহারা সহজে এই ব্যবস্থা অর্থাৎ ইংরেজের অধীনতা মানিয়া লয় নাই। আফ্রিদি, ওয়াজিরি, মাসুদ, মোমান্দ ও অন্যান্য বহু জাতি পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ করিয়াছে এবং তাহাদের দমনের জন্য ইংরেজকে সামরিক অভিযান প্রেরণ করিতে হইয়াছে। চিত্রলের যুদ্ধ ইহাদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। চিত্রলের ভৌগোলিক অবস্থিতি সামরিক হিসাবে খুব মূল্যবান এবং এইজন্য ইংরেজ ইহা হস্তগত করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র ছিল। ১৮৯১ সনে চিত্রলের সিংহাসনে অধিকার লইয়া দুই পক্ষে বিবাদ বাধিলে ইংরেজ এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠাইল। অপর পক্ষের উত্তেজনায় পার্শ্ববর্তী সমস্ত পাঠান জাতি মিলিত হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিল। ভারতীয় ইংরেজ ও শিখ সৈন্যদল চিত্রলের দুর্গে অবরুদ্ধ হইল এবং প্রায় দেড়মাস অবরোধের পর নূতন ভারতীয় সৈন্য গিয়া তাহাদের উদ্ধার করিল। চিত্রলে ইংরেজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৮৯৭-৯৮ সনে বহু পাঠান জাতি একযোগে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল এবং তাহাদের দমন করিতে ইংরেজকে বহু অভিযান পাঠাইতে হইয়াছিল।

বড়লাট লর্ড কার্জন সীমান্ত প্রদেশ শাসনের জন্য এক নূতন নীতি অবলম্বন করিলেন। তিনি অধিকাংশ ইংরেজ সৈন্য পার্বত্য পাঠান অধ্যুষিত অঞ্চল হইতে পঞ্জাবের সীমানায় সরাইয়া নিলেন এবং তাহাদের পরিবর্তে ইংরেজ কর্মচারী দ্বারা শিক্ষিত পাঠান সৈন্যের হাতেই নিজ নিজ গ্রামের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দিলেন। লর্ড কার্জন ডুরাণ্ড লাইন ও পঞ্জাবের মধ্যবর্তী ভূভাগ এবং পঞ্জাবের পশ্চিম সীমাস্থিত হাজরা, পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু এবং ডেরা ইসমাইল খান—এই কয়টি জিলা লইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (North-West Frontier Province) নামে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করিলেন। প্রত্যক্ষ ভাবে ভারত

সরকারের অধীনস্থ একজন চীফ কমিশনারের উপর ইহার শাসন ভার ন্যস্ত হইল।

লর্ড কার্জনের নীতিতে প্রথম প্রথম সুফল হইয়াছিল এবং পাঠান জাতি অনেকটা শান্ত ছিল। কিন্তু ইহা বিশ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই।

(খ) তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ

১৮২৪ ও ১৮৫২ সনে দুইটি যুদ্ধের ফলে ব্রহ্মদেশের অধিকাংশ ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার ফলে এবং অন্যান্য কারণে ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরেজ সরকারের মনোমালিন্য বাড়িয়াই চলিতেছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসি জাতি কোচিন-চীন ও টঙ্কিন প্রদেশ অধিকার করিয়া ব্রহ্মদেশের নিকটবর্তী প্রদেশে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করে। ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্রহ্মরাজ ফরাসিদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছেন, এইরূপ ধারণার ফলে ইংরেজরা ভীত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। এই সময়ে একটি ইংরেজ বণিক কোম্পানি ব্রহ্মে কাঠের ব্যবসা করিত। তাহারা বে-আইনি কাজ করিয়াছে এই অভিযোগে ব্রহ্মরাজ তাহাদের ২৩ লক্ষ টাকা জরিমানা করেন। ইহাতে বড়লাট লর্ড ডাফরিন্ (১৮৮৪-১৮৮৮) ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মরাজকে এমন কতকগুলি শর্তে সন্ধি করিতে বলিলেন, যাহাতে ব্রহ্মরাজের স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে খর্ব হইয়া যায়। ব্রহ্মরাজ থিব এইরূপ সন্ধি করিতে অস্বীকৃত হইলে ডাফরিন্ ব্রহ্মদেশে সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং অল্লায়াসেই রাজধানী মান্দালয় অধিকার করিলেন (১৮৮৫)। ব্রহ্মরাজ থিব সপরিবারে ভারতে নির্বাসিত হইলেন এবং সমগ্র উত্তর ব্রহ্মদেশ ইংরেজরাজের অধিকারে আসিল (১৮৮৬)। এইরূপে তিনটি যুদ্ধের ফলে সমগ্র ব্রহ্মদেশ বৃটিশ সাম্রাজের অন্তর্ভুক্ত হইল।

(গ) মণিপুর

আসামের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র মণিপুর রাজ্য প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পর ইয়ান্দাবোর সন্ধির শর্ত অনুসারে ব্রহ্মদেশের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইল। কিন্তু ইংরেজ গভর্নমেন্টের একজন প্রতিনিধি (Political Agent) ঐ রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করার ফলে মণিপুরের উপর ইংরেজের কিছু প্রভাব ছিল। ১৮৯০ সনে মণিপুর রাজের ভ্রাতা ও

সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎ রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার জন্য ইংরেজ গভর্নমেণ্ট তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিল এবং রাজ্যের এক আভ্যন্তরিক গোলযোগের সুযোগে তাঁহাকে গোপনে বন্দী করিবার ব্যবস্থা করিল। ১৮৯১ সন ২৪শে মার্চ শেষ রাত্রে অকস্মাৎ ইংরেজ সৈন্য তাঁহার বাসস্থল আক্রমণ করিয়া অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোককে হত্যা করিল এবং বহু দ্রব্য লুণ্ঠন করিল; কিন্তু টীকেন্দ্রজিৎকে ধরিতে পারিল না। ইহাতে উত্তেজিত হইয়া মণিপুরের সৈন্যদল ইংরেজ প্রতি-নিধির উপর গোলাগুলি বর্ষণ করায় ইংরেজ পক্ষের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি রাত্রে রাজপ্রাসাদে আসিয়া টীকেন্দ্রজিতের সঙ্গে একটি মিট-মাটের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন রকম আপস করা সম্ভব হইল না। তখন টীকেন্দ্রজিৎ বিশ্রামের জন্য বিদায় লইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতাকে নির্দেশ দিলেন যেন ইংরেজ কর্মচারীদিগকে তিনি নির্বিঘ্নে রাজপ্রাসাদের বাহিরে পৌঁছাইয়া দেন। কিন্তু সেই দিন প্রাতঃকালে ইংরেজ সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল; সুতরাং বিক্ষুব্ধ জনগণ ইংরেজ কর্মচারীরা দেউড়িতে পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। একজন আহত ও তিনজন ইংরেজ কর্মচারী এবং তাঁহাদের সঙ্গী একজন বাদ্যকর (bugler) বন্দী হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া টীকেন্দ্রজিৎ আসিয়া রাত্রের জন্য তাহাদের রক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি নিদ্রিত হইলে মণিপুর রাজ্যের একজন কর্মচারী তোঙ্গোল সেনাপতি চারিজন বন্দী ইংরেজ এবং তাঁহাদের সঙ্গী বাদ্যকরকে হত্যা করিলেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আসামের চীফ কমিশনার ও মণিপুরের ইংরেজ প্রতিনিধি ছিলেন।

এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনদিক হইতে তিনদল ইংরেজ সৈন্য মণিপুর আক্রমণ করিয়া রাজপ্রাসাদ অধিকার করিল। মণিপুরের রাজা, টীকেন্দ্রজিৎ, অন্যান্য রাজ ভ্রাতারা এবং তোঙ্গোল সেনাপতি পলাইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই ধৃত হইলেন। একটি বিশেষ আদালতে রাজ পরিবারের এবং দুইজন ইংরেজ কর্মচারীর নিকট অন্য সকল অভিযুক্তগণের বিচার হইল। বিচারের ফলে মণিপুরের রাজা কুলচন্দ্র, টীকেন্দ্রজিৎ, তাঁহাদের আর এক ভ্রাতা এবং তোঙ্গোল সেনাপতির প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। টীকেন্দ্রজিৎ ও তোঙ্গোল সেনাপতির ফাঁসী হইল।

বড়লাট কুলচন্দ্র ও তাঁহার অন্য ভ্রাতার প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দিলেন। টীকেন্দ্রজিৎ যে ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যার ব্যাপারে কোন রকম লিপ্ত ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার শক্তি ও জনপ্রিয়তাই যে ইংরেজদের বিরাগের কারণ এবং ইংরেজের চক্ষে তাহার প্রধান অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং একজন ইংরেজ মন্ত্রীও তাহা প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছিলেন।

অতঃপর ইংরেজ গভর্নমেণ্ট মণিপুরের ভূতপূর্ব এক রাজার প্রপৌত্র পাঁচ বছরের শিশু চূড়াচাঁদকে এক সনদ দিয়া মণিপুরের রাজ সিংহাসনে বসাইলেন। সনদের শর্ত অনুসারে মণিপুরের রাজা ইংরেজকে বার্ষিক কর দিতে এবং শাসন ও অন্য বিষয়ে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের নির্দেশ মত কার্য করিতে বাধ্য থাকিলেন। রাজা যতদিন নাবালক থাকিবেন তত দিন নূতন ইংরেজ প্রতিনিধি (Political Agent) মণিপুর রাজ্য শাসন করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

(ঘ) ভুটান

আসাম ও বাংলার জলপাইগুড়ি জিলার উত্তরে এবং সিকিম ও দার্জিলিং জিলার পূর্বে অবস্থিত পার্বত্য ভুটান রাজ্যের দক্ষিণ পর্বতমালার নিম্নভূমিতে একটি অপ্রশস্ত দীর্ঘ উর্বর ভূমিখণ্ড আছে। পূর্বে আসামের ধনসিরি হইতে পশ্চিমে বাংলার তিস্তা নদী পর্যন্ত এই বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রায় কুড়ি মাইল চওড়া এবং ইহার পরিমাণ এক সহস্র মাইল বর্গক্ষেত্র। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া পার্বত্য ভুটান হইতে সমতল বাংলায় যাইবার এগারোটি, এবং আসাম যাইবার সাতটি সংকীর্ণ পথ আছে। ইহাদিগকে 'দুয়ার' বলা হয়, এবং এই কারণে সমস্ত অঞ্চলটি 'ভুটান দুয়ার' নামে খ্যাত। এই ভূখণ্ড উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা ও কাঠের জন্য প্রসিদ্ধ, এবং ইউরোপীয়দের বসবাসের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। সুতরাং আসাম জয় করিবার পর এই 'দুয়ার' অঞ্চলের উপর ইংরেজদের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইল। তাহারা দাবি করিল যে দরাং জিলায় 'দুয়ারের' যে অংশ তাহা আসামের অন্তর্গত এবং ভুটান তাহা অন্যায়রূপে দখল করিয়াছে। ভুটানরাজ সামান্য কর দিতে স্বীকৃত হইয়া আপস করিলেন। কিন্তু

এই কর নিয়মিত না দেওয়ায় এবং ভুটিয়ারা ব্রিটিশ রাজ্যে লুঠতরাজ করায় আবার গোলমাল আরম্ভ হইল। বিবাদের কোন মীমাংসা না হওয়ায় ১৮৪১ সনে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট আসামের 'দুয়ার' অঞ্চল দখল করিল এবং শাস্তি রক্ষার জন্য ভুটানকে বাৎসরিক দশ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইল।

কিন্তু ইহার পরেও ভুটিয়ারা মাঝে মাঝে বাংলা দেশে ঢুকিয়া লুঠপাট করিত। ১৮৬৩ সনে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ক্ষতি পূরণের দাবি করিবার জন্য সার অ্যাশলী ইডেনকে (Sir Ashley Eden) দূত নিযুক্ত করিয়া ভুটানে পাঠাইল। কিন্তু ভুটানরাজ প্রকাশ্য দরবারে ইডেনকে অপমান করিল এবং তাহার মুক্তির মূল্যস্বরূপ তাহাকে দিয়া আসামের 'দুয়ার' অঞ্চল ভুটানকে ফিরাইয়া দিবে এই মর্মে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করাইল। ইডেন কোনমতে পলাইয়া ১৮৬৪ সনের এপ্রিল মাসে দার্জিলিং পৌঁছিলেন। ভুটানকে যথোচিত শাস্তি দিবার জন্য তাহার বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করা হইল এবং একদল ইংরেজ সৈন্য ভুটান আক্রমণ করিল। ১৮৬৫ সনের ১১ই নভেম্বর সন্ধি হইল। বাংলা ও আসামের দুয়ার অঞ্চল ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহার পরিবর্তে ইংরেজ ভুটানকে বার্ষিক বৃত্তি দিতে স্বীকার করিল। প্রথম তিন বৎসর যথাক্রমে ২৫,০০০, ৩৫,০০০, ৪৫,০০০ এবং পরে প্রতি বৎসর ৫০,০০০ টাকা বৃত্তি নির্ধারিত হইল। কিন্তু স্থির হইল ভুটিয়ারা ইংরেজ রাজ্যে লুঠতরাজ করিলে এই বৃত্তি বন্ধ করা হইবে এবং ভুটানের সহিত সিকিম বা কোচবিহারের বিবাদ হইলে ভুটান ইংরেজ গভর্নমেণ্টের শালিসী মানিয়া লইবে। এইরূপে সমগ্র দুয়ার অঞ্চল বাংলার অন্তর্ভুক্ত হইল।

(৬) সিকিম

লর্ড ডালহৌসী যে বলপূর্বক সিকিমের এক-তৃতীয়াংশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

১৮৬০ সনে সিকিমের দেওয়ান কয়েকজন ব্রিটিশ প্রজাকে অপহরণ করে। সিকিমরাজ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ না করায় ক্যাম্পবেল ক্ষুদ্র একদল অশিক্ষিত সৈন্য লইয়া অগ্রসর হন কিন্তু পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসেন। পরে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য সিকিম আক্রমণ করে এবং বিনা

বাধায় রাজধানী তুমলুং পৌঁছে (১৮৬১)। সিকিমের রাজার সহিত নূতন সন্ধি হয়—ইহার ফলে তাঁহার স্বাধীনতা অনেকাংশে খর্ব হয় এবং তাঁহাকে বহু টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে হয়।

১৮৮৬ সনে তিব্বত সিকিম আক্রমণ করে। সিকিমের অধিবাসীরা বেশীর ভাগই তিব্বতের পক্ষে এবং তাহারা তিব্বতের বিরুদ্ধে ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করিল না। কিন্তু সিকিমের মধ্য দিয়াই ভারতের সহিত তিব্বতের বাণিজ্যের রাস্তা এবং দার্জিলিংয়ের চা বাগানগুলি ও সিকিমের সীমান্তে। সুতরাং সিকিম তিব্বতের অধীন হইলে ইংরেজদের অনেক অসুবিধা। এই কারণে বিনা আমন্ত্রণেই ইংরেজ সরকার সিকিমের তিব্বতীয় আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইল এবং তিব্বত পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। ১৮৯০ সনে চীন ও ইংরেজের মধ্যে যে সন্ধি হইল তাহাতে তিব্বত ও সিকিমের সীমানা নির্দিষ্ট করা হইল এবং সিকিম ইংরেজের আশ্রিত রাজ্যে (British Protectorate) পরিণত হইল। অর্থাৎ সিকিমের আভ্যন্তরিক শাসন ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনে ভারত সরকারের অব্যাহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্যবসা বাণিজ্যেরও অনেক সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হইল।

(চ) গারো অভিযান

একদিকে আসাম ও অন্যদিকে ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের পশ্চিম প্রান্তে গারো জাতি বাস করিত। তাহাদের মধ্যে একদল কোন শাসন মানিত না এবং মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে হানা দিয়া লুঠপাট করিত। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ পাঠান হইল এবং তাহারা বিনা বাধায় বশ্যতা স্বীকার করিল (১৮৭২)।

৩। শাসন প্রণালীর সংস্কার

আলোচ্য সময়ের মধ্যে ১৮৬১ ও ১৮৯২ সনে দুইটি আইনদ্বারা শাসন ব্যবস্থার গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়।

১৮৫৩ সনে আইন প্রণয়নের জন্য যে নূতন ব্যবস্থা হয় তাহাতে কয়েকটি ত্রুটি লক্ষিত হইল :

প্রথমতঃ, নবগঠিত আইন পরিষদ কেবলমাত্র নূতন আইন প্রণয়নে

নিযুক্ত না থাকিয়া সাধারণ শাসন ব্যাপারেও নানা প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে।

দ্বিতীয়তঃ, আইন প্রণয়নের অধিকার কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় পরিষদে থাকায়, বম্বে ও মাদ্রাজ বিক্ষুব্ধ হয়।

তৃতীয়তঃ, সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭-৫৮) এবং নীলকর আন্দোলন (১৮৬০) প্রভৃতি বিপ্লব ও বিক্ষোভের কারণ অনুসন্ধান করিয়া অনেকেই এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, ভারতের জনমত সম্বন্ধে সরকার সাবহিত নহেন, এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি না রাখিলে, বিদ্রোহ বা গুরুতর বিক্ষোভ ব্যতীত প্রজার অসন্তোষ ও অভিযোগ সম্বন্ধে পূর্বে জ্ঞাত হইয়া যথোচিত ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে।

এই সমুদয় ত্রুটি দূর করিবার জন্য ১৮৬১ সনের আইনে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন করা হইল।

১। গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সদস্য সংখ্যা চারি হইতে বাড়াইয়া পাঁচ করা হইল।

২। আইন প্রণয়নের জন্য এই পরিষদে গভর্নর জেনারেল অন্যূন ছয় ও অনধিক বারোজন অতিরিক্ত সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন। অন্ততঃ ইহার অর্ধেক সংখ্যক বে-সরকারী হইবেন। সেনাপতি এবং যে প্রদেশে এই পরিষদের অধিবেশন হইবে তাহার গভর্নর বা লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর ইহার অতিরিক্ত সদস্য হইবেন। এই বর্ধিত পরিষদ আইন-প্রণয়ন ব্যতীত অন্য কোন বিষয় আলোচনা করিতে পারিবে না। এই পরিষদ যে আইন প্রণয়ন করিবে বড়লাটের সম্মতি ব্যতীত তাহা আইন বলিয়া গৃহীত হইবে না এবং বিলাতের কর্তৃপক্ষ তাহা নাকচ করিয়া দিতে পারিবেন।

৩। সপারিষদ বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্নর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ফিরিয়া পাইল। কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের জন্য এই পরিষদে অন্যূন চারি ও অনধিক আটজন অতিরিক্ত সদস্য গভর্নর মনোনীত করিতে পারিবেন। অ্যাডভোকেট জেনারেলও পদানুরোধে ইহার সদস্য থাকিবেন। বড়লাট ইচ্ছা করিলে এই পরিষদে প্রণীত যে কোন আইন নাকচ করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে সপারিষদ গভর্নর জেনারেল সমগ্র ভারতের জন্য আইন করিতে পারিবেন।

৪। বাংলা, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জন্য এইরূপ আইন-পরিষদ গঠন করিতে বড়লাটকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

৫। গভর্নর জেনারেল নিজের ইচ্ছায় যে কোন অর্ডিন্যান্স (Ordinance) করিতে পারিবেন—ছয়মাস পর্যন্ত ইহা আইন বলিয়া স্বীকৃতি পাইবে।

উল্লিখিত ৪ সংখ্যক ধারা অনুসারে ১৮৬২ সনের ১৮ই জানুআরি বাংলা দেশে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাতে লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর বারোজন সদস্য মনোনীত করিবার অধিকার পাইলেন। তিনি চারিজন ইউরোপীয় ও দুইজন ভারতীয় কর্মচারী এবং চারিজন ইউরোপীয় ও দুইজন ভারতীয় বেসরকারী সদস্য নিযুক্ত করিলেন। ১৮৬২ সনের ১লা ফেব্রুআরি তারিখে এই আইন পরিষদের প্রথম অধিবেশন হইল।

১৮৬১ সনের আইন অনুসারে যে আইন-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইল তাহাতে ভারতীয়েরা সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই—কারণ অল্প সংখ্যক যে কয়েকজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন তাঁহারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না—গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হইতেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশই অযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন এবং গভর্নমেণ্টের নির্দেশ অনুসারেই ভোট দিতেন। ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইল এবং ১৮৮৫ সনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হইলে শাসন ব্যাপারে ভারতীয় প্রজাগণের অধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিল। ইহার ফলে ১৮৯২ সনে নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইল।

ইহাতে নিম্নলিখিতরূপ পরিবর্তন হইল। ১। গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা বাড়াইয়া ১৬ করা হইল। ইহার মধ্যে অনধিক দশজন বে-সরকারী হইবেন। ইহাদের মধ্যে চারিজন চারিটি প্রাদেশিক বিধান-পরিষদের বে-সরকারী সদস্যদের এবং একজন কলিকাতা চেম্বার অফ্‌ কমার্সের (Chamber of Commerce) সুপারিশে, এবং বাকী পাঁচ জন গভর্নর জেনারেল কর্তৃক সোজাসুজি মনোনীত হইবেন। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, প্রাদেশিক বিধান পরিষদের মাত্র আট জন সদস্য মিউনিসিপ্যালিটি, জিলাবোর্ড (District Board), জমিদার, বিশ্ববিদ্যালয় ও চেম্বার অফ কমার্সের সুপারিশে মনোনীত (বা নির্বাচিত) হইতেন।

৪। বাংলা দেশের আভ্যন্তরিক শাসন ব্যবস্থা

বাংলা দেশের জন্য পৃথক এক জন শাসন কর্তার নিয়োগে যে

আভ্যন্তরিক শাসন ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ ইহার পূর্বে সপারিষদ বড়লাট ইহার শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেও এ বিষয়ে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারেন নাই। নব-নিযুক্ত লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর বা ছোটলাট কেবলমাত্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন, সুতরাং পূর্বাপেক্ষা শাসন কার্য অধিকতর যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন হইত।

বাংলা দেশের প্রথম তেরজন ছোটলাট ছিলেন :

১। সার ফ্রেডারিক জেমস্ হ্যালিডে (১৮৫৪-৫৯)

২। সার জন পিটার গ্র্যাণ্ট (১৮৫৯-৬২)

৩। সার সিসিল বিডন (১৮৬২-৬৭)

৪। সার উইলিয়ম গ্রে (১৮৬৭-৭১)

৫। সার জর্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১-৭৪)

৬। সার রিচার্ড টেম্পল (১৮৭৪-৭৭)

৭। সার অ্যাসলি ইডেন (১৮৭৭-৮২)

৮। সার অগস্টাস্ রিভার্স টম্পসন (১৮৮২-৮৭)

৯। সার স্টুয়ার্ট কলভিন বেলী (১৮৮৭-৯০)

(ইনি ১৮৭৯ সনের ১৫ই জুলাই হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত অস্থায়ী ছোটলাট ছিলেন।)

১০। সার চার্লস অ্যালফ্রেড ইলিয়ট (১৮৯০-৯৫)

১১। সার অ্যালেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি (১৮৯৫-৯৮)

১২। সার জন উডবার্ণ (১৮৯৮-১৯০২)

১৩। সার অ্যানড্রু হেণ্ডারসন লিথ ফ্রেসার (১৯০৩-৫)

১৮৪৩ খ্রীঃ বাংলার শাসন বিভাগে একজন মাত্র সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। পৃথক লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর হওয়ার পরে সার উইলিয়ম গ্রের সময়ে একজন ও সার অ্যাসলি ইডেনের সময় আর একজন সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ইঁহারা বিচার, রাজস্ব ও অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে ইঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান (Chief) সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

প্রথম ছোটলাট হ্যালিডের সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (১৮৫৭), ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইনের আরম্ভ (১৮৫৫), সিপাহী বিদ্রোহ ও তাহার ফলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিবর্তে মহারাণী

ভিক্‌টোরিয়ার স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ, বিধবা-বিবাহ আইন, ও ১৮৫৯ সনে কৃষকগণের খাজনা আইন—এবং দ্বিতীয় ছোটলাটের সময় বাংলা দেশে প্রথম লেজিস্লেটিভ কাউন্‌সিল গঠন এবং নীল-চাষীদের বিদ্রোহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৮৬২ সনে কলিকাতা হাই-কোর্টের প্রতিষ্ঠা হয়। কোম্পানির আমলের সুপ্রীম কোর্ট, সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামৎ আদালতের সমস্ত ক্ষমতা এই হাই-কোর্টকে দেওয়া হয়।

আভ্যন্তরিক শাসন পদ্ধতি বিষয়ে ১৮৫৯ সনে যে নূতন ব্যবস্থা হয় ইংরেজ শাসনের শেষ পর্যন্ত প্রায় তাহাই প্রচলিত ছিল। এই নূতন ব্যবস্থায় একই ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেকটরের পদে নিযুক্ত হন এবং তিনিই জিলার শাসনের সকল বিভাগে সর্বেসর্বারূপে বিরাজ করেন। পুলিশ ও জেল তাঁহার অধীনস্থ করা হয় এবং ফৌজদারী মোকদ্দমাও প্রথম অবস্থায় তিনিই বিচার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় এবং ম্যাজিস্ট্রেট কলেক্‌টরের হাত হইতে বিচারের ভার সরাইয়া নিবার জন্য বহুদিন যাবৎ তীব্র আন্দোলন হয়। বিলাতেও ভারত শাসন বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং পার্লিয়ামেণ্টের কয়েকজন ইংরেজ সভ্য এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সেক্রেটারী অব ষ্টেটের নিকট এক আবেদনপত্র পাঠান। ইহাতে তাঁহারা বলেন যে একই ব্যক্তির উপর ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশের অধ্যক্ষ, পাবলিক প্রসিকিউটর (Public Prosecutor), ফৌজদারী মামলার বিচারক, রাজস্ব-সংগ্রাহক প্রভৃতি পদের দায়িত্ব এবং রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার আপিল শুনানির ভার দেওয়া সত্যই অতি অদ্ভুত। কিন্তু ইংরেজ শাসনে এবং স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্র শাসনের বিশ বৎসর কালেও এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। এস্থলে বলা আবশ্যক যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজ আমলে বহুবার ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

১৭৯৩ খ্রীঃ বিধান অনুসারে ভারতের সরকারী উচ্চপদে কেবল সনদ প্রাপ্ত কর্মচারীরাই (Covenanted Civilian) নিযুক্ত হইতে পারিতেন, এবং সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদেই এই সকল ইংরেজ কর্মচারীরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য ছোটখাট নীচের পদে ভারতীয়দিগকে নিয়োগ করা হইত। ১৮২৪ সনে মুনসিফ ও সদর আমিন এবং সাত বৎসর পরে প্রধান সদর আমিনের পদ সৃষ্টি হয়—ইহাদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

১৮৬৮ সনে এই সমুদয় পদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টরের নিয়োগ পূর্বোক্ত বিধানের বিরোধী হওয়ায় ১৮৬১ খ্রী: নূতন এক বিধান দ্বারা ইহা অনুমোদিত হয়।

সনদপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী প্রথমে বিলাতের কর্তৃপক্ষেরা মনোনীত করিতেন এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরদের আত্মীয় স্বজনেরাই সাধারণত: মনোনীত হইতেন। এই সব কর্মচারীরা এদেশে আসিয়া ১৮০০ খ্রী: প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া কার্যে যোগ দিতেন। পরে বিলাতে লণ্ডনের নিকটবর্তী হেইলিবেরী (Haileybury) নামক স্থানে তাঁহাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে একটি পরীক্ষায় পাশ করিবার পর কলিকাতায় আসিয়া তাঁহারা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতেন।

১৮৫৩ খ্রী: চার্টার অ্যাক্টে এই প্রথা বিলুপ্ত করিয়া কেবলমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষা দ্বারাই সনদপ্রাপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত করার নিয়ম হইল। সকলেই এই পরীক্ষা দিতে পারিত, কিন্তু কেবলমাত্র লণ্ডনে এই পরীক্ষা গৃহীত হওয়ায় ভারতীয় যুবকদের পক্ষে এই পরীক্ষা পাশ করা খুবই কষ্টকর ছিল। তথাপি ক্রমে ক্রমে অল্প সংখ্যক ভারতীয় এই পরীক্ষা পাশ করিয়া এই সনদপ্রাপ্ত পদে নিযুক্ত হইতে লাগিল। এই সর্বোচ্চ পদের নাম পরিবর্তিত হইয়া ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস্ (Indian Civil Service) হইল। এই সার্ভিসের লোকেরাই প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করিত।

নিম্ননির্বাহক পদ (Subordinate Executive Service) দুইটি শাখায় বিভক্ত ছিল। উচ্চতর শাখায় ডেপুটি কলেক্টর এবং নিম্নতর শাখায় সাব-ডেপুটি কলেক্টর, তহশিলদার, কানুনগো প্রভৃতি।

১৮৮২-৮৩ খ্রী: নিম্ন নির্বাহক পদে (Subordinate Executive Service) নিয়োগের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা নির্বাচনের প্রথা প্রচলিত হয়। পূর্বেও এই প্রকার পরীক্ষা নেওয়া হইত এবং যাহারা উত্তীর্ণ হইত তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হইত; কিন্তু বৎসরে কতজন কর্মচারীর নিয়োগ হইবার সম্ভাবনা তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা হইত না। ফলে প্রায় ৩০০ জন পদপ্রার্থীর নাম তালিকাভুক্ত হইল, সুতরাং পরীক্ষা

গ্রহণ বন্ধ হইল। ১৮৮২-৩ খ্রীঃ প্রবর্তিত নিয়ম অনুসারে যে কয়টি পদ খালি হওয়ার সম্ভাবনা কেবলমাত্র সেই সংখ্যক পদপ্রার্থীই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া গৃহীত হইত। ইহার অতিরিক্ত কর্মচারী প্রয়োজন হইলে লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর তাহাদিগকে মনোনীত করিতেন। কিন্তু শীঘ্রই এই প্রথার পরিবর্তন হইল। কারণ দেখা গেল যে কেবলমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারা নির্বাচিত হইলে, বাঙ্গালী হিন্দুরাই প্রায় সকল পদ দখল করিবে, মুসলমানদের বা বাংলার অন্তর্ভুক্ত বিহার ও উড়িষ্যার অধিবাসীদের এবং বিশিষ্ট বা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের নিয়োগ খুবই কম হইবে। অতএব স্থির হইল (১৮৮৮-৮৯ খ্রীঃ) যে অতঃপর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ প্রার্থীরা খালি পদের অর্ধেক পাইবে, এক চতুর্থাংশ পদে যে সকল প্রার্থী উক্ত পরীক্ষায় মোট নম্বরের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ পাইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবে, এবং বাকী এক চতুর্থাংশ নিম্নতর শাখা হইতে উচ্চতর শাখায় উন্নীত হইবে। নিম্নতর শাখায় নিয়োগের জন্যও মোটামুটি এই প্রথাই গৃহীত হইল।

ব্রিটিশ আমলের প্রারম্ভ হইতেই দেশে চুরি ডাকাতির যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। পুলিশের অকর্মণ্যতা সম্বন্ধে বহু অভিযোগ ছিল—চোর ডাকাত বড় একটা ধরা পড়িত না এবং অনেক স্থলে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রায় লোপ পাইয়াছিল। ইহার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ১৮৬০ খ্রীঃ একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং ইহার মতানুসারে পুলিশ সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা হয়। সমস্ত প্রদেশের পুলিশের অধ্যক্ষ হইবেন একজন Inspector General of Police—সনদপ্রাপ্ত কর্মচারী (Covenanted Service), এবং তাঁহার অধীনে থাকিবেন কয়েকজন Deputy Inspector General—ইঁহারা প্রত্যেকে এক একটি এলাকার (Range) ভার গ্রহণ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশ কয়েকটি এলাকায় ভাগ করা হয়। প্রতি জিলায় পুলিশের একজন অধ্যক্ষ থাকিবেন—Superintendent of Police। এই সমুদয় কর্মচারীদের জন্য একটি পৃথক নিখিল ভারতীয় পদের (All India Police Service) সৃষ্টি হইল এবং বিলাতের কর্তৃপক্ষ ইহাদের নিয়োগ করিতেন। আভ্যন্তরিক ব্যবস্থায় পুলিশ কর্মচারীদের কতকটা স্বাধীনতা থাকিলেও ইহারা সর্বতোভাবে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভাগীয় কমিশনারের অধীন ছিল।

প্রতি জিলায় সর্বনিম্ন পুলিশ ষ্টেশন ছিল থানা। প্রতি থানার অধীনে অনেকগুলি গ্রাম ছিল এবং ইহাদের শান্তি রক্ষার জন্য একজন দারোগা থাকিত। প্রতি গ্রামে শান্তি রক্ষার জন্য চৌকিদার নিযুক্ত হইত। ১৮৫৬ সনে চৌকিদারী আইন পাশ হয়। ইহার ফলে প্রতি গ্রামে অন্যূন পাঁচ জন সদস্য লইয়া একটি পঞ্চাইতি গঠিত হইত। ইহারা সকলেই জিলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা মনোনীত হইত এবং চৌকিদারের বেতনের জন্য গ্রামবাসীদের উপর কর ধার্য করিত। ম্যাজিস্ট্রেটই চৌকিদার নিযুক্ত করিতেন। চৌকিদারেরা থানার দারোগাকে গ্রামের সংবাদ সরবরাহ করিত। এই ব্যবস্থায় সুফল না পাওয়ায় ১৮৭০ খ্রী: নূতন এক আইন হয়। ইহাতে শান্তি রক্ষার জন্য পঞ্চাইতদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করা হয়। চৌকিদার নিয়োগের ভার তাহাদের হস্তে ন্যস্ত হয়, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন ব্যতীত তাহারা কোন চৌকিদারকে বরখাস্ত করিতে পারিত না।

পুলিশ বিভাগের কার্য তদন্তের জন্য ১৮৬০ সনে ভারত সরকার একটি কমিশন গঠিত করে। ইহাদের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতি জিলায় একজন ইউরোপীয় পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট এবং বড় বড় জিলার জন্য একজন ইউরোপীয় সহকারী সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদের অধীনে ইন্‌স্‌পেক্‌টর, হেড কনষ্টেবল, ও সার্জেণ্ট থাকিত। বিভাগীয় কমিশনারের পরিবর্তে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের কর্তা হইলেন। সৈনিকদিগকে পুলিশের বড় পদে নিযুক্ত করা বন্ধ হইল এবং প্রথমে মনোনয়ন ও পরে প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দ্বারা পুলিশের বড় কর্মচারী নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হইল। ১৯০২ সালে একটি কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী পুলিশ কর্মচারীদের নির্দিষ্ট গ্রেডে বিভক্ত করা হইল এবং ইন্‌স্‌পেক্‌টর ও 'ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেনারেল অফ পুলিশ' পদের সৃষ্টি হইল। রেলওয়ের জন্য নূতন পুলিশ বিভাগ হইল কিন্তু মিউনিসিপালিটি ও ক্যাণ্টনমেণ্টের পৃথক পুলিশ বিভাগ রদ করা হইল। কলিকাতার জন্য আলাদা পুলিশের বন্দোবস্ত হইল।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে ইংরেজ শাসনের প্রথম হইতেই দেশে স্থলপথে ও জলপথে ডাকাতির খুব প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সরকারী রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে দুই কারণে ডাকাতি দমন করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল প্রথম,

সাধারণ লোকের মধ্যে ডাকাতদের প্রতিরোধ করিবার ইচ্ছা বা শক্তির অভাব। দ্বিতীয়, জমিদাররাই ডাকাতির প্রশ্রয় দিতেন। বাংলা দেশে জমিদারেরা যে অনুচরবর্গ লইয়া ডাকাতি করিতেন তাহার অসংখ্য কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত ছিল। সরকার ডাকাতি দমনের জন্য একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রচেষ্টায় ডাকাতির সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। ১৮৫২, ১৮৫৬, ১৮৫৮ ও ১৮৫৯ সনে ডাকাতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫২০, ২৯২, ১৯০ ও ১৭১। বাংলা দেশে আর একটি উপদ্রব ছিল। পূর্ব সীমান্তের আদিম অসভ্য জাতিরা মাঝে মাঝে অভাবের তাড়নায় চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে হানা দিত।

১৮৬২ সনে জুরী প্রথার প্রবর্তন হয়। প্রথমে কয়েকটি জিলায় এবং নির্দিষ্ট অপরাধের বিচারের জন্য ইহা প্রবর্তিত হয়—কিন্তু ক্রমে ইহা অন্যান্য জিলায় বিস্তৃত হয়, এবং যে সমুদয় অপরাধের জন্য জুরীর বিচার হইবে তাহার সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়।

১৮৭৪ সনে আসাম প্রদেশ বাংলা হইতে পৃথক হইয়া চীফ কমিশনারের অধীনে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়।

১৮৫৯ সনের খাজনা আইনে (Bengal Rent Act.) রায়তদের কিছু সুবিধা হয়। ইহা দ্বারা নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত দাবি এবং বাকী খাজনার জন্য জমিদার কর্তৃক প্রজার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার অধিকার অনেক হ্রাস পায়। জমিদার ও প্রজার মামলা সাধারণ দেওয়ানী আদালত হইতে কলেক্টর ও তাঁহার সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত রাজস্ব আদালতে স্থানান্তরিত করা হয় (কিন্তু দশ বৎসর পরে পূর্ব ব্যবস্থা প্রচলিত করা হয়)। প্রজাদিগকে জোর করিয়া জমিদারী কাছারীতে হাজিরা দিতে বাধ্য করার প্রথা রহিত করা হয়।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রজা ও জমিদার উভয় পক্ষেরই কয়েকটি গুরুতর অসুবিধা ছিল। ইহার সম্বন্ধে প্রায় বারো বৎসর যাবৎ তর্ক ও আন্দোলনের ফলে ১৮৮৫ সনে এক নূতন আইন হয়। জমিদারী প্রথায় কোন রায়ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন জমি ভোগ দখল করিলে তাহাতে তাহার চিরস্থায়ী রায়তী স্বত্ব জন্মিত—জমিদার সহজে তাহাকে ঐ জমি হইতে বেদখল করিতে পারিত না। ইহা এড়াইবার জন্য জমিদার নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হইবার পূর্বেই রায়তকে গ্রামের এক জমি হইতে উঠাইয়া

আর এক জমির দখল দিতেন। ইহার ফলে প্রজা কোন জমিতেই রায়তী স্বত্বের দাবি করিতে পারিত না। ১৮৮৫ সনের আইন অনুসারে ১২ বৎসর যাবৎ এক গ্রামের মধ্যে যে কোন জমি দখলে থাকিলেই তাহাতে প্রজার রায়তী স্বত্ব জন্মিবে। আর প্রজা ১২ বৎসর এইরূপে কোন জমির দখলকারী ছিল কিনা তাহা প্রমাণ করিবার যে দায়িত্ব এতদিন প্রজার উপর ছিল, নূতন আইনে জমিদারের উপর সেই দায়িত্ব অর্পিত হইল। ইংরেজ আদালতে কোন অধিকার প্রমাণ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং গরীব প্রজার পক্ষে প্রবল জমিদারের বিরুদ্ধে নিজের অধিকার প্রমাণ করা খুবই দুরূহ ছিল। নূতন ব্যবস্থায় রায়তদের অনেক সুবিধা হইল।

অন্য দিকে জমিদারদেরও কিছু সুবিধা হইল। জমির উৎপন্ন শস্যের দাম বৃদ্ধি হইলে সেই অনুপাতে জমিদার খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। কিন্তু প্রজারা ন্যায্য বৃদ্ধি দিতেও স্বীকার করিত না, এবং আদালতে উৎপন্ন শস্যের দাম যে অনুপাতে বাড়িয়াছে খাজনাও সেই অনুপাতে বাড়ান হইয়াছে ইহা প্রমাণ করিতে বেগ পাইতে হইত। নূতন আইনে উৎপন্ন শস্যের মূল্যের তালিকা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হইল। সুতরাং ন্যায্য খাজনা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে জমিদারের কোন বাধা রহিল না। জমিদার ও রায়তদের মধ্যে মামলা যাহাতে অল্প সময়ে ও সহজে নিষ্পত্তি হয় নূতন আইনে তাহারও ব্যবস্থা করা হইল।

জমিদার ও প্রজার সংঘর্ষ প্রায় সর্বত্রই ঘটিত। কারণ জমিদারেরা অনেক স্থলে ন্যায্য খাজনার অতিরিক্ত অনেক দাবি করিতেন এবং প্রজাদের নিকট হইতে জোর করিয়া আদায় করিতেন। মাঝে মাঝে এই সংঘর্ষ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইত। ১৮৭২ সনে পাবনা জিলার অনেক রায়ত একজন নেতার অধীনে দলবদ্ধ হইয়া 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করে। ক্রমে ক্রমে এই দলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় এবং তাহারা অনেক ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেয়, এবং লুটপাট করে। গভর্নমেণ্ট এক ইস্তাহার জারি করিয়া প্রজাদিগকে এই সব হাঙ্গামা বন্ধ করিতে বলেন এবং জমিদারদিগকেও অন্যায্য দাবি প্রত্যাহার করিতে বলেন। সরকারের এই নিরপেক্ষ ব্যবহারের ফলে হাঙ্গামা থামিয়া যায়। কিন্তু প্রজাগণ দলবদ্ধ হইয়া আন্দোলন করিতে অভ্যস্ত হয়। ইহাতে গভর্নমেণ্ট শঙ্কিত হইয়া ওঠেন এবং পূর্বোক্ত ভূমি-রাজস্ব আইন বিধিবদ্ধ করার ইহাও একটি কারণ।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে কয়েকবার ভীষণ ঘূর্ণবাতের (Cyclone) ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের গুরুতর দুর্দশা ঘটিয়াছিল। ১৮৬৪ খ্রী: ৫ই অক্টোবর, প্রবল ঘূর্ণবাত ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হয়। কোন কোন স্থলে নদীর তরঙ্গ ৩০ ফুট উচ্চ হইয়া নদীর দুই কূলে ৮ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কলিকাতায় ১০০ পাকা বাড়ী ধ্বংস এবং পাঁচছয় শত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ৪০,৬০০ খড়ের ঘর পড়িয়া যায়। হাওড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জিলায় যথাক্রমে ২০০০ মানুষ ও ১২০০০ পশু, ২০,০০০ মানুষ ও ৪০,০০০ পশু, এবং ১২,০০০ মানুষ ও শতকরা ৮০টি পশু নিহত হয়। সগরদ্বীপ একেবারে বিধ্বস্ত হয় এবং ইহার ৬০০০ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ১৫০০ রক্ষা পায়। ১৮৭৪ খ্রী: ১৫-১৬ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গে ভীষণ ঘূর্ণবাতের ফলে মেদিনীপুর জেলায় ৩০৪৯ জন মানুষ এবং ১৭৫০০ গবাদি পশু নিহত হয়। বর্ধমান জিলায় খানা জংশনের কাছে একটি রেলওয়ে ট্রেন বাতাসের বেগে লাইন-চ্যুত হয়, এবং ২১,০০০ গৃহ ধ্বংস হয়। হুগলী, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও রাজসাহী জেলায় যথাক্রমে ৯, ২৯, ২৭, ৭, ও ৪ জন লোকের মৃত্যু হয়। এই ঘূর্ণবাত গঙ্গা পার হইয়া রাজসাহীর দিকে যায় এবং গঙ্গা নদীতে বহু নৌকা ডুবিয়া যায়। সরকারী বিবরণ অনুসারে মৃতের সংখ্যা ছিল মোট ৩৩১২—কিন্তু সম্ভবত: আরও অনেক বেশী সংখ্যক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল।[১]

১৮৭৬ খ্রী: ৩১শে অক্টোবর মেঘনা নদীর মোহনার নিকটে নদীর দুই তীরে এবং সন্দীপ, হাতিয়া ও দক্ষিণ শাবাজপুর প্রভৃতি দ্বীপে ঘূর্ণবাত ও ঝড়ের বেগে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে নদীর ঢেউ ১০।১২ ফুট বা তাহার চেয়েও উঁচুতে ওঠায় তিন হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের ১০,৬২,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ২,১৫,০০০—সম্ভবত: আরও বেশি—লোকের মৃত্যু হয়। মৃত গবাদি পশুর সংখ্যাও ছিল খুব বেশি। কোন কোন গ্রামের মোট অধিবাসীদের শতকরা, ৩০, ৫০, এমন কি ৭০ জনেরও প্রাণ নাশ হইয়াছিল।

১৮৯৭ খ্রী: ২৪শে অক্টোবর চট্টগ্রাম জেলায় ঘূর্ণবাত ও উচ্চ নদী-তরঙ্গের ফলে ১৪,০০০ লোকের ও ১৫,০০০ গবাদি পশুর মৃত্যু হয়।

১৮৯৭ খ্রী: ১২ই জুন সমগ্র বঙ্গদেশে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয় ইহার পূর্বে আর কখনও সেরূপ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। উত্তর বঙ্গে ইহার প্রকোপ ছিল খুব বেশি। ১৩৫ জন লোকের মৃত্যু হয়, এবং বহু ঘর-বাড়ী ধ্বংস হয়।

১৮৮৭ খ্রীঃ বাংলাদেশের নিম্নশ্রেণীর অবস্থা নির্ণয় করার জন্য একটি বিশেষ তদন্ত করা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে বাংলার শ্রমজীবিগণের অবস্থা মোটামুটি ভাল এবং তাহাদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে। তাহাদের তুলনায় বিহারের ঐ শ্রেণীর লোকের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।[২]

কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলেও মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত এবং তাহার প্রতিরোধের জন্য ভারত সরকার নানারূপ ব্যবস্থা করিতেন। ১৮৬৭, ১৮৭৩-৪, এবং ১৮৯৬-৭ খ্রীঃ ব্যাপক ভাবে দুর্ভিক্ষ হয়। বর্ষাকালে যথেষ্ট বৃষ্টি না হওয়াতে ফসলের অপ্রাচুর্যই এই সমুদয় দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ কারণ। কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে, সমুদয় স্বাভাবিক দৈব দুর্বিপাকের জন্য পূর্বেই প্রস্তুত থাকার মত শস্য বা অর্থ সঞ্চয় সাধারণ লোকের সাধ্য ছিল না।

১৮৬১-৬২ সনের শেষে ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হাওড়া হইতে মুঙ্গের পর্যন্ত লাইন খোলা হয়। ১৮৬২ সনে কলিকাতা হইতে কুষ্ঠিয়া ও ক্যানিং টাউন পর্যন্ত দুইটি পৃথক রেল লাইন খোলা হয়। ১৮৭১-৭২ সনে উত্তর বাংলার মধ্য দিয়া দার্জিলিং পর্যন্ত রেল লাইন খুলিবার প্রস্তাব মঞ্জুর হয় ও কার্য আরম্ভ হয়। ১৮৮১-৮২ সনের পূর্বেই নিম্নলিখিত রেলওয়ে লাইনগুলি খোলা হয়।

১। Northern Bengal State Railway (ইহা পরে দিনাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়)।

২। Darjeeling Himalayan Railway.

৩। Calcutta and South-Eastern State Railway (ইহা পরে ডায়মণ্ড হার্বার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়)।

৪। Central Bengal Railway (যশোহর হইয়া খুলনা পর্যন্ত)।

১৮৮৭ সনের পূর্বেই কুমিল্লা হইতে কাছার, বৈদ্যবাটি—তারকেশ্বর, বর্ধমান—কাটোয়া, মেদিনীপুর—পুরী, নারায়ণগঞ্জ—ঢাকা—মৈমনসিং প্রভৃতি রেলওয়ে লাইন খোলা হয় এবং নারায়ণগঞ্জ—গোয়ালন্দ ষ্টীমার লাইন খোলা হয়। মোটের উপর বাংলা দেশের প্রায় সবগুলি রেল লাইনই উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার আগে খোলা হয়।

৫। পৌর প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসন

(ক) কলিকাতা শহরের উন্নতি

সতরো শতকের শেষ ভাগে গঙ্গার তীরবর্তী তিনখানি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করিয়া ইংরেজ কোম্পানি কলিকাতা শহরের পত্তন করে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তারপর ধীরে ধীরে নূতন নূতন পার্শ্ববর্তী গ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আঠারো ও উনিশ শতকে কলিকাতা বড় হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। ১৭৭৯ সনেও দক্ষিণে খিদিরপুর নালা, পশ্চিমে গঙ্গা এবং পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 'মারহাট্টা ডিচ' (বর্তমান সার্কুলার রোড) ছিল ইহার সীমানা। 'ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম' এই নামটি কলিকাতা শহরের পূর্ব অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়। এণ্টালি, বেনিয়াপুকুর, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ প্রভৃতি অনেক অঞ্চল উনিশ শতকে কলিকাতা নগরের সীমানাভুক্ত করা হয়।[৩]

কলিকাতা প্রথমে খুব অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। এখন যেখানে গড়ের মাঠ সেখানে জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর আবাস ছিল। চোর ডাকাতের ভয়ও ছিল। এখন যেখানে চৌরঙ্গী রোড সেই পথ দিয়া কলিকাতা হইতে দক্ষিণে কালীঘাটের দিকে যাইতে হইলে শান্ত্রী পাহারা ছাড়া পথ চলা নিরাপদ ছিল না। সমুদ্রের লোনা জল বর্তমান শহরের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত আসিত এবং এখান হইতে একটি ক্ষুদ্র নালা দিয়া গঙ্গা নদীতে পড়িত। বর্তমান কালের Salt Lake ও Creek Row নামক ক্ষুদ্র গলি (সুবোধ মল্লিক পার্কের পূর্বে) এখনও তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে। শহরের নর্দমাগুলি প্রায়ই ময়লা জলে ভর্তি থাকিয়া স্বাস্থ্যের হানি ঘটাইত। কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন: "দিনে মশা, রেতে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।"

সাহেবরা যে পাড়ায় থাকিতেন তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। ১৮৪৯ সনে সম্বাদ ভাস্কর লিখিয়াছে: "বাঙ্গালী পাড়ার প্রতি পথের পার্শ্বে পার্শ্বে নর্দমার কত ময়লা উদ্ধৃত হইয়াছে; এক এক পথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে পর্বতাকার এমত ময়লা রহিয়াছে পথিকেরা এরূপ কখন দেখেন নাই ··· শিমলার পরিসর পথের উভয় পার্শ্বেই যখন নর্দমার ময়লায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তখন গলিপথের দশা সহসাই বোধগম্য হইবে।"[৪]

৬৫ বৎসর পরেও যে স্বাস্থ্যের দিক দিয়া কলিকাতার বিশেষ উন্নতি হয় নাই ১৮৬৪ সনে স্বাস্থ্য কমিশনের সভাপতি সার জন ষ্ট্রাচীর মন্তব্য হইতে তাহা বোঝা যায়। ইহার সারমর্ম উদ্ধৃত করিতেছি :

"কলিকাতা শহরের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই অভিযোগ শোনা যাইতেছে। কিন্তু বর্তমানে ইহা চূড়ান্তে পৌঁছিয়াছে। দক্ষিণ কলিকাতায় যে অঞ্চলে বড় বড় বাড়ীতে সাহেবরা থাকেন তাহার অবস্থাও অতিশয় খারাপ। আর উত্তর কলিকাতা যেখানে লক্ষাধিক এদেশীয় লোকে বাস করে সেখানকার শোচনীয় অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ভারতের অন্যান্য শহরে বা পৃথিবীর যে কোন শহরের সব চেয়ে নোংরা যে অঞ্চল আমি দেখিয়াছি তাহার সহিত এক মুহূর্তের জন্যও কলিকাতার কুৎসিত অবস্থার তুলনা হইতে পারে না। যদি উত্তর কলিকাতার রাস্তার খোলা নর্দমায় যে ভাবে ময়লা জমিয়া পচিয়া পূতি-গন্ধময় বায়ুর সৃষ্টি করে তাহার সঠিক বিবরণ বিলাতের কোন কাগজে প্রকাশিত হয় তবে লোকে তাহা বিশ্বাস করিবে না। শহরের অবস্থা যেমন, যে নদীর তীরে ইহা অবস্থিত তাহার অবস্থাও তদ্রূপ। এই নদীর জলই শহরের অধিকাংশ লোক পান করে, অথচ প্রতি বৎসর পাঁচ হাজার মৃতদেহ কলিকাতা হইতে নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। সরকারী হাসপাতাল হইতেই এক বছর দেড় হাজার মৃতদেহ ঐ নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আরও কত রকমে যে এই নদীর জল কলুষিত হয় তাহার বর্ণনার প্রয়োজন নাই। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের রাজধানী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহরের অন্যতম কলিকাতা কোন সুসভ্য জাতির পক্ষে নিন্দা ও লজ্জার বিষয় এবং ইহা সভ্য মানব জাতির বাসের অযোগ্য।"[৫]

কলিকাতার অধিবাসিগণও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং এ সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন করেন। ইহার ফলে ১৮৮৪ সনের ১৪ই অগষ্ট গভর্নর একটি কমিটি নিয়োগ করেন এবং ইহার রিপোর্ট অনুযায়ী শহরের অনেক উন্নতি হয়। ১৮৮৮ সনে এক নূতন আইনের দ্বারা সাতটি শহরতলী কলিকাতা মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত করা হয় এবং ইহার আয়তন ৬ বর্গ মাইল হইতে ১১½ বর্গ মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা চারি লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ ৮২ হাজার, এবং আয়ের পরিমাণ ২৮ লক্ষ হইতে ৩৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।[৬]

১৮৭০ সনে কলিকাতা শহরে কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। ইহার পূর্বের পাঁচ বৎসরে কলিকাতায় ১৮,৪২২ জন কলেরায় মারা যায়—কিন্তু পরের পাঁচ বৎসরে মৃত্যু সংখ্যা কমিয়া মাত্র ৫৯২২ হয়।

১৮৭৪ সনে হাওড়া পোলের (পুরাতন—অধুনা বিলুপ্ত) নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ইহাতেও কলিকাতা শহরের অশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

কলিকাতা শহরের ক্রমশঃ উন্নতি বিধান ব্রিটিশ রাজত্বে বাংলা দেশের ইতিহাসে একটি বিশের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলিকাতার বাড়ীঘর ও গাড়ীর সংখ্যা 'সংবাদ প্রভাকরে' এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :'

কলিকাতা নগরে ১৮৫০ সালে সর্বশুদ্ধ ২৬৫৬৫ বাটী নিরূপিত হয়। তদ্বিশেষ।

একতলা বাটী	...	৫৯৫০
দোতালা ঐ	...	৬৪৩৮
তেতালা ঐ	...	৭২১
চৌতালা ঐ	...	১০
পাঁচতালা ঐ	...	১
খড়ুয়া ঘর	...	৪৯৪৪৫
ভূমি ১৫১৪৪/বিঘা		
ইহাতে প্রজার সংখ্যা		৩৬১৩৬৯
দুই অশ্বে যোজিত চারিচাকার গাড়ী		৬৭৬
এক অশ্বে যোজিত		১৬৮৯
ছেক্ড়া ও অন্যান্য গাড়ী		১৩৯১
দুই চাকার গাড়ী		৮৬৪
সোয়ারি পনি ঘোড়া		৪২৬
গাড়ী টানা বড় ঘোড়া		২৮৫০
„ টাটু ঘোড়া		২০০৩

ইহার তিন বৎসর পরে সংবাদ প্রভাকরের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—কারণ ইহা হইতে বোঝা যায় যে একশত বৎসর পূর্বেও পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীরা শহরের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য খুব ব্যগ্র ছিল না।

• "আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর জেনরেল সাহেব সংপ্রতি এরূপ মানস করিয়াছেন যে কলিকাতা নগরের সীমাবৃদ্ধি করিবেন। ভবানীপুর, কালীঘাট, চক্রবেড়ে, শিবাদহ, ইণ্টালি, বৈঠকখানা, বরাহনগর, কাশীপুর, চিৎপুর, পাকপাড়া প্রভৃতি গ্রাম সকল নগরভুক্ত হইবেক। চারিজন মাজিস্ট্রেট চারি ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক শান্তিকার্য নির্ব্বাহ করিবেন। ছোট আদালতের বিচারপতিদিগের ক্ষমতা বাড়িবেক ··· কিন্তু এক বিষয়ে আমারদিগের শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে, কলিকাতা নগরীর বসত বাটীর টেক্স গ্রহণের যে নিয়ম চলিত আছে ঐ নিয়ম উল্লেখিত গ্রামাদিতে প্রচলিত হইলে প্রজারা সুখানুভব করিবেন না। আর নাগর্য্য কমিস্যনের মহাশয়েরা যে সমস্ত বায়না অর্থাৎ নিয়মাদি এতন্নগরে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা নিরানন্দ হইবেন। পর্ব্বাহ সময়ে আমারদিগের খোদাবন্দ প্রধান মাজিস্ট্রেট সাহেব যে যে হুকুম জারি করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহারা ক্লেশ বোধ করিবেন। এই কয়েক বিষয়ে নগরবাসিরা যে ক্লেশ ভোগ করিতেছে পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামনিচয় নিবাসি লোকেরা তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই, কিন্তু মহানগর কলিকাতার সীমাবৃদ্ধি হইলেই তত্তাবৎ তাঁহারদিগকে অনুভব করিতে হইবেক।···

"নগরের সীমাবৃদ্ধি হইলে টেক্স অফিসের আয় বৃদ্ধি হইবেক, অতি কষ্টে প্রজাদিগকে টেক্সের টাকা প্রদান করিতে হইবেক, না দিলে তাহাদিগের রক্ষা থাকিবেক না, এদিকে রাস্তা মেরামত, নরদমা পরিষ্কার, আলোক প্রদান ও জল সেচন প্রভৃতি যে যে বিষয়ে রাজপুরুষেরা আইন নিবন্ধন দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কিছুই হইবেক না, অতএব আমারদিগের গবরনর জেনরেল সাহেব নগরের সীমাবৃদ্ধি করণের যেরূপ মহদভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন সেইরূপ ইহার শোভা বৃদ্ধি বিষয়ে বিশিষ্টরূপ মনোযোগী হউন। ···"[৮]

এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক ছিল না কারণ বহু বৎসর পর্যন্ত কলিকাতা নগরে শাসন ও সংরক্ষণের সুব্যবস্থা হয় নাই।

(খ) স্বায়ত্তশাসন

প্রথমে কোম্পানির একজন কর্মচারী কলিকাতা শাসন করিতেন—তাঁহাকে বলা হইত জমিদার। ১৭২৭ সনে একজন মেয়র (Mayor) ও নয়জন

অল্ডারম্যান (Aldermen) লইয়া গঠিত একটি পৌরসভা (Corporation) এবং একটি "Mayor's Court" অর্থাৎ বিচারালয় স্থাপিত হয়। ১৭৯৪ সনে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত কয়েকজন জাস্টিসেস্ অফ দি পিস্ (Justices of the Peace) বিচার কার্য ছাড়াও শহরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুলিশের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারা চৌকিদার, ঝাড়ুদার, মেথর প্রভৃতি নিযুক্ত করিতেন এবং শহরের বাড়ী ও জমির উপর কর আদায় করিয়া ইহার ব্যয় বহন করিতেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জাস্টিসেরা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না এবং একজন চীফ ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁহার সহযোগী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকেই সব কাজ করিতে হইত। এইজন্য ১৮৪৭, ১৮৫২ ও ১৮৫৬ সনের আইনে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কার্যভার কয়েকজন বেতনভোগী কমিশনারের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং বাড়ী, গাড়ী ও জল সরবরাহের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়। ১৮৫৬ সনের আইনে কলিকাতায় গ্যাসের বাতি ও নর্দমার ব্যবস্থা করা হইল। ইহাতেও সুফল না পাওয়ায় ১৮৬৩ সালের আইনে কলিকাতায় মিউনিসিপাল কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইল। সকল জাস্টিসেস্ অফ দি পিস্ ইহার সভ্য হইলেন কিন্তু কার্যকরী ক্ষমতা ইহার চেয়ারম্যানের হস্তে ন্যস্ত হইল। ইনি গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং পুলিশ কমিশনারের কাজও করিতেন। স্যার স্টুয়ার্ট হগ চেয়ারম্যান হইয়া বাড়ী ও জলের কলের উপর কর বসাইয়া শহরের নর্দমা পরিষ্কার ও জল সরবরাহের সুব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু অন্য সদস্যেরা বিশেষ কোন কার্য না করায় ১৮৭৬ সালে নূতন এক আইনে জাষ্টিস্‌দের বদলে করদাতাগণের নির্বাচিত ৪৮ ও গভর্নমেণ্ট মনোনীত ২৪ মোট ৭২ জন কমিশনার কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য হইলেন। ১৮৮২ সালে নির্বাচিত কমিশনারের সংখ্যা দুইজন বাড়াইয়া ৫০ করা হইল এবং কলিকাতা শহরতলীর কতক অংশ কর্পোরেশনের অধিকারের মধ্যে আনা হইল।

বড়লাট লর্ড কার্জনের আমলে ১৮৯৯ সনে যে নূতন আইন হয় তাহাতে নির্বাচিত কমিশনারের সংখ্যা অর্ধেক করা হইল। বাকী ২৫ জনের মধ্যে বাংলা গভর্নমেণ্ট ১৫ জন, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স ও কলিকাতা ট্রেডস্ অ্যাসোসিয়েসন প্রত্যেকে চারিজন এবং কলিকাতা পোর্ট কমিশনার দুইজন মনোনীত করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা হইল। গভর্নমেণ্ট নিযুক্ত চেয়ারম্যানের

হাতে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হইল এবং মিউনিসিপাল ট্যাক্সের পরিমাণ নির্ধারণ এবং সাধারণভাবে শাসন প্রণালীর আলোচনা ছাড়া কর্পোরেশনের হাতে আর কোনও ক্ষমতা রহিল না। এইভাবে করদাতা নাগরিকগণের ক্ষমতা খর্ব করায় বিষম বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। কংগ্রেসের সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার অভিভাষণে এবং স্বনামধন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে এইরূপে কলিকাতা নগরীর স্বায়ত্ত শাসনের বিলোপের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। এই আইনের প্রতিবাদস্বরূপ কর্পোরেশনের ২৮ জন কমিশনার পদত্যাগ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথও ইঁহাদের একজন ছিলেন। অমৃতলাল বসু "সাবাস আটাশ" নামে একখানি ক্ষুদ্র নাটকে ইঁহাদের অভিনন্দন করিলেন। ইহা কলিকাতা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইল। অদৃষ্টের অপূর্ব পরিহাসের দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথই বাংলা দেশের মন্ত্রীরূপে কলিকাতা কর্পোরেশনে নাগরিকদের ক্ষমতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নূতন আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

১৮৫০ সনের ২৬ সংখ্যক আইনে কলিকাতার বাহিরেও কোন কোন শহরে মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৬৪ সনের ৩নং আইনে এবং ১৮৬৭ সনের পরিবর্তনে (amendment) ইহাদের সম্বন্ধে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা হয়। সরকারের মনোনীত অন্যূন ৭ জন অধিবাসী, এবং বিভাগীয় কমিশনার, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিউনিসিপাল সভার সদস্য এবং জিলা ম্যাজিস্ট্রেট সভাপতি (chairman) হন। বাড়ী, ঘর, জায়গা, জমি, গাড়ী, ঘোড়া, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতির উপর ট্যাক্স বসাইবার ক্ষমতা মিউনিসিপ্যালিটিকে দেওয়া হয়।

কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলের উন্নতির বিষয়ে গভর্নমেণ্ট প্রথমে খুব দৃষ্টি দেন নাই। ইংরেজ সরকার প্রথম প্রথম রাজস্ব আদায় ও শান্তি রক্ষার দিকেই মনোযোগ দিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না এবং কতকটা অর্থের অভাবেও বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় নাই। বেণ্টিঙ্কের আমলে শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু তৎপরতা দেখা যায়। অবশেষে স্থির হয় যে লোকের নিকট হইতে, রাস্তা ঘাট নির্মাণ, শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কর আদায় করিয়া তাহাদের হাতেই ইহার ভার দেওয়া হউক। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন পাশ হয়। ইহাতে নির্দেশ দেওয়

হয় যে, প্রতি জিলায় ম্যাজিষ্ট্রেট একটি জিলা বোর্ড গঠিত করিবেন—ইহার সদস্যেরা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত হইবে—কিন্তু ইহার এক তৃতীয়াংশের বেশি সরকারী কর্মচারী হইবে না। এই কমিটি রোডসেস্ (পথ কর) আদায় করিয়া রাস্তাঘাট নির্মাণ করিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার সভাপতি থাকিবেন।

এইগুলির মধ্য দিয়া যাহাতে ভারতবাসী স্বায়ত্ব শাসন প্রণালী শিক্ষা করিতে পারে তাহার জন্য বড়লাট লর্ড রিপন নির্বাচিত বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা বাড়াইয়া যাহাতে প্রতি বোর্ডে তাহাদেরই সংখ্যাধিক্য থাকে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এই অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, যথাসম্ভব বেসরকারী ব্যক্তিরাই এই সমুদয় বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন। কিন্তু সাধারণতঃ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটই ইহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতেন—সুতরাং লর্ড রিপনের মহান উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তথাপি ১৮৮২ সালে এই বিষয়ে লর্ড রিপন যে বিস্তৃত মন্তব্য করেন তাহাই ভবিষ্যতে বাংলা তথা ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের আদর্শ ও মূল ভিত্তিরূপে গৃহীত হইয়াছে।

লর্ড রিপনের মন্তব্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য ১৮৮৫ সনে এক নূতন আইন পাশ হয়। ইহাতে প্রতি জিলায় জিলা বোর্ড এবং ইহার অধীনে অনেক মহকুমায় লোকাল বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব হয়। লোকাল বোর্ডের সদস্যদের তিন-চতুর্থাংশ নির্বাচিত হইবে এবং লোকাল বোর্ড জিলা বোর্ডের অন্তত অর্ধেক সদস্য নির্বাচন করিবে। জিলা বোর্ডের হাতে রাস্তাঘাট ও হাসপাতাল, দুর্ভিক্ষে সাহায্য, প্রভৃতি বিষয়ে অনেক ক্ষমতা দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থাও করা হয়। ট্রামওয়ে, রেলপথ, জলের কল এবং সরকারী গৃহ নির্মাণের ক্ষমতা এবং প্রাথমিক ও মধ্য বাংলা বিদ্যালয় চালাইবার সম্পূর্ণ ভারও জিলা বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়। যদিও চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল তথাপি বরাবরই জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট জিলা বোর্ডের এবং মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইতেন।

৬। ইংরেজী শিক্ষার প্রসার

বাংলা দেশে একজন লেফ্‌টেনান্ট গভর্নরের অধীনে স্বতন্ত্রভাবে শাসনের ব্যবস্থা হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতের কোর্ট অব্‌ ডিরেক্টরস্ বঙ্গদেশে

তথা ভারতে যে নূতন শিক্ষানীতির প্রবর্তন করেন তাহা এদেশে শিক্ষার ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়া আছে। ১৮৫৪ সনের ১লা মে বাংলার প্রথম লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর সার ফ্রেডারিক জেম্‌স্‌ হ্যালিডে কার্যভার গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর ১৯শে জুলাই বিলাতে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি সার চার্লস্‌ উড (Sir Charles Wood) তাঁহার প্রসিদ্ধ শিক্ষা বিষয়ক অনুশাসন (Education Despatch) লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতে এদেশে ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের উদ্দেশ্যে যে সমুদয় প্রস্তাব করা হয় তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল :

(১) শিক্ষার জন্য একটি পৃথক শাসন-বিভাগের (Separate Department of the administration for education) সৃষ্টি।

(২) কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(৩) সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ের (School) শিক্ষকের শিক্ষার নিমিত্ত নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

(৪) বর্তমানে যে সকল সরকারী স্কুল ও কলেজ আছে তাহার পরিচালনার সুব্যবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি।

(৫) নূতন নূতন মাধ্যমিক স্কুলের প্রতিষ্ঠা।

(৬) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সকল পাঠশালা আছে তাহাদের উন্নতি সাধন।

(৭) বে-সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারী অর্থ সাহায্য দানের ব্যবস্থা। ইহা কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে আবদ্ধ হইবে না।

(৮) সাধারণ লোকের জীবিকা উপার্জনের উপযোগী কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা।

(৯) মেধাবী ছাত্রেরা যাহাতে ক্রমশঃ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারে তাহার জন্য বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা।

(১০) উচ্চশিক্ষা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এবং প্রাথমিক ও নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা বাংলা ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হইবে।

(১১) স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও সরকারী সাহায্য দান।

(১২) সরকারী পদে নিয়োগের জন্য শিক্ষার প্রাধান্য স্বীকার—অর্থাৎ সকলপ্রকার সরকারী চাকুরীতেই অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিতের অধিকতর দাবি থাকিবে।

এই সমুদয় প্রস্তাব অনুসারে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এখানে সাধারণ শিক্ষা (Arts), আইন, ডাক্তারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার জন্য পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা করা হইল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজকে আদর্শ কলেজে পরিণত করার জন্য ইহার অনেক উন্নতি সাধিত হইল।

১৮৫৯ সনের ৭ই এপ্রিল তারিখের শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিবরণী হইতে জানা যায় যে, বিগত পাঁচ বৎসরে বাংলা দেশে সরকারী সাহায্যে ইংরেজী উচ্চ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নতি হইয়াছে ও সংখ্যা বাড়িয়াছে, কিন্তু সাধারণের আগ্রহের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার কোন উন্নতি বা প্রসার হয় নাই। ইহার প্রতিকারের জন্য লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর সার জন পিটার গ্র্যান্ট দেশীয় ২৫ জন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এক সুদীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন (১৯শে অক্টোবর ১৮৬০)। তিনি স্বীকার করেন যে এই সমুদয় প্রাথমিক পাঠশালার ঘরগুলির অবস্থা শোচনীয় ; 'গুরু'দিগের বিদ্যাবুদ্ধি যে পরিমাণে কম, কুসংস্কার সেই পরিমাণে বেশি ; পাঠ্য পুস্তকের অভাব ; শিক্ষার মান খুবই নিম্ন ও শিক্ষার্থীদের দারিদ্র্য খুবই বেশি। কিন্তু তথাপি তিনি যে ৩০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে তাহা উঠাইয়া না দিয়া প্রতি জিলায় কতকগুলি (গড়ে একশত) বিদ্যালয়কে সরকারী দানের সাহায্যে উন্নত করা এবং ৬টি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন ও চারি জন সাব-ইনস্পেক্টর নিয়োগের প্রস্তাব করেন। ইহার জন্য প্রতিবৎসর মোট ১২,০০০ টাকা নিম্নলিখিতরূপে ব্যয়ের বরাদ্দ হয়—

১০০ স্কুলে সাহায্য	...	৫০০০ টাকা
৬টি আদর্শ বিদ্যালয় মাসিক ৩০ টাকা হিঃ		২১৬০ „
৪ জন সাব-ইনস্পেক্টর মাসিক ১০০ টাকা		৪৮০০ „
		১২,৯৬০ টাকা

ইহা ছাড়া প্রতি বিদ্যালয়ে সস্তায় পুস্তক সরবরাহ করারও ব্যবস্থা হয়। এ পর্যন্ত যাহা কেবল মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হইত--এই সকল পুস্তকের সাহায্যে ছাত্রেরা তাহা শিখিতে পারিবে। অর্থাৎ ইহাতে গণিত, কৃষি ও ব্যবসায় সংক্রান্ত সহজ হিসাব, চুক্তিপত্র, খত, দলিল, ও সাধারণ চিঠিপত্র লেখা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা থাকিবে।

কয়েক বৎসর পরে এই সকল বিদ্যালয়ের গুরুদিগের শিক্ষার জন্য বর্ধমান, কৃষ্ণনগর ও যশোহরে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর সার জর্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১-৭৪) প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি-বিধানের জন্য অনেক চেষ্টা করেন। তিনি প্রতি গ্রাম্য পাঠশালায় মাসিক পাঁচ টাকা সাহায্য করেন, এবং যেখানে পাঠশালা নাই সেখানে নূতন পাঠশালা ঐ পরিমাণ অর্থব্যয়ে স্থাপন করেন। ১৮৭২ সনের ৩১শে মার্চ সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠশালার সংখ্যা ছিল ২৪৫১ এবং মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৪,৭৭৯। মোট সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ১,৩০,০০০ টাকা। সার জর্জ আরও চারি লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। ১৮৭৩ সনের শেষে মোট প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ের পরিমাণ ছিল আট লক্ষ টাকা—১০,৭৮৭ গ্রাম্য পাঠশালায় ২,৫৫,৭২৮ জন ছাত্র পড়িত। পর বৎসরে ইহাদের সংখ্যা বাড়িয়া হয়, যথাক্রমে ১২,২২৯ এবং ৩,০৩,৪৩৭। ১৮৭৫-৭৬ সনে এই সংখ্যা ছিল ১৫,১৬০ ও ৪,১৫,৫৮৫; এবং ১৮৯৩ সনে ৪৭,৫২৫ ও ১১,২২,৯৩০।

ভারত সরকার ইংরেজী স্কুলের শিক্ষার ব্যয় কমাইবার জন্য ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন—কিন্তু বাংলার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর ইহার প্রতিবাদ করেন। মোটের উপর বাংলার গভর্নমেণ্ট শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে সর্বদাই যত্নশীল ছিলেন এবং প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে টেকনিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। হুগলী ও ঢাকায় সার্ভে স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর সার রিচার্ড টেম্পল (১৮৭৪-৭৭) বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতির ব্যবস্থা করেন এবং শিল্প বিদ্যালয়ের (School of Art) সঙ্গে একটি ছবির গ্যালারী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮০ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ তুলিয়া দিয়া শিবপুরে বর্তমান ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮৮২ সনে ভারত সরকার শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। ইহার সভাপতি ছিলেন সার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার (Sir William Wilson Hunter)। ১৮৮৩ সনে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ইহাতে বাংলা দেশে শিক্ষার ব্যবস্থার গুরুতর কোন পরিবর্তন হয় নাই। বহরমপুরে ও মেদিনীপুরে যে দুইটি সরকারী কলেজ ছিল তাহা বে-সরকারী কলেজে পরিণত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাৎসরিক দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব অপাতত: মুলতবী রাখা হয়।

১৮৯৬-৯৭ সনে শিক্ষা বিভাগের চাকুরীর নূতন ব্যবস্থা হয়। উচ্চতর বিভাগের নাম হয় "ভারতীয় শিক্ষা বিভাগ" ও নিম্নতর বিভাগের নাম হয় "প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগ"। উচ্চতর বিভাগের কর্মচারীরা বিলাতে নিযুক্ত হইতেন। প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগেরও আবার দুইটি স্তর ছিল—উভয় স্তরের কর্মচারীরাই এদেশের গভর্নমেণ্ট নিযুক্ত করিত। ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীরা অধ্যাপক (Professor) ও ইনস্‌পেকটর (Inspector) পদে নিযুক্ত হইতেন এবং তাঁহাদের বেতনের হার ছিল—প্রথম পাঁচ বৎসর অস্থায়ী ভাবে (On probation) থাকা কালীন মাসিক ৫০০-৫০-৭০০ ; পরে ৭৫০-৫০-১০০০। ইহা ছাড়া কোন কোন পদের অতিরিক্ত ভাতা (allowance) ছিল মাসিক ২৫০ হইতে ৫০০ টাকা। উচ্চতর প্রাদেশিক স্তরের বেতন ধার্য হইল প্রতি মাসে ১৫০ হইতে ৭০০ টাকা—ইঁহারা অধ্যাপক, ইনস্‌পেক্‌টর ও সহকারী ইনস্‌পেক্‌টর পদে নিযুক্ত হইতেন। জিলা স্কুলের হেডমাস্টার, ডেপুটি ইনস্‌পেক্‌টর প্রভৃতি নিম্ন প্রাদেশিক স্তরের কর্মচারীদের সর্বোচ্চ বেতন ছিল মাসিক ২০০ কি ২৫০ টাকা।[২]

এই ব্যবস্থার ফলে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মত মনস্বীরাও প্রাদেশিক বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—বিলাত হইতে সদ্য আগত, অনেক স্থলেই অখ্যাত, তরুণবয়স্ক ইংরেজ অধ্যাপকগণ উচ্চতর বিভাগে নিযুক্ত হইয়া তাঁহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। ভারতীয় মাত্রেই এই কুব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন এবং কোন কোন উচ্চপদস্থ বিলাতী রাজকর্মচারীও ইহার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন। তথাপি এই ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল—তাহার পরেও, কোন কোন স্থলে ব্যতিক্রম ঘটিলেও, সাধারণতঃ সাহেবরাই ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত হইতেন—প্রভেদের মধ্যে কোন কোন ভারতীয় অধ্যাপক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিলে পরিণত বয়সে ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে উন্নীত হইতেন।

১৮৮৩ সনে স্ত্রীলোকদিগকে মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা লাভের অধিকার দেওয়া হয়। সার রিচার্ড টেম্পলের আমলে (১৮৭৪-৭৭) এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং সাধারণের অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু ইহা কার্যে

পরিণত হয় নাই। ১৮৮২ সনে পুনরায় প্রস্তাবটি আলোচিত হয়। জনসাধারণ ইহার অনুকূলে মত দিলেও এবং কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহাদের কন্যাদিগকে ভর্তি করিতে চাহিলেও Medical College Council স্ত্রীলোকদিগকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করিতে অসম্মত হন। তখন লেফে্‌টেনান্ট গভর্নর সার রিভার্স টমসন (১৮৮২-৮৭) স্ত্রীলোকদিগের ভর্তির প্রস্তাব সমর্থন করিয়া সুদীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ইহার ফলে মেয়েরা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইবার অধিকার লাভ করে।

পাদটীকা

১। Buckland, C. E.—*Bengal under the Lieutenant Governors*, pp.298-9, 621.

২। ঐ, পৃঃ ৮৬৪

৩। বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে সমাজ চিত্র, ১।৫১৫-৬

৪। ঐ, ৩।২৭৭

৫। Buckland, p. 281

৬। ঐ, p. 820

৭। ঘোষ, ১।১৭৫

৮। ঐ, ১।১৯৭

৯। Buckland, p. 927

দ্বিতীয় খণ্ড

বাংলার নব-জাগরণ (১৮০০-১৯০৫)

চতুর্থ অধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা দেশ (১৭৬৫-১৮০০)

১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশি যুদ্ধের পর অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইংরেজী শাসন বাংলাদেশে কিরূপে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল প্রথম খণ্ডে তাহা বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু শাসন ব্যবস্থায় গুরুতর পরিবর্তন হইলেও ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে মধ্যযুগের পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই সকল সম্বন্ধে বাংলাদেশের অবস্থা প্রায় একরূপই ছিল। কবিবর নবীন চন্দ্র সেন 'পলাশির যুদ্ধ' নামক বিখ্যাত কাব্যে পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার শোচনীয় পরাজয়ের পর অস্তগামী সূর্যের উদ্দেশ্যে মোহনলালের যে এক সুদীর্ঘ কাল্পনিক উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে আছে :

"আজি গেলে, কালি পুনঃ হইবে উদয়,
গেল দিন, এই দিন ফিরিবে আবার,
ভারত-গৌরব-রবি ফিরিবার নয়,
ভারতের এই দিন ফিরিবে না আর।"

কিন্তু ইহা নিছক কবির কল্পনা মাত্র। পলাশির যুদ্ধের সময় বা পরে বাংলা দেশের লোকের মনে এই আশঙ্কা কখনও উদিত হয় নাই। সে সময়ের অবস্থায় গৌরব করিবার মতও বিশেষ কিছু ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চেতনা, দেশপ্রীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে সমুদয় উন্নতি বাঙ্গালীকে গৌরবের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠাইয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহার বিন্দুমাত্র সূচনা বা সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। এই সমুদয় গুরুতর পরিবর্তনের ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে নব-জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং যাহা ক্রমে সমুদয় ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া নবীন ভারত গঠন করিয়াছে, পৃথিবীর যে কোন দেশের ইতিহাসে তাহা এক গৌরবময় অধ্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। এই পরিবর্তন

সম্যক বুঝিতে হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা দেশের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

পলাশির যুদ্ধের সময় মুসলমান নবাবদের রাজ্যশাসন প্রথা এবং দরবারের সামাজিক ও ব্যক্তিগত দুর্নীতি অবনতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। রাজকর্মচারীরা প্রায় সকলেই অযোগ্য ও অসৎ, এবং রাজপরিবারের অধিকাংশের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপই ছিল। "আলিবর্দি অনেকটা ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিবারে এমন একজন পুরুষ ছিল না যাহাকে প্রকৃত মানুষ বলা যাইতে পারে, এবং স্ত্রীলোকেরা ছিল ততোধিক পাপিষ্ঠা।"[১] বিলাস ব্যসন ও ইন্দ্রিয়ের সুখভোগই নবাব ও তাহাদের অনুচরদের একমাত্র কাম্য ছিল—নারী ও সুরাই ছিল তাহাদের নিয়ত সঙ্গী। সিরাজউদ্দৌল্লা, মীরণ প্রভৃতির প্রকৃতি এমন ছিল যে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরাও সর্বদাই ভয়ে তটস্থ থাকিত। ফলে সৈন্যরা ছিল অপদার্থ ও অকর্মণ্য এবং নবাবের বিরুদ্ধে অহরহ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ লাগিয়াই ছিল। পারিবারিক জীবনও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও বিলাস ব্যসনের ফলে কলুষিত হইয়াছিল। ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যে এই কলুষতা পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

নবাব দরবারের এই কলুষতা যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজকেই কতকটা দূষিত করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মধ্যযুগে প্রায় ছয়শত বৎসর একত্র বাস করিয়াও হিন্দু ও মুসলমান যে সম্পূর্ণ পৃথক দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।[২] উনবিংশ শতাব্দীতেও এই পার্থক্য স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। ১৮৬৯ খ্রীঃ অমৃতবাজার পত্রিকায় মুসলমানদের সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :

"হিন্দু ও মুসলমানে এ দেশের অধিবাসীগণ বিভক্ত। ...আমাদের দেশের মুসলমানের পূর্বপুরুষেরা তাবতেই যে আফগানিস্থান, তাতার প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়াছেন তাহা নয়। পূর্বকালে হিন্দুসমাজের শাসন অতি কঠোর ছিল। ...যবনে বল দ্বারা কোন হিন্দু স্ত্রীলোককে হরণ করিলে সে গোষ্ঠী সমেত পতন হইত। এরূপ ঘটনা ভদ্রলোকের গৃহে অতি বিরল হইত, অপর (নীচ জাতীয়) লোকের মধ্যেই বিস্তর ঘটিত। এমন কি কোন একটি সামান্য ঘটনা হইলেই তাহার জাতি যাইত। এইরূপে এদেশে মুসলমানের দল বৃদ্ধি হয়। এই সমাজচ্যুত হতভাগ্য ব্যক্তিরা আসল মুসলমান কর্তৃক

গৃহীত হইল না। কাজেই তাহারা নিজেরা বা পৃথক একদল হইল।...ইহাদের পূর্বপুরুষ তল্লাস করিতে গেলে জানা যাইবে যে ইহারা...নীচজাতীয় হিন্দুগণের সন্তান। ...ইহাদের সঙ্গে কি ভদ্র হিন্দুর তুলনা হইতে পারে? সচরাচর গণনা করা হইয়া থাকে যে এদেশে দুই ভাগ হিন্দু ও একভাগ মুসলমান, কলিকাতার জনসংখ্যা নিরূপণ দেখিলে (হিন্দু ২,৩৯,১৯০ ও মুসলমান ১,১৩,০৫৯) তাহাই বোধ হয়। এই মুসলমানের মধ্যে যদি বারো আনার পূর্বপুরুষ এদেশে জাত ধরা হয়, তবু বোধহয় কম ধরা হইল। এ হিসাবে এতদ্দেশে ৩০ লক্ষ বিদেশস্থ, অর্থাৎ জাতি মুসলমান ও ২ কোটি ৬০ লক্ষ হিন্দু আছে।"*

বাংলাদেশে মুসলমানদের উৎপত্তি সম্বন্ধে উল্লিখিত বিবরণ কতদূর সত্য তাহা বলা কঠিন। কিন্তু তৎকালে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহার সম্বন্ধে ইহা হইতে অনেকটা সত্য ধারণা করা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কাল্পনিক ভ্রাতৃ-ভাবের যে প্রবল বন্যা ও উচ্ছ্বাস বহিয়াছিল—তাহার সহিত উল্লিখিত উক্তির কোন সমন্বয় বা সামঞ্জস্য করা কঠিন। অপ্রিয় হইলেও ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করা উচিত নহে—কারণ তাহা হইলে ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না। পাকিস্থান সৃষ্টির মূলে যে কেবল সৈয়দ আহম্মদ ও জিন্নার অবদান আছে তাহা নহে, মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে হিন্দুদিগের চিরন্তন মনোভাবও ইহার জন্য কতক পরিমাণে দায়ী। এই মনোভাব কতদূর ন্যায়সঙ্গত ছিল এবং কি কারণে গড়িয়া উঠিয়াছিল, বর্তমান প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। বহুকাল পাশাপাশি অবস্থানের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ উভয়ের মধ্যে অনেক স্থলে বাহ্যিক প্রীতির বন্ধন ছিল এবং উভয়ে উভয়ের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান এবং লৌকিক ধর্মসংস্কার ও বিশ্বাস কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান যে বাংলা দেশে বরাবরই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক সম্প্রদায় ছিল, ধর্ম, সামাজিক আচার ব্যবহার, সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির মধ্য দিয়া যে উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রণ তো দূরের কথা কোন নিবিড় যোগসূত্র গড়িয়া উঠে নাই, এ কথা অস্বীকার করা কঠিন। তাহারা প্রতি গ্রামে ও শহরে বা পাশাপাশি গ্রামে এক সঙ্গে বাস করিত—কিন্তু তাহারা এক পরিবার বা এক সমাজভুক্ত হয় নাই—

তাহারা ছিল মাত্র প্রতিবেশী। উভয়ের মধ্যে সাধারণতঃ সদ্ভাব ও মৈত্রীর সম্বন্ধ ছিল. আবার কখনও ধর্ম বা সামাজিক বৈষম্যের ফলে মতান্তর, মনান্তর, কলহ ও মারামারি হইত—কদাচিৎ ইহা তুমুল দাঙ্গায়ও পর্যবসিত হইত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহাই ছিল বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত সম্বন্ধ। তাহাদের মধ্যে সচরাচর বৈরীভাব ছিল না কিন্তু ভ্রাতৃত্ব বন্ধনেরও কোন প্রমাণ নাই। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য ও অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন থাকিলেও সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃ-ভাব কখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং সর্ব বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ এত গুরুতর ছিল যে ইহার কোন সম্ভাবনাও কেহ মনে করিত এরূপ কোন প্রমাণ নাই। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ইহা কেহ কখনও কল্পনাও করে নাই। ইংরেজ আমলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কিরূপে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অবশেষে পাকিস্তানের সৃষ্টি হইল ইহা সঠিক বুঝিতে হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল সে বিষয়ে প্রকৃত ধারণার প্রয়োজন। আধুনিক যুগে হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ বাংলার—তথা ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এইজন্য প্রথমেই এই বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল।

বাংলায় মুসলমান সমাজে কতকগুলি নূতন প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল এবং এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল যাহা ইসলামের ধর্ম-বিশ্বাসের বিরোধী। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (২৪৮-২৫১ পৃঃ) যাহা বলা হইয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে অনুরূপ আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। হিন্দু-বিবাহের অনেক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান মুসলমান সমাজে ঢুকিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিবাহের পূর্বে কন্যাস্নান ও নানা কেলি-কৌতুক-রঙ্গ, মেয়েদের শাড়ী পরিধান ও চুলের খোপায় ফুল গুজিয়া দেওয়া, ধান্যদূর্বা দিয়া বর বরণ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোনও কোনও মুসলমান সম্প্রদায়ে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় ছিল। এই সমুদয় ছাড়াও যাত্রাকালে শুভ ও অশুভ বস্তু দর্শন, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, জ্যোতিষগণনার উপর নির্ভরশীলতা, মাথায় হাত দিয়া শপথ করা, পূজ্যপাদ ব্যক্তিকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম, শিশুর অন্নপ্রাশন, প্রভৃতি এমন বহু হিন্দু-প্রথা বাংলার মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল যাহা মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে অনুমোদিত নহে।

বাংলার বৈষ্ণব ধর্মও মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অনেক মুসলমান লেখক বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছেন। মুসলমান সাহিত্যে কর্মফলভোগ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

এই সমুদয় খুব স্বাভাবিক কারণেই ঘটিয়াছিল। বাংলা দেশের বহু মুসলমান যে ধর্মান্তরিত হিন্দু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার বাল্যকালে আমাদের গ্রামের নিকটে এক মুসলমান জমিদার ছিলেন; তাঁহার পিতামহ বা প্রপিতামহ যে হিন্দু ছিলেন ইহা ঐ অঞ্চলে সর্বজনবিদিত ছিল। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্তের কথা মনে আছে। সুতরাং ইঁহারা যে পূর্ব সংস্কার ও আচার ব্যবহার কিছু কিছু বজায় রাখিবেন ইহা অস্বাভাবিক নহে। হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের উপর পরস্পরের প্রভাব সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (৩৪৪-৩৪৮ পৃষ্ঠা) যাহা বলা হইয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও তাহাই ছিল; সুতরাং ইহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

দুইটি বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। প্রথমতঃ, এই দুই সংস্কৃতিই ধর্মকেন্দ্রিক এবং দুয়ের মধ্যেই ধর্মান্ধতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। উভয় সমাজেই প্রচলিত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানই ধর্মের স্থান অধিকার করিত—কোনরূপ যুক্তি-তর্ক বা ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বড় একটা ছিল না। হিন্দু সমাজে সতীদাহ, গঙ্গায় শিশু-সন্তান বিসর্জন, চড়ক প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথা এবং বিধবা-বিবাহ নিষেধ ও কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফল লোকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিনা বিচারে মানিয়া লইয়াছে, স্ত্রীলোকের অক্ষর পরিচয় হইলেই তাহাদের বৈধব্যদশা ঘটিবে ইহা বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকের কঠোর পর্দার ব্যবস্থা নির্বিচারে অনুসৃত হইয়াছে। হিন্দুদিগের প্রধান ধর্মোৎসব দুর্গা পূজা ধনীর গৃহে জাক-জমক, নৃত্যগীত ও পান-ভোজনের উপলক্ষ মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই শিক্ষা ও জ্ঞানের গণ্ডী প্রায় ধর্ম বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য জগতে এই সময়ে নূতন নূতন চিন্তাধারার বিকাশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতি সাধন হইতেছিল কিন্তু ইহার কোন সংবাদই বাঙ্গালা দেশে পৌঁছায় নাই। এমন কি মুদ্রণ যন্ত্র সম্বন্ধেও হিন্দু-মুসলমানেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। বাংলা ভাষায় তখন গদ্য

সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না। অবশ্য বাঙ্গালীরা গদ্য ভাষায় কথাবার্তা বলিত, চিঠিপত্র লিখিত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের দুই একখানি প্রচার গ্রন্থ ছাড়া ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাংলা গদ্যে লিখিত এমন একখানি গ্রন্থও নাই যাহা সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালীর নীতি ও চরিত্র এবং হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক সম্বন্ধ বিষয়ে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (৩৩১-৩৫৩ পৃঃ) যাহা বলা হইয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ সম্বন্ধেও তাহা মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বাঙ্গালীর ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল, পরবর্তী একশত বৎসরের মধ্যেই তাহার গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়। ঐ সময়ের মধ্যেই স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়ভাবের উন্মেষ এবং রাজনীতিক অধিকার লাভের প্রেরণা দেখা দেয়। যে সমুদয় কারণে এই গুরুতর পরিবর্তন ঘটে তাহাদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষাই প্রধান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতরাং প্রথমেই এই বিষয়টি আলোচনা করিয়া পরে জাতীয় নবজাগরণের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হইবে।

পাদটীকা

১। History of Bengal Vol. II (Published by Dacca University), p. 497.

২। দ্বিতীয় ভাগ, ৩৩৪-৫০ পৃঃ।

৩। যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা" (১ম খণ্ড) পৃঃ ১৭৪-৬। বর্তমান যুগের রুচিসম্মত না হওয়ায় কয়েকটি শব্দ বাদ দেওয়া বা পরিবর্তন করা হইল।

পঞ্চম অধ্যায়

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার

১। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন

ইংরেজ বণিকদিগের সহিত ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা চালাইবার জন্যই প্রথমে অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এই প্রয়োজন আরও বাড়িয়া যায়। কিন্তু ইংরেজ সরকার এদেশীয় লোককে ইংরেজী বা পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য বহুদিন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই করে নাই; তাহারা সংস্কৃত ও আরবী পার্শী শিক্ষার জন্যই কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেরা বাংলা শিক্ষা করেন এবং বাঙ্গালীদিগকে ইংরেজী শিখাইবার জন্য সচেষ্ট হন। প্রধানত: তাঁহাদের চেষ্টায়ই সর্ব প্রথমে ইংরেজী ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা হয়। ১৭৩১ খ্রীঃ অর্থাৎ পলাশির যুদ্ধের ২৬ বৎসর পূর্বেই সেণ্ট অ্যানড্রুজ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ St. Andrews Presbyterian Church) একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করে। এখানে এবং এইরূপ আরও কয়েকটি মিশনারী প্রতিষ্ঠানে ইংরেজী এবং আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞান শেখান হইত। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বে সর্বসাধারণের এইরূপ শিক্ষার জন্য অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের কথা জানা যায় না। তবে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ভালরূপ ইংরেজী শিখিতেন এবং সাধারণ লোকও কেহ কেহ জীবিকা অর্জনের উপায়স্বরূপ মোটামুটি ইংরেজী শিখিবার চেষ্টা করিতেন। ইঁহারা নিজের অধ্যবসায়ে, কতকটা ইংরেজ বা ইংরেজীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্যে ও সহায়তায়, এবং কতকটা কার্য ব্যপদেশে ইংরেজী শিখিয়া যথেষ্ট সাংসারিক উন্নতি করিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুর কোন বিদ্যালয়ে না পড়িয়াও উত্তমরূপ ইংরেজী শিখিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার আইনজীবি ছিলেন এবং যথেষ্ট খ্যাতি ও অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। দ্বারকা-নাথ ঠাকুর ব্যবসায়ের নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রভূত সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে জন্মিয়া নীলমণি দত্ত ইংরেজ ব্যবসায়ীর বেনিয়ান-গিরি করিয়া ধনী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রসময়

দত্ত (১৭৯৯-১৮৫৪) ১৬ টাকা বেতনে এক ইংরেজ সওদাগরী অফিসের কেরাণীরূপে জীবন আরম্ভ করিয়া কলিকাতা স্মল কজ কোর্টের (Small Cause Court) জজ হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে ছয় লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হওয়ার ফলে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হয় ও ইহার অর্থোপার্জন শক্তিরও বৃদ্ধি হয়। এই সমুদয় কারণে ইংরেজী শিক্ষার জন্য কোন ভাল প্রতিষ্ঠান না থাকিলেও আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বাঙ্গালীরা অনেকে মোটামুটি ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিতেন। ইউরেশিয়ান বালকদেরও ইংরেজীতে শিক্ষা লাভের বিশেষ প্রয়োজন ও আগ্রহ ছিল। ক্রমে ক্রমে এই সমুদয় কারণে ছোট-খাটো একাধিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮০০ সনে বা তাহার কাছাকাছি সময়ে কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরে জগমোহন বসু একটি[১] এবং মধ্য কলিকাতায় ড্রামণ্ড সাহেব ধর্মতলা একাডেমী নামে আর একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ শিক্ষক ডিরোজিও এই শেষোক্ত স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠাতা স্কচ্ জাতীয় ড্রামণ্ড ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তাঁহার বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গী ছাত্রেরা তাঁহার শিক্ষায় যুক্তিবাদী দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইত। ডিরোজিও ও তাঁহার হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এই প্রগতিশীল প্রভাব কিরূপ শক্তিশালী ছিল তাহা পরে উল্লিখিত হইবে। ১৮১৪ খ্রী: ম্যাজিস্ট্রেট ফর্বেশ (Forbes) সাহেব চুঁচুড়ায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

যে সমুদয় খ্রীষ্টান মিশনারী বাংলা দেশে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ব্যাপটিষ্ট উইলিয়ম কেরীর নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। কেরী ১৭৯৩ খ্রী: এদেশে আসেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তখন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহাদের এলাকায় মিশনারীদিগকে প্রচারকার্য চালাইবার অনুমতি দিতেন না। সুতরাং কেরী ১৮০০ খ্রী: ডেন জাতির এলাকা শ্রীরামপুরে যাইয়া বসবাস করেন। এখানে জশুয়া মার্শম্যান (Joshua Marshman) ও উইলিয়ম ওয়ার্ড (William Ward) নামে ব্যাপটিষ্ট মিশনের আর দুইজন তাঁহার সঙ্গে যোগ দেন। এখানে তাঁহারা একটি বিদ্যালয় ও একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায়

ব্যাকরণ সঙ্কলন করেন, এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশিত করেন। কেরীর চেষ্টায় হুগলী, দিনাজপুর ও যশোহর জিলায় আরও কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমুদয় বিদ্যালয়ে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় আধুনিক প্রণালীতে শেখান হইত। তৎকালে মনিটোরিয়াল (monitorial) পদ্ধতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। এই পদ্ধতিতে স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগকে পড়াইত। ইহার প্রবর্তক অ্যানড্রু বেলের (Andrew Bell) নামানুসারে ইহা বেল পদ্ধতি নামেও পরিচিত ছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বহু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৭ সনে এই প্রকার শতাধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬৭০০।

এই সময় রবার্ট মে (Robert May) নামে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির একজন পাদ্রী চুঁচুড়ায় তাঁহার নিজ বাটীতে 'বেল পদ্ধতিতে' শিক্ষা দিবার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় ইহা স্বতন্ত্র বাটীতে স্থানান্তরিত হয় এবং আরও ১৫টি স্কুল স্থাপিত হয়। গভর্নমেণ্ট এই সমুদয় স্কুলের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রথমে ৬০০, পরে ৮০০ টাকা মাসিক সাহায্য করেন। স্কুলের জন্য সরকারী দানের ইহাই সম্ভবতঃ প্রথম দৃষ্টান্ত। ১৮১৮ সনে মৃত্যুর পূর্বে মে সাহেব মোট ৩৬টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

চার্চ মিশনারী সোসাইটি ১৮১৬ সনে খিদিরপুরে জমিদার কালীশঙ্কর ঘোষালের প্রদত্ত ভূমিখণ্ডে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে সৈন্য বিভাগের কাপ্তেন স্টুয়ার্ট (Captain Stewart) বর্ধমানে কয়েকটি স্কুল স্থাপন করেন। চার্চ মিশনারী সোসাইটি তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করেন এবং স্কুলগুলির তত্ত্বাবধানের জন্য কয়েকজন মিশনারী পাঠান। ১৮২০ সনে এই স্কুলগুলির সংখ্যা ছিল ১৬ এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২০০। ইহা ছাড়া একটি কেন্দ্রীয় স্কুলে ৫৫ জন ছাত্রকে ইংরেজী ও ফার্সী শেখান হইত।

আর একটি মিশনারী সোসাইটি (Society for Promoting Christian Knowledge) ১৮১৮ সনে কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে কয়েকটি স্কুল স্থাপন করে। ১৮২৩ সনে ইহাদের সংখ্যা ছিল ১২। ইহাদের মধ্যে দুইটিতে ইংরেজী শেখান হইত।

উল্লিখিত মিশনারী স্কুলের অনেকগুলিতেই প্রথমে বাংলায় পড়ান হইত।

কোন কোনটিতে পরে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইত। আবার কতকগুলি স্কুলে প্রথম হইতেই ইংরেজী শেখান হইত। কিন্তু সব স্কুলেই সাহিত্য, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় আধুনিক পদ্ধতিতে শেখান হইত। দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং টোল চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ পুরাণে বর্ণিত ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি অনুযায়ী দধি-সমুদ্র, ক্ষীর-সমুদ্র, প্রভৃতি বেষ্টিত জম্বুদ্বীপ এবং সত্য যুগ, ত্রেতা যুগের শত সহস্র বৎসর-জীবি রাজগণের বিবরণ শিক্ষা করিত। এইসব নূতন বিদ্যালয়ে পড়িয়া তাহারা এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের অবস্থান জানিত ও ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক রাজবংশ প্রভৃতির কাহিনী পড়িত। পৃথিবীটা যে সমতল নহে গোলাকার, এবং ইহা যে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, এবং চন্দ্রগ্রহণ যে রাহুর গ্রাসের ফল নহে, এ সমুদয় অনেক নূতন জ্ঞান তাহারা লাভ করিত। যাহাতে নূতন বিষয়ে জ্ঞান লাভের ইচ্ছা জন্মে, এবং ভাল মন্দ বিচার করিবার প্রবৃত্তি হয় এদিকেও শিক্ষকদের লক্ষ্য ছিল।

তবে মিশনারী স্কুলে যে খ্রীষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারিত হইত এবং কোন স্থলে যে হিন্দুধর্মের দেব-দেবী পূজা ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের নিন্দা করা হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ স্কুলেই ইহা অপ্রত্যক্ষভাবেই হইত। সোজাসুজি খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিবার জন্য স্কুলগুলি ব্যবহার করা হইত—এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

মিশনারীদের ব্যাপকভাবে শিক্ষা প্রদানের চেষ্টার পূর্ব হইতেই কলিকাতার বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজী শিখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। ইহার ফলে ১৮১৭ সনে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলায়—তথা ভারতে—ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের ইতিহাসে এই দুইটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

স্কুলের উপযোগী ইংরেজী ও বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্যই স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বইগুলি স্বল্প মূল্যে—কখনও বিনামূল্যে বিতরিত হইত। সে যুগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ও মিশনারী এবং সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোকের হস্তে এই সোসাইটির পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল। ১৮১৮ সনের ১১ই জুলাই এই সভার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। ইহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ঐ বৎসরে সোসাইটির মোট আয় ছিল ১৭,০০০ টাকা—এবং পুস্তক প্রচারের জন্য ব্যয় হইয়াছিল মোট পাঁচ

হাজার টাকা। ইংরেজ ও বাঙ্গালীর চাঁদা দ্বারাই এই সোসাইটি প্রতি-পালিত হইত। এই সোসাইটি প্রধানতঃ স্কুলপাঠ্য বাংলা বই প্রকাশ করিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত, আরবী ও ইংরেজী বইও ছাপাইত।

১৮১৮ সনে কলিকাতার পাঠশালার উন্নতিকল্পে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এই উদ্দেশ্যে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে আধুনিক কালের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া প্রাথমিক স্কুলে বিতরণ করেন এবং কোন স্কুলে বিশেষ উন্নতির পরিচয় পাইলে ঐ সমুদয় স্কুলের শিক্ষকদিগকে নির্দিষ্ট মাহিনার অতিরিক্ত কিছু টাকা পুরস্কার দিতেন। রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কয়েকজন বাঙ্গালী নেতা ও ইংরেজ মিশনারীরা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যাপকভাবে এই প্রণালীতে কাজ করেন এবং এইসব প্রাথমিক স্কুলের ভাল ভাল ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রথমে তাহাদিগকে হিন্দু কলেজে পড়িবার সাহায্যার্থে বৃত্তি দেন, এবং পরে নিজেরাই ইংরেজী শিখিবার জন্য স্কুল করেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে গোঁড়া হিন্দুদের মিশনারী স্কুলের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকিলেও পরে এগুলি খুব জনপ্রিয় হয়। গ্রামের লোকে স্কুলের বাড়ী করিয়া দিত এবং হরিপাল গ্রামের ৮৩ জন বাসিন্দা মাসিক চারি আনা হইতে ছয় টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিত। রাধাকান্ত দেব, কালীশঙ্কর ঘোষাল, রসময় দত্ত প্রভৃতি কলিকাতার ধনী লোকেরা অনেক টাকা চাঁদা দিয়া এই উন্নত শ্রেণীর শিক্ষালয়গুলির ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতেন।

পূর্বোল্লিখিত বিদ্যালয়গুলিতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইংরেজী শিক্ষার যে সূচনা হয়, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে তাহা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ ইহা বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে যেরূপ সহায়তা করিয়াছিল আর কোন একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা তাহার শতাংশও সাধিত হয় নাই—ইহা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না। বোধ হয় এই কারণেই পরবর্তীকালে একাধিক ব্যক্তিকে এই প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনার কৃতিত্ব দেওয়া হইয়াছে। এখন পর্যন্তও এদেশে অনেকের বিশ্বাস যে রামমোহন রায়ই হিন্দু কলেজের পরিকল্পক। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে রামমোহনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রকার যোগাযোগ ছিল না। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বাদানুবাদ ও আলোচনা না করিয়া হিন্দু কলেজের কল্পনা ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে

যে কয়েকটি নিশ্চিত তথ্য জানা গিয়াছে তাহারই উল্লেখ করিব[২]। ১৮১৬ সনের ১৮ই মে তারিখে কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ঈষ্ট (Sir Hyde East) তাঁহার সহকর্মী ও বন্ধু হ্যারিংটন সাহেবকে বিলাতে যে চিঠি লেখেন তাহাতেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাতে তিনি লেখেন যে মে মাসের প্রথমে তাঁহার পরিচিত একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে হিন্দুদের মধ্যে অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তির ইচ্ছা যে ইউরোপে যে উদার প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয় কলিকাতায়ও সেইরূপ শিক্ষাদানের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হউক এবং এই বিষয়টি আলোচনার জন্য তিনি হাইড ঈষ্টকে একটি সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করেন। এই সময়ে ইংরেজ সরকার এদেশীয়দের ইংরেজী শিক্ষা বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে ছিলেন, সুতরাং ঈষ্ট গভর্নর-জেনারেলের ও সুপ্রীম কাউন্সিলের অনুমতি লইয়া একটি সভা আহ্বান করিলেন। ১৮১৬ সনের ১৪ই মে এই সভার অধিবেশন হইল। সভায় ৫০ জনেরও অধিক ধনী-মানী ও বিশেষ সম্ভ্রান্ত হিন্দু-প্রধান উপস্থিত ছিলেন এবং ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিতও ছিলেন। সভায় পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইল এবং আরও চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। এই সভায় স্থির হইল যে "চাঁদার টাকায় জমি কিনিয়া কলেজের জন্য বাড়ী তৈরী করা হইবে। এই কলেজে বিশেষভাবে বাংলা ও ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং সম্ভব হইলে হিন্দুস্থানী ও ফার্সী, ইংরেজী ধরণে নীতি শিক্ষা, ভগবদ্‌-ভক্তি, গণিত, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি, এবং যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইলে উচ্চাঙ্গের ইংরেজী কাব্য ও সুকুমার সাহিত্য (belles-lettres) প্রভৃতি বিষয় অনুশীলিত হইবে।"

এই সমুদয় বর্ণনা করিয়া ঈষ্ট ঐ পত্রে লিখিয়াছেন :

১ "এই সভার একটি বিশেষ লক্ষণীয় এই যে নানা জাতির লোক—যাঁহারা একত্রে বসিয়া ভোজন করিবেন না—তাঁহারাও তাঁহাদের শিশুদের একত্রে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থার জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন।

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে উপস্থিত প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ পূর্বোক্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলির পূর্ণ সমর্থন করিলেন এবং তাঁহাদের মুখ্যপাত্র হিসাবে প্রধান পণ্ডিত সভাভঙ্গের পূর্বে এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন

যে লুপ্তপ্রায় ভারতের সাহিত্যচর্চা যে তাঁহাদের জীবিতকালেই আবার পুনরুজ্জীবিত হইবে এতদিনে ইহার সম্ভাবনা দেখা দিল।"

পত্রের উপসংহারে ঈষ্ট লিখিয়াছেন :

"স্থির হইল যে এক সপ্তাহ পরেই আর একটি সভার অধিবেশন হইবে। এই কয়দিনের মধ্যেই বহুলোক ঐ সভায় যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমার অনুমতির জন্য চিঠি লিখিয়াছেন। চারদিক হইতেই প্রস্তাবিত কলেজের সম্পূর্ণ অনুমোদনের সংবাদ পাইতেছি এবং প্রারম্ভেই এক লক্ষ টাকার চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। আপাততঃ এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইবে—ইহার বেশীর ভাগ সদস্যই হইবেন হিন্দু—তবে দুই তিনজন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞকেও সাহায্য ও পরামর্শের জন্য ইহার সদস্য করা হইবে।"

ঈষ্ট সাহেবের পরবর্তী চিঠি হইতে জানা যায় এইরূপ একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল এবং প্রস্তাবিত কলেজের নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ইহার মূলনীতি হইল যে হিন্দু ভিন্ন অন্য কেহ এই কলেজে ভর্তি হইতে পারিবে না। এই কমিটি বা প্রথম ও দ্বিতীয় সভায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দের মধ্যে রামমোহন রায় বা ডেভিড হেয়ারের নাম নাই। যে ব্রাহ্মণ প্রথমে হাইড ঈষ্টের সহিত দেখা করিয়াছিলেন তাঁহার নাম বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর হইতেই এই শ্রেণীর প্রগতিশীল বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৩৫ সালের পূর্বেই কলিকাতায় এরূপ অন্ততঃ ২৫টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। সমসাময়িক বাংলা সংবাদপত্রে এই সমুদয় বিদ্যালয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা হইতে জানা যায় যে ১৮২৮ সনে হিন্দু কলেজে চারি শত ও অন্যান্য স্কুলে একশত ছাত্র ইংরেজী পড়িত ও আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিত হইত। ১৮৩৪ সনের একটি পত্রিকায় কলিকাতার কয়েকটি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের নাম ও প্রত্যেকের ছাত্র সংখ্যার উল্লেখ আছে। এই তালিকা হইতে কয়েকটির নাম উদ্ধৃত করিতেছি—

কলেজ	ছাত্র সংখ্যা
হিন্দু কলেজ	৩৩৮
কলিকাতা স্কুল সোসাইটির বিদ্যালয়গুলি	৩০০
ডাফ স্কুল	৩৫০

চার্চ মিশনারী স্কুল	২০০
অরিয়েণ্টাল সেমিনারী	২০০
হিন্দু অবৈতনিক বিদ্যালয়	১০০

শেষোক্ত স্কুলে ছাত্রেরা বিনা বেতনে পড়িতে পারিত এবং অর্ধমূল্যে পুস্তক ক্রয় করিতে পারিত। প্রথমে কয়েকজন ধনী ব্যক্তি ইহার খরচ দিতেন পরে চাঁদা তুলিয়া ইহার ব্যয় নির্বাহ হয়। চাঁদা দাতাগণের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইংরেজ ও বাঙ্গালী উভয় সম্প্রদায়ের ধনী লোকেরাই এই সমুদয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ দিতেন। কয়েকজন বাঙ্গালী মোটা রকমের দান করিয়াছিলেন। নিম্নে তিনজনের নাম দিতেছি—

দাতার নাম	অর্থের পরিমাণ
বৈদ্যনাথ রায়	৭০,০০০ টাকা
নরসিংহ চন্দ্র রায়	৪৬,০০০ „
বনওয়ারীলাল রায়	৩০,০০০ „

ইহা ছাড়া আরও চারিজন প্রত্যেকে ২০,০০০ টাকা এবং একজন ১০,০০০ টাকা দিয়াছিলেন। ১৮২২ সনে রাজা রামমোহন রায় নিজ ব্যয়ে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন।

ডেভিড হেয়ার ও জি. এ. টার্নবুলও প্রত্যেকে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। কলিকাতার লর্ড বিশপ ১৮২০ সনে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্কচ মিশনারীরা ডাফ সাহেবের নামে একটি স্কুল করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা কতকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৩১ সনে তাহারা ছয়টি প্রাতঃকালীন স্কুল পরিচালনা করিত। বাঙ্গালী হিন্দু ও খ্রীষ্টান মিশনারীরা আরও অনেক স্কুল স্থাপিত করেন।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ হোরেস হেম্যান উইলসন ১৮৩৬ সনে কলিকাতা ত্যাগ করার প্রাক্কালে লিখিয়াছেন যে তখন প্রায় ছয় সহস্র যুবক ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিত।

কলিকাতার বাহিরেও অনেক নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শহরের সন্নিকটে আন্দুল, চনক, পানিহাটি, সুখচর, বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে এবং দূরে মফঃস্বলে শ্রীরামপুর, টাকী, বারাসত, বর্ধমান, চন্দননগর, শান্তিপুর, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠার সংবাদ

জানা যায়। ১৮১৮ সনে শ্রীরামপুরের মিশনারীরা একটি কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। ১৮২১ সনে কলেজের গৃহনির্মাণ কার্য শেষ হয়—ইহার জন্য মোট খরচ হয় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইংরেজ সরকার এইরূপ আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষাদান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ১৮১৩ সনে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে নূতন সনদ পান তাহাতে শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ আছে। কিন্তু ইহা বহুকাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের জন্য ব্যয় করা হয় নাই। পূর্বে যে সমুদয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হইল তাহা জনসাধারণের মধ্যে তৎকালে ইংরেজী শিক্ষার প্রবল আগ্রহের ফল বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। বস্তুত: ১৮৩৫ সনের পূর্বে ইংরেজ গভর্নমেন্ট প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য অর্থাৎ সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষাদানেই বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। অপরপক্ষে বাঙ্গালী হিন্দু প্রধানদের মধ্যে অনেকে ইংরেজী শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। খ্রীষ্টান মিশনারী ছাড়াও অনেক ইংরেজ এই প্রকার শিক্ষার পক্ষপাতী ও বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ডেভিড হেয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একবার রাজা রামমোহন রায় ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা এ দেশীয় যুবকদের উন্নতির প্রস্তাব করিলে হেয়ার সাহেব ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে আধুনিক যুগোচিত ইউরোপীয় প্রথায় উচ্চশিক্ষা দানই এইরূপ উন্নতির প্রকৃত উপায় এবং উপস্থিত সকলেই ইহার অনুমোদন করেন। হেয়ার সাহেব ঘড়ীর ব্যবসা করিতেন কিন্তু তিনি এদেশে আধুনিক শিক্ষার বিস্তারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ইংরেজী শিখিবার জন্য বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যেও প্রবল আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজী শেখার ব্যবস্থা করার দাবী জানাইয়া ছেলের দল সাহেবদের পাল্কীর পেছনে পেছনে ছুটিত এবং করুণ মিনতি জানাইত। সমসাময়িক ইংরেজ লেখকও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] ইহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ একজন সমসাময়িক ইংরেজ লিখিয়াছেন যে স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত ইংরেজী বই দুই বৎসরে ৩১,০০০ খানা বিক্রী হইয়াছিল কিন্তু গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে যে সমুদয় আরবী ও সংস্কৃত বই ছাপা হইয়াছিল তাহার বিক্রীর টাকায় এই পুস্তকগুলির দুই মাসের রাখার খরচও ওঠে নাই। মেকলে লিখিয়াছেন যে প্রতি বৎসর বিশ হাজার

টাকা ব্যয় করিয়াও তিন বছরে এক হাজার টাকার সংস্কৃত, আরবী বই বিক্রী হয় নাই। কিন্তু স্কুল বুক সোসাইটি প্রতি বৎসর সাত আট হাজার বই বিক্রয় করে এবং ছাপা খরচ কুলাইয়া শতকরা কুড়ি টাকা লাভ করে।

অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও একটি দৃঢ়মূল সংস্কার আছে যে, কেরাণী সম্প্রদায় তৈরী করিবার জন্যই ইংরেজ গভর্নমেণ্ট এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণা। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, গভর্নমেণ্ট এদেশে ইংরেজী শিক্ষার জন্য মোটেই আগ্রহশীল ছিল না এবং ১৮৩৫ সনের পূর্বে এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করে নাই। বাংলার জনসাধারণের আগ্রহে ও হিন্দু প্রধানদের উৎসাহেই ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হয়। আর এই শিক্ষা যে কেরাণীকুল তৈরী করিবার উদ্দেশ্যেই প্রবর্তিত হয় নাই, তৎকালে ইউরোপীয় প্রথায় যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা ও ভাবনার ভিত্তিতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগের অনুশীলনদ্বারা মানসিক উন্নতি এবং জ্ঞান, বুদ্ধি, ও কর্মশক্তির নব নব উদ্দীপনাই যে ইহার আদর্শ ছিল– তৎকালের নূতন প্রণালীতে শিক্ষিত ছাত্রবৃন্দের চিন্তা ও কার্যধারা আলোচনা করিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে এই নূতন আদর্শ বাঙালী নেতা ও সর্বসাধারণের মধ্যে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল ও কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

গভর্নমেন্ট সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিভাগে উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্য পণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালিত একটি সংস্কৃত কলেজ করিবার প্রস্তাব করিলে, রাজা রামমোহন রায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া ১৮২৩ সনে ডিসেম্বর মাসে বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন, তাহার সারমর্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল:

"এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে যুবক ছাত্রেরা নূতন কিছুই শিখিবে না। দুই হাজার বছর পূর্বেকার ব্যাকরণ ও ন্যায়, দর্শন, মীমাংসা, ও বেদ বেদান্তের সূক্ষ্ম ও শুষ্ক বিচার—যাহা বহুকাল যাবৎ ও এখনও ভারতের সর্বত্র প্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত—তাহারই টীকার টীকা তস্য টীকা প্রভৃতির আলোচনায় জীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিবে। এক কথায় বলিতে গেলে বিলাতে লর্ড বেকনের পূর্বে যেরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিল তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে এবং বিলাতে লর্ড বেকনের পরে যে নূতন প্রণালীতে

সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিলেই পূর্বোক্ত প্রাচীন প্রথা ও তৎসদৃশ ভারতে গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত সংস্কৃত শিক্ষার অসারতা প্রতিপন্ন হইবে। ইংরেজ জাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে রাখাই যদি উদ্দেশ্য হইত তবে মধ্যযুগের শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্তে বেকনের দর্শন প্রভৃতি পড়াইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইত না। সেইরূপ যদি ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে অজ্ঞান তিমিরেই রাখিতে চাহেন তবে সংস্কৃত কলেজ করিলেই সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইবে। কিন্তু যদি এ দেশবাসীর মানসিক উন্নতি ও উদার জ্ঞানলাভই গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য ও আদর্শ হয় তাহা হইলে আধুনিকভাবে ও উন্নত পাশ্চাত্য প্রণালীতে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, শরীর-সংস্থান বিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান প্রভৃতি শিখাইবার জন্য উপযুক্ত ইউরোপীয় শিক্ষক পরিচালিত একটি কলেজ স্থাপন এবং ইহার সঙ্গে প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইবে।"

এইরূপ ধারণা যে কেবল রাজা রামমোহন রায়ের মনেই উদয় হয় নাই এবং তাঁহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁহার পূর্বেই এইরূপ আদর্শ রূপায়িত করিবার জন্য হিন্দু কলেজ ও পূর্বোক্ত অন্যান্য শিক্ষালয়গুলির প্রতিষ্ঠাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ, এই সকল বিদ্যালয়ে, ইংরেজী সাহিত্য ও ব্যাকরণ, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূগোল (আধুনিক পদ্ধতি), ভারতীয় ও ইউরোপীয় দর্শন, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, চিত্রকলা ও নানাবিধ শিল্পকলা শিক্ষা দেওয়া হইত।

শিক্ষার এই উন্নত আদর্শ বাংলা দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল 'সুধাকর' নামক একটি বাংলা পত্রিকার ১২৪০ সালের ২০শে ভাদ্রের (১৮৩৩ খ্রী: ৭ই সেপ্টেম্বর) সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তীর্ণরূপে বিদ্যাপ্রচারের নিমিত্তে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা যতই লিখেন বোধহয় গভর্ণমেণ্ট তাহাতে শ্রুতিপাতই করেন না।...যে বিদ্যায় খরচ করা উচিত বুঝেন তদর্থেই খরচ করিতেছেন। কিন্তু এইমাত্র কহিতে পারি ঐ খরচের দ্বারা ভারতবর্ষের সর্বসাধারণের কি উপকার দর্শিতেছে আমরা এ পর্যন্ত তাহার কিছু জানিতে পারি নাই।...সংস্কৃত

বিদ্যালয়েতে গভর্ণমেণ্টের খরচ সত্য বটে কিন্তু তদ্দ্বারা সর্বসাধারণের বিশেষ উপকার নাই কেননা সেখানে কেবল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির বিদ্যাভ্যাস হয় না। যখন গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত না করিয়াছিলেন তখনও স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী ছিল, এবং তাহাতেই ব্রাহ্মণ সন্তানের বিদ্যাভ্যাস নির্বাহ হইত। আর এখনও দেশে দেশে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের চতুষ্পাঠী আছে, অতএব গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্য ব্যতিরেকেও সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের বড় ক্ষতি হয় না, এবং সে বিদ্যার দ্বারা কেবল ব্যবস্থাদি দান ভিন্ন শাসনাদি কর্মেরও কোন উপকার নাই। অতএব যে বিদ্যা শিক্ষাতে লোকের অন্ধকার দূর হইয়া রাজশাসনাদিতে নৈপুণ্য জন্মে তাবদ্দেশ ব্যাপিয়া সেই বিদ্যার বীজ রোপণ করাই ধার্মিক দয়ালু রাজার উচিত কর্ম···কিন্তু গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন না করিলেও তাহা দূর হইবেক না। যদি কহেন তাবদধিকারের গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত করা অনেক ব্যয়সাধ্য, তাহা সুসিদ্ধ হওয়া কঠিন তবে তাহার এই এক উপায় আমরা দেখিতেছি···তাহা এই যে গভর্ণমেণ্ট যদ্যপি অনুগ্রহপূর্বক তাঁহার অধিকারের প্রতি গ্রামের প্রজারদের উপর যোত্রানুসারে এক এক চাঁদার আজ্ঞা করেন তবে তাঁহার আজ্ঞারোধ কোনপ্রকারে হইবেক না সুতরাং যাঁহার যেমত সাধ্য তদনুসারে ঐ চাঁদাতে অবশ্যই দিবেন···অবশিষ্ট খরচ এডুকেশন কমিটি হইতে দিলেই স্বচ্ছন্দে সর্বত্র বিদ্যালয় চলিতে পারিবেক···নতুবা আমরা যে দেখিব কেবল গভর্ণমেণ্টের খরচে প্রতি গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া লোকের অন্ধকার দূর হইতেছে এখনও সে কাল কালের মধ্যে গণিত হয় নাই।" [৪]

এই প্রবন্ধের কয়েকটি উক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা মনের অন্ধকার দূর করা বিদ্যাশিক্ষার আদর্শ এবং শাস্ত্রের ব্যবস্থায় আবদ্ধ না থাকিয়া শিক্ষা যে যুগোপযোগী ও কার্যকরী হওয়া উচিত এই ধারণাটি খুব স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যাশিক্ষা যে সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হওয়া দরকার এবং ইহার জন্য কেবল শহরে নহে প্রতি গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তাহার উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, ইহার ব্যয়ের জন্য কেবলমাত্র গভর্নমেণ্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করা বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজন-বোধ করিলে গভর্নমেণ্ট তাহার ব্যবস্থা করিবেন এই প্রস্তাবে শিক্ষা প্রসারের প্রতি গভীর আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

২। শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী নীতি

প্রবল জনমতের প্রভাবে এবং সম্ভবতঃ অন্য কয়েকটি কারণে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের মনোভাব ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের প্রভুত্ব বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে তাহাদের উচ্চ ধারণা জন্মে—সুতরাং প্রথমে সেই সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ও শিক্ষা-দান করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হয়। কয়েকজন মুসলমান প্রধানের অনুরোধে আরবী, ফারসী ও মুসলিম আইন-কানুন শিক্ষা দিবার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সনে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৭৯১ সনে হিন্দু শাস্ত্র, সাহিত্য, আইন, প্রভৃতি শিক্ষার জন্য রেসিডেণ্ট জোনাথান ডানকান কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই সময়ে বিলাতে কয়েকজন মনস্বী ও ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর প্রভাবশালী ব্যক্তি ভারতীয়দের শিক্ষাদান সম্বন্ধে আন্দোলন করেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই দল ছিল। এক দলের মতে ভারতীয়দের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা দূর করিবার জন্য খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তিতে শিক্ষাদান করাই কর্তব্য। আর এক দল বেন্থামের "জনহিতবাদের" (Utilitarianism) আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আধুনিক কালের উপযোগী শিক্ষাদানের সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। প্রথম দলের আন্দোলনের ফলে ১৮১৩ সনে কোম্পানিকে যে নূতন সনদ দেওয়া হয় তাহাতে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের এদেশে বসবাসের অনুমতি এবং এদেশে শিক্ষার উন্নতিকল্পে প্রধানতঃ ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু কোম্পানির ভারতীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের অনেকেই—ওয়ারেন হেস্টিংস, ম্যালকম, মনরো প্রভৃতি এদেশে খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারের বিরোধী ছিলেন, সুতরাং দশ বৎসরের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নীতির অভাবে ঐ বরাদ্দ টাকা ব্যয় করা হইল না। গভর্নমেণ্ট প্রাচীন চিন্তা, ধারণা ও সংস্কৃতির শিক্ষাই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং ১৮২৩ সনে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ইহার প্রতিবাদ করিয়া রাজা রামমোহন রায় বড়লাটকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। গভর্নমেণ্ট নিরপেক্ষ বা উদাসীন থাকিলেও পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষার জন্য মিশনারীগণ ও

বাঙ্গালী জনসাধারণের চেষ্টায় যে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল তাহাও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমুদয় কারণে ১৮২৩ সনে গভর্নমেণ্ট শিক্ষা প্রণালী স্থির করা ও তদনুসারে বার্ষিক বরাদ্দ এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করিলেন (General Committee of Public Instruction)। এই সময় বিলাতে বেন্থামের শিষ্য জেমস্ মিল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শে কোর্ট অব ডিরেকটরস্ (Court of Directors) ১৮২৪ সনের ১৮ ফেব্রুআরি তারিখের নির্দেশপত্রে হিন্দু বা মুসলমান শাস্ত্রের পরিবর্তে আধুনিক প্রণালীতে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার সমর্থন করিলেন। ইহা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত কমিটি এযাবৎ কাল পর্যন্ত গভর্নমেণ্টের অনুসৃত নীতি একেবারে পরিত্যাগ করিলেন না। কিন্তু ক্রমে ইহার সদস্যদের মধ্যে মতভেদ হইল। একদল পুরাণ প্রথায় সংস্কৃত, আরবী, ফারসীর পক্ষপাতী, আর একদল পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষাদানের সমর্থনকারী। ১৮২৮ সনে লর্ড বেন্টিঙ্ক বড়লাট হইয়া ভারতে আসিলেন। তিনি বেন্থাম ও মিলের ভক্ত ছিলেন এবং ১৮২৯ সনের ১৯শে নভেম্বর বেন্থাম নিজে তাঁহাকে পত্র লিখিয়া উৎসাহিত করিলেন। ফলে তিনি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুমোদন করিলেন।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শিক্ষা-কমিটির সদস্যগণের মধ্যে পূর্বের ন্যায় এ বিষয়ে তীব্র মতভেদ উপস্থিত হইল। প্রায় অর্ধেক সদস্য প্রাচীন সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার, আর বাকী অর্ধেক আধুনিক যুগোপযোগী প্রগতিশীল শিক্ষাপদ্ধতির সমর্থন করিলেন। এই সময়ে (১৮৩৪) মেকলে গভর্নর জেনারেলের সভায় আইন সদস্যরূপে ভারতে আসিলেন। এই সভায় ঐ দুই বিরুদ্ধমতের আলোচনা প্রসঙ্গে মেকলে ১৮৩৫ সনের ২রা ফেব্রুআরি এই সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য (minute) লিপিবদ্ধ করিয়া সভায় পেশ করিলেন। ইহাতে তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় নানারূপ যুক্তিতর্ক এবং ব্যঙ্গ ও শ্লেষ সহকারে প্রাচীন পদ্ধতির তীব্র নিন্দা করিয়া খুব জোরের সহিত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা প্রবর্তনের সমর্থন করিলেন। এই সমর্থন পাইয়া বেন্টিঙ্ক আর কাল বিলম্ব করিলেন না। ১৮৩৫ সনের ৭ই মার্চ গভর্নমেণ্টের সিদ্ধান্ত (Resolution) প্রচারিত হইল। ইহার মর্ম এই যে অতঃপর এদেশে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার

প্রসারই সরকারী নীতি বলিয়া গৃহীত হইবে এবং শিক্ষার জন্য নির্ধারিত টাকা এই উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হইবে। এইরূপে সরকারের সাহায্যে ইংরেজী শিক্ষা এদেশে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

মেকলের সুদীর্ঘ মন্তব্য একখানি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দলিল। ইহাতে ইংরেজী শিক্ষা যে ভাবে ও যে ভাষায় সমর্থন করা হইয়াছে ইহার পূর্বে আর কেহ তাহা করে নাই। এদেশে এখনও অনেকের ধারণা যে মেকলেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তক। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এদেশে যে দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক ব্যক্তি এবং জনসাধারণের একটি বিশিষ্ট অংশ বহুকাল হইতেই এই প্রণালীর শিক্ষার দাবি করিতেছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তারপর ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে মেকলে এ দেশে আসিবার পূর্বেই বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কও বেন্থামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই জনহিতকর শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য মনস্থির করিয়াছিলেন। সুতরাং মেকলের সুদীর্ঘ মন্তব্য গভর্নমেণ্টের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি ত্বরান্বিত এবং ইহা গ্রহণের পথ সুগম করিলেও ইহার সবটুকু কৃতিত্বই মেকলেকে দেওয়া যায় না।

ইংরেজী শিক্ষার এই সরকারী সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আর একটি ভ্রান্ত ধারণা এখনও প্রচলিত। অনেকে মনে করেন যে ইহার ফলেই বাংলা ভাষার পরিবর্তে ইংরেজীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে তখন মীমাংসার বিষয় ছিল যে উচ্চশিক্ষার বাহন সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষা হইবে না ইংরেজী ভাষা হইবে। বাংলা ভাষার কোন প্রশ্নই তখন ওঠে নাই এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার কোন সম্ভাবনাও তখন ছিল না—কমিটির মধ্যে যে ইহার বিরোধী দল ছিল তাহারাও বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষা দিবার প্রস্তাব করে নাই। অপর পক্ষে উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী রিপোর্টে স্পষ্ট ঘোষণা করা হইল যে বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা এখনও যেরূপ চলিতেছে সেইরূপই চলিতে থাকিবে। অবশ্য একথা ঠিক যে ইংরেজী শিক্ষা একবার চালু হইলে বাঙ্গালী হিন্দুরা ইহার প্রতি এতই ঝুকিয়া পড়িল যে বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল। কিন্তু ইহা কোন সরকারী সিদ্ধান্তের ফল নহে, লোকের রুচি ও মতি-গতির পরিবর্তনের ফলেই

ঘটিয়াছিল। ইংরেজী সাহিত্যের উচ্চ মান এবং এই শিক্ষায় অর্থোপার্জন ও উচ্চপদ অধিকারের সম্ভাবনাও ইহার কারণ।

বর্তমান কালে প্রচলিত আর একটি ধারণা এই যে একদল কেরাণী সৃষ্টি করার জন্যই ইংরেজ সরকার এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করে। সরকার কর্তৃক এই শিক্ষার প্রচলনের বহু পূর্ব হইতেই যে জনসাধারণ ইহা আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আর এই শিক্ষা প্রচলন সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র ও সরকারী দলিল প্রভৃতি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে কেরাণীর দল সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই কোর্ট অব ডিরেকটার্স, মিল, বেন্টিঙ্ক বা মেকলে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন অনুমোদন করেন নাই। আর কেরাণী-কুল সৃষ্টি করাই যদি ইংরেজ গভর্নমেন্টের মতলব হইত তাহা হইলে প্রথম হইতেই তাহারা সংস্কৃত, আরবী, ফার্সীতে উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য অর্থব্যয় করিতেন না। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ও বহুসংখ্যক স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠায় ইংরেজী শিক্ষিতদের দল বৃদ্ধি পাইল এবং ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষা শাসন ও বিচারকার্যে ব্যবহৃত হইতে লাগিল তখন ইংরেজী ভাষার জ্ঞান জীবিকার্জনের একটি উৎকৃষ্ট উপায়ে পরিগণিত হইল এবং ফলে ক্রমশঃই ইংরেজী শিক্ষিত লোক কেরাণীকুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষার ফলে যে বাঙ্গালীরা উত্তরোত্তর উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিক চিন্তার ধারা দেশে প্রবর্তিত করিল সে কথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য।

প্রথমে যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে ছিলেন তাঁহারা কেরাণী সৃষ্টির জন্যই ব্যাকুল ছিলেন এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তবে তাঁহারা সকলেই যে নিঃস্বার্থভাবে নিছক ভারতীয়দের মানসিক উন্নতি ও যুগোপযোগী উদার ভাবধারা ও মনোবৃত্তি সৃজনের জন্য এই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহাও সত্য নহে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের আশা ছিল যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে হিন্দুরা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইবে। ইংরেজী শিক্ষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক মেকলেও তাঁহার পিতার নিকট চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে ত্রিশ বৎসর পরে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের মধ্য হইতে পৌত্তলিকতা একেবারে লোপ পাইবে।" অনেক হিন্দু প্রধানও মনে করিতেন যে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হইলে সমাজের অনেক কুসংস্কার এবং

অসঙ্গত ও অযৌক্তিক কদাচার ও বিশ্বাস দূরীভূত হইবে। আবার অন্যদিকে অনেক ইংরেজ মনে করিতেন যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে ইউরোপের ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি পাঠ করিয়া ভারতবাসী ইংরেজের প্রভুত্ব না মানিয়া স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিবে। মেকলে ১৮৩৩ সনে পার্লিয়ামেন্টে বলিয়াছিলেন যে যদি এমন দিন সত্য সত্যই আসে তবে আমি তাহার প্রতিবন্ধকতা করিব না—ইহা ইংলণ্ডের সর্বাপেক্ষা গৌরব ও অহঙ্কারের দিন বলিয়া গণ্য করিব। মেজর জেনারেল লায়নেল স্মিথ ১৮৩১ সনে বিলাতের কমনস্ সভার একটি কমিটিতে সাক্ষ্যদানকালে বলিয়াছিলেন যে ভারতীয়েরা যে পরিমাণে আধুনিক শিক্ষা পাইবে সেই পরিমাণে স্বাধীনতার দাবি করিবে। এলফিনস্টোন একবার একগাদা পাঠ্যপুস্তক দেখাইয়া এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে এগুলি আমাদের বিলাতে ফিরিয়া যাইবার টিকিট। বস্তুতঃ এইরূপ আশঙ্কায় একদল ইংরেজ বিলাতে কমনস্ সভায় এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই সমুদয় সত্ত্বেও ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিলেন—সুতরাং কেরাণী-কুল সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তাঁহারা ইহা করিয়াছিলেন এরূপ ধারণা অসঙ্গত ও অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

৩। হিন্দু কলেজের শিক্ষা

ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষালাভের ফলে বাংলা দেশে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি ও সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহার প্রকৃতি বা স্বরূপ ও কারণ বুঝিতে হইলে, সে সময়কার কলেজের ছাত্রগণের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং অন্যান্য উপায়ে জ্ঞানার্জন ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। হিন্দু কলেজ এবিষয়ে আদর্শ স্থানীয় ছিল, সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধেই প্রথমে কিছু বলিব।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই এই কলেজের তরুণ অধ্যাপক লুই হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও-র নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইনি কলিকাতাবাসী একজন ইউরেশিয়ান (পর্তুগীজ বংশোদ্ভব) এবং ১৮০৮ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পূর্বোক্ত ধর্মতলার ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। স্কচ জাতীয় ড্রামণ্ড ছিলেন সর্বসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তার উপাসক।

ডিরোজিও তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। ১৮২৬ সনের মে মাসে তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং পাঁচ বৎসর তথায় শিক্ষকতা করেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহার আদর্শে ও ভাবধারায় তিনি ছাত্রদের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ক্লাসের বাহিরে ডিরোজিও ছাত্রগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন এবং আলোচনামূলক ছাত্রপ্রতিষ্ঠানে এবং কলেজের পত্রিকার মাধ্যমে বিবিধ বিষয় আলোচনা করিতেন। শাসন ও সামাজিক সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া, অদৃষ্টবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, প্রতিমা-পূজা, পুরোহিত সম্প্রদায়, পাপ-পুণ্য, স্বদেশপ্রীতি, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে স্বাধীন যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রকার সংস্কার-মুক্ত মতামত প্রকাশ করিতেন এবং ছাত্রদিগকেও এইসব বিষয়ে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে উৎসাহ দিতেন। মনস্বী প্যারীচাঁদ মিত্র ডিরোজিও সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

"তিনি ছাত্রদের মনে কতকগুলি মহান আদর্শনীতি গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন—যথা, স্বাধীন চিন্তার দ্বারা জীবনে মত ও পথ স্থির করিবে, কোন প্রচলিত সংস্কার অন্ধভাবে অনুসরণ করিবে না, জীবনে ও মরণে একমাত্র সত্যকেই অবলম্বন করিবে, সকল প্রকার সদ্‌গুণ অনুশীলন করিবে, এবং যাহা কিছু অসৎ ও অন্যায় তাহা পরিহার করিবে। তিনি প্রাচীন ইতিহাস হইতে ন্যায়পরায়ণতা, দেশপ্রেম, মানবিকতা ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত ছাত্রদের পড়িয়া শুনাইতেন এবং যে ভাবে তিনি এই আদর্শ গুণগুলি বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতেন তাহাতে ছাত্রেরা অভিভূত হইত এবং পূর্বোক্ত বিভিন্ন আদর্শ গুণগুলি বিভিন্ন ছাত্রদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিত। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাঁহার ছাত্রদের পরিচালিত পত্রিকায় (Bengal Spectator) নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল:

"হেনরী ডিরোজিও তাঁহার জ্ঞান, ধীশক্তি ও উৎসাহ, হিন্দুকলেজের ভিতরে ও বাহিরে অক্লান্ত কর্মপ্রবণতা, হেয়ার সাহেবের স্কুলে বক্তৃতামালা, কলেজের সাপ্তাহিক বিতর্ক সভায় (Academic Institution, a debating club) নিয়মিত বক্তৃতা ও উপদেশ, এবং সর্বোপরি তাঁহার উদ্দীপনাময়, জ্ঞানালোকদীপ্ত স্বচ্ছন্দ কথাবার্তাদ্বারা ভারতীয় যুবকদিগের চিত্তে যে গভীর

পরিবর্তন আনিয়াছিলেন তাহা আজও আছে এবং তাঁহার ছাত্রদের মনে অক্ষয় স্মৃতিরূপে চিরকাল বিরাজ করিবে।"

দেশাত্মবোধ বা দেশপ্রেম বলিতে আমরা যাহা বুঝি উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালীর মনে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। ডিরোজিও নিজেকে ভারতীয় বলিয়া মনে করিতেন এবং দেশাত্মবোধক ইংরেজী কবিতা লিখিয়াছিলেন। জন্মভূমি ভারতের প্রতি কবিত্বময় উচ্ছ্বাসের ইহাই বোধ হয় প্রথম দৃষ্টান্ত। ইহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার হিন্দু কলেজের ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষও ১৮৩০ সনে ইংরেজীতে অনুরূপ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ছাত্রদের উপর তাঁহার রাজনীতিক মতের প্রভাব কিরূপ ছিল, দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বুঝা যায়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ১৮৩০ সনের জুলাই মাসে যে বিদ্রোহ হয় তাহার স্মরণার্থে ঐ বৎসর ১০ই ডিসেম্বর দুইশত ছাত্র কলিকাতা টাউন হলে মিলিত হইয়া উৎসব করে। ঐ বৎসর বড় দিনের উৎসবে ফরাসী বিদ্রোহের প্রতীক ত্রিবর্ণ পতাকা ময়দানে মনুমেন্টের উপর উড়িতে দেখা যায়। ইহা যে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কীর্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ছাত্রদের উপর যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত ডিরোজিওর অতুলনীয় প্রভাব দেখিয়া একদল হিন্দু বিশেষ শঙ্কিত হন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় ডিরোজিওকে পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু কয়েকমাস পরেই কলেরা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। (২৬ ডিসেম্বর, ১৮৩১)। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর আট মাস। বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবের প্রবর্তনের ইতিহাসে ডিরোজিও-র নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজ ত্যাগ করিলেও তাঁহার মত ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব হিন্দু কলেজ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। সামাজিক, রাজনীতিক, অর্থনীতিক প্রভৃতি সকল বিষয়েই হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল উদার মত পোষণ করিত। এ বিষয়ে ১৮৩৬ সনের মে মাসে **'Englishman'** পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"রাজনীতি বিষয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা উগ্রপন্থী (radicals) এবং বেন্থামের নীতির অনুগামী। 'টোরি' এই নামটি তাহাদের ঘৃণার উদ্রেক করে। তাহারা মনে করে গভর্ণমেন্ট সর্বপ্রকার মতের প্রতিই সহানুভূতি দেখাইবেন এবং সর্বপ্রকার অসভ্য রীতি ও প্রথা দূর করিবার একমাত্র

উপায় শিক্ষা বিস্তার। অর্থনীতি বিষয়ে তাহারা অ্যাডাম স্মিথের মতবাদ গ্রহণ করে। তাহারা মনে করে যে একচেটিয়া অধিকার (monopoly) কোনপ্রকার বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, এবং অনেক দেশের আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী কৃষি ও উৎপাদনের উন্নতির প্রতিবন্ধক এবং ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতির প্রতিরোধক।"

ইউরোপের উদারবাদী লেখক বেকন, হিউম, টম পেইন প্রভৃতি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। একজন পুস্তক বিক্রেতা টম পেইন প্রণীত "Age of Reason" (যুক্তির যুগ) নামক গ্রন্থ ১ টাকা মূল্যে বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন দিয়াছিল। কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই বই কেনার ঝোঁক দেখিয়া দাম বাড়াইয়া পাঁচ টাকা করিল। কিছুকাল পরে ইহার এক অংশের বাংলা অনুবাদ একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

প্রগতিশীল মতবাদের আলোচনার জন্য হিন্দু কলেজে কয়েকটি ছাত্র-পরিষদ্ ও পত্রিকা ছিল। ইহার মধ্যে সর্বপ্রথমটি—Academic Association —ডিরোজিও কর্তৃক ১৮২৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, দেশপ্রেম প্রভৃতি এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতামত আলোচিত হইত। যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করিয়া, হিন্দুধর্ম ও সমাজের অনেক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার তাহারা নিন্দা করিত। খাদ্যাখাদ্য বিচার, গুরু পুরোহিতের আধিপত্য, জাতিভেদ, স্ত্রীজাতির অবনতি, প্রতিমা পূজা প্রভৃতি তাহাদের বিরুদ্ধ আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল। তাহাদের একদল যুক্তিনিষ্ঠ ভাবনা কার্যে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইল—ইহারই ফলে হিন্দু অভিভাবকদের প্ররোচনায় ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে অপসৃত করা হইল।

১৮৩৮ সনের ১৬ মে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার (Society for the Acquisition of General Knowledge) প্রথম অধিবেশন হয়। দেশের সর্ববিধ অবস্থার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন ও বিস্তার করাই ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। সভায় ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হইত। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে এই সভায় আলোচনা হইত। "ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সভার অধিবেশনে প্রবন্ধপাঠ ও পাঠান্তে আলোচনা করা হত। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি নির্বাচন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হত।

সভায় পঠিত এই রকম প্রবন্ধ-সংকলনের তিনটি খণ্ড ১৮৪০, ১৮৪২ ও ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। সংকলনের নাম—

Selection of Discourses Delivered at the Meeting of the Society for the Acquisition of General Knowledge."[৫]

হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা ১৮২৮ হইতে ১৮৪৩ সনের মধ্যে নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি পরিচালনা করিত—Parthenon (১৮৩০) জ্ঞানান্বেষণ (Gyananneshun—১৮৩১), Hindu Pioneer, Bengal Spectator (১৮৪২)।

এই সমুদয় পত্রিকায় দেশের যাবতীয় বিষয় আলোচিত হইত। রাজনীতি বিষয়ে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হইত—পরে ইহার উল্লেখ করা যাইবে। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম ও সমাজের সংস্কার প্রচেষ্টা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মতে পর্যাপ্ত ছিলনা—অনেক বিষয়েই তাহারা অধিকতর উদার ও অগ্রগতিশীল মতামত প্রচার করিত।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধেও হিন্দু কলেজের একদল ছাত্র খুব আগ্রহশীল ছিলেন। বঙ্গভাষার আলোচনার জন্য ১৮৩৩ সনের ১৯ জানুআরি তারিখে 'সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিলেন: "এক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভাষা আলোচনার্থ অনেক সভা দৃষ্টি গোচর হইতেছে এবং তত্তৎ সভার দ্বারা উক্ত ভাষায় অনেকে বিচক্ষণ হইতেছেন। অতএব গৌড়ীয় সাধুভাষা আলোচনার্থ এই সভা সংস্থাপিত হইলে সভ্যগণেরা ক্রমশ: উত্তমরূপে উক্ত ভাষাজ্ঞ হইতে পারিবেন।" রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এই সভার সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার সম্পাদক হইলেন। স্থির হইল যে, প্রতি রবিবার দুই প্রহর চারিদণ্ড সময়ে এই সভার অধিবেশন হইবে এবং "বঙ্গভাষা ভিন্ন এ সভাতে কোন ভাষায় কথোপকথন হইবেক না"।[৬]

ইংরেজী শিক্ষিত নব্য বঙ্গের দলও যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উদাসীন ছিলেন না—এই সভা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গভর্নমেণ্টের সহায়তায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা বিদ্যালয়গুলির অনেক উন্নতি সাধন করেন।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে যে স্বদেশ প্রীতি ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত

হইয়াছিল তাহার আভাস পূর্বেই দিয়াছি। ইহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সহযোগিগণ বিশ্বাস করিতেন যে ভারতবর্ষে ইংরেজেরা স্থায়ীভাবে বসবাস করিলে তাহাদের সাহচর্যে ও দৃষ্টান্তে ভারতবাসীরা অনেক বিষয়ে লাভবান হইবে। হিন্দু কলেজের একদল ছাত্র ইহার বিরোধী ছিলেন। Hindu Literary Society-র এক সভায় এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং ইহা পরে ১৮৩০ সনের ১২ ফেব্রুআরি India Gazette-এ প্রকাশিত হয়। গ্রীক, রোম, ফিনিসিয়া প্রভৃতি প্রাচীন, এবং ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও স্পেন প্রভৃতি আধুনিক দেশের উপনিবেশগুলির সবিস্তারে আলোচনা করিয়া লেখক ইহার কুফল সমূহ প্রদর্শন করেন। পরে ব্যঙ্গ সহকারে মন্তব্য করেন: "ইউরোপীয়গণ ভারতে আসিয়াই এদেশের লোকের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। নানা জাতীয় মদ্য—রাম, গিন, ব্র্যাণ্ডি ও আধুনিক সভ্যতার অনুরূপ অন্যান্য উপকরণ আমদানী করিয়া কিরূপ অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহারা এই বর্বর জাতিকে সভ্য করিয়া তুলিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।"

এই প্রবন্ধ হইতে বেশ বোঝা যায় যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে যে বাঙ্গালী যুবকগণ একেবারে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণই সভ্যতা বলিয়া মনে করিতেন এ ধারণা সত্য নহে। ইহাও সহজেই অনুমিত হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজ জাতির প্রতি যে ভক্তি ও শ্রদ্ধার জোয়ার বহিয়াছিল তাহাতে ভাটা পড়িয়া আসিতেছিল।

ইহার অন্য প্রমাণও আছে। ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণ ব্রিটিশ শাসন-নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। হিন্দু কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০—৫৮) কলিকাতার পুলিশ ও বিচার বিভাগের সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে, ইহা সকল রকমেই সুশাসন প্রণালীর বিরোধী। নিরপেক্ষভাবে সুবিচার করাই প্রত্যেক শাসন প্রণালীর আদর্শ হওয়া উচিত—কিন্তু ভারতের ব্রিটিশ শাসনে তাহা সম্ভবপর হয় নাই—কারণ এক বণিকদলের হাতে দেশ শাসনের ভার থাকায় তাহারা কেবল লাভ লোকসানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শাসনকার্য পরিচালনা করে।

হিন্দু কলেজের আর একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

(১৮১৪—১৮৭৮) এই মত প্রচার করেন যে, জগতে সকল মানুষেরই সমান অধিকার এবং মুষ্টিমেয়ের স্বার্থসাধনের পরিবর্তে বহুজনের হিতসাধনই গভর্নমেণ্টের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং বিদেশীর শাসন কখনও শুভ হইতে পারে না। কারণ বিদেশী শাসনকর্তারা নিজেদের স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি রাখে, এদেশীয়দের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখার মত মানবিকতা তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর সহিত ব্যবহারেও হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ কিরূপ আত্মসম্মান ও স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেন তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

১৮৪৩ সনের ৮ই ফেব্রুআরি হিন্দু কলেজের হলে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র একটি অধিবেশন হয়। এই সভায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন; তাহার বিষয়বস্তু ছিল "বাংলা দেশে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পুলিশ বিভাগ ও ফৌজদারি বিচারের বর্তমান অবস্থা"। প্রবন্ধটি কতকদূর পড়া হইলে কলেজের প্রিন্সিপাল ডি. এল. রিচার্ডসন (D. L. Richardson) তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন যে তাঁহার কলেজ হল তিনি এরূপ রাজদ্রোহীদের সমাবেশের জন্য ব্যবহার করিতে দিবেন না। এই সভার সভাপতি ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র তারাচাঁদ চক্রবর্তী। তিনি রিচার্ডসনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এই সভার সভাপতি এবং দক্ষিণারঞ্জনের বন্ধু হিসাবে বলিতেছি যে আপনার মন্তব্য অতিশয় অশোভন এবং আমি এই সভায় এরূপ আচরণ অনুমোদন করিতে পারি না। ইহা আমাদের সভার পক্ষে অপমানজনক এবং আপনি যদি আপনার মন্তব্য প্রত্যাহার-পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা না করেন তাহা হইলে আমরা এ বিষয়ে হিন্দু কলেজের কমিটি এবং প্রয়োজন হইলে গভর্নমেণ্টের কর্ণগোচর করিব। আমরা কমিটির নিকট হইতে এই হলে সভা করিবার অনুমতি পাইয়াছি—আপনার অনুগ্রহে নহে। আপনি এখানে দর্শকমাত্র, সুতরাং এই সভার কোন বক্তাকে বাধা দিবার কোন অধিকার নাই। আমি আশা করি আপনি বক্তা ও উপস্থিত সভ্যগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার ঔচিত্য সহজেই বুঝিতে পারিবেন।"

ইংরেজী শিক্ষায় যে কেবল কেরানী-কুলেরই সৃষ্টি হয় নাই উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

• হিন্দু কলেজের শিক্ষাপ্রণালী ও তৎসম্বন্ধে সাধারণের মতামত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (আশ্বিন ১৭৭২ শক) বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।[৮]

• ইংরেজী শিক্ষার ফলে দেশের রাজনীতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক প্রভৃতি বিবিধ বিষয় আলোচনা করিবার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান ও সভা-সমিতির কথা সাময়িক সংবাদপত্রে জানা যায়। ইহার মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

১। তত্ত্ববোধিনী সভা। রামমোহন রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হিন্দু কলেজের ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৩৯ সনে এই সভা স্থাপন করেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ছাড়াও বাঙ্গালীর আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রভৃতির উন্নয়ন উদ্দেশ্যেই এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা হইতে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হয় এবং ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যা প্রভৃতি দেশের কল্যাণকর সকল বিষয়েই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই পত্রিকায় আলোচিত হইত। এই পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলায় বিজ্ঞান-পুস্তক রচনা করেন এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলন করেন।

২। "বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ" ১৮৫০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজী সাহিত্যের কতকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ করিয়া লোকশিক্ষার উন্নতি করাই ছিল এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। পরবর্তী বৎসরে এই সমাজের পক্ষ হইতে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদনায় "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

৩। বেথুন সোসাইটি।[৯] বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিবিধায়ক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের মৃত্যুর পর তাঁহার নামানুসারে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৫১ খ্রী:)। ধর্ম ও রাজনীতি ব্যতীত দেশের ও সমাজের কল্যাণকর সকল বিষয়ই এখানে আলোচিত হইত। "শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পৌরসংস্কার, জ্ঞানবিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, ভারতীয় সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে বাংলা দেশের মনীষিবৃন্দ ইংরেজী, বাংলা ও উর্দু ভাষায় বক্তৃতা করিতেন—এবং নির্বাচিত প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইত। বৈজ্ঞানিকগণ চিত্রের সাহায্যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনাদ্বারা বিদ্যুৎ, রসায়ণ, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে লোকশিক্ষার সহায়তা করিতেন।" ১৮৫৪ সনে কর্ণেল গুডউইন ভারতে শিল্পচর্চা ও শিল্পের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা

করেন। ইহার ফলে এই সোসাইটির কয়েকজন সভ্যের চেষ্টায় ঐ বৎসরই "শিল্প বিদ্যোৎসাহিনীসভা" এবং School of Industrial Art নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দশ বৎসর পরে গভর্নমেণ্ট ইহার ভার গ্রহণ করেন এবং প্রথমে Government School of Art ও বর্তমানে Art College নামে পরিচিত এই প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গদেশে—তথা ভারতে—কারু-শিল্পবিদ্যায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

৪। ইংরেজী শিক্ষার প্রসার

হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও মেকলের আমলে রাজশক্তির সহায়তা পাইয়া দ্রুতবেগে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার হইল। ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি এডুকেশন কাউন্সিল (Education Council) স্থাপিত হইল এবং ইহার তত্ত্বাবধানে বড় বড় শহরে কয়েকটি সরকারী কলেজ ও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। সর্ব-সাধারণের আগ্রহ ও চেষ্টায় কলিকাতায় কয়েকটি কলেজ ও বহু স্কুল স্থাপিত হইল। উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এইরূপ দ্রুত সংখ্যায় বৃদ্ধি, বাংলা দেশের ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। ইহার সবিস্তারে উল্লেখ সম্ভবপর নহে। একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র দিতেছি।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে বা তাহার কিছু পূর্বে হুগলী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই শতকের মধ্যভাগে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রতিষ্ঠা, ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসে এক নূতন যুগ আনয়ন করে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার উৎপত্তি সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

১৮৫২ সনে জনরব উঠিল যে, হিন্দু কলেজে অহিন্দু ছাত্র অর্থাৎ মুসলমান ও খ্রীষ্টান ভর্তি করা হইবে। ইহাতে হিন্দু সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া তীব্র প্রতিবাদ করে। ১৮৫২ সনের ২১ ডিসেম্বর 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখা হয় :

"সম্ভ্রান্ত হিন্দুমণ্ডলী চাঁদা দ্বারা বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া হিন্দু কালেজ নামক বিখ্যাত বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, তখন হিন্দু মাত্রেই অন্তঃকরণে এমত বিশ্বাস হইয়াছিল যে হিন্দু বালক ব্যতীত তথায় অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্র নিযুক্ত হইবেক না। কালেজ সংস্থাপন কাল অবধি এ পর্যন্ত ঐ নিয়ম

প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, কোন ব্যক্তি তাহার প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই, কিন্তু কি চমৎকার! শিক্ষা কৌন্সেলের বর্তমান অধ্যক্ষ ও মেম্বারগণ অধুনা ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায় কার্য্য করিয়াছেন…পরন্তু হিন্দু কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ে যখন সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বি বালকদিগের নিযুক্ত হইবার নিয়ম হইল ইহার পর আবার মিসনারি সাহেবেরা তথাকার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন, তাহা হইলেই চূড়ান্ত হইয়া উঠিবেক, বাইবেল পুস্তকের অধ্যয়ন হইবার আর বড় বিলম্ব থাকিবেক না, অতএব স্বধর্ম্মতৎপর হিন্দুমণ্ডলী এই সময়ে সতর্ক হউন।[১০] ১২৫৩ সনে ১১ই ফেব্রুআরি তারিখে উক্ত পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য বাহির হইল :—

"এতন্নগরের সর্ব্বত্র এমত জনরব হইয়াছে যে নেপাল দেশীয় একটি বেশ্যানন্দন অধ্যয়নার্থ হিন্দু কালেজে নিযুক্ত হইয়াছে, কি আক্ষেপ। যবন ও খ্রীষ্টান এই দুই দোষ ছিল এইক্ষণে বেশ্যাপুত্র আসিয়া ত্রিদোষ প্রাপ্ত করাইল। আর বড় অপেক্ষা নাই, ত্র্যহস্পর্শ হইয়াছে, ইহার পর "মঘা এড়াবি ক ঘা" যাহা হউক নাগরিক হিন্দু বালক বৃন্দের ইংরেজী শিক্ষার যে এক প্রধান স্থান ছিল সংপ্রতি সে স্থানের অগ্রে অন্ত (আন্ত?) বর্ণের সংযোগ হইল, সুতরাং সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহাশয়েরা আর তথায় বালক প্রেরণে সাহসী হইতে পারেন না, আমরা বিশেষরূপে শ্রবণ করিলাম অনেক ধনি লোকেরা হিন্দু কালেজ হইতে অবিলম্বে আপনাপন সন্তানদিগ্যে ছাড়াইয়া অন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন ……

"কেবল হিন্দুর দানে মূলধন নির্দ্দিষ্ট হইয়া হিন্দু কালেজ স্থাপিত হয় এবং কেবল হিন্দুদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে ঐ কালেজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবে এমত নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়, অতএব যখন হিন্দুরাই ক্ষমতাহীন হইলেন এবং যখন সেই নিয়মেরই অন্যথা হইল তখন হিন্দু ধনদাতারা আপনারদিগের প্রদত্ত ধন পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারেন, ঐ ধনে আর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব থাকিতে পারে না কেননা নিয়মাতিক্রম করাতেই তাঁহারা স্বত্বহীন হইলেন।"[১১]

হিন্দু কলেজে খ্রীষ্টান, মুসলমান ও বেশ্যানন্দনকে ভর্তি করার জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া হিন্দুরা ১৮৫৩ সনে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন করেন। হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র এই নূতন বিদ্যালয়ে ভর্তি হইল।

অপরপক্ষে 'হরকরা' (Harkara) নামক ইংরেজী দৈনিক সংবাদ পত্রে এই নূতন বিধান সমর্থন করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য বাহির হইল।

"This measure, although opposed to the spirit in which the College was originally established, is nevertheless a very desirable one, and is decidedly a move in the right direction. We shall be happy to hear that the opening thus afforded has been freely availed of by all classes which the prohibitory rules hitherto shut out. This liberal measure will tend much to extend the utility of the institution. Distinctions of caste and creed are bad enough in private life, much more so in public institutions like a government College."[১২]

হিন্দুদের প্রতিবাদে বিচলিত হইয়া সরকার এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারীকে পত্র লিখিলেন। সেক্রেটারী প্রায় ছয় মাস পরে ঐ পত্রের যে উত্তর দিলেন তাহার তাৎপর্য এই: "নূতন নিয়ম কিছুই করা হয় নাই, পূর্ব্ব নিয়মানুরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, বেশ্যাপুত্র যে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহা আমারদিগের জ্ঞাতসারে হয় নাই, যখন তাহাকে বারাঙ্গনা সুত জানিতে পারিলাম তখনই বিদায় করিয়া দিলাম, এবং খ্রীষ্টান ও মুসলমান বালক নিযুক্ত করণের বিষয় এজুইকেসন্ কৌন্সেলের বিবেচনাধীনে রহিয়াছে, অদ্যাপি সে বিষয় নিষ্পন্ন করাণ যায় নাই ইত্যাদি।"

অনেক বিচার বিতর্কের পর সরকার স্থির করিলেন যে, হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ দুইভাগে বিভক্ত হইবে—জুনিয়ার ভাগে কেবল হিন্দু বালকেরাই অধ্যয়ন করিবে, সিনিয়র বিভাগে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই পড়িতে পারিবে। পরিণামে এই জুনিয়র বিভাগ হিন্দু স্কুল ও সিনিয়র বিভাগ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির হইল যে হেয়ার সাহেবের স্কুলও এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত হইবে, এই স্কুলে সকল জাতির ছাত্রই পড়িতে পারিবে। বর্তমানকাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে।

অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজ একটি প্রধান বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। এখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে আইন ও ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যা-শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকও ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন:

"যেহেতু নূতন কালেজে আইন শিক্ষা করণের নূতন পদ্ধতি হইবেক এবং তাহাতে ছাত্রেরা সুশিক্ষিত হইলে, সুপ্রিম কোর্টে ও সদর আদালতে ওকালতি ও মুন্সেফি সদর আমিনী এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত

কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, সুপ্রিম কোর্টের কোন সম্ভ্রান্ত কৌন্সেলি সাহেব নূতন কালেজের আইন শিক্ষকের পদে অভিযুক্ত হইবার কল্পনা আছে।"[১৩]

সরকারী কলেজ ছাড়াও এই সময়ে বেসরকারী অনেক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৪] ইহাদের মধ্যে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, এবং শীলস্ ফ্রি কলেজ, হিন্দু হিতার্থি বিদ্যালয়, ও ইণ্ডিয়ান ফ্রি স্কুল নামক তিনটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টান পাদ্রীদিগের "অবৈতনিক বিদ্যালয় কিশোর হিন্দু ছাত্রদের খ্রীষ্টধর্মের দীক্ষা কেন্দ্র হয়ে ওঠার" ফলেই এই সমুদয় অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে যে দেশের বহু উপকার হইতেছে, জনসাধারণের মনে এই ভাব ক্রমেই দৃঢ়মূল হইতেছিল। এই বিষয়ে উদার মতাবলম্বী 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় (১৭৬৫ শক ১ ভাদ্র সংখ্যা) মুসলমান ও ইংরেজ শাসনের নিম্নলিখিত তুলনামূলক মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

"ইহার ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে নেত্রপাত করিলে এইক্ষণকার আমারদিগের এই অবস্থাকে কি দুরবস্থা বোধ হয়। তৎকালে বিদ্যার আলোচনা কি পরিপাটী রূপ ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনবর্ণ বিদ্যাভ্যাসে তৎপর ছিলেন, শূদ্র জাতিদিগের বিদ্যার অনুশীলনা ছিল না কিন্তু তাহারা সমুদয় লোকমধ্যে চারিভাগের এক ভাগ মাত্র, কোন্ দেশীয় লোকের মধ্যে এখনও পর্য্যন্ত চতুর্থাংশের একাংশকে মূর্খ না পাওয়া যায়। পরে যখন মুসলমান রূপ পিশাচেরা এই ভাগ্যহীন ভারতবর্ষকে ৯১১ শকে আক্রমণ করিয়া বিবিধ অত্যাচার দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড এবং মুমূর্ষু করিল সেই অবধি ক্রমে বিদ্যার সুতরাং ধর্ম্মের বল হ্রাস হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয় বর্ণ অন্য অন্য বর্ণের আশ্রয় হইয়াছেন অতএব ক্ষত্রিয়ের পরাজয়ে এবং ক্ষয়ে অন্য অন্য বর্ণেরও নাশ হইতে লাগিল, এ নিমিত্তেও আমারদিগের বঙ্গদেশে এইক্ষণে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি কেবল বাহুল্যে দৃষ্ট হয়, এবং এইক্ষণকার এই শূদ্রজাতি বঙ্গদেশীয় বর্ত্তমান ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের ন্যায় যে বর্ণসঙ্কর নহেন এমত প্রমাণ দ্বারা সম্যক্‌রূপে স্থাপিত করা যায় না। মুসলমানদিগের উন্নতিকালে ব্রাহ্মণেরা আপনারদিগের ধর্ম্ম সুন্দর রূপে রক্ষণে ক্রমে অশক্ত হইতে লাগিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ কেহবা জীবন ধারণার্থে কেহবা সম্মান উপচয়ার্থে শূদ্রদিগের

দৃষ্টান্তে মুসলমানদিগের দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং সেই জাতীয়েরদিগের পারস্য ভাষা শিখিতে লাগিলেন যে ভাষাতে কেবল কতক-গুলীন উন্মাদ প্রলাপের ন্যায় গদ্য পদ্য রচনা ভিন্ন যাহাকে বিদ্যা বলা যায় এমত কোন বিদ্যার বাষ্পও নাই, তাহার অভ্যাসে মনের বিকার ব্যতীত সংস্কার কুত্রাপি সম্ভব হয় না। মুসলমানের বিদ্যা অর্থকারী বিদ্যা হইল সুতরাং বালক কালাবধি ধনের উদ্দেশ্যে ধর্ম্মনাশের শিক্ষা পিতার শাসনে শিখিতেই হইল, তদবধি সকলের মনে এই এক কুসংস্কার হইল যে কেবল ধনের নিমিত্তে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন, যে বিদ্যায় ধনের আয় নাই সে বিদ্যা অভ্যাস করা পরিশ্রম মাত্র, এইরূপ গাঢ় সংস্কার বশতঃ আপনারদিগের শাস্ত্র দেখিবার ও শুনিবার প্রয়োজন থাকিল না। সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞানাভাবে আমারদিগের সনাতন ধর্ম্মেরও নানাবিধ বিকৃতি হইয়া উঠিল। এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়দিগের প্রাদুর্ভাবে এদেশ উজ্জ্বল হইবার উন্মুখ হইয়াছে, ক্রমে প্রায় ৮০০ বছর পর্য্যন্ত যে দুঃখ এদেশে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা ক্রমে দূরীকৃত হইতেছে।"[১৪]

তৎকালে মুসলমানদের প্রতি উদারপন্থী হিন্দুদেরও কিরূপ মনোভাব ছিল উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহার স্পষ্ট ধারণা করা যায়। ইংরেজী শিক্ষা যে জীবনযাত্রার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হওয়ায় লোকে ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসার এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ও উন্নতিসাধন যে ইহার বিশিষ্ট ফল তাহাও পুনঃ পুনঃ স্বীকৃত হইয়াছে।

বর্তমানকালে ইংরেজীর পরিবর্তে দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা সম্বন্ধে যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে ইহার পূর্বাভাস শতাধিক বর্ষ পূর্বেও পাওয়া যায়। ১৮৪৮ সনে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার মন্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"বাঙ্গালা ও ইংরাজী এই উভয় ভাষার মধ্যে কোন্ ভাষার দ্বারা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য ? অধুনা এই প্রস্তাব বিষয়ে সংবাদপত্রে ভারি বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, বিশেষতঃ বিজ্ঞবর শ্রীযুত মেং হাজসন সাহেব বঙ্গভাষার অনুকূলে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে অনেকানেক সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু হাজসন সাহেব আপন লেখায় যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার

বিপক্ষেরা তাহার কোন কথার উত্তর করিতে পারেন নাই কেবল বাহুল্যরূপে ইংরাজী ভাষার প্রশংসাই লিখিয়াছেন।···

"ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট এতদ্দেশে আগমনাবধি একাল পর্য্যন্ত স্বদেশীয় ভাষার বিস্তার জন্য অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, ফলতঃ তাহার সুফল সিদ্ধির বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাঘাত হইতেছে, দেশের অধিকাংশ স্থানে বিদ্যার আলোক বিস্তীর্ণ হয় নাই, প্রজারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবৃত হইয়া অত্যন্ত দীন ও মলিন হইয়াছে···রাজপুরুষেরা ঐ অর্থদ্বারা যদ্যপি এতদ্দেশীয় ভাষানুশীলনের পথ পরিষ্কার করিতেন, এবং ঐ ভাষায় এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করণে অনুরাগি হইতেন তবে আমরা তাহাদিগ্যে এই বঙ্গদেশের যথার্থ উপকারি বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতাম···কিন্তু কি আক্ষেপ ইংরাজ জাতি সুসভ্য ও বহুদর্শি হইয়াও··· বাঙ্গালিদিগ্যে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করেন না, বঙ্গভাষার প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন···তাঁহারা জাতীয় ভাষার মূলোৎপাটনেই যত্ন করিতেছেন, অপিচ তাঁহারদিগের ঐ দুরাশা কোন মতেই সিদ্ধ হইবেক না।"[১৫]

কিন্তু দুই বৎসর পর এ বিষয়ে সম্পাদকের মতের পরিবর্তন দেখা যায় :

"···ইংলণ্ডীয় ভাষা যৎকালীন এতদ্দেশে পদার্পণ করে নাই তৎকালে কোন পণ্ডিত ব্যক্তিও দেশীয় বৃত্তান্ত ব্যতিরিক্ত অন্যান্য দেশের নাম শ্রুত হয়েন নাই, অতএব ইংলণ্ডীয় বিদ্যাধ্যয়নে জ্ঞানের প্রশস্ততা হয়, তজ্জন্য বঙ্গদেশীয় লোকেরা স্বেচ্ছাতে উক্ত দেশীয় ভাষাভ্যাস করিয়া থাকেন।···

"ইংলণ্ডীয় বিদ্যাভ্যাসে এতাধিক উপকার কিন্তু স্বীয় ভাষাতে সর্ব্বাগ্রে নিপুণ হইয়া তদনন্তরে ইংলণ্ডীয় ও আর আর অপর দেশীয় ভাষাভ্যাস করত সাধ্যানুসারে জ্ঞানোন্নতি করিয়া পারদর্শি হইতে চেষ্টা করা উচিত, কারণ স্বদেশীয় বিদ্যা অগ্রে না শিখিয়া পরদেশীয় ভাষাভ্যাস করিলে দেশীয় ও বিদেশীয় নর সমূহের সমীপে নিন্দনীয় ও উপহাসের যোগ্য ও লজ্জিত হইতে হয়।"[১৬]

বাংলা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে তৎকালে শিক্ষিত জনসাধারণ খুবই সচেতন ছিলেন, সমসাময়িক পত্রিকাগুলি হইতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং জানা যায় যে বাংলা শিক্ষার প্রচার ও প্রসার বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণ উভয়েরই সমান আগ্রহ ছিল। শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি বেথুন সাহেব নির্দেশ দিয়াছিলেন যে "কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের

দৃষ্টান্তে মুসলমানদিগের দাসত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং সেই জাতীয়েরদিগের পারস্য ভাষা শিখিতে লাগিলেন যে ভাষাতে কেবল কতক-গুলীন উন্মাদ প্রলাপের ন্যায় গদ্য পদ্য রচনা ভিন্ন যাহাকে বিদ্যা বলা যায় এমত কোন বিদ্যার বাষ্পও নাই, তাহার অভ্যাসে মনের বিকার ব্যতীত সংস্কার কুত্রাপি সম্ভব হয় না। মুসলমানের বিদ্যা অর্থকারী বিদ্যা হইল সুতরাং বালক কালাবধি ধনের উদ্দেশ্যে ধর্ম্মনাশের শিক্ষা পিতার শাসনে শিখিতেই হইল, তদবধি সকলের মনে এই এক কুসংস্কার হইল যে কেবল ধনের নিমিত্তে বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন, যে বিদ্যায় ধনের আয় নাই সে বিদ্যা অভ্যাস করা পরিশ্রম মাত্র, এইরূপ গাঢ় সংস্কার বশতঃ আপনারদিগের শাস্ত্র দেখিবার ও শুনিবার প্রয়োজন থাকিল না। সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞানাভাবে আমারদিগের সনাতন ধর্ম্মেরও নানাবিধ বিকৃতি হইয়া উঠিল। এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়দিগের প্রাদুর্ভাবে এদেশ উজ্জ্বল হইবার উন্মুখ হইয়াছে, ক্রমে প্রায় ৮০০ বছর পর্য্যান্ত যে দুঃখ এদেশে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা ক্রমে দূরীকৃত হইতেছে।”[১৪]

তৎকালে মুসলমানদের প্রতি উদারপন্থী হিন্দুদেরও কিরূপ মনোভাব ছিল উদ্ধৃত অংশ হইতে তাহার স্পষ্ট ধারণা করা যায়। ইংরেজী শিক্ষা যে জীবনযাত্রার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হওয়ায় লোকে ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা ও প্রসার এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন ও উন্নতিসাধন যে ইহার বিশিষ্ট ফল তাহাও পুনঃ পুনঃ স্বীকৃত হইয়াছে।

বর্তমানকালে ইংরেজীর পরিবর্তে দেশীয় ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা সম্বন্ধে যে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে ইহার পূর্বাভাস শতাধিক বর্ষ পূর্বেও পাওয়া যায়। ১৮৪৮ সনে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার মন্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

“বাঙ্গালা ও ইংরাজী এই উভয় ভাষার মধ্যে কোন্ ভাষার দ্বারা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য? অধুনা এই প্রস্তাব বিষয়ে সংবাদপত্রে ভারি বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, বিশেষতঃ বিজ্ঞবর শ্রীযুত মেং হাজসন সাহেব বঙ্গভাষার অনুকূলে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে অনেকানেক সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু হাজসন সাহেব আপন লেখায় যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার

এক মাসের বেতন লাভ করিতে পারেন না,…শ্রীযুক্ত মানেজর বাবুদিগের আলস্যে ও ঔদাস্যে এইরূপ নানাবিধ বিষমতর মর্ম্মান্তিক ক্লেশের উৎপত্তি হইতেছে। সে যাহা হউক, যদিস্যাৎ শ্রীশ্রীযুক্তেরা এরূপ বেতন বিষয়ে শিক্ষক সমূহকে সমূহ কষ্ট প্রদান করিয়াও সাবকাশানুসারে এক একবার আপনারদিগের অধীনস্থ বঙ্গ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বাবধারণ করেন, তাহা হইলেও পরমানন্দের বিষয় হয়।…দেখুন তাঁহারা [রাজপুরুষগণ] বিদেশীয় ধবলাঙ্গ বণিক হইয়া যখন আমাদিগের হিতার্থে অস্মদাদির মাতৃভাষায় এতদূর গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, তখন আমাদিগের যে কি পর্য্যন্ত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনারও অতীত।"[১৯]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পর ইহার ফলাফল সম্বন্ধে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় যে মন্তব্য করা হয় তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"এই তিনবৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে প্রায় ২১০ জন ইঙ্গরেজী ছাত্র প্রবেশ পরীক্ষায় এবং প্রায় ২২ জন কৃতবিদ্য ছাত্র বি, এ, উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।…

"আমরা মনে করিয়াছিলাম রাজধানীতে ইঙ্গলণ্ডীয়রীতিমতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে আমাদের দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সহকারে তাহার আদর ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে, সকলেই পূর্ব্ববৎ ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আদর পূর্ব্বক দেশীয় ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিবে এবং অবিলম্বেই দেশীয় ভাষা ও বিদ্যা সুসংস্কৃত ও সুসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। কৈ এক্ষণে তাহার কিছুই দেখিতে পাই না বরং দিন দিন দেশীয় ভাষার শ্রীহ্রাস্ সহকারে তাহার সঞ্চিত গৌরবের হানি হইতেছে ইহা সাধারণ দুঃখের বিষয় নহে।…

"কলিকাতা রাজধানীতে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাবধি বিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রগণেরই মন ইঙ্গরেজী ভাষার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। ইঙ্গরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব ইহাই সকল ছাত্রের ইচ্ছা।…

"দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধন গবর্ণমেণ্টের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রে কর্ত্তব্য। ইঙ্গরেজী ভাষা ও আমাদের সংস্কৃত ভাষার যেরূপ উপাধি পরীক্ষা ও উপাধি গ্রহণের রীতি আছে, আমাদের মতে বাঙ্গালা ভাষাতেও সেইরূপ রীতি প্রচলিত করা অতি আবশ্যক।"[২০]

বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য এ দেশীয় কেহ কেহ ও কোন কোন সাহেবও যে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন, সমসাময়িক পত্রিকায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ বিষয়ে রেভারেণ্ড লং (Rev. Long) সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন :

"মেং লং সাহেব অতি উদার চিত্ত, সর্ব্বতোভাবে সুগুণজ্ঞ, এই মহাশয় প্রায় মধ্যে মধ্যে সামান্য গুরুমহাশয়দিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠালয়ে গমনান্তর তাহার তত্ত্বাবধারণ এবং ছাত্রগণের পরীক্ষা লইয়া থাকেন, আর তাহারদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সাধ্যানুসারে সাহায্য করণে ক্রটি করেন না।"[২১]

লং সাহেব বঙ্গীয় পুস্তকালয় স্থাপনের জন্য বহু আয়াস করিয়াছিলেন। ১৮৫১ সনে সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত তাঁহার একখানি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"শ্রীযুক্ত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়েষু।

"যে যে মহাশয়েরা এবং যে যে সভাস্থ লোকেরা সাধারণ জনগণের পাঠার্থ বঙ্গীয় পুস্তকালয় স্থাপনের প্রসঙ্গে গত বৎসরে আমার বক্তৃতায় সানন্দচিত্তে মনোযোগ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহারদিগের নিকট এক্ষণে মনের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি ।

পশ্চাল্লিখিত দশস্থানে দশটী পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং ইউরোপীয় লোকের অধ্যক্ষতায় তাহার কার্য্যনির্ব্বাহ হইতেছে, যথা ঠাকুরপুকুর, কলিকাতা, আগড়পাড়া, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, ছাপ্রা, সোলো, বল্লভপুর, রত্নপুর এবং কার্পাসডাঙ্গা। রত্নপুরস্থ দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানেরা অতিরিক্ত পুস্তক সংগ্রহ করণার্থ একেবারে ১২ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছে।

উক্ত দশ পুস্তকালয়ের নিমিত্ত ১৪০০ বঙ্গীয় পুস্তক ক্রীত অথবা দত্ত হইয়াছে। কলিকাতাস্থ পুস্তকালয়ে বিশেষ বিশেষ দান হইয়াছে, তন্মধ্য নানাবিধ বঙ্গীয় পুস্তক চারিশত আছে।

ঐ সকল পুস্তকালয়ের তাৎপর্য্য এই যে ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ এতদ্দেশীয় লোকেরা উত্তম বিষয়ে গ্রন্থ পাঠ করিতে পায় এবং ইউরোপীয় লোকেরাও গৌড়ীয় বিদ্যা এবং বাক্য বিন্যাসের পরিচয় পায়েন। নূতন প্রকাশিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পুস্তকালয় বৃদ্ধি করিবারও উপায় হইয়াছে।

উক্ত পুস্তকালয়ে এই এই গ্রন্থ আছে যথা ইংলণ্ড, গ্রীস, রোম, ইজিপ্ত,

বঙ্গ, ভারতবর্ষ এই সকল দেশের এবং খ্রীষ্টীয় সভার পুরাবৃত্ত, তথা পদার্থ, জ্যোতিষ, যন্ত্রাধ্যায়, ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং পশুপক্ষীর প্রকৃতি ও চেম্বরের নির্ব্বাচিত জীবনবৃত্তান্ত, রেসেলস্ এবং নীতিবোধক ইতিহাস।

পূর্ব্বোক্ত স্থানের মধ্যে পাঁচ গ্রামের ইংরাজী ভাষাজ্ঞ লোকের অধ্যয়নার্থ ইংরাজী পুস্তকালয় পূর্ব্বে স্থাপিত ছিল।

লোকে ঐ সকল পুস্তকালয় কেমন উপকারক জ্ঞান করে তদ্‌বিষয়ের নানাবিধ প্রমাণ পাইয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তদ্দ্বারা মফঃসলের লোকেরা অবসর মতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পায়, গ্রন্থাধ্যায়নে তাহারদের অনুরাগ জন্মে এবং তাহারা কলিকাতায় মুদ্রাঙ্কিত অথচ পল্লীগ্রামে অপ্রসিদ্ধ নূতন নূতন পুস্তক পাঠ করিতে পায়।"[২২]

বংশবাটী গ্রামে "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা"র প্রতিষ্ঠা ও এই উপলক্ষে অক্ষয়-কুমার দত্ত যে বক্তৃতা করেন এই প্রসঙ্গে তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২২ক]

বাংলা শিক্ষার উন্নতির জন্য আরও কতকগুলি কার্যপ্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছিল। স্থানে স্থানে 'বঙ্গানুশীলন সভা' স্থাপিত হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট গ্রন্থরচনা করার জন্য পুরস্কার দেওয়া হইত। পাঁচজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ও দুইজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীর স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি-পত্র বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য :

"বঙ্গীয় ভাষায় ইতিবৃত্ত রচনা। পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা করিতে পারিবেন তাঁহাকে ৩০০ টাকা এবং যে ব্যক্তির রচনা দ্বিতীয় রূপে গণ্য হইবে তাঁহাকে ১০০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

"ইউরোপ এবং এস্যা খণ্ডস্থ নারীগণের চরিত্র অবস্থা এবং প্রভাবে যে তারতম্য আছে তাহার তুলনা এবং ঐ তারতম্যের সাধারণ কারণ কি? আর সেই সকল কারণের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কিরূপ সংযোগ এতদ্বিষয়ে বর্ণনা।

প্রথম পারিতোষিক ৩০০ টাকা কেবল বিবি লোকের বদান্যতায় সংগৃহীত হইয়াছে।"[২৩]

ইংরেজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (সম্ভবতঃ ১৮৫০ সনে)। কাউয়েল (Cowell) সাহেব ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। অনেকে ইহার সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ কেহ ইহার বিরোধিতা

করিয়াছিলেন। সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক মূল উদ্দেশ্য সমর্থন করিলেও অনূদিত গ্রন্থের রচনা-প্রণালী "রীতি বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট" হয় নাই এরূপ মন্তব্য করিয়াছেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ক্রোড়ে লওত:' 'ভাত খাওত:' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়ার ভূরি ভূরি প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, বাংলা গদ্য রচনা তখনও সাধারণভাবে খুব উৎকর্ষলাভ না করার জন্যই এই সমুদয় অনুবাদ গ্রন্থ জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক বলিয়াছেন যে উক্ত সমাজ প্রতি অনুমোদিত গ্রন্থের পারিশ্রমিক মাত্র ২০০ টাকা নির্ধারিত করায় 'কোন সৎ লেখক এই অসাধারণ পরিশ্রমে অগ্রসর হন না।' তিনি আরও লিখিয়াছেন: "সমাজে বাঙ্গলা ভাষার রসজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ লোক প্রায় নাই।" সুতরাং কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও অনেক গ্রন্থই পাঠশালা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী হয় নাই।[২৩ক] এই মন্তব্য হইতে বেশ বোঝা যায় যে ইংরেজী শিক্ষা একশ্রেণীর লোকের নিকট যেরূপ আদৃত হইয়াছিল বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে কোন শ্রেণীরই সেরূপ আগ্রহ ছিল না। এবং ইহাই বাংলা শিক্ষার যথোচিত উন্নতি না হওয়ার প্রকৃত কারণ। ইহার জন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনকে প্রধানতঃ দায়ী করা অসঙ্গত। এ সম্বন্ধে শিক্ষা কমিটির প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে সরকারী নীতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

"আমরা বিবেচনা করে দেখেছি যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এদেশে ক্লাসিকাল ভাষা সংস্কৃত ও আরবীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া অনেক ভাল। সংস্কৃত বা আরবী এদেশের কারও মাতৃভাষা নয়। অতএব পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করে নিয়ে আমরা কেবল এই সিদ্ধান্ত করেছি যে সংস্কৃত-আরবী অপেক্ষা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা অনেক উন্নত। মাতৃভাষার গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করিনি। ভবিষ্যতে যাতে সমস্ত শিক্ষাই মাতৃভাষাতে হতে পারে, সেদিকে আমাদের বরাবরই লক্ষ্য ছিল।"[২৪]

কিন্তু বাংলা শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগিগণও ইংরেজী শিক্ষার সঙ্কোচ করার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। যখন লর্ড লরেন্স ও লর্ড মেয়ো ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ করিয়া দেশীয় ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় যাহাতে শিক্ষা দেওয়া না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন সোমপ্রকাশ পত্রিকা ইহার

প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন "আমাদিগকে পশুবৎ করিয়া রাখিয়া শাসন করা তাঁহাদের অভীষ্ট।"[২৪ক]

বাংলা শিক্ষার দুরবস্থা ব্যতীত প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির আরও কয়েকটি ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি বেশ সজাগ ছিল। প্রথমতঃ, নীতি শিক্ষার অভাব। এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক পত্রিকার আলোচনা হইতে মনে হয় যে, শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে সে সময়কার ধারণা বেশ উচ্চ ও উদার ছিল। সংবাদ প্রভাকরে লেখা হইয়াছে :

"আজকাল আমাদিগের সমাজের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রকার উন্নতির আশা করা কেবল দুরাশা মাত্র। বালক বালিকাদিগকে সম্যক প্রকারে সুনীতি শিক্ষা না দিলে সমাজের কোন উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদিগের দেশের বালক বালিকাদিগকে এরূপ নীতিশিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহাদিগের মন মধ্যে স্বধর্ম্মানুরাগ, স্বদেশানুরাগ, স্বজাতি অনুরাগ প্রভৃতি উদ্ভাবিত হইতে পারে।"[২৫]

১৮৪২ সনে একজন লিখিয়াছেন যে "শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধি এবং অন্তঃকরণ উভয়কেই উৎকৃষ্ট করা উচিত।

"বিশেষতঃ বুদ্ধি অপেক্ষা অন্তঃকরণের উৎকর্ষের অধিক প্রয়োজন যেহেতু বুদ্ধি দ্বারা কোন বিষয়ে সত্য মিথ্যা জ্ঞান হয় বটে কিন্তু অন্তঃকরণের যোগ ব্যতিরেকে তাহাতে মগ্ন হওয়া যায় না এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ণ অথচ অন্তঃকরণ মন্দ হইলে ধার্ম্মিক হইতে পারে না ও সেই অন্তঃকরণে দয়া ধর্ম্ম ইত্যাদির বীজ থাকিলেও তাহার অঙ্কুর হইয়া ফল জন্মে না।"[২৬]

এই লেখকই বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়েই নীতি শিক্ষা প্রদান আবশ্যক। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে প্রধান বিদ্যালয়ে "কাব্য ইতিহাসাদি রেখা' গণিত, ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন হয়।" কিন্তু "ছাত্রদের বুদ্ধি বৃদ্ধির নিমিত্তে যাদৃশ মনোযোগ নীতি বিদ্যানুশীলনের প্রতি তাদৃশ নাই।" কিন্তু কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন যে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ নীতি শিক্ষায় খুব বেশী ফল হইবার সম্ভাবনা নাই এবং এদেশে বিভিন্ন ধর্ম থাকায় বিদ্যালয়ে ধর্মালোচনা বাঞ্ছনীয় নহে। শতাধিক বর্ষ পরে আজও আমাদের দেশে এ সমস্যার সমাধান হয় নাই।

শিক্ষার আর দুইটি ত্রুটির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়। প্রথমতঃ, কি

প্রকারে বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে হয় সে বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয় না এবং শিল্প ও বিজ্ঞান শেখার ব্যবস্থাও খুব সামান্য। সুতরাং কেবল কয়েকটি রাজকীয় কর্ম ছাড়া আর কোন উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা শিক্ষিতদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না, শিক্ষকের পদের বেতন অতিশয় অল্প এবং শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে। "বাঙ্গালীরা দাসত্বের মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাণিজ্য না করিলে উন্নতি করিতে পারিবে না।"[২৭]

লেখাপড়া শিক্ষা যাহাতে ছাত্রদের উপজীবিকার উপায় হয় সে সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সংবাদ প্রভাকরের নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"কি পরিতাপ! ছাত্ররা ১৫।১৬ বৎসর নিয়ত পরিশ্রম করত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে কর্ম্মাভাবে অন্নাভাব জন্য হাহাকার করিতে থাকে। "সিবিল ইঞ্জিনিয়রী" ও আর আর বিদ্যায় নিপুণ হইলে অনায়াসেই নানা উপায়ে উপজীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে, অতএব যাহাতে দুই প্রকার উপকার অর্থাৎ একটা মহতী বিদ্যা নৈপুণ্য এবং তৎসহযোগে সৌভাগ্য সঞ্চয়, এমত মহৎকল্পে নিরুৎসাহি হওয়া অতিশয় অনুচিত হইতেছে, অনেকে অনুমান করেন গবর্ণমেণ্ট দুই কারণে ইহাতে বিরত আছেন, প্রথম কারণ এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরা বিজ্ঞান বিদ্যায় তৎপর হইলে কতকগুলিন ইংরাজের এদেশে প্রভুত্ব থাকিতে পারে না, দ্বিতীয় কারণ ভয়, কেননা কালেজের ছাত্রেরা যুদ্ধ সম্পর্কীয় অস্ত্র সস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে শিখিলে ভবিষ্যতে গোলযোগ করিতে পারে।"[২৮]

শিল্পবিদ্যা সম্বন্ধে সরকারের ঔদাসীন্যে দুঃখ প্রকাশ করিয়া সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ১৮৫৪ সনে মন্তব্য করিয়াছেন :

"পরমেশ্বরের প্রসাদে এই ভারতবর্ষ মধ্যে সোরা, গন্ধক, নীল, হরিতাল, তাম্র, শেলাক, লাকডাই, পাট, শোন, পসম, তুলা, লৌহ সীসক ইত্যাদি বিবিধ বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই সমস্ত দ্রব্য জাহাজ যোগে বিলাতে প্রেরিত হওয়াতে তথাকার লোকে শিল্পাদি বিদ্যা প্রভাবে বিচিত্র বিচিত্র বস্তু প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন ও সেই দ্রব্যসকল ভারতবর্ষেও আসিয়া থাকে তাহাতে জাহাজ ভাড়া মহাজনের লাভ, রাজার মাশুল ইত্যাদিতে অনেক ব্যয় হইয়াও বণিকেরা সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় পূর্ব্বক বিপুল বিত্ত লাভ করিতেছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা শিল্প-

বিদ্যায় শিক্ষিত হইলে, তাঁহার স্বদেশজাত বহু বস্তুর দ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিবেন, তাহাদিগকে জাহাজ ভাড়া, মাশুল ও মহাজনের লাভ ইত্যাদি কিছুই দিতে হইবেক না। যাহারা দ্রব্যাদি বিক্রয় করে তাহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নানা প্রকার শোভাকর ও মনোহর ও অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং তত্তাবৎ অতি সুলভ মূল্যে এদেশে বিক্রয় হইতে পারিবেক।"[২৯]

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

"রাজার সাহায্য ব্যতীত কোন দেশেই কোন প্রকার শিক্ষার আতিশয্য হয় না। পূর্ব্বে নৃপতিরা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের শিল্পবিদ্যা শিক্ষার সাতিশয় সমাদর করিতেন, একারণ তাহার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছিল, আধুনিক রাজ্যাধিপতি মহাশয়দিগের এরূপ এক প্রবল ভ্রান্তি আছে যে তাঁহারা স্বদেশ ব্যতীত অন্যদেশজাত কোন দ্রব্যের প্রশংসা বা ব্যবহার করেন না···।"[৩০]

এই মন্তব্য প্রকাশের অল্পকাল পরেই একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সম্পাদক বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের নাম The Calcutta School of Industrial Arts। এখানে 'কাঠের কাজ, মাটির কাজ, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, লিথোগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। এই বিদ্যালয়ে প্রথমে "চিত্রবিদ্যার শিক্ষার শ্রেণীতে ৫০ জন ও মৃত প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করণ বিদ্যা শিক্ষার শ্রেণীতে" ৪৫ জন গ্রহণ করার প্রস্তাব হয়, কিন্তু ঐ সংখ্যক ছাত্র প্রথম দিনই ভর্ত্তি হয় এবং বহু ছাত্র ফিরিয়া যায়। সম্পাদক লিখিয়াছেন যে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলে "৪।৫ দিনের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা ৫০০ হইতে পারে।"[৩১]

প্রস্তাবিত শিল্প বিদ্যালয়ে বা পৃথকভাবে যাহাতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা, জাহাজ নির্মাণ, কাঁচের পাত্রাদি নির্মাণের শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা হয় সে সম্বন্ধেও আলোচনা হইয়াছে এবং ইহার জন্য রাজপুরুষদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে : "বিজ্ঞান বিদ্যার প্রাদুর্ভাব না হইলে কোন রূপেই দেশের মঙ্গল সম্ভাবনা নাই।"[৩২] যন্ত্র দ্বারা সুতা ও কাপড়ের নির্মাণ হওয়ায় এক্ষণে ঐ রূপ যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখান হইয়াছে এবং মন্তব্য করা হইয়াছে :

"ইংরাজ প্রভৃতি জাতি বিজ্ঞান বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শি হওয়াতে এই সমস্ত অচিন্তনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন

অতএব ঐ বিজ্ঞান বিদ্যার অনুশীলন নিমিত্ত এদেশে এক স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করা অতি আবশ্যক বোধ হইতেছে, বহুদিবস হইল কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মিকনিক্স ইনষ্টিটিউট নামে বিজ্ঞান বিদ্যানুশীলনের এক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতি কোনরকম সাহায্য না করায় ও সাধারণেরও উৎসাহ বৃদ্ধি না হইবায় তাহা পত্তনেই পতন হইয়াছে। যাহা হউক…এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগকে এই বিদ্যা দিয়া চিরোপকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়।”[৩৩]

এই উদ্ধৃতিতে যে Mechanics Institute সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বিলাতের আদর্শে ১৮৩৯ সনে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু শীঘ্রই ইহার বিলোপ হয়। কৃষি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও এ বিষয়ে সরকারের ঔদাসীন্য সম্বন্ধেও তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে। শ্রমজীবী ও কৃষকদিগের শিক্ষাদানের সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা হইয়াছে।[৩৪]

সমসাময়িক পত্রিকার পূর্বোদ্ধৃত ও অনুরূপ আরও বহু মন্তব্য হইতে বেশ বোঝা যায় যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার যে ত্রুটি আমাদের বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী, শতাধিক বৎসর পূর্বেই শিক্ষিত বাঙ্গালীরা সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ঠিক একশত বর্ষ পূর্বে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

“ভারতবর্ষে প্রকৃত বিজ্ঞানের অনুশীলন নাই বলিলে হয়। রুড়কি কালেজ ও মেডিকাল কালেজ সমূহে যে কিছু আছে এই মাত্র। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ কৃতবিদ্য ছাত্রকে একটি পুষ্প প্রদর্শন করিয়া তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলে উর্দ্ধনয়ন হইয়া থাকেন। আসিয়াটিক সোসাইটী বিজ্ঞানের এই শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যাহাতে বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা প্রবেশিকা শ্রেণী হইতে ইহার আরম্ভ করিতে বলেন ; কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া সে সময় অদ্যাপি আইসে নাই এই মাত্র উত্তরদান করিয়াছেন। শিখিবার সময় আইসে নাই, চমৎকার কথা! আরম্ভ না করিলে সেই সময় কখনই হইবে না।…

“অতএব সোসাইটীর প্রস্তাবানুসারে কাজ করা অতিশয় আবশ্যক

হইয়াছে। সর্ব্বত্রই প্রকৃত বিজ্ঞান-শিক্ষার আরম্ভ করিয়া দেওয়া উচিত। বাঙ্গালা বিদ্যালয়েও ইঁহার অনুশীলন আবশ্যক।”[৩৫]

৫। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রতিক্রিয়া

গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের পূর্বেই বঙ্গদেশে সহস্রাধিক যুবক ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছিল। এই সময় ইংরেজী শিক্ষার ফল সম্বন্ধে সাধারণের কি ধারণা ছিল তাহা সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে জানা যায়।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে যে যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তার উদ্ভব হইয়াছিল তাহার প্রতিক্রিয়ায় প্রথম প্রথম এক শ্রেণীর ছাত্রের মনে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের চিরাচরিত প্রথা, সংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি প্রবল বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। এই শ্রেণীর মুখপাত্র মাধবচন্দ্র মল্লিক বাংলা ১২৩৮ সালের ২৩ আশ্বিন (৮ অক্টোবর, ১৮৩১) অবৈতনিক হিন্দু ফ্রি স্কুল সম্বন্ধে যে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন তাহাতে এই মনোভাবের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

“যে অযুক্ত (অযৌক্তিক ?) ধর্ম্মের শৃঙ্খলে বহুকালাবধি আমাদের মন বদ্ধ আছে তাহার দৃঢ়করণে যদ্যপি আমারদিগের অভিপ্রায় থাকিত তবে আমরা কখন হিন্দু ফ্রি-স্কুল স্থাপন করিতাম না।...ফলোপদায়ক বিদ্যা বর্দ্ধনার্থ এবং ঐ বিদ্যার দ্বারা ধর্ম্মবিষয়ক মোহ দূরীকরণাভিপ্রায়ে ঐ হিন্দু ফ্রি স্কুল সংস্থাপিত হইয়া যে তাহার পৌষ্টিকতা হইয়াছে ইহা আমি সুন্দর অবগত আছি।...পৃথিবীর মধ্যে আমি ও আমার মিত্রেরা যদ্রূপ হিন্দুধর্ম্ম ঘৃণা করি তদ্রূপ আমারদের অপর কোন ঘৃণ্য বস্তু নাই। হিন্দুধর্ম্ম কুকর্ম্মের যদ্রূপ কারণ তদ্রূপ অপর কুকর্ম্মের কারণ জ্ঞান করি না। হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা যদ্রূপ কুক্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় এমত অপর কোন বিষয়ে আমরা বোধ করি না এবং সর্ব্বসাধারণের লোকের শান্তি ও কুশল ও সুখের হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ ব্যাঘাত জন্মে তদ্রূপ অপর কোন বিষয়ে আমরা বুঝি না! এবং অযুক্ত ধর্ম্ম বিনাশার্থ আমাদের যে অভিপ্রায় তাহা কি ব্যঙ্গোক্তি কি তোষামদ কি ভয় কি তাড়না কোন প্রকারেই আমরা ত্যাগ করিব না।”[৩৬]

পত্রলেখক ঐ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন—সুতরাং ছাত্রদেরও কেহ কেহ যে

অনুরূপ চিন্তা ও আচরণ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভাবকদের বহু পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :

১। "আমি নির্দ্ধন মনুষ্য পুত্রটি ঘরের কর্ম্ম কখন কখন দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত। কিন্তু (হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার পরে) কিছুকালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল। পরে দেশের রীত্যনুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্নান বিহীন প্রাপ্ত মাত্রেই ভোজন করে শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান জাতীর বিষয় অভিমান ত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই Nonsense কহে ইত্যাদি"।[৩৭] (৬ নবেম্বর, ১৮৩০)

২। "এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে ইদানীং যাহারা ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করিয়াছে তাহারদিগের মধ্যে যাহারা ভাল শিক্ষা করিয়াছে তাহারা প্রায় পরস্পর ইংরাজী ভাষা ভিন্ন পত্রাদি লেখে না এবং ইংরাজী কথা কহিতে পাইলে বাঙ্গালা বাক্য ব্যবহার করে না।"[৩৮] (৯ মে, ১৮৩১)

৩। "কতিপয় দিবস গত হইল কলিকাতার একজন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ৺জগদম্বার দর্শনে কালীঘাটে আসিয়া...জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাবতের সহিত অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কিন্তু উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না। ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা 'গুড মর্ণিং ম্যাডম'...তাহাতে ঐ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝকমারি করো তোরে হিন্দু কালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল।"[৩৯] (১৪ মে, ১৮৩১)

৪। তৎকালে প্রচলিত কতকগুলি আচার ব্যবহার হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা না মানিয়া চলায় একজন পত্রলেখক কলেজের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন নিম্নলিখিত আজ্ঞা দেন :

"হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা ফিরিঙ্গির মত পরিচ্ছদ না করিতে পায় যথা ফিরিঙ্গি জুতা পায় সবচুল মাথায় খালি আঙ্গরাখা গায় মালা নাই গলায়

নেচরের গুণে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় এবং দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে ইত্যাদি পরিবর্ত্তে মাথা কামায় ফিরিঙ্গি জুতা পায় না দিতে পায় উড়ানি কিম্বা একলাই দেয় গায়, মালা দেয় গলায়, অস্পৃশ্য দ্রব্য না খায়, তিলক সেবা করে, ত্রিকচ্ছ কর্যে ধুতী পরে, ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনে সর্ব্বদা রত হয়, কাছা খুলে প্রস্রাব ত্যাগ কর্যে জল লয়।"[৪০] (১৬ জুলাই ১৮৩১)

৫। কিন্তু হিন্দু কলেজের সমর্থকও একদল ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্বোক্ত ১নং চিঠি সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত হইলে, তাহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ একজন লেখেন :

"হিন্দুকালেজনামক যে বিদ্যালয় কএক বৎসরাবধি এদেশে স্থাপিত-হওয়াতে সর্ব্বসাধারণের যে উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাহারা যোত্রহীন তাঁহারদিগের সন্তানদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা ভদ্রলোকের অবিদিত কি আছে। কিন্তু চন্দ্রিকাকার তদ্বিষয়ে নিতান্ত অসুখী। তিনি যে কালেজস্থ অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের অল্প অল্প দোষে তাহারদিগের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়া চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কালেজের বিপক্ষ···আমি চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিত হওনের পূর্ব্বে কি হিন্দু বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত না কেবল বহু পরিশ্রম-পূর্ব্বক কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কি তাঁহারা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। কালেজ স্থাপিত হওনের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় কয়েকজন বাঁকা বাবুরা তাঁহারদিগের স্ব স্ব পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনাধিকারী হইয়া ধন যৌবন এবং মূর্খতাপ্রযুক্ত মদ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোন কোন অবৈধ কর্ম্ম না করিয়াছেন এবং পৈতৃক ধন কি কি রূপ অসদ্ব্যয়ে না নষ্ট করিয়াছেন ···গাঁজাখুরী ঝকমারি সবলোট ইত্যাদি তৎকালে বিদ্যার অপ্রাচুর্য্যহেতুক ভদ্রলোকের সন্তানেরা কোন কোন অসৎকর্ম্ম না করিয়াছেন। এইক্ষণে··· এতদ্দেশে হিন্দুকালেজ প্রভৃতি কএকটা পাঠশালা স্থাপিত হওয়াতে উপরের লিখিত কুনীতি বা রীতি আর প্রায় দেখা যায় না বরং হিন্দু বালকেরা ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান হইতেছেন এবং তদ্দৃষ্টে অনেকেরি বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহ জন্মিতেছে।[৪১] (২২ জানুআরি ১৮৩১)

ইংরেজীভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্যজ্ঞানের প্রসার ও তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কয়েকটি অনুকূল সম্পাদকীয় মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :

১। "গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এ দেশে ইংলণ্ডীয় ভাষা ও বিদ্যাশিক্ষা করণার্থে যে উদ্যোগ হইতেছে তাহা অত্যাশ্চর্য্য। ইহার পূর্ব্বে আমরা শুনিতাম যে ইংলণ্ডীয় ভাষার ছাত্রেরা যৎকিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়া কেরাণিদের পদপ্রাপণার্থে সেই ভাষা শিক্ষা করিত। কিন্তু আমরা এখন অত্যাশ্চর্য্য দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় বালকেরা ইংলণ্ডীয় অতিশয় কঠিন পুস্তক ও গূঢ় বিদ্যা আক্রমণ করিতে সাহসিক হইয়াছে এবং ভাষার মধ্যে যাহা অতিশয় দুঃশিক্ষণীয় তাহা আপনাদের অধিকারে আনিয়াছে।...এতদ্বিষয়ে যে প্রশংসা আমরা ইংলণ্ডীয় সাহেব লোকের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি তাহা যদি লিখি তবে তাহা খোসামোদের ন্যায় জ্ঞান হইবেক।[৪২] (৭ই মার্চ্চ ১৮২৯)

২। হিন্দু কলেজের ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়:

"শ্রীযুক্ত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংলণ্ডীয় কাব্যের স্বকপোল রচিত এক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় কাব্যক্ষেত্রে এতদ্দেশীয় লোকের প্রথম অধিকার এই।...তৎ পুস্তক হইতে সংগৃহীত যে কিয়ৎ প্রকরণ আমারদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহাতে তৎ কবির কাব্যীয় গুণ এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় নিপুণতমতা প্রকাশ হইতেছে। ইঙ্গরেজী ভাষার মধ্যে যাহা দুঃসাধ্য তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের অধিকারকরণ ক্ষমতাতে যদি আমারদের মনে কিছু সন্দেহ থাকিত তবে এই কাব্যের দ্বারা তাহা দূরীকৃত হইত। ...গত দশবৎসরের মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যার অনুশীলনেতে তাঁহারা যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা অতি বিস্ময়নীয়... এক্ষণে কলিকাতা নগরে স্বীয় ভাষার তুল্য ইঙ্গরেজী ভাষাভিজ্ঞ শতাবধি দুইশত যুবা মহাশয়েরদিগকে দর্শায়ন যায়। তাহাদের মধ্যে কএকজন... ইঙ্গরেজী ভাষাধ্যয়নে এমত দৃঢ়তরাভিনিবেশ করিয়াছেন যে ইংলণ্ডীয় লোকের অধিকাংশেরা যে পুস্তক রচনায় উৎসাহ রহিত সেই পুস্তক প্রস্তুত করণে সক্ষম হইয়াছেন।[৪৩] (২৭ ফেব্রুআরি ১৮৩০)

৩। হিন্দু কলেজের পরীক্ষা প্রসঙ্গে মন্তব্য:

"পূর্ব্বে ইংরাজেরা এমত বুঝিতেন যে বাঙ্গালিরা কেবল কেরাণীগিরির উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা করে। কিন্তু এখন দেখা গেল যে তাহারা আপনারদের দেশভাষার ন্যায় ইংরাজি শিক্ষা করিতেছে—অতএব আদালতের মধ্যে ইংরাজি ভাষায় সওয়াল ও জবাব করিবার কি আটক। এখন বাঙ্গলা

দেশের মধ্যে স্তাবৎ আদালতে পারসি ভাষা চলিতেছে তাহা জজসাহেবের ভাষা নয় ও উকীলদের ভাষা নয় আসামী ফরিয়াদীর ভাষা নয় এবং সাক্ষিরদের ভাষাও নয়। আমাদের বিবেচনায় এই হয় যে যদি আদালতে কোন বিদেশীয় ভাষা চালান উচিত হয় তবে ইংরাজি ভাষা চালান উপযুক্ত (ইহার যে বাধা ছিল তাহা এখন ঘুচিয়াছে কারণ কলিকাতায় ইস্কুলে যত বালক ইংরাজী শিখিতেছে তাহারদের সংখ্যা করিলে এক হাজারের ন্যূন হইবে না)। [৪৪] (২৬ জানুআরি ১৮২৮)

হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের যে সমুদয় আচার-ব্যবহারে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, পূর্বোক্ত চিঠি-পত্রাদি প্রকাশের বহুকাল পরেও যে তাহা কতক পরিমাণে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে, বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সম্মুখে গোলদীঘির নিকট যে একটি উদ্যান ছিল যেখানে তিনি ও তাঁহার বন্ধুগণ সমবেত হইয়া মদ্যপান ও নিষিদ্ধ মাংস আহার করিতেন—এবং অপরিমিত মদ্যপানের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য এরূপ ভাঙ্গিয়া যায় যে ১৮৪৪ সনে তিনি হিন্দু কলেজ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হন। তিনি এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, সে যুগে হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা মদ্যপান সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিত এবং ইহা কোন প্রকারেই দূষণীয় মনে করিত না। ইহার সমর্থনে তিনি বলেন যে, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী ছাত্র সম্প্রদায় মদ্যপান করিত না বটে কিন্তু তাহারা গাজা ও চরস খাইত, বেশ্যাগৃহে গমন করিত এবং বুলবুলের লড়াই ও ঘুড়ি ওড়ানের জুয়া খেলিত। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা এই সব কদাচার হইতে মুক্ত ছিল এবং সভ্যতার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবেই মদ্যপান করিত। ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার পিতার আদেশে তিনি গৃহে তাঁহার সঙ্গে একত্রে পরিমিত মদ্যপান করিতেন এবং মুসলমান বাবুর্চির তৈরী খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতেন।

৫। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্থায়ী প্রভাব

ইংরেজী শিক্ষার স্থায়ী প্রভাব নির্ণয় করিতে হইলে পূর্বোক্ত আচার-ব্যবহারের পরিবর্তনের কতটুকু ভাল ও কতটুকু মন্দ, এবং ইহার কতটা সাময়িক এবং কতটা চিরস্থায়ী কেবলমাত্র তাহার বিচার করিলে চলিবে না।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাঙ্গালীর যে সমুদয় গুরুতর মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহার উপরেও জোর দিতে হইবে। এই বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থে সম্ভবপর নহে সুতরাং মাত্র সাধারণভাবে বিশেষ কতকগুলি পরিবর্তনের উল্লেখ করিব।

প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার শেষ যুগে ইহার মধ্যে যে একটি গুরুতর অশুভ দেখা দিয়াছিল সে সম্বন্ধে মুসলমান পণ্ডিত আলবেরুণী বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন এবং এ দেশের বহু গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে হিন্দুরা বহির্জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং পাশ্চাত্য জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির যে সমুদয় উন্নতি হইয়াছে তাহার কোন খবরই রাখে না। সুতরাং তাহারা মনে করে যে তাহারাই জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি, অন্য কোন জাতির কাছে তাহাদের শিখিবার কিছুই নাই। কিন্তু তাহাদের পূর্ব-পুরুষদের এরূপ মনোবৃত্তি ছিল না। আলবেরুণীর এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন কালে হিন্দুরা উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল এবং এই সমুদয় দেশের অনেক অংশে হিন্দু সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল। কিন্তু আলবেরুণীর সময় অথবা তাহার পূর্ব হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই আটশত কি হাজার বৎসর বহির্জগতের সহিত তাহাদের যে বিশেষ কোন পরিচয় ছিল এরূপ প্রমাণ নাই। বাণিজ্য ব্যপদেশে বণিকগণ ভারতের বাহিরে যাইত, কিন্তু বিদেশের কোন বিবরণ যে ভারতবাসীদের জানা ছিল তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। মধ্যযুগে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছিল—এবং ভারতের বাহিরে সকল দেশেই ম্লেচ্ছজাতির বাস, এই কারণে স্থলপথেও বিদেশযাত্রা রহিত হইয়াছিল। এই কূপমণ্ডূকতা যে মধ্যযুগে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবনতির একটি প্রধান কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। পাশ্চাত্য জগতে মধ্যযুগের শেষভাগে নূতন নূতন চিন্তাধারার বিকাশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে অদ্ভুত উন্নতি সাধন হইতেছিল, তাহার কোন সংবাদই বঙ্গদেশে তথা ভারতে পৌঁছায় নাই। যে সময়ে ইউরোপে নিউটন, লাইবনিৎজ, বেকন

প্রভৃতি মনীষিগণ মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিতেছিলেন সেই সময় বাঙ্গালী তাহার কোন সংবাদ পায় নাই এবং বাঙ্গালী হিন্দুর মনীষা নব্যন্যায়ের শুষ্ক তর্কে এবং স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রেমের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা বিচারে মাসের পর মাস ব্যস্ত ছিল। প্রতিবেশী চীনদেশের তিনটি আবিষ্কার পৃথিবীতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। মুদ্রণ যন্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র ও চুম্বক দিগ্‌দর্শন যন্ত্র যথাক্রমে শিক্ষা ও চিন্তা জগতে, যুদ্ধে, এবং সমুদ্র যাত্রার অদ্ভুত উন্নতি করিয়াছিল এবং তাহার ফলে পাশ্চাত্য জগতে রেণেসাঁস বা নবজাগরণ আসিয়াছিল। কিন্তু প্রতিবেশী বাঙ্গালী এই সমুদয় আবিষ্কারের কোন খবরই রাখে নাই—অথচ এই সব আবিষ্কারের পরে বহু চীনদেশীয় রাজদূত বাংলার সুলতানের দরবারে আসিয়াছিল।

অকস্মাৎ ইংরেজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়, সহস্র বৎসরের অবরুদ্ধ পঙ্কিল জলাশয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল এবং নূতন নূতন ভাবধারা ও জ্ঞানের বেগবতী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইল।

প্রধানত নূতন নূতন স্কুল, কলেজ, এবং আলোচনা ও বিতর্ক সভার মাধ্যমেই যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যান্য কতকগুলি নূতন প্রতিষ্ঠানও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ এশিয়াটিক সোসাইটির (Asiatic Society) উল্লেখ করা যাইতে পারে। সার উইলিয়ম জোন্‌স্ ১৭৮৪ সনে কলিকাতায় ইহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহা এখনও বর্তমান। এই সুদীর্ঘ কালে ইহা ভারতবাসীর জ্ঞানভাণ্ডার কিরূপ সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়; ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিভাগে আধুনিক প্রণালীতে চর্চা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া ইহা ভারতে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। প্রথম ৪০।৫০ বৎসর বিদেশীরাই ইহার পরিচালনা করিত—কোন ভারতবাসী ইহার সদস্য ছিল না। তারপর ক্রমে ক্রমে বহু ভারতবাসী ইহাতে যোগদান এবং ইহার উন্নতিবিধান করেন।

১৮০০ সনে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ১৮৬১ সনে প্রতিষ্ঠিত পুরাকীর্তি সন্ধান বিভাগ (Archaeological Survey of India) এবং

এইরূপ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে ভারতে এক নব জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে।

ভাগ্যক্রমে ইউরোপে এই সময় যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রবল বন্যা বহিতেছিল। অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের উপর যুক্তির প্রাধান্য, শাস্ত্রের অনুশাসন অপেক্ষা বিবেক ও ন্যায়বিচারের শ্রেষ্ঠতা, জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে রাজ্যে ও সমাজে সকলের তুল্য অধিকার প্রভৃতি ধারণা মানুষের মনে দৃঢ়মূল হইয়া উঠিয়াছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সে সমুদয় ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক প্রথা মানুষ বিনাবিচারে ভগবানের অমোঘ বিধান বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছিল; এখন যুক্তির সাহায্যে তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে লাগিল এবং ধর্মে ও সমাজে যাহা কিছু প্রচলিত আছে তাহাই সত্য এই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত হইল। নির্বিচারে প্রচলিত মত, প্রথা, বিশ্বাস ও সংস্কার প্রভৃতি গ্রহণ ও স্বীকার করার বিরুদ্ধে চিন্তার স্বাধীনতা, মানুষের মনে বিদ্রোহ জাগাইল। ইউরোপের এই সমুদয় বিশেষ শিক্ষা ও নূতন চিন্তাধারা বাঙ্গালীর মনকে উদ্বুদ্ধ করিল—এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রভাবও বিস্তৃত ও চিরস্থায়ী হইল।

আবহমান কাল হইতে হিন্দুরা দেবদেবীর মূর্তি গড়িয়া পূজা করিত, পতির মৃত্যু হইলে সদ্য বিধবাকে পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় পোড়াইয়া মারিত, দেবদেবীর কাছে মানত করিয়া শিশুপুত্রকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দিত, উচ্চনীচ জাতির মধ্যে সর্ব বিষয়ে কঠোর প্রভেদ রক্ষা করিয়া চলিত, ৫০।৬০টি কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাকে একসঙ্গে মৃত্যুপথ-যাত্রী কুলীনের সঙ্গে বিবাহ দিয়া জাতি রক্ষা করিত, দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বর জ্ঞান করিত এবং ইংরেজ প্রভুকে সাদরে আহ্বান করিয়া আজ্ঞা পালনে ও দাসত্ব শৃঙ্খল পরিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না, হিন্দুস্থানী বা মারাঠা ও পাঞ্জাবী অপেক্ষা ইংরেজকে অধিকতর আত্মীয় মনে করিত—বিনাবিচারে এই সমুদয় মানিয়া লইতে তাহারা কখনও দ্বিধা বোধ করিত না। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদর্শের প্রভাবে এই সমুদয় স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস, ক্রিয়া ও মতের বিরুদ্ধে তাহারা অনুপ্রাণিত হইল। এক কথায় বলিতে গেলে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, প্রভৃতি মানুষের সকল কর্মক্ষেত্রেই এই নূতন আদর্শের প্রভাব লক্ষিত হইল। এই প্রভাবের ফলে এই সমুদয় ক্ষেত্রে বঙ্গদেশে উনবিংশ

শতাব্দীতে যে গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, অতঃপর পৃথকভাবে তাহারই আলোচনা করিব।

পাদটীকা

১। সং. সে.ক. ১।৪১ (শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রথম খণ্ড, ৪১ পৃঃ)।

২। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য *Journal of Asiatic Society*, Letters, Vol. XXI. (1955) pp. 39-51 দ্রষ্টব্য।

৩। Andrews and Mookerjis, *The Rise and Growth of the Congress*, pp. 70-71.

৪। সং. সে. ক., ২।১৩১-৩২ পৃঃ

৫। ঘোষ, ৩।৬০২ (বিনয় ঘোষ প্রণীত 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র'— প্রথম সংখ্যাটি খণ্ড ও দ্বিতীয় সংখ্যাটি পৃষ্ঠার নির্দেশক)।

৬। সং. সে. ক. ২।১২৪

৭। *The Bengal Harukaru*, 13 February, 1843. '*History of Political Thought*' by B. Majumdar, p. 108.

৮। ঘোষ, ২।৪২০-২৯

৯। বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত 'বাংলার নবজাগরণের কথা' ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

১০। ঘোষ, ১।৩৩৫-৬ ১১। ঐ, ১।৩৩৭-৮ ১২। ঐ, ৩৪০

১৩। ঐ, ৩৫২-৩ ১৩। ঘোষ, ২।৪০৬-১৫, ৬৩৫ ১৪। ঐ. ৩৯৩-৪

১৫। ঘোষ, ১।৩০১ ১৬। ঐ, ৩২২ ১৭। ঐ

১৮। ঐ, ৩৩৪ ১৯। ঐ, ৩৭৭-৮ ২০। ঐ. ৩৮০-৮১

২১। ঐ, ৩২৭ ২২। ঐ, ৩২৭-৮ ২২ ক। ঘোষ, ২।৩৯৬-৭

২৩। ঘোষ, ১।৩২৮ ২৩ ক। ঐ, ৪৭১-৩ ২৪। ঐ, ৫০১

২৪ ক। ঘোষ, ৪।৫৬০ ২৫। ঘোষ. ১।৩৭৫ ২৬। ঘোষ, ৩।১৮৩, ১৭৭

২৭। ঘোষ, ১।২০৩ ২৮। ঐ, ৩২৯ ২৯। ঐ, ৩৫৭

৩০। ঐ. ৩৫৮ ৩১। ঐ, ৩৫৯-৬০ ৩২। ঐ, ৭১

৩৩। ঐ, ৯৪ ৩৪। ঘোষ, ১।৪৯৩ ৩৮৬-৮৮ ; ৪।৫২৭, ৫৪৯, ৫৭৩

৩৫। ঘোষ, ৪।৫৩০ ৩৬। সং, সে, ক. ২।৫২ ৩৭। ঐ. ২৩১

৩৮। ঐ. ২৩৬ ৩৯। ঐ. ২৩৭ ৪০। ঐ, ২৩৮

৪১। ঐ, ২৩৩-৪ ৪২। সং, সে, ক, ১।৪২ ৪৩। ঐ. ৬৪

৪৪। সং. সে, ক, ৩।৯-১০

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধর্ম

উপক্রমণিকা

একশত বৎসর পূর্বে (১২৭৭ সনে) শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার সময়কার ধর্মসম্প্রদায়ের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, যদিও উনবিংশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচটি ধর্মসম্প্রদায় প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইত তথাপি ইহার প্রতিটির মধ্যেই দুই দল ছিল। এক দলে ছিলেন "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও তদীয় মতানুগত গৃহী ব্যক্তিরা।" ইঁহারা "বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়বিধ ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিতেন।" অপর দল বিষ্ণু, শক্তি, শিব, সূর্য ও গণেশকে ইষ্টদেবতাস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের আরাধনা করিতেন, কিন্তু "বেদের শাসন ও ব্রাহ্মণ-বর্ণের আধিপত্য অস্বীকার করিতেন।" তাঁহারা "স্ব-সম্প্রদায় মধ্যে বর্ণবিচার পরিত্যাগ করেন, সকল বর্ণ হইতেই গুরু ও শিষ্য গ্রহণ করেন, এবং দেশভাষায় লিখিত সমধিক গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়া চলেন।" 'এই বৈশিষ্ট্য অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য এবং নিম্বাদিত্য প্রবর্তিত চারিটি সম্প্রদায়ই প্রধান। কিন্তু বাংলা দেশে চৈতন্য সম্প্রদায়ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহা গৌড়-বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হয়।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেক শাখা আছে। তাহা এই অধ্যায়ের শেষে বর্ণিত হইবে। তৎপূর্বে উনিশ শতকে যে সমুদয় নূতন ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল।

১। ব্রাহ্মধর্ম

ক। রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩)

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর জীবনে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমুদয় গুরুতর পরিবর্তন হয়, তাহার সকলের মূলে

না থাকিলেও প্রায় সবগুলির সহিতই রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল— এবং তাঁহাকে এই নবযুগ বা নবজাগরণের (Renaissance) সৃষ্টিকর্তা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না। সুতরাং এই মহাপুরুষের জীবনী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় একজন অবস্থাপন্ন ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁহার জন্মতারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে—কেহ বলেন ১৭৭২—আবার কাহারও মতে ১৭৭৪।[১] রামমোহনের বাল্যকাল সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ বিশেষ কিছু জানা যায় না। কথিত আছে যে তিনি বাড়ীতে ফার্সী, পাটনায় আরবী এবং কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন—ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না—তবে তিনি যে এই তিনটি ভাষাই ভাল জানিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রামমোহন সম্বন্ধে আরও দুইটি কাহিনী প্রচলিত আছে : (১) ষোল বৎসর বয়সে তিনি হিন্দুদের প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে একখানি গ্রন্থ লেখায় তাঁহার পিতার সহিত মনোমালিন্য হয়, এবং তিনি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চারি বৎসর দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার পরে পিতার সহিত তাঁহার পুনর্মিলন হয়।

(২) হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পিতার সহিত নানা আলোচনা সত্ত্বেও তিনি সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় ১৫ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন এবং ভিন্ন কোন ধর্মের সহিত পরিচিত হইবার জন্য তিব্বতে গমন করেন।

রামমোহনের জীবনী সম্বন্ধে এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীর সামঞ্জস্য করা কঠিন। প্রথমটিতে তাঁহার পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে গ্রন্থ লেখা ও পিতার সহিত মনোমালিন্যের কথা আছে কিন্তু তিব্বত যাওয়ার কথা নাই। দ্বিতীয়টিতে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কোন গ্রন্থ লেখার কথা নাই এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে পিতৃগৃহ ত্যাগের কথা আছে। অপর পক্ষে তিব্বত ভ্রমণের কথা আছে।

প্রথম কাহিনী পাওয়া যায় কোন বন্ধুর নিকট লিখিত চিঠিতে রামমোহনের আত্মজীবনের বিবরণীতে—কিন্তু এই চিঠি তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। দ্বিতীয় কাহিনীটি মেরী কার্পেন্টার রামমোহনের মুখে দুইবার শুনিয়াছেন—এরূপ লিখিয়াছেন।

পরস্পর বিরোধী হওয়ায় মোটামুটি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়া সত্ত্বেও রামমোহনের তিব্বত ভ্রমণ এবং ১৬ বৎসর বয়সে পৌত্তলিকতার বিরোধী মতপ্রচার—ইহার কোনটাই নিঃসংশয়ে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

পূর্বোক্ত আত্মজীবনীতে রামমোহন লিখিয়াছেন যে তিনি ২০ বৎসর বয়স হইতেই ইউরোপীয়দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেশামেশি করিতেন এবং তাহাদের আইন-কানুন ও শাসন প্রণালী সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করেন। রামমোহন কিছুদিন ঢাকা জালালপুরের (পাকিস্থানের অন্তর্গত ফরিদপুর) কলেক্টর উড্‌ফোর্ড সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। মুর্শিদাবাদে অন্য একজন সিবিলিয়ান র‍্যামজে সাহেবের সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল। অতঃপর ১৮০৫ হইতে ১৮১৪ সন পর্যন্ত রামমোহন মফঃস্বলের নানা স্থানে জন ডিগবীর অধীনে চাকুরি করেন এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। "কিন্তু ডিগবীর সহিত রামমোহনের কেবলমাত্র মনিব কর্মচারীর সম্বন্ধই ছিল না। রামমোহন ডিগবীর নিকট হইতে গভীরভাবে ইংরেজী শিক্ষা করেন। ডিগবীও রামমোহনকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন।"[২] ডিগবী নিজেই লিখিয়াছেন যে, 'যদিও রামমোহন ২২ বৎসর বয়সে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার অধীনে কর্মচারী থাকা কালীন তিনি উত্তমরূপে ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন; ইংরেজী সংবাদপত্র পড়িতেন, ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনা জানার তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তিনি সম্রাট নেপোলিয়নের একজন ভক্ত ছিলেন।' সুতরাং ডিগবী ছুটি নিয়া বিলাত যাওয়ার পরে ১৮১৪ সনে রামমোহন যখন স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। রামমোহন কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং ইউরোপীয় ভারতভ্রমণকারীর অনেকেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সুতরাং পাশ্চাত্য জগতের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তিনি যখন ডিগবীর অধীনে রংপুরে চাকুরী করিতেন তখন তান্ত্রিক যোগী হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর নিকট কয়েক বৎসর হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের রীতিমত চর্চা করিয়াছিলেন।

এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই যাহাতে বলা যায় যে, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বে রামমোহনের ধর্মমত পরিবর্তন হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে (১৮০৩-৪ সন) লিখিত তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন নামক আরবি ও ফার্সী ভাষায় লিখিত একখানি গ্রন্থে ইহার প্রথম পরিচয় পাওয়া

যায়। এই গ্রন্থে তিনি হিন্দুগণের প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ভাল করিয়া ইংরেজী শেখার এবং কলিকাতায় আসার পর তিনি সর্বপ্রথম ধর্মসংস্কারের আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনের মূল সূত্র ছিল যে, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস ও তাঁহাদের প্রতিমা-পূজা করা প্রকৃত হিন্দু ধর্মের বিরোধী। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন এবং 'ঈশ,' 'কেন,' 'কঠ' প্রভৃতি উপনিষদ্ প্রকাশ করেন। গ্রন্থ রচনা ছাড়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৮১৫ সনে তিনি 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। এই সভায় বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা, শাস্ত্র আলোচনা ও ব্রহ্ম সঙ্গীত হইত।

রামমোহনের ধর্মমতে আকৃষ্ট হইয়া অনেক শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রথম প্রথম এই সভায় যোগ দিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায় তাঁহার বিরোধিতা করিয়া পুস্তক লেখা এবং তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ করার ফলে যখন তুমুল দলাদলি আরম্ভ হইল, তখন অনেকেই আর এই সভায় যোগ দিতে সাহস করিতেন না। ১৮২১ সনে রামমোহন 'ইউনিট্যারিয়ান কমিটি' নামে আর একটি সভা স্থাপন করিলেন। "এই সভার ধর্মমত খ্রীষ্টান ধর্মমত হইতে গৃহীত হইয়াছিল ও উহাতে ইউনিট্যারিয়ান খ্রীষ্টান মতেই উপাসনা প্রভৃতি হইত।"[৩] কিন্তু এই সভাও বেশী জনপ্রিয় হয় নাই। অবশেষে তিনি আর একটি নূতন সভা স্থাপন করিলেন। ইহার নাম হইল 'ব্রাহ্ম সমাজ'—কিন্তু সাধারণত লোকে ইহাকে 'ব্রহ্মসভা' বলিত। ১৮২৮ সনের ২০ অগষ্ট তারিখে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে এই সভার অধিবেশনে বেদ ও উপনিষদ্ পাঠ, বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা, এবং সঙ্গীত হইত। কিছুদিন পরে ইহার জন্য একটি নূতন বাড়ী নির্মাণ করা হইল। ১৮৩০ সনের ২৩ জানুআরি এই নূতন গৃহের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রায় পাঁচশত হিন্দু সমবেত হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণও ছিলেন। বস্তুতঃ রামমোহন কোন দিনই একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করেন নাই—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী সকলেই এই উপাসনায় যোগ দিতেন। রামমোহন তাঁহার লিখিত দলিলেও এইরূপ নির্দেশ দিয়া যান যে, যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিবেন

তাহারই জন্য জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্বিশেষে এই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। তবে এখানে কোন সাম্প্রদায়িক নামে ভগবানের উপাসনা হইতে পারিবে না, কোন প্রকার চিত্র বা প্রতিমূর্তি ব্যবহৃত হইবে না, প্রাণিহিংসা হইবে না, পানভোজন হইবে না, এবং কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হইবে না। যাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণার প্রসার হয়, এবং প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হয়, সেই আদর্শের অনুযায়ী উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে। এই আদর্শের পরিপন্থী কোন অনুষ্ঠান এই মন্দিরে হইতে পারিবে না।

নূতন মন্দিরের উদ্বোধনের দশমাস পরেই রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন (১৮৩০ সন, ১৯ নভেম্বর) এবং প্রায় তিন বৎসর পর ১৮৩৩ সনের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে বিলাতেই ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু-কাল পর্যন্ত তিনি ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন।

রামমোহন নূতন ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা না করিলেও প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কারের প্রতি কঠোর আঘাত করিয়াছিলেন। পৌত্তলিকতা বর্জন ও একেশ্বরবাদ যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন—এবং যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তার স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়া, তিনি সামাজিক অনুশাসন ও প্রচলিত শাস্ত্রবিধি ইহার বিরোধী হইলে তাহা অমান্য করার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া হিন্দু সমাজে যেমন, তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজেও তেমনি প্রবল আকারে দেখা দিল। ইহার ফলে একদিকে যেমন হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট পরিবর্তন হইল তেমনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ সার্বজনীন উদার ধর্মমতের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া একটি স্বতন্ত্র ধর্ম সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। অতঃপর কিরূপে ক্রমে ক্রমে এই গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইল তাহার আলোচনা করিব।

খ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫) ও আদি ব্রাহ্ম সমাজ

রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্ম সমাজ ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়ে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থ-সাহায্যে ইহা কোনমতে টিকিয়া ছিল। সাপ্তাহিক সভায় খুব অল্পই লোক হইত এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আচার্যের কাজ করিতেন।

দ্বারকানাথের পুত্র হিন্দু কলেজের ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ এই সমাজকে পুনরায় উজ্জীবিত করেন। রামমোহনের সংস্পর্শেই দেবেন্দ্রনাথের মনে প্রথম ধর্মভাবের উন্মেষ হয়। পরে কয়েকখানি উপনিষদ্ পাঠ করিয়া এই ধর্মভাব বাড়িয়া যায় এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার জন্য তিনি 'তত্ত্বরঞ্জিণী সভা' স্থাপন করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে ইহার নূতন নামকরণ হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯ খ্রীঃ)। "সমুদয় (হিন্দু) শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার" ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হয়। এই সভার তৃতীয় বৎসরে, ১৮৪২ সনে, দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং এই দুইটি সভা দেবেন্দ্রনাথের পরিচালনাধীনে যুক্ত হয়। তত্ত্ব-বোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করে। এই সময় ব্রাহ্ম সমাজের অনেক সভ্যেরা সভায় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিলেও নিজ নিজ বাটীতে প্রতিমা পূজা করিতেন, এবং পূর্বের ন্যায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদ পাঠ করিবার পর তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন বেদী হইতে শ্রীরামচন্দ্রের অবতারত্ব সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিতেন। তখন সমাজের কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন ছিল না, যে কেহ ইচ্ছা করিত আসিত যাইত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন ঐক্যের বন্ধন ছিল না। দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে অতঃপর যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া মাত্র এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবেন কেবল তাঁহারাই সমাজের সভ্য বলিয়া গৃহীত হইবেন। এই উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি দৈনিক কৃত্যাদি সংযোগ করিয়া একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচিত হইল এবং ১৮৪৩ সনের ২১ ডিসেম্বর তারিখে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ ২১ জন এবং দুই বৎসরের মধ্যে আরও ৫০০ জন উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইলেন। প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা হইল "প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব" এবং উপাসনার জন্য উপনিষদ হইতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এবং "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এই দুইটি বাক্য উদ্ধৃত হইল। পরে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" এই বাক্যটিও যোগ করা হয়। দেবেন্দ্রনাথ উপাসনার প্রণালী নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং ইহার শেষে একটি প্রার্থনা যোগ করিলেন।

এইরূপে রামমোহনের প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজ একটি স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হইল। কিন্তু তখনও ইহা হিন্দু সমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন

হয় নাই। দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা বর্জন করিলেও প্রথম প্রথম 'বেদ অপৌরুষেয়' ইহা বিশ্বাস করিতেন। খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের সঙ্গে বাদানুবাদ প্রসঙ্গে তিনি একটি প্রবন্ধে লিখিলেন যে, "আমরা একমাত্র বেদকেই হিন্দু সমাজের মূল উৎস বলিয়া মনে করি—স্মৃতি ও অন্য সকল শাস্ত্র যে পরিমাণে বেদের অনুগামী সেই পরিমাণেই গ্রহণীয়। কারণ বেদ 'শ্রুতি' অর্থাৎ ঋষিদের মুখে উচ্চারিত ভগবানের বাণী (uttered by inspiration—What we consider as revelation is contained in the Vedas alone)। স্মৃতি প্রভৃতি বেদের ভাষ্য মাত্র (only an exposition of their precepts)"।[৪]

এই প্রবন্ধ ১৮৪৫ সনে প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে বেদের চর্চা বিশেষ ছিল না। এদেশে যাহাতে বেদের পঠন-পাঠন হয় সেজন্য তিনি ১৭৬৬ শকে আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য, এবং পর বৎসর আরও তিনজনকে বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশীধামে পাঠান। এই চারিজন যথাক্রমে চারি বেদ অধ্যয়ন করেন। কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। বেদের বিষয়বস্তু সম্যক উপলব্ধির ফলে ইহার অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের মনে সংশয় উপস্থিত হইল। কাশীধামে প্রেরিত পণ্ডিতগণের মধ্যে একজন ১৮৪৭ এবং আর তিনজন ১৮৪৮ সনে ফিরিয়া আসেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'আত্মচরিতে' দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"ইংরাজী ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট কিনা, ইহা সর্ব্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বর প্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ ছিল বলিয়া তাহা ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম।"

কিন্তু এ বিশ্বাস শিথিল হইয়া গেল, তবে ব্রাহ্ম ধর্মের ভিত্তি বা পত্তনভূমি বেদে বা উপনিষদে না পাইয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে "আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি" এবং তাঁহার "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম" গ্রন্থ প্রথম খণ্ডে (১৮৪৯) "বেদ ও উপনিষদ হইতেই তিনি আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ তত্ত্বসমূহ মাত্র সংকলন করিলেন"। তিনি লিখিলেন : "ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের বেদ ও উপনিষদকে আমি একেবারে পরিত্যাগ করিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের আর কোন সংস্রব রহিল না। এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য, তাহা লইয়াই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সংগঠিত হইল···

আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষদকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম ; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্য্যের নহে, যেহেতুক সমস্ত খনি কিছু স্বর্ণ হয় না। খনির অসার প্রস্তরখণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়।" ৫

এই উক্তিটি বিশেষ মূল্যবান—কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের যে দুইটি মূল কথা—অন্ধ বিশ্বাস ও প্রচলিত সংস্কারের উপর যুক্তির প্রাধান্য, এবং শাস্ত্রের বা গুরুর নির্দেশ অপেক্ষা আত্মপ্রত্যয় অধিকতর সিদ্ধ—ইহাতে তাহাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আর দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজ ভাঙ্গিয়া ক্রমে যে আরও দুইটি অধিকতর প্রগতিশীল সমাজের সৃষ্টি হয় তাহার মূলেও আছে এই দুইটিরই প্রভাব।

দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক দুই খণ্ড গ্রন্থে ব্রাহ্ম ধর্মের সার সংকলিত হইলে সমাজে নূতন প্রেরণার সঞ্চার হইল। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ববোধিনী সভা এই নূতন ধর্মমতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাইল না, বরং ইহার বিঘ্নস্বরূপ হইল। বিরক্ত হইয়া, দেবেন্দ্রনাথ ঐ সভা তুলিয়া দিলেন, এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ব্রাহ্ম সমাজের সম্পত্তি হইয়া প্রকাশিত হইল (১৮৫৯)। দেবেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে "ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্যের নিমিত্ত আর 'তত্ত্ববোধিনী সভা' রাখিয়া লোকদিগের মতামত লইয়া বিবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন যে কার্য্যতৎপর উন্নত ব্রাহ্মগণকে পাওয়া যাইতেছে ইহাদিগকে লইয়া ব্রাহ্ম সমাজের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে ব্রাহ্মদিগের মতামতের জন্য বিবাদের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়।"৬ কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের এই আশা ফলবতী হয় নাই। কারণ তিনি পূর্বোক্ত যে "কার্য্যতৎপর উন্নত ব্রাহ্মগণের সাহায্যের" আশা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কেশবচন্দ্র সেনই দেবেন্দ্রনাথের সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ গঠন করিলেন।

গ। কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮—১৮৮৪)

১৮৩৮ সনে কলুটোলার সেন পরিবারে কেশবচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহ রামকমল সেন কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনী ও খ্যাতিমান পুরুষ ছিলেন এবং নানা জনহিতকর প্রগতিশীল কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।

কেশব হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ছাত্রাবস্থাতেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন। তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত ব্রাহ্ম সমাজের সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ায় অল্পদিন পূর্বেই কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের সহিত যোগ দেন এবং শীঘ্রই তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন এবং একজন কর্মঠ সহযোগী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তত্ত্ববোধিনী সভার পরিবর্তে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালনার জন্য নূতন 'অধ্যক্ষ সভা' গঠন করেন (১৮৫৯, ২৫ ডিসেম্বর)। ইহার সভাপতি হইলেন রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় এবং যুগ্ম সম্পাদক হইলেন দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলে চাকুরী করিতেন, তাহা ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে সমাজের কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন (১৮৬১, ১লা জুলাই)। ইহার পূর্বেই 'ব্রহ্ম বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (৮ মে, ১৮৫৯) এবং এখানে প্রতি সপ্তাহে দেবেন্দ্রনাথ বাংলায় ও কেশবচন্দ্র ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন। কেশব শীঘ্রই বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন এবং উভয়ের উদ্দীপনাময় বক্তৃতা ও প্রবন্ধ ক্রমে ক্রমে বহু যুবককে নূতন ধর্মমতে আকৃষ্ট করিল। ইঁহাদের মধ্যে উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, আনন্দমোহন বসু ও গিরীশচন্দ্র সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্রের উৎসাহ ও চেষ্টায় ধর্মালোচনার জন্য 'সঙ্গত সভা' (১৮৬১) এবং সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য 'ব্রাহ্মবন্ধুসভা' (১৮৬৩) স্থাপিত হইল। ইহার ফলে সমাজের কর্মসূচীও প্রসার লাভ করিল এবং সমাজ নানাভাবে কর্মমুখর হইয়া উঠিল। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসেবা ও সমাজের উন্নতিমূলক নানাবিধ সংস্কার-কার্যের সূচনা হইল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে সমাজ একটি সাহায্য-সমিতি গঠন করে। ভাগীরথীর তীরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বহু নরনারীর মৃত্যু হয়—ইহার প্রতীকার ও প্রশমনের জন্য কেশবচন্দ্র সদলবলে ঐ সব অঞ্চলে গমন করেন। সাধারণের মধ্যে এবং অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের প্রতিও সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শিক্ষা প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনের জন্য কেশবচন্দ্র প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করেন। নীতিধর্মবিহীন শিক্ষার পরিবর্তে নীতিধর্মমূলক শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি বিষয়ে কেশবচন্দ্র মর্মস্পর্শী ভাষায় যে বক্তৃতা দেন তাহার ফলে বিলাত হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া

"কলিকাতা কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হইল এবং কেশবচন্দ্র ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামে ইংরেজী একখানি পাক্ষিক পত্র ও 'ধর্মতত্ত্ব' নামে বাংলা মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। কেশবচন্দ্রই এই উভয়ের ভার গ্রহণ করেন।

কেশবচন্দ্র কলিকাতার বাহিরেও ধর্মপ্রচার করেন। ১৮৬১ সনে কৃষ্ণনগরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায়ও মুগ্ধ হইয়া কেশবকে বহু সাধুবাদ করেন। এই অঞ্চলে খ্রীষ্টান পাদ্রীগণের খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল; কেবশচন্দ্রের প্রচারের ফলে তাহা অনেকটা কমিয়া যায়। কেশবচন্দ্র পাদ্রীদিগের সঙ্গে যে তর্ক-বিতর্ক করেন তাহাতে তাঁহারা বিস্মিত হন এবং প্রসিদ্ধ পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ পর্যন্ত ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

কেশবচন্দ্রের কার্যাবলীতে প্রীত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে 'ব্রহ্মানন্দ' এই উপাধি দেন এবং সমাজের আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৬২ খ্রী:)। অতঃপর তিনি নিজে প্রধান আচার্য এই আখ্যা গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা বাংলা দেশের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। আচার্যপদে বৃত হইবার পর তিনি দক্ষিণ ভারতে ধর্মপ্রচার করেন (১৮৬৪ খ্রী:)। তিনি প্রথমে মাদ্রাজ ও পরে পুণা, বোম্বাই, কালিকট প্রভৃতি স্থানে গমন করেন এবং এই সমুদয় নগরীতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে ধর্মসমাজ স্থাপিত হয়। বোম্বাই-এর সমাজ "প্রার্থনা সমাজ" নামে খ্যাত হয় এবং মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের পরিচালনায় ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কেশবচন্দ্রের ভারত ভ্রমণ একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ইহার পূর্বে বর্তমান যুগে সমগ্র ভারতের ঐক্য সাধনের আদর্শ ও প্রচেষ্টার এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে রাজনীতিক ভিত্তিতে জাতীয় কংগ্রেস যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, বহুদিন পূর্বেই কেশবচন্দ্র ধর্মের ভিত্তিতে তাহার সূচনা করেন।

তত্ত্ববোধিনী সভা বিলোপ করিয়া নূতনভাবে পরিচালনার পর প্রথম পাঁচ-ছয় বৎসর কাল ব্রাহ্মসমাজের সুবর্ণ যুগ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। কার্যসূচীর প্রসার, জনপ্রিয়তা অর্জন এবং শাখা সমাজ-প্রতিষ্ঠানের ও সভ্য সংখ্যার বৃদ্ধি—সকলই এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। ব্রাহ্ম সমাজের

সভ্য সংখ্যা ১৮২৯ সনে ছিল ৬, এবং দশ বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া ১০০ হইয়াছিল। ১৮৪৯ সনে এই সংখ্যা ছিল ৫০০, কিন্তু ১৮৬৪ সনে ইহা বাড়িয়া দুই সহস্র হইয়াছিল। বাংলা দেশের নানাস্থানে এই সভার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—এবং বাংলার বাহিরেও বোম্বাই ও মাদ্রাজ পর্যন্ত ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৮৫৮ সনে এই শাখা-সমাজের সংখ্যা ছিল ১০।১২টি কিন্তু ১৮৭৮ সনের যে মাসে ইহার সংখ্যা ছিল ১২৪—বঙ্গদেশে ৮০, আসামে ৮, বিহারে ৬, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ১১, অযোধ্যায় ৫, বম্বে প্রদেশে ৭, সিন্ধু প্রদেশে ২ এবং দক্ষিণ ভারতে ৫। ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় ২১টি পত্রিকা প্রকাশিত হইত। এই দ্রুত উন্নতি যে প্রধানত কেশবচন্দ্রের কৃতিত্বের ফল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব ব্যতীত ইহা সম্ভব হইত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যাইতে পারে।

কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গরাশির মত উন্নতির সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মসমাজের অবনতি আরম্ভ হইল। ইহার মূল কারণ হইল, দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের মতবিরোধ। বিপ্লব মাত্রেরই একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে, একবার আরম্ভ হইলে ক্রমশই ইহার গতিবেগ বর্ধিত হইতে থাকে—এবং প্রথম বিপ্লবকারীরা যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রা করেন, পরবর্তী কালে তাঁহাদের অনুচরগণ সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া এতদূর অগ্রসর হন যে, পূর্ববর্তিগণ ইহার অনুমোদনের পরিবর্তে বিরোধিতা করেন। বিংশ শতাব্দীতে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে ইহার যে সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়—উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্ম সমাজের বিবর্তনেও তাহাই ঘটিয়াছিল। রামমোহন যেখানে থামিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহা হইতে অনেক দূর অগ্রসর হইলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্ম হইতে একটি স্বাতন্ত্র্য দান করিলেন—এবং বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিতে অসমর্থ হইলেন। কিন্তু তিনি উপনিষদ, স্মৃতি প্রভৃতি একেবারে অগ্রাহ্য করেন নাই। সমাজ সম্বন্ধেও তিনি পৌত্তলিকতা বর্জন পূর্বক হিন্দুর নানাবিধ সংস্কার—উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতেন। জাতিভেদ না মানিলেও ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহ (কেশবচন্দ্র ব্যতীত) বেদী হইতে উপাসনা করিবার অধিকারী ছিলেন না।

কেশবচন্দ্র আর এক ধাপ অগ্রসর হইলেন। তিনি সর্বপ্রকার শাস্ত্রের

উপর কেবলমাত্র যুক্তি ও বিবেকের অনুশাসন মানিতেন, এবং যে কোন সামাজিক প্রথা যুক্তি-বিরোধী—যতই প্রাচীন ও শাস্ত্রানুমোদিত হউক না কেন, তাহা অবিলম্বে বর্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুগত যুবকদল সর্ববিধ সামাজিক সংস্কারের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ, স্ত্রীলোকের পর্দা বিলোপ প্রভৃতি সংস্কারের কার্য তাঁহারা সক্রিয়ভাবে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্যদিগের উপবীত ত্যাগ ও জাতি নির্বিশেষে সকলেরই বেদী হইতে উপাসনা পরিচালনা করিবার অধিকারও তাঁহারা দাবি করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ প্রথম উপবীতধারী উপাচার্যদিগকে বর্জন করিলেন কিন্তু পরে আবার তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে একটি আপস রফার চেষ্টা করিলেন এবং "উপবীতধারী ব্রাহ্মণ উপাসনাকারীর পার্শ্বে জাতিভেদ বিরোধী প্রগতিশীল ব্যক্তিদেরও স্থান করিয়া দিলেন।"[৭] এই সমুদয়ের ফলে বৃদ্ধের দল অসন্তুষ্ট ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল কিন্তু প্রগতিশীল দলও সন্তুষ্ট হইল না। তাহারা দাবি করিল যে, "সাধারণ উপাসনার দিন ব্যতিরেকে তাহাদের উপাসনার জন্য একই ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে অন্য একদিন নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে।" দেবেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় কেশবচন্দ্র ও তাঁহার প্রগতিশীল দল ব্রাহ্ম সমাজ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলেন (১৮৬৫) এবং কিছুদিন পর 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত সমাজ 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' নামে পরিচিত হইল।

দেবেন্দ্রনাথ যে সমাজসংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। কিন্তু তাঁহার মতে ধর্ম ও সমাজসংস্কার একসঙ্গে একভাবে গ্রহণ করিলে অনর্থের সৃষ্টি হইবে। এ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন: "সমাজসংস্কার ও সভ্যতাবর্ধন যদি ব্রাহ্মধর্মের অঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম কেবল সংস্কৃত ও সভ্য সমাজেরই ধর্ম হইয়া থাকিবে। বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক ও উদারতর বলিয়া ব্রাহ্মধর্মের যে মহিমা কীর্তিত হইয়া থাকে, তাহার যথেষ্ট হানি করা যাইবে।"[৮]

সামাজিক সংস্কার ভিন্ন আরও কোন কোন বিষয়ে কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে মতদ্বৈধ প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। কেশবের ইচ্ছা ছিল যে, ব্রাহ্ম সমাজ কতকগুলি নিয়ম প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সর্বসাধারণের মত

দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ইহার বিরোধী ছিলেন, কারণ এ সকল বিষয়ে জনমতের প্রতি তাঁহার মোটেই আস্থা ছিল না।

কেহ কেহ উভয়ের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধের আর একটি কারণও নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল বাংলা ১৩৬৫ সনে প্রকাশিত কেশবচন্দ্র সেনের জীবনীতে লিখিয়াছেন :

"তিনি (কেশবচন্দ্র) দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের পর একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় মণ্ডলী স্থাপন করিতে অভিলাষী হন, যাহা শুধু বাংলার নহে, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ধর্মসমাজগুলির মধ্যেও যোগাযোগ স্থাপন করিয়া পরস্পর উন্নতি সাধনে যত্নবান হইবে। বঙ্গদেশে প্রতিনিধি-সভা গঠিত হইল, নিয়মাবলীও রচিত ও গৃহীত হইল। এইরূপ প্রতিনিধি-সভার কয়েকটি অধিবেশন এই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ প্রতিনিধি-সভা গঠনের প্রস্তাবেই দেবেন্দ্রনাথ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। পাছে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের কর্তৃত্বভার প্রতিনিধি-সভার হাতে চলিয়া যায় এই আশঙ্কায় তিনি ট্রাস্টীর ক্ষমতাবলে উহার কর্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন পরিচালকপদে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বসান। কেশবচন্দ্রের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হইল ; কেশবচন্দ্র প্রকাশ্য সভায় এরূপ কার্যের সমালোচনা করিতে ছাড়িলেন না। এইভাবে বিরোধ ক্রমে বিচ্ছেদে পরিণত হইল। কেশবচন্দ্র সদলে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন।" ৮ক

যোগেশবাবুর মতে পূর্বে উল্লিখিত সমাজ-সংস্কার ও উপাচার্যদের উপবীত ত্যাগ ও গ্রহণাদি প্রভৃতি কারণগুলি গৌণ, অর্থাৎ এইটিই বিচ্ছেদের আসল কারণ। অথচ ১৫ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীতে তিনি ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই।

১৮৬৬ সনের ১১ নভেম্বর ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভার একটি সাধারণ সম্মেলনে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথমে একখানি খোলার ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে উপাসনার স্থান হয়। পরে সভ্যগণ নিজেরা চাঁদা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন এবং কেশবচন্দ্র নিজের দায়িত্বে মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে (বর্তমান কেশব সেন স্ট্রীট) জমি কেনেন। ১৭৮৯ শক ১১ মাঘ (১৮৬৮, ২৪ জানুআরি) 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দিরের' ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই নামটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেকালে সমগ্র ভারত যে একটি অখণ্ড দেশ এ ধারণা লোকের মনে স্থান পাইত না। রাজনীতি ক্ষেত্রে এই বাংলা দেশের

নেতারাই ১৮৫১ সনে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করিয়া ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ঐক্য সাধনের সূত্রপাত করেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র আর একটু অগ্রসর হইয়া ধর্মক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের ঐক্য সাধনের প্রতীক স্বরূপ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' এই নামটি ব্যবহার করিলেন। দক্ষিণ ভারতে ধর্মপ্রচার করিবার পর হইতেই সম্ভবত তিনি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৮৬৯ সনের ২১শে অগষ্ট বহু আড়ম্বর, উপাসনা ও বক্তৃতার সহিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়।

নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠার পর পূর্বের ন্যায় কেশবচন্দ্র ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপূর্ব কর্মশক্তির পরিচয় দিলেন। ১৮৬৭ সনে উত্তর ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি পাটনা, এলাহাবাদ, কানপুর, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি একটি বক্তৃতায় সমগ্র ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণের একটি মিলন-ক্ষেত্রের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। দশ বৎসর পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এইরূপে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে শিক্ষিত ভারতবাসীদের মিলন-ক্ষেত্র রচনার পথ সুগম করেন। এ বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

কেশবচন্দ্রের দৃষ্টান্তে ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া একদল ব্রাহ্ম যুবক প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। হিন্দু আত্মীয় ও প্রতিবেশীর হস্তে তাঁহাদের অনেককেই যথেষ্ট লাঞ্ছনা, অপমান ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নিজের জন্মস্থান শান্তিপুরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করায় তাঁহার গায়ে চিটাগুড় মাখাইয়া বোলতা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। উমেশচন্দ্র দত্ত হরিনাভিতে ব্রাহ্ম মন্দিরে চক্ষু বুজিয়া ধ্যান বা উপাসনা করিতেছিলেন—এই অবস্থায় তাহাকে তুলিয়া পাশের এক কাঁটাবনে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন স্থানে ব্রাহ্ম মন্দিরে আগুন লাগান হয়। কোন কোন যুবা প্রচারককে পিতা ত্যাজ্যপুত্র করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। কিন্তু এই সমুদয় বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্মের প্রচার পুরাদমে চলিতে লাগিল এবং বাংলা দেশে ইহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়া গেল। কেশবচন্দ্রের বহুমুখী কর্মশক্তি ও তাঁহার ধর্মসম্প্রদায়ের বিস্তৃত বর্ণনা করা বর্তমান গ্রন্থে সম্ভব নহে। কেবল কয়েকটি বিশিষ্ট প্রসঙ্গের উল্লেখ করিব।

কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি কেবল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৮৬০ সন

হইতেই তিনি জগতের বিভিন্ন স্থানের একেশ্বরবাদীদের সহিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনা করিয়াছিলেন। ভারতে খ্রীষ্টীয় পাদ্রীদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক এবং কয়েকটি বক্তৃতায় তিনি খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান ও যীশু খ্রীষ্টের প্রতি অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৬৬ সনে মার্চ মাসে তিনি "খ্রীষ্ট, ইউরোপ ও এশিয়া" নামক যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড লরেন্স হইতে আরম্ভ করিয়া বহু উচ্চপদস্থ ইংরেজ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। এইরূপ আরও কয়েকটি বক্তৃতার ফলে অনেকে, বিশেষতঃ পাদ্রীরা, বিশ্বাস করিতেন যে, কেশব অবিলম্বে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবেন। সুতরাং কেশবচন্দ্র যখন বিলাত যাত্রার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, তখন সেখান হইতে লর্ড লরেন্স প্রমুখ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সাদর আমন্ত্রণ জানাইলেন। ১৮৭০ সনে ২১শে মার্চ তিনি লণ্ডনে পৌঁছিলেন এবং প্রায় সাত মাস সেখানে থাকিয়া ২০শে অক্টোবর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। বিলাতে ম্যাক্সমুলার, জন স্টুয়ার্ট মিল, গ্ল্যাডস্টোন প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়াও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিলাতে কেশবচন্দ্রের জনপ্রিয়তার সম্ভবত রাজনীতিক কারণও ছিল। ইংরেজ সরকারের আনুগত্য তিনি অবশ্য পালনীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সর্বপ্রকার রাজনীতিক আন্দোলন বর্জন করিয়া চলিতেন। সুতরাং যখন সুরেন্দ্রনাথের উদ্দীপনাময় বক্তৃতা ও জাতীয় ভাব জাগরণের প্রভাবে বাংলার যুবকদল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিল তখন কেশবচন্দ্রের ইংরেজ রাজের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য ক্রমশই যুবক দলকে তাঁহার ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রতি বিমুখ ও রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট করিল।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র নানাবিধ সমাজ-সংস্কারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন—স্ত্রীজাতির শিক্ষা ও সর্ববিধ উন্নতি, শ্রমিক দলের শিক্ষা ও মানসিক উন্নতি, সর্বসাধারণের জন্য অল্প মূল্যে গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ, সুরাপান নিবারণ, প্রভৃতি অনেক কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইহার ফলে এক পয়সা মূল্যের 'সুলভ সমাচার', শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় ও বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীপদ ব্যানার্জি ১৮৭৪ সনে শ্রমিকদের জন্য 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকা প্রকাশিত করেন।

রাজনীতিক কারণ ছাড়া কেশবচন্দ্রের জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্য কারণও ছিল। তিনি ক্রমশ খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও ধর্ম শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। পূর্বোল্লিখিত খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন: 'যখন আমি চিন্তা করি খ্রীষ্ট, তাঁহার শিষ্য ও ধর্মপ্রচারকগণ সকলেই এশিয়াবাসী ছিলেন, তখন খ্রীষ্টের প্রতি আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া যায়। তিনি মানবত্বের উৎকৃষ্ট আদর্শ…এশিয়া ও ইউরোপ তাঁহার ভিতর দিয়াই একতা ও সমন্বয়ের শিক্ষা লাভ করিতে পারে।' ১৮৬৮ সনের একটি বক্তৃতায়ও তিনি খ্রীষ্টধর্মের উৎকর্ষ উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, বিশেষতঃ উপনিষদের ভিত্তিতেই ধর্মমত গঠন করিয়াছিলেন—কিন্তু কেশবচন্দ্র তাঁহার ধর্ম সার্বজনীন উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ইহা যে হিন্দুধর্মের সংস্কার মাত্র তাহা অস্বীকার করিলেন। শালগ্রাম শিলা সম্মুখে না রাখিয়া বিবাহ করায় ব্রাহ্মদের বিবাহ আইনের চক্ষে অসিদ্ধ ছিল, সুতরাং কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় গভর্নমেণ্ট ১৮৭২ সনে নূতন এক আইন করিলেন। এই নূতন আইনে বিভিন্ন জাতির মধ্যে, এবং কোন প্রকার পৌত্তলিকতার (শালগ্রাম শিলা প্রভৃতির) অনুষ্ঠান ব্যতীতও আইনসঙ্গত বিবাহ হইতে পারিত। কিন্তু যাহারা এই আইন অনুসারে বিবাহ করিত তাহাদিগকে ঘোষণা করিতে হইত যে, "আমি হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান নহি।" এই আইনের খসড়ায় ইহার নাম ছিল "ব্রাহ্মবিবাহ বিল"। কিন্তু আদি ব্রাহ্ম সমাজের লোকেরা আপত্তি করিল যে, তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্মমত গ্রহণ করিলেও নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া মনে করেন। তখন ঐ আইনের নাম হইল "সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট" (Civil Marriage Act)। এইরূপে কেশবের ধর্ম সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু এই নূতন আইন একদিক দিয়া তাঁহার বিজয় সূচিত করিলেও পরিণামে ইহাই তাঁহার সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন করিল।

ইহা বর্ণনা করার পূর্বে কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনের আরও কয়েকটি গুরুতর পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

একদিকে তিনি যেমন খ্রীষ্ট ধর্মোক্ত "ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব", "মানুষ মাত্রেই পাপী – অনুতাপ ও হৃদয় পরিবর্তন ও ঈশ্বরের করুণা ব্যতীত তাহার উদ্ধারের উপায় নাই" প্রভৃতি বিশিষ্টভাবের উপর অতিরিক্ত জোর দিতেন, ও খ্রীষ্টের দেবত্বে বিশ্বাস করিতেন, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার

আচরণে বৈষ্ণবোচিত ভক্তি ধর্মের আতিশয্য নানাভাবে প্রকাশ পাইত। ইহার ফলে তাঁহার সহচর ও অনুচরের দলে "অনুতাপ ও ব্যাকুল প্রার্থনা" অদ্ভুতরূপে ফুটিয়া উঠিল। ব্রাহ্ম উপাসকগণের ক্রন্দন, চীৎকার ও আর্তনাদে, বাহিরের লোকের পক্ষে তাহাদের উপাসনার স্থানে বসা দুষ্কর হইত। কোন কোন ব্রাহ্ম সঙ্গীত ও সংকীর্তনাদির সময় অচেতন-প্রায় হইয়া গড়াগড়ি দিতেন। কেহ বা অপরের পা ধরিয়া কাঁদিতেন এবং অনেকে আচার্য কেশবচন্দ্রের চরণে পড়িয়া প্রার্থনা করিতেন।[৯]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি শক্তিরূপে কালীর উপাসনাও করিতেন—কেহ কেহ এরূপও বলিয়াছেন। কিন্তু কেশব-চন্দ্রের কোন কোন ভক্ত ইহা স্বীকার করেন না। আমার পিতৃদেব কৈশোরে কেশবচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, কেশব যখন ঘণ্টা বাজাইয়া কালীপূজা আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন।[১০]

আর একটি নূতনত্ব—কেশবচন্দ্রের অন্তরে ভগবানের 'প্রত্যাদেশ'—এবং যুক্তির পরিবর্তে এই প্রকার প্রত্যাদেশের অনুসরণ। সম্ভবত ইহারই ফলে তাঁহার কোন কোন ভক্ত তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেন এরূপ কাহিনী প্রচলিত হইয়াছিল। এই বিষয়টি লইয়া তখন ঘোরতর আন্দোলন হইয়াছিল। কিন্তু ইহা যে অনেকটা সত্য তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।[১০ক]

এই সমুদয় কারণে কেশবের সহকর্মিগণ ক্রমশ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠেন। ইহাই কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তীব্র আকার ধারণ করে।

১৮৭৭ সনের শেষ দিকে বাংলা গভর্নমেণ্ট কুচবিহারের মহারাজার সহিত কেশবচন্দ্রের কন্যা সুনীতি দেবীর বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত করেন। কেশবের ব্রাহ্ম বন্ধুগণ ইহার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কারণে আপত্তি করেন।

(১) ১৮৭২ সনে কেশবের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মদের বিবাহ আইনানুমোদিত করিবার জন্য যে নূতন আইনের প্রবর্তন হয় তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই আইন অনুসারে বিবাহ দিতে হইলে বর ও কনের বয়স যথাক্রমে অন্যূন ১৮ ও ১৪ বৎসর হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বর ও কনে দুজনেরই বয়স ইহার অপেক্ষা কম ছিল।

(২) বিবাহে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিকূল পৌত্তলিকতার অনুষ্ঠান হইবে। কারণ কুচবিহারের রাজপরিবার ছিল গোঁড়া হিন্দু।

(৩) মহারাজা স্বয়ং ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন না।

কিন্তু এই সমুদয় আপত্তি সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র এই বিবাহে অনুমতি দিলেন। যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিকূল কোন অনুষ্ঠান না হয় এ সম্বন্ধে বরপক্ষ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কার্যকালে নারায়ণ শিলার সম্মুখেই হিন্দু অনুষ্ঠানের সহিত বিবাহকার্য সম্পন্ন হয় (৬ই মার্চ, ১৮৭৮)। অবশ্য কেশবচন্দ্র ইহার বিরুদ্ধে চেষ্টা ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হন নাই। তবে একথা স্বীকার করিলেও, এরূপ হওয়ার যে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এ কথা পূর্বেই তাঁহার বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু কেশবচন্দ্র ভগবানের প্রত্যাদেশ হিসাবেই এই বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন। বিবাহের অল্পকাল পরেই কেশবচন্দ্র একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন: "আমি অনুভব করিলাম স্বয়ং ভগবান তাঁহারই অদ্ভুত বিধানে আমার তনয়ার পরিণয়ের জন্য কুচবিহারের যুবক মহারাজাকে আমার সম্মুখে আনিয়াছিলেন। আমি কি আর না বলিতে পারি? আমার বিবেক আদেশ পালন করিতে বলিল।...অপরাপর চিন্তা এই পবিত্র আহ্বান—এই ঐশ্বরিক অনুজ্ঞার নিম্নে পড়িয়াছিল।" [১১]

যাঁহারা বিবাহের বিরুদ্ধে বিশেষ আপত্তি করেন নাই, তাঁহারাও সাংসারিক ব্যাপারে 'ভগবানের প্রত্যাদেশ' এইরূপ দোহাই দেওয়া খুবই আপত্তিজনক বলিয়া মনে করিতেন। এই প্রকার রাজপরিবারের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে যে ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পূর্বোক্ত নানা কারণে কেশবের অনুচরগণের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হওয়ায় এই উপলক্ষে এক প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং আপত্তিকারী ব্রাহ্মগণ কেশবচন্দ্রকে সমাজের সম্পাদক ও আচার্যের পদ হইতে সরাইবার চেষ্টায় বিফল হইয়া ১৮৭৮ সনের ১৫ই মে তারিখে টাউন হলে এক সভা আহ্বান করিলেন। এই সভাতে এক স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হইল। ইহারই ফলে 'কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয়বার বিচ্ছেদের পরে কেশবচন্দ্রের ধর্মমতের অনেক পরিবর্তন হইল। এই পরিবর্তনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মধর্মকে সকল দেশের

এবং সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের উপযোগী এক বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত করা। সনাতন হিন্দু ধর্মের ভক্তি, বিশ্বাস ও ভাবধারাগুলিকেও তিনি ইহার অন্তর্ভুক্ত করিলেন। একটি বক্তৃতায় তিনি যীশুখ্রীষ্টে দেবত্ব আরোপিত করিলেন। হিন্দুধর্মের চিরপ্রচলিত ধর্মসাধনা—সৃষ্টি কর্তাকে মাতৃ বা শক্তিরূপে উপলব্ধি করা—তিনি গ্রহণ করিলেন। আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ মূর্তিরূপে পূজিত হইতেছে। হিন্দুর পৌত্তলিকতা অগ্রাহ্য করিবার বস্তু নয়। মূর্তি ভগবানের অসংখ্য অংশের প্রতীক, সকল একত্র কর অখণ্ড ব্রহ্মকে পাইবে। প্রত্যেকটি মূর্তি ভগবানের এক একটি গুণবাচক প্রতীক।" বৈষ্ণবদের মত তিনি দল বান্ধিয়া রাস্তায় ভগবানের নাম সংকীর্তন করিতেন। তিনি আর একটি অনুষ্ঠান প্রবর্তন করিলেন— **Pilgrimage to Saints and Prophets** (সাধুসন্তদের নিকট তীর্থযাত্রা)। ইহার উদ্দেশ্য হইল, জগতের সকল সাধু ও মহাপুরুষদের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে গভীর আলোচনা ও ধ্যান এবং তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা ধর্মে ও জীবনে গ্রহণ করা, এবং তাঁহাদের সঙ্গে আত্মিক যোগ স্থাপনা করা। তিনি বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, সোক্রেটিস, কার্লাইল, এমারসন, ফ্যারাডে প্রভৃতি সকলকে এই সাধু ও মহাপুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। মোটের উপর কেশবচন্দ্র তাঁহার ধর্মে হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বগুলি, এমন কি পৌত্তলিকতার নিগূঢ় রহস্যপূর্ণভাব, বৈষ্ণবের ভক্তিবাদ, শৈবের শক্তি পূজা প্রভৃতির সহিত ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্যগুলির সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সমন্বয়মূলক নবীন ধর্মমতকে তিনি 'নববিধান' নামে অভিহিত করিলেন অর্থাৎ সমাজের নাম পূর্ববৎ ব্রাহ্ম-সমাজ থাকিল, কিন্তু ধর্মের নাম হইল নববিধান। ১৮৮১ সনে মাঘোৎসবের সময় মন্দিরের বেদী হইতে এবং টাউন হলে তাঁহার বার্ষিক ইংরেজী ভাষণে তিনি এই নবধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিয়া বলিলেন, "এই নববিধান সকল ধর্মপ্রবর্তক, সকল ধর্মশাস্ত্র ও সকল বিধানের এক অপূর্ব সঙ্গতি। এই নববিধান সকল দেশের ও সকল কালের সঞ্চয়িত মণিমুক্তাদ্বারা নির্মিত একটি বহুমূল্য কণ্ঠহার। জগতে যাহা কিছু সত্য, শিব ও সুন্দর সে সমস্তই এই ধর্মে গৃহীত হয়। হে জগতের জাতিসমূহ, তোমরা এই ধর্মের পতাকার সম্মুখে মস্তক অবনত কর আর ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা কর।"[১২]

নববিধান ঘোষণার পরেই 'পতাকা বরণ' নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। নববিধানের প্রতীক এই পতাকায় চিত্রদ্বারা ধর্মসমন্বয়ের কল্পনা ও আদর্শ পরিস্ফুট করা হইয়াছে। ইহার বর্ণনা প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র বলেন: "ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত কর, সেখানে দেখিবে জগতের সকল ধর্মপ্রবর্তক সাধু মহাজনদের আত্মা সম্মিলিত হইয়াছে...এই পূত পতাকার পাদদেশে রহিয়াছে হিন্দু, খ্রীষ্টান, মোসলেম ও বৌদ্ধধর্মের শাস্ত্রসমূহ।"[১৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কেবলমাত্র বাণী দ্বারা নহে, নিজের সাধনা দ্বারা সর্বধর্মসমন্বয়ের যে অপূর্ব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। ইহা পরে বিবৃত হইবে। কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন—অনেকে এই মত পোষণ করেন, কিন্তু নববিধানের নেতাগণ অনেকেই ইহা বিশ্বাস করেন না। তবে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও আরও কেহ কেহ ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন।[১৪]

কেশবচন্দ্র নববিধানের বিশেষত্বসূচক কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন। খ্রীষ্ট ধর্মের অনুকরণে দীক্ষাগ্রহণ (Baptism) ও অন্তিম ভোজ (Lords' Supper), এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুমতে হোমেরও ব্যবস্থা হয়। প্রচারক দলকে অভিষিক্ত করা, ভক্তদের ভিতর দারিদ্র্য, আত্মসমর্পণ, দান প্রভৃতি বিষয়ে ব্রত গ্রহণের প্রবর্তন, ও এই উদ্দেশ্যে ভগিনী সম্প্রদায় ও যুবক-সম্প্রদায় গঠন—ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফরাসী পণ্ডিত রোঁমা রোঁলা ও পাশ্চাত্যের আরও অনেক মনীষিবৃন্দ 'নববিধানের' উদার সার্বজনীনভাবে মুগ্ধ হইয়া কেশবচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। যে সকল ব্রাহ্ম তাঁহার দল ছাড়িয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম প্রসিদ্ধ নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী ইহাকে "ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্তে কেশবচন্দ্রের একটি প্রধান কার্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতিও ইহার সম্বন্ধে অনেক সাধুবাদ করিয়াছেন।[১৫] কিন্তু তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নববিধান কোনদিনই খুব জনপ্রিয় হইয়া ওঠে নাই এবং ১৮৮৪ সনে কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর ইহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না। ইহার প্রধান কারণ মনে হয় যে, হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম কোন সম্প্রদায়ই কেশবচন্দ্রের অনেক কার্যকলাপ সমর্থন করিতেন না। এ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজনারায়ণ বসুকে একখানি পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে।

"শ্রীযুক্ত কেশববাবুর প্রতি এখনো যে আমার স্নেহ আছে তাহা ম্লান হয় নাই তাহাই আমি প্রতাপবাবুর পত্রে লিখিয়াছিলাম।...আমার সহিত কেশববাবুর যাহাতে পূর্ববৎ সম্মিলন হয়, প্রতাপবাবু তাঁহার পত্রের শেষে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।...এই কথার সহজ উত্তর এই যে ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আর মিল হইতে পারে না। মিলের সম্ভাবনাই বা কোথায়? যখন তিনি স্বীয় অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার আর নাগাল পাই না, তখন আর তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারে মিল হইবে? যখন তিনি কখনো গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কখনো রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করিতে করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কখনো আবার হোম করিতেছেন, কখনো সশিষ্যে বাড়ীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডান নদীতে জান-দি-বেপ্‌টাইস্‌টের দ্বারা বেপ্‌টাইস্‌ট হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুশা, যীশা, সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থযাত্রা করিতেছেন—তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে? আমরা কেবল এক জন্মভূমির অনুরাগে ঋষিদিগের বাক্যেই জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছি, তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদিদিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদিদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই তাঁহার অসাধারণ উদার প্রেমই সমস্ত কলহের মূল, ইহা লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এত বিবাদ। ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহার অন্ত নাই - ইহার কোলাহল ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে।"[১০]

কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' যে আদি ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ উভয়েরই' বিরাগভাজন হইয়াছিল এই পত্র হইতে তাহা জানা যায়। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী যাহা লিখিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন:

"ব্রাহ্ম ধর্মের এই উদারতা ও সার্বজনীনতা তাঁহার একটি প্রধান কার্য। এ কার্যের গুরুত্ব ও মহত্ব প্রতীতি করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এখনও জগতের ধর্মসকল প্রাচীন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লইয়া বাস করিতেছে, ব্রাহ্মধর্ম যে মহৎ কার্যে প্রবৃত্ত, তাহা দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু দিন আসিতেছে, যখন তাহা দেখিতে পাইবে। তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তি পাইবে।"[১১]

ইহা ব্যতীত কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজকে অন্য যাহা যাহা দিয়া গিয়াছেন—

১৯১০ সনে মাঘোৎসব উপলক্ষে শিবনাথ শাস্ত্রী তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন ও তাঁহার বিরোধী দলের অন্যতম নেতা ত্রিশ বৎসর পরে তাঁহার সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী—কারণ ইহা স্তাবকের অত্যুক্তি নহে এবং পক্ষপাতিত্বদোষে দুষ্ট বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। সমসাময়িক ঘটনায় যে চিত্তবিক্ষোভ হইয়াছিল, তাহার উপশম হইবার বহু বৎসর পরে বাদ-বিসম্বাদের অবসানে, শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার বিরোধী পক্ষের নেতার অবদান যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—তাহা তাঁহার ন্যায় উদার-হৃদয় চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব এবং সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং সংক্ষেপে ইহার উল্লেখ করিতেছি:

১। কেশবচন্দ্রের প্রথম মহোপদেশ এই যে ঈশ্বরের মৌখিক বা ক্রিয়াময় পূজাই সর্বশ্রেষ্ঠ নহে, কিন্তু বাক্যে, কার্যে ও জীবনে অসত্যকে বর্জন করা ও সত্যকে গ্রহণ করা, অন্যায়কে নিবারণ করা ও ন্যায়কে স্থাপনা করা, অপবিত্রতাকে পরিহার করা ও পবিত্রতাকে অবলম্বন করা, এসকলও তাঁহার পূজা। ব্রাহ্ম যে কেবল মূর্তি পূজা বর্জন করিয়া তৎস্থানে অনন্তের পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার ধর্মবুদ্ধিতে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত জানিয়া সর্বস্থানে সর্বকালে ও সর্বাবস্থাতে তাঁহার আদেশের অনুগত হইয়া চলিবেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপদেশ ও দৃষ্টান্তে এইভাব যুবক ব্রাহ্মগণের মনে এক সময় এমন প্রবল হইয়াছিল যে, ইহা অনেক জীবনে মহা পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল।

২। দেবেন্দ্রনাথ মানবের সামাজিক জীবনকে ধর্মসাধনের অঙ্গীভূত করেন নাই; কিন্তু কেশবচন্দ্র আধ্যাত্মিক অর্চনার ন্যায় মানবের সামাজিক জীবনকে ধর্মসাধনের অঙ্গীভূত করিলেন। জাতিভেদ বর্জন, নারীগণের শিক্ষা ও সর্ববিধ উন্নতি, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ নিবারণ, পানদোষ বর্জন প্রভৃতির দিকে যুবক ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

৩। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুভাবেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থ সকলের সমালোচনাই প্রধানরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্মকে এক উদার আধ্যাত্মিক ও সর্বজনীন মহাধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৪। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম বহুল পরিমাণে জ্ঞানের ধর্ম ছিল।

রামমোহনের জ্ঞান-প্রধান বেদান্তবাদ এবং দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ রসপান' ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উপজীব্য ছিল। কেশবচন্দ্র বৈষ্ণবীয় কীর্তন প্রথার প্রবর্তন ও চৈতন্য প্রভৃতি ভক্তগণের জীবন আলোচনা করিয়া এক নবযুগের প্রবর্তন করেন এবং ব্রাহ্ম সমাজে ভক্তিস্রোতের প্রবাহ বহিতে থাকে। ইহা দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্মকে জ্ঞান-প্রধান বেদান্তবাদে পরিণত হওয়ার বিপদ হইতে রক্ষা এবং ব্রাহ্ম ধর্মের সাধনে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের চির কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

৬। ঈশ্বরের করুণাতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক, তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্ম সমাজের সেবাতে দেহ মন প্রাণ নিয়োগ করিতে পারেন, এরূপ এক প্রচারকদল সৃষ্টি করা কেশবচন্দ্রের একটি প্রধান কার্য।[১৮]

ঘ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

কেশবচন্দ্রের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৫ই মে, ১৮৭৮) তাঁহাদের মধ্যে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ধর্মের দিক দিয়া এই সমাজের নূতন অবদান বিশেষ কিছুই নাই। আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্ম সমাজে আধ্যাত্মিকতার ভাব অনেকটা বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে "তাঁহার সাকার বিশ্বাস লুকাইয়া রাখিতে না পারিয়া" ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উক্ত সমাজের মধ্যে তাঁহার উপর যাঁহাদের একান্ত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল তাঁহারাও সমাজ ছাড়িয়া তাঁহার সহিত চলিয়া আসিলেন। পরবর্তী আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী একজন উপযুক্ত নেতা ছিলেন এবং সমাজের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নশীল ছিলেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ও তাঁহার অনুচরগণের সমাজত্যাগের পরই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে আধ্যাত্মিক ধর্মভাবের অনুশীলন ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতে লাগিল এবং আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কার এবং নানাবিধ দেশহিতকর কার্যেই সমাজের সদস্যগণ আত্মনিয়োগ করিলেন। অবশ্য সমাজে ধর্মপিপাসু ব্যক্তির একেবারে অভাব কখনও হয় নাই। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে কেশবচন্দ্র ও

বিজয়কৃষ্ণের পর আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও প্রচার 'নববিধান' ও 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের' বৈশিষ্ট্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত 'ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস' পড়িলে, এবং বিগত অর্ধশতাব্দী কালের যে কার্যক্রম বর্তমান লেখকের প্রত্যক্ষ গোচরে আসিয়াছে তাহা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মধর্মের নূতন নূতন উদ্‌ভাবনী শক্তি ও সক্রিয় গতিবেগ তিরোহিত হইয়াছে। গত নব্বই বৎসরে সাধারণ সমাজের সঙ্গে আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও কেশবচন্দ্রের নববিধান বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ পাশাপাশি অবস্থান করিয়া মোটামুটি নির্বিবাদে নিজ নিজ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ঠাকুর পরিবার—বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ, এবং অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ—আদি ব্রাহ্ম সমাজের স্মৃতি উজ্জ্বল রাখিয়াছেন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনেক সভ্যও সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞানচর্চা ও সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে কীর্তিলাভ করিয়াছেন—কিন্তু ধর্মের ইতিহাসে তাঁহাদের বিশেষ কোন স্থান নাই। তিনটি শাখার ব্রাহ্মদের সংখ্যা বহুদিন ধরিয়াই কমিতেছে। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় তাহাদের মোট সংখ্যা ২৮৫ এবং সমগ্র ভারতে ২,১১২। সুতরাং ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন এখন অতীতের ইতিহাসে পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান হিন্দু সমাজের গঠন ও আদর্শ যে ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু সমাজ হইতে স্বাতন্ত্র্যের দাবি বেশ জোরের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক পৌত্তলিকতা বর্জন ব্যতীত ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য, তাহা বর্তমান হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছে এবং কোন কোন বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম সমাজ অপেক্ষা অনেক বেশি অগ্রসর হইয়াছে। নিষিদ্ধ দ্রব্যের ভোজন, বিলাত যাত্রা, জাতিভেদের নিয়ম লঙ্ঘন, প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া ও শিক্ষিতা কন্যার অভাব, প্রভৃতি যে সমুদয় কারণে বহুসংখ্যক হিন্দু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিত, সে সকল কারণের অভাবই যে প্রধানত বাহ্ম সমাজের জনপ্রিয়তা ও সভ্য-সংখ্যা হ্রাসের প্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে ইহাও যেমন সত্য, অপ্রত্যক্ষভাবে ইহা যে হিন্দুধর্মের অঙ্গরূপে পরিণত হইয়া ইহাকে নূতন রূপ ও শক্তি দান করিয়াছে, ইহাও তেমনি সত্য। ভারতে বৌদ্ধধর্ম যেরূপে

পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়াছে, ব্রাহ্মধর্মও তেমনি বিরাট হিন্দুধর্ম ও সমাজের মধ্যে মিশিয়া যাইবে—ইহার সম্ভাবনা খুব বেশি।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের শ্রেষ্ঠ অবদান গণতন্ত্রমূলক ভিত্তির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' প্রথম হইতেই, এবং 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ' কিছুদিনের মধ্যেই কার্যত একজন নায়কের অধীনে পরিচালিত হইত। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম হইতেই গণতন্ত্র প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে। রাজনীতির ভাষায়, প্রথম দুই সমাজে ছিল স্বৈরতন্ত্র (Dictatorship) এবং তৃতীয়টি ছিল গণতন্ত্র (democracy)। ধর্মজগতে শাসনপ্রণালীর এই পরিবর্তন, বঙ্গদেশের রাজনীতিক চেতনাকেও অনুরূপভাবে পরিবর্তনের সহায়তা করিয়াছিল, এরূপ অনুমান করা খুব অসঙ্গত হইবে না। ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে বাংলায় যাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মদের সংখ্যা খুব কম নহে। ইহা একেবারে আকস্মিক ঘটনা নাও হইতে পারে। ধর্মমতের স্বাধীনতার জন্য ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ, সামাজিক জগতে সাম্যপ্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন কেশবচন্দ্র, এবং সাধারণ লোকের সর্ববিষয়ে তুল্য অধিকারের দাবির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। এই দাবি যে রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রয়োগ করার আন্দোলন হইবে ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সুতরাং ধর্মজগতে নূতন অবদান বিশেষ কিছু না থাকিলেও, জাতীয় জাগরণে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অ বদান স্বীকার করিতেই হইবে।

২। খ্রীষ্টধর্ম

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজগণ বাংলায় ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে বসবাস করিতে আরম্ভ করিলে বাংলা দেশে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার আরম্ভ হয়। সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম, ব্যাণ্ডেল ও হুগলীতে পর্তুগীজেরা বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে এবং ক্রমে এই সমুদয় স্থানে, বিশেষতঃ হুগলীতে, বহু পর্তুগীজ ও ইউরোপীয়ান স্থায়ীভাবে বাস করে। পর্তুগীজেরা জোর করিয়া হিন্দু মুসলমানদের খ্রীষ্টান করিত, এবং গর্ব করিত যে সমস্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে পাদ্রীরা দশ বৎসরে যত ভারতীয়কে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করে

হুগলীতে এক বৎসরে তাহার চেয়ে বেশী লোক খ্রীষ্টান হয়। কিন্তু মুঘল সম্রাট শাহজাহানের বেগমের দুই জন বান্দীকে অপহরণ করায় তাঁহার আদেশে হুগলী হইতে পর্তুগীজেরা বিতাড়িত হয় (১৬৩২ খ্রী:)।

পর্তুগীজ মিশনারীরা যে ধর্মপ্রচারের জন্য বাংলা শিখিয়া ঐ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিত, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (৪৪৭—৪৪৯ পৃ:) তাহা বিবৃত হইয়াছে। পর্তুগীজদের মধ্যে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, ১৭৪৩ খ্রী: রচিত 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থের রচয়িতা ডোম আন্টোনিও রোজারিও নামক খ্রীষ্টধর্মান্তরিত একজন বাঙ্গালী হিন্দু ঢাকার নিকটবর্তী অঞ্চলে ২০,০০০ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করে, কিন্তু দুই দল পাদ্রীর মধ্যে ইহাদের তত্ত্বাবধান করিবার ভার লইয়া বিবাদ হয় এবং তাহার ফলে ইহারা সকলেই পুনরায় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে। পূর্ববঙ্গে নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক পর্তুগীজদের প্ররোচনায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের মোট সংখ্যা খুব বেশী নহে। ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাঙ্গালীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব খুব সামান্যই ছিল। তবে বহু পর্তুগীজ এ দেশীয় স্ত্রীলোকদের বিবাহ করায় একটি বড় খ্রীষ্ট সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পর্তুগীজদের পরে ইউরোপ হইতে ওলন্দাজ ও ইংরেজ কোম্পানি এদেশে আসিয়া বাণিজ্যে প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু তাহারা ধর্মপ্রচারের সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিল। যে রাজকীয় সনদের বলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়াছিল তাহাতে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে তাহারা ভারতে মিশনারী পাঠাইতে পারিবে না। এই বাধা সত্ত্বেও উইলিয়ম কেরী নামে একজন ইংরেজ ডেন দেশীয় জাহাজে ১৭৯৩ সনে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসেন। তিনি এক দরিদ্র মুচির পুত্র ছিলেন এবং যথেষ্ট উৎসাহ ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে সম্পূর্ণ বিফল হইলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার আহ্বানে আরও চারি জন ইংরেজ এক আমেরিকান জাহাজে কলিকাতায় পৌঁছিলেন। কিন্তু ইংরেজ গভর্নমেন্ট তাঁহাদিগকে কলিকাতায় নামিতে না দেওয়ায় তাঁহারা ডেন জাতি-অধিকৃত শ্রীরামপুরে চলিয়া গেলেন এবং কেরীও সেখানে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এইরূপে কলিকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে প্রটেষ্ট্যান্ট খ্রীষ্টান মিশনারীদের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইল। বাংলা দেশে গদ্য ভাষা, সাহিত্য,

শিক্ষা ও মুদ্রা যন্ত্রের উন্নতিকল্পে তাহাদের অমূল্য অবদান যথাস্থানে বিবৃত হইবে। ১৮০০ সনে কৃষ্ণচন্দ্র পাল নামে একজন ছুতার মিস্ত্রী হাত ভাঙ্গিয়া টমাস নামে এক মিশনারী ডাক্তারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করে। সেই সর্বপ্রথম খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। ইহার পূর্বে সাত বৎসরের মধ্যে কেরী একটি বাঙ্গালীকেও খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই ঘটনায় সমস্ত মিশনারীরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—ডাক্তার টমাস উন্মাদের ন্যায় আচরণ করায় তাহাকে আটক করিয়া রাখা হইল।

বিলাতে একদল লোকের চেষ্টায় ভারতে ইংরেজ মিশনারীদের ধর্ম-প্রচারে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, ১৮১৪ সনে তাহা রহিত করা হয়। সুতরাং শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কর্মক্ষেত্র সমস্ত বাংলায় এবং বাংলার বাহিরেও বিস্তৃত হইল। ১৮১৮ সনে মিশনের অধীনে ১২৬টি দেশীয় ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়ে প্রায় দশ হাজার ছাত্র পড়িত, এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মেও শিক্ষালাভ করিত। ১৮২১ সনে শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই কলেজটি এখনও আছে।

১৮১৪ সনের পর বহু মিশনারী দলে দলে বঙ্গদেশে আসিতে লাগিল। কলিকাতায় একজন বিশপ নিযুক্ত হইলেন। ইহার ফলে এবং প্রধানত বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতির দ্বারা দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা প্রলুব্ধ হইয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী হয় নাই।

১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৩৫ সনের সরকারী নূতন ব্যবস্থায় ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও খ্রীষ্ট-ধর্মের প্রতি আসক্তি বাড়িয়া ওঠে। মধুসূদন দত্ত ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

পূর্বে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এ দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিরোধী ছিলেন—ক্রমে ক্রমে তাহাদের মত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল। ১৮১৩ সনে কোম্পানিকে যে নূতন সনদ দেওয়া হইল, তাহাতে মিশনারীদের এ দেশে বসবাস ও ধর্মপ্রচারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইল। দলে দলে মিশনারীরা এ দেশে আসিতে লাগিল ও ইংরেজ কর্মচারিগণ এ যাবৎ পরোক্ষভাবে হিন্দুধর্মের যে সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। তাহাদের প্রধান কয়টি অভিযোগের সারমর্ম এই :

(১) সরকার পক্ষ হইতে হিন্দু মন্দিরের ভার গ্রহণ করা।

(২) অনাবৃষ্টি হইলে ইহার নিবারণের জন্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুজা করান।

(৩) সরকারী দলিলে 'শ্রী' লেখা এবং গণেশ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা।

(৪) হিন্দু ও মুসলমান ধর্মোৎসবে সরকারী কর্মচারীদের যোগদান ও এই উপলক্ষে শোভাযাত্রায় সামরিক বাদ্য বাজান।

(৫) হিন্দু উৎসব উপলক্ষে দুর্গ ও জাহাজ হইতে কামান দাগা।[১৯]

এই আন্দোলনের ফলে বিলাতের কর্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন যে সরকারী কর্মচারীরা হিন্দুধর্মের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে পারিবে না। সরকারের নির্দেশ ছিল যে সরকারী কর্মচারীরা ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকিবে, কিন্তু কার্যত তাহারা খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য নানাভাবে মিশনারীদের সাহায্য করিত। এ বিষয়ে উদার মতাবলম্বী রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"গত বিশ বৎসর যাবৎ একদল ইংরেজ মিশনারী প্রকাশ্যে নানাভাবে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রথমত ছোট বড় নানা গ্রন্থে এই উভয় ধর্মের নিন্দা ও কুৎসা এবং হিন্দুদের দেবতা ও মহাপুরুষদের প্রতি গালাগালি ও ব্যঙ্গোক্তি করিয়া তাহা সাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা; দ্বিতীয়ত: এ দেশীয় লোকের গৃহের সম্মুখে এবং রাস্তায় দাঁড়াইয়া স্বীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠতা ও অন্য ধর্মের হীনতা প্রচার করা; তৃতীয়ত: নিম্নশ্রেণীর কোন লোক অর্থ লোভে বা অন্য কোন স্বার্থের আশায় খ্রীষ্টান হইলে তাহাদের ভরণপোষণ ও চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া অপরকে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণে উৎসাহ দান।

"সত্য বটে যে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা নানা দেশে ধর্মপ্রচার করিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে তাহারা ঐ সমুদয় দেশে রাজত্ব করিত না। যদি ইংরেজ মিশনারীরা তুরস্ক, পারশ্য প্রভৃতি অধিকতর নিকটবর্তী যে সমুদয় দেশ ইংরেজের অধীন নহে সেই সমুদয় দেশে ধর্মপ্রচার করিত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে যীশুর অনুচরগণের ন্যায় ধর্ম সাধনই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য; কিন্তু যে বাংলা দেশে ইংরেজ রাজা এবং ইংরেজের নামেই লোকে ভয়ে কম্পমান, সেই দেশের দরিদ্র ভীরু অধিবাসীদের ধর্মবিষয়ে স্বাধীন অধিকারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ভগবান বা মানুষের কাছে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত

হইবে না। কারণ জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা তাহাদের অপেক্ষা কম শক্তিশালী কাহারও মনে আঘাত দেওয়া অন্যায় মনে করেন, বিশেষত: এই সকল দুর্বল লোকেরা যদি তাঁহাদের অধীনস্থ হয় তবে তাঁহারা ইহাদের কোনরূপ কষ্ট দেওয়ার কথা কল্পনাও করিতে পারেন না।"[২০]

মিশনারীরা হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন বাংলার সুপ্রসিদ্ধ মনীষী রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ প্রণীত একখানি গ্রন্থের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে তাহা বোঝা যাইবে: "অধঃপতিত মানবের কুবুদ্ধি হইতে যে সকল অসত্য ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছে তাহার মধ্যে হিন্দুধর্মই সর্বাপেক্ষা বিশাল। জগতে যত মিথ্যা ধর্ম আছে তাহাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং অধিক প্রকারে ভগবানের প্রচারিত সত্যের বিরোধী মত ও উক্তি স্থান পাইয়াছে।"[২১]

মিশনারীদের বিদ্যালয়গুলি যে প্রধানত খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কেন্দ্ররূপে কল্পিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৮২২ সনে এক ইংরেজী পত্রিকায় লেখা হইয়াছে যে, "যে সকল ছাত্রেরা এখন পুতুল পূজার ন্যায় অপবিত্র গর্হিত আচরণে অভ্যস্ত তাহারা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রভাবে ভগবান ও তাঁহার প্রেরিত যীশু সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিবে।"

মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়গুলিতেও প্রকাশ্যে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দেওয়া হইত। হিন্দু ছাত্রীদের অন্নপূর্ণা, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি নামের উল্লেখ করিয়া একজন মন্তব্য করিয়াছেন, "ব্যভিচারিণী, ইন্দ্রিয় পরায়ণা যে সব কাল্পনিক দেবীর ক্রুরতা ও কামুকতার কুৎসিৎ কাহিনী হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে তাহাদের নামে পিতা মাতা যে সন্তানদের নাম রাখিয়াছেন তাহাদের সৎ আচরণ কিরূপে প্রত্যাশা করা যায়।"[২২]

মিশনারীরা যে ছলে বলে তরুণ বালকদিগকে খ্রীষ্টান করিতেন এরূপ অভিযোগ সে সময়কার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। ১২৪০ সালের ২৪ আষাঢ় (৬ জুলাই, ১৮৩৩) তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এক পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন যে তাঁহার পুত্র তাঁহাকে না জানাইয়া মিশনারী স্কুলে পড়িতেছে এই সংবাদ পাইয়া তিনি পুত্রকে বাড়ীতে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:

"কিঞ্চিৎকাল পরে জাতিভ্রষ্ট অপকৃষ্ট কৃষ্টা বাব্বা নামক পাতিফিরিঙ্গি একজন গত স্নানযাত্রার দিবসে আমার বনহুগলীর বাটীতে যাইয়া ঐ চৌদ্দ

বৎসর বয়স্ক বালককে ছল করিয়া আনিয়া বগীগাড়ীতে আরোহণ করাইল। বালক শিক্ষকের বশীভূত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে গেল তৎকালে আমার গৃহে পুরুষমাত্র ছিল না। কিন্তু যখন কলিকাতাভিমুখে বগী চালাইতে লাগিল তখন বালক চীৎকার ধ্বনি করিয়া গ্রামের লোককে কহিল তোমরা আমার পিতাকে সংবাদ দিবা আমাকে কেষ্টা বান্দা ধরিয়া লইয়া যায়। তৎপরে কএক দিবস আমি তত্ত্বকরত ঐ পাঠশালায় আছে জানিতে পারিয়া বাটীমধ্যে প্রবিষ্ট হওনের চেষ্টা করিলাম। কোনমতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলাম না। পরে পোলীসে নালিস করিলাম ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও তাহাতে মনোযোগ করিলেন না। ফলতঃ আমার বালককে ছাড়িয়া দিতে হুকুম দিলেন না।”

পত্রপ্রেরক ইহার পরে লিখিয়াছেন যে মিশনারীরা এই প্রকার দৌরাত্ম্য করিতেছে—এবং এইরূপ আরও যে চারিটি বালককে অপহরণ করিয়া খ্রীষ্টান করিয়াছে তাহাদের নাম ও পরিচয় দিয়া হিন্দুদিগকে মিশনারী দমনের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।[২৩]

মিশনারী ডাফ সাহেব তাঁহার যে গ্রন্থে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে পূর্বোল্লিখিত নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহার তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। ডাফ স্কুলের একজন ছাত্র ও তাহার স্ত্রী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় কলিকাতায় তুমুল আন্দোলন হয় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে হিন্দুগণ এই প্রকার বলপূর্বক খ্রীষ্টান করার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়। তাঁহাদের চেষ্টা অনেকটা সফল হয় এবং বলপূর্বক খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা দিবার দৃষ্টান্ত অনেক কমিয়া যায়। মিশনারীদের বিদ্যালয়গুলিই এইরূপ ধর্মান্তর গ্রহণের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। এইজন্য হিন্দুরা ইংরাজী শিক্ষার জন্য সচেষ্ট হইল। ইহার ফলে ১৮৪৫ সনে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সহস্রাধিক হিন্দু ছাত্র এখানে বিনা বেতনে পড়িতে পারিত।

কিন্তু এই সমুদয় অপচেষ্টা সত্ত্বেও উচ্চ ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের উপর খ্রীষ্টধর্ম বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। সাধারণত আদিবাসী ও অস্পৃশ্য জাতির লোকেরাই দলে দলে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিত। ইহার কারণ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। হিন্দু সমাজে যাহাদের ঘৃণিত জীবন যাপন করিতে হইত, খ্রীষ্টান হইলে তাহাদের যে কেবল সামাজিক উন্নতি হইত তাহা নহে; তাহারা বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে পড়িত, অনেকে

বিনামূল্যে খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি পাইত, হাসপাতালে ও প্রসূতি সদনে বিনা খরচায় চিকিৎসা, এবং অন্যান্য নানারকমের যথেষ্ট সুবিধা ভোগ করিত। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রচুর অর্থ আসিত এবং মিশনারীদের মধ্যে অনেক যোগ্য লোকের নিঃস্বার্থ চেষ্টার ফলে মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলি এ দেশের আদর্শ স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যীশুখ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস অপেক্ষা এই সমুদয় ঐহিক সুবিধাই সাধারণ লোককে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের প্রতি বেশী আকর্ষণ করিত।

খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত উচ্চবর্ণের বাঙ্গালীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলেও খ্রীষ্টধর্মের প্রধান প্রধান নীতি ও আদর্শ যে বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের অব্যবহিত পরেই পাশ্চাত্য খ্রীষ্টীয় সমাজের অনেক রীতিনীতি যে বাঙ্গালী যুবকেরা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দূষণীয় অনেক কিছু থাকিলেও স্থায়ী শুভ ফলও উপেক্ষনীয় নহে। ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মমত—একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিক পূজার বিরোধিতা,—সামাজিক উদার নীতি—স্ত্রীশিক্ষা, জাতিভেদ লোপ, বহুবিবাহে বিমুখতা, ধর্মের সহিত সামাজিক সংস্কারের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, শাস্ত্রসম্মত হইলেও কুসংস্কার ও যুক্তিহীন আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—প্রভৃতি নানা বিষয়ে খ্রীষ্টধর্ম ও সমাজের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না; এবং পরবর্তী কালে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যেও ইহার প্রসারে ব্রাহ্মধর্মের ও সমাজের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং খ্রীষ্টধর্মের ও সমাজের অপ্রত্যক্ষ প্রভাব তুল্যরূপেই বিদ্যমান। কেশবচন্দ্র সেন যে খ্রীষ্টধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় মিশনারী অপেক্ষা ইংরেজী সাহিত্য বাংলায় খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব বিস্তারে বেশী সহায়তা করিয়াছে। ধর্মগ্রন্থ বাইবেল অপেক্ষা শেক্‌সপীয়র **(Shakespeare)**, মিলটন, পোপ, টেনিসন অ্যাডিসন প্রভৃতি ইংরেজী সাহিত্যিকগণের রচনার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম এবং সভ্যতা ও সংস্কারের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছে। সাধারণভাবে মিশনারীরা হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে যে নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করিত, পূর্বে তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু পাদ্রীদের মধ্যেও অনেক সদাশয় মহানুভব লোক ছিলেন। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে কেরী ও মধ্যভাগে লং সাহেব

এবং বিংশশতকে অ্যাণ্ড্রুস্ ও আরও অনেকের নাম করা যাইতে পারে। ইঁহাদের জীবনী ও চরিত্র খ্রীষ্টধর্মকে মহিমান্বিত করিয়াছে।

৩। হিন্দুধর্ম

ক। ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

একদিকে খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ আর একদিকে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে যে সমুদয় তীব্র নিন্দাসূচক মন্তব্য ও সমালোচনা করেন—তাহার বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য, যাহাতে লোকে এই সকল নিন্দাবাদে বিভ্রান্ত হইয়া হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ এবং ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ না করে, তাহার জন্য নিন্দুকের সমালোচনার অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া হিন্দুধর্মের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া একদল লোক প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন যে, হিন্দুধর্ম ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান ধর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইহার মধ্যে দূষণীয় কিছুই নাই। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও যুক্তি ও উক্তি অতিশয় হেয় ও অসার। কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন শ্রোতাদিগকে বলিতেন যে দেখ, খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর প্রতিবাচক শব্দ God, উল্টা দিক হইতে পড়িলে হয় dog অর্থাৎ কুকুর; কিন্তু হিন্দুর দেবতা নন্দনন্দন ডাহিন বা বাম হইতে পড়—উভয়ই এক। ইহাদের অপেক্ষা কিছু উন্নত স্তরের প্রতিবাদকারীদের মধ্যে শশধর তর্কচূড়ামণির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি হিন্দুদের মূর্তি-পূজা, জাতিভেদ ও অন্যান্য যে সমুদয় ধর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠান ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানদের প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য, সে সমুদয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতেন। এই শ্রেণীর সমালোচকদের উদ্দেশ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন: "টিকিতে electricity নাই, if you think তা'হলে you are an awful goose।" অর্থাৎ তুমি যদি এ কথা না মান যে (ব্রাহ্মণের মাথার) টিকির মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাহলে তুমি একটি বোকচন্দ্র।

এইরূপ যুক্তিতর্ক বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও গোলদীঘিতে আমি ছাত্রাবস্থায় নিজে শুনিয়াছি—যথা "বেদে যে ত্রিতারং শব্দ আছে তাহার প্রকৃত অর্থ তিনটি তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎশক্তির তিন রূপের প্রকাশ—positive, negative, neutral"। যুক্তি হিসাবে এই সকল উক্তি মূল্যহীন

হইলেও সাধারণ লোকের মনে ইহার ফলে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা জন্মিত।

কিন্তু সে যুগের অনেক চিন্তাশীল ও পণ্ডিত ব্যক্তিরাও হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে প্রচলিত বহু নিন্দাবাদ অযৌক্তিক ও অজ্ঞানতা-প্রসূত বলিয়াই মনে করিতেন —এবং প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদি হইতে হিন্দুধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা ইহার নিরসন করিতে যত্নবান হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শিক্ষাবিদ্ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার সাহিত্য জগতে নূতন শ্রেণীর উপন্যাস এবং বাংলা ভাষায় এক অভিনব সুললিত রচনা রীতির প্রবর্তন করিয়া অমর কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন—এ বিষয় নবম পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তিনি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক প্রণালীতে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে তিনি 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থ ও ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা রচনা করিয়া হিন্দুধর্মের উপর নূতন আলোকপাত করেন। কিন্তু এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাঁহার 'কৃষ্ণ চরিত্র' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। হিন্দুগণের বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূর্ণ অবতার এবং তাঁহার জীবন কাহিনী ও ধর্মমত সাধারণ হিন্দুর ধর্ম, বিশ্বাস ও সংস্কারের এক বিরাট অংশ প্রভাবান্বিত করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের এবং বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রধান উপজীব্য। রাধা ও অন্যান্য গোপবধূর সহিত কৃষ্ণের 'কামকেলির' বহু আদিরসাশ্রিত কাহিনী খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারকগণের হস্তে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অমোঘ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমুদয় অপবাদ ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে অন্যান্য অলৌকিক কাহিনীর যে কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই—ইহা প্রমাণিত করিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণ চরিত্র' রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায় ও সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, সে যুগের পক্ষে তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। তাঁহার এই গ্রন্থলেখার উদ্দেশ্য তিনি নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন :

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।· ···কিন্তু ইঁহারা ভগবানকে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন;

ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি, অপুণ্য দূর হয়, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্র-সঙ্গত?……

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আমার যতদূর সাধ্য আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাসসকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বপাপসংস্পর্শ-শূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের এই উক্তি এবং একখানি বৃহদাকার গ্রন্থে যুক্তিতর্কদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে যে কতদূর সহায়ক হইয়াছিল তাহা আজ আমাদের পক্ষে ধারণা করা দুরূহ। শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান প্রভৃতির অপপ্রচারে ও কুৎসায় নিজেদের ধর্ম প্রকাশ্যে সমর্থন করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন—কারণ সাধারণ অশিক্ষিত লোকের ন্যায় যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র সংস্কার ও বিশ্বাসকে আঁকড়াইয়া ধরা, তাঁহাদের মার্জিত বুদ্ধিবৃত্তি অনুমোদন করিত না। সুতরাং যেরূপ যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর করিয়া হিন্দু বিদ্বেষিগণ হিন্দু ধর্মের কুৎসা ও নিন্দা করিত, সেইরূপ যুক্তিতর্কের সাহায্যেই এই সমুদয় অপবাদ নিরাকৃত করিয়া, হিন্দুর উপাস্য দেবতা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনপূর্বক বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদিগকে স্বীয় ধর্মের গৌরব প্রত্যক্ষ করাইয়া, স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সাহায্য করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও কেবলমাত্র কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া এ পর্যন্ত যাহা কিছু হিন্দু ধর্মের গ্লানি বলিয়া বিবেচিত ও প্রচারিত হইত, তাহা খণ্ডন করিবার জন্য প্রতিবাদ আরম্ভ হইল। বস্তুত একটু অনুধাবন করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, রামমোহন রায়ের ও বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মান্দোলনের মধ্যে প্রণালীর কোন বিশেষ প্রভেদ ছিল না। উভয়েই প্রচলিত ধর্ম, বিশ্বাস ও সংস্কারকে অন্ধভাবে

মানিয়া না লইয়া যুক্তিতর্কের সাহায্যে তাহার সত্যতা নিরূপণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু দুইজনের সিদ্ধান্ত ছিল একেবারে বিপরীত। রামমোহন একমাত্র বেদ বেদান্তকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং পরবর্তিকালে যে পৌরাণিক ধর্মের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা অসার বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিপন্ন করিলেন যে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বর্জনীয় নহে, তাহার মধ্যেও হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ আছে। দুজনেই বহু কুসংস্কার ও কদাচার বিসর্জন করিয়া বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম কি তাহার নিরূপণে যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কলুষতা বর্জিত সত্য হিন্দুধর্ম কি সে সম্বন্ধে তাঁহারা বিপরীত মত প্রচার করিলেন। পরবর্তিকালে যে হিন্দু সমাজ রামমোহনের পরিবর্তে বঙ্কিমচন্দ্রকেই অনুসরণ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করিলে ভুল হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তি অবিসংবাদিতরূপে রামমোহনের যুক্তি অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত ও গ্রহণীয়। প্রকৃত কারণ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ছিল হিন্দুর বিশ্বাস ও সংস্কারের অনুকূল এবং রামমোহনের সিদ্ধান্ত ছিল তাহার প্রতিকূল। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের মত গ্রহণ করিল এবং ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টধর্ম বাংলাদেশে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিল না। হিন্দুধর্ম জয়লাভ করিলেও এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধের অবান্তর ফল অর্থাৎ সংস্কার ও বিশ্বাসের উপর যুক্তি ও স্বাধীন চিন্তার প্রভাব—শিক্ষিত হিন্দুর মনে ও হৃদয়ে যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা হিন্দুর ধর্ম ও বিশ্বাসে ক্রমশই গুরুতর পরিবর্তন আনয়ন করিল। বিংশ শতাব্দীর হিন্দুধর্ম ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের হিন্দুধর্ম—এ উভয়ের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান সহজেই পরিলক্ষিত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচার ব্যতীত আরও কয়েকটি কারণে ইহা ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যে দুইটি প্রধান; প্রথমত, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের অভ্যুদয়। দ্বিতীয়ত, ভারতে থিওসফি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা।

এই দুইটি সম্প্রদায়ের আলোচনার পূর্বে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বর্তমান কালের বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মে কৃষ্ণ ও ভগবদ্গীতার স্থান বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেন। খ্রীষ্টান মিশনারীরা বলিত যে, এই নব-কৃষ্ণ আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালীরা কৃষ্ণকে খ্রীষ্টের এবং গীতাকে বাইবেলের আসন দিয়াছে। ১৯০২ সনে প্রেমানন্দ ভারতী নামে একজন বাঙ্গালী

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নানা স্থানে কৃষ্ণসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং লস এঞ্জেলসে (Los Angeles) একটি হিন্দু মন্দির স্থাপিত করেন।

খ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

পরবর্তীকালে যিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছিলেন, বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। ১৮৩৬ সনে হুগলী জিলার অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণগৃহে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁহার লেখাপড়ায় বিশেষ মন ছিল না—সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার পরে আর বেশীদূর অগ্রসর হন নাই। তাঁহার অগ্রজ রামকুমার এ বিষয়ে তাঁহাকে ভর্ৎসনা ও অনুযোগ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন: "চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি না; আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।" অগ্রজ রামকুমার ১৭ বৎসর বয়সের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কলিকাতায় আনিয়া নিজের টোলে শিক্ষা দিতেন এবং কয়েকটি বাটীতে দেবসেবা করিয়া কিছু আয়ের জন্য ঐ কার্যে নিযুক্ত করেন। ইহার কিছুকাল পরে কলিকাতার প্রসিদ্ধ জমিদার রাণী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন (১২৬২ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ; ১৮৫৫ সন ১১শে মে)। কথিত আছে যে; এই উপলক্ষে রাণী নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং ২,২৬,০০০ টাকায় একটি পরগণা কিনিয়া দেব-সেবার জন্য দান করিয়াছিলেন। রামকুমার এই মন্দিরের প্রথম পূজক নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পরে গদাধর ঐ কার্যে নিযুক্ত হন।

লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ না থাকিলেও বাল্যকাল হইতেই গদাধর সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। কামারপুকুর গ্রামের পাশ দিয়াই ৺পুরীধাম যাইবার পথ, সুতরাং বহু সাধু, ফকির, বৈরাগী প্রভৃতির সহিত তাঁহার মিশিবার সুযোগ হইত। গদাধর তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ ও তাঁহাদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিতেন। কথিত আছে যে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভাবাবেশ হইত। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, যে ছয়-সাত বছরের সময় একদিন মুড়ি খাইতে খাইতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের গায়ে এক ঝাঁক সাদা বক দেখিয়া "অপূর্বভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হলো যে, আর হুঁশ রইলো না। কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলাম

বলতে পারি না. লোকে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁশ হয়ে যাই।"[২৪]

আট বৎসর বয়সের সময় অনেক স্ত্রীলোকের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির দেখিতে যাওয়ার পথে গদাধর উক্ত দেবীর মহিমা কীর্তন "করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেল, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যাঙ্গাদি অবশ আড়ষ্ট হইয়া গেল, চক্ষে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল।" ব্যজন, মস্তকে জলসেক প্রভৃতি বহুরকমের চেষ্টায়ও যখন বালকের জ্ঞানসঞ্চার হইল না, তখন স্ত্রীলোকেরা আকুল হইয়া বিশালাক্ষী দেবীর আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং বালকের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল—কিন্তু শরীরে কোনরূপ অবসাদ বা দুর্বলতা দেখা গেল না।

দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরের পূজক নিযুক্ত হইবার পর গদাধরের হৃদয়ে অপূর্ব ভগবদ্‌-ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইল। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন :

"তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে যথারীতি পূজা সমাপনান্তে ৺দেবীকে নিত্য রামপ্রসাদ প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীত সমূহ শ্রবণ করান তিনি পূজার অঙ্গবিশেষ বলিয়া গণ্য করিতেন। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ঐ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন—রামপ্রসাদ প্রমুখ ভক্তেরা মা'র দর্শন পাইয়াছিলেন; জগজ্জননীর দর্শন তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, আমি কেন তবে তাঁহার দর্শন পাইব না? ব্যাকুল হৃদয়ে বলিতেন—'মা তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্, আমায় তবে কেন দেখা দিবি না? আমি ধন জন ভোগ সুখ কিছুই চাহিনা, আমায় দেখা দে।' ঐরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত।... দেবীর পূজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নির্দিষ্টকালও এই সময় হইতে তাঁহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল।... দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল ঠাকুরের মনে অনুরাগ, ব্যাকুলতাও, তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ..."[২৫]

"তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময় একদিন তিনি জগদম্বাকে গান শুনাইতেছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, 'মা, এত যে ডাকৃচি তার কিছুই কি তুই শুনচিস্ না? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েচিস, আমাকে কি দেখা দিবি না?'

"তিনি বলিতেন—মার দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ;······যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি এমন সময়ে সহসা মা'র অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম। তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন্‌দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই! অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব জমাট-বাধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মা'র সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।"[২৬]

ইহার পরেও তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী মূর্তির অবাধ অবিরাম দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেন। সময় সময় অসহ্য যন্ত্রণায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেন এবং তার পরেই দেখিতেন, "মার বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি।" তিনি বলিতেন, "দেখিতাম ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে।"

ইহার পর জগদম্বার ধ্যানে ঠাকুর এত বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, নিয়মিত পূজার কার্যও তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর হইল না। পূজা করিতে বসিয়া অদ্ভুত আচরণ করিতেন। জবাবিল্বের অর্ঘ্য প্রথমে নিজের মাথা, বুক এমন কি পায়ে পর্যন্ত ছোঁয়াইয়া পরে কালীমূর্তির চরণে দিতেন—পূজার আসন ত্যাগ করিয়া সিংহাসনের উপর উঠিয়া সস্নেহে দেবীমূর্তির চিবুক ধরিয়া আদর, গান, পরিহাস বা কথোপকথন করিতেন, অথবা শ্রীমূর্তির হাত ধরিয়া নৃত্য করিতেন। ভোগ নিবেদনের সময় অন্নব্যঞ্জনের কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট অংশ মার মুখে দিতেন।"

তাঁহার বাহ্যিক আচরণও মাঝে মাঝে অদ্ভুত বলিয়া মনে হইত। অবশেষে ইহা চরমে পৌছিল। একদিন রাণী রাসমণি মন্দিরে পূজা দিবার সময় ঠাকুর সঙ্গীত করিতেছিলেন, কিন্তু রাণী বিষয়-সংক্রান্ত একটি গুরুতর মামলার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কা হইয়া পড়িয়াছিলেন—পূজা বা সঙ্গীত কোনদিকেই তাঁহার মন ছিল না। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "এখানেও ঐ চিন্তা।" কর্মচারিগণ ভীত ও বিহ্বল হইয়া ভাবিল, ভট্টাচার্যের মন্দিরে পূজারীগিরি আজই শেষ হইল। রাণী ক্রুদ্ধা না হইয়া

নিজের ত্রুটির জন্য অনুতপ্তা হইলেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি বৃদ্ধি পাইল।[২৭] কিন্তু তাঁহার জামাতার সন্দেহ হইল যে ঠাকুরের মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত হইয়াছে। তিনি চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের নিকট পাঠাইলেন। কবিরাজ বলিলেন, "ইনি উন্মাদ বটে—তবে দিব্যোন্মাদ। এ রোগ আমাদের চিকিৎসার বাহিরে।" এই ঘটনার কাল ১৮৫৮ সন। ইহার পরে ঠাকুর দেবীপূজার কার্য ছাড়িয়া দিয়া পরবর্তী আট বৎসর কাল নানারকম সাধন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এক ভৈরবীর নিকট শিক্ষালাভ করিয়া প্রথম চারি বৎসর তন্ত্র-নির্দিষ্ট সাধন সকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পরবর্তী চারি বৎসরে তিনি জটাধারী নামে এক রামাইত সাধুর নিকট হইতে রাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট ও বাৎসল্যভাব সাধনে সিদ্ধ হন, বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত মধুরভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য ছয়মাসকাল স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকেন; আচার্য শ্রীতোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক বেদান্ত সাধনদ্বারা এক দিনে সমাধির নির্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করেন। বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল নির্বিকল্প সমাধি। ঠাকুরের এই সমাধি-অবস্থা দেখিয়া তোতাপুরী "স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—চল্লিশ বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা কি এই মহাপুরুষ সত্য সত্যই এক দিবসে আয়ত্ত করিলেন!"[২৮] অদ্বৈত ভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুর উপলব্ধি করিলেন যে, ইহাই ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধন-ভজনের চরম উদ্দেশ্য। উহারা প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। তিনি ভক্তগণকে বারংবার বলিতেন: "জানিবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ"। এইরূপ ধর্ম বিষয়ে উদারতার ফলে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত গোবিন্দ রায়ের নিকট যথা-বিধি ইসলাম ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ঐ সময়ে 'আল্লা' মন্ত্র জপ করিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নামাজ পড়িতাম এবং হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক দর্শন পর্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পরে ঐ মতের সাধনফল সম্যক হস্তগত হইয়াছিল।"[২৯] ইহা ছাড়াও তিনি বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সখ্যভাবের এবং কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণব মতের অবান্তর সম্প্রদায় সকলের সাধন-মার্গের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে শম্ভুচরণ মল্লিকের নিকট যীশু খ্রীষ্টের (ঈশার) জীবনী ও ধর্মমত শুনিয়া এবং মাতৃকোলে শিশু যীশুর মূর্তি দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তিন দিন পর্যন্ত তিনি এইভাবে এরূপ বিভোর ছিলেন যে মন্দিরেও যান নাই। তৃতীয় দিনের শেষে তিনি পঞ্চবটীতলে বেড়াইতে বেড়াইতে অনুভব করিলেন, সৌম্যমূর্তি এক দেব-মানব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরে লীন হইলেন। "ঐরূপে শ্রীশ্রীঈশার দর্শন লাভ করিয়া ঠাকুর তাঁহার অবতারত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন।" ৩০

শ্রীবুদ্ধদেবকে ঠাকুর ঈশ্বরের অবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ও পূজা করিতেন এবং বলিতেন, তৎপ্রবর্তিত মতে এবং বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই। জৈনধর্ম-প্রবর্তক তীর্থঙ্করদের এবং গুরু নানক হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু গোবিন্দ পর্যন্ত দশজন শিখ গুরুর অনেক কথা পরজীবনে জৈন ও শিখদের নিকট হইতে শুনিয়া ঐ দুই সম্প্রদায়ের প্রতি ঠাকুরের বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। অন্যান্য দেবদেবীর চিত্রের সঙ্গে তাঁহার ঘরে মহাবীর তীর্থঙ্করের একটি প্রস্তরমূর্তি এবং যীশু খ্রীষ্টের একখানি ছবি ছিল। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই সকল ছবি ও মূর্তির সম্মুখে ধুপ-ধুনা দিতেন।৩১

এইরূপে বিভিন্ন ধর্মমতের সাধনে সিদ্ধি ও বহু ধর্মমতের পরিচয় লাভ করিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল "সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত তত পথ মাত্র।" ৩২ তাঁহার ধর্মমতের ইহা একটি প্রধান ও শ্রেষ্ঠ উক্তি এবং বর্তমান যুগে এটি একটি মহান আদর্শ। তাঁহার একজন ভক্ত এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন:

"সকল প্রকার ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যুগাবতার ঠাকুরের উহা প্রচারপূর্বক পৃথিবীর ধর্মবিরোধ ও ধর্মগ্লানি নিবারণের জন্যই যে বর্তমানকালে আগমন, এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, কোন ঈশ্বরাবতারই ইতঃপূর্বে সাধনসহায়ে ঐ কথা নিজ জীবনে পূর্ণ উপলব্ধিপূর্বক জগৎকে ঐ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন নাই। আধ্যাত্মিক মতের উদারতা লইয়া অবতারসকলের স্থান নির্দেশ করিতে হইলে, ঐ বিষয় প্রচারের জন্য ঠাকুরকে নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চাসন প্রদান করিতে হয়।"৩৩

কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌" —যে ইহার বীজ স্বরূপ সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সমস্ত ধর্মমতের সত্যতা স্বীকার করিলেও বেদান্তের অদ্বৈতভাবই তাঁহার উপর সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অদ্বৈতভাব—অর্থাৎ সমস্ত জড় জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নতা এবং তাহার ফলে জীবজন্তু, উদ্ভিদ প্রভৃতি সকলের সহিত একাত্মভাব—ঠাকুরের কতদূর অন্তরের পদার্থ ছিল, বহু ঘটনায় তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দুইটি উল্লেখ করিতেছি :

(১) ঘাটে বসিয়া দেখিলেন, দুই নৌকার মাঝিদের মধ্যে কলহের ফলে সবল ব্যক্তি দুর্বলের পৃষ্ঠদেশে বিষম চপেটাঘাত করিল। ঠাকুর চীৎকার করিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় আসিয়া দেখিল, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।

(২) নবীন দূর্বাদলে ঢাকা উদ্যানের শোভা ঠাকুর তন্ময় হইয়া দেখিতে দেখিতে উহাকে নিজের অঙ্গ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি উহার উপর হাঁটিতে লাগিল। ঠাকুর বলেন, "বুকের উপর দিয়া কেহ চলিয়া গেলে যেরূপ যন্ত্রণার অনুভব হয়, ঐ কালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম।"[৩৪]

কিন্তু এই জ্ঞানমূলক বেদান্তের সহিত ভক্তি ও মূর্তিপূজার সমন্বয় ঠাকুরের জীবন ও ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই প্রসঙ্গে এমন একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি—যাহা গৃহীদিগের পক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপদেশ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য। স্বামী সারদানন্দ ইহার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাই সংক্ষিপ্ত আকারে উদ্ধৃত করিতেছি :

"১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে আমাদিগের জনৈক বন্ধু দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর গৃহমধ্যে ভক্তগণ-পরিবৃত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রও (ভবিষ্যৎ স্বামী বিবেকানন্দ) সেখানে উপস্থিত।" বৈষ্ণব ধর্মের প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেন যে এই মতের সারমর্ম "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন।" ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিলেন, "কৃষ্ণেরই জগৎ সংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজীবে দয়া—এই পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা।

কীটাণুকীট—তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া কর্বার তুই কে? না না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।...

নরেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া বলিলেন: "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম। শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্ত-জ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত করিয়া কি সহজ সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন? অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতি কোমলভাব সমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি।... কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়। মানব যাহা করিতেছে, সে সকলই করুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎরূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছে।... সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, অথবা দয়া করিবার তাহার অবসর কোথায়? ঐরূপে 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকে চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।...

শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবে সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্ত সাধক স্বল্পকালেই কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য।

কর্ম না করিয়া দেহী যখন এক দণ্ডও থাকিতে পারে না, তখন 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-রূপ কর্মানুষ্ঠানই যে কর্তব্য এবং উহা করিলেই তাহারা লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইবে, একথা বলিতে হইবে না। যাহা হউক ভগবান যদি কখন দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব,—পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"[৩৫]

ভগবান দিন দিয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ এই ভিত্তির উপরই শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় ভারতের সর্বত্র প্রসারিত রামকৃষ্ণ

মিশনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঠাকুরের উক্তি 'শিবজ্ঞানে জীব সেবা' এবং তাঁহার প্রবর্তিত এই উক্তিসূচক 'দরিদ্র-নারায়ণ' এই শব্দটি ভারতের নব্য হিন্দুধর্মের ইতিহাসে অমর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

অতি বাল্যকালেই ঠাকুরের বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পরে চতুর্দশ বৎসর বয়সের সময় শ্রীশ্রীমাতার প্রথম স্বামী সন্দর্শন হয়। তার পরে বহুকাল তাঁহারা কামারপুকুরে ও দক্ষিণেশ্বরে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় বাস করেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে মাতৃজ্ঞান করিতেন। ঠাকুর বলিতেন, "আমি স্ত্রীলোক মাত্রকেই মা বলে জ্ঞান করি, কারণ স্ত্রীলোক মাত্রেই ভগবতীর অংশ।" ঠাকুরকে বিবাহিত জানিয়া তোতাপুরী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: "তাহাতে আসে যায় কি? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে।" ঠাকুর আজীবন স্ত্রীর সাহচর্য করিয়াও এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠের জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে ইন্দ্রিয় জয়ের এরূপ পরিচয় ও পরীক্ষা আরও আছে। ভৈরবীর নিকট ঠাকুর যখন তন্ত্র সাধনায় দীক্ষিত হইতেছিলেন তখন তিনি একদিন এক পূর্ণযৌবনা সুন্দরী রমণীকে বিবস্ত্রা করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—ইহাকে দেবীবুদ্ধিতে পূজা কর। পূজা শেষ হইলে বলিলেন—ইহাকে সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে ইহার কোলে বস এবং তন্ময় চিত্তে জপ কর। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিয়াছেন: "আতঙ্কে ক্রন্দন করিয়া মাকে বলিলাম, 'মা, তোর শরণাগতকে এ কি আদেশ করিতেছিস? দুর্বল সন্তানের ঐরূপ দুঃসাহসের সামর্থ্য কোথায়?' ঐরূপ বলামাত্র দিব্যবলে হৃদয় পূর্ণ হইল··· এবং রমণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইবামাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম।"[৩৬]

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ঠাকুরের পদসেবা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?" ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, "যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই।" ঠাকুরের প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও ঠাকুরকে এইরূপ দেখিতেন। উভয়ের মধ্যে কোন 'কাম-গন্ধ' ছিল না।[৩৭]

অর্থের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্তি তাঁহার সাধনার আর একটি বিশেষত্ব। সাধনকালের প্রথমে তিনি 'টাকা মাটি—মাটি টাকা' বলিতে বলিতে মাটির সহিত কয়েকটি মুদ্রা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতেন। পরিণত বয়সেও অজ্ঞাতসারে মুদ্রার স্পর্শ হইলে তিনি অসুস্থবোধ করিতেন। একবার ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য কেহ তাঁহার বিছানার তলে টাকা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ঠাকুর শয়ন করিবামাত্র অসুস্থ বোধ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কামিনী ও কাঞ্চনের মোহ ত্যাগের এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

ঠাকুর কোনদিন ধর্মপ্রচার করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরেই নির্জনে বাস করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হওয়ায় বহুলোক তাঁহাকে 'দর্শন' করিতে আসিত। ঠাকুর কথোপকথনচ্ছলে তাঁহাদিগকে নানা উপদেশ দিতেন এবং তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সংক্ষিপ্ত দু চারিটি কথায় এবং ছোট ছোট গল্প ও দৃষ্টান্তের সাহায্যে তিনি যে অমূল্য ধর্ম উপদেশ দিতেন শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত (মাষ্টার মশায়) নামে তাঁহার এক ভক্ত প্রত্যহ তাহা লিখিয়া রাখিতেন এবং পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত নামে পাঁচ খণ্ডে পুস্তক-আকারে প্রকাশিত করেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানি ঠাকুরের আধ্যাত্মিক জীবন ও তাঁহার ধর্মমতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া যে সমুদয় যুগোচিত ধর্মানুষ্ঠানের ও ধর্মমতের পরিচয় পাওয়া যায় ঠাকুর নিজের জীবনে তাহা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। "আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়"—এই মহান উক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। ইহা স্মরণ করিয়াই প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত রোমা রোঁল্যা বলিয়াছেন যে এই মহাপুরুষ "ভারতবর্ষের তিনসহস্র বৎসরের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতীক স্বরূপ।" ঠাকুরের জীবিত কালেও সুরেশ চন্দ্র দত্ত ১৮৮৪ সনে তাঁহার অনেকগুলি উক্তি বা উপদেশ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার ধর্মমতকে নব্য হিন্দুধর্ম বলিয়া অভিহিত করা যায়—কারণ হিন্দুধর্ম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে ও উপদেশে যে রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে তাহাই বর্তমান যুগে বিশেষভাবে প্রচলিত। বেদান্ত ও উপনিষদের আত্মা, পরমাত্মা ও ভগবৎ-জ্ঞান লাভ, ভগবানে ঐকান্তিক ভক্তি ও আত্মসমর্পণ, সংসারবদ্ধজীবের কর্মশক্তি ভগবানের সৃষ্ট জীবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা, এবং এই

সমুদয়ের সাহায্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার জন্য চিত্তের সতত আগ্রহ ও ব্যাকুলতা—এই সমুদয় ভিত্তির উপরই ঠাকুরের ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা।

রামমোহন রায় বেদ-বেদান্ত উপনিষদ মানিতেন কিন্তু পরবর্তী পৌরাণিক যুগে হিন্দুধর্মের যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল তাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহার ধর্মমতের দুইটি দৃঢ় স্তম্ভ ছিল ; প্রথম, একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরে অবিচলিত নিষ্ঠা ; দ্বিতীয়, প্রতিমাদিরূপে তাঁহার ধারণা, পূজা উপাসনা প্রভৃতির সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান। এই দুইটি বিষয়েই ঠাকুর তাঁহার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা রামমোহনের মতের বিরুদ্ধে প্রচলিত হিন্দুধর্মের (অর্থাৎ সাকার ভগবানে বিশ্বাস ও তাঁহার প্রতিমা পূজার সার্থকতার) প্রতি সর্বসাধারণের, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। হিন্দুরা মনে মনে এইরূপ যুক্তি করিতেন যে ঠাকুর কালীমাতার পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—ইহা অপেক্ষা রামমোহনের উল্লিখিত দুইটি মতের বিরুদ্ধে বলবত্তর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? মূর্তিপূজা যে ধর্মের একটি পরীক্ষিত পদ্ধতি ও বেদান্তে বর্ণিত মোক্ষলাভের অন্যতম উপায়, ঠাকুরের জীবনী আলোচনা করিয়া কে তাহা অস্বীকার করিতে পারে? আর ঠাকুরের ন্যায় কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবী বিশ্বাস করিয়াও যদি আধ্যাত্মিকতার চরমে পৌঁছান যায় তবে সাকার ভগবানে বিশ্বাস সমূলে বর্জন করিবার প্রয়োজন কোথায়? এই প্রকার সহজ যুক্তির বলেই ঠাকুরের প্রভাবে খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় কর্তৃক বহুনিন্দিত পৌরাণিক ধর্মে হিন্দুর বিশ্বাস দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রচলিত ভাষায় যাহাকে উচ্চশিক্ষা বলে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাহার অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু এই অশিক্ষিত ও প্রায় নিরক্ষর ব্রাহ্মণ যে উচ্চ আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় দিতেন তাহাতে লোকে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইত। তিনি বক্তৃতা দিতেন না—কিন্তু সাধারণভাবে কথাবার্তার মধ্য দিয়া অতি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের সমাধান ও উচ্চ ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেন।[৩৮]

ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন : "রাত্রে আকাশে কত তারা দেখ, সূর্য উঠলে দেখতে পাওনা ব'লে কি ব'লবে দিনের বেলায় আকাশে তারা নেই? সেই রকম অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পাওনা বলে কি ব'লবে ঈশ্বর নাই?"

সাকার, নিরাকার ও প্রতিমা পূজা সম্বন্ধে ঠাকুরের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

"দেখ, ভগবান আসলে নিরাকার, কিন্তু ভক্তের আকুলতায় তাঁকে রূপ ধরতে হয়। যেমন মহাসমুদ্র—কেবল জল—কিন্তু তারই মাঝে মাঝে ঠাণ্ডায় হিমে জল জমে বরফ হ'য়ে গেছে। এও ঠিক তাই। ভগবান জলের মতই নিরাকার। কিন্তু ভক্তদের ভক্তিরূপ হিমে জ'মে তাঁকে মাঝে মাঝে আকার ধারণ করতে হয়।"

মাষ্টার প্রশ্ন করলেন :—

"ভগবান সাকার একথা ধ'রে নিলেও তিনি যে মাটির প্রতিমার ভেতরও আছেন, একথা কেমন ক'রে বিশ্বাস কর্ব ?"

ঠাকুর—"তুমি মাটির প্রতিমা কেন বলছ গো ? মায়ের চিন্ময়ী প্রতিমা।"

মাষ্টার—"তবে যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ওটা ঈশ্বর নয়। তারা ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে প্রতিমার পূজা করে মাত্র।"

ঠাকুর—"আচ্ছা ঈশ্বর সব জানেন আর এইটে জানেন না যে এইভাবে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে ?" "প্রতিমাদি সাকার মূর্তিতে ঈশ্বর ভাব থাকলে ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে। আর কাঠ, খড়, মাটি বোধ থাকলে কিছুই হয় না।" "যেমন সোলার আতা, মাটির হাতী দেখে আসল আতা ও হাতী মনে পড়ে, সেইরকম প্রতিমা দেখে ঈশ্বরকে মনে পড়ে।" কেশবচন্দ্রকে তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রতিমা দেখলে মাটি খড় তোমার মনে আসে কেন ? সচ্চিদানন্দময়ী মা মনে আসে না কেন ?" "আগে গোটা লেখা অভ্যাস হ'লে পরে ছোট হরফ সহজে লিখতে পারা যায়; সেইরূপ আগে সাকারে মন্ বসলে সহজেই নিরাকারকে ধরতে পারা যায়।"

আর এক সময় ঠাকুর বলেছিলেন :

"গাছের উপর একটা গিরগিটী দেখে একজন এসে বললে, সেটা লাল, আর একজন বললে সেটা সবুজ, তৃতীয় ব্যক্তি বললে হলদে। তিনজন ঝগড়া কর্তে কর্তে গাছতলায় একজন লোককে দেখে জিজ্ঞেস কর্ল। সে বলল ভাই তোমরা সবাই ঠিক দেখেছ। আমি সব সময় এই গাছতলায় থাকি, আমি জানি জানোয়ারটি বহুরূপী। সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলদে। ঈশ্বর হলেন বহুরূপী। যে ভক্ত তাঁর যে রূপ ভালবাসে

তাকে সেইরূপেই তিনি দেখা দেন। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, এব তাঁর আরো কত আকার আছে তা আমরা জানিনা।"

একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন: "যদি সকল ধর্মের ভিতরে এক ঈশ্বরের কথাই লেখা আছে তবে প্রত্যেক ধর্মে ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন দেখায় কেন?"

ঠাকুরের উত্তর: "ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁর ভাব বিভিন্ন। যেমন বাটীর কর্তা এক ব্যক্তি, কিন্তু তিনি কাহারও পিতা, কাহারও ভ্রাতা এবং কাহারও পতি। ভাব ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ব্যক্তি এক। ঈশ্বর সেই রকম। যেমন কুমোরের দোকানে হাঁড়ি, গামলা, জালা, প্রদীপ প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য থাকে, কিন্তু সকলকার ভিতরে সেই এক মাটি। ঈশ্বরও সেই রকম এক হইয়াও দেশ ভেদে ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছেন।" "ঈশ্বর এক কিন্তু ভাবে বহু। মাছ এক, কিন্তু ঝালে, ঝোলে, অম্বলে প্রভৃতি নানা রকমে যেমন তাকে আস্বাদ করা যায়, সেই রকম ভগবান এক হইলেও সাধকগণ তাঁকে বিভিন্ন রকমে উপভোগ করে থাকেন।"

"যেমন কালীঘাটে মায়ের বাড়ী যাবার অনেক পথ আছে, সেইরকম ভগবানের ঘরেও নানা পথ দিয়ে যেতে পারা যায়। প্রত্যেক ধর্মই এক এক পথ দেখাইয়া দিতেছে।"

একজন ব্রাহ্ম সাধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ব্রাহ্ম ধর্মে ও হিন্দুধর্মে প্রভেদ কি?" তিনি বলিলেন, "পোঁ বাজান ও সুর বার করা। ব্রাহ্মধর্ম এক ব্রহ্মের পোঁ ধরিয়া আছে, হিন্দুধর্ম তাহার উপর নানা রকম সুর তাল লয় বাহির করিতেছে।"

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর প্রাচীন হস্তী-ন্যায়ের কথাও বলতেন। চারজন অন্ধ হাতী দেখতে গিয়ে তার বিভিন্ন অঙ্গ—পা, শুঁড়, পেট ও কান হাত বুলিয়ে পরখ করল। ফলে তখন তাদের যথাক্রমে ধারণা হ'ল, হাতীটা স্তম্ভ, মুগুর, জালা ও কুলোর মত। যারা গোঁড়া তারা এই অন্ধের মত ভগবানের একটা দিক দেখেই ঠিক করে নেয় যে ভগবান এই রকম। আজ যে সাকার রূপের পূজা কর্চ্ছে, সেই আবার নিরাকার রূপের পূজা করবে। ছোট ছোট মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলা করে, কিন্তু যেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়, অমনি পুতুল খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এগুলো হ'ল ধাপ বা সিঁড়ি। ভগবানই এ ব্যবস্থা করেছেন। মা যেমন যে ছেলের পেটে যা সয় তাই ভেবে কারো জন্যে ডাল ভাত এবং কারো জন্যে বাও ব্যবস্থা করেন—অথবা যার যে রকম মাছ

সয় তাকে সেই রকম করে মাছ রেঁধে দেন—কাকেও ভাজা, কাকেও ঝোল, কাকেও ঝাল—ভগবানও সেইরূপ প্রত্যেক মানুষের উপযোগী সাধনার ব্যবস্থা করে থাকেন।

বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি :

"ভগবান তো আলাদা নন। তিনি এক, কেবলমাত্র নামের তফাৎ এই যা। তাঁকে কেউ বলছে আল্লা, কেউ হরি, কেউ God, কেউ কালী, কেউ ব্রহ্ম, আবার কেউ বা বলছে—যীশু, দুর্গা, ইত্যাদি। যেমন একটা পুকুরের তিন চারটা ঘাট আছে। একটায় হিন্দুরা জল খায়, তারা বলছে জল, একটাতে মুসলমানেরা খায়, তারা বলছে পানি, আর একটায় খ্রীষ্টানেরা খায় তারা বলছে Water। এ নিয়ে মানুষে মানুষে ঝগড়া কেন?"

ভগবানকে পাওয়া মানব জীবনের চরম ও পরম আদর্শ ও লক্ষ্য, এবং সকল ধর্মেরই সেইটিই মূল কথা। কিন্তু এর জন্যে যে সংসার ত্যাগ করে বনে পর্বতে সাধন ভজন করতেই হবে তা নয়। "অসতী স্ত্রীলোক বাপ মা ও সমস্ত পরিবারের ভিতর থেকে সংসারের কাজ কর্ম করে, কিন্তু তার মন থাকে সেই উপপতির প্রতি। হে সংসারী জীব! মন ঈশ্বরে রেখে, তুমিও বাপ মা ও পরিবারের কাজ করিও।"

"জাহাজের কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে থাকে, তাই জাহাজের দিক্‌-ভুল হয় না। মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তা হ'লে কোন ভয় থাকে না।"

"জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকায় যেন জল না থাকে। সাধক সংসারে থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধকের ভেতর যেন সংসার না থাকে।"

ঠাকুর বলিতেন, "ভগবানে মন দিতে গেলে সংসার ছাড়তে হবে কেন? সংসারও যে তাঁরই রাজত্বে। এই জগৎ সংসার সবই যে তাঁর, কোথায় ছেড়ে কোথায় যাবে?"

একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "যাঁরা সংসারে থাকেন তাঁদের ভগবান লাভের উপায় কি?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "তাদের উপায় সব সময় তাঁর নাম ও গুণগান করা, মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করা, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা, যেন তিনি তাঁদের বিশ্বাস ভক্তি দেন। বিশ্বাস হলেই হ'য়ে গেল, ওর ওপরে আর জিনিষ নেই।"

"বাপ-মা আপনার লোক, এদের সকলকে নিয়ে থাকবে, তাঁদের ভক্তি কর্বে, সেবা কর্বে, কিন্তু মন রাখবে ঈশ্বরে। যেমন বড়লোকের বাড়ীর ঝি মনিবের বাড়ীতে কাজ করে, ছেলে পুলে মানুষ করে, মুখে বলে আমার হরি, আমার যদু, কিন্তু মনে জানে এরা কেউ তার নয়—সব সময় মন প'ড়ে থাকে আপনার বাড়ীতে। সেই রকম তুমিও নিজের ছেলেদের যত্ন করো, কিন্তু মন রেখো ঈশ্বরের দিকে।"

"যদি কেউ ভগবানের ইচ্ছার ওপর সব ফেলে দিয়ে সংসার করে তাতে দোষ কি? সংসার ছাড়তে হবে না। সংসারই তোমাকে ছাড়ুক। সংসারে বান্ধা না পড়লেই হ'ল। লুকোচুরি খেলায় যে বুড়ি ছোঁয়, সে আর চোর হয় না। তেমনি ঈশ্বরস্বরূপ বুড়িকে ছুঁয়ে থাকলে, সে আর বান্ধা পড়ে না।"

মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঈশ্বরকে দেখা যায় কি না এবং কেমন হলে দেখা যায়।" ঠাকুর জবাব দিলেন: "হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখা যায়, খুব আকুল ভাবে তাঁকে ডাকলে, তাঁর নাম করে কাঁদলে তাঁর দেখা মেলে। লোকে ছেলের জন্যে, স্ত্রীর জন্যে, টাকার জন্যে ঘটি ঘটি কান্দে, কিন্তু ঈশ্বরের দেখা পেলাম না ব'লে ক'জন কান্দছে। ডাকার মত ডাকলে তিনি দেখা না দিয়ে পারেন না—অবশ্য দেখা দেন। সতীর স্বামীর প্রতি টান, বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, আর মায়ের ছেলের প্রতি টান মিলে যদি এক টান হয়, আর সেই টান যদি কেউ ঈশ্বরের উপর দেয়, তার ঈশ্বর লাভ হবেই হবে। মোট কথা ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। বেড়ালের ছানা যেমন মা ছাড়া কিছুই জানে না, মা যখন যেখানে তাকে রাখে সেইখানেই থাকে আর মিউ মিউ করে, তেমনি যদি কেউ তাঁর উপর পুরোপুরি ভরসা ক'রে ব'সে থাকে, তবে কি তিনি দেখা না দিয়ে পারেন?"

অন্যত্র ঠাকুর বলিয়াছেন: "ভগবানের নামে এমন জোর বিশ্বাস হওয়া চাই যে জোর করে বলতে পারা চাই, আমি তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ কোথায়?"

একজন ঠাকুরের সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধে তর্ক করিতেছিল। ঠাকুর বলিলেন "তর্ক করে যদি বুঝতে চাও কেশবের কাছে যাও। আর যদি সহজ করে এককথায় বুঝতে চাও ত আমার কাছে এস।" কেশবচন্দ্র সেনের সম্বন্ধে ঠাকুরের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি, এই উক্তিটি থেকে তা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়।

ঠাকুরের আর একটি কথাও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। "একটা খালি কলসীতে জল ভরতে যাও—ভক ভক শব্দ কর্বে। যেই সেটা ভরে গেছে আর শব্দ নেই। সেই রকম যে ভগবান পায়নি, সে বই থেকে নানা কথা আওড়ায়। কিন্তু যে ভগবানের দেখা পেয়েছে, সে চুপ ক'রে আনন্দ ভোগ করে।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক ভারতের দুইজন প্রসিদ্ধ ধর্মাচার্য ও নবধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। ঠাকুরের প্রায়ই ভাব সমাধি হইত—তাহা দেখিয়া কেশবচন্দ্র সেন বলিয়াছিলেন: "এই রকমের সমাধি দেখা যায় না। এ কেবল কয়েকজনের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। এই ভাবের সমাধি শ্রীচৈতন্যের হ'ত, যীশুখ্রীষ্টের হ'ত, মহম্মদের হ'ত।"

অতি সরল সহজ ভাষায় সুপরিচিত সাধারণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে ঠাকুরের উচ্চ দার্শনিক তথ্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন: "এ যে একেবারে যীশুখ্রীষ্টের মত কথা। সকলের বোঝার মত ক'রে সেই রকম গল্প করে বোঝান। যীশু পিতা পিতা ক'রে পাগল, আর ইনি মা মা ক'রে পাগল, এই যা তফাৎ।" শ্রীদয়ানন্দ সরস্বতীও এই রকম মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বিলাতে ম্যাক্স মূলার ও ফরাসি দেশে রোমাঁ রোলাঁও ঠাকুরের উচ্চস্তরের সাধনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন।

ভগবানের কথার সঙ্গে ঠাকুর অনেক সময় নীতির উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন: "সত্য একালের তপস্যা। যদি কেউ জীবনে সত্য কথা ব'লে যায় ও সেই মত কাজ ক'রে যায়, সে তা'তেই ভগবানকে লাভ করতে পারে।" ঠাকুর নিজের জীবনে কি অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত এই নীতি পালন করিতেন সে সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। একবার তিনি নিজেই নিজের কথা বলিয়াছিলেন: "যদি একবার বলতুম, অমুক জায়গায় যাব বা এই কাজ কর্ব বা এই জিনিষ খাব, তা হ'লে সেটা করা চাই। একবার রামের বাড়ী গিয়ে ব'লে ফেলেছিলুম, লুচি খাব না। যখন খেতে দিলে, ভারি ক্ষিধে পেয়েছে। কিন্তু লুচি খাব না বলেছি, কাজেই মিঠাই খেয়েই পেট ভরালুম।"

ঠাকুর সকলকেই মাতাপিতার প্রতি ভক্তির উপদেশ দিতেন। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন: "বাপ মা যদি কোন গুরুতর অপরাধ করেন,

কিংবা ভয়ানক পাপ কাজ করেন, তাহ'লেও কি তাঁদের মানতে হবে?" ঠাকুর উত্তর দিলেন: "তা হলেই বা—কথায় আছে, যদিও আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়, তবুও আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। মা-বাপ এরা কি কম? তারা রাগ করলে ধর্ম-টর্ম হয় না। মানুষের কতকগুলি ঋণ আছে, দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, মাতৃঋণ। মা বাপের ঋণ শোধ না কর্লে কিছুই হবে না জেনো। তবে ভগবানের নামে পাগল হ'লে কে কার? তখন বাপই বা কে আর মাই বা কে! সে তখন যা কিছু করার মত সবটুকুর বাইরে চ'লে যায়। তার আর ঋণ বলতে কিছু থাকে না।"

"কেবলমাত্র ভগবানকে পাবার জন্য মা-বাপের অবাধ্য হতে পারা যায়। যেমন প্রহ্লাদকে তার বাপ কৃষ্ণনাম নিতে বারণ করেছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ তা শোনে নি। ধ্রুবকে তার মা তপস্যা কর্তে নিষেধ করেছিল, কিন্তু ধ্রুব না শুনে বনে গিয়েছিল।"

জাতিভেদ সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: "জাতিভেদ একটা উপায়ে উঠে যেতে পারে। সেই উপায়টা হচ্ছে, ভক্তি। ভক্তের জাত নেই। চণ্ডালও যদি ভক্তিলাভ করে, সে আর চণ্ডাল থাকে না। আর একটি উপায় হচ্ছে, নিজেকে বোঝার জ্ঞান লাভ।" "কাশীতে শঙ্করাচার্য একবার গঙ্গাস্নান ক'রে উঠে আসছেন। এই সময় একজন চণ্ডালের গায়ে গা লেগে গেল। তিনি বল্লেন: 'তুই আমায় ছুঁয়ে দিলি?' চণ্ডাল বল্লে, 'ঠাকুর তুমি আমায় ছোঁও নি, আমিও তোমায় ছুঁই নি। তোমাতে আমাতে তফাৎ কি? তুমিও যা আমিও তাই।' যিনি শুদ্ধ আত্মা তিনি শরীর নন, পঞ্চভূত নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন।" তখন শঙ্করের জ্ঞান হইল।

ঠাকুর অবতারত্ব বিশ্বাস করিতেন। বলিতেন: "অবতার ঈশ্বরের কর্মচারী—যেমন জমিদার ও তাঁহার নায়েব। আপন অধিকারের যে প্রদেশে গোলমাল হয় জমিদার সেই প্রদেশেই তাঁর নায়েবকে প্রেরণ করেন; সেইরূপ জগতে যে কোন স্থানে ধর্মহানি হয় সেই স্থানেই অবতারকে আসতে হয়।" "সেই একই অবতার যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হ'লেন, ওখানে উঠে যীশু হলেন।"

ঠাকুরের ভক্তেরা তাঁকে অবতার মনে করিতেন। এই বিষয় আলোচনার জন্য দক্ষিণেশ্বরে অনেক পণ্ডিতেরা এক সভায় সমবেত হন এবং তাঁকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। ঠাকুর নাকি নিজেই বলিয়াছিলেন—পূর্ব

যুগে রাম ও কৃষ্ণের অবতার এ যুগে রামকৃষ্ণ হইয়া জন্মিয়াছিল। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন: "তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি 'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ"।[৩৯]

ঠাকুরের মৃত্যুর দুইদিন পূর্বে তাঁহার রোগশয্যার পাশে দাঁড়াইয়া নরেন্দ্রের মনে হইয়াছিল, "উনি তো অনেক সময় নিজেকে ভগবানের অবতার ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। এখন এই সময়ে যদি বলতে পারেন 'আমি ভগবান' তবেই বিশ্বাস করি।" ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "এখনও তোর জ্ঞান হোলো না? সত্যি সত্যি বলছি, যে রাম যে কৃষ্ণ—সে-ই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ—তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।"[৪০]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কোনদিনই কোন বিশেষ ধর্মমত প্রচার করেন নাই। তিনি দক্ষিণেশ্বরের নির্জন পরিস্থিতিতেই সাধন ভজন করিতেন এবং জনসাধারণও বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিত না। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য কেশবচন্দ্রের খ্যাতি শুনিয়া ঠাকুর বেলঘরিয়ায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে করিতে ঠাকুরের সমাধি হয়—তৎপর গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি তিনি এমন সরল ভাষায় সামান্য সামান্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যক্ত করেন যে শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়। ঠাকুর কেশবকে তাঁহার অনেক অনুচরবর্গের সাক্ষাতেই বলিয়াছিলেন: "তোমার ল্যাজ খসিয়াছে।" সকলের অপ্রস্তুত ভাব দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন: "দেখ ব্যাঙাচির যতদিন ল্যাজ থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে, স্থলে উঠিতে পারে না, কিন্তু ল্যাজ যখন খসিয়া পড়ে তখন জলেও থাকিতে পারে, ড্যাঙাতেও বিচরণ করিতে পারে—সেইরূপ মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে সংসার-জলেই কেবল থাকিতে পারে; ঐ ল্যাজ খসিয়া পড়িলে, সংসার এবং সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়েই ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে। কেশব, তোমার মন এখন ঐরূপ হইয়াছে, উহা সংসারেও থাকিতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেও যাইতে পারে।"[৪১]

কেশবচন্দ্র তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে অতঃপর তিনি মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। ঠাকুরও মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় কেশবচন্দ্রের বাটীতে গমন করিতেন। এইরূপে উভয়ে উভয়ের সাহচর্যে বহুদিন ধর্মের তথ্য আলোচনা করিয়াছেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের

অভিমত পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধেও ঠাকুর খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় কেশবচন্দ্র ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া অথবা ঠাকুরকে লইয়া যাইয়া ঈশ্বর প্রসঙ্গে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিতেন। "অনেকবার তিনি জাহাজে করিয়া কীর্তন করিতে করিতে সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিতে শুনিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতেন।" কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন "মনে হয়, যেন আমার একটা অঙ্গ (পক্ষাঘাতে) পড়িয়া গিয়াছে।"

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে কেশবচন্দ্র সেনের একজন ভক্ত শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবিতাবস্থায় (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে): তাঁহার সরল সংক্ষিপ্ত উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়া "পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি" এই নামে প্রকাশিত করেন। ১৯০৭ সনে ইহার পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে কেশবচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে জনসাধারণের নিকট তাঁহার অপূর্ব জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি ঐশ্বরিক সম্পদের কথা প্রচার করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকা —সুলভ সমাচার, Sunday Mirror, Theistic Quarterly Review— প্রভৃতি ঠাকুরের পূতচরিত্র, সারগর্ভ বাণী ও ধর্মবিষয়ক মতামতের আলোচনায় পূর্ণ থাকিত। বক্তৃতা এবং একত্র উপাসনার পরে বেদী হইতে ব্রাহ্মসঙ্ঘকে সম্বোধন পূর্বক উপদেশ প্রদান কালেও কেশবপ্রমুখ ব্রাহ্মনেতাগণ অনেক সময় ঠাকুরের বাণীসকল আবৃত্তি করিতেন।[৪২]

এই সমুদয়ের ফলে ক্রমশঃ কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু লোক ঠাকুরকে দর্শন করিতে ও তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত। ঠাকুরও কথোপকথন প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকে নানারূপে ধর্মোপদেশ দিতেন। এইগুলির একটি মনোরম বিবরণ শ্রীম (মহেন্দ্র গুপ্ত) রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' (পাঁচখণ্ডে সম্পূর্ণ) পাওয়া যায়। ইনি মাঝে মাঝে ঠাকুর দর্শনে যাইতেন এবং ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত ভক্ত ও দর্শকবৃন্দের সঙ্গে ঠাকুরের কথোপকথনের সারাংশ লিখিয়া রাখিতেন। এই দৈনিক বিবরণী অবলম্বন করিয়াই তিনি "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" লিখিয়া অমর হইয়াছেন। বস্তুতঃ ধর্মজগতে

কোন মহাপুরুষের উক্তি ও দৈনন্দিন জীবনের চিত্র কোন প্রত্যক্ষদর্শী এইরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর নাই। ঠাকুরের জীবনী সম্বন্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে ইহা এখনও খুব জনপ্রিয় এবং নানা ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। এই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ঠাকুরের ভক্তদলের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল এবং প্রতিদিনই দক্ষিণেশ্বরে ভক্তবৃন্দের সমাগত হইত।

আচার্য কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের একজন ভক্ত ছিলেন এবং ঠাকুরের প্রভাবে তাঁহার ধর্মমত এতদূর পরিবর্তিত হইয়াছিল যে তিনি সাকার ভগবানে বিশ্বাসপূর্বক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। "কীর্তন-কালে ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার উদ্দাম নৃত্য ও ঘন ঘন সমাধি দেখিয়া লোকে মোহিত হইত। আধ্যাত্মিক গভীরতা লাভের পরে তিনি অনেক ব্যক্তিকে মন্ত্রশিষ্য করিয়াছিলেন।"[৪৩]

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ন্যায় শিবনাথ শাস্ত্রীও ঠাকুরের নিকট আসিতেন এবং তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের উপর ঠাকুরের প্রভাবের পরিণাম ফল দেখিয়া তিনি আর ঠাকুরের নিকট যাইতেন না এবং অন্যান্য ব্রাহ্মকেও সম্ভবতঃ যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তৎকালীন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন সদস্য নরেন্দ্রনাথ দত্তকে—ভবিষ্যৎ স্বামী বিবেকানন্দ—বলিয়াছিলেন, "তিনি (শিবনাথ শাস্ত্রী) দক্ষিণেশ্বরে ঘন ঘন গমন করিলে তাঁহার দেখাদেখি ব্রাহ্মসংঘের অন্য সকলেও ঐরূপ করিবে এবং পরিণামে উক্ত দল ভাঙ্গিয়া যাইবে।" শিবনাথ শাস্ত্রী নরেন্দ্রনাথকেও দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর দর্শনে গমন হইতে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক ছিল না বিজয়কৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের জীবনীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিজয়কৃষ্ণের ন্যায় নরেন্দ্রনাথও ঠাকুরের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান ভক্ত ও শিষ্য হন—এবং গুরুর ধর্মমত দেশেবিদেশে প্রচার করিয়া নব্য হিন্দুধর্মকে ধর্মজগতে এক বিশিষ্ট উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। অতঃপর তাঁহার জীবনী আলোচনা করিব।

গ। স্বামী বিবেকানন্দ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যে সকল ভক্তবৃন্দ আসিতেন, তাঁহারা সকলেই ছিলেন সংসারী—অবসরমত ঠাকুরের উপদেশ শুনিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ঠাকুরের বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন ছিলেন। কথিত আছে যে ঠাকুর নাকি বহু পূর্বেই এই কয়জন ভক্তের আগমনের কথা জানিতেন। ১৮৮৫ সনের আরম্ভে পূর্ণ নামক জনৈক ভক্ত আসার পর তিনি বলিয়াছিলেন : "এখানে আসিবে বলিয়া যাহাদিগকে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই শ্রেণীর ভক্ত সকলের আসা সম্পূর্ণ হইল। অতঃপর ঐ শ্রেণীর আর কেহ এখানে আসিবে না।" "ঐ সকল ভক্তের আগমন মাত্র, অথবা আসিবার স্বল্পকাল পরে, ঠাকুর তাহাদের প্রত্যেককে একান্তে আহ্বানপূর্বক ধ্যান করিতে বসাইয়া তাহাদিগের বক্ষ, জিহ্বা, প্রভৃতি শরীরের কোন কোন স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ করিতেন। ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শ···ঈশ্বরের দর্শন লাভের জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিত। ফলে উহার প্রভাবে···কাহারও গভীর ধ্যান ও অভূতপূর্ব আনন্দ, কাহারও ঈশ্বর লাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা, কাহারও ভাবাবেশ ও সমাধি হইত।" ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে স্পর্শ করা ছাড়াও ঠাকুর মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিতেন।

এই সকল ভক্তদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে কলিকাতাবাসী একটি ইংরেজী শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশে জাত যুবক ঠাকুরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি কয়েকজন ভক্তকে নির্দেশ করিয়া বলিতেন, "ইহারা ঈশ্বরকোটী অথবা শ্রীভগবানের কার্যবিশেষ সাধন করিবার নিমিত্ত সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। ঐ কয়েক ব্যক্তির সহিত নরেন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি এক দিবস বলিয়াছিলেন—"নরেন্দ্র যেন সহস্রদল কমল ; এই কয়েকজনকে ঐ জাতীয় পুষ্প বলা যাইলেও, ইহাদের কেহ দশ, কেহ পনর, কেহ বা বড় জোর বিশ দল বিশিষ্ট।"[৪৪] ১৮৬৩ সনের ১২ই জানুআরি নরেন্দ্রনাথের জন্ম। ১৮৮১ সনের শেষভাগে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। একদিন ঠাকুরের ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ঠাকুরকে কলিকাতায় নিজ ভবনে আমন্ত্রণ করেন এবং প্রতিবেশী নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুরের নিকট ভজন গাহিবার জন্য আহ্বান করেন। নরেন্দ্রনাথ তখন এফ এ ক্লাসে পড়িতেন কিন্তু সঙ্গীত বিদ্যাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রের ভজন শুনিয়া ঠাকুর

তাঁহার প্রতি খুব আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন।[৪৫]

নরেন্দ্রনাথ যে এই সময়ে ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরক্ত ছিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই ঘটনার পরে নরেন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাব আসিল—বরপণ দশ হাজার টাকা। কিন্তু পিতার অনুরোধ সত্ত্বেও নরেন্দ্র ধর্মভাবের প্রেরণায় বিবাহ করিতে রাজী হইলেন না। তখন তাঁহার আত্মীয় ও ঠাকুরের পরমভক্ত রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন: "যদি ধর্মলাভ করিতেই তোমার যথার্থ বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি স্থলে না বেড়াইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট চল।" সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ঐরূপ নিমন্ত্রণ করাতে নরেন্দ্র তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে গান গাহিতে বলায় নরেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের "মন চল নিজ নিকেতনে, সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে" এই গানটি গাহিলেন। তাহার পরে যাহা ঘটিল নরেন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি: "গান ত গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর সহসা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া উত্তরের বারাণ্ডায় নিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিলেন। বারাণ্ডায় ঝাঁপ থাকায় বাহিরের লোককে দেখা যাইত না। সহসা আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'এতদিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই?'…ইত্যাদি কত কথা বলেন ও রোদন করেন। পরক্ষণেই করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ' ইত্যাদি; "আমি ত একেবারে নির্বাক—স্তম্ভিত। মনে মনে ভাবিলাম 'এত একেবারে উন্মাদ'…তারপরে গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ও তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া মনে হইল ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ত্যাগ জগতে বিরল—উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্র, মহাত্যাগী এবং এইজন্য মানব হৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী।"

ইহার পূর্বেই নরেন্দ্রনাথ ধর্মভাবের তীব্র প্রেরণায় অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনে ও কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান করিতেন। কিন্তু ক্রমেই তিনি ভগবানের দর্শন

লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। নরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন: "তুমি ধ্যানাভ্যাস করিলে যোগশাস্ত্রনির্দিষ্ট ফল সকল শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করিবে।"[৪৬] নরেন্দ্র তাঁহার উপদেশমত ধ্যান করিতে লাগিলেন কিন্তু যাহা খুঁজিতেছিলেন তাহা পাইলেন না—শান্তি মিলিল না। একদিন তিনি মহর্ষিকে প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয় আপনি কি স্বয়ং ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" মহর্ষি তদুত্তরে "ক্ষণকাল নরেন্দ্রের নেত্রমধ্যে দৃষ্টি সন্নিবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বৎস! তোমার চক্ষুদ্বয় ঠিক যোগীদিগের চক্ষের ন্যায়।"[৪৭] কিন্তু নরেন্দ্র এই উত্তরে বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথের সহিত ঠাকুরের দুইবার সাক্ষাতের কথা পূর্বে বলিয়াছি। তাহার পর আরও দুইবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের দর্শন পাইয়াছিলেন এবং পূর্ববৎ তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অদ্ভুত আচরণ ও অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া কখনও ভাবিতেন ইনি উন্মাদ, আবার কখনও ভাবিতেন, না, ইনি সত্যই মহাপুরুষ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে শেষোক্ত সাক্ষাতের পর তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন 'আপনি কি ঈশ্বর দেখিয়াছেন?' "পরমহংসদেব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, 'হাঁ গো, এই যেমন তোমায় দেখছি', এবং তোমাকেও ঈশ্বর দেখাইতে পারি"।[৪৮]

অতঃপর নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে ঠাকুরের প্রেম, ভক্তি, বৈরাগ্য ও অমৃতময় উপদেশের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, এবং অনেক অন্তঃসংগ্রাম ও তর্কবিরোধের পর অবশেষে তিনি পরমহংসদেবের সকল কথা সত্য বলিয়া মানিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইহা দুই একদিনে হয় নাই,—তিনি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল ধরিয়া প্রতিপদে ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন ও সম্পূর্ণ প্রমাণ সহায়ে নিজের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কখনও তাঁহার প্রতি সন্দেহ ত্যাগ করেন নাই। ইহার বিস্তারিত কাহিনী বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ইহা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক উন্নতি কোন পথে কি ভাবে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিত দিবার জন্য মাত্র দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

১৮৮৪ সনে নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয় এবং সংসারে খুব অভাব অনাটন দেখা দেয়। তখন নরেন্দ্রের বয়স কুড়ি বৎসর এবং নরেন্দ্রনাথ বি. এ.

পরীক্ষা দিয়াছেন। বি. এ. পরীক্ষায় পাশ হইবার পর তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও জীবিকার্জনের কোন সুবিধা করিতে পারিলেন না। অর্থাভাবে মাতা ও ভ্রাতাগণের দুর্দশা সহ্য করিতে না পারিয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "আপনি মা কালীকে বলিয়া কহিয়া আমাদের সাংসারিক দুঃখ নিবারণের একটা উপায় করিয়া দিন।" ঠাকুর তাঁহাকে স্বয়ং মার কাছে গিয়া প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন। "নরেন্দ্র প্রথমে সম্মত হইলেন না কিন্তু ঠাকুরের পুনঃ পুনঃ আদেশে ভবতারিণীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দেবীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি প্রার্থনা করিলেন, টাকা পয়সার কথা মনে রহিল না।" ফিরিবার পর যখন ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে মাকে বলিয়াছিস ত?" তখন নরেন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল, বলিলেন, 'না, সে কথা বলিতে ভুলিতে গিয়াছি'। ঠাকুর তাঁহাকে আরও দুইবার মায়ের মন্দিরে পাঠাইলেন, কিন্তু ফল একই হইল—প্রতি বারই ধনরত্নের পরিবর্তে বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তি প্রার্থনা করিলেন।[৪৯]

ঠাকুরের সহিত দীর্ঘকাল মিলনের সৌভাগ্য নরেন্দ্রনাথের অদৃষ্টে ছিল না। প্রথম সাক্ষাতের পর চারি বৎসর অতীত হইবার কিছু পরেই ঠাকুরের গলায় ক্যান্সার রোগ হয়, এবং চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কাশীপুরে এক বাগান বাড়ীতে আনা হয়। নরেন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত সর্বদা তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন। এই সময় তিনি একদিন এই কয়েকজন যুবক ভক্তকে গেরুয়া প্রদান করিয়া সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন।[৫০]

"দেহত্যাগের তিন চারি দিবস পূর্বে একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রকে কাছে ডাকিলেন ও সম্মুখে বসাইয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। স্বামীজি বলিতেন, তখন তাঁহার অনুভব হইতে লাগিল যেন ঠাকুরের শরীর হইতে তড়িৎ কম্পনের মত একটা সূক্ষ্ম তেজঃরশ্মি তাঁহার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমে তিনিও বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন।··· বাহ্য-চেতনা হইলে দেখিলেন, ঠাকুর অশ্রু ত্যাগ করিতেছেন। তিনি অতিশয় চমৎকৃত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর সস্নেহে বলিলেন, 'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকীর হলুম! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ করবি। কাজ শেষ হ'লে পর ফিরে যাবি।"[৫১]

ঠাকুরের মহাপ্রস্থানের দুই দিন পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফি'রে না গিয়ে এক স্থানে থেকে খুব সাধন-ভজনে মন দেয় তার ব্যবস্থা করবি।

১৮৮৬ সনের ১৬ আগষ্ট ঠাকুর মহাপ্রয়াণ করিলেন। তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণ আরও কয়েকদিন কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে ছিলেন। কয়েকজন অভিভাবকদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আসন্ন বি. এ. পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু কয়েকজন গৃহত্যাগ করিয়াই আসিয়াছিলেন। তাঁহারা একজন গৃহীভক্ত সাহায্য করায় বরাহনগরে একটি জীর্ণ শীর্ণ বাড়ী সস্তায় ভাড়া পাইয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। যাহারা গৃহে ফিরিয়াছিল তাহারাও পরীক্ষান্তে আসিয়া জুটিল। এইভাবেই ধীরে ধীরে বরাহনগরের মঠ গড়িয়া উঠিল। ১৮৮৬ সনে ডিসেম্বর মাসে সমবেত ভক্তগণ সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হইলেন এবং গৃহস্থ জীবনের নাম পরিবর্তন করিয়া নূতন নাম গ্রহণ করিলেন। সকল নামের শেষেই ছিল আনন্দ এই শব্দ। নরেন্দ্রনাথ প্রথমে বিবিদিষানন্দ, সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে বিবেকানন্দ নামেই তিনি পরিচিত ও প্রসিদ্ধিলাভ করেন। অতঃপর এই নামেই তাঁহাকে অভিহিত করিব। ১৮৮৬ হইতে ১৮৯২ সন পর্যন্ত মঠ বরাহনগরে, ও তারপর ১৮৯৭ পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের নিকটে আলমবাজারে ছিল। সেখান হইতে কিছুদিনের জন্য বরাহনগরের অপর পারে গঙ্গাতীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগানে উঠিয়া যায়। কিরূপে পরিশেষে স্থায়ীভাবে বেলুড়ে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা পরে বলা হইবে। বলা বাহুল্য সকল ভক্তগণই প্রথম হইতে নরেন্দ্রকে মঠের অধিনায়ক বলিয়া স্বেচ্ছায় ও সানন্দে স্বীকার করিয়া লইল।

বরাহনগরে মঠের কঠোর ও কষ্টকর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে বলিতেন: "বরাহনগরে এমন কতদিন গিয়াছে যে খাবার কিছুই নাই, ভাত জোটে ত নুন জোটে না। দিন কতক হয়ত শুধু নুন-ভাত চলুলো, কিন্তু কাহারও গ্রাহ্য নাই। কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও নুন-ভাত—এই মাসাবধি চলছে। আহা সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত, মানুষের কথা কি? কিন্তু এই

দুঃখ কষ্টের মধ্যেও জপ-ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা ভাসছি। সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবিরাম সংকীর্তন হইতেছে, কাহারও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তিবোধ বা বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা নাই। ব্যাকুল ঈশ্বর দর্শন লালসা দাবাগ্নির ন্যায় প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রজ্বলিত।"[৫২]

মঠ স্থাপিত হইলেও একস্থানে গৃহীর ন্যায় জীবনযাপন করা অনেক ভক্তেরই মনঃপূত হইল না। অনেকেরই মনে নির্জনবাসের ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। তীর্থভ্রমণ ও পরে নির্জনে বসিয়া একাকী ঈশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে অনেকে মঠ ছাড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন। স্বামী বিবেকানন্দও এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মাঝে মাঝে দুই একজনকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইতেন। কিন্তু আবার মঠে ফিরিয়া আসিতেন। ১৮৯১ সনের প্রথম ভাগে দিল্লী হইতে তিনি একাকী ভারত পর্যটনে বাহির হইলেন এবং সাধারণ সাধু-সন্ন্যাসীর ন্যায় পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া আলোয়ার, জয়পুর, খেতড়ি, গুজরাত, বম্বে, মহীশূর, মালাবার, মাদুরা, রামেশ্বর হইয়া কুমারিকা অন্তরীপে পৌঁছিলেন। পথে অনেক রাজা, মহারাজা, পণ্ডিত ও সাধুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছিল—তাহার বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার জীবনীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এখানে মাত্র কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

বিবেকানন্দের খ্যাতি শুনিয়া আলোয়ারের মহারাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি প্রথমেই বলিলেন ; স্বামীজি মহারাজ, শুনছি আপনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তা আপনিত সহজেই অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন। তাহা না করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন? স্বামীজি উত্তর করিলেন,—"মহারাজ আপনি রাজকার্য অবহেলা করিয়া দিন রাত্রি সাহেবদের সঙ্গে খানা খাইয়া শিকার করিয়া বেড়ান কেন?" মহারাজ বলিলেন "ঐরূপ করিতে ভাল লাগে।" স্বামীজি বলিলেন, "আমারও ফকিরী ক'রে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে।" কথা প্রসঙ্গে মহারাজা বলিলেন "আমি অন্যলোকের মত কাঠ, মাটি, পাথর, ধাতুর মূর্তি পূজা করিতে পারি না।" সম্মুখেই দেওয়ালে মহারাজের একখানি ছবি ছিল, তাহা নামাইয়া আনিয়া তিনি দেওয়ানজীকে বলিলেন "এই চিত্রের উপর নিষ্ঠীবন ত্যাগ কর"। দেওয়ানজী হতভম্ব হইয়া বলিলেন 'একি আদেশ করিতেছেন, ইহা আমাদের মহারাজের প্রতিকৃতি। ইহার প্রতি আমরা কিরূপে

অসম্মান প্রদর্শন করিতে পারি।' স্বামীজি তখন মহারাজার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, দেখুন—যদিও এই চিত্রটি আপনি নহেন, এক টুকরা কাগজমাত্র, তথাপি ইহারা উহাকে ঠিক আপনার মতই ভাবেন···। ভগবদ্ভক্তও প্রস্তর বা ধাতু নির্মিত দেবদেবী মূর্তিকে এইভাবে দেখেন—ঐ সকল দেখিলে চিন্ময় ইষ্টদেব পরমব্রহ্মকেই মনে পড়ে, তাই ভক্ত ঐ মূর্তির এত সম্মান করেন। কেহ বলে না "হে প্রস্তর, আমি তোমার উপাসনা করি। হে ধাতু, আমার প্রতি সদয় হও।" স্বামীজির কথা শেষ হইলে মহারাজা করযোড়ে নিবেদন করিলেন "প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, তাহার প্রতি বর্ণ সত্য। আমি এতদিন অন্ধ ছিলাম, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আজি আমার চক্ষু খুলিল।"[৫৩]

জয়পুরে খেতড়ির মহারাজের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ধর্মপ্রসঙ্গের পর মহারাজ একজন নর্তকীকে একটি গীত গাহিতে আদেশ করিলেন। সঙ্গীত ব্যবসায়ী স্ত্রীলোক—সম্ভবতঃ অসচ্চরিত্রা—এই আশঙ্কায় স্বামীজি স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মহারাজার বিশেষ অনুরোধে একটি গান শুনিতে রাজী হইলেন। রমণী ভক্ত সুরদাসের পদ গাহিতে লাগিল। হিন্দী গানটির প্রথম ছয় লাইনের ভাবার্থ এই :

প্রভু আমার অসৎ প্রবৃত্তি দেখিও না,
কারণ তোমার নাম সমদর্শী,
একখণ্ড লৌহ মন্দিরে মূর্তির মধ্যে থাকে,
আর এক খণ্ড থাকে ব্যাধের (কসাইয়ের) ঘরে,
কিন্তু পরশমণি যদি স্পর্শকরে ;
তবে দুইই স্বর্ণে পরিণত হয়।

স্থিরভাবে অপূর্ব তান লয় সহকারে মধুর কণ্ঠে গীত এই বৈষ্ণব পদাবলী শুনিয়া স্বামীজি ভাবিলেন "আজ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই সার সত্যটি গায়িকা সুপরিস্ফুটভাবে আমার মর্মবোধ করিয়া দিয়াছে। আমি সন্ন্যাসী আর এই স্ত্রীলোক পতিতা নারী, এ ভেদজ্ঞান তো আজিও যায় নাই। সর্বভূতে ব্রহ্মানুভূতি কি কঠিন।" গায়িকা রমণীকে বলিলেন, "মা, আমি অপরাধ করিয়াছি, আপনাকে ঘৃণা করিয়া উঠিয়া যাইতেছিলাম। আপনার গানে আমার চৈতন্য হইল।"[৫৪] এইরূপে ভ্রমণকালে স্বামীজি রাজা, মহারাজা, সাধু, পণ্ডিত প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন।

তিনি বহু দরিদ্র লোকেরও আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনেক অস্পৃশ্য নীচজাতির বাটিতে খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন।

আগ্রা হইতে পদব্রজে বৃন্দাবন যাইবার পথে দেখিলেন এক ব্যক্তি মহা আরামে ধূমপান করিতেছে। ক্ষুৎপিপাসাকাতর স্বামীজি তাহার নিকট হইতে কলিকাটি চাহিবামাত্র লোকটি নিতান্ত ত্রস্তভাবে বলিল 'মহারাজ, হাম ভঙ্গী (মেথর) হ্যায়।' স্বামীজি নিরাশচিত্তে অগ্রসর হইলেন—কিন্তু কিছু দূর গিয়াই তাঁহার মনে হইল, 'কি! সারাজীবন আত্মার অভেদ বিচার করিয়া শেষে জাতিভেদের পাকে পড়িলাম! ছি, ছি, এখনও সংস্কার!' পুনরায় সেইস্থানে ফিরিয়া গিয়া তিনি ঐ মেথরের কলিকায় তামাকু সেবন করিলেন।"[৫৫]

এই দেশভ্রমণের ফলে স্বামীজি খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেশের সকল শ্রেণীর লোকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইলেন। উৎপীড়িত, অসহায় ভারতবাসী জনসাধারণের দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতাজনিত কুসংস্কার এবং ধনীর ধর্মজ্ঞানহীনতা, বিলাস ব্যসন প্রভৃতি ছায়া চিত্রের মতন তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত হইল। তিনি দেখিলেন রাজা মহারাজা এবং উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পাশ্চাত্যের প্রভাবে নিজেদের অতীত সংস্কৃতি ও গৌরব বিস্মৃত হইয়াছে এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি উভয়ই বিসর্জন দিয়াছে। ইহার ফলে স্বামীজির জীবনের গতি পরিবর্তিত হইল।

ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে তিনটি সমুদ্রের সঙ্গমস্থল কুমারিকা অন্তরীপে পৌঁছিয়া স্বামীজি কন্যা কুমারীর পূজা করিলেন। তারপর সমুদ্রে নামিয়া অনতিদূরবর্তী এক প্রস্তরখণ্ডের উপর উত্তরাস্য হইয়া বসিলেন। কল্পনায় দেখিলেন সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত এবং ধ্যানযোগে তাঁহার চিত্তে ভারতের অতীত ও বর্তমানের চিত্র ভাসিয়া উঠিল। তিনি মানসনেত্রে ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করিয়া তাঁহার কর্তব্যপথ স্থির করিলেন। গুরুদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'খালিপেটে ধর্ম হয় না' তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল। তিনি লিখিয়াছেন: "ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরার উপর বসে ভাবতে লাগলাম, এই যে আমরা সন্ন্যাসীরা লোককে দর্শন শিক্ষা দিচ্ছি এসব পাগলামি—এই যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে তার কারণ মূর্খতা; আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছি আর দু'পা দিয়ে দলেছি।"[৫৬] তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন

আর নিজের মুক্তি বা নির্বিকল্প সমাধির চেষ্টা না করিয়া মূর্খ দরিদ্র ভারত-বাসীর শিক্ষা ও অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন।

১৮৯২ সনের শেষভাগে স্বামীজি কন্যা কুমারী হইতে মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদে গমন করেন। মাদ্রাজে তাঁহার বিপুল সম্বর্ধনা হয় ও এখানেই তিনি সর্বপ্রথম জনসমাজের নিকট বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্ব হইতেই ভারত ভ্রমণকালে পাশ্চাত্য দেশে যাইবার ইচ্ছা স্বামীজির মনে উদিত হইয়াছিল। কুমারিকা অন্তরীপে এই ইচ্ছা বর্ধিত হয় এবং আমেরিকায় বিশ্বের সকল ধর্মের প্রতিনিধিদের মহাসম্মেলনে যোগ দিবার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। সর্বপ্রথমে মহীশূরে তিনি বেদান্ত প্রচার উদ্দেশ্যেই পাশ্চাত্যে যাইবেন এইরূপ মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু মাদ্রাজের ভক্তদের নিকট তিনি বলেন যে ভারতের দরিদ্র অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দশা দূর করাই তাঁহার লক্ষ্য। কুমারিকায় তাঁহার যে ধারণা হইয়াছিল যে ক্ষুধার্ত লোকের নিকট ধর্মপ্রচার করার কোন অর্থ নাই—এবং দরিদ্রের অন্ন সংস্থানের জন্যই তিনি আমেরিকায় যাইতেছেন, পাশ্চাত্যে যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে তিনি তাঁহার দুই গুরুভাইকে এইরূপ বলিয়া-ছিলেন।"[৫৭] মহীশূরের মহারাজ ও হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁহার আমেরিকা যাত্রার খরচ বহন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। মাদ্রাজের ভক্তগণও এই উদ্দেশ্যে চাঁদা তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য খেতড়ির মহারাজাই তাঁহার যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত এবং সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন।

১৮৯৩ সনের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে ধর্মমহাসভার (Parliament of Religions) প্রথম অধিবেশন হয়। এই মহাসভায় স্বামীজি যে কয়েকটি বক্তৃতা করেন তাহা হইতে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত হয় এবং মহাসভায় উপস্থিত অন্য ধর্মাবলম্বী পাশ্চাত্য দেশীয় শ্রোতাদের মনে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম জাগরূক করে।

প্রথম দিবসের অধিবেশনে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণ স্বীয় স্বীয় ধর্ম সম্বন্ধে খুব সাধারণভাবে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতে আহূত হন। বিবেকানন্দ মামুলীভাবে শ্রোতৃগণকে 'ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ'—এইরূপ সম্বোধন না করিয়া "আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃমণ্ডলী" এই সম্বোধন করায় কয়েক

মিনিট পর্যন্ত তুমুল সাধুবাদ ও হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। তারপর স্বামীজি যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন তাহার সারমর্ম এই : ৫৮

"যে ধর্ম চিরদিন সকল ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করিতে শিখাইয়াছে আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি। আমরা যে অন্য ধর্মকে কেবল সমদৃষ্টিতে দেখি তাহা নহে, আমরা সকল ধর্মকেই সত্য বলিয়া মনে করি। যে ধর্মের অভিধানে 'বর্জন' বা পরিত্যাজ্য শব্দ (অর্থাৎ ইংরেজী exclusion-এর প্রতিশব্দ) নাই আমি সেই ধর্মভুক্ত। কোটি কোটি হিন্দু নরনারী যে স্তোত্রটি এখনও প্রতিদিন পাঠ করে তাহা এই : 'যেমন ভিন্ন ভিন্ন নদীর উৎপত্তি স্থান বিভিন্ন হইলেও সকলেই সমুদ্রে পতিত হয়, তেমনি হে প্রভো! ভিন্ন ভিন্ন রুচি হেতু সরল ও কুটিল প্রভৃতি নানা ধর্ম পথ অবলম্বন করিলেও সকল যাত্রীর তুমিই একমাত্র গম্য স্থান।'···

"আমাদের ধর্মগ্রন্থ গীতায় ভগবানের মুখে উক্ত হইয়াছে, 'যে যেরূপ ধর্মমত আশ্রয় করিয়া আসুক না কেন, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি—মনুষ্যগণ সকল পথ দিয়াই আমার নিকটই পৌঁছে।'

"সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা ও উহাদের ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা, এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরিয়া পীড়িত করিয়াছে ও বহুবার নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছে। কিন্তু আমি আশা করি যে আজ যে ঘণ্টাধ্বনি এই মহাসভার আহ্বান জানাইয়াছে তাহাই ঐ সমুদয়ের নিধনবার্তা ঘোষণা করিবে।"

এই বক্তৃতায় স্বামীজি তাঁহার গুরুর মহান উদার বাণী "যত মত তত পথ"—বিশ্বের সকল ধর্মের অনুগামীদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা স্বীয় ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে যত্নবান হইলে স্বামীজি গুরুর আর একটি উক্তি বা উপদেশমূলক আখ্যান উদ্ধৃত করিয়া ইহার উত্তর দেন।

"কোন একটি ক্ষুদ্র কূপে এক ভেক বাস করিত। দৈবক্রমে সমুদ্রতীরবাসী একটি ভেক আসিয়া সেই কূপে পতিত হইল। প্রথম ভেকটি যখন শুনিল যে দ্বিতীয়টি সমুদ্র হইতে আসিয়াছে—তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল— 'সমুদ্র? সে কত বড়? তাহা কি আমার কূপের মত বড়?" সে যত বলে যে ক্ষুদ্র কূপের সহিত সমুদ্রের তুলনাই হইতে পারে না—ততই কূপ মণ্ডূক তাহার প্রতিবাদ করিল এবং অবশেষে বলিল "আমার কূপের ন্যায় কিছুই

বড় হইতে পারে না, ইহা অপেক্ষা কিছুই বড় থাকিতে পারে না ; এটা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী, অতএব ইহাকে তাড়াইয়া দাও।"

এই আখ্যানটির উল্লেখ করিয়া স্বামীজি বলিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ এইরূপ সঙ্কীর্ণভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান আমরা সকলেই নিজের নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছি ও ইহাকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছি। আশা করি এই ধর্মমহাসভার ফলে এই ক্ষুদ্র জগতগুলির অবরোধ ভাঙ্গিয়া যাইবে।"

১৯শে সেপ্টেম্বর একটি লিখিত ভাষণে স্বামীজি হিন্দুধর্মের বিশেষত্বগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব যে সকল সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিতেন ইহা তাহারই ভাষ্য মাত্র। হিন্দুধর্মের ব্যাপকতা ও উদারতার পরিচয়স্বরূপ তিনি বলেন :

"আধুনিক বিজ্ঞানের নূতনতম আবিষ্ক্রিয়াসমূহ বেদান্তের প্রতিধ্বনিমাত্র। সেই সর্বোৎকৃষ্ট বেদান্তজ্ঞান হইতে সামান্য মূর্তিপূজা ও তদানুষঙ্গিক নানাবিধ পৌরাণিক গল্প পর্যন্ত, এমন কি, বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ এবং জৈনদের নিরীশ্বরবাদ—এই প্রত্যেকটিরই হিন্দুধর্মে স্থান আছে।" ইহার প্রয়োজনীয়তা ও অন্য ধর্মের সহিত এ বিষয়ে হিন্দুধর্মের প্রভেদ স্বামীজি নিম্নলিখিত যুক্তিদ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন :

"অন্যান্য ধর্ম কতকগুলি নির্দিষ্ট মতবাদ বিধিবদ্ধ করিয়া সমাজের সকলকে তাহাই বলপূর্বক মানিয়া লইতে বাধ্য করেন। সকলের সম্মুখে একমাপের একটিমাত্র জামা রাখিয়া জ্যাক, জন, হেনরী সকলকেই উহা পরিতে হুকুম করেন। যার গায়ে এ জামা লাগেনা সে বরং খালি গায়ে থাকিবে তবু অন্য রকম বা অন্য মাপের জামা পরিতে পারিবে না—অর্থাৎ খালি গায়ে থাকিবে তাহাও ভাল কিন্তু জামার বদল হইবে না। হিন্দুগণ বুঝিয়াছেন যে কেবল সাপেক্ষকে আশ্রয় করিয়াই নিরপেক্ষ তত্ত্বের ধারণা উপলব্ধি বা প্রকাশ সম্ভব। অতএব তাঁহাদের মতে হিন্দুদের দেববিগ্রহ, খ্রীষ্টানদের ক্রস (Cross) ও মুসলমানদের চন্দ্রকলা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় স্বরূপ। সকলের পক্ষে ইহা আবশ্যক না হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশ লোকেই যে ইহাতে পরম উপকার লাভ করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ···ভারতবর্ষে মূর্তিপূজা একটা ভয়ানক ব্যাপার নয়। ইহা কুকর্মের অনুষ্ঠানের প্রশ্রয় দেয় না ; বরং ইহা দুর্বল অধিকারীদিগকে ধর্মের

উচ্চভাব ধারণা করিতে সক্ষম করে।…হিন্দুর পক্ষে সমস্ত ধর্মজগৎটা নানা রুচিবিশিষ্ট নরনারীর নানা অবস্থার মধ্য দিয়া সেই একমাত্র ঈশ্বরোপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে।"

হিন্দুধর্মের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ও আপাতদৃষ্টিতে বিরোধীভাব সমুদয়ের সাধারণ ভিত্তিমূল কোথায়? কোন সাধারণ কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া ইহারা অবস্থান করিতেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজি জীব-দেহ এবং আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন: "আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি। যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমার সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করি—'আমি', 'আমি', 'আমি', তাহা হইলে আমার কি ভাবের উদয় হয়? এই দেহই আমি—এই ভাবই মনে আসে। বেদ বলিতেছে, 'না', আমি দেহমধ্যস্থ 'আত্মা'—আমি দেহ নহি। দেহ নষ্ট হইবে, কিন্তু আমি নষ্ট হইব না। আমি এই দেহের মধ্যে আছি—কিন্তু যখন এই দেহ পঞ্চত্ব লাভ করিবে তখনও আমি বিদ্যমান থাকিব, এবং এই দেহগ্রহণের পূর্বেও আমি ছিলাম। আত্মা কোন পদার্থ হইতে সৃষ্ট হন নাই।

"হিন্দু আপনাকে আত্মা বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই আত্মাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারেনা, জলে আর্দ্র করিতে পারে না ও বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। সেই আত্মা এমন একটি বৃত্তস্বরূপ, যাহার পরিধি নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু যাহার কেন্দ্র কোন একটি দেহমধ্যে অবস্থিত, এবং সেই কেন্দ্রের দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু। আর আত্মা জড় নিয়মের বশীভূত নহেন, ইনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব; অনাদি, অমর ও পূর্ণ। মনুষ্যের বর্তমান অবস্থা পূর্ব জন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের ফল; এবং ভবিষ্যৎ বর্তমান কর্মের ফলস্বরূপ।

"আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ, কেবলমাত্র পঞ্চভূতে বদ্ধ হইয়া আছেন। যখন তিনি এই বন্ধন হইতে মুক্ত হন, তখনই পূর্ববৎ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই অবস্থার নাম মুক্তি অর্থাৎ অপূর্ণতা, জন্ম-মৃত্যু-আধিব্যাধি প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি। ঈশ্বরের কৃপা হইলেই কেবল আত্মার এই বন্ধন মোচন হইতে পারে। আর পবিত্র স্বভাব লোকের উপরেই তাঁহার কৃপা হয়। যখন তাঁহার কৃপা হয়, তখন শুদ্ধ বা পবিত্র হৃদয়ে তিনি প্রকাশিত হন। নির্মল বিশুদ্ধ মানব ইহজীবনেই তাঁহার দর্শন লাভ করেন। 'আমি আত্মাকে দর্শন করিয়াছি, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়াছি' এই অনুভূতি

না হইলে কোন মনুষ্য পূর্ণ হইতে পারে না। অতএব ক্রমাগত অধ্যবসায় ও যত্নদ্বারা পূর্ণতা লাভ করা—দেবতা হওয়া, ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও তাঁহার দর্শন লাভ করাই হিন্দুদের সমুদয় সাধন-প্রণালীর লক্ষ্য। আর এইরূপে ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করিয়া, তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার ন্যায় পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম। পূর্ণ হইলে মনুষ্য নিত্য আনন্দ ভোগ করেন। যিনি সমুদয় লাভের অপেক্ষা পরম ও চরম লাভস্বরূপ, সেই পরমানন্দধাম ঈশ্বরকে পাইয়া পরমানন্দের অধিকারী হন।"

এইরূপে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত সার সত্য ব্যাখ্যা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিপন্ন করেন যে হিন্দুর অদ্বৈতবাদই ধর্ম-বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্ত। মূল শক্তি—অর্থাৎ যে শক্তি হইতে অন্যান্য শক্তি উদ্ভূত হইয়াছে—তাহার আবিষ্কার করাই বিজ্ঞানের চরম উন্নতি। অদ্বৈতবাদও পরিবর্তনশীল জগতের মূল কারণ—যিনি একমাত্র পরমাত্মা, অন্যান্য আত্মা যাহার প্রতিবিম্ব-স্বরূপ আবিষ্কার করিয়াছে। এইরূপে বহু ঈশ্বরবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতির ভিতর দিয়া অদ্বৈতবাদে উপনীত হইলে, ধর্মবিজ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না।

বেদান্ত ব্যাখ্যার পর হিন্দুদের যে সকল ধর্মমত ও বিশ্বাস প্রভৃতি কুসংস্কার বলিয়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা নিন্দা করে বিবেকানন্দ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে প্রতিমা পূজা—তথাকথিত পৌত্তলিকতা—প্রথমাবস্থায় প্রয়োজনীয়—পরে কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিলে ইহা ত্যাগ করাও চলে। সুতরাং ইহা ভ্রমাত্মক নহে। হিন্দুদের মতে, ক্ষুদ্র অজ্ঞানীদের ধর্ম হইতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত যাবতীয় ধর্মই অনাদি পরব্রহ্ম উপলব্ধির সাধন বা সোপানস্বরূপ, জন্ম ও অবস্থাভেদে যাঁহার পক্ষে যাহা উপযোগী, তিনি সেইটিকে আশ্রয় করিয়া অপরটিতে উত্থিত হইবেন। অর্থাৎ মানব ভ্রম হইতে সত্যে গমন করিতেছে না, কিন্তু নিম্নতর হইতে উচ্চতর সত্যে গমন করিতেছে।

হিন্দুদের অনেক কুসংস্কার আছে ইহাদিগকে দোষ বলিয়া স্বীকার করিয়াও তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—'মনে রাখা উচিত যে ইহার ফলে তাহারা নিজের দেহ পীড়ন করে কিন্তু অন্যধর্মাবলম্বীর শিরশ্ছেদ করে না। হিন্দু নরনারী অগ্নিকুণ্ডে স্বীয় দেহপাত করে, কিন্তু বিধর্মীদের অথবা ডাকিনী বলিয়া শত শত স্ত্রীলোককে পোড়াইয়া মারিবার জন্য আগুন জ্বালায় না।

শিকাগোর ধর্ম মহাসভার প্রধান উদ্দেশ্য ও আদর্শ—ধর্মসমন্বয়ের সাধারণ ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে ইহার শেষ অধিবেশনে তিনি বলেন: "যদি এখানে কেহ এরূপ আশা করেন যে, উক্ত সমন্বয় বিভিন্ন ধর্ম সমূহের মধ্যে একটির অভ্যুদয় ও অপরগুলির বিনাশ দ্বারা সাধিত হইবে, তবে তাহাকে আমি বলি, ভ্রাত: 'তোমার আশা ফলবতী হওয়া অসম্ভব'। আমি ইচ্ছা করি না যে খ্রীষ্টান হিন্দু হউন অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধ খ্রীষ্টান হউন। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মগুলির সারভাগগুলিকে ভিতরে গ্রহণ ও তদ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া আপনার বিশেষত্ব রক্ষাপূর্বক নিজের প্রকৃতি অনুসারে পরিবর্ধিত হইবে।...পবিত্রতা, উদারতা, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ কোন ধর্মেরই নিজস্ব নহে এবং প্রত্যেক ধর্মেই উন্নতচরিত্র নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে। শীঘ্রই দেখিবেন...সকল ধর্মের পতাকা শীর্ষে লিখিত হইবে, 'সমর নহে—সহায়তা!' 'বিনাশ নহে—বরণ! দ্বন্দ্ব নহে—মিলন ও শান্তি।'

শিকাগো ধর্ম মহাসভায় স্বামীজির বক্তৃতাগুলি চারি সহস্র শ্রোতৃবর্গের হৃদয় জয় করিয়া তাহাদের মনে এক অপূর্ব গভীর ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল। বিভিন্ন সংবাদপত্রে উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁহার প্রশংসা হইত। একটি কাগজ (New York Herald) লিখিল, "ধর্ম মহাসভায় ইনিই নিঃসন্দেহে সর্বপ্রধান ব্যক্তি। ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে সুশিক্ষিত ভারতবাসীর নিকট খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারী পাঠান কতদূর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।" বোষ্টনের কাগজে লিখিল, "তাঁহার পাণ্ডিত্য এত বেশি যে আমাদের দেশের খুব কম পণ্ডিতই তাঁহার সহিত তুলনায় দাঁড়াইবার যোগ্য।" আরও কয়েকটি কাগজের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি: "সভায় বহু খ্রীষ্টান বিশপ এবং প্রায় সকল সম্প্রদায়ের ধর্মোপদেষ্টাগণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তৎপ্রভাবে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন।" "ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁহার প্রশংসা-ধ্বনিতে মহাসভায় সর্বাপেক্ষা অধিক কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয়ে যাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সভামধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।" "ধর্মসভার অধ্যক্ষেরা লোককে আকৃষ্ট করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দকে রাখিয়া দিতেন। শত শত শ্রোতা চলিয়া যাইতেছে দেখিলে সভাপতি অমনি উঠিয়া বলিতেন সভার কার্য শেষ হইবার অব্যবহিত পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিবেন। আর কথা

নাই, অমনি সেই শত শত ব্যক্তি দাঁড়াইয়া পড়িতেন। এইরূপে কলম্বস হলের চারি সহস্র শ্রোতা শেষকালে বিবেকানন্দের পনর মিনিট বক্তৃতা শুনিবার জন্য সহাস্য বদনে দুই ঘণ্টা হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিত।"

ধর্ম মহাসভার জেনারেল কমিটির সভাপতিও বলিয়াছেন: "স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রোতৃবর্গের উপর আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।" মাননীয় মিঃ মারউইন-মেরী স্নেল (Horible Mr. Merwin-Marie Snell) লিখিয়াছেন: "আর কোন ধর্মই ধর্ম মহাসভায় হিন্দুধর্মের ন্যায় প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে নাই এবং এই ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। মহাসভায় ইঁহার প্রভাব ও আদর যে সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে সে বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।...খ্রীষ্টান অখ্রীষ্টান সকলবক্তা অপেক্ষা লোকে তাঁহাকেই অধিকতর উৎসাহ সহকারে সম্বর্ধনা করিত। তিনি যেদিকে যাইতেন সেই দিকেই লোকের ভীড় হইত এবং তাঁহার মুখের প্রত্যেক কথাটি শুনিবার জন্য লোক উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত।" ৫৯ এইরূপে শিকাগো ধর্ম মহাসভা অনুষ্ঠানের ফলে বিবেকানন্দ বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে অপরিচিত, অবহেলিত হিন্দু ধর্ম গৌরবের শীর্ষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল। ভারতের নব জাতীয় জাগরণের উপরে ইহার প্রভাব অন্যত্র আলোচিত হইবে।

কিন্তু বিবেকানন্দ যে হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা উনবিংশ শতাব্দীতে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম হইতে অনেক পৃথক। মোটের উপর একথা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না যে উনবিংশ শতাব্দীতে এক দিকে ব্রাহ্মধর্ম ও অপরদিকে গোঁড়া হিন্দুধর্মের মধ্যে যে বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তাহার সমন্বয় সাধন করেন। তাঁহারা হিন্দুধর্মকে যে রূপ দিয়া গিয়াছেন বর্তমান যুগে তাহাই হিন্দুধর্মের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করিবার পক্ষপাতী ছিল এবং যাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার উজ্জল আলোকে অন্ধ হইয়া প্রাচীন হিন্দুধর্মকে একেবারে অসার বলিয়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল—স্বামীজি এই উভয়কেই ভ্রান্ত বলিয়াছেন। তিনি পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা হিন্দুদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ এই শিক্ষার অভাবই হিন্দুদের পতনের একটি প্রধান কারণ—আর্থিক, শারীরিক ও

মানসিক শক্তি না থাকিলে কেবল আধ্যাত্মিক শক্তি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। অন্য দিকে তিনি জোরের সহিত বলিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম এখন অন্তঃসারশূন্য হইয়া কতকগুলি কুসংস্কার ও লোকাচারে পরিণত হইয়াছে—সুতরাং ঐগুলি দূরীভূত করিতে হইবে। তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন: "ঘণ্টা ডাইনে বাজবে না বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়,—পিদ্দীম দুবার ঘুরবে বা চার বার,—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিনরাত ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা। যদি ভাল চাওত ঘণ্টা ফণ্টা গুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে...এর নাম কর্ম—ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম কর্ম নয় ওর নাম পাগলা গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুর ঘরের দরজা খুলচে আর পড়ছে! এই ঠাকুর কাপড় ছাড়চেন, ত এই ঠাকুর ভাত খাচ্চেন, ত এই ঠাকুর আঠ কুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ড করছেন—এ দিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্নবিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্ছে—মানুষ গুলো মরে যাক্।"[৬০]

"পুঁথি পড়ে বি—অবগত হয়েছেন যে এ দুনিয়াতে যত লোক আছে তারা সকলে অপবিত্র এবং তাদের প্রকৃতিতে আসল ধর্ম হবার যোটি নেই, কেবল ভারতবর্ষের এক মুষ্টি ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন তাঁদেরই ধর্ম হতে পারবে।...ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নাই—ভোগ সাঙ্গ হইলেই স্নান, কেন না ব্রাহ্মণেতর অপবিত্র জাতি—অন্য সময় তাদের স্পর্শ করাও নাই। সাধু-সন্ন্যাসী, আর ব্রাহ্মণ বদ্মাস দেশটা উৎসন্ন দিয়েছে। দেহি দেহি চুরি বদমাসি—এরা আবার ধর্মের প্রচারক! পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে, আবার বলে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা—আর কায তো ভারি—'আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তা'হলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?' 'চৌদ্দবার হাতে মাটি না করিলে চৌদ্দ পুরুষ নরকে যায় কি চব্বিশ পুরুষ?'—এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন আজ দুই হাজার বৎসর ধরে। এ দিকে সিকি ভাগ লোক না খেতে পেয়ে মরছে। আট বৎসরের মেয়ের সঙ্গে তিরিশ বৎসরের পুরুষের বিয়ে দিয়ে মেয়ের মা আহ্লাদে আটখানা। ছয় বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন্ দেশী ধর্ম?"[৬১]

"হিন্দুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাড়িতে। (এখনকার) হিন্দুর ধর্ম বিচার-মার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুৎমার্গ,—আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা, বস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। "আত্মবৎ সর্বভূতেষু" কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে না কি? যারা এক টুকরা রুটী গরীবের মুখে দিতে পারে না তারা আবার মুক্তি কি দিবে! যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করিবে? ছুঁৎমার্গ একপ্রকার মানসিক ব্যাধি, সাবধান। সর্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম সেখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ, অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি।…সকল অবতারের মধ্যে চৈতন্য প্রভু বড়, কিন্তু তাঁহাতে (প্রেমের সমান) জ্ঞানের অভাব ছিল—রামকৃষ্ণ অবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম, অনন্ত জীবে দয়া।…

"সমগ্র হিন্দু জাতি সহস্র সহস্র যুগ ধরিয়া যে চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি এক জীবনেই সেই সমুদয় ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সকল জাতির শাস্ত্র সমূহের জীবন্ত টীকা স্বরূপ।"[৩২]

স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত হিন্দুধর্মের ভিত্তি কি, ১৮৯৭ সনে লিখিত তাঁহার একখানি ইংরাজী পত্রের নিম্নলিখিত অংশ হইতে তাহা বোঝা যাইবে।

"তুমি বেদ সম্বন্ধে যে আপত্তিগুলি প্রদর্শন করিয়াছ, সেগুলি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যাইত, যদি 'বেদ' শব্দ কেবল সংহিতা বুঝাইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের সর্ববাদিসম্মত মতানুসারে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ এই তিনটির সমষ্টিই বেদ। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি কর্মকাণ্ড বলিয়া এখন একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল উপনিষদকেই আমাদের সকল দার্শনিক ও বিভিন্ন মতের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল সংহিতা অংশটিই বেদ, এ মত অতি আধুনিক এবং স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দই এই মতের প্রথম প্রবর্তক। প্রাচীন হিন্দু সমাজের ভিতর এই মতের প্রভাব কিছুমাত্র বিস্তৃত হয় নাই।…গীতা নিঃসন্দেহই এতদিনে হিন্দুধর্মের বাইবেল স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[৩৩]

গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের যে রূপ দেশের

সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, উল্লিখিত উক্তিগুলি হইতে তাহার সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে ইহাই বর্তমান যুগে হিন্দু ধর্মের স্বরূপ বলিয়া ভারতের শিক্ষিত সমাজে গৃহীত হইয়াছে—এবং সম্ভবতঃ ইহার আদর্শেই হিন্দুধর্ম ভবিষ্যতে নূতন আকার ধারণ করিবে। সমাজ ও ধর্মের দিক দিয়া দেখিলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ বাংলা দেশে যে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছেন এবং কালে ইহার প্রভাব যে সুদূরস্পর্শী হইবে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। এই জন্যই ইঁহাদের কাহিনী বিস্তৃত ভাবে লিখিত হইয়াছে।

আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশে ঘুরিয়া ১৮৯৭ সনের ১৫ জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দ কলম্বোতে উপনীত হইলেন, এবং দক্ষিণ ভারতের রামনদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি নানা স্থানে কিছুদিন কাটাইয়া ২০ ফেব্রুআরি কলিকাতা পৌঁছেন। সকল স্থানেই স্বামীজির অভ্যর্থনার যে বিপুল আয়োজন হইয়াছিল তাহার তুলনা নাই। রামনদের রাজা নিজে অন্যান্য লোক সহ স্বামীজির গাড়ী টানিয়া নিয়াছিলেন। কলিকাতায়ও এই দৃশ্যের পুনরভিনয় হইয়াছিল। ইহার পর স্বামীজি উত্তর ভারতেও বহু স্থান ভ্রমণ করেন—এবং সকল জায়গায়ই স্বামীজি স্বাগত সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর ও কোন কোন স্থানে সাধারণ ভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহার অনেকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে।[৬৪] কলম্বো হইতে হিমালয় পর্যন্ত এই অভিযানের ফলে ভারতে হিন্দুধর্মের নূতন কলেবরে নবজন্ম লাভ হইয়াছিল।

এই সমুদয় অভ্যর্থনা ও নানা শ্রেণীর দর্শকের সাক্ষাৎকারে ব্যস্ত থাকিলেও স্বামীজি পুরাতন মঠের কথা বিস্মৃত হন নাই। ১৮৯২ সনে মঠটি বরাহনগর হইতে আলমবাজারে উঠিয়া গিয়াছিল—এবং স্বামীজি সারাদিন নানা কার্যে ব্যস্ত থাকিলেও প্রতি রাত্রে মঠে যাইয়া গুরুভাইদের সঙ্গে ভবিষ্যতের কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তিনি যে নূতন কর্মপদ্ধতির আদর্শ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন—তাহার মূল লক্ষ্য 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা' এই মহামন্ত্রকে কার্যে রূপায়িত করা। ঠাকুরের ভক্তেরা যাহাতে জনসাধারণের শিক্ষা বিস্তার, দারিদ্র্য ও ব্যাধির হাত হইতে পরিত্রাণ, এবং সামাজিক বৈষম্য ও কলুষতার দূরীকরণ দ্বারা তাহাদের সর্ববিধ নৈতিক, শারীরিক, ও মানসিক উন্নতি বিধানে আত্মোৎসর্গ করেন, ইহাই ছিল স্বামীজির মূল কথা—অর্থাৎ যাহাতে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী-সংঘ ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে

সঙ্গে জাতীয় জাগরণ ও সামাজিক সংস্কারকেও ইহার এক প্রধান অঙ্গ স্বরূপ মনে করিয়া এক নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হন তাহার ব্যবস্থা করা। একদল ভক্ত প্রথমে ইহা অনুমোদন করেন নাই। তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের সাধন ভজন দ্বারা মুক্তি লাভ করাই সন্ন্যাস-গ্রহণের উদ্দেশ্য—কোন কারণেই সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া কর্তব্য নহে—ইহাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ। কিন্তু বহু তর্ক বিতর্কের পর স্বামীজির মতই গৃহীত হইল।[৬৫]

এই মহান আদর্শ কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৯৭ সনের মে মাসে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশে ও বিদেশে বেদান্ত ধর্ম প্রচার, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপন, এবং ভারতীয় জনসাধারণের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নানাস্থানে মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া একদল সন্ন্যাসী ও গৃহীকে শিক্ষাদান, এই সমুদয় মিশনের কার্যসূচী বলিয়া নিরূপিত হইল।

অতঃপর আলমবাজার হইতে বেলুড়ে মঠটি স্থানান্তরিত হইল এবং ১৮৯৮ সনের ৯ ডিসেম্বর যথারীতি শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী বর্তমান বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন হইল। মঠের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও কার্যসূচী নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য অনেক নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করা হইল। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি নিয়ম বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

১। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথে প্রত্যেকে যাহাতে নিজের মুক্তি ও জগতের সর্বপ্রকার কল্যাণসাধন করিতে সক্ষম হন তাহাই এই মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকদিগের জন্য এইরূপ পৃথক মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২। উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গুরুতর ব্যবধানই ভারতের সর্ববিধ দুর্দশার মূল কারণ। এই ব্যবধান দূর না হইলে দেশের মঙ্গল নাই। অতএব জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, ও ধর্মবিস্তারের জন্য সর্বত্র প্রচারক পাঠাইতে হইবে।

ইহাও স্থির হইল যে বেলুড় মঠই রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান মঠ অর্থাৎ কেন্দ্র হইবে এবং রামকৃষ্ণসম্প্রদায়ের সকল সন্ন্যাসীকেই ইহার নিয়ম প্রণালী অনুসারে চলিতে হইবে। প্রথমে রামকৃষ্ণ মিশনকে মঠের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু শিক্ষা, আর্তত্রাণ প্রভৃতি দেশহিতকর কার্যের প্রসার হওয়ায় ১৯০৯ সনে রামকৃষ্ণ মিশন পুনরুজ্জীবিত হইল অর্থাৎ বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের

অধীন হইলেও ইহা একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পাইল—এবং সন্ন্যাসী ব্যতীত গৃহী ভক্তরাও ইহার সদস্যপদের অধিকারী হইল।**

বর্তমানে ভারতের সর্বত্র রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সংখ্যা ৮৩। ভারতের বাহিরেও অনেক মিশন আছে। ইহাদের সংখ্যা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১১। সমগ্র পৃথিবীতে ৪১টি মঠ, ৫০টি মিশন ও ২১টি যুক্ত মঠ ও মিশন আছে।

৪। থিওসফিক্যাল সম্প্রদায়

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৭৫ সনে ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি (Madame H. P. Blavatsky), কর্নেল অলকট (H. S. Olcott) প্রভৃতি কয়েকজন মিলিয়া থিওসফিক্যাল সম্প্রদায় (Theosophical Society) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার উদ্দেশ্য: (১) জগতের নরনারীর মধ্যে সৌভ্রাত্র স্থাপন; (২) প্রাচীন ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক চর্চায় উৎসাহ প্রদান; এবং (৩) প্রকৃতির রাজ্যে যে সমুদয় ঘটনা ঘটে—অথচ যাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ এখনও পাওয়া যায় নাই, তাহার গূঢ় কারণ নির্ণয় এবং মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত ঐশী শক্তি আছে তাহার মূল উৎস অনুসন্ধান এবং বৃদ্ধিকরণ।

প্রকট, অপ্রকট সমগ্র চরাচর বিশ্বের পশ্চাতে যে একটি সত্তা (বা আত্মা) বিদ্যমান—ভারতীয় বেদান্ত মতের অনুযায়ী এই বিশ্বাসই প্রথম উদ্দেশ্যের ভিত্তি।

থিওসফিষ্টরা বিশ্বাস করেন যে, জগতে যত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহার সকলগুলিই একটি মৌলতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত এবং কেবল 'একশ্রেণীর সাধুরা' তাহা অবগত আছেন। ইঁহাদিগকে 'মহাত্মা' বলা হয়। ইঁহারা এখনও হিমালয় পর্বতে বাস করেন। ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি ইঁহাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া অনেক গূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে তিনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। এই মতবাদই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের ভিত্তি।

তৃতীয় উদ্দেশ্য ভারতের অতীন্দ্রিয়বাদ বা অলৌকিক বাদের অনুরূপ এবং ইহার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। হিন্দুধর্মের সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে থিওসফি

মতবাদ শিক্ষিত হিন্দুদিগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহার আর একটি কারণ এই যে হিন্দুধর্মের ও সমাজের যে সমুদয় অঙ্গ—প্রতিমা পূজা, জাতিভেদ প্রভৃতি—খ্রীষ্টান ও অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বিশেষভাবে নিন্দা করিত, থিওসফিষ্টগণ নানা যুক্তি তর্কের সাহায্যে তাহার পূর্ণ সমর্থন করিত।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যানি বেসান্ট (Annie Besant) ১৯০৭ সনে থিওসফিক্যাল সম্প্রদায়ের সভাপতি হন। তিনি আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতার প্রমাণ দিয়াছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মোক্ত 'কর্মফল', 'নির্বাণ' প্রভৃতি তত্ত্বও থিওসফিষ্টরা প্রচার করিতেন। ফলে যে সমুদয় নব্যশিক্ষিত হিন্দুরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা ও কটূক্তির যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ না করিতে পারিয়া অশান্তি ও অস্বস্তি ভোগ করিতেছিল—তাহারা থিওসফিষ্টদের ন্যায় একদল ইউরোপীয়দের সমর্থন পাইয়া একদিকে থিওসফি সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত হইল—এবং অপরদিকে নব্য-হিন্দু ধর্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠিল।

ভারতে থিওসফি সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল মাদ্রাজ শহরের নিকটবর্তী অ্যাডিয়ার নামক শহরতলীতে। বাংলা দেশেও ইহার কিছু কিছু প্রভাব ছিল। পণ্ডিত-প্রবর দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৫। ইসলাম ধর্ম

খাঁটি ইসলামের অতিরিক্ত এবং অননুমোদিত কতকগুলি ধর্ম বিশ্বাস ও সামাজিক প্রথা যে মুসলমান সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ২৪৮) বিবৃত হইয়াছে। হিন্দুর দৃষ্টান্তে যে অনেক নূতন সামাজিক প্রথা মুসলমান সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল তাহাও এই গ্রন্থে অন্যত্র আলোচিত হইবে। এই সমুদয় দূর করিয়া পুনরায় যাহাতে ইসলাম ধর্মের আদিম বিশুদ্ধ অবস্থা ফিরাইয়া আনা যায় সেজন্য আরব দেশে যে আন্দোলন হয় তাহা ওয়াহাবি আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে বাংলা দেশেও যে ইহার অনুরূপ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল—এবং কিরূপে তাহা ধর্মসংস্কারের পরিবর্তে রাজনীতিক আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ধর্মের দিক দিয়া এই দুই আন্দোলন

অথবা পরবর্তী উত্তর-ভারতব্যাপী ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশে ইসলাম ধর্মের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

* পঞ্জাবে মির্জা গুলাম আহমদ খ্রীষ্টান ও আর্যসমাজ সম্প্রদায়ের তীব্র সমালোচনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইসলামের কিছু কিছু সংস্কার করেন। ১৮৮০ সনে প্রকাশিত 'বরাহীনি অহ্মদিয়' নামক তাঁহার গ্রন্থ সমগ্র মুসলমান সমাজে আদৃত হয়। কিন্তু ১৮৯১ সনে যখন তিনি নিজেকে ধর্মপ্রবর্তক (মাহ্‌দি ও মেসায়া) ও কৃষ্ণের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিলেন তখন অনেকেই তাঁহার বিরোধী হইল। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদল লইয়া এক নূতন মুসলমান সম্প্রদায় গঠিত হইল। এই সম্প্রদায় তাঁহার নামানুসারে আহমদিয়া এবং তাঁহার জন্মস্থান কাদিয়ান শহরের নামানুসারে কাদিয়ানী নামে পরিচিত। বাংলা দেশেও এই সম্প্রদায় আছে—কিন্তু ইহার সংখ্যা বা প্রভাব খুব বেশী নহে।

আলিগড় আন্দোলনের নেতা সার সৈয়দ আহমদও ইসলাম ধর্মে আধুনিক যুগোচিত কিছু সংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার প্রভাবও বাংলা দেশে খুব বেশী দেখা যায় না।

৬। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায়

ক। তন্ত্রমত

বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই তান্ত্রিক প্রভাব বিস্তৃত হয়। তান্ত্রিক ধর্মমতের অনুষ্ঠানে নানারূপ ব্যভিচারের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে ২৫৭ পৃষ্ঠায় কিছু বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহার প্রতি অনেকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। হাইকোর্টের জজ উড্রফ সাহেব ও বাঙ্গালী মন্মথনাথ দত্ত তন্ত্রের মূল তত্ত্ব আলোচনা করিয়া ইহার অন্তর্নিহিত ধর্মের সার সত্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাও নব্য-হিন্দুধর্মের অনুরূপ প্রাচীন মতের সমর্থন করার চেষ্টা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

খ। শিবনারায়ণ পরমহংস ও অন্যান্য সাধু-সন্ত

১। পরিব্রাজক সাধু শিবনারায়ণ পরমহংস ১৮৪০ সনে কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা দেশে এক নূতন ধর্মমত প্রচার করেন।

তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন ও প্রতিমা পূজার বিরোধী ছিলেন। এই দুই বিষয়ে তিনি স্বামী দয়ানন্দের সহিত একমত ছিলেন—কিন্তু তিনি 'বেদ অপৌরুষেয় সুতরাং প্রামাণিক' এই মত এবং কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিতেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার' উপর খুব জোর দিতেন। তিনি কয়েকটি অদ্ভুত মত প্রচার করিতেন, যথা—সমস্ত মানুষের একটি মাত্র ভাষা থাকিবে—এবং সমুদয় ধর্মসম্প্রদায়ের সার সত্য সংগ্রহ ও ঐ ভাষায় প্রকাশ করিয়া অপর সমুদয় ধর্মশাস্ত্র পোড়াইয়া ফেলিবে।

শিবনারায়ণ ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কলিকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চলে তাঁহার বহু ভক্ত ও শিষ্যেরা একটি ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায় গড়িয়া তোলে। আসামের মেচ জাতির মধ্যে শিবনারায়ণের অনেক শিষ্য ছিল। কালীচরণ নামে তাহাদের একজন এই ক্ষুদ্র ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন।

এইরূপে অনেক সাধুসন্তের শিষ্যেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভোলাগিরি, তৈলঙ্গ স্বামী, পাহাড়ী বাবা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কাঠিয়া বাবা এবং সন্তদাস বাবাজী বাংলা দেশে সমধিক প্রসিদ্ধ।

গ। কর্তাভজা সম্প্রদায়

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে কর্তাভজা সম্প্রদায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ ২৮৩)। আউলচাঁদ নামক একজন সাধক এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়ের মতে শ্রীচৈতন্যই আউলচাঁদরূপে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং 'গুরু সত্য' এই মন্ত্র প্রচার করেন। ইহা বৈষ্ণব ধর্মেরই একটি শাখা বা প্রশাখা এবং নিজেদের মধ্যে সহজধর্ম বা সত্যধর্ম বলিয়া পরিচিত। এই ধর্মমতে গুরুই পৃথিবীতে ভগবানের একমাত্র প্রতিনিধি এবং অবিচলিত নিষ্ঠা ও ভক্তিসহকারে ঈশ্বরজ্ঞানে গুরুসেবাই এই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। গুরুসেবাই 'কর্তা সেবা বা কর্তা ভজা,' এবং ইহা হইতেই এই সম্প্রদায় কর্তাভজা নামে পরিচিত। বাউলদের মতন ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গোপনীয় রহস্য বা তত্ত্ব আছে। দলের বাহিরে কাহারও তাহা জানিবার

উপায় নাই। এই দলের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না। হিন্দু মুসলমান সকলেই সকলের অন্ন ভোজন করিতেন।[৬৭]

কাঁচড়াপাড়ার উত্তর-পশ্চিমে পাঁচমাইল দূরে অবস্থিত ঘোষপাড়া গ্রাম এই সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র। ইহার প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদের ২২ জন শিষ্যের মধ্যে সদ্‌গোপ, কলু, মুচি প্রভৃতি হিন্দু ও কয়েকজন মুসলমান ছিলেন। আউলচাঁদের মৃত্যুর (আ ১৬৯১ শক = ১৭৬৯ খ্রী:) পর তাঁহার ২২ জন শিষ্যের অন্যতম এই গ্রামবাসী সদ্‌গোপ[৬৭ক] বংশীয় রামশরণ পাল তাঁহার স্থানে গুরুর পদে অভিষিক্ত হন। রামশরণের মৃত্যুর পর (আ ১৭৮৩ খ্রী:) তাঁহার পুত্র রামদুলাল, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর (১৮৩৩ খ্রী:) তাঁহার পুত্র ঈশ্বর পাল গুরু হন।[৬৭খ] সমসাময়িক পত্রিকায় এই সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৬৩ সনের সোমপ্রকাশে একজন লিখিয়াছেন:

"রামশরণের বাটীতেই আউলেচাঁদের মৃত্যু হয়। চাকদহের নিকট পড়াবি গ্রামে ইঁহার সমাধি হইয়াছে। ঘোষপাড়ায় একটি সমাজবাটী আছে। কেহ কেহ বলে, ঐটি রামশরণের স্ত্রী সতীমার সমাধিস্থান। কর্ত্তাভজা স্ত্রী ও পুরুষেরা ঐ বাটীস্থ এক স্তম্ভে আবির ও পুষ্পমালা প্রভৃতি প্রদান করিয়া ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। ধর্ম্মাবলম্বীরা রামশরণের স্ত্রীর প্রতি অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকে। রামশরণের পুত্র রামদুলাল, রামদুলালের দুই পুত্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও ইন্দ্রনারায়ণ। এই ঈশ্বরচন্দ্র বর্ত্তমান কর্ত্তা, ইঁহাদিগের পৌত্র হইয়াছে। এই ১০০ বৎসরের মধ্যে পালদিগের ৫ পুরুষ ও বঙ্গদেশের ভিতরে ভিতরে প্রায় একলক্ষ লোক কর্ত্তাভজা হইয়াছে। ইহাদিগের উপাসনা প্রকার বড় বাহুল্য নয়, একখানি গীতগর্ভ পুস্তক আছে, আহারের পর ১০ জন একত্র উপবেশন করিয়া আউলেচাঁদ, রামশরণ ও তাঁহার স্ত্রীর মূর্ত্তি ভাবনা, ক্রন্দন ও গান করিয়া থাকে।...

"কর্ত্তাভজা ধর্ম্মাবলম্বিরা পুত্রকে পুত্র ও পিতাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করে না। ইহারা বলে, সকলেই একজনের পুত্র, একমাত্র গুরুই সকলের পিতা। মফঃস্বলের গুরু (কর্ত্তা) দিগকে 'মহাশয়' বলে। এক একজন মহাশয়ের অধীনে কয়েকজন করিয়া শিষ্য আছে, শিষ্যদিগের নিকট হইতে যে প্রণামী আদায় হয়, ঈশ্বরবাবু তাহার অংশ পান, মফঃস্বলের মহাশয়েরা তাহার কিছু কিছু পাইয়া থাকেন।

* * *

"ইতর লোকের মধ্যে এই ধর্ম্মের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব। ভদ্রলোকেরা ইহার আদর করা দূরে থাকুক, যাহারা এই ধর্ম্ম অবলম্বন করে তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, তবে যে ২।৪ জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে এই ভ্রমে পতিত দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাও মূর্খতায় ইতর লোকের তুল্য। এ ধর্ম্মের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইবার এই কারণ অনুমান হয়, ইহার ভক্তদিগের নানাপ্রকার যথেচ্ছাচারিতার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। হিন্দুদিগের শাস্ত্র ও ব্যবহারানুসারে স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য নাই। তাঁহাদিগকে সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতেই পিতা, মাতা, পতি ও পুত্রাদির পরতন্ত্র হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু কর্ত্তাভজা ধর্ম্মে বিলক্ষণ স্বাতন্ত্র্যলাভ আছে। আমাদিগের সম্বাদদাতা বলিলেন, মেলাস্থলে কর্ত্তাদিগের অতিশয় কড়াকড়ি আছে, কেহ কোন কুকর্ম্ম করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার দণ্ডবিধান হয়। এরূপ হওয়া অসম্ভাবিত নয়। কর্ত্তা পর্য্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইলে ধর্ম্মলোপ ও স্বার্থহানি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থানে মূর্খতা ও স্বাতন্ত্র্য উভয়ের যোগ, সেখানে কুক্রিয়ার বিলক্ষণ আধিপত্য হয়, ধর্ম্মের নাম তাহার সহিত সংযোজিত হইলে তাহার ত আর কথাই নাই। আমাদিগের সম্বাদদাতা এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, বর্ত্তমান কর্ত্তা ঈশ্বরবাবু একটি শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া কেহ পদসেবা করিতেছে, কেহবা অঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছে এবং কেহ কেহ বা গলদেশে পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিতেছে। আমরাও অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছি এই ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনের প্রকৃত কৃষ্ণলীলাটাই অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন কর্ত্তা কুলবালাদিগের বস্ত্র হরণ করিয়া বৃক্ষে আরোহণ করেন, রমণীরা করযোড় করিয়া বৃক্ষতল হইতে উহা প্রার্থনা লয়। এতদ্ব্যতিরিক্ত ভূতছাড়ান, ডাইন ঝাড়ান প্রভৃতি বিস্তর রহস্য আছে। অতএব অনুমান হইতেছে অনেকে দুষ্প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ও স্বার্থসিদ্ধির আশ্রয়ে ঐ দলের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে।

"কর্ত্তাভজাদলে জাতিভেদ নাই, স্ত্রী পুরুষ একত্র বসিয়া উপাসনাদি করা হইয়া থাকে, ঐ ধর্ম্মের উপদেশগুলিও সৎপথ প্রদর্শন। এই সকল দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যিনি এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, চতুর ও ঔদার্য্যশালী। এই ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার

নিজ নামকে চির প্রসিদ্ধ করিবার অভিলাষ ব্যতিরিক্ত অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল কিনা, এখন নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কর্ত্তারা আপনাদিগকে ঈশ্বর স্থানীয় বলিয়া জ্ঞান করেন, উপাসকদিগের নিকটেও পূজা পাইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা আবার নিজ গৃহে দুর্গোৎসবাদি ও ব্রাহ্মণের পদধূলি পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন! অথচ তাঁহাদিগের উপাসকেরা তাঁহাদিগের প্রতি দৃঢ়ভক্তি প্রকাশ করে।

"আমাদিগের অধিকতর চমৎকার বোধ হইতেছে, খৃষ্ট, মহম্মদ, গৌরাঙ্গ ও আউলেচাঁদ, ইঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ও সেই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন প্রকারের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।"৬৮

রথযাত্রা ও দোলের সময় ঘোষপাড়ায় বিশেষ সমারোহ হইত ও মেলা বসিত। দোলের মেলাতেই লোকসমাগম ও জাঁকজমক বেশি হইত। ১৮৪৮ সনের ৩০শে মার্চ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত একজন প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ এইরূপ :

"গত দোলযাত্রার পর দিবস সোমবার অপরাহ্নে কতিপয় বন্ধু সহিত আনন্দধাম ও পবিত্র স্থান ঘোষপাড়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে রাসযাত্রা দর্শন করিতে গমন করিয়া তথায় স্ত্রীপুরুষ অন্যূন দশ সহস্র ভাবের মনুষ্য অর্থাৎ কর্ত্তা উপাসককে উপস্থিত দেখিলাম, এতদ্ভিন্ন সে স্থলে ক্রেতা, বিক্রেতা, রঙ্গদর্শি ও নিমন্ত্রিত প্রভৃতি অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

"ঐ বহু সংখ্যক কর্ত্তামতাবলম্বিরা কেবল যে ইতর জাতি ও শাস্ত্রবিজ্ঞান বর্জ্জিত মনুষ্য তাহা নহে তাহাদের মধ্যে সৎকুলোদ্ভব মান্য, বিদ্বান এবং সূক্ষ্মদর্শি জন দৃষ্ট হইল, এই ভাবকেরা ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ পূর্ব্বক বৃক্ষমূলে বা রম্যস্থলে বা পুষ্করিণীর ঘাটে বা মাঠে বা গৃহস্থের উঠানে অথবা রাজপথে স্ব স্ব মহাশয় অর্থাৎ উপগুরু বেষ্টন করিয়া বসিয়া একান্তঃকরণে কর্ত্তাগুণ সংকীর্ত্তন করিতেছে, কি আশ্চর্য্য, কি কুহক, যুবতী ও কুলের কুলবধূ প্রভৃতি কামিনীগণ যাহারা পিঞ্জরের পক্ষির ন্যায় নিয়তঃ অন্তঃপুরে বদ্ধা থাকেন তাহারা এককালীন লজ্জা ও কুলভয় এবং মনের বিকারকে জলাঞ্জলি দিয়া পরপুরুষের সহিত একাসনোপবিষ্টা হইয়া আনন্দ লহরী ও গোপীযন্ত্রে গীত ও বাদ্য করিতেছে, ক্ষণেক ক্ষণেক ঠাকুর ঠাকুর বলিয়া চীৎকার, ক্ষণেক বা গুরুনামে করতালি ও জয়ধ্বনি প্রদান এবং ক্ষণেক বা আউল নাম উচ্চারণ করিতেছে, আরবার নিস্তব্ধ হইয়া ভক্তিতে মগ্নানন্তর অশ্রুপাত করিতেছে,

এবম্প্রকার দর্শন ও শ্রবনানন্তর কর্ত্তার ভবনে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে বহু জনতা দেখিলাম, তিলার্দ্ধ স্থান শূন্য নাই, যে কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান হইয়া কাহার সহিত কথোপকথন বা পুরীর শোভা সন্দর্শন করি, পরে বাটিস্থিত এক দাড়িম্ব তরুতলে অনেক লোককে পতিতাবস্থায় দৃষ্টি করিয়া তদ্বৃক্ষের নিকটস্থ হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবাতে অবগতি হইল যে, এ স্থলে কর্ত্তা পাতকী তরাইয়াছিলেন, বিধেয়ে ইহার বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, এজন্য সঙ্কটাপন্ন জীবেরা ইহার আশ্রয় লইয়াছে, অনন্তর তথায় অর্দ্ধদণ্ডকাল অবস্থিতি করিয়া দেখিলাম, যে যাহারা ভুমি সার করিয়াছে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ উৎকট পীড়াতে পীড়িত, কেহ বা সমূহ বিপদ্‌গ্রস্ত, কেহ বা মনের তাপে তাপিত ও কেহ বা সন্তান সন্ততি বিরহে দুঃখিত হইয়া স্ব স্ব দায় হইতে উদ্ধার হওনের ভরসায় ও মনোরথ সিদ্ধকরণের প্রত্যাশায়, এরূপ হত্যে দিয়াছে, মধ্যে মধ্যে কর্ত্তার উদ্দেশ্যে ঐ পবিত্র বৃক্ষকে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত দোহাই ঠাকুর দোহাই সতী মা, আমরা নরাধম অতি পাপি, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর ইত্যাদি কাতরুক্তি প্রয়োগ করিতেছে। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত বাটীর কিয়দ্দূরে হিমসাগর নামক পুষ্করিণীর নিকট চরণ চালন করিয়া দেখিলাম যে ইহার ঘাটের অধঃসোপানে পাপি লোকসকল এক পদ স্থলে দিয়া অন্য পদ জলে মগ্ন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কর্ত্তাপ্রেরিত দূতগণের সমক্ষ্যে স্ব স্ব কৃত কলুষ রাশি অম্লান বদনে স্বীকার করত ত্রাণ পাইতেছে, কিন্তু যাহারা স্বীয় স্বীয় অপরাধ ব্যক্ত করিতে বিলম্ব বা সন্দেহ করিতেছে দূতেরা তাহাদের প্রতি প্রকৃত যমদূতের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দে তাহাদের কেশাকর্ষণ করত মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা তাহাদের পাপপুঞ্জ স্বীকার করাইয়া লইতেছে, পরে পাতকিদিগকে কথিত পুষ্করিণীতে অবগাহন করাইয়া তাহাদের দেহ নিষ্পাপ করিয়া দিতেছে, পরিশেষে কর্ত্তার নিকেতনের উত্তরাংশে এক স্থানে দৃষ্ট হইল যে, একজন ফকির চামর লইয়া রোদন বদনে প্রভু আউলের আবির্ভাব ও তাহার সহিত বর্ত্তমান কর্ত্তা ঈশ্বরচন্দ্র পালের পিতামহ রামশরণ পালের মিলন বিষয়ের আদ্যন্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছে শ্রোতারা তচ্ছ্রবণে ভাবে গদ গদ ও আর্দ্র হইতেছে। এদিগে কর্ত্তার অন্তঃপুরে রাশি রাশি অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া সেবকবর্গের সেবায় লাগিতেছে, বাহির মহলে গান বাদ্য ও নৃত্যের ধূমধাম হইতেছে, অপর রাত্রি দশ ঘটিকার সময় নাট মন্দিরে কবি আরম্ভ

হইলে, আমরা তথা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলাম, আমরা এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। যেহেতু ব্রাহ্মণ, শূদ্র, যবন প্রভৃতি জাতি নীচেদের অন্ন বিচার না করিয়া এরূপ ক্ষেত্রে ভোজন ও পান করে ইহা কুত্রাপি কোন স্থানে দেখি নাই ও শুনি নাই, বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদবধি আমরা উক্ত পল্লীতে উপস্থিত ছিলাম তদবধি ক্ষণমাত্র কাহাকেও অসুখি দেখি নাই, সকলেই হাস্যাস্যে সময়ক্ষেপ করিতেছিল, বোধহয় রাসের তিন দিবস তথায় আনন্দ বিরাজমান থাকে।"[৬১]

১৮৬৩ সনের 'সোম প্রকাশে' একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই মেলার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"এবৎসর দোলে প্রায় ৬৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। যাত্রীদিগের মধ্যে চৌদ্দ আনা স্ত্রীলোক। কুলকামিনী অপেক্ষা বেশ্যাই অধিক, পুরুষদিগের সকলেই প্রায় মূর্খ। এখানে জাতিভেদ নাই। সকল জাতিই সকলের মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়া থাকে। এ বিষয়ে ঘোষপাড়া জগন্নাথ ক্ষেত্রকেও পরাজয় করিয়াছে। সেখানে মুসলমানদিগের প্রবেশাধিকার নাই, এখানে মুসলমানেরা স্বচ্ছন্দে ব্রাহ্মণের মুখে অন্ন প্রদান করিতেছে! রামশরণ বাবুর পূজার বাটীতে একটি দাড়িম্ব বৃক্ষ আছে, কেহ কেহ বলে, এই দাড়িম্ব তলায় আউলেচাঁদের গোধূড়ী প্রোথিত আছে, কেহ বলে, রামশরণ ঐ স্থানে বসিতেন এই নিমিত্ত উহার অধিক মাহাত্ম্য হইয়াছে। দেখিলাম ২০ রোগী আরোগ্যলাভ করিবার আশায় দাড়িম্ব তলায় হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগের ন্যায় ইহাদিগের বুজরুকীও অল্প নয়। কোন পরিচিত ব্যক্তিকে বোবা সাজাইয়া "বোবার কথা হউক" প্রভৃতি বলিয়া রোগ আরাম করিতেছে! ঈশ্বরবাবুর বাটীতে দুর্গোৎসব, রাস, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় পর্য্যন্ত সমুদায় অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তিনি নিজেও ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকেন। সকল কর্ত্তাভজাঁরই প্রায় ঐরূপ ব্যবহার দেখা যায়। আমাকে কল্য জুতা পায়ে দিতে দেয় নাই, কিন্তু অদ্য আমি দাড়িম্বতলা পর্য্যন্ত জুতা পায়ে দিয়া বেড়াইয়াছি।

"এই রাধাকৃষ্ণের দোল উপলক্ষে প্রতি বৎসর অনেক চুরি ও হত্যা হইয়া থাকে। এ বৎসর তিন ব্যক্তির ওলাওঠায় মৃত্যু হইয়াছে, দেখিয়া আসিয়াছি। ইহার পর আর কত হয় বলিতে পারি না। পুলিষের কনষ্টবলেরাও অত্যাচার করিয়া পয়সা গ্রহণ করে।

"উপসংহার স্থলে সমাজের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমুদায় জেলা হইতেই কর্তাভজা আসিয়াছে, তাহার মধ্যে মুরশিদাবাদের লোকই অধিক। যে সমাজের স্ত্রীলোকেরা লজ্জা ও কুলভয়ে গৃহের বাহির হইতে সাহসী হয় না, সেই সমাজের সেই স্ত্রীলোকেরা এক "কর্তা"র অনুরোধে বহুসংখ্য অপরিচিত পুরুষের সহিত একত্রে বসিয়া আমোদ করিতে লজ্জিত হইতেছে না!! এক একটি পুরুষের নিকটে গড়ে ৪।৫টী করিয়া যুবতী বসিয়া আছে!"[১০]

অক্ষয়কুমার দত্ত এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "ব্যভিচার দোষ তাঁহাদের সকল গুণ গ্রাস করিয়াছে। সম্প্রদায়-ভুক্ত স্ত্রীপুরুষ ভ্রাতৃভগিনী সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেও পরস্পর একত্র বাসই তাহাদের সর্বনাশের হেতু হইয়া উঠিয়াছে।"[১১]

ঘ। রামবল্লভী সম্প্রদায়

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হুগলীর নিকটবর্তী বাঁশবেড়িয়া গ্রামে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একটি নূতন ধর্মসম্প্রদায় গঠিত হয়। ১৮৮১ সনে ৩১শে মে তারিখে শ্রীরাজনারায়ণ বসু রামমোহন রায়ের জীবনী লেখিকা মিস্ কলেটের নিকট একখানি চিঠিতে ইহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছিলেন নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দিতেছি।

"শ্রীযুত কেশবচন্দ্র সেন নানা প্রচলিত ধর্মমত ও অনুষ্ঠানের জগাখিচুড়ী (jumbling up) করিয়া যে নববিধান প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা এদেশে নূতন নহে। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে হুগলীর নিকটস্থ বাঁশবেড়িয়া গ্রামে রাধাবল্লভ নামে একটি অদ্ভুত প্রকৃতির (eccentric) লোক অনুরূপ একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বাৎসরিক সভায় হিন্দু প্রণালীতে দেবতার নিকট ভোজ্য নিবেদন প্রথার অনুকরণে কৃষ্ণ, খৃষ্ট ও মহম্মদ এই তিনজনের উদ্দেশ্যেই ভোগ দেওয়া হইত। কৃষ্ণকে ননী, মাখন, মিষ্টান্নাদি দেওয়া হইত, কিন্তু মাংস দেওয়া হইত না। মুহম্মদকে গো-মাংস দেওয়া হইত কিন্তু শূকর-মাংস নহে। খ্রীষ্টকে উক্ত উভয় প্রকারের মাংসই ভোগ দেওয়া হইত। এই উৎসবে যে স্তোত্র পাঠ করা হইত তাহার মর্মার্থ এই যে কালী, কৃষ্ণ, খোদা এ সকলই ভগবান, ইঁহাদের মধ্যে কোন ভেদ বুদ্ধি মনে ঠাঁই দিও না।"[১২]

শ্রীরাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন যে অক্ষয়কুমার দত্তের 'Hindu Sects' নামে প্রসিদ্ধ বাংলা গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থে ইহা 'রামবল্লভী নামে' অভিহিত হইয়াছে। অক্ষয়কুমার কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বিবরণের পরই ইহার বিবরণ দিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন: "কিছুদিন হইল পালদিগকে (অর্থাৎ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরু রামশরণ পালের বংশধরদিগকে) কর্তা স্বরূপ স্বীকার না করিয়া বংশবাটির কয়েক ব্যক্তি রামবল্লভী নামে একটি শাখা সংস্থাপন করেন। কৃষ্ণকিঙ্কর গুণসাগর ও শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এ সম্প্রদায়ীরা রামবল্লভ নামে এক ব্যক্তিকে আপনাদের প্রবর্তক ও শিবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। ...ইঁহারা সর্বশাস্ত্রকে সমান জ্ঞান ও সর্বশাস্ত্রোক্ত দেবতাদিগকে অভিন্নবোধ করেন। অতএব ঐ উৎসব কালে ভগবদ্গীতা, কোরাণ, বাইবেল এই তিনই পঠিত হয়।...শ্রুত হওয়া গিয়াছে ইঁহারা খেচরান্ন ও গোমাংসাদি সকল দ্রব্যেরই ভোগ দিয়া থাকেন—ইশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ ও নানকের এক এক ভোগ হয় এবং এক একজন তত্তৎ মহাজন স্বরূপ হইয়া তদীয় ভোগের সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাকেন।...ইঁহাদের মত-প্রতিপাদক গান: "কালী কৃষ্ণ গাড্ খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাদীর বিবাদ দ্বিধা, তাতে নাহি টলোরে। মন কালী কালী গাড্ খোদা বলরে।"

রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয়কুমার দত্ত, দুই ভিন্ন নামে যে একই সম্প্রদায়ের বিবরণ দিয়াছেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। রাধাবল্লভী নামে একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও ছিল। অক্ষয়কুমার তাহার বর্ণনা করিয়াছেন—কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাবলম্বী এবং বাংলায় তাহার বিশেষ প্রাধান্য ছিল না। রাজনারায়ণবাবু বোধ হয় ভ্রমবশতঃ রামবল্লভী ও রাধাবল্লভী এই দুই সম্প্রদায়কে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। রামবল্লভী নামই ঠিক বলিয়া মনে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' ও কেশবচন্দ্রের 'নববিধান' এই দুই ধর্মসমন্বয়ের পরিকল্পনার সহিত রামবল্লভী সম্প্রদায়ের ধর্মমতও উল্লেখযোগ্য।

৬। সাহেবধনী

প্রবাদ এই যে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শালিগ্রাম, দোগাছিয়া প্রভৃতি কয়েক গ্রামের বনে সাহেবধনী নামে এক উদাসীন এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। ইহা সম্ভবতঃ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষ, এবং হিন্দু ও

মুসলমান উভয়েই ইহার শিষ্য হইত। ইহাদের মূল-গুরু দুঃখীরাম পালের পুত্র চরণ পাল শতাধিক বৎসর পূর্বে ইহার মূল-গুরু ছিলেন এবং বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিলেন। "এই সম্প্রদায় কোন বিগ্রহের উপাসনা করে না, বরং বিগ্রহ ও মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতি বিশেষ বিদ্বেষই প্রকাশ করে। প্রতি বৃহস্পতিবার এই সম্প্রদায়ের অনেক লোক একত্রিত হইয়া উপাসনা ও পরমার্থ সাধন করে, অর্থাৎ যবনাদি নানা জাতি প্রদত্ত তাহাদের প্রস্তুত করা পরমান্ন ও অন্যান্য ভোগের সামগ্রী উপাসনা স্থানের (একখানি চৌকী) নিকট নিবেদন করিয়া দিয়া নিবেদিত দ্রব্য পরস্পরের মুখে অর্পণ করে।"৭৩ চরণ পালের পরে তাঁহার পুত্র এই সম্প্রদায়ের গুরু হন।

চ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়

উনবিংশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কয়েকটি শাখার প্রাধান্য ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্পষ্টদায়ক, সখীভাবক, আউল, বাউল, সহজী, সাঁই, নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র প্রবর্তিত ন্যাড়া, সনাতন গোস্বামী প্রবর্তিত দরবেশ, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রকৃতি-সাধন (অর্থাৎ নারীর সহিত সাধন), জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিষ্যগ্রহণ, ও তাহাদের পরস্পরের অন্নগ্রহণ প্রভৃতি ইহাদের বৈশিষ্ট্য। ইহাদের সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে আলোচনা করা হইয়াছে (২৮২—২৯০ পৃ)। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে সখীভাবক সম্প্রদায় কলিকাতায় খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সুবর্ণবণিক ও অপরাপর জাতীয় ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত লোকেরা এই সম্প্রদায়ের ধর্ম অনুষ্ঠান করিতেন।"৭৪ আউল সম্প্রদায় সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিয়াছেন: "ইহাদের আর একটি নাম সহজ কর্তাভজা। কোন সম্প্রদায় প্রকৃতি সাধন বিষয়ে ইহাদের ন্যায় উদার ভাব অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইহাদের পরমার্থ সাধন কেবল দুই একটি নিজ প্রকৃতি সহবাসে পর্যাপ্ত হয় না, কি প্রকাশ্য, কি অপ্রকাশ্য, ইচ্ছানুরূপ বহুতর বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা ইহাদিগের সাধন সম্পাদনে নিয়োজিত হইয়া থাকে।......শুনিয়াছি, আপনার প্রকৃতিকে অন্যদীয় সংসর্গে অনুরক্ত দেখিলেও কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করে না। বাউল ও ন্যাড়ারা যেরূপ শ্মশ্রু ও ওষ্ঠ লোমাদি সমুদয় কেশ রাখিয়া দেয়, ইহারা সেরূপ করে না; ঐ উভয়ই ক্ষৌরী হইয়া থাকে। ৪০।৪৫ বৎসর

অতীত হইল (অর্থাৎ ১৮৩০-৩৫ সনে) কলিকাতার শ্যামবাজারে রঘুনাথ নামে একটি আউল ও তাহার কতকগুলি শিষ্য ছিল। এক্ষণে (১৮৭০ সনে) এ সম্প্রদায়ী লোক এ প্রদেশে আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।"[৭৫]

পূর্বোক্ত সম্প্রদায়গুলি ছাড়া আরও কয়েকটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(১) খুশি-বিশ্বাসী—নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকটবর্তী ভাগা গ্রামনিবাসী খুশি বিশ্বাস নামক একজন মুসলমান এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। এই সম্প্রদায়ীরা খুশি বিশ্বাসকে চৈতন্যের অবতার স্বরূপ জ্ঞান করে, বর্ণভেদ মানে না, সকল জাতি একত্র হইয়া পরস্পরের মুখে অন্নাদি অর্পণ করে।[৭৬]

(২) গৌর-বাদী—ইহারা গৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ মনে করে, কারণ রাধা-কৃষ্ণ একত্র মিলিয়া গৌরাঙ্গরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হন ; দেবালয়ে একমাত্র গৌরাঙ্গের বিগ্রহ স্থাপন করে, এবং সর্বদা গৌর নাম উচ্চারণ করে।

(৩) নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রামের অধিবাসী বলরাম হাড়ি একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। শিষ্যেরা বলরামকে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়া বিশ্বাস করে। "দোলের সময় বলরাম স্বয়ং দোলমঞ্চে আরোহণ করিয়া বসিত এবং শিষ্যেরা আবির ও পুষ্পাদি দিয়া তাহার অর্চনা করিত।" এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ নাই। অনেকেই গৃহস্থ, কেহ কেহ উদাসীন। "উদাসীনেরা বিবাহ করে না অথচ ইন্দ্রিয় দোষেও লিপ্ত নহে।" ইহাদের মধ্যে বিগ্রহ-সেবা প্রচলিত নাই। ১২৫৭ সালে (১৮৫১ সনে) বলরামের মৃত্যুর পর ব্রহ্ম মালোনী নামে একটি স্ত্রীলোক গুরুর কার্য করিত।[৭৭]

(৪-৮) হজরৎ, গোবরা ও পাগলনাথ এই তিনজন মুসলমান কর্তৃক কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ তিনটি সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। তিলক দাস নামে একজন সদ্‌গোপ কর্তাভজা সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া নিজ নাম অনুসারে তিলকদাসী নামে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেকে বিষ্ণু শিবাদির অবতার বলিয়া প্রচার করিতেন। শান্তিপুর নিবাসী দর্পনারায়ণ মুচি একটি সম্প্রদায়ের প্রবর্তক।

ছ। পাগলপন্থী

ময়মনসিংহ জিলায় সেরপুরের মুসলমানদিগের মধ্যে পাগলপন্থী নামক

এক সম্প্রদায় ছিল। "সুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত লেটিয়াকান্দা গ্রামবাসী টিপু পাগল এই মতের প্রবর্ত্তয়িতা। টিপু প্রথমে সামান্য কৃষাণ ছিল, সময়ে সে কেবল ধর্ম্মপ্রচারক নহে, বহু সংখ্য অনুচর প্রাপ্ত হইয়া একজন ঘোরতর সমাজবিপ্লাবক হইয়া উঠে। তদীয় ধর্ম্মের অন্যতম মূলসূত্র এই, সকল মানুষই ঈশ্বর সৃষ্ট, কেহ কাহারও অধীন নহে ; সুতরাং কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, এরূপ প্রভেদ করা অসঙ্গত। ১২৩১ সনে তন্মতাবলম্বী এ পরগণাস্থ অনেক প্রজা দলবদ্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া জমীদার প্রভৃতিকে খাজানা দেওয়া বন্ধ করে। পরিশেষে উহারা গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে নিরস্ত হয়। পাগল গুরুরা অন্যান্য মুসলমানদিগের ন্যায় শ্মশ্রুধারণ, কুক্কুটাদি জন্তু পালন করেন না। লোকে ইহাদিগের অতিমানুষিক ক্ষমতা বিশ্বাস করিয়া তদুদ্দেশে অনেক প্রকার মানসিক করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত সর্ব্বদা তাহাদের বাসভবনে অনেক লোকের সমাগম হয়। টিপু পাগলকে পূর্ব্ব বাঙ্গলার এক প্রকার লুই ব্লেঙ্ক (Louis Blanc) বলিলে হয়।"[৩১৮]

৭। ধর্মের নামে নিষ্ঠুরতা

আঠার ও উনিশ শতকে ধর্মের নামে অনেক নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। সতীর সহমরণ ও গঙ্গা সাগরে সন্তান বিসর্জন ইহার মধ্যে প্রধান। সতী প্রথা সমাজ-শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। কোন স্ত্রীলোকের সন্তান না হইলে মানৎ করিত যে দুইটি সন্তান জন্মিলে একটি গঙ্গা মাতাকে উপহার দিবে—অর্থাৎ মাতা স্বহস্তে নিজের শিশু সন্তানকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবেন। কতদূর ধর্মান্ধ ও সদসৎ বিবেচনা-শূন্য হইলে কেহ এইরূপ অমানুষিক কার্য অথবা তাহার অনুমোদন করিতে পারে তাহা আজ সকলেই বুঝিতে পারে। অথচ উনিশ শতকে বাংলা দেশের বহু জননী গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে এইরূপে নিজের সন্তান নিজে হত্যা করিয়াছে—এবং হিন্দু সমাজ তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছে—অন্তত: প্রতিবাদ করিয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই। "দেবতার গ্রাস" নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের এই চরম কলঙ্ককে সাহিত্যে শাশ্বতরূপ দিয়াছেন।

চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজার উৎসবে বহু প্রকারের দৈহিক যন্ত্রণা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। চড়ক গাছে অর্থাৎ একটি উচ্চ খুঁটিতে 'ভক্ত' বা 'সন্ন্যাসীকে' লোহার হুক দিয়া চাকার সহিত বাঁধিয়া ঐ চাকা

দ্রুতবেগে ঘোরান হইত—অনেক সময় হুক ছিঁড়িয়া যাইত এবং ঐ সব পুণ্য-পিপাসী ভক্তের দেহ মাংসপিণ্ডাকৃতি হইয়া ২৫—৩০ গজ দূরে যাইয়া পড়িত। এইরূপ ভক্তের সংখ্যা কখনও কখনও শতাধিক হইত। তাদের পিঠে, হাতে, পায়ে, জিহ্বায়, এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে "বাণ ফোঁড়া" অর্থাৎ লোহার শলাকা বিদ্ধ করা হইত, জলন্ত লোহার শলাকা তাদের গায়ের মধ্যে ফুড়িয়া দেওয়া হইত।[৭৯] গভর্নমেণ্ট ইচ্ছা থাকিলেও বহুদিন পর্যন্ত লোকমত উপেক্ষা করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিতে সাহস করেন নাই। অবশেষে প্রায় দশ বৎসর নানা আলোচনা ও আন্দোলনের পর ১৮৬৫ সনে আইন করিয়া ইহা বন্ধ করা হয়।[৮০] কিন্তু এখনও এই গাজন (গা অর্থাৎ গ্রামের জনসাধারণের উৎসব) পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রী বিনয় ঘোষ লিখিয়াছেন :

"চৈত্রসংক্রান্তির সময় মহাসমারোহে শিবের গাজন হয় বাহুলাড়ায়, এবং উৎসব উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী মেলা হয়। আগেকার তুলনায় সমারোহ এখন কমে গেলেও, আজও মেলায় চার-পাঁচ হাজার লোকের সমাগম হয়। গাজনে আগে কয়েক শত 'ভক্ত' বা সন্ন্যাসী হত এবং পিঠ ফোঁড়া বাণ হত। চড়কগাছে পিঠে বাণ ফুঁড়ে ভক্তরা দে-পাক, দে-পাক করে পাক খেতেন। এখন ভক্তের সংখ্যা একশ-দেড়শ জন হয় এবং পিঠবাণ হয় না। তা না হলেও অন্যান্য বাণ ফোঁড়া এখনও হয় সিদ্ধেশ্বরের গাজনে। যেমন জিব-বাণ কপাল বাণ ইত্যাদি। এখনও চৈত্রসংক্রান্তির আগের দিন পাটভক্তা বা প্রধান ভক্তা স্নান করে, লোহার কাঁটা-বেঁধা পাটাতনের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে, বুকের উপর ব্রাহ্মণ পূজারীকে বসিয়ে, ঘাট থেকে গাজনতলায় আসেন। অন্যান্য ভক্তেরা বেতের ছড়ি ঠুকতে ঠুকতে—"ব্যোম্ ব্যোম্ শিব শঙ্কর"—ধ্বনি দিতে দিতে তাঁর অনুগমন করেন। বাহুলাড়ায় চাষী, তিলি, সদগোপ, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, নায়েক, খয়রা, বাউরী, ধীবর প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোকের বাস থাকলেও, প্রধানত ভক্তা হন নায়েক, খয়রা, বাউরী, ধীবর প্রভৃতি জাতির লোকেরাই বেশি। উৎসবটাও প্রধানত তাঁদেরই। কাছাকাছি ধর্মঠাকুরও আছেন এবং তাঁরও গাজন-উৎসব হয়।"[৮১]

৮। উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্মের অবস্থা

শ্রীরামপুরের মিশনারী W. Ward হিন্দুদের ধর্ম, সমাজ, আচার ব্যবহার,

শিক্ষা, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লেখেন।[৮২] ওয়ার্ড তাঁহার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার ফলে যে সমুদয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থের প্রধান উপাদান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালীর জীবন যাত্রার এরূপ বিস্তৃত সমসাময়িক বিবরণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। অবশ্য তিনি বিদেশী ও বিধর্মী এবং স্বাভাবিক অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি এবং মিশনারীদের মজ্জাগত হিন্দু-বিদ্বেষ যে তাহার ধারণা ও বর্ণনার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তথাপি সমসাময়িক বর্ণনা এবং তখনকার বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে একজন বিদেশীর কিরূপ ধারণা ছিল তাহার নিখুঁত পূর্ণাবয়ব ছবি হিসাবে ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। অনেক বিষয়ে তাঁহার বর্ণনা যে সত্যকে লঙ্ঘন করে নাই এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দেয় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শতবর্ষ পরে আমার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অনেক বিষয়ে তাঁহার বর্ণনা সমর্থন করে। গুরুর নিকট দীক্ষা ও গুরুর প্রতি শিষ্যের আচরণ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা রক্ষণশীল পরিবারে এখনও, অন্ততঃ কিছুদিন পূর্বেও, প্রচলিত ছিল। গুরু শিষ্যের বাড়ীতে আসিলে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিত এবং তিনি তাঁহার দক্ষিণ চরণ তাঁহাদের মস্তকে স্থাপন করিতেন। একজন তাঁহার পাদদ্বয় জলে ধোয়াইয়া দিত, পরে এই জল সকলেই একটু একটু মুখে দিত, বাকী জল সযত্নে রক্ষিত হইত। কয়েকজন তাঁহার অঙ্গে তৈল মাখাইত এবং মস্তকে জল ঢালিয়া স্নান করাইয়া দিত। গুরুর ভোজন হইলে পাত্রে ভুক্তাবশেষ যাহা থাকিত তাহার কিছু কিছু সকলেই খাইত। তারপর শিষ্যের দীক্ষা গ্রহণের পর গুরু তাঁহার কানে বীজ মন্ত্র দিতেন। অতঃপর শিষ্য নিজের সঙ্গতি অনুসারে যথাসাধ্য প্রণামী টাকা বস্ত্র প্রভৃতি দিলে গুরু বিদায় লইতেন। এই দীক্ষা গ্রহণ হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই প্রসঙ্গে মিঃ ওয়ার্ড নিম্নলিখিত কাহিনীটি লিখিয়াছেন।

১৮০৪ সনে হরি তর্কভূষণ নামে ৬০ বৎসর বৃদ্ধ এক ব্রাহ্মণকে মৃত্যুকালে কলিকাতায় গঙ্গাতীরে নেওয়া হয়। তাঁহার শিষ্য উভয়চরণ মিত্র নামে একজন কায়স্থ গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে তিনি কিছু চাহেন কিনা। মুমূর্ষু গুরু বলিলেন আমাকে এক লক্ষ টাকা দেও। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া শিষ্য বলিল তাহার এত টাকা দিবার সাধ্য নাই।

গুরু প্রশ্ন করিলেন তাহার কত আছে। শিষ্য বলিল তাহার প্রায় লাখ টাকার সম্পত্তি আছে কিন্তু নগদ টাকা অত নাই। গুরু বলিলেন ইহার অর্ধেক টাকা আমার পুত্রগণকে দাও। শিষ্য স্বীকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল গুরু আর কিছু চাহেন কিনা। গুরু বলিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র একজোড়া সোনার বালা (মণিবন্ধে পরিবার জন্য) চাহিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা দিতে পারেন নাই। শিষ্যের এক পুত্র পাশে দাঁড়াইয়াছিল—শিষ্য তৎক্ষণাৎ তাহার মণিবন্ধ হইতে সোনার বলয় জোড়া খুলিয়া গুরুপুত্রকে দিল। এইরূপে শিষ্যের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় গুরু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্য কলিকাতায় বিশ হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড জমি এবং নিজের শ্রাদ্ধের জন্য পাঁচ হাজার টাকা চাহিলেন। শিষ্য উভয় দাবিই পূরণ করিলেন। পরদিনই গুরুর মৃত্যু হইল এবং স্ত্রী সহমৃতা হইলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধের খরচ বাবদ শিষ্য আরও পাঁচ হাজার টাকা দিল।

এই বিবরণের উপসংহারে মিঃ ওয়ার্ড (Ward) লিখিয়াছেন যে হিন্দুরা সকলেই এই গুরুকে গালমন্দ করিয়া বলিল যে স্ত্রী সহমরণে না গেলে গুরুর নরক বাস হইত। ইহার কিছুদিন পরে উক্ত শিষ্য উভয়চরণ মথুরায় মারা যান। তাঁহার ব্যবহৃত লাঠি ও খড়ম (clog) সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় তাঁহার স্ত্রী চিতায় আরোহণ করিয়া সতীধর্ম পালন করেন।

ওয়ার্ড আরও লিখিয়াছেন: "আমি শুনিয়াছি যে শিষ্যের অন্ধ ভক্তির সুযোগ লইয়া কোন কোন গুরু শিষ্যের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হন। কোন কোন গুরুর ফৌজদারী অপরাধে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হইয়াছে।"[৮৩]

গুরুর উত্তরাধিকারীরাই বংশানুক্রমে গুরুর পদ অধিকার করিত। গুরুর একাধিক পুত্র থাকিলে অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় গুরুরা শিষ্যবর্গ নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া নিতেন। এইরূপে গুরুগিরি একটি পৈতৃক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে অধিকাংশ গুরুরই এই পদের উপযুক্ত যোগ্যতা ছিল না।

গুরুবাদ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও খুব প্রচলিত ছিল। মিঃ ওয়ার্ড লিখিয়াছেন যে তাঁহার সময়ে (১৮১১ সনে) বাংলা দেশের হিন্দুদের এক পঞ্চমাংশ চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ এবং ছয় গোস্বামীর বংশধরগণ তাঁহাদের গুরু ছিলেন। মিঃ ওয়ার্ড লিখিয়াছেন অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের বংশধরেরা শান্তিপুর, বাগনাপাড়া এবং খড়দহে বাস করেন, গুরুদের মধ্যে তাঁহাদের প্রাধান্য সকলেই স্বীকার করেন এবং বর্তমানে তাঁহারা

অতুল বৈভবের অধিকারী। অসংখ্য যাত্রী তাঁহাদের ভবনে তীর্থযাত্রা করে এবং প্রণামী দেয়। প্রত্যেক বৈষ্ণবের বিবাহের সময় তাঁহারা বর কনে উভয় পক্ষের নিকট হইতে মোট ৩৲ টাকা দক্ষিণা পান এবং উভয়ের সম্মতি ক্রমে তাঁহারা বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি দিলেও তুল্য পরিমাণ দক্ষিণা পান। ইহা আদায় করিবার জন্য নানাস্থানে তাঁহাদের নিযুক্ত লোক থাকে।[৮৪] বৈষ্ণব গুরু ও অন্য কয়েকটি বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (২৮২—২৮৪) যাহা উক্ত হইয়াছে—উনবিংশ শতাব্দীতেও তাহার প্রচলন ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে লৌকিক ধর্মের বিবরণে ওয়ার্ড সাহেব নিম্নলিখিত দেবদেবীর মূর্তি পূজার উল্লেখ করিয়াছেন।

১। রাধা—কৃষ্ণের মূর্তির পাশে ইহার মূর্তি থাকে।

২। পঞ্চানন—শিবের মূর্তি বিশেষ—পঞ্চ-মুখ—প্রত্যেক মুখে তিনটি চক্ষু। মাটির মূর্তি গড়িয়া অথবা একটি প্রস্তরখণ্ডে তৈল মাখাইয়া রং করিয়া প্রায় প্রতি গ্রামে বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের নীচে ইহার পূজা হয়। কোন শিশুর মৃগী রোগ হইলে এই দেবতার পূজা দিলে আরোগ্য হয় এই প্রকার সংস্কার ছিল।

৩। ধর্মঠাকুর (দ্বিতীয় ভাগ, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

৪-৫। কালুরায় ও দক্ষিণ রায় (ঐ, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

৬। কালভৈরব—কুকুরের পৃষ্ঠে নগ্ন, ভস্মাচ্ছাদিত ত্রিনেত্র শিবমূর্তি—এক হস্তে শিঙ্গা অন্য হস্তে ঢাক। বাংলাদেশের অনেক স্থানে এই মূর্তি প্রত্যহ পূজিত হইত। ইনি কাশীধামের বিশ্বেশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ইহা ব্যতীত বর্তমানকালে প্রচলিত শীতলা, মনসা প্রভৃতি বহু পূজাও প্রচলিত ছিল। বৃক্ষ (বট, তুলসী, অশ্বত্থ, বকুল, হরীতকী, আমলকী), পশু-পক্ষী (গরু, হনুমান, শৃগাল এবং বিভিন্ন দেবতার পশু-পক্ষী বাহন), গঙ্গা, আত্রেয়ী, করতোয়া প্রভৃতি নদী, শালগ্রাম শিলা এবং ঢেকি পূজা প্রচলিত ছিল।[৮৫]

তান্ত্রিক উপাসনার কয়েকটি বীভৎস চিত্র ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে আছে। রুদ্রযামল, যোনিতন্ত্র, নীলতন্ত্রগুলিতে যে সমুদয় বিধান আছে, তদনুসারে এগুলির অনুষ্ঠান হইত—প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে শুনিয়া ওয়ার্ড ইহার বিবরণ দিয়াছেন। এই অনুষ্ঠানগুলি সাধারণতঃ চক্র নামে অভিহিত হইত। ওয়ার্ড সাহেবের বিবরণ সংক্ষেপে এই:

"এই অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমে পূজার জন্য একটি স্ত্রীলোক নির্বাচন করিতে হইবে। দক্ষিণাচারীরা নিজের স্ত্রীকে এবং বামাচারীরা, নর্তক, কাপালী,

ধোবা, নাপিত, চণ্ডাল বা মুসলমান জাতীয়া নারী অথবা গণিকাকে আনিয়া একটি আসনে বা মাদুরের উপর বসাইবে। অতঃপর মৎস্য, মাংস, কড়াই শুঁটি, ভাত, মদ্য, মিঠাই, ফুল ও অন্যান্য দ্রব্য আনিবে। প্রথমে মন্ত্র পড়িয়া এই সমুদয় দ্রব্য ও স্ত্রীলোকটিকে শোধন করিবে এবং ইষ্ট দেবতার পূজা করিবে।

যে নারীর পূজা হইল, পূজান্তে সে মৎস্য, মাংস, মদ্য প্রভৃতি ভোগের দ্রব্য প্রথমে আহার করিত, পরে তাহার ভুক্তাবশিষ্ট অন্য সকলে একে অন্যের মুখে পুরিয়া দিত—ইহার মধ্যে কোন জাতি বিচার ছিল না।

"অতঃপর স্ত্রীলোকটিকে নগ্ন করিয়া প্রথমে পুরোহিত ও পরে অন্যান্য সকলে প্রকাশ্যে উল্লিখিত শাস্ত্র সমূহের বিধান অনুযায়ী যাহা যাহা করিত তাহা এতই অশ্লীল যে লিপিবদ্ধ করা যায় না। যে সমুদয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত আমাকে এই বিবরণ দিয়াছেন তাঁহারা বলিতে বলিতে পুনঃ পুনঃ থামিয়া ঢোক গিলিয়া কোন মতে এই বীভৎস কাহিনীর বর্ণনা শেষ করেন।"[৮৬]

ওয়ার্ড অবধূত ব্রহ্মচারীদের 'পূর্ণাভিষেকের' এইরূপ বীভৎস অনুষ্ঠানও বর্ণনা করিয়াছেন।[৮৭]

উপসংহারে ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, এইরূপ অনুষ্ঠানের সংখ্যা ও বীভৎসতা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এগুলি গোপনে হইলেও ইহা যে ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতির মধ্যে ক্রমশঃ বাড়িতেছে ইহা সকলেই জানে। শাস্ত্রের মন্ত্র ও বিধান যথাযথভাবে কম লোকেই অনুসরণ করে—অধিকাংশই এই সমুদয় অনুষ্ঠান মৎস্য, মাংস, মদ্য ও মৈথুন প্রভৃতি সম্ভোগের উপলক্ষ্য বলিয়াই মনে করে।

তান্ত্রিক পূজার আর একটি অঙ্গ নরবলিও যে প্রচলিত ছিল কয়েকটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া ওয়ার্ড সাহেব তাহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[৮৮]

ওয়ার্ড সাহেব কয়েক প্রকার স্বেচ্ছামৃত্যুর বিবরণ দিয়াছেন। কুষ্ঠ প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি, দুর্দশা, সামাজিক ঘৃণা প্রভৃতির হাত হইতে এড়াইবার জন্য কেহ কেহ আগুনে পুড়িয়া বা জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিত। নদীয়ার নিকটে ক্ষীরগ্রামে একপ্রকার অর্ধচন্দ্রাকৃতি খড়্গের সাহায্যে নিজের গলা কাটিয়া মৃত্যুবরণের কাহিনী ওয়ার্ড লিখিয়াছেন। গঙ্গায় শিশুসন্তান বিসর্জন ছাড়াও পূর্ব বঙ্গে অসুস্থ শিশুকে 'ভূতে পাইয়াছে' মনে করিয়া ঝুড়িতে ভরিয়া তিন দিন গাছের ডালে ঝুলাইয়া রাখা হইত। ইহার ফলে প্রায়ই শিশুর মৃত্যু হইত।[৮৯]

ওয়ার্ড সাহেব বাংলায় বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা

সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি : ২০

বৈরাগী : "অধিকাংশ বৈরাগীই চৈতন্য-সম্প্রদায়-ভুক্ত। তাহাদের অধিকাংশের সঙ্গেই একজন করিয়া বোষ্টুমী থাকে গোঁসাইরা মালা বদল করিয়া ইহাদের বিবাহ দেন। অনেক বোষ্টুমীই অসচ্চরিত্রা। ইহারা গান গাহিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। (দ্বিতীয় ভাগ ৩৭১ পৃঃ)।

এই বর্ণনার সমর্থনে আমার বাল্যকালের একটি কাহিনী মনে পড়ে। আমাদের বাড়ীতে একজন নমঃশূদ্র চাকর ছিল। এক নাপিতের বিধবা কন্যাকে লইয়া সে পলাইয়া যায়। ২।৩ বছর পরে এই দুইজন তিলক কাটিয়া বৈরাগী বোষ্টমরূপে আমাদের গ্রামে আসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিত। কোন ভদ্র গৃহস্থ যে তাহাদের অতীত জীবনের কথা মনে করিয়া তাহাদের ঘৃণা করিতেন বা তাহাদের প্রতি বিরূপ ছিলেন এরূপ মনে হয় না।

শৈব সন্ন্যাসী : ইহারা গায়ে ভস্ম মাখিয়া কৌপীন পরে এবং গায়ের উপর একখানি রঙীন কাপড় জড়াইয়া রাখে। ইহাদের ময়লা চুল জটা পাকাইয়া অনেক সময় প্রায় পায়ের গোড়ালিতে পৌঁছে—তবে এগুলি অনেক সময়ই কৃত্রিম পরচুলা মাত্র। কেহ কেহ হাতে শূকরের দাঁত বান্ধে। কেহ কেহ উলঙ্গ হইয়াই ঘোরে। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণী বিবাহ করে না, মৎস্য, মাংস আহার করে না এবং তৈল মাখে না। বাংলা দেশে শৈব সন্ন্যাসীর সংখ্যা অনেক বেশী, কিন্তু বৈরাগীদের অপেক্ষা তাহাদের আদর বা সম্মান অনেক কম। (দ্বিতীয় ভাগ, ৩৭১ পৃঃ)।

ইহা ছাড়া আরও কয়েক শ্রেণীর সন্ন্যাসী ছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব বেশী নহে। ইহাদের মধ্যে দণ্ডী ও পরমহংস বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিল। ইহা ছাড়া মৌনী ও ঊর্ধবাহু সন্ন্যাসীও বাংলায় কিছু কিছু দেখা যাইত। দণ্ডীদের হাতে লাঠি থাকিত, তাহারা কেশ ও শ্মশ্রু রাখিত না, কৌপীন ও রক্ত বস্ত্রের উত্তরীয় পরিত; মৎস্য, মাংস, তৈল ও সিদ্ধ চাউল বর্জন করিত এবং গঙ্গামাটি গায়ে মাখিয়া স্নান করিত। তাহারা ভিক্ষা বা রন্ধন করিত না—ব্রাহ্মণের গৃহে সম্মানিত অতিথি হইয়া ভোজন করিত। বিষ্ণুর ধ্যান ও জপে তাহারা সর্বদাই নিযুক্ত থাকিত। পরমহংসগণ সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতেন, কোন বস্ত্র পরিধান করিতেন না, এবং মৌনী হইয়া তীর্থস্থানে বাস করিতেন। কালীঘাটে কয়েকজন পরমহংসের কথা ওয়ার্ড লিখিয়াছেন। ইহারা ভিক্ষা চাহিতেন না স্বেচ্ছায় যে যাহা দিত তাহা খাইয়াই জীবন ধারণ করিতেন। ইহা ছাড়া ও

একদল মৌনী সাধু ছিলেন—তাঁহারা কৌপীন পরিতেন, গায়ে ছাই মাখিতেন এবং গঙ্গাতীরে দুগ্ধ, ফল, মূল প্রভৃতি আহার করিতেন। লোকে এসকল স্বেচ্ছায় দান করিত—এবং প্রয়োজন হইলে শিষ্যগণ ভিক্ষা করিত। কিন্তু মৌনীবাবা কখনও কথা বলিতেন না। উর্ধবাহুগণ সর্ব্বদাই দক্ষিণ হস্ত উঁচু করিয়া রাখিতেন—কেহ চিরকালের জন্য কেহবা নির্দিষ্টকালের জন্য এইরূপ থাকিবেন এইরূপ ব্রত গ্রহণ করিতেন। ব্রতকাল শেষ হইলে বিষ্ণু পূজা করিয়া সন্ন্যাসীদের প্রধানকে দক্ষিণা দিতেন। ওয়ার্ড বলেন যে হিন্দু বাঙ্গালীর আট ভাগের এক ভাগ লোক এই প্রকার সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে।

বর্তমানকালের ন্যায় গঙ্গাসাগরে এবং নানা যোগে অর্থাৎ পুণ্য তিথিতে কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে দূর দূরান্তর হইতে যাত্রীরা গঙ্গা স্নান করিতে আসিত।

ওয়ার্ড সাহেব বহু ধর্মোৎসব ও ব্রতের এবং উপবাস, দান ও পুণ্য কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা করা, অতিথি সেবা, পথের ধারে পুকুর কাটা ও গাছ লাগান, জলসত্র, ব্রাহ্মণকে দান প্রভৃতি পুণ্য কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। শ্রীরামপুরের গোলকচন্দ্র রায় প্রত্যহ ২৫০ জন পথিক ও সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইতেন। কথিত আছে যে ইহার জন্য প্রতি বৎসরে তিনি ৫০,০০০ টাকা ব্যয় করিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে খ্রীষ্টান মিশনারী (মিঃ ওয়ার্ড ও অন্যান্য ইংরেজ লেখকগণ) হিন্দু ধর্মের সম্বন্ধে যে সমুদয় কুৎসা প্রচার করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক ভুল, ভ্রান্তি ও অতিরঞ্জন থাকিলেও প্রকৃত তথ্যও অনেক আছে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রকাশিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার উল্লেখ করা যায়। ইহার গ্রন্থকারের নাম ব্রজমোহন—কিন্তু অনেকে মনে করেন যে রামমোহন রায় নিজেই ছদ্মনামে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাতে পূজা পার্বণ উপলক্ষে স্ত্রীলোকদের সাক্ষাতে অতিশয় অশ্লীল ভঙ্গীতে নৃত্যসহ অশ্রাব্য ভাষায় সঙ্গীত, হোলি, ঝুলন-যাত্রা, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মুসলমান বাইজীর গীত ও নৃত্য, গঙ্গার ঘাটে পুরুষদের দৃষ্টিগোচরে যুবতীদের স্নান, এবং প্রধানতঃ নিম্নজাতীয়দের মধ্যে প্রচলিত কালু রায়, দক্ষিণ রায়, ওলাবিবি প্রভৃতির পূজার উল্লেখ করা হইয়াছে।[৩১]

এই প্রসঙ্গে বামাচারী শাক্ত, অঘোরপন্থী শৈব, ও এই শ্রেণীর অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের বীভৎস অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী অথবা সমসাময়িক বিশ্বস্ত হিন্দু

বিবরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেও যে এই জাতীয় অনুষ্ঠান একেবারে অপ্রচলিত হয় নাই তাহারও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে।

বাংলাদেশে উনিশ শতকে ধর্মে যে বিষম গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশ্যক।

প্রথমতঃ, ধর্মের নামে এই প্রকার বীভৎসতা বহু বৎসর পূর্ব হইতেই এবং কেবল বাংলাদেশে নহে ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ পশ্চিম ভারতের বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সম্প্রদায়ের গুরু—মহারাজ অথবা গোকুলস্থ গোঁসাই নামে অভিহিত হইতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে একখানি সংস্কৃত নাটকে এই সমুদয় গুরুদের সহিত তাহাদের শিষ্যাদের যে সম্ভোগ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা অবিশ্বাস্য বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু স্বামী নারায়ণ নামে একজন সংস্কারক (১৭৮১-১৮৩০) এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে যে তুমুল আন্দোলন করেন তাহাতে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ থাকে না। কচ্ছদেশে ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ম্যাকমার্ডো (McMurdo) ১৮২০ সনে লিখিয়াছেন যে ভাটিয়া সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত লোকেরাও তাহাদের স্ত্রী ও কন্যারা গুরু মহারাজের সঙ্গে সহবাস করিলে নিজদিগকে সম্মানিত মনে করেন। হয়ত এই সমুদয় কেহই পুরাপুরি বিশ্বাস করিত না। কিন্তু এই গুরু মহারাজেরা এক মানহানির মোকদ্দমা আনিলে ১৮৬২ খ্রীঃ বোম্বে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সার জোসেফ আর্নল্ড (Sir Joseph Arnold) যে রায় দেন তাহাতে শিষ্যাদের সহিত গুরুদের ব্যভিচার কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মন্তব্য করেন। একজন গণ্যমান্য সাক্ষী বলেন যে তিনি এই ব্যভিচার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কারণ চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কিছু টাকা দক্ষিণা দিলেই ভক্তকে ইহা দেখিবার সুযোগ দেওয়া হয়। মোকর্দমার এই রায় বাহির হইলে কোন সংবাদপত্রে লেখা হইয়াছিল, যে ইহার ফলে বল্লভাচার্য সম্প্রদায় লোপ পাইবে এবং কৃষ্ণ-গোপী মূলক বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিপত্তিও খুব হ্রাস পাইবে। কিন্তু কার্যতঃ ইহার কিছুই হয় নাই।[২২]

দ্বিতীয়তঃ, উনিশ শতকের প্রথম ভাগে সুরা পান, স্ত্রী-সংসর্গ প্রভৃতি বিষয়ে বর্তমানকালের নীতি ও আদর্শ বিশিষ্ট হিন্দুদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল না। রামমোহন রায় সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনিও 'কুলার্ণব' ও 'মহানির্বাণ-তন্ত্রে'র বচন উদ্ধৃত করিয়া 'সংস্কৃত মদ্যপানে' দোষ নাই

এবং যে ইহা দোষ মনে করিয়া নিন্দা করে তাহার মহাপাতক হয়—ইহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ইহাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "তন্ত্রোক্ত শৈব বিবাহের দ্বারা বিবাহিতা যে স্ত্রী সে বৈদিক বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য গম্যা হয়। শৈব বিবাহের বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই কেবল সপিণ্ডা না হয় এবং সভর্তৃকা না হয় তাহাকে শিবের আজ্ঞাবলে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেক।" ইহার যুক্তি স্বরূপ তিনি বলেন "বৈদিক বিবাহের স্ত্রী……যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হয় তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী সে পত্নীরূপে গ্রাহ্য কেন না হয়?" ৯৩

অনুরূপ যুক্তি বলে অনেক কদাচারকেই সমর্থন করা যায়। অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থে মদ্যপান ও পরস্ত্রীগমন সম্বন্ধে এমন সমুদয় বচন আছে যে তাহার উল্লেখ করা বর্তমানকালে রুচিসঙ্গত হইবে না। সুতরাং সে যুগের সাধারণ লোকে যে বেদের বহু পরবর্তীকালের তন্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের দোহাই দিয়া 'মদ্য, মাংস মৈথুনের' বিষয়ে যথেচ্ছাচার করিবে ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। 'শিব প্রোক্ত' বাণী যদি গ্রাহ্য হয় তবে বৈষ্ণব গ্রন্থে অনুমোদিত কার্যাবলীই বা দোষের হইবে কেন? অথচ রামমোহন ইহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।৯৪

তৃতীয়তঃ, যদিও কর্তাভজা, বল্লভাচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিবরণ হইতে সে কালের ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে গভীর অশ্রদ্ধার উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে—তথাপি এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অনেক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও ছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।৯৫ নিত্যানন্দের দশম অধস্তন বংশধর, রঘুনন্দন গোস্বামী, ১৭৮৬ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাম-সীতার কাহিনী মূলক 'রামরসায়ণ' নামে মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে 'গৌরাঙ্গচম্পূ', 'গীতমালা' নামে কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে ৪৩৯টি গীতিকবিতা, এবং রাধার প্রণয় অবলম্বনে ৩৪ সর্গে বিভক্ত আর একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। ইহাতে কবিত্ব শক্তি ও মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

অদ্বৈতের বংশধর রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া দেশীয় ও ইংরেজ পণ্ডিতদের সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। স্মৃতি, ন্যায় ও দর্শনে তাঁহার অপূর্ব পাণ্ডিত্য ছিল এবং ১৮০২ খ্রীঃ তিনি 'তত্ত্ব-সংগ্রহ' নামে প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বৈষ্ণব ধর্মের সম্বন্ধে তিনি 'কৃষ্ণতত্ত্বামৃত', 'কৃষ্ণভক্তি-রসোদয়', 'কৃষ্ণভজনক্রম-সংগ্রহ'

এবং 'কৃষ্ণার্চনদীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন।

হেষ্টিংসের দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ইংরেজ কোম্পানির অধীনে উচ্চ চাকুরী করিতেন। কিন্তু বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া ৩০ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে যান। সেখানে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি কৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিদিন বৈষ্ণব ভোজন করাইতেন—ইহাতে বার্ষিক ২২ হাজার টাকা ব্যয় হইত। ৪০ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া গোবর্ধনের সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজীর শিষ্য হন এবং সাধু সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন। লালাবাবু নামে তিনি এখনও বাংলাদেশে সুপরিচিত। ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে বহু বাঙ্গালী বৈষ্ণব মথুরা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আদর্শ বৈষ্ণব সাধুর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া তিন শত বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্যের প্রতিষ্ঠিত এই বৈষ্ণব কেন্দ্রের খ্যাতি ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের গৌরব সূচিত করে।

পাদটীকা

১। বিভিন্ন মতের সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলির জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য: (১) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—রামমোহন রায়, পৃ: ১২। (২) *The Life and Letters of Raja Rammohan Roy*, by S. D. Collet, Edited by Dilip Kumar Biswas and Prabhat Chandra Ganguli পৃ: ১।

২। ব্রজেন্দ্র—২৪ পৃ।

৩। ব্রজেন্দ্র—৫৪ পৃ।

৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—২৭ পৃ।

৫। ঐ—২৮।২৯ পৃ।

৬। ঐ—৩১ পৃ।

৭। ঐ—৩৬ পৃ।

৮। ঐ—৩৯ পৃ।

৮ (ক)। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—কেশবচন্দ্র সেন—৩৭।৩৮ পৃ।

৯। ১৯১০ সনে মাঘোৎসব উপলক্ষে শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা। G. C. Banerjee প্রণীত *Keshub as seen by his Opponents* গ্রন্থের ১১৪ পৃ দ্রষ্টব্য।

১০। প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার *"The Life and Teachings of Keshub Chander Sen"* গ্রন্থে কেশবচন্দ্রের উপর রামকৃষ্ণের প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন। "And now the sympathy,

friendship and example of the Paramhansa converted the Motherhood of God into a subject of special culture with him" (২২৮-২৯ পৃ)। প্রতাপচন্দ্র আরও বলেন যে "ইহার ফলে হিন্দুসমাজে কেশবের ধর্মমত জনপ্রিয় হইয়া ওঠে এবং 'আর্যনারী' সমাজ" নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়—এখানে কেশবের ও প্রতিবেশী পরিবারের নারীগণ ধর্মসাধনা করেন।"

১০ ক। G. S. Leonard প্রণীত *A History of the Brahmo Samaj* নামক সমসাময়িক গ্রন্থে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য (pp. 284-293)

১১। শ্রীগিরিশ চন্দ্র নাগ—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার মহত্ত্ব, ১৩৯ পৃ।

১২। ঐ ১৪২-১৪৮ পৃ।

১৩। ঐ ১৪৯ পৃ।

১৪। ১০ পাদটীকায় উল্লিখিত গ্রন্থের ২৪১—৪২ পৃ দ্রষ্টব্য। রামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের উল্লেখ করিয়া প্রতাপচন্দ্র বলিয়াছেন: "This strange eclecticism suggested to Keshub's appreciative mind the thought of broadening the spiritual structure of his own movement."

১৫। গিরিশ, ১৬১-১৬৭ পৃ।

১৬। বাগল—দেবেন্দ্র নাথ, ৭২-৩ পৃ।

১৭। ৯ পাদটীকায় উল্লিখিত গ্রন্থ, ১১৫-১৬ পৃ।

১৮। ঐ, ১১১-১২১ পৃ।

১৯। P. Thomas, *Christians and Christianity in India and Pakistan* (George Allen and Unwin, 1954) p. 182.

২০। Rammohan Roy's Works (Panini Office Edition) pp. 145-6

২১। Reverend Alexander Duff, *India and Indian Missions* (Quoted in *History & Culture of the Indian People*, Vol. X, p. 155).

২২। *The Calcutta Journal*, 11 March, 1822.

২৩। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা,—২য় ভাগ—১৭৩-৪ পৃ।

২৪। স্বামী সারদানন্দ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—২য় খণ্ড, ৪২ পৃ (এই গ্রন্থ পরবর্তী পাদটীকাগুলিতে "লীলা প্রসঙ্গ" নামে অভিহিত হইবে।)

২৫। ঐ, ১০৭-৮ পৃ।

২৬। ঐ, ১১০ পৃ।

২৭। ঐ, ১২৬ পৃ।

২৮। ঐ, ২৮৮ পৃ।

২৯। ঐ, ৩০০ পৃ।

৩০। ঐ, ৩৬১ পৃ।

৩১। ঐ, ৩৬২-৩ পৃ।

৩২। ঐ, [illegible] পৃ।

৩৩। ঐ, ৩৬৬-৭ পৃ।

৩৪। ঐ, ৩০৩ পৃ।

৩৫ , পঞ্চম খণ্ড, ২২৩-৫ পৃ।

৩৬। ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯ পৃ।

৩৭। ঐ, ৩৫১ পৃ।

৩৮। অতঃপর দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের যে কয়টি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেইগুলি এবং অনুরূপ আরও বহু উক্তি নিম্নলিখিত দুইটি গ্রন্থে আছে :

১। শ্রীসুরেশ চন্দ্র দত্ত—পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি (ইহার প্রথম ভাগ ১৮৮৪ অব্দে ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৬ অব্দে পরমহংসের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত হয়। পরে ইহার পরিবর্দ্ধিত বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে)।

২। শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) কথিত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (৫ খণ্ড)।

৩৯। লীলাপ্রসঙ্গ—তৃতীয় খণ্ড, ১৪৫ পৃ।

৪০। শ্রীপ্রমথ নাথ বসু—স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম খণ্ড) ১৪৭ পৃ (এই গ্রন্থ অতঃপর 'বিবেকানন্দ' নামে অভিহিত হইবে।

৪১। লীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৯০ পৃ।

৪২। ঐ, পঞ্চম খণ্ড, ৮ পৃ।

৪৩। ঐ ১৮ পৃ।

৪৪। ঐ, ২২২ পৃ।

৪৫। নরেন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনা—'বিবেকানন্দ' গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

৪৬। লীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ড, ৬৫ পৃ।

৪৭। বিবেকানন্দ—প্রথম খণ্ড, ১০৩ পৃ।

৪৮। ঐ, ১০৯ পৃ।

৪৯। ঐ, ১১৮-৯ পৃ।

৫০। ঐ, ১৩৭ পৃ।

৫১। ঐ, ১৪৫ পৃ।

৫২। ঐ, ১৬০ পৃ।

৫৩। ঐ, ২৩৮ পৃ।

৫৪। ঐ, ২৫৮ পৃ।

৫৫। ঐ, ১৮৭ পৃ।

৫৬। ঐ, ৩৪০ পৃ।

৫৭। স্বামীজির আমেরিকা যাইবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল, এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা "*Swami Vivekananda—A Historical Review*" by Dr. R. C. Majumdar." গ্রন্থে আছে।

৫৮। ধর্মমহাসভায় অধিবেশনে স্বামীজি যে সমুদয় বক্তৃতা করেন তাহার বঙ্গানুবাদ উদ্বোধন কার্যালয় হইতে "স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা" নামে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

৫৯। ধর্মমহাসভায় স্বামীজির বক্তৃতাগুলির মর্ম এবং এ সম্বন্ধে আমেরিকায় যে সমুদয় মতামত প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে আছে :

১। R. C. Majumdar, *Swami Vivekananda—A Historical Review*, pp. 38-50, Calcutta, 1965.

২। Burke, Marie Louise, *Swami. Vivekananda in America : New Discoveries*, Calcutta, 1958.

৩। Nikhilananda Swami, *Vivekananda : a Biography*, New York, 1953.

৬০। পত্রাবলী (উদ্বোধন কাযালয় হইতে প্রকাশিত—১৩৪১ বাংলা সন) দ্বিতীয় ভাগ, ১০১-২ পৃ।

৬১। ঐ, ১১০-১১২ পৃ।

৬২। ঐ, ১১৫-১১৭ পৃ (মূল চিঠির কোন কোন অংশ ইংরেজীতে লেখা—তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।)

৬৩। ঐ, ১৫৭ পৃ।

৬৪। *Lectures from Colombo to Almora.*

৬৫। বিবেকানন্দ, চতুর্থ খণ্ড, ৭২২-৭২৫ পৃ।

৬৬। ইহার বিস্তৃত বিবরণীর জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য : Swami Gambhirananda, *History of the Ramakrishna Math and Mission*. Advaita Ashrama, Calcutta, 1957.

৬৭। বিস্তৃত বিবরণের জন্য অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—প্রথম ভাগ, ১৫২-১৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য (পরবর্তী পাদটীকাগুলিতে এই গ্রন্থ 'উপাসক' নামে উল্লেখ করা হইবে।)

৬৭ (ক) কাহারও মতে 'কৈবর্ত' (*JAS*, 1966, p 244).

৬৭ (খ) ঐ।

৬৮। বিনয় ঘোষ প্রণীত "সাময়িক পত্রে সমাজচিত্র", চতুর্থ খণ্ড, ৬৯৮—৭০০ পৃঃ দ্রঃ। পরবর্তী পাদটীকাগুলিতে এই গ্রন্থ 'বিনয়' ও খণ্ড সূচক অঙ্ক দ্বারা উল্লেখ করা হইবে।

৬৯। বিনয়, ১। ১১৫-১৭ পৃ।

৭০। ঐ, ৪। ৬৯৯ পৃ।

৭১। 'উপাসক', ১৫৭ পৃ।

৭২। বিনয়, ২। ৩৪৩ পৃ।

৭৩। 'উপাসক,' ১৬৫ পৃ।

৭৪। ঐ, ১৮৬-৯ পৃ।

৭৫। ঐ, ১৭৫ পৃ।

৭৬। ঐ, ১৭৭ পৃ।

৭৭। ঐ, ১৮০ পৃ।

৭৮। বিনয়, ২। ৫৭৫ পৃ।

৭৯। *Journal of the Asiatic Society*, 1833, Vol. 2.

৮০। Buckland, C. F., *Bengal under the Lieutenant Governors*, pp. 32, 177. R. C. Majumdar, *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, pp. 69-70.

৮১। বিনয় ঘোষ, পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি, ১০৭ পৃ।

৮২। Ward, W., *A View of the History, Literature and Mythology of the Hindoos*. Serampore, 1818.

৮৩। ঐ, ২। ২৫৪ পৃ।

৮৪। ঐ, ২। ১৭৫ পৃ; Wilson, H. H., *An Account of the Religious Sects of Hindus* (1832), p. 107.

৮৫। Ward ২। ১৯৫-২২৪ পৃ।

৮৬। ঐ, ২। ১৯৩পৃ।

৮৭। ঐ, ২। ২৯৫-৬ পৃ।

৮৮। ঐ, ২। ২৬১ পৃ।

৮৯। ঐ, ২। ৩১৩ পৃ।

৯০। ঐ, ২। ৩৭১ পৃ।

৯১। *J.A.S.* Vol. VIII, 1966, No. 4, p. 245.

৯২। ঐ, ২৪১-২৪২ পৃ। বিস্তৃত বিবরণের জন্য *History of the sect of Maharajas of Vallabhacharyas in Western India* দ্রষ্টব্য।

৯৩। "চারি প্রশ্নের উত্তর" (সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ) ১৮-১৯ পৃ। "পথ্যপ্রদান", ১৩১।

৯৪ "গোস্বামীর সহিত বিচার", ৫১ পৃ; "পথ্যপ্রদান" ১৩১-১৪০ পৃ।

৯৫। বিস্তৃত বিবরণের জন্য *JAS*, 1966, pp. 242-43 দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়

সমাজ

পলাশির যুদ্ধের পর দুইশত বৎসরের মধ্যে বাংলার হিন্দু সমাজে কয়েকটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। ইহার পূর্বে পাঁচ ছয় শত বৎসরে স্বাভাবিক বিবর্তন ও মুসলমান আক্রমণের ফলে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, ইংরেজী শিক্ষা ও তজ্জনিত পাশ্চাত্য ভাব ও সামাজিক রীতিনীতির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে পূর্বোক্ত দুইশত বৎসরের পরিবর্তন তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ ১২০০ সনের হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির সহিত ১৭৫৭ সনের হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির যে প্রভেদ দেখা যায়, ১৭৫৭ সনের হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি হইতে ১৯৫৭ সনের হিন্দু সমাজের ও সংস্কৃতির প্রভেদ তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে বেশী। কেহ কেহ মনে করেন যে মধ্যযুগে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে এই দুই পৃথক সংস্কৃতি লুপ্ত হইয়া এক 'নব ভারতীয়' সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। ইহা সত্য হইলে বলিতে হইবে যে সেই তথাকথিত ভারতীয় সংস্কৃতির অস্তিত্বও আজ আর নাই। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সহিত সমন্বয়ে আর এক সম্পূর্ণ নূতন সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহা হিদু নহে, মুসলমান নহে, ভারতীয় নহে—কিন্তু এই তিনের সহিত পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে এক আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি। হাস্যকর হইলেও এরূপ প্রস্তাব যে পূর্বোক্ত 'নব ভারতীয়' সংস্কৃতিরূপ মতবাদ হইতে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত এবং অধিকতর তথ্যবহুল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ এবং তাহাদের অনুজীবি, অনুগত, অন্ধভক্ত ও পৃষ্ঠপোষকেরা ব্যতীত আর কেহই তাহা অস্বীকার করিবে না। বস্তুতঃ 'নব ভারতীয়' সংস্কৃতি বর্তমান রাজনীতিকদের সৃষ্ট একটি মতবাদ মাত্র—ইহার অস্তিত্ব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র সত্তা কোন দিনই লোপ হয় নাই; মুসলমান সংস্কৃতিও ভারতে আসিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয় নাই; যদিও বহুদিন এক দেশে একত্র বসবাসের ফলে উভয়েরই উভয়ের দ্বারা কম বেশী প্রভাবান্বিত হইয়াছে এবং গত দুই শত বৎসর পাশ্চাত্য সংস্কৃতি উভয়ের উপরেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিলেও উভয়েরই স্বতন্ত্র মূল কাঠামো বজায় আছে।

সুতরাং এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ মধ্যযুগের ইতিহাসের ন্যায় এই খণ্ডে আধুনিক যুগের আলোচনায় হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম ও সমাজ পৃথকভাবে আলোচিত হইবে। পাশ্চাত্য প্রভাবে হিন্দু সমাজেই গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে সুতরাং তাহাই প্রধানতঃ এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

১। নাগরিক সমাজ

বর্তমান যুগে নাগরিক ও গ্রাম্য সমাজের মধ্যে একটি অলঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে। নাগরিক সমাজ প্রধানতঃ কলিকাতাকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উনিশ শতকেই ইহা একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ নীচ নানা জাতি ও স্তরের বিভিন্নতার উপর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির নূতন রীতি এবং ইংরেজ শাসনের নূতন আদর্শের প্রভাবে পূর্বেকার উচ্চ, নীচ জাতি ও শ্রেণীর প্রভেদ ও বৈষম্য ঘুচিয়া এখন নূতন নূতন সামাজিক স্তর গড়িয়া উঠিয়াছে। জমিদারী প্রথার ফলে এক নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থই পরমার্থ, এই পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শিল্প-বাণিজ্যের ফলে যে সমুদয়—প্রধানতঃ সুবর্ণবণিক গোষ্ঠির অন্তর্গত—ধনশালী লক্ষপতি বা ক্রোড়পতির উদ্ভব হইয়াছে তাঁহারাও এক নূতন অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইংরেজী শিক্ষা ও তাহার ফলে যে একদল বড় বড় সরকারী চাকুরী পাইয়াছেন বা অন্য কোন নূতন ভাবে জীবিকা অর্জনের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন, জমিদারদের অধীনস্থ কর্মচারী ও মধ্যস্বত্বভোগীগণ[১] এবং ব্যবসায় ও শিল্প-বাণিজ্যের দ্বারা লক্ষপতি না হইলেও মোটামুটিভাবে যাহারা স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন—এই সমুদয় মিলিয়া এক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে।[২]

নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধানতঃ কলিকাতা শহরেই প্রথম স্পষ্ট রূপ ধারণ করে। ছোটখাট ব্যবসায়ী এবং প্রধানতঃ চাকুরীজীবিরাই ছিল এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেরুদণ্ড। চাকুরীর মধ্যে শিক্ষকতা এবং সওদাগরী ও সরকারী, বেসরকারী অফিসের উচ্চ-নীচ শ্রেণীর কেরানীরাই ছিল প্রধান। 'সরকার' নামে এক শ্রেণীর লোক দেশীয় ধনী ও বিদেশীয় পরিবারের সাংসারিক সকল রকম কেনা কাটার কাজ করিত—এবং এদের মাসিক বেতন সাধারণ কেরানীদের সমান হইলেও 'ন্যায্য' দস্তুরী এবং 'অন্যায্য' অনেক উপায়ে বহু অর্থ উপার্জন করিত। আমার বাল্যকালে এদেশীয় এক হাইকোর্টের জজের সরকার আমাদের বাড়ীর

নিকট থাকিতেন। তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ১৫ টাকা কিন্তু সাংসারিক ব্যয় ছিল অন্তত দুইশত টাকা—ইহা ছাড়াও তাঁহার স্ত্রীর গাত্রে বহু স্বর্ণ অলঙ্কার শোভা করিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ও আয় অনেক বেশী ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

ইংরেজী শাসন প্রণালীর পরিবর্তনে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলে, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সদরআলা, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির সৃষ্টি হওয়ায় মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্প্রসারণ হইল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আনুকূল্যে নগরে একটি নিম্ন মধ্যবৃত্তিরও উদ্ভব হইল। খুচরা ব্যবসায়ী, ছোট ছোট দোকানদার, নানা রকম ছোটখাট শিল্পের সাহায্যে জীবিকা অর্জনকারী, ছোটখাট মুদ্রা যন্ত্রের চালক ও মালিক, ধনীর অধীনস্থ কর্মচারী প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। ইহাদের নীচে ছিল পারিবারিক ভৃত্য, কুলি, মজুর, দপ্তরী প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণী। কারখানা শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক মজুর প্রভৃতি সংখ্যাবহুল এক শ্রেণী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইল। গ্রামে কৃষি বা কুটিরশিল্প দ্বারা জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা না হওয়াতে দলে দলে লোক ক্রমশঃ এই সব কার্যের লোভে শহরে আসিতে আরম্ভ করিল। গ্রামের তুলনায় শহরে জীবনযাত্রার উপায় সহজলভ্য হওয়ায়, গ্রামবাসীর সংখ্যা কমিল এবং নগর ও নগরবাসীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। বাঙ্গালীর সমাজ ও আর্থিক অবস্থার উপর ইহার যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল—তাহার পূর্ণ বিকাশ হইল বিংশ শতাব্দীতে। ইহার ফলে ধীরে ধীরে সবার অলক্ষ্যে যে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজ ছিল গ্রাম ও পরিবারকেন্দ্রিক তাহা পুরাপুরি নগর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইয়া উঠিল। ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি আচার ব্যবহারের যে সমুদয় পরিবর্তন পরে বিবৃত হইবে গ্রাম হইতে নগরের প্রাধান্য তাহার একটি মুখ্য কারণ। মুসলমান সমাজের এই পরিবর্তন কখনও খুব গুরুতর হয় নাই।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে সহজেই বোঝা যাইবে যে গ্রাম্য সমাজের গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছিল এবং এই পরিবর্তনের কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ, নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় চাকুরীজীবি, সুতরাং কলিকাতা ও অন্যান্য শহরের দিকেই তাহাদের আকর্ষণ বাড়িল ও গ্রামের বাস ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল। প্রথম প্রথম শিক্ষিতেরা চাকুরীস্থলে থাকিতেন—স্ত্রী ও পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে গ্রামে বাস করিতেন—দুর্গাপূজা বা অন্য উৎসব উপলক্ষে তাঁহারা গ্রামে আসিতেন। ক্রমে ক্রমে, অনেকটা পাশ্চাত্য প্রভাবে, স্ত্রীর মর্যাদা ও

সাংসারিক প্রতিষ্ঠার উন্নতি হওয়ায়, চাকুরীজীবিরা সস্ত্রীক শহরে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে গ্রামের সহিত সম্পর্ক কমিতে লাগিল এবং একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিল। এই দুইটি গুরুতর পরিবর্তনের সূচনা হয় উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথম হইতে ইহা বাংলার সামাজিক জীবনে বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়া ওঠে।

দ্বিতীয়তঃ, অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীদের কুটিরশিল্প ধ্বংস হওয়ায় ফলে কুলগত বৃত্তি লোপ পাওয়ায় অনেকে জীবিকা অর্জনের জন্য শহরে যাইতে বাধ্য হয়—কারণ ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মজুর শ্রেণীর পক্ষে এক কৃষি কার্যের উপর নির্ভর করিয়া সংসার চালান ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া ওঠে। ছোটখাট যে সকল শিল্প গ্রামে ছিল—শহরের সাহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবের ফলে শহর হইতেই তাহার আমদানি বেশী হইত—সুতরাং জীবিকা নির্বাহের পক্ষে তাহার যথেষ্ট চাহিদা গ্রামে ছিল না। যখন উচ্চ নীচ এই উভয় শ্রেণী গ্রাম হইতে শহরে যাইতে আরম্ভ করিল—তখন তাহাদের স্থান অধিকার করিল ভূমি ও শাসন সংক্রান্ত নূতন দুই সম্প্রদায়—অর্থাৎ জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার, গোমস্তা, দারোগা, পাইক, পিওন, শিক্ষক প্রভৃতি মধ্যবিত্ত এবং চৌকিদার, দফাদার, কনেষ্টবল এবং ইহাদের ভৃত্য ও অনুগ্রহজীবি প্রভৃতি নিম্নবিত্ত। এইভাবে গ্রাম্য সমাজের শিক্ষা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, স্বাস্থ্য, উৎসব, আমোদ, প্রমোদ প্রভৃতির রূপান্তর হইল—এবং সাধারণভাবে বলিতে গেলে, সব দিক দিয়াই অবনতি ঘটিল। ইহার ফলে শিল্পজীবি ও কৃষকদের যে দুরবস্থা হয় তাহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব বাংলার সমাজে যে অস্তিনবত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল সমসাময়িক পত্রিকাতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ১৮২৯ সনের 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :—

"যে সকল লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে। এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অতাল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতিবর্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক।"

প্রধানতঃ বাঙ্গালীর ধনবৃদ্ধিই যে এই নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের কারণ তাহার উল্লেখ করিয়া বঙ্গদূত এই ধনবৃদ্ধির কয়েকটি নিদর্শন দিয়াছে। 'প্রথম ভূম্যাদির মূল্যবৃদ্ধি—৩০ বৎসর আগে যে ভূমির মূল্য ছিল ১৫ টাকা এখন তাহা বৃদ্ধি পাইয়া অন্ততঃ ৩০০ টাকা হইয়াছে'। দ্বিতীয়তঃ, "এমতে ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদবৃদ্ধি হইয়াছে"—দশ বৎসরের মধ্যে যে লোকের মাসিক বেতন দুই টাকা ছিল তাহা পাঁচ টাকা ও সূত্রধরের মাসিক বেতন আট হইতে কুড়ি টাকা হইয়াছে এবং "পূর্ব্বে এক তঙ্কায় ১২ জন কৃষক লোক সমস্ত দিন শ্রম করিত এক্ষণে ৪ জনের অধিক এক তঙ্কায় পাওয়া যায় না।" 'শালিভূমির মালিকেরা বিঘা প্রতি রাজস্ব এক টাকার স্থানে চারি টাকা আদায় করেন—ওদিকে চাউলের দাম প্রতি মণ আট আনার পরিবর্তে দুই টাকা হইয়াছে।' ইহার কারণ নির্দেশ করিতে যাইয়া বঙ্গদূত লিখিয়াছে: "এই প্রকার অবস্থান্তর ও রীতি পরিবর্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্য বিস্তার ও ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম ইহাই সাব্যস্ত বোধ হইতেছে।"[৪]

বঙ্গদূত এই প্রসঙ্গে সাধারণ অর্থনীতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত যে মন্তব্যটি করিয়াছে তাহা সে যুগের বাঙ্গালীদের বুদ্ধিবৃত্তির ও সূক্ষ্ম অর্থনীতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে:

> "ফলিতার্থ এ প্রকার এদেশের অবস্থান্তর হওয়াতে যে সকল উপকারোপযোগি ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা তন্মধ্যে অর্থের চলাচল এক প্রধান ফল দৃষ্ট হইতেছে যে হেতুক ধন আর সার মৃত্তিকা ইহা রাশিকৃত হইলে কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎপত্তির নিমিত্ত হয়।"[৫]

অর্থের সঞ্চয় অপেক্ষা সচলতাই যে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করে এই অর্থনীতিক তথ্যটি যে ১৮২৯ সনেই বাঙ্গালীর বোধগম্য হইয়াছিল অথচ তদনুযায়ী ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে বেশী দূর তাহারা অগ্রসর হয় নাই, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়।

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে সমাজের অশেষ উন্নতির মূল তাহা বাঙ্গালীদের বোধগম্য হইয়াছিল। ১৮৬৯ সনে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়:—

> "মধ্যবিত্ত লোক যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত তাহাতে ইহাদের ধনাঢ্যগণের অবস্থার দোষের ভাগ থাকে না, অথচ গুণটি থাকে। ইহারা দরিদ্রগণের ন্যায় অন্নচিন্তায় দিবারাত্র জর্জরিত হন না, অথচ কর্মঠ হন, সুতরাং

ইহারা যেরূপ আত্মোৎকর্ষের সুবিধা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন, স্বীয় উন্নতির প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন ইহারা সেইরূপ প্রবলভাবে অনুভব করেন। সুতরাং মধ্যবিত্ত লোক সকল সময়েই সমাজে অধিক উপকারী রূপে পরিগণিত হন। এদেশের সৌভাগ্য অনেক অংশে এই শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করে। যদি কোন কালে এদেশে কোনরূপ সামাজিক কি অন্য কোন বিপ্লব হয়, ইহাদের দ্বারাই তাহা সম্পাদিত হইবে। এখন দেশেতে যতরূপ শুভ সূচক কার্যের উদ্যোগ হইতেছে তাহা ইহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে রক্ষা ও পোষণ করা দেশহিতৈষী রাজার অতি কর্তব্য।"৬

এই মন্তব্যটি যে কতদূর সত্য উনিশ শতকের শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতির সংস্কারের বিবরণ পড়িলেই তাহা উপলব্ধি করা যায়। কারণ এই সমুদয় বিষয়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই নেতৃত্ব ও প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু পূর্বোক্ত মন্তব্যের উপসংহারে পত্রিকা দুঃখ প্রকাশের সহিত লিখিয়াছে যে ক্রমে ক্রমে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা ও প্রতিপত্তি লোপ পাইতেছে। ইহার কারণ বলা হইয়াছে : "মধ্যবিত্ত লোকের দুইটি জীবনোপায় ভূমি সম্পত্তি এবং চাকুরী এবং ইংরেজ শাসন প্রভাবে দুইটিই ক্রমশঃ অন্তর্ধান করিতেছে।" ইহার যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"মধ্যবিত্ত লোকগণ প্রায়ই গাঁতিদার। .....

"১০ আইনের নিমিত্ত গাঁতিদারগণ এক প্রকার উচ্ছন্ন গিয়াছেন এবং যাঁহারা বজায় আছেন, তাঁহারা জমিদারগণের সম্পূর্ণ কৃপার অধীন। মনে করিলে মুহূর্ত মধ্যে তাঁহারা গাঁতিদারগণকে সর্বস্বচ্যুত করিতে পারেন। যশোর ও নদীয়ায় সৌভাগ্যশালী গাঁতিদার অতি কম আছেন। এমন কি অনেককে এক্ষণ অন্নকষ্টে দিন অতিবাহিত করিতে হয়।

"এদেশে পল্লীগ্রাম মাত্রেই দুই একজন মধ্যবিত্ত লোকের বাস, এবং যিনি কখন ইতিমধ্যে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন ইহাদের কেমন ভগ্নদশা, প্রায় অনেকের গৃহ ইষ্টকনির্মিত, এমন কি অনেকের গৃহ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, কিন্তু সকলেই প্রায় ভগ্ন হইয়া পতিত হইতেছে। বট বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা বনাকীর্ণ হইতেছে। বাটীতে আর

লক্ষ্মীশ্রী দৃষ্ট হয় না, অপিচ অপরিষ্কার বন, পুতিগন্ধ সম্বলিত প্রাসাদ, প্রভৃতি দারিদ্র্যদশার চিহ্ন লক্ষিত হয়। যাঁহাদের পিতামহগণ দান ধ্যানে দেশমান্য ও প্রাতঃস্মরণীয় ছিলেন, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণের হয়ত দিনান্তে এক সন্ধ্যা আহার সংগ্রহ হওয়া কঠিন। অনেকেই দুর্দশান্বিত হইয়া কখন কখন ঘৃণাস্কর জীবিকা দ্বারা উদর পূর্তি করিতেছেন। অনেক সময় অবস্থা দৃষ্টে অনেকে তাঁহাদের নিজ পরিচয়ও বিশ্বাস করে না। ফলে উভয় দিক হইতে মধ্যবিত্ত লোকদিগের শোষণ করিয়া জমিদার ও দরিদ্র প্রজাগণ পুষ্টিবর্ধন করিতেছে এবং ক্রমে সমাজের এরূপ হিতকর সম্প্রদায়ী অন্তর্হিত হইতেছে।"[৭]

এই অবনতি কতকটা স্বাভাবিক কারণেও ঘটিয়াছিল। ভূমিসম্পত্তি যত বেশী পরিমাণে টুকরা টুকরা ভাগ হইল, প্রতি পরিবারের জীবিকা নির্বাহের পক্ষে তাহা ততই অপ্রচুর হইল। আর শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যে গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছিল, চাকুরী ও অন্যান্য জীবিকা নির্বাহের উপায় সে পরিমাণে বাড়ে নাই। সুতরাং মধ্যবিত্তদের প্রধান জীবনোপায়—ভূমিসম্পত্তি ও চাকুরী—আক্ষরিক অর্থে 'অন্তর্ধান' না করিলেও কার্যতঃ বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। বঙ্গদূত 'অবাধ বাণিজ্য বিস্তার' ও 'ইংরেজদের আগমন' এদেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির আকর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল—কিন্তু ইহার সুফল বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

এই দুরবস্থা নাগরিক অপেক্ষা গ্রাম্য মধ্যবিত্ত সমাজেই বেশী ঘটিয়াছিল। কারণ জমিদার ও ধনী লোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া শহরে যাওয়ার ফলে তাহাদের অনুজীবিদের জীবিকার্জন অপেক্ষাকৃত অধিক কষ্টসাধ্য হইল। অন্যদিকে নাগরিক ভোগবিলাসের আস্বাদ পাইয়া এবং তাহাতে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারণের মানদণ্ড অপেক্ষাকৃত উচ্চতর সুতরাং অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিল।

নাগরিক সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে নীচ জাতীয় লোক লেখাপড়া শিখিয়া সামাজিক মর্যাদা লাভে তৎপর হইল। 'সংবাদ ভাস্করের' নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

"পূর্বে যে সকল নীচ লোকেরা এ দেশে রাজ মজুরী করিত এইক্ষণে তাহারা কর্নিকাদি পরিত্যাগ করিয়া কাগজ কলম ধরিয়া বসিয়াছে। ধোপা, নাপিত, ছুতার, মেথরাদিও কেরানি, বিল সরকার, মেট,

দালালাদির কর্ম্মে গিয়াছে। নীচ কর্ম্মের লোকের অত্যন্ত অপ্রতুল হইয়াছে। সভ্যরাজ্যে ইতর লোকেরাও লেখাপড়া করিয়া থাকে কিন্তু তাহারা স্ব স্ব জাতীয় নীচকর্ম্মে লজ্জা জ্ঞান করে না। ডিউক বংশেরাও যদি অযোগ্য হন তবে স্বচ্ছন্দে নাবিকাদির কর্ম্ম করিতে যান। এদেশে ইতর জাতিরা লেখাপড়া শিক্ষা না করিয়া যদি ইংরাজী ভাষায় কয়েকটা কথাও কহিতে পারে তথাপি সে সিপসরকার হইয়া উঠিল প্রাণ গেলেও আর স্বজাতীয় কর্ম্মে হস্ত দিবে না অতএব সর্ব্ব সাধারণে বিদ্যা প্রদানে এই এক মহদ্দোষ হইয়া উঠিয়াছে এতদপ্রতুল নির্ম্মূল করণের কি সদুপায় হইবেক তাহা পরমেশ্বর জানেন।"৮

ইহার ফলে সমাজে জাতি ভেদের কঠোরতা ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিল। উচ্চ নীচ জাতি-বর্ণগত বৃত্তির অনুসরণ যেমন হ্রাস হইল—জন্মগত জাতির মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠাও তেমন ধীরে ধীরে হ্রাস পাইল। ব্রাহ্মণ আর জন্মগত অধিকারে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিত না, এবং ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চ ও গোপ, কর্মকার, সূত্রধর, তন্তুবায় প্রভৃতি তথাকথিত নিম্ন জাতির স্তর ভেদের পরিবর্তে—শিক্ষা, অর্থ ও উপজীবিকাই সমাজে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার মানদণ্ডরূপে গৃহীত হইল। ইহার অবান্তর ফল হইল যে জন্মগত বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভেদাভেদ ক্রমশই ঘুচিতে লাগিল। পরস্পরের অন্নগ্রহণ ও সামাজিক ব্যাপারেও একত্রে এক পংক্তিতে ভোজন নাগরিক সমাজে দ্রুতবেগে প্রচলিত হইল—গ্রাম্য সমাজেও ইহার প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইল। একমাত্র বিবাহের বিষয়ে প্রাচীন জাতিভেদের কঠোরতা উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত অটল ছিল—বিশ শতকে নাগরিক সমাজে ইহার হ্রাসের সূচনা দেখা দিয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্তও জাতিভেদ মানিয়া চলিলেও একই জাতির মধ্যে শিক্ষা, অর্থ, মর্যাদা, প্রতিপত্তি বিষয়ে অনুরূপ পরিবারের মধ্যেই সাধারণতঃ বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। বিশ শতকে অসবর্ণ বিবাহ ধীরে ধীরে প্রচলিত হইতেছে—এবং ইহার আইনগত বাধা বিঘ্নও দূর হইয়াছে।

নাগরিক সমাজের কিরূপ অবনতি হইতেছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' ১৭৬৮ শকে (১৮৪৬ সনে) প্রকাশিত একটি সুদীর্ঘ মন্তব্য হইতে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রাচীন-পন্থী অশিক্ষিত ধনী সম্প্রদায় সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে:

"এইরূপকার প্রাচীন লোক এবং প্রাচীনদিগের সম্পূর্ণ মতানুগামি যাঁহারা,—

বিষয়োপযোগী হস্তলিপি এবং কিঞ্চিৎ অঙ্কপাত মাত্র যাঁহাদিগের বিদ্যার সীমা, এবং যাঁহারদিগের এই প্রত্যয় যে কেবল অর্থ উপার্জ্জনই সমুদয় বিদ্যার তাৎপর্য্য এবং তাবৎ জীবনের সুখ—স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহারা চিন্তাই করেন না—"দেশের উপকার" এ বাক্যের অর্থও তাঁহাদিগের সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহারা কেবল স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন—এই সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া এক পাদও অগ্রসর হয়েন না—সৎ বা অসৎ যে উপায় দ্বারা হউক ধন সঞ্চয় করিয়া তাহা পুত্র ও পৌত্রাদির নিমিত্তে রক্ষা করিতে পারিলেই আপনারদিগকে কৃতকার্য্য বোধ করেন। ইহার জন্যই দিবারাত্রি ব্যতিব্যস্ত, এ কর্ম্মের সমাধা পরে যে কিঞ্চিৎকাল অবশিষ্ট থাকে, তাহা প্রায় অলীক আমোদেই ক্ষেপণ করেন। ইঁহারদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনারদিগকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বাল্য ক্রীড়ার ন্যায় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। বিষয় সম্পত্তি লাভের আশ্বাসের সহিত আমোদ সম্ভোগ এবং সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহারদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রধান সূত্র; নতুবা প্রতিমা অর্চ্চনাতে নৃত্য, গীত, গৃহসজ্জা প্রভৃতির জন্যই বিশেষ মনোযোগি হইয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় অনেকে কেন করেন? বিশেষত: তাঁহারদিগের উপাসনায় সাত্ত্বিকতার কি অপূর্ব্ব চিহ্ন দেখা যায়, যাঁহারা আড়ম্বরের সহিত বিবিধ পূজার সামগ্রী সকল সম্মুখে রাখিয়া বিষয় ব্যাপার তাবৎ নিপুণরূপে তৎকালে সমাধা করেন। এই সমুদয় মনুষ্যের ক্রোড়ে রাশীকৃত ধন স্থাপিত হইলেও তদ্দারা স্বদেশের বিন্দুমাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সম্প্রদায়ভুক্ত দাতাও অনেকে আছেন, স্বীয় মণ্ডলী মধ্যে যশ উপার্জ্জন করা তাঁহারদিগের প্রধান তাৎপর্য্য; অতএব বিবাহ ও দলাদলি প্রভৃতি কর্ম্মে কেহ কেহ এককালে সহস্র সহস্র মুদ্রা অক্লেশে দান করেন। যিনি পুত্রের বিবাহ উপলক্ষ্যে পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা একদিনে ব্যয় করিয়া থাকেন, তিনি সেই পুত্রের অধ্যয়ন হেতু মাসিক পাঁচ টাকাও প্রদান করিতে ক্লেশ বোধ করেন।"

এই সম্প্রদায় যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের অবনতির অন্যতম কারণ তাহা দেখাইবার জন্য মন্তব্য করা হইয়াছে:

"সম্পূর্ণ অজ্ঞ হইলেও যে কোন ব্রাহ্মণ বিবিধ ধর্ম্ম চিহ্ন ধারণ করিয়া আপনাকে ধার্ম্মিকরূপে প্রকাশ করে, অথবা তাঁহারদিগের যাত্রা মহোৎসবাদি ক্রিয়া সম্পাদনের প্রয়োজনীয় মন্ত্র সকল কেবল উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়, তাহাকেই যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক ধন প্রদান করিয়া থাকেন, সে ব্রাহ্মণ জ্ঞানাপন্ন কিনা ইহা ভ্রান্তিতেও বিবেচনা করেন না। এই প্রকার উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া

অনেক ব্রাহ্মণ দশকর্ম্মোপযোগি কতকগুলীন মন্ত্র অভ্যাস করিয়াই আপনারদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন ;—কঠোর জ্ঞানাভ্যাসে আর কেন পরিশ্রম করিবেন? তথাপি ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের পূর্ব্বাভিমানেই মগ্ন রহিয়াছেন—বিবেচনা করেন না যে ব্রাহ্মণ নামের উপযুক্ত তাঁহারদিগের আর কি পদার্থ আছে? অন্যকে ধর্ম্মের উপদেশ দিবেন কি? আপনারা তাহার সম্যক বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছেন, এবং অজ্ঞান ও কুপ্রবৃত্তিপ্রযুক্ত বিজ্ঞ সমাজে ক্রমাগত হতাদর হইতেছেন। ইহা কি ব্রাহ্মণদিগের সামান্য লজ্জার বিষয় যে, যে শূদ্রেরা পূর্ব্বে তাঁহারদিগের আজ্ঞাকারি দাস ছিল, এইক্ষণে তাঁহারা সেই শূদ্রদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তি হইয়াছেন—ধন সেবা জন্য তাঁহারদিগের সেবাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব ও পণ্ডিতত্ব লইয়া দম্ভ করেন, অনাহূত, অনাদৃত, তিরস্কৃত হইলেও ধনিদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা তাঁহারদিগের প্রাতঃকৃত্য হইয়াছে এবং ধনিদিগের উপাসনা আন্তরিক ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছে। কি জানি তাঁহারা অনুষ্ঠানের ত্রুটি দেখেন, এ নিমিত্তে কপালে দীর্ঘ রেখা, হস্তেতে কোষাপাত্র এবং তদুপরি গঙ্গাস্নানের প্রত্যক্ষ চিহ্ন স্বরূপ সিক্ত বস্ত্র খণ্ড পরিপাটি রূপে সংস্থাপনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আশীর্ব্বাদ করত উপস্থিত হয়েন। অনেক মহোপাধ্যায় পণ্ডিত কিঞ্চিৎ ধন প্রাপ্ত হইলে দাতার মনোরম্য যে কোন অভিপ্রায় তাহাকে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া প্রায়বক্ত্য (?) করেন এবং কত অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা স্বহস্তেতেও লিখিয়া প্রদান করেন। ....

"শিষ্য সমীপে নানা প্রকার ছদ্ম ব্যবহার দ্বারা আপনারদিগকে পরম পবিত্র ঋষি তুল্য দেখান। যাঁহার আমিষ ভোজন ব্যতীত এক সন্ধ্যা যাপন হয় না, এবং কুলটা সংসর্গ বিনাও এক রজনী ক্ষেপণ হয় না, শিষ্য গৃহে তিনি হবিষ্যাশী হইয়া অতি শুদ্ধ সত্বরূপে অবস্থান করেন, এবং সংযম উপবাসাদি কঠিন কঠিন নিয়ম পালন পূর্ব্বক পরমতপস্বির ন্যায় আপনাকে প্রকাশ করেন। শিষ্যের বিত্ত গ্রহণ জন্য গুরুদিগের এই প্রকার বিবিধ কৌশল, কিন্তু তাহার পরিত্রাণের উপায় বিষয়ে তাহারদিগের জিজ্ঞাসা করিলে কহেন যে প্রতিমাদি স্থূল ধ্যান দ্বারা ক্রমে জ্ঞানের সোপান লাভ হইবেক। হা! এক দিবস একবার মাত্র তাহার কর্ণকুহরে মন্ত্র ধ্বনি প্রবিষ্ট করিয়া উপযুক্ত উপদেশ করিতে চিরকাল ক্ষান্ত থাকিলে সোপান সে কোথায় পাইবে যে তদ্দ্বারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিবেক? পরিত্রাণ দূরে থাকুক, অনেকে শিষ্যের অধোগতির কারণ হয়েন। গোস্বামিরা কৃষ্ণমন্ত্রে বা রাধামন্ত্রে বা যুগলমন্ত্রে শিষ্যদিগকে দীক্ষিত করিয়া

গোপাঙ্গনাদিগের সহিত কৃষ্ণের রাসলীলা প্রভৃতিকে অহরহ আলোচনা করিতে অনুমতি করেন। ভণ্ড কথকদিগের সহায়তা দ্বারা শিষ্যেরাও সেই অনুমতি পালন করিতে কিছুমাত্র ক্রুটি করেন না,—বরঞ্চ কোন কোন নিপুণ শিষ্য সেই রাসলীলাদির অনুরূপ অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। শক্তিমন্ত্রের উপদেশক বামাচারিরাও অল্প অনর্থের কারণ নহেন। তাঁহারা প্রচুর মদ্য মাংস ভোজনাদিকে উপাসনার অঙ্গরূপে উপদেশ করেন, চণ্ডালী প্রভৃতি স্ত্রী সঙ্গকেও অতি গুহ্য পরমার্থ সাধন রূপে ব্যাখ্যা করেন, এবং কদাপি স্বয়ং চক্র মধ্যে ভৈরবী সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট হইয়া চক্রেশ্বর রূপে কারণবলে ও মন্ত্রবলে চক্রিদিগকে অভিভূত করেন, যেখানে গলিত নরমাংস পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের লোভ হইতে পরিত্রাণ পায় না।"

ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :

"এই সমুদয় প্রাচীন ব্যক্তিদিগের সন্তানেরা, যাহারা ইংলণ্ডীয় ভাষায় বিদ্যা অভ্যাস করে, তাহারদিগের বুদ্ধি বিদ্যা সংস্কার সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হয়। প্রাচীন-দিগের সহিত তাহারদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে কিছুমাত্র ঐক্য হয় না। পিতা অতি যত্নপূর্ব্বক স্বীয় গৃহে প্রতিমা অর্চ্চনার আয়োজন করেন, পুত্র তাহাকে কাল্পনিক জানিয়া অবহেলা করেন। পিতা অন্যের সহিত অসংস্রবে আহারাদি সমাধা করেন, পুত্র কোন জাতি বিচার করেন না—ম্লেচ্ছেরও সহিত একত্র পান ভোজন করিয়া পিতার মানসিক ক্লেশের কারণ হয়েন। এই প্রকার পরিবারের মনে ক্লেশ প্রদান মাত্র অনেকের বিদ্যা শিক্ষার ফল হইয়াছে।"

"কতক ব্যক্তি কেবল মৌখিক বাগাড়ম্বর করিয়াই কাল হরণ করেন। তাঁহারা মনঃকল্পনাতে স্ত্রীদিগের নিমিত্তে কদাপি প্রকাশ্যে পাঠশালা স্থাপন করিতেছেন, কদাপি বিধবার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতেছেন, কদাপি সমুদয় দেশ হইতে পৌত্তলিকতাকে এক দিবসে উচ্ছেদ করিতেছেন। তাঁহারা দেশের স্বরূপ অবস্থাকে আলোচনা করেন না—নিবিড় অন্ধকারময় পল্লীগ্রামকে স্মরণ করেন না—জ্ঞান ধর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ আন্দোলন এই কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি স্থানে দৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বিস্তীর্ণ ভারতভূমিকে একই দিবসে উজ্জ্বল করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহারা মৌখিক যে প্রকার আন্দোলন করেন, তদনুসারে কি কার্য্য করিয়া থাকেন?"

এই ইঙ্গ বঙ্গ শ্রেণীর ইংরেজের অনুকরণ করার কি কুফল হইয়াছে তাহার বর্ণনা :

"এইরূপে এইক্ষণকার বিদ্বান্ নামে খ্যাত যাঁহারা, তাঁহারদিগের দ্বারা

উপকার না হউক, অপকার নানা প্রকার হইতেছে। তাঁহারা স্বদেশের আচার ব্যবহারকে অগ্রাহ্য করিয়া ইংলণ্ডীয় লোকের দৃষ্টান্তকে গ্রহণ করিতেই শিক্ষা করেন। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহারদিগের উত্তম ব্যবহার সকলকে গ্রহণ না করিয়া যদ্দ্বারা অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা এমত আচরণ সকলের অনুবর্ত্তি হইতেই অভ্যাস করেন। সম্প্রতি মদিরা পানের দৃষ্টান্ত তাঁহারদিগের বিনাশের হেতু হইয়াছে। তাঁহারা প্রথমতঃ অল্প পরিমাণে এই ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়েন, পরে লোভ সম্বরণে অসমর্থ প্রযুক্ত ক্রমাগত উপভোগ দ্বারা তাহাতে প্রগাঢ় আসক্ত হইয়া এককালে মোহাচ্ছন্ন এবং হতজ্ঞান হয়েন। মদিরা পানে যাহার আসক্তি, তাহার দ্বারা কোন দুষ্কর্ম্মের অসম্ভাবনা হয়? শুভ কর্ম্মের প্রবৃত্তিই বা তাহার কি প্রকারে হইতে পারে? ব্যক্ত করিতে অশ্রুপাত হয় যে কলিকাতায় প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের কত সুশিক্ষিত ছাত্র এই মোহকারি দুষ্কর্ম্মে মগ্ন হইয়া অবশেষে ব্যভিচার প্রভৃতি কুব্যবহার দ্বারা মনুষ্য নামের অযোগ্য হইয়াছে।"

ইহাদিগের অসৎ দৃষ্টান্তে অশিক্ষিত লোকের চরিত্রও যে কলুষিত হইয়াছে তাহার বর্ণনা :

"এই কলিকাতা মধ্যে স্থানে এমত সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকর্ম্মে অজস্র লিপ্ত থাকে। তাহারদিগের ধর্ম্মের নিয়ম নাই; কোন কর্ম্মেরও নিয়ম নাই; কখন পৌত্তলিকের ন্যায়, কখন ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায়, কদাপি নাস্তিকের ন্যায়ও ব্যবহার করিয়া থাকে। কদাপি দেব বিশেষের প্রতিমা সমীপে দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইতেছে, পুনর্ব্বার পরিহাসচ্ছলে সেই দেবতার প্রতি অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিতেছে; কদাপি ইতর জাতিকে স্পর্শ করিয়া আপনারদিগকে অশুচি জ্ঞানে গঙ্গানীরে অবগাহন করিতেছে, তৎপরক্ষণেই সকল বর্ণের সহিত একত্র হইয়া একাকার রূপে পান ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেছে। মাদক দ্রব্য সেবন এবং লাম্পট্য ব্যবহার এই দলভুক্ত ব্যক্তিদিগের জীবনের সার কর্ম্ম হইয়াছে।"[১]

"পূর্ব্বে এই স্বাধীন ভারতবর্ষস্থ ধর্ম্মশীল রাজাদিগের শাসনানুসারে মদ্য ব্যবসায় বা মদ্য ব্যবহার এদেশে প্রায় ছিল না। কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোকের অধিকার হওয়া অবধি তাঁহারদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় যে মদিরা তাহার ব্যবসায় দেশময় প্রচলিত হইয়াছে, এবং তাঁহারদিগের দৃষ্টান্তে এদেশস্থ লোক সকল অপরিমিত মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মাদক দ্রব্যের কর সংগ্রহ জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারিরা অধিক ধনাগম করিতে পারিলেই রাজপুরুষদিগের নিকটে

প্রতিপন্ন হয়েন, এ প্রযুক্ত স্বীয় অধিকারে মদ্যাদির অধিক বিপণী স্থাপন দ্বারা অধিক কর সংগ্রহ জন্য তাঁহারদিগের একান্ততঃ যত্ন হয়। ইহাতে মাদক দ্রব্যের বাণিজ্য বৃদ্ধির সহিত এতন্নগরস্থ লোকেরা ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতেছে। অধুনা এই নগরে রাজশাসন অভাবে যেমন মদ্য পানের বাহুল্য হইতেছে তদ্রূপ দিন দিন বেশ্যা শ্রেণীও বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বকালে রাজশাসনে নগর বা গ্রামের প্রান্ত ব্যতীত কদাপি তাহারা তন্মধ্যে বসতি করিতে সমর্থ হইত না; ইহার কতক দৃষ্টান্ত পল্লীগ্রামে অদ্যাপি রহিয়াছে। কিন্তু ইদানীং এই রাজধানীতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। লোক যখন স্বীয় বাটীর চতুর্দ্দিকে বেশ্যাদিগের হাব ভাব, কটাক্ষ সর্ব্বদা দেখিতে পায়, তখন সহজেই তাহারদিগের মন তাহাতে আসক্ত হয়। কেবল পুরুষেরা কুপথগামী হয় না, অনেক অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী এই কুদৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুতা হয়।"

"বেশ্যাগমন পাপ এইক্ষণে কলিকাতা মধ্যে যে কি প্রকার বিস্তারিত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ধনী, মধ্যবর্ত্তী, অতি দীন পর্য্যন্ত এই দুষ্কর্ম্মে এমত সাধারণ রূপে মগ্ন হইয়াছে যে অন্য অন্য কর্ম্মের ন্যায় ইহাকে পরস্পর কাহারও নিকটে কেহ বিশেষ গোপন করে না—আপনার এই পাপ স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিতেও কেহ লজ্জা বোধ করে না। এই নগর মধ্যে এমত পল্লী নাই যেখানে শত শত বেশ্যা একত্র বাস না করে, এবং তন্মধ্যে প্রায় এমত বেশ্যা নাই যাহার আলয়ে বহু লম্পট ব্যক্তিকে অহর্নিশি একত্র দেখা না যায়? সন্ধ্যার পর নগর মধ্যে পাপের মহোৎসব উপস্থিত; কোন স্থানে বহু ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া গণিকার গৃহে প্রবেশ করিতেছে, কুত্রাপি কোন বাবুর কদাচারের সাক্ষী স্বরূপ অশ্বযান তাঁহার রক্ষিতা বেশ্যা দ্বারে স্থাপিত রহিয়াছে; কোন কোন বেশ্যার আলয় হইতে মাদকোন্মত্ত সমূহ লম্পটের উল্লাস কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে, কুত্রাপি গণিকার অধিকার জন্য বিমোহিত পুরুষেরা বিবাদ, কলহ, সংগ্রামে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইতেছে। কুকর্ম্মদ্বারা চিত্তের বিকৃতি ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সম্ভব হয় যে আপনার রক্ষিতা গণিকালয়ে স্বীয় বালক পুত্রাদি তাঁহার সাক্ষাতে, বরঞ্চ তাঁহার অনুমতিক্রমে স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করে এবং তথায় পরিপাটীরূপে লাম্পট্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া চিরজীবন পাপের বর্ত্মে ভ্রমণ করে। তাহারা জন্মকালে দুশ্চরিত্র পিতার অসৎ স্বভাব সকলকে অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, এবং জীবনকালে তাঁহার কুদৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া সংসারে মহা উপদ্রবের হেতু হয়। এবম্পরাম্পরানুসারে এই জঘন্য দুষ্কর্ম্ম গঙ্গা প্রবাহের

স্রায় বহমান হইতেছে এবং ক্রমশঃ বিস্তারিত হইয়া পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছে।

"এই দলভুক্ত ধনি সকল এই দুষ্কর্ম্মের প্রসঙ্গ, আয়োজন এবং উপভোগে সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন, এবং ইহার আনুষঙ্গিক অশ্বযানের শোভা, পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও বিহঙ্গ ক্রীড়া প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্তে অপরিমিতরূপে রাশি রাশি ধন ক্ষেপণ করেন—কেহ কেহ সকল্ সম্পত্তি নষ্ট করিয়া নানা প্রকার অপমানের আস্পদ হয়েন। ইঁহারা কেবল স্বীয় অমঙ্গলের কারণ আপনারা হয়েন না, ইঁহারদিগের পার্শ্ববর্ত্তি আশ্রিত যুবকগণের বিষম দুরদৃষ্টের হেতু হয়েন। তাহারা বাবুর তুষ্টির নিমিত্তে তাঁহার সকল প্রিয় কুকর্ম্মে উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে, বরঞ্চ তাহার সম্পাদন জন্য উল্লাসের সহিত যত্নবান্ হয়। এইরূপে অনেক নির্দ্দোষি ব্যক্তি ধনি বাবুদিগের সংসর্গ দ্বারা দুষ্কর্ম্মের আমোদে সুশিক্ষিত হয় এবং তদ্দারা তাহারদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, বীর্য্য একেবারে বিনষ্ট হয়।

"যাহারদিগের কুকর্ম্ম সম্পাদনের উপযোগী ধন নাই, অথচ বুদ্ধি বিদ্যার হীনতা প্রযুক্ত ন্যায় পূর্ব্বক উপার্জ্জন করিতে যাহারা ক্ষমতাবান্ নহে, তাহারা সামান্য কোন বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া চৌর্য প্রবঞ্চনাকে ধন লাভের প্রধান উপায় রূপে স্থির করে। বেশ্যা গমন তুল্য কর্ম্মস্থলে চৌর্য ব্যবহার এইক্ষণকার সাধারণ পাপ হইয়াছে এবং অভ্যাস দ্বারা অনেকের চিত্ত এমন কঠিন হইয়াছে যে এই কদাচারকে তাহারা কুকর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে না এবং প্রভুর সকল সম্পত্তি হরণ করিতে পারিলেও তজ্জন্য আপনারদিগের দোষ বোধ করে না।

"পুরুষদিগের এই প্রকার অত্যাচারে এবং দেশের নানা প্রকার কুপ্রথাতে এদেশীয় অবোধ স্ত্রীলোকেরা যেরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা স্মরণ করিলে রোদন করিতে হয়।......

"অনেক পুরুষ এ প্রকার দুরাচার যে ভার্য্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহারদিগের প্রবৃত্তিই হয় না—মাসান্তেও একবার তাহারা অন্তঃপুরের সংবাদ গ্রহণ করে না। অনেকে উপপত্নীর বশীভূত প্রযুক্ত কোপ দৃষ্টি ব্যতীত একদিনের নিমিত্তে প্রণয় দৃষ্টিতে ভার্য্যার প্রতি অবলোকন করে না, এবং প্রায় অপ্রিয় ব্যতীত প্রিয় শব্দে তাহাকে সম্ভাষণ করে না। ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে কোন পতির নিতান্ত নিদারুণ কুব্যবহার জন্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া কত স্ত্রী আত্মঘাতিনী পর্য্যন্ত হইয়াছে।"[১]

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে উদ্ধৃত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' মন্তব্যের প্রসঙ্গে 'সংবাদ ভাস্করের' নিম্নলিখিত মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য :

"কলিকাতা নগরীর বিধবাবিবাহ সভায় যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা গমন করিয়াছিলেন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকের নিমন্ত্রণাদি বন্ধ হইয়াছে বিধবাবিবাহ সপক্ষেরা যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ক্ষতি পূরণ না করেন তবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা চতুষ্পাঠী রাখিতে পারিবেন না, অগত্যা "শ্রীবিষ্ণু" বলিয়া বিপক্ষ দলের শরণাপন্ন হইবেন, আমরা শুনিলাম ইহার মধ্যেই কেহ কেহ বিষ্ণু স্মরণ করিয়াছেন, বিপক্ষ পক্ষে সম্মান পাত্র কমলা পুত্রেরা ঐক্যবাক্য হইয়াছেন তাঁহারা যদি বৃত্তি বিধান না দেন আর স্ব স্ব দলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিমন্ত্রণাদি রহিত করেন তবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কি উপায়ে জীবন ধারণ করিবেন ? এই ক্ষণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের লভ্য কি আছে ? পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা প্রাতঃস্নান করিয়া সন্ধ্যা পূজা করিতেন তৎপর ধনিগণকে আশীর্ব্বাদ করিতে যাইতেন এইক্ষণে আশীর্ব্বাদ গমন উঠিয়া গিয়াছে ; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আশীর্ব্বাদ করিতে গেলে দূরে থাকিতেই অনেকে কহেন "এই অসভ্য বেটারা পোড়াইতে আসিতেছে কতকগুলা সংস্কৃত শ্লোক ছাড়িবে আর কথায় কথায় অর্থ চাহিবে" ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের এমনি দুর্দ্দশা হইয়াছে "আশীর্ব্বাদ" বলিয়া অগ্রে হস্ত পাতিতে হয়, আশীর্ব্বাদ বলিয়া হস্ত পাতিলে ধনিরা কি করেন ? কেহ কেহ বলিদানের ন্যায় হস্ত তোলেন, অনেকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া প্রণাম সারেন, পরে মনোভ্রমে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যদি বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্তও বসিয়া থাকিয়া সংস্কৃত কবিতা বকাবকি করেন তথাচ কপর্দ্দক দেখিতে পান না, পরিশেষে প্রণাম চিহ্ন রম্ভা দর্শন করিয়া বিদায় হন, তবে কোন ব্যাপার প্রয়োজনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ না করিলে নয় আর দুর্গোৎসবাদি কর্ম্মে বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বাবধি চলিত হইয়া আসিয়াছে, ধার্ম্মিকেরা তাহা রহিত করিতে পারেন না, এই কারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ডাকেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও সেই বৃত্তি দান বিদায় দানে কোন প্রকারে সিদ্ধান্নে জীবন যাপন করিতেছেন তাহাও যদি যায় তবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কি করিয়া সংসার চালাইবেন ?"[১০]

ইহার প্রতিকারের জন্য উক্ত পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব করা হইয়াছে :

"যদি আমারদিগের পরামর্শ শ্রবণ করেন তবে ধর্ম্ম রক্ষার উপায় দেখুন, হিন্দু মাত্র সকলে একত্র হইয়া অর্থ সংগ্রহ করুন দান পত্রে প্রতিজ্ঞা লিখিবেন যাঁহার যত উপার্জ্জন হইবে মাসে তাহার একাংশ ধর্ম্মার্থে রাখিবেন, এককর্ম্ম অল্প

ধনের কর্ম্ম নহে, প্রচুর ধন সংগ্রহ করিতে হইবেক কোন বিশ্বাসযোগ্য স্থলে তাহা সঞ্চয় থাকিবে ঐ ধনে কোন বাণিজ্যালয় হইবে, বাণিজ্য দ্বারা তাহা বৃদ্ধি পাইবে, এদিকে মাসে মাসে সকলে স্ব স্ব উপার্জ্জনের একাংশ দিবেন, মাসিক দানে মূলধন পুষ্ট হইতে লাগিল, বাণিজ্য দ্বারা নানা দেশ হইতে বৃদ্ধি ধন আসিল, বাণিজ্য লভ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিভক্ত করিয়া দিবেন, সে দান এইরূপ দান হইবে পণ্ডিতগণ স্বচ্ছন্দে থাকিয়া শাস্ত্র ব্যবসায় করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে অন্ন বস্ত্রাদি জন্য অন্য চিন্তা করিতে হইবে না অন্য চিন্তায় চিন্তিত না হইয়া অন্তেবাসিগণকে সুশিক্ষা দিবেন, ছাত্রদিগের মধ্যে যিনি শিক্ষা বিষয়ে সুপাত্র হইবেন তিনি মাসে মাসে বৃত্তি পাইবেন সেই বৃত্তি এমন বৃত্তি হইবে মাসে মাসে তাঁহার বাটীর সকলের দিনবৃত্তি চলিবে, ইহা হইলে সে ছাত্রকে পরিবারাদি প্রতিপালন জন্য অন্য চিন্তা করিতে হইবেক না।"[১১]

জন্মগত জাতিভেদের বন্ধন শিথিল হইলেও, বৃত্তি-ভিত্তিক জাতির মধ্যে ঐক্য বন্ধন শহরে বেশ সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সমসাময়িক পত্রিকায় এই প্রকার জাতীয়তা ও তাহার নিদর্শন স্বরূপ ধর্ম্মঘটের উল্লেখ আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :

১। ১৮৫৯ সনের জুন মাসে গোপ ও মোদকদের ধর্ম্মঘট।[১২]

কলিকাতা এবং ইহার নিকটস্থ গ্রামনিবাসি গোপ এবং মদকেরা পরস্পর বিবাদ উপস্থিত করিয়া যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহাতে মণ্ডালোভি বাবু ও বিপ্রবর্গের বিলক্ষণ ক্লেশ বোধ হইয়াছে, দেশীয় ছানার উত্তম সন্দেশ আর কেহ দেখিতে পান না, বড়বাজারের রাতাবি আর প্রস্তুত হয় না, এই বিবাদের মূলকারণ মদকেরা পূর্ব্বে গোপদিগের নিকট হইতে গামছা বদ্ধ ছানা ওজন করিয়া লইত তাহার জলাংশ বাদ দিত না, পরে তাহারা ছানার বন্ধন খুলিয়া তাহার মধ্যে ভাগ কাটিয়া জল বাদ দিয়া ওজন করার নিয়ম করাতে গোপগণ বিলক্ষণ ক্ষতিবোধ করিয়া একেবারে পরস্পর ঐক্য হইয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে, যে মদকদিগকে ঐরূপ ছানা বিক্রয় করিবেক না, এবং মদকেরাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, জল বাদ না দিলে গোপদিগের ছানা ক্রয় করিবেক না, এইক্ষণে আনারপুরের ছানা যাহা.........বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহাই ক্রয় করিতেছে, গোপ-মদকের এই প্রতিজ্ঞা কত দিবস থাকে তাহা বলা যায় না, আপাততঃ এতদ্দ্বারা কলিকাতার বাজারে উত্তম সন্দেশ অদৃশ্য হইয়াছে শ্রাদ্ধ ও বিবাহ সময়ে যাহারা আহারের সময়ে উৎকৃষ্ট মণ্ডার প্রতি অধিক লালসা প্রকাশ করেন,

অধুনা তাহারদিগের ঐ লালসা পূর্ণ হয় না, গোপেরা অধিক পরিমাণে ছানা প্রস্তুত না করাতে কলিকাতা এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তি স্থানাদিতে দুগ্ধ বিলক্ষণ সস্তা হইয়াছে; সকল রাজপথে গোপেরা ভারে ভারে তাহা বহন করিয়া প্রত্যেক সের দুই তিন পয়সা মূল্য বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে, দুগ্ধ হইতে ক্ষীর, মাখন, ননী, স্বর, মালাই, দধি অনেক প্রস্তুত হইতেছে, যে সকল দুঃখি লোক ঐ উপাদেয় দ্রব্যাদির আস্বাদ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা তাহা আহার করিয়া কৃতার্থ মানিতেছে।"

১। গো শকট, মুটের ধর্ম্মঘট।[১৩]

"বিধি নির্ব্বন্ধ হইয়াছে কলিকাতা নগরীতেও গাড়িঘোড়া প্রভৃতির ট্যাক্স হইবে, ইহাতে গো শকট বাহকেরা ঐক্যবাক্য হইয়া গত সোমবারাবধি তাহাদিগের গাড়ি চলায়ন বন্ধ করিয়াছে তাহাতে নগরবাসীদিগের বিশেষতঃ বণিকগণের অনেক ক্ষতি হইতেছে বণিকেরা দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানী করিতে পারেন না, এবং আমরা গত বৃহস্পতিবারে নারিকেলডাঙ্গার গোলা হইতে সুন্দরীকাষ্ঠ আনয়নার্থ লোক পাঠাইয়াছিলাম আমারদিগের লোকেরা গোশকটাভাবে কাষ্ঠ আনয়ন করিতে পারে নাই এবং মুটেরাও গাড়োয়ানদিগের সহিত যোগ দিয়াছে, গাড়োয়ান ও মুটে পাঁচ ছয় সহস্র লোক একত্র হইয়া ডেপুটি গভর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছে তাহারদিগের প্রতি এই ট্যাক্স ক্ষমা হয় কিন্তু উক্ত মহাশয় সাহেব তাহারদিগের উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, উড়ে বেহারা, রোমানি বেহারা গরু গাড়োয়ান ইত্যাদি নীচ লোকেরা ঐক্যবাক্য আছে কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহা দেখিয়াও এতদ্দেশীয় মান্য লোকেরা লজ্জা জ্ঞান করেন না, আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া কি গাড়ি ঘোড়া পরিত্যাগ করিতে পারি না, এদেশে যখন গাড়িঘোড়া ছিল না তখন কি যানবাহন দ্বারা মান্য লোকদিগের কর্ম্ম চলে নাই, সম্ভ্রান্ত লোকেরা গাড়িঘোড়ার কর নিবারণ করিতে পারিলেন না এইক্ষণে গাড়য়ানদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

৩। ধোপার ধর্ম্মঘট।[১৪]

"কলিকাতা নগরীয় কৃষ্ণবাগানে অনেক ধোপা বসতি করে, তাহারা দেখিয়াছে মুট্যে মজুর পর্য্যন্ত সকলে স্ব স্ব কর্ম্মে দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেতন লইতেছে এই কারণ জ্ঞাতি বন্ধুগণকে আবাহন পূর্ব্বক এক সভা করিয়াছিল তাহাতে প্রামাণিক ধোপারা বক্তৃতা করিয়া সকল ধোপাকে জানাইল এক টাকার চাউল দুই টাকা হইয়াছে, এক পয়সার মাছ দুই পয়সায় বিক্রী হইতেছে, মুট্যেরা মোট

লইয়া যে স্থানে এক পয়সায় যাইত দুই পয়সা না পাইলে সে স্থানে যায় না, আমরা এক পয়সার হাঁড়ী দুই পয়সা না দিলে পাই না পূর্ব্বে টাকায় ছয় মণ কাঠ বিক্রয় হইত এখন তিন মণের অধিক দেয় না এইরূপ সকল বিষয়ে দ্বিগুণ লাভ হইতেছে তবে আমরাই বা কি কারণ চিরকাল এক মূল্যে থাকিব? অতএব সকলে প্রতিজ্ঞা কর এক পয়সায় যে কাপড় কাচিয়া থাকি দুই পয়সা না পাইলে তাহা কাচিতে পারিব না। ইহাতে সভাস্থ সমস্ত ধোপা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে আর এক পয়সায় কাচাখানা ও কাচা হইবেক না, যাহারা নগদ পয়সায় কাপড় ধোলাই করাইত তাহারা ঘোর বিপদে পড়িয়াছে, ধোপারা তাহারদিগের কাপড় লয় না, দরিদ্র লোকেরা দুই চারিখানা কাপড় কাচাইতে গেলে রজকেরা কহে 'প্রতি কাপড় দুই পয়সা অগ্রে রাখ তবে কাপড় লইব নতুবা চলিয়া যাও, আমরা আর কাপড় কাচা ব্যবসায় করিব না, সন্তানদিগে পাঠশালায় দিয়াছি কাপড়ের মোট বহন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম,' এদিগে কাপড় ধোলাই জন্য দরিদ্র লোকেরা দুঃখ পাইতেছে ধোপারাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে কাপড় ধোলাই করিবেক না।"

এইরূপ উড়িয়া কাষ্ঠবাহী ও কাষ্ঠছেদক, মজুর, পাল্কীবাহক, নৌকার মাঝি প্রভৃতিরও ধর্মঘটের বিবরণ পাওয়া যায়।

বৃত্তিভিত্তিক জাতির ঐক্য বন্ধনের আর একটি পরিচয় পাওয়া যায় কলিকাতার বৃত্তিভিত্তিক বসতি বিন্যাসে। এক বৃত্তি অবলম্বনকারীরা যে পূর্বে এক পাড়ায় বাস করিত এখন পর্যন্তও কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের নাম তাহার সাক্ষ্য দেয়—যদিও কার্যতঃ নামগুলি অনেক স্থলেই এখন একেবারে অর্থহীন। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি পাড়ার নাম উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে—কলুটোলা, কুমারটুলি, বেনিয়াটোলা, জেলেপাড়া, কসাইটোলা, পটুয়াটোলা, শাখারিপাড়া, কাঁসারিপাড়া। গোপ লেন, ঘোষ লেন, হালদারপাড়া, বোসপাড়া লেন, দত্ত লেন, ব্রাহ্মণপাড়া লেন, বসাক লেন, চাউলপটি লেন, ছুতারপাড়া লেন, গোঁসাই লেন, হাজরা রোড, কাঠগোলা লেন, কুণ্ড লেন, রায়পাড়া লেন, স্যাকরা পাড়া লেন, তাঁতি বাগান রোড, তেলিপাড়া লেন, যোগীপাড়া লেন—প্রভৃতিও এইরূপ বসতি বিন্যাসের নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

বলাবাহুল্য যে বর্তমানকালে এই সকল নামের প্রায়ই কোন সার্থকতা নাই—কারণ কুমারটুলীতে এখনও বহু কুমার থাকিলেও প্রায় সমস্ত অঞ্চলের নামের সহিতই সেই সেই বৃত্তি অবলম্বনকারীর সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে।

২। বেশ্যা

কলিকাতায় বেশ্যাবৃত্তির প্রসার আর একটি দুরপনেয় কলঙ্ক।

১৮৪৩ সনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কলিকাতায় বেশ্যাগমন রূপ ব্যভিচারের সম্বন্ধে উক্তি পূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। কলিকাতাবাসীরা সমাজের এই ব্যাধি দূর করার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় এ বিষয়ে বহুলোকের স্বাক্ষরিত যে আবেদন পত্র পাঠাইবার প্রস্তাব করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

নিম্নস্বাক্ষরিত বঙ্গদেশবাসীদিগের সবিনয় নিবেদন এই : "এক্ষণে পোলিস কর্তৃক যেরূপ শান্তিরক্ষা হইতেছে তাহা বর্ণনা বাহুল্য, অতি সুচারুরূপেই হইতেছে তাহা সন্দেহ নাই, নগরীর যাবতীয় শান্তিরক্ষার মধ্যে বেশ্যাকুল দ্বারা তাহার অনেক অংশের ত্রুটি হয়, কারণ বারঘোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগ করণে বাধ্য হন চৌর্য্য কার্য্যদ্বারা যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় তাহা কেবল ঐ বারললনাগণের ব্যবহার কারণ। রাত্রিকালে মদ্য বিক্রয় যাহা ভয়ানক শান্তিভঙ্গ করে তাহা কেবল এই বারঘোষাগণের নিমিত্ত হয়, কলহ মদ্যপান দ্বারা জীবন সংহার, ব্যসন, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচার করণ এই বারস্ত্রীগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়, আরো বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের ইহা স্বভাব সংশোধন বলিলেও বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা কি প্রাতঃকালে কি সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বেশ্যা সংখ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উত্তম নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যথেচ্ছা তাহাই করিতেছে, কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বশত বাটীতেও অধিক ভট্টালোভী হইয়া ভদ্রপল্লীর মধ্যে বেশ্যাগণকে স্থানদান করিয়া অতুল সুখপ্রাপ্ত হইতেছেন যদ্দারা একঘর বেশ্যা বৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে অতি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ধনবান মান্য বংশের প্রাসাদাদির নিকটেই বেশ্যা নিকেতন কেবলই ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ, আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতি আজ্ঞা করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবান এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্র নগর বাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না।"[১৫]

এ বিষয়ে জনমত গঠন করিবার জন্য ১৮৫৮ সনের ২৩ মে বিদ্যোৎসাহিনী সভায় "বেশ্যাগণের বাস করিবার নিমিত্ত এক নির্দ্দিষ্ট পল্লী নিরূপিত হয়" এই মর্মে লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে আবেদন করার প্রস্তাব বিচার ও সেই বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। শ্রীকালী প্রসন্ন সিংহ তখন সেই সভার সম্পাদক ছিলেন।[১৬]

পাঠশালার নিকট বেশ্যালয় থাকাতে ছাত্রদের চরিত্রহানি আশঙ্কা করিয়া ইংলিশম্যান পত্রিকায় এক চিঠি প্রকাশিত হয় এবং ইহার ফলে কতিপয় বেশ্যাকে ইংরেজী স্কুলের নিকট হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১২৬১ সনের ৩রা আশ্বিন তারিখের সংবাদ প্রভাকরে ইহার বিরুদ্ধে বেশ্যাগণের নামে এক প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার উল্লেখ করিয়া তাহাদের সপক্ষে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :

"ভদ্রকুলবধূ সুলোচনাগণ সর্ব্বসাধারণের লোচনানন্দদায়িনী হইয়া নিঃশঙ্কায় স্বামী বর্ত্তমানে পরপুরুষকে সুখ সম্ভোগ করিতেছে, কিন্তু তাহাতেও তাহারা ধন গৌরবে এবং স্বামী সত্বে সাধ্বী হইয়া পরমারাধ্যা ও অহল্যাদি পঞ্চকন্যা তুল্যা প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছে, হায় কি দুঃখ! আমরা পতি প্রতি অপ্রীতি প্রকাশ ও ত্যাগ করিয়াই কি এই অপরাধিনী হইয়াছি? এই প্রবলা কল্পিত কুলবালারা পুরুষ মন বিহঙ্গ ধৃত জন্য যে নব নিতম্ব বাগুরা বিস্তার করত ঈষদ্বস্ত্রাচ্ছাদিত বঙ্কিম নয়নে সহাস্য আস্যে যৎকালীন বারি আনয়ন ছলে স্কুলের নিকটবর্ত্তি বর্ত্মে গমন করে তৎকালীন কি বিদ্যার্থি বালকবৃন্দ নেত্র যুগল অঙ্গলী (? অঙ্গুলী) আচ্ছাদন দেয়? না সে সময়ে ফুলবান বাণে পরাভূত করে? অথবা কি কন্দর্প দর্পশূন্য হয়?"

এই প্রসঙ্গে কলিকাতা নিবাসিনী বেশ্যা স্বাক্ষরিত 'বিদ্যাদর্শন পত্রিকার' সম্পাদককে লিখিত এক চিঠিতে (১৭৬৪ শক) স্ত্রীলোকের ব্যভিচারের কারণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"মহাশয় যে নিয়মক্রমে বিদ্যাদর্শন প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত এবং ভরসাযুক্ত হইয়াছি। আমার নিকটে এক পণ্ডিত সর্ব্বদা গমনাগমন করেন তিনি বিদ্যাদর্শনের প্রথম সংখ্যাবধি চতুর্থ সংখ্যা পর্য্যন্ত আমার সম্মুখে পাঠ করিয়াছেন, তাহার সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বোধ হইল, যে এই পত্র কেবল আমারদিগের অর্থাৎ (স্ত্রীলোকদিগের) হিতার্থেই সৃষ্টি হইয়াছে। এই সুযোগে আমি আপন দুঃখের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে

বাসনা কায়, এবং বোধ করি যে তাহা জনসমাজে উপদেশজনক হইবে। যদিও আমার বিদ্যা এবং লিপিনৈপুণ্য নাই, কেননা আমি বঙ্গদেশের স্ত্রী, কিন্তু আমার অভিপ্রায় সকল কথিত পণ্ডিত মহাশয় দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতে কৃপণ হইবেন না।

"আমি শান্তিপুর নিবাসী এক কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলাম, শৈশবকাল বাল্যক্রীড়ায় যাপন হইয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইল, তথাপি পিতামাতা বিবাহের উদ্যোগ করেন না; ইহাতে একদিন আমি প্রতিবাসিনী কোন রমণীর নিকটে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অবগত হইলাম, যে তিন বৎসর অপেক্ষাও অল্প বয়ঃক্রম কালীন আমার বিবাহ হইয়াছে। এই বাক্য শ্রবণ মাত্র আমি একেবারে স্তব্ধ রহিলাম। পরন্তু যখন আমার ষোড়শবর্ষ বয়স তখন কোন দিবস অপরাহ্ণে পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স্ক একজন মনুষ্য আমারদিগের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং পরিচয় গ্রহণ দ্বারা জানা গেল মাত্র অন্তঃকরণ কম্পিত হইল। লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ, সংশয় প্রভৃতি ভাবের এ প্রকার আন্দোলন হইয়াছিল, যে আমি আর লোক সমাজে মিশ্রিত হইবার অভিলাষ একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলাম তাঁহার কুৎসিত আকৃতি, গলিত অঙ্গ এবং পক্ক কেশাদি দর্শন করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম। আমি জ্ঞানতঃ তাঁহাকে বরণ করি নাই, কদাপি তাঁহার সহিত জ্ঞানাবস্থায় সাক্ষাৎ নাই, তাঁহার সহিত আমার মনের ঐক্য বা প্রণয়ের সঞ্চার হয় নাই অথচ তিনি আমার পতি আমার সুখের মূলাধার, কি আশ্চর্য্য তাঁহার মূর্ত্তি যেমন কুৎসিত রজনীতে তাঁহার ব্যবহারও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ হইল। যাহা হউক পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আমার পিতার নিকট কিঞ্চিৎ ধনসংগ্রহ-পূর্ব্বক যে প্রস্থান করিলেন সেই পর্য্যন্ত আর দর্শন হয় নাই। একে আমার যৌবনোত্তম, তাহাতে এবম্প্রকার বিড়ম্বনা সকল সঙ্ঘটন হওয়াতে যেরূপ যাতনা বোধ হইল বিশেষতঃ জীবনের সুখ যে পতি সম্ভোগ, তাহাতে এককালীন বঞ্চিত হইয়া অন্তঃকরণ যে প্রকার অস্থির হইল, তাহা কি বলিব। মাসাবধি দিবারাত্রি কেবল ক্রন্দন করিয়াছি। যদিও আমার নিতান্ত চেষ্টা ছিল, সৎপথে রহিব, এবং কুল ধর্ম্ম রক্ষা করিব কিন্তু অবশেষে জ্বালাতন হইয়া ব্যভিচারের পথকে অবলম্বন করিয়াছি, এবং স্বাধীন মনে কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক মেছোবাজার-বাসিনী হইয়াছি।

"আমি এ স্থলে বসতি করিলে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীও স্বামীর সহিত অনৈক্য এবং বিবাদ করিয়া গত বৎসর আমার সহবাসিনী হইয়াছেন। তদ্ব্যতীত আমার

বাল্যকালের বিংশতি জন সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহারা আমার ন্যায় কলিকাতার স্থানে স্থানে অধিবাস করিতেছেন।"[১৮]

৩। আমোদ উৎসব

হিন্দু জাতির ধর্মগত প্রাণ। সুতরাং আমোদ উৎসবও যে অনেকটা ধর্মকেন্দ্রিক হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। দুর্গা পূজা এদেশে কখন প্রথম প্রচলিত হয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ ও মতভেদ আছে। ইহা খুব প্রাচীন না হইলেও ষোড়শ শতকে যে ইহা একটি প্রধান ও লোকপ্রিয় ধর্মানুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আঠারো শতকেই ইহা যে খুব আমোদ প্রমোদের সহিত সম্পন্ন হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।[১৯]

হলওয়েল সাহেব ১৭৬৬ সনে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে দুর্গা পূজা হিন্দুদিগের একটি প্রধান উৎসব—এই উপলক্ষে সাহেব মেমদের নিমন্ত্রণ হয় এবং প্রতি সন্ধ্যায় ভোজন, নৃত্য গীত প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে। ১৭৯২ সনের Calcutta Chronicle পত্রিকায় সুখময় রায়ের বাড়ীতে নৃত্য-গীতের বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে এবং সঙ্গীতে হিন্দুস্থানী ও ইংরেজী সুরের সংমিশ্রণের উল্লেখ আছে।[২০]

১৮২৬ সনের ১২ অক্টোবর তারিখের Government Gazette পত্রিকায় দুর্গা পূজার ব্যয়বহুল ও বিচিত্র আমোদ উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ আছে। বাবু গোপীমোহন দেবের বাড়ীতে অনেক উচ্চপদস্থ সাহেব মেমের সমাগম এবং ভোজ ও মদ্যপান হইয়াছিল। মুসলমানী বাইজী ছাড়াও ব্রহ্মদেশীয় কয়েকটি নর্তকী ও গায়িকার আমদানি করা হইয়াছিল, একজন লোক বোতলের কাচ খাইয়া এবং আর একজন কাষ্ঠ নির্মিত অশ্বের উপর দুটি কাঠের 'রণ পা' (stilt) অবলম্বনে ভূমি হইতে ১০।১২ ফুট উচ্চে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।[২১]

তৎকালে দুর্গাপূজায় এই শ্রেণীর আমোদ প্রমোদ কেবল কলিকাতাতেই আবদ্ধ ছিল না। চুঁচুড়া (হুগলী) শহর নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ হালদার ১৮২৭ সনে ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে Government Gazette পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়া সাহেব মেম ও বাঙ্গালী জনসাধারণকে জানাইয়াছেন যে যাঁহারা নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছেন এবং যাঁহারা পান নাই সকলেই যেন তাঁহার বাটিতে ২৭শে হইতে ৩০শে পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষে নৃত্যোৎসবে (Grand Nauch) যোগ দান করেন এবং ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়দিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন যে তাঁহাদের টিফিন,

ডিনার ও সুরাপানের উত্তম বন্দোবস্ত থাকিবে।[২২]

১৮২৯ সনে উক্ত পত্রিকায় দুর্গাপূজার বিবরণে লেখা হইয়াছে যে, মেম ও সাহেবেরা সঙ্গীত ও খানাপিনার লোভেই এই উৎসবে যোগদান করেন এবং মদের প্রভাবে তাঁহারা বেসামাল হইয়া যেরূপ হৈ হুল্লোড় করেন তাহাতে ইংরেজদের সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মনে বিরূপ ধারণাই জন্মে।

এই উৎসবের ব্যয়বাহুল্যের উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছে যে, ওয়ার্ড (Mr. Ward) সাহেবের হিসাব মত কেবল কলিকাতা শহরেই দুর্গোৎসবের খরচ হয় (সেকালের) পঞ্চাশ লক্ষ টাকা—আর হাজার পাঁঠা বলি হয়।[২৩]

১৮৫৪ সনে 'সংবাদ প্রভাকরে' দুর্গাপূজার যে বর্ণনা আছে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"নগরে মহামায়া মহেশ্বরীর মহা মহোৎসব অতি সমারোহপূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে, ধনাঢ্য পরিবারেরা অতি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, শোভাবাজারস্থ নৃপতিদিগের উভয় নিকেতনে নৃত্য গীতাদির মহাধুম হইয়াছিল, সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া সেই নাচের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, লোভ (?) দেবের প্রিয় শিষ্য শ্বেতাঙ্গ ও আন্দ্রু পিন্দ্রু গোমিস্ ও গানসেলবস্ প্রভৃতি কৃষ্ণাঙ্গগণ যাঁহারা মোদের বেলাত ও মোদের কুইন বলিয়া গর্ব্ব পর্ব্ব বৃদ্ধি করেন তাঁহারা এই পূজোপলক্ষে রাজভবনে উপস্থিত হইয়া বিলক্ষণরূপে উদর পূরণ করিয়াছেন।

"যোড়াসাঁকো নিবাসি মিষ্টভাসি পরহিত তৎপর শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় স্বীয় কুল-প্রতিমা সিংহবাহিনী দেবীর পূজার পালা প্রাপ্ত হইয়া আপনারদিগের রম্য নিকেতন অমর ভবনের ন্যায় সুসজ্জিভূত করিয়াছিলেন, নাচের মজলিস দর্শনে দর্শক মাত্রেরই চিত্তক্ষেত্র পুলকালোকে পরিদ্বীপ্ত হইয়াছিল, গায়িকাগণের তানমান শ্রবণ ও সুন্দর অঙ্গ ভঙ্গিমা দর্শনে অনেকেই মোহিত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে রণবাদ্যবৎ চিত্ত প্রফুল্লকর ইংলণ্ডীয় বাদ্য ব্যাদন হইবায় সকলেই এক একবার মহা আনন্দ অনুভব করিয়াছেন; যে দিবস ইংরেজদিগের সভা হইয়াছিল সেই দিবস অনেকানেক সম্ভ্রান্ত সাহেব তথায় সমাগত হইয়াছিলেন।"[২৪]

দুর্গাপূজার প্রায় এক মাস দেড় মাস পূর্ব হইতেই সর্ব শ্রেণীর বাঙ্গালীর মনে কি আনন্দ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকার ১৮৫৬ সনের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত একখানি পত্রে চমৎকার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

"বাই খেমটাওয়ালী প্রভৃতি নর্ত্তকীগণ দুর্গোৎসবের সময় বড় মানুষ

বাবুদিগের বাটীতে স্বকীয়া মনোমোহিনী বিশুদ্ধ তান লয় স্বরে গান করিয়া সকলের মনোমোহন করিতে পারিবে এই নিমিত্ত সংগীত শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছে, যাত্রাওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা, কবিওয়ালা প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়স্থ লোকেরা সেইরূপ সংগীতালোচনা করিতেছে, যাহারা আবার দূরদেশে যাইবে তাহারা গমনোদ্যোগ করিতেছে, বারাঙ্গনাকুল দুর্গোৎসবোপলক্ষে চাতুরী করিয়া স্ব স্ব ক্রেতাদিগের মনোরঞ্জন করিতেছে, তাহারদিগের প্রেম যে মিথ্যা ও মৌখিক এবং ক্ষণিক ইহা সকলেই জানে গৃহস্থদিগের গৃহিণীরা বলিতেছে এবারে কর্ত্তাটী পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ, জামাতা দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও ভৃত্যবর্গকে কিরূপ কাপড় চোপড় দিবেন তাহার ঠিকানা নাই, যুবতীগণ শয়ন মন্দিরে যামিনীযোগে সুযোগ পাইয়া পূজার সময় কি কি আবশ্যক তাহা নিজ নিজ স্বামীর নিকট হাস্য পরিহাস ছলে কহিতেছে, অল্প বয়স্ক বালকেরা কাপড় জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, পূজার সময় অনেক দিবস পাঠশালার ছুটি হইবে এ নিমিত্ত পাঠার্থিগণ মহানন্দ করিতেছে। কিরূপে এই বক্রী কয়টা দিবস যায় তাহা চিন্তা করিতেছে, যাহারা বিদেশীয় ছাত্র তাহাদিগেরও আমোদের সীমা নাই, তাহারা ছুটি প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব বাটীতে গিয়া মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীদিগকে সন্দর্শন করিতে পারিবে।"[২৫]

দুর্গোৎসব উপলক্ষে ধর্মভাবের অভাব, নৃত্যগীত, সাহেব ভোজন এবং অর্থের অপব্যয় প্রভৃতির জন্য প্রথম হইতেই একশ্রেণীর লোক তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৮২৬ সনের Government Gazette পত্রিকায় একজন ইংরেজ লেখক (সম্ভবতঃ সম্পাদক) ইহার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া নিমন্ত্রণ কর্ত্তা বাঙ্গালী ও ইংরেজ যোগদানকারী উভয়েরই নিন্দা করিয়াছেন।[২৬]

জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা (১৮৩২ খৃষ্টাব্দ) দুর্গাপূজায় আমোদ আহ্লাদের ন্যূনতা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে :

"হিন্দুদের প্রধান কর্ম্ম যে দুর্গোৎসব তাহাও এবৎসরে অনেক ন্যূনতা শুনা যাইতেছে। পূর্ব্বে এতন্নগরে ও অন্যান্য স্থানে দুর্গোৎসবে নৃত্যগীত প্রভৃতি নানারূপ সুখজনক ব্যাপার হইয়াছে। বাইনাচ ও ভাঁড়ের নাচ দেখিবার নিমিত্তে অনেক ইংরেজ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া এমন জনতা করিতেন যে, অন্যান্য লোকেরা সেই সকল বাড়ী প্রবিষ্ট হইতে কঠিন জ্ঞান করিতেন। এবৎসরে সেই সকল বাড়ীতে ইতর লোকের স্ত্রীলোকেরাও স্বচ্ছন্দে প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া দেখিতে পায় এবং বাইজীরা গলী গলী বেড়াইয়াছেন তত্রাপি কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই অনেকে এ বৎসর পূজাই করেন নাই এবং যাহাদের বাড়ীতে পাঁচ সাত তরফা

বাই থাকিত এবৎসর কোন বাড়ীতে বৈঠকি গানের তালেই মান রহিয়াছে কোন কোন স্থলে চণ্ডীর গান ও যাত্রার দ্বারাই রাত্রি কাটাইয়াছেন দুর্গোৎসবে প্রায় বাড়ীতে এমন আমোদ নাই যে লোকেরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে এবং যাহারা আল করিয়া কাল বিনাশ করিতেন তাঁহারাও প্রায় এতদ্বর্ষে বাতীর স্বাশ্রয় করিয়াছেন; অতএব দুর্গোৎসবে যে আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বে ছিল এবৎসরে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে অনেকে কহেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ধন শূন্য হওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছে ইহা হইতেও পারে…"।[২৭]

কিন্তু ঐ পত্রিকাই সাত বৎসর পরে (১৮৩৯) লিখিয়াছে:

"বর্ত্তমান বর্ষীয় শারদোৎসবোপলক্ষে নৃত্য সংদর্শনার্থ খ্রীষ্টিয়ানগণের মধ্যে অত্যল্প মনুষ্য আগমন করিয়াছিলেন এতদ্দর্শনে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি আর যখন সর্ব্বসাধারণের একেবারে এতদ্বিষয়ে উৎসাহ পরিত্যাগ করিবেন তাহা আমরা আরো অধিক সন্তুষ্ট হইব কারণ তাহাতে তাঁহারদিগের জ্ঞান ও সুনীতি এবং অন্যান্য বিদ্যার আধিক্য হইবে। আমরা অনুমান করি যে এতদ্দেশীয় ধনী বিশিষ্ট মনুষ্য যাঁহারা নৃত্য বিষয়ে উৎসাহ করিতেন এইক্ষণে ঐ নৃত্য ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ধর্ম্ম সভায় নিন্দিত এবং জ্ঞানি বিদ্বিষ্ট এই বোধ করিয়া পরিত্যাগ করিবেন যদ্যপি তাঁহারা উৎসবোপলক্ষে উৎসাহই করেন তবে তাঁহারা ঐ যবন রমণীর নৃত্যের পরিবর্ত্তে অন্য কোন উৎসাহ করেন কেননা মহৎ ভদ্র জ্ঞানী জনগণ দর্শন করণে সমর্থ হয়েন।"[২৮]

দুর্গাপূজায় বাহ্যিক আড়ম্বর ও ধর্মভাবের অভাব সম্বন্ধে 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'য় এক বিস্তৃত আলোচনা ১৮৬২ সনে প্রকাশিত হয়। ইহা প্রতিমা-পূজা বিরোধী আদি ব্রাহ্ম সমাজের মুখপাত্র, সুতরাং দুর্গাপূজায় উৎসাহ ও সহানুভূতির অভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহাতে যুক্তি তর্কের সহায়তায় দুর্গোৎসবের অন্তঃসারশূন্যতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে তৎকালীন আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের মনোভাব অনেক পরিমাণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। সুতরাং ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"দুর্গোৎসব বঙ্গবাসীদিগের প্রধান উৎসব। পৌত্তলিকতার সঙ্গে যত প্রকার দোষ থাকিতে পারে, ইহার মধ্যে তাহার সকলই আছে। দুর্গোৎসবের সময় লোকের অর্থগৌরব প্রকাশ করিবার সময়। দুর্গোৎসবের সময় আমোদ, প্রমোদ, অত্যাচার ও উন্মত্ততার সময়। যেখানে যাও, ধূপ ধুনার গন্ধ—নৃত্যগীতের

আমোদ—ছাগ মহিষের রক্তস্রোত—বাদ্যধ্বনি, জন কোলাহল নয়ন ও মন আকর্ষণ করে। এ সময়ে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল লোকের মন মহা-উৎসাহে উত্তেজিত হয় যথার্থ দেশহিতৈষীর মন নিরুৎসাহে পূর্ণ হয়। পৌত্তলিকতার দূষিত দুর্গন্ধ বায়ুর মধ্যে যখন আর আর সকলে উল্লসিতচিত্তে সঞ্চরণ করিতে থাকে, তিনি সত্যের মহিমা ম্লান দেখিয়া এই উৎসব কোলাহলের মধ্যে মৌনভাব ধারণ করেন। ..

"বাহিরের আড়ম্বর এই প্রকার যে তাহাতেই মন সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বর উপাসনার ভাব কিছুই নাই। মনকে ভুলাইয়া রাখিবার নানা সামগ্রী রহিয়াছে। নানাবিধ লোক একত্র হইয়াছে,—বলিদান হইতেছে—বাদ্যধ্বনি উঠিতেছে। যাঁহার নিকটে মনের কুপ্রবৃত্তি সকলকে বলিদান দিতে হইবে তাঁহার সম্মুখে নির্দোষী ছাগ-মহিষের রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।...

"প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দুর্গোৎসবের যে সকল দোষ উল্লেখ করা গিয়াছিল, এখনো সেই সকল দোষ সম্পূর্ণই আছে। দুর্গোৎসবের "উদ্যোগে অমঙ্গল, উৎসবের সময়ে অমঙ্গল, এবং ইহার সমাপ্তিতেও প্রচুর অমঙ্গল দ্বারা প্রতি বৎসর এই সময়ে বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।" "এদেশে সম্বৎসর যত দুষ্কর্ম্ম হয়, এই তিন দিবসে তাহা সম্পূর্ণরূপে কৃত হয়। এই সকল দুষ্কর্ম্ম স্বভাবতই অপরাধের কারণ, কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে তাহারা বিষম অপরাধের হেতু হইয়াছে। ধর্ম্ম অনুশীলনের নির্দ্দিষ্টকাল যাহারদিগের সম্পূর্ণ অধর্ম্ম আচরণের কাল হয় এবং ঈশ্বর উপাসনার নিমিত্তে নির্ম্মিত স্থান যাহারদিগের কুকর্ম্মসূচক আমোদের সম্ভোগস্থল হয়, তাহাদিগের আর নিষ্কৃতির উপায় কি? এদেশস্থ লোকের এই প্রকার বিপরীত প্রকৃতি দেখিয়া কে না বিস্মিত ও দুঃখিত হয়?

"পূজায় তিন দিন পাপের স্রোত বহিতে থাকে। এই তিন দিনে শত শত শরীর অবসন্ন হয়, মন দুর্ব্বল হয়, নীচ প্রবৃত্তি সকল প্রদীপ্ত হয়।"[২৯]

কিন্তু ১৪ বৎসর পরে (১৮৭৬ সনে) উক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দুর্গাপূজা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্যভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্গাপূজার ঐতিহাসিক তথ্য ও দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার পর ইহার সামাজিক আকর্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে:

"তৃতীয় সমাজ, এই উৎসবে সমাজের বহুতর আয়োজন। লোকে সংবৎসর-কাল মিতাচারে অবহাইরূপ ধন সংগ্রহ করিয়াছে এবং তাহা ব্যয় করিবার সময় উপস্থিত। হিন্দুজাতি স্বার্থপর নয় কেবল স্ত্রী-পুত্র ইহাদের সর্ব্বস্ব নয়। ইহারা

লৌকিকতা রক্ষা করা বিলক্ষণ বুঝে। স্বসম্বন্ধী স্বগন্ধী কে কোথায় আছে এই সময়ে তাহার তত্ত্ব লওয়া হয়। ফলত এসময়ে হিন্দু সমাজ একটি নূতন জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বিদেশী কর্ম্মস্থান হইতে বিদায় লইয়াছে, বহুদিবস পর গুরুজনের শ্রীচরণ দর্শন করিবে, পত্নী উৎসুক মনে পথের পানে চাহিয়া আছে, তাহাকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিবে, শিশুগুলি চটুল নেত্রে প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিবে এবং বন্ধু-বান্ধব বহুদিন যাবৎ দূরে আছেন, তাহাদিগকে পাইয়া সুখী হইবে ; এইজন্যই দুর্গোৎসব মহোৎসব।"

উপসংহারে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"দুর্গোৎসব কেবল বঙ্গদেশের নয়, ইহা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথায় এই উৎসব দশাহ নামে প্রসিদ্ধ। এই উৎসব থাকাতে এতদ্দেশীয় শিল্প নানারূপ শিল্পের উদ্ভাবন করিতেছে, বাণিজ্য সজীব রহিয়াছে, নৃত্যগীত বিলুপ্ত হয় নাই, কবিত্ব অপ্রতিহত স্রোতে চলিতেছে, দয়া নির্ব্বাণ হয় নাই, প্রীতি স্নেহ নূতন বলে আবির্ভূত হইয়া থাকে, এবং শত্রুতা বিদূরিত ও সদ্ভাবও বদ্ধমূল হয়। ফলত এই উৎসবের উপকারিতা যথেষ্ট। ইহা দ্বারা কনিষ্ঠাধিকারীদিগের ধর্ম্মভাবও রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এই উৎসবের যেরূপ গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা যদি ,তাহা মূর্ত্তি বিশেষের প্রতি নিয়োজিত না হইয়া অনন্ত ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইত তাহা হইলে ইহার শোভা কতই না বৃদ্ধি পাইত। যাহা হউক, এই উৎসবে হিন্দু সমাজে যতটুকু উপকার তাহা কিছুতেই অস্বীকার করি না ; গুরুজনকে প্রণিপাত, স্নেহের পাত্রকে আশীর্ব্বাদ এবং প্রীতিভাজনকে আলিঙ্গন এই সমস্ত সুরীতি অবশ্যই প্রশংসনীয়, কিন্তু এই উৎসব প্রসঙ্গে যে ভয়ানক পাপাচার সকল প্রশ্রয় পায়, মদ্য যে অতিমাত্রায় হৃদ্য হইয়া উঠে আমরা হৃদয়ের সহিত তাহা ঘৃণা করিয়া থাকি।"৩০

১৮৭৭ সনে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর সহানুভূতি ও হৃদয়াবেগের সহিত দুর্গোৎসবের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

গোঁড়া হিন্দুদিগের পক্ষ হইতেও দুর্গোৎসবের কোন কোন অঙ্গের কঠোর সমালোচনা হইয়াছে। হিন্দুর পূজা উপলক্ষে সাহেবদের নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করিয়াছেন :

"পরন্তু হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে পর্ব্বাহ দিবসে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করা অতিশয় নিষিদ্ধ। একারণ বহুবাজার নিবাসি ধনরাশি পরম বদান্যবর দত্তবাবুরা রাসের কয়েকদিবস সাহেবদের নিমন্ত্রণ না করিয়া রাস শেষ হইলে এক দিবস

তাহারদিগকে অতি সম্মানপূর্ব্বক আহ্বান করত খানা ও নাচ দেন। অন্যান্য ধনাঢ্য হিন্দু মহাশয়েরা যদ্যপি এই নিয়মের অনুগামি হয়েন তবে অতি উত্তম হইতে পারে।"৩১

১৮৫১ সনে দুর্গাচরণ দত্তের বাড়ীতে রাসযাত্রার সময় সাহেবদের নিমন্ত্রণ না হওয়াতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

১৮৫৬ সনের ৩০শে অগষ্ট তারিখে 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকাতে দুর্গাদেবীর পদে প্রণামী দিবার প্রথা সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে :

"বঙ্গদেশে বিশেষতঃ মহানগর কলিকাতায় অনেক পূজা হইয়া থাকে, তাহাতে সকলেই প্রায় আপনার বান্ধব কটুম্বাদিকে দেবতা দর্শন জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিয়ম মত সকলের ঘরেই দেবদর্শন জন্য প্রণামী দিতে হয়, এই নীতি যদিচ অতি প্রবলা হইয়া চলিতেছে তথাপি এতদ্বারা সামাজিকে অনেক অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহার জন্য অনেককেই দৈন্য-দশা প্রযুক্ত স্বকীয় পরম মিত্রের ভবনেও গমন করিয়া দেবতা দর্শন ও অন্যান্য প্রকার আমোদ প্রমোদ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ... নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলে কাহারো গৃহে চারি আনা, কাহারো গৃহে আষ্ট আনা এবং কাহারো গৃহে এক টাকা দিতে হয় এইরূপ নিয়মে যদি ১৫/১৬ স্থানে মান রক্ষা করিয়া ভ্রমণ করেন তবেই দীন ব্যক্তির পক্ষে প্রতুল।

"ঠাকুর দর্শন করিয়া যাহা প্রণামী দেওয়া যায় তাহা গৃহস্থ ব্যক্তি লাভ করেন, কাহারো বা গুরু পুরোহিতেরাই সেই প্রণামী দিবার সময় কে কি দিল তাহা লিখিয়া রাখিতে হয়, ইহার অভিপ্রায় এই যে বাটীর কর্ত্তা যখন আবার সেই সেই লোকের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইবেন তখন সেই সেই নিয়মে দিতে হইবেক ইহা এক প্রকার বার্ষিক বলিলেও বলা যাইতে পারে কিন্তু বড় মানুষদিগের পক্ষেই এইরূপ প্রণামী দেওয়া সাজে, দৈন্যদশাগ্রস্ত ভদ্র সন্তানদিগের তাহা মর্ম্মান্তিক হয়।

"এইরূপ অনেককেই দেখা গিয়াছে তাঁহারা কোন কোন পূজা করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণও এই প্রকার সরস্বতী পূজাদি করিয়া থাকেন এবং বারাঙ্গনারাও নানাপ্রকার পূজা করে, সকলের পক্ষে পূজা প্রণামী জমিদারীর খাজনার ন্যায় হইয়াছে।"৩২

পর বৎসর উক্ত পত্রিকায় উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পুস্তকালয় বা গ্রন্থমন্দির প্রতিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে :

"ধন থাকিলে কি হয়, সৎকর্ম্মে ব্যয় না করিলে সে ধনে কোন ধনী ধনী

গণ্য হইতে পারেন না, অনেকের ধন আছে এবং তাঁহারা অপকর্ম্মে ব্যয় করিতেও পারেন, বেশ্যালয়ে, দোল, দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা, শ্যামা পূজা, নন্দোৎসব, যাত্রা মহোৎসবাদি ব্যাপারে কত ব্যক্তি কত অপব্যয় করিতেছেন, সাধারণ মঙ্গল কার্য্যে এক পয়সা দিতেও মস্তক নত করেন। যে দিবস পৃথিবী হইতে গমন করিবেন সেদিনে তাঁহাদিগের প্রচুর ধন কোথায় থাকিবে, অনেকে নানাপ্রকার অসদুপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন স্ত্রী পুত্রাদি সে সকল ধন উড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহারদিগের পিণ্ডদানের উপযুক্ত ব্যয় করেন নাই, ধনীগণ প্রতিদিন এই সকল দেখিতেছেন তথাচ কেমন কুহকে পড়িয়াছেন সৎকর্ম্মে ধনের কর্ম্ম করিতে পারেন না, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণ কার্য্যে অকাতরে ধনের কর্ম্ম করিতেছেন অতএব আমরা পথপ্রদর্শক শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত সৎকর্ম্মে ধন দিয়া সকলের ধনের কর্ম্ম করুন, অবশেষে প্রার্থনা করি দেশকুল কীলালতৃষ্ণ জয়কৃষ্ণবাবু দীর্ঘজীবী হইয়া কুশলে থাকুন।"৩৩

দুর্গাপূজা ব্যতীত শ্যামা পূজা, সরস্বতী পূজা, হংসেশ্বরী পূজা, রাসোৎসব প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই সমুদয় পূজা ও উৎসব সম্বন্ধে সমসাময়িক পত্রিকার বিবরণ কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

১। শ্যামাপূজা

'সংবাদ ভাস্করের' (১লা নভেম্বর, ১৮৫৬) সম্পাদকীয় মন্তব্য :

"কলিকাতার মধ্যে এবং চতুর্দ্দিগে শ্যামাপর্ব্ব উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে কোন বিঘ্ন হয় নাই, কলিকাতা নগরীর প্রধান প্রধান ধনিদিগের সকলের বাড়ীতে শ্যামা পূজা হয় না। যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহারাও শ্যামা-পূজায় সমারোহ করেন না, নিয়মরক্ষার মত সংক্ষেপেই সারেন, কম্বোলীয়াটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মৈত্রি মহাশয় শ্যামাপূজায় সমারোহ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাটীতে দান ভোজন ও নৃত্য গীতাদির বিলক্ষণ আমোদ হইয়াছিল এবং বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মিত্র মহাশয়ও শ্যামা পূজায় ব্যয় করিয়াছেন।······

"মিত্র বাবুরা প্রতি বৎসর শ্যামাপূজার ভগবতীর আপাদমস্তক স্বর্ণমণ্ডিত করিতেন, আর তৈজসবস্ত্রাদি কত দিতেন, তাহার সংখ্যা ছিল না। চারি পাঁচ মোন তণ্ডুল না হইলে এক একটি নৈবেদ্য হইত না, নৈবেদ্যের পশ্চাদ্ভাগে মনুষ্য লুক্কায়িত হইয়া থাকিতে পারিত এক একটি সন্দেশের পরিমাণ দশ সেরের ন্যূন

ছিল না অর্দ্ধ যোন পরিমিত এক এক সন্দেশ কেবল ঐ বাড়ীতেই হইত। মিত্র-বাবুদিগের সে পূজার সহিত তুলনা করিলে শ্যামাচরণবাবুর এ পূজার ব্যয় তাহার একাংশও বলা যায় না। তথাচ শ্যামাচরণ-পরায়ণ শ্যামাচরণ শ্যামাচরণ-পূজায় যাহা করিয়াছেন কলিকাতা নগরে অন্যত্র কুত্রাপি এমত হয় নাই, তবে অনেকে বিসর্জ্জন দিন রাত্রি সাত আট ঘণ্টা পর্য্যন্ত পথে পথে প্রতিমা দেখিয়া বেড়াইয়াছেন বটে তাঁহারদিগের পূজার এই ব্যয় বহুব্যয় যে রাত্রিকালে আলো করিয়া পথে পথে প্রতিমা দেখিয়া বেড়ান, এ দেশের অধিকাংশ লোক হাটে বাটে ধর্ম্মধ্বজিত্বের ঠাট দেখাইতে ভালবাসেন, শাস্ত্রে লেখেন শ্যামা সাধন অতি গুপ্ত সাধন, রাত্রিতেই পূজা, রাত্রিতেই বিসর্জ্জন, যাঁহাকে রজনীতে আবাহন করিয়া আনিলেন, যে ভাবেই হোক ইষ্টভাব দেখাইয়া অর্চ্চনা করিলেন এবং সেই রাত্রিতেই মন্ত্রযোগে বিদায় দিলেন যদি তন্ত্র মন্ত্র সত্য জ্ঞান করেন তবে মন্ত্র মতেই চলিতে হয়, তাঁহাকে পরদিন চণ্ডীমণ্ডপে উপবাসে রাখেন, একবিন্দু গঙ্গাজল একটি বিল্বদল দিয়াও সম্বর্দ্ধনা করেন না, রজনীতে সেই উপবাসিনী উলঙ্গিনী ঠাট হাটে বাটে বেশ্যা-দিগকে দেখাইয়া বেড়ান, যাঁহাকে মাতা বলেন তাঁহার এই অপমান করেন ইহাতে কি তিনি সন্তুষ্টা হন? মহাদেব যাঁহার শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া ধ্যান করিতে করিতে শবাকার হইয়া গিয়াছেন, সেই ভগবতীর এই প্রকার দুর্গতি কি ধর্ম্ম কর্ম্ম বলা যায়? তন্ত্র শাস্ত্রের কোন গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে? বরং বিরুদ্ধ প্রমাণ সকল দৃষ্ট হইতেছে।"৩৪

২। সরস্বতী পূজা

সংবাদ ভাস্করের (৩ ফেব্রুআরি, ১৮৫৭) সম্পাদকীয় মন্তব্য :

"নগর বাহিরে সরস্বতী পূজার বিলক্ষণ আমোদ হইয়াছিল, বরাহনগর নিবাসি শ্রীযুত রায় মথুরানাথ চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেক বিদায় প্রাপ্ত করিয়াছেন এবং রাত্রিযোগে নৃত্যগীতাদি সভায় নগরীয় মান্য লোকেরা গমন করিয়াছিলেন তাঁহারাও শ্রীযুত রায় চৌধুরী বাবুর শিষ্টাচার মিষ্টালাপে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কাশীপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু প্রাণনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাটিতেও ব্রাহ্মণ ভোজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়াদির সমারোহ হইয়াছিল, রাত্রি-যোগে নৃত্যগীতাদি সভাতেও ভদ্রলোকেরা আমোদ করিয়াছেন, শ্রীযুত মহারাজ নৈরেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর বহুজন ব্রাহ্মণগণকে নানা প্রকার উপাদেয় দ্রব্যাদি দ্বারা মহাভোজ দিয়াছেন এবং নৃত্যগীতাদি দর্শন শ্রবণার্থ এতদ্দেশীয় মান্য লোক সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও ভদ্রলোক মুখে প্রতিষ্ঠা লাভে নরবর

বাহাদুর পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন অন্যান্য স্থলেও সরস্বতী পূজায় দর্শকেরা হর্ষলাভ করিয়াছেন, সরস্বতী পূজায় কোন স্থলে কোন ব্যাঘাত শুনা যায় নাই।"৩৫

৩। হংসেশ্বরী পূজা

সংবাদ ভাস্করের (২৪ এপ্রিল, ১৮৫৬) বর্ণনা :

"কলিকাতা নগরীয় হাটখোলা প্রবাসি পুণ্যরাশি ধনী মহাজনগণ প্রতিবৎসর নন্দিঘাট নামক প্রসিদ্ধ স্থানে হংসেশ্বরী দেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এ বৎসর গত শনিবারে পূজারম্ভাবধি মঙ্গলবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহ করিয়াছিলেন তৎপরে মহামায়াকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাঠক মহাশয়েরা এ পূজাকে বারোএয়ারি পূজা জ্ঞান করিবেন না, বাবুরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া টাকা সংগ্রহ করেন না। সম্বৎসর ব্যাপিয়া আপনারদিগের বাণিজ্য লাভের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ রাখেন বৎসরান্তে এই পূজায় তিন চারি সহস্র টাকা ব্যয় করেন। পূজারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন কুণ্ড মহাশয়ের নামে সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হয়, পরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নানা স্থান হইতে আসিয়া উপযুক্ত বিদায় লইয়া যান। এ বিদায়ও অল্প বিদায় নয়, এতদ্দেশীয় ধনী লোকেরা বহু ব্যয়সাধ্য শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে নানা দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে যেরূপ বিদায় দিয়া থাকেন পূজক বাবুরাও সেইরূপ বিদায় করেন, প্রতি দিবস পূজায় বস্ত্র তৈজসাদি দ্বারা দেবী মণ্ডপ পরিপূর্ণ হয়, সামাজিক দানে চিনি পরিপূর্ণ উত্তমোত্তম থাল বিতরণ করেন এবং প্রতি দিবস ব্রাহ্মণাদি নানা জাতীয় ন্যূনাধিক দুই সহস্র লোকের আহার হয়। উত্তম উত্তম সন্দেশ ও নানা প্রকার মিষ্টান্নাদি সকল গৃহে প্রস্তুত করাইয়া ইতর সাধারণ সকলকে ঐ সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি-ভোজন দ্বারা সমানরূপে তৃপ্ত করেন। হংসেশ্বরী পূজায় চিঁড়া মুড়কী ব্যবহার নাই। লুচী, কচুরী, সন্দেশ, মিষ্টান্নাদি যে যাহা খাইতে চায় তাহাই পায়।……

"একাদশজন মহাজনের বাণিজ্য ধনে পরমেশ্বরী হংসেশ্বরী সিদ্ধবিদ্যার সাঙ্গোপাঙ্গ পূজা হয়। বাবুরা প্রতি রাত্রিতেই নৃত্যগীতাদি দর্শন শ্রবণ করাইয়া মহামায়ার আরাধনা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন কুণ্ড মহাশয় এই বৃহৎ কর্ম্মের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত থাকেন তাঁহার অধ্যক্ষতায় সর্ব্ব বিষয়ে সুপ্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সকল মহাজনগণ বৎসর বৎসর কেবল এই দান করেন এমৎ নহে, তাঁহারদিগের নিত্য দান অনেক আছে। যাহার যে বস্তুর বাণিজ্য প্রতি দিন বেলা দশ ঘণ্টা কালে বস্তুর কাঁটা উঠিলে যে যাইয়া যাচ্ঞা করে ঐ বস্তু অর্থাৎ চিনি তণ্ডুল লবণাদি পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া যায়। বাবুদিগের এইদানে কলিকাতা নগরে বহু

দেবালয়ে ভোগ রাগাদি হয়, এতন্নগরে বহুজন ধনী লোক বসতি করেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বাবুদিগের দানের মত প্রতিদিন দান কোথায় আছে ? বাবুরা বাহিরে আড়ম্বর দেখান না কিন্তু দান বিষয়ে তাঁহারদিগের আড়ম্বরের ন্যায় আড়ম্বর প্রায় নাই, এই সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা তাঁহারদিগের বাণিজ্যলাভ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা প্রার্থনা করি মহেশ্বরী হংসেশ্বরী হৃদয়োপরি বিরাজমানা হইয়া বাবুদিগের আরও শ্রীবৃদ্ধি করুন।"৩৬

৪। রাসের মেলা

সোম প্রকাশে (২১ বৈশাখ ১২৭১) প্রকাশিত চিঠি :

"জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি হরিণাভি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ গত চৈত্রী পূর্ণিমাতে এক রাস করিয়াছেন। ১০ই বৈশাখ অবধি ১২ই বৈশাখ পর্য্যন্ত তিনদিন এই রাসযাত্রা হইয়াছিল। আমি তিন দিনই উহা দর্শন করিয়াছি। যাহা দেখা গিয়াছে, অগ্রে সংক্ষেপে তাহার স্থূল স্থূল বিবরণগুলি বলিয়া এতদ্দ্বারা যাহা বুঝিতে পারিলাম, নিম্নে লিখিয়া দিতেছি—

"১০ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় রাস দেখিতে গমন করি, প্রথমে সদর রাস্তার উপরে নহবৎ ফটক ও লোকের ভিড়, তাহার পর দোকান। দোকান বড় অধিক আইসে নাই, কয়েকজন ময়রা মিঠাইকর, কয়েকজন মাতুর-ওয়ালা, জন দশবার মৎস্য ব্যবসায়ী, কয়েকজন মণিহারি, আর কয়েকজন ডাব-নারিকেল, আতোষবাজী, মাটির পুতুল, সরা ঢাক, বাঁশী, পাঁজী ও পট বিক্রয় করিতেছে। দোকানের পার্শ্বে অথবা রাস্তার দুই ধারে নানা প্রকার মাটির সঙ। সঙেরা যেন বিপণিগুলির প্রহরিস্বরূপ হইয়াছে, যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই নূতন নূতন সঙ আমার নয়নগোচর হইতে লাগিল। কতকদূর যাইয়া দেখি, একটা দরমার বেড়া দেওয়া ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে কলের পুতুল নাচ হইতেছে, ঢুলিরা নীচে দাঁড়াইয়া তালে তালে সঙ্গত করিতেছে। পুতুল নাচের পর একটি পুষ্করিণী, পুষ্করিণীতে কমলে কামিনী সঙ হইয়াছে। জলের উপর কতকগুলি সোলার পদ্ম ফুল এবং জেলে ডিঙি চড়া সকাওয়ারী মাটির শ্রীমন্ত সওদাগর ভাসিতেছে। কামিনীরূপা মাটির ভগবতী একধারে বসিয়া গজ গিলিতেছেন।

"রাস্তার সঙ দেখা শেষ হইলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ভাবিয়াছিলাম এখানেও কোন প্রকার আশ্চর্য্য সঙ থাকিতে পারে, কিন্তু সে কল্পনা সম্পূর্ণরূপে সত্য হইল না। বাটীর ভিতরে অতিশয় লোকের ভিড়। সেই ভিড়ের ভিতর একটি স্ত্রীলোক কীর্ত্তন করিতেছে।......

"কীর্ত্তনের সম্মুখেই দালানের উপর কাষ্ঠময় সিংহাসনে সকিশোরী ত্রিভঙ্গ রাসবিহারী দুলিতেছেন। চৌকীর পার্শ্বে মাটির গোপীগণ ও সোলার ফুল প্রভৃতি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে কতকগুলি প্রকৃত পুষ্পরিকী রহিয়াছে। এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, কি দালান, কি কীর্ত্তন স্থানে, কি পুতুল নাট্যশালা এবং কি রাস্তা, সকল স্থানেই প্রায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক।

"গ্রীষ্মের কল্যাণে সর্দ্দিগরমি হইবার উপক্রম হইল, আমি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গাতীরে আসিলাম। তথায় দুখানি ময়ূরপঙ্খীর উপর একদল স্ত্রী ও একদল পুরুষের সারি গাওয়া হইতেছিল। সারির কুৎসিৎ খোঁড় ও দর্শকদলের করতালি ও হরিবোলের ধ্বনিতে গঙ্গা যেন এক একবার লজ্জায় অধোবদন হইতেছেন। আমি ঐরূপ ব্যবহার দর্শন করিয়া দুঃখিত চিত্তে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। রাত্রিতে খেমটার নাচ, একদিন বৈঠকী গাওনা ও দুইদিন যাত্রা হইয়াছিল।

"এই স্থানে রাসযাত্রার ফলের বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় ও নানা স্থানের লোকের সমাগম হওয়াতে ব্যবসায়ের বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু ভিড়ের ভিতর অনেক লম্পট স্ত্রীলোকের প্রতি অনুচিত ব্যবহার করে। .....

"কীর্ত্তনের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিদিগের ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মকথা শ্রবণ করা হয় বটে, কিন্তু কাজে তাহা ঘটিয়া উঠে না। আমি দেখিলাম, অনেক শ্রোতা নীচে ও উপরের বারাণ্ডার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন। ফলতঃ নবীন বাবু অনাবৃত স্থানে স্ত্রীলোক বসাইবার নিয়ম করিয়া ভাল করেন নাই। গঙ্গায় সারি গাওয়ার কথা ত মুখেই আনিবার নয়। খেমটার নাচও অতিশয় অনিষ্টকর। নর্ত্তকীরা যত নৃত্য করিতে পারুক আর না পারুক, বাবুদিগকে কটাক্ষে মোহিত করিয়া অর্থ শোষণ করে। এই দুটী বিষয় দর্শকদিগের চরিত্রদোষ সম্পাদনের প্রধান কারণ, রাসযাত্রা যখন হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত তখন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিরা উহা করিতে পারিবেন না, ইহা বলা অন্যায়, কিন্তু এ সকল উপসর্গ কেন? ভদ্রলোকের বাটীর ভিতর গোপাল উড়ের যাত্রা দেওয়া কোন্ যুক্তির অনুসারী কার্য্য? এই যাত্রার সকল অঙ্গই প্রায় আদিরস ঘটিত, বিশেষতঃ যখন মালিনী আইসে, তখন কোন্ ভদ্রলোক অনাবৃত কর্ণে বসিয়া স্থির থাকিতে পারেন?......

"উপসংহার স্থলে নবীন বাবুর প্রতি আমার একটি বক্তব্য আছে। তিনি পূজার ন্যায় অঙ্গ ব্যতিরেকে জলকীর্ত্তন, খেমটা এবং গোপাল উড়ের যাত্রাতে যত

টাকা ব্যয় করিলেন, অথবা জলে ফেলিয়া দিলেন, অন্য কোন সৎকার্য্যে এই টাকা দিলে কি ইহা অপেক্ষা অধিকতর আমোদ, প্রশংসা ও পুণ্যলাভ করিতে পারিতেন না? শাস্ত্রে কি বেশ্যার নৃত্য ও খেঁউড়ে পূজার অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে? একটি আহ্লাদের বিষয় এই যে, নবীনবাবু বাজী পোড়াইয়া কতকগুলি টাকা হুতাশন মুখে আহুতি প্রদান করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে জগদ্দলনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোলকনাথ ঘোষ গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষে তিন দিন অনেকগুলি টাকা জলে ও অনলে নিক্ষেপ করিয়াছেন।"[৩৭]

৫। চৈত্রপর্ব

সোম প্রকাশে (২৯ চৈত্র ১২৭৮) প্রকাশিত চিঠি :

"মহাশয়! এই পর্ব্বোপলক্ষে আমাদিগের গ্রামের লোকেরা অসীম অর্থ ব্যয় করিয়া যে কতদূর আনন্দ প্রকাশ করেন, তাহা বর্ণনাতীত। এই গ্রামবাসী লোকেরা চারিটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত, অর্থাৎ এই পর্ব্বোপলক্ষে চারি পাড়ার লোকে এক একদল হইয়া মহোৎসাহ সহকারে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, এবং এই কার্য্য সমাধা করিতে পারিলেই তাঁহারা আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন। ইঁহারা চৈত্রমাসের প্রথমদিবসে আনন্দ সূচক ধ্বজা উত্তোলন করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের বিপক্ষবর্গকে অবগত করাইয়া থাকেন যে আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থব্যয় করিয়া এবং নানাবিধ বাদ্য বাদন করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিব। এইরূপে প্রথম দিবসাবধি সংক্রান্তি পর্য্যন্ত প্রত্যহ মহা মহোৎসবে নানাবিধ নৃত্যগীত হইয়া থাকে। গ্রামস্থ অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পর গানের উত্তর প্রত্যুত্তর দেন এবং মাসের শেষ দুই দিবসে উত্তম যাত্রা ও নৃত্যাদি হইয়া পর্ব্ব সমাপ্ত হয়। মহাশয় চৈত্রপর্ব্বের কি অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য! এ সময়ে ভদ্রাভদ্রের কিছুই বিচার থাকে না, সকলেই সমবেত হইয়া নৃত্যাদি করেন।

"সম্পাদক মহাশয়! বরং ছেলে ছোকরাদের পার আছে কিন্তু গ্রামের আশীতিবর্ষ বয়স্ক ব্যক্তিগণ যে কি পর্য্যন্ত ঘৃণিত কার্য্যে রত হন তাহা বলা যায় না, এমন কি আমিও এক সময়ে আহ্লাদে মগ্ন হইয়া বাঁশ বহন এবং নৃত্যাদি করিয়াছি। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন অস্মদ্দেশীয় লোকেরা কিরূপ ভ্রমান্ধ, তাঁহারা প্রাণে প্রাণে এরূপ অলীক আমোদে মত্ত হইয়া অকাতরে অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু তাঁহাদিগের নিকটে দেশের কোন শুভ সাধনোদ্দেশে বা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাঁহারা সাধ্যমতে তাহাব বাধা জন্মাইয়া থাকেন।"[৩৮]

৬। গাজি সাহেবের মেলা

সোমপ্রকাশ (১১ আষাঢ়, ১২৭৯)।

"এই অম্বুবাচীতে মাতলা রেলওয়ের বাঁশড়া ষ্টেসনের নিকটে গাজিসাহেবের মেলা বলিয়া একটী মেলা হয়। এটী মুসলমানদিগের মেলা। আমরা দেখিলাম, শত শত মুসলমান মেলাস্থলে যাইতেছে। এত জনতা হইয়াছে যে গাড়িতে স্থান সমাবেশ হইতেছে না। অধিকাংশ যাত্রির সঙ্গে ছাগল ও মুরগী আছে। শুনিলাম, উহারা মেলাস্থলে উপস্থিত হইয়া ঐ সকল ছাগল ও মুরগী জবাই করিবে।......

"অম্বুবাচীতে এই মেলাটীর সৃষ্টি হইবার এই কারণ বোধ হয়, অম্বুবাচীর তিনদিন কৃষিকার্য্য নাই। কৃষকদিগের অবসর থাকে। মাতলা রেলওয়ের পার্শ্ববর্ত্তী এক এক গ্রামে অধিকাংশ কৃষকের বাস। তাহারা এই অবসরকাল আমোদপ্রমোদে অতিবাহিত করে।"৩৯

৭। বারয়ারী

সোমপ্রকাশ (২৯ আষাঢ় ১২৯৩)

"আমাদের কোন সহযোগী বারয়ারীর বড় পক্ষপাতী হইয়াছেন। তাঁহার মতে বারয়ারী অনেক লোকের আমোদের আহ্লাদের স্থান এরূপ "জাতীয় আমোদ একতার আমোদ" উঠাইয়া দেওয়া তাঁহার মতে বুদ্ধিমান কার্য্য নয়।

আমাদের আহ্লাদ যে মনুষ্য জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন কিন্তু সেই আমোদ দূষিত হইলেই প্রয়োজনটা কিছু সামান্য হইয়া পড়ে। যদি গ্রামের ভিতর একটি শুঁড়ীর দোকান ব্যতীত আমোদ-আহ্লাদের আর স্থান না থাকে, তবে কি সেখানকার আমোদ প্রমোদ জীবনের কোন অভাব পূরণ করে? আজকালকার বারয়ারীতে বিশুদ্ধ আমোদ লাভ করা যায় না। প্রায়ই মদ বেশ্যা ইত্যাদি লইয়া বারয়ারীর পাণ্ডাদিগের আমোদ প্রমোদ হয়।.....

"বারয়ারী পাণ্ডারা প্রায়ই নিষ্কর্ম্মা। দেশের ভিতর তাহারা কেবল পরনিন্দা পরগ্লানি করিয়া দিনাতিপাত করে। যাহাদের কোন সঙ্গতি নাই, এমন কোন সামর্থ্য নাই, যাহাতে স্বীয় ভরণপোষণের উপায় করিতে পারে, চৌর্য্যবৃত্তি যাহাদের অভ্যস্থ, দেশে গ্রামে প্রায়ই যাহাদের অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায় এই প্রকার লোকেই বারয়ারীর গন্ধ পাইয়া নাচিয়া উঠে, পাণ্ডা সাজিয়া চাঁদা আদায়ের জন্য গ্রামের লোকের উপর উৎপীড়ন করে কাহারও চাঁদা দিবার সামর্থ্য না থাকিলে ঘরের ঘটি-বাটী ঝাড়ের বাঁশ কাড়িয়া লইয়া যায়। যে যে গ্রামে এই প্রকার

বারয়ারীর পাণ্ডারা বাস করে সেখানে বিবাহ দিতে যাওয়া ভদ্রলোকের পক্ষে বড় বিপদের কথা। বরকন্যা বিদায়কালীন বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় আত্মীয়-দিগের ভিতর অপ্রণয় জন্মাইবার প্রধান কারণ এই সকল বারয়ারীর পাণ্ডা। ইহারা অভদ্রোচিত গালাগালি দিয়া বরযাত্রের নিন্দা করাকে বড় পুরুষত্ব মনে করে, তাই বরযাত্রীরা যতই কোন বারয়ারীর জন্য টাকা দিন না, পাণ্ডাদের নিন্দা কুৎসা অপমানসূচক বাক্য এমন কি কুৎসিৎ ভাষায় গালি পর্য্যন্ত না খাইয়া ফিরিতে পারেন না। এই সকল ব্যক্তি যথন বারয়ারীর পাণ্ডা তথন যে তাহাদের কার্য্যে বিশুদ্ধ আমোদ পাওয়া যাইবে তাহা কথনও সম্ভব নহে। . ...

"বারয়ারী নির্ব্বোধ ও অপরিণামদর্শী ব্যক্তিদিগের উৎসন্ন যাইবার হেতু। পল্লীগ্রামে জোরজবরদস্ত করিয়াও আশানুরূপ চাঁদা উঠে না, প্রায়ই একটি যাত্রার খরচ যোগাইবার সংস্থান হওয়া কোন কোন স্থানে ভার হইয়া উঠে, কিন্তু বারয়ারীর আদায়ের আগে খরচের ব্যবস্থা। টাকা সংগ্রহ না করিয়া বারয়ারীতে যাত্রার বায়না হয়। শেষে এই টাকার অধিকাংশ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া যাত্রাওয়ালা বিদায়ের সময় পাণ্ডাদের মোড়লকে ঘরের টাকা বাহির করিয়া দিতে হয়। আমরা কোন দরিদ্র মোড়লকে স্ত্রী ও পুত্রবধূর গহনা বন্ধক দিয়া যাত্রাওয়ালা বিদায় করিতে দেখিয়াছি।

"বারয়ারী বালকগণের মাথা খাইবার সহজ উপায়। বারয়ারীর দুই চারিদিন পূর্ব্ব হইতে পল্লীগ্রামের বালকেরা পড়াশুনা স্কুল পাঠশালা ছাড়িয়া পাণ্ডাদের সঙ্গী হয়, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে চাঁদা আদায়ের জন্য বাহির হয়। পাণ্ডাদের কুৎসিৎ বিদ্রূপ কদর্য গীত, পাষণ্ডের ন্যায় ব্যবহার এই চারি পাঁচদিন কি সপ্তাহকালের মধ্যে তাহারা বেশ অনুকরণ করিতে শিখে। .....

"বারয়ারীর উদ্যোগের পর, উৎসবের দিন এই সকল পাণ্ডাদের মাদক সেবন, দাঙ্গা হাঙ্গামা, গালাগালি বীভৎস কৌতুক এসকলও বালকদিগের বেশ অনুকরণের সামগ্রী, বারয়ারীতে বালকেরা হলাহল পান করে আর তাহাদের চরিত্রের মাথা থায়।

"এই সকল কথাই আমরা পল্লীগ্রামের বারয়ারীর সম্বন্ধে বলিলাম। সহরের বারয়ারীতে লোকের উপর উৎপীড়ন হয় না বটে কিন্তু সেখানেও পাপের স্রোত বন্ধ নাই। মদ ও বেশ্যার কাণ্ডটা সহরেই কিছু বাড়াবাড়ি। যে আমোদের সঙ্গে মদ ও গণিকার সংস্রব রহিল তাহাকে আমরা আমোদের মধ্যে গণ্য করি না।"[৪০]

৮। কথকতা

উনিশ শতকে কথকতার এক সময়ে খুব সমাদর ছিল। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের, বিশেষতঃ পুরাণের ও রামায়ণ মহাভারতের, কাহিনী সহজ ভাষায় বর্ণনা করিলে আমাদের একসঙ্গে ধর্ম্ম ও জ্ঞানোপার্জ্জনের সম্ভাবনা আছে, ইহা উপলব্ধি করিয়াই প্রথমতঃ কথকতার সূত্রপাত হয়। কেবল নীরস ব্যাখ্যায় শ্রোতারা আকৃষ্ট হয় না এজন্য তাহাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ক্রমে ক্রমে উহাতে স্বর ও গীত যোগ করা হয়। ১৮৬৩ সনে সোমপ্রকাশ পত্রিকায় ইহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

"বেদীর উপর উপবেশন পূর্ব্বক স্বর ও গীত সংযুক্ত কথকতারীতি বঙ্গদেশ ব্যতিরিক্ত আর কোন দেশেই নাই। যিনি ইহার প্রথম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ লোক ছিলেন সন্দেহ নাই। ভাল লোক ইহাতে হস্তার্পণ করিলে অবশ্যই লোকের মনোরঞ্জন হইয়া থাকে। .....

"গদাধর শিরোমণি ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি একশত বৎসরের অধিক দিনের লোক নহেন। তাঁহার পর কৃষ্ণহরি শিরোমণি ও রামধন তর্কবাগীশ প্রভৃতি কয়েকজন সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া গিয়াছেন।"[৪১]

লেখক বলেন :

"দিনকতকাল এই ব্যবসায়ের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এক্ষণে দিন দিন হিন্দুসমাজের অবস্থা পরিবর্ত্ত সহকারে যেমন লোকের মনে ভাব পরিবর্ত্ত হইতেছে তেমনি কথকতার প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইতেছে। সুশিক্ষিত দলে ইহা আর অধিকার পায় না, এক্ষণে কেবল অশিক্ষিত দল হইতেই কথঞ্চিৎ ইহার জীবন রক্ষা হইতেছে। অশিক্ষিত দলের মধ্যে কেবল স্ত্রীলোক ও নীচ লোকেরাই ইহার অধিকতর ভক্ত। সুশিক্ষিত দলের এ বিষয়ে অরুচি জন্মিবার তিনটি কারণ আছে। এক, ইহা হিন্দুধর্ম্মে গ্রথিত, যাহাদিগের সেই ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহাদিগের এ বিষয়ে শ্রদ্ধা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল পুরাণাদি লইয়া কথকতা করা হয়, তদ্দ্বারা সৎ ও অসৎ উভয়বিধ উপদেশ শিক্ষার সম্ভাবনা আছে। মানুষের মন অসৎ উপদেশ গ্রহণে যেরূপ অগ্রসর হয়, সদুপদেশ গ্রহণে সেরূপ হয় না। কৃষ্ণলীলা বর্ণনাবাসরে রাস ও বস্ত্রহরণাদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অশিক্ষিত যুবতীর চিত্ত অবিচলিত থাকা সম্ভাবিত নয়। এই অসৎ উপদেশ শিক্ষাশঙ্কা শিক্ষিতদলের এ বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শনের দ্বিতীয়

কারণ। তৃতীয়, এতন্মধ্যে কতকগুলি বিশেষ দোষ প্রবেশ করিয়াছে।......

"কথকদিগের অনেকে লম্পট স্বভাব হন, এক্ষণকার শ্রোতাগণের মধ্যেও বেশ্যা. অসতী ও লম্পটই বাহুল্য পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।"[৪২]

কুশদহ নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত রামরাম তর্কালঙ্কারের পৌত্র রামধন তর্কবাগীশ একদিকে যেমন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন অন্যদিকে তেমনি কথকতার গুণে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এ সম্বন্ধে "কুশদ্বীপ-কাহিনী"তে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হইয়াছে।

"যথার্থ কথা বলিতে কি, রামধনের পূর্ব্বে গদাধর শিরোমণি ও কৃষ্ণহরি ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি যে কথকতা করিতেন, তাহা মহাভারত ও ভাগবতীয় কথা বলিয়াই সাধারণের ভক্তি আকর্ষণ করিত ও তাহাই লোকে একমনা হইয়া শ্রবণ করিত। কিন্তু তৎপরে রামধন যে প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন, তাহা সাধারণের ধর্ম্মশিক্ষার ও ভক্তি আকর্ষণের যেমন মহাস্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল, উহার রচনাপারিপাট্য, সঙ্গীত সমাবেশ, সাময়িক বর্ণনা, সুললিত বাক্যবিন্যাস যোগ্যতা প্রভৃতিও লোকসাধারণের তেমনই প্রীতিকর হইয়াছিল। ফলতঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক যিনি যে ভাবেই তাঁহার কথকতা শ্রবণ করিতেন, তিনি সেইভাবেই চরিতার্থ ও মোহিত হইতে পারিতেন। বলিতে কি, রামধনের কথকতা এরূপ শ্রুতিমনোহর ও লোকশিক্ষার অমোঘ উপায় হইয়া উঠিল এবং সাধারণে এতদূর আগ্রহ সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করিত যে, দ্বিসহস্র আবালবৃদ্ধবণিতার সমাবেশ একটি সামান্য সূচীপাত স্বর অনায়াসে শ্রুতিগোচর হইত। ফলতঃ আমরা সাহঙ্কারে বলিতে পারি যে, কুশদ্বীপে বহুতর মহামহোপাধ্যায় সুধীমণ্ডলীর জন্মস্থান; কিন্তু সেইসকল খ্যাতনামা মহাপুরুষগণের জন্ম না হইয়া, কুশদ্বীপে এক রামধনই যদি জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও কুশদ্বীপের মুখচন্দ্র স্বতঃ আলোকিত হইত এবং কস্মিন্ কালেও সেই বিমল মুখমণ্ডল কলঙ্কিত ও রাহুগ্রস্ত হইত না।"[৪৩]

৯। পাঁচালী, কবিওয়ালার গান, যাত্রা এবং রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয়

এই সমুদয় খুবই প্রচলিত ছিল। শেষোক্ত দুইটির এখনও আদর আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে এ সমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইবে।

১০। অন্যান্য আমোদ প্রমোদ

সাহেবদের অনুকরণে কলিকাতার ধনীবাবুরা আলাদা 'ঘোড় দৌড়'-এর ব্যবস্থা করেন। কলিকাতার উত্তরভাগে পোস্তার রাজা নরসিংহের বাগানে ছিল তাঁদের

ঘোড় দৌড়ের মাঠ। জকি, বুকি, জুয়া—প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানেরই অভাব ছিল না।[৪৪]

আর একটি আমোদ ছিল দুইদল বুলবুলি পক্ষীর লড়াই। শীতকালে খুব বড় একটা মাঠে দুই বাবুর দুইদলে, মোট প্রায় তিন শত 'শিক্ষিত' (trained) বুলবুলির মধ্যস্থলে কিছু খাদ্যদ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়া হইত এবং তাহা লইয়া বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত দুই দলের বুলবুলি লড়াই করিত—পরাজিত দল উড়িয়া পলাইত।[৪৫] ঘুড়ি ওড়ান ও পরস্পরের ঘুড়ি কাটাকাটি আর একটি আমোদের উৎস ছিল।

৪। নিষ্ঠুর প্রথা

চড়ক পূজা উপলক্ষে অনেক অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ঘটিত। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (২৫৪-৫৫ পৃঃ)। ১৮৫৬-৫৭ খ্রীঃ বাংলা গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয় এবং বিলাতের ডিরেক্টর সভাও এই বিষয়ে আলোচনা করেন। কলিকাতায় খ্রীষ্টান মিশনারীরা এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিবার জন্য গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু গভর্নমেণ্ট এ বিষয়ে কোন আইন না করিয়া মিশনারী ও শিক্ষকদের এই সমুদয় নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে উপদেশ দিলেন।

মিশনারীরা পুনরায় এ বিষয় গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ছোটলাট জে. পি. গ্র্যাণ্ট বিভাগীয় কমিশনারদিগকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বলেন। তাহাদের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে এই নিষ্ঠুর প্রথা কেবল বাংলা ও উড়িষ্যায় সীমাবদ্ধ ছিল। গভর্নমেণ্ট স্থানীয় কর্মচারীদিগকে নির্দেশ দিলেন যে, যেখানে এই নিষ্ঠুর প্রথা বহুদিন ধরিয়া প্রচলিত আছে, সেখানে জমিদারদের সহায়তায় জনসাধারণকে যুক্তি-তর্ক দ্বারা ইহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অন্যত্র ম্যাজিষ্ট্রেট ইহা শান্তি রক্ষা ও নীতির দোহাই দিয়া বন্ধ করিয়া দিবেন।

এই প্রথা ক্রমে ক্রমে কমিলেও একেবারে রহিত হইল না। অবশেষে ছোটলাট বিডন হিন্দু নেতাগণের ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সম্মতিক্রমে ১৮৬৫ খ্রীঃ ১৫ই মার্চ এক ইস্তাহার জারী করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে ইহা বন্ধ করিবার নির্দেশ দিলেন।[৪৬]

হিন্দুদের মধ্যে আর দুইটি নিষ্ঠুর প্রথা ছিল—গঙ্গা যাত্রা ও অন্তর্জলি। পীড়িত কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন হইলে তাহাকে গঙ্গাতীরে নিয়া রাখা হইত—কোন কোন স্থলে মৃতপ্রায় ব্যক্তির দেহের নিম্নভাগ গঙ্গার জলে ডুবাইয়া রাখা হইত—কারণ হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল যে গঙ্গাতীরে মৃত্যু হইলে, বিশেষতঃ গঙ্গা

জলের মধ্যে দেহত্যাগ করিলে, মৃত ব্যক্তির পুণ্য ও আত্মার সদ্‌গতি হয়। কিন্তু অনেক স্থলেই যে ইহা আশু মৃত্যুর কারণ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। শিক্ষিত হিন্দুরা এই প্রথার তীব্র নিন্দা করিলেও আইন বা সরকারী হুকুমে ইহা রহিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। গভর্নমেণ্ট তদনুযায়ী ইহা বন্ধ না করিয়া আদেশ দিলেন যে কোন মৃত্যুপথ-যাত্রীকে গঙ্গাতীরে নিবার পূর্বে পুলিশকে জানাইতে হইবে যে রোগীর বাঁচিবার আর কোন আশাই নাই। রোগীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা এই মর্মে পত্র দিবেন—এবং সম্ভব হইলে এই মর্মে চিকিৎসকের সার্টিফিকেটও দাখিল করিবেন।[৪৭]

মুসলমানী আমলে কেহ জুতা পায়ে দিয়া দরবারে বা রাজকর্মচারীদের নিকট যাইতে পারিত না। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা যখন ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করিল তখন কলিকাতায় রাজভবনে এবং সরকারী বা আধা-সরকারী অনুষ্ঠানে জুতা পায়ে দিয়া যাইতে পারিবে এই মর্মে ১৮৫৪ খ্রীঃ এক সরকারী ইস্তাহার বাহির হয়। কিন্তু ইহা সত্বেও মফঃস্বলে উচ্চপদস্থ ভারতীয়েরাও ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সম্মুখে জুতা পায়ে যাইতে পারিতেন না। ১৮৬৮ খ্রীঃ এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে এই প্রকার বৈষম্য রহিত করিয়া সর্বত্র ভারতীয়েরা সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে জুতা পায়ে দেখা করিতে পারিবে এই নির্দেশ দেওয়া হইল।[৪৮]

৫। ব্যয় বাহুল্য মূলক প্রথা

শ্রাদ্ধের ব্যয়—এ বিষয়ে 'সংবাদ প্রভাকরের' (১৮৫৪ সন, ৭ জুন ও ১ জুলাই) নিম্নলিখিত দুইটি উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য :

"মৃত বাবু মতিলাল শীলের পুত্রেরা অতি সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবার মানস করিয়াছেন, শ্রাদ্ধ দিবসে আহুত রবাহুত কাঙ্গালী ইত্যাদি বহু লোকের সমাগম হইবে, একারণ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সাহেবেরা মতিবাবুর পুত্রদিগের প্রতি এপ্রকার অনুমতি করিয়াছেন যে ঐ লোক সমারোহ জন্য নগরবাসিদিগের যদ্যপি কোন ক্ষতি হয় তবে তাহা পূরণ করণার্থ তাঁহারদিগকে অগ্রে এক লক্ষ টাকা কোর্টে জমা দিতে হইবেক, যেহেতু মৃত বাবু গোপালকৃষ্ণ মল্লিকের মাতৃ শ্রাদ্ধ সময়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কাঙ্গালী বিদায় করণে অক্ষম হওয়াতে কাঙ্গালিরা আহারাভাবে নগরের বাজার সকল লুট করিয়াছিল, এই বিষয় মতিলাল বাবুর পুত্রেরা কি উত্তর করিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই।"[৪৯]

"বাঙ্গাল হরকরা সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে "মৃত বাবু মতিলাল শীলের পুত্রেরা তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন, ঐ টাকার

অনায়াসে এক চিরস্থায়ী কালেজ স্থাপিত হইতে পারে......আন্ত শ্রাদ্ধে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইলে মহা সমারোহ হইবেক এবং শীলবাবুর শ্রীমান পুত্রেরা যশোলাভ করিবেন তাঁহার সন্দেহ নাই কিন্তু শ্রাদ্ধের দানাংশ যাহারা পাইবেন তাঁহারদিগের বিশেষোপকার কিছুই হইবেক না অতএব শ্রাদ্ধের ব্যয় ন্যূন করিয়া কোন সাধারণ হিতজনক বিষয়ে অর্থদান করা শীলবাবুর সুশীল পুত্রদিগের কর্ত্তব্য হয়।" হরকরা সম্পাদক মহাশয়ের এই উপদেশ অতি উত্তম বটে, কিন্তু এদেশে শ্রাদ্ধে বহু ব্যয় বিধান করণের বিধি থাকাতে ধনবান লোকেরা পিতামাতার শ্রাদ্ধে অর্থব্যয় করা আপনারদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া গণনা করেন......অতএব মৃত শীলবাবুর পুত্রেরা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন ইহার বিচিত্র কি?"[৫০]

এই ব্যয়বাহুল্য কিরূপ আকার ধারণ করিত নিম্নলিখিত বিবৃতি হইতে তাহার কতকটা ধারণা করা যাইবে।

"গত বৃহস্পতিবারে রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুরের আন্ত শ্রাদ্ধ হইয়াছে, ভূকৈলাস রাজপরিবারেরা কোন কালেই শ্রাদ্ধাদি বিষয়ে সভামধ্যে দানাদি সাজাইয়া আড়ম্বর দেখান না, সঙ্গোপনে অন্তঃপুরে দানোৎসর্গ করেন, তাঁহারদিগের দানের পারিপাট্য এই যে একটা রূপার ঘড়ায় দান সাগরের ষোলটা ঘড়া হয়, দানাদির সংখ্যা অল্প কিন্তু পরিমাণে অধিক, রাজকুমার বাহাদুরেরা এইরূপ দানাদি এবং বৃষোৎসর্গ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ভোজনের অনেক পারিপাট্য হইয়াছিল। শ্রাদ্ধ দিনে ভূকৈলাসের চতুর্দ্দিক হইতে ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর এবং রাজপুত্র ও ভ্রাতৃপুত্রাদি সকলে তাঁহারদিগকে যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে বসাইলেন এবং বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টাকালে তাবৎ ব্রাহ্মণ সমাগত হইলে আমলা বাটী ও পতিতপাবণীর বাটী ইত্যাদি নানা প্রকোষ্ঠে একেবারে সকলকে বসাইয়া দিলেন, উপস্থিত সময়ে কলিকাতা নগরে যে সকল উত্তম দ্রব্যাদি আছে এবং মিষ্টান্নাদি যতপ্রকার প্রস্তুত হইতে পারে রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখেন নাই, ভোক্তারা আহার করিয়া রাজা বাহাদুরকে ধন্য ধন্য বলিয়াছেন।"[৫১]

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে শ্রাদ্ধে ব্যয়বাহুল্য বাংলা দেশে পূর্ব্বেও ছিল। আঠারো শতকে শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণ মুন্সী তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। বাংলা দেশে এইরূপ আরও দুই একটি চিরাচরিত সামাজিক প্রথা ছিল যাহা ভাল কি মন্দ বিবেচনা করা

তখনকার দিনে সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু কোন কোন সমসাময়িক পত্রিকায় এগুলি বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'সোমপ্রকাশের' (১২৮০, ২৪ অগ্রহায়ণ) মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"দারিদ্র্য বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান প্রধান কষ্ট বলিয়া বোধ হয়। সমাজের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ শ্রেণী বলিয়া গণ্য অর্থাৎ অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও বিশেষ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারিতেছেন না। তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা ঋণ দায়ে বিব্রত ও অন্ন চিন্তায় জর্জ্জর হইয়া যেরূপে দিনপাত করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে মনে ভয় ও ক্লেশের উদয় হয় এবং এই দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ কি ? বারম্বার এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে থাকে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার অনেকগুলি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ দিন দিন দেশের রপ্তানীর ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রব্যাদি দুর্মূল্য হইয়াছে সুতরাং সংসার নির্ব্বাহ করা পূর্ব্বাপেক্ষা বহু অর্থসাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনের সংস্কার ও হৃদয়ের ইচ্ছা ব্যতিক্রম ঘটাতে অনেক নূতন-বিধ ভোগ্য বস্তু, নূতন-বিধ সামগ্রী অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। সেগুলি না হইলে সমাজে হেয় ও অবগণিত হইতে হয়, সুতরাং সেগুলির আহরণের জন্য লোকে ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকে।" লেখকের মতে হিন্দুসমাজের নিম্নলিখিত কয়েকটি পুরাতন রীতি, নীতি এবং প্রথাও এই দারিদ্র্যের জন্য দায়ী।

"প্রথমতঃ একান্নবর্ত্তিতা। এই প্রথার সপক্ষে বলিবার অনেক কথা আছে; কিন্তু ইহা যে লোকের দরিদ্রতা বৃদ্ধির অন্যতর কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে একদিকে দশজন নিষ্কর্ম্মা, অথবা অল্পোপার্জ্জক একজন উপার্জ্জনশীল ও পরিশ্রমী ব্যক্তির গলগ্রহ হইয়া থাকে। অনায়াসে আপনাদের এবং পরিবারদের উদরের অন্নের সংস্থান হয় বলিয়া শ্রম করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না। অপরদিকে পরিশ্রম করিয়া নিজের নিজের ও নিজ পরিবারের উন্নতির বিশেষ আশা না থাকাতে সেই উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিরও অধিক উপার্জ্জনের জন্য প্রয়াস হয় না। অথচ সেই উপার্জ্জিত অর্থ বহু ভাগ হওয়াতে কাহারও অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয় না।

দ্বিতীয়তঃ বাল্যবিবাহ। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে উপার্জ্জন সম্বন্ধে দুইটী অপকার হয়: (১) পুত্র-কন্যাদিগকে উপার্জ্জনের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে (২) ক্রমেই ব্যয় বাড়িতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, এক ব্যক্তির

একটী পুত্র আছে। সে ব্যক্তি মাসে ৩০ টাকা উপার্জ্জন করে, তাহাতে কোনরূপে তাহার পরিবারের ভরণপোষণ চলিয়া যায়। পুত্রটির ১৪।১৫ বৎসরের সময় একটি বিবাহ দিল, তাহাতে একটি পরিবার বৃদ্ধি হইল। পরে ১৮।১৯ বৎসর হইতে পুত্রটির সন্তান জন্মিতে আরম্ভ হইল। আর ৩০ টাকাতে সংসার নির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং তিনি পুত্রটিকে বিদ্যালয় ছাড়াইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন, শিক্ষা অসম্পূর্ণ সুতরাং তাহারও উপার্জ্জন অল্প হইতে লাগিল, কিন্তু সন্তানের স্রোত অপ্রতিহত রহিল। এদিকে বৃদ্ধ পিতা উপার্জ্জনাক্ষম হইয়া পড়িলেন। এরূপ অবস্থায় অন্নকষ্ট ও সাংসারিক অসচ্ছল অপরিহার্য্য।

"তৃতীয়তঃ পিতামাতার শ্রাদ্ধ ও পুত্রকন্যার বিবাহ প্রভৃতি। এই কার্য্য-গুলির বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই। এগুলি অত্যাবশ্যক ও পুণ্য কর্ম্ম কিন্তু এগুলির এত প্রকার ব্যয়ের সহিত সংস্রব আছে, যে অনেক সময় তজ্জন্য অনেক ব্যক্তিকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। চতুর্থতঃ চিরবৈধব্য। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে কতকগুলি নিরুপায় স্ত্রীলোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ভার আত্মীয়স্বজনদিগকে লইতে হয় এবং চিরদিন তাহা বহন করিতে হয়। অন্যান্য দেশে তাহারা পুনরায় পত্যন্তর গ্রহণ করেন সুতরাং তাঁহাদের জন্য কোন পরিবারপোষী আত্মীয়কে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না।

"পঞ্চমতঃ জাতিভেদ ও জাত্যভিমান। যদিও ইংরাজী শিক্ষা বহুল প্রচার হওয়াতে ক্রমেই ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমতা হইয়া আসিতেছে এবং অনেক উচ্চ জাতির লোক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও হীন জাতিদিগের চিরাবলম্বিত অনেক কার্য্য অবলম্বন করিতেছেন, তথাপি এখনও অনেকে জাত্যভিমান নিবন্ধন অশেষ কষ্ট ও সাংসারিক অসচ্ছল সহ্য করেন, কিন্তু কষ্ট নিবারণের উপায় থাকিতে নীচ ও হেয় বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।"[৫২]

এই প্রসঙ্গে উক্ত সোমপ্রকাশ পত্রিকার ১২৭১ সালের ১৪ই বৈশাখ সংখ্যায় 'কন্যাদায়' সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, কারণ শতাধিক বর্ষ অতীত হইলেও এখন পর্য্যন্ত এই কু-প্রথা বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে।

"কন্যা জন্মিলেই সর্ব্বনাশ। বরের অথবা বরের পিতামাতার অসঙ্গত অর্থ-লোভই এই বিপত্তির কারণ। অনেক স্থলে এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, পরিণয় সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে বরের পিতামাতা কন্যার পিতামাতার নিকট অসঙ্গত

অর্থ প্রার্থনা করে। উচ্চ ঘরে কন্যা সম্প্রদান না করিলে কুলক্ষয় হইবে এই শঙ্কায় কন্যার পিতামাতাকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও অগত্যা সেই প্রার্থনা পরিপূরণ করিতে হয়। এই কুৎসিত রীতি নিবন্ধন অযোধ্যায় কন্যাহত্যা প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কন্যা জীবিত থাকিলে তাহার সম্প্রদান কালে আপনাদিগকে দরিদ্র হইতে হইবে, এই ভয়ে মাতাপিতা কন্যার স্নেহ বন্ধন ছেদন করিয়াও তাহার প্রাণ বধ করিত। ক্রমে উহা প্রথারূপে পরিণত হইল। সম্প্রতি ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের যত্নে উহা নিবারিত হইয়াছে।

"বঙ্গদেশে কন্যাহত্যা প্রথা নাই, কিন্তু অনেক স্থলে কন্যার মাতাপিতাকে বরের মাতাপিতার যেরূপ অসঙ্গত অর্থলোভতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে হয়, তাহাতে অনেকে এককালে দরিদ্র হইয়া পড়েন। কলিকাতার সুবর্ণবণিকদের যিনি দরিদ্রমধ্যে পরিগণিত, তিনিও ৫০ ভরি সুবর্ণের ন্যূনে কন্যা সম্প্রদানকালে অব্যাহতি পান না। কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অর্থগ্রহণপ্রবাদ চিরপ্রসিদ্ধ আছে। এই সকল কারণে কন্যার পিতামাতা আপনাদিগকে কন্যাদানগ্রস্ত বিবেচনা করেন। এই কুৎসিত প্রথা যে পূর্ব্বে ছিল না তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের বচন দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে।"[৫৩]

কলিকাতার বসাক-সম্প্রদায়ে কন্যা বিবাহের দায় সম্বন্ধে এই সোমপ্রকাশ পত্রিকায় ১২৭৯ সাল ১লা শ্রাবণ একজন পত্রপ্রেরক যে বিস্তৃত মন্তব্য করিয়াছেন[৫৪] তাহা পড়িলে এই কুপ্রথা যে কি ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছিল তাহা বোধগম্য হইবে। ১২৯১ সালের ১০ আষাঢ় উক্ত পত্রিকায় বঙ্গদেশে পুত্র বিক্রয় সম্বন্ধে একটি তীব্র প্রতিবাদ এবং ঐ সম্বন্ধে রূপচাঁদ পক্ষী বিরচিত একটি সুদীর্ঘ সঙ্গীত প্রকাশিত হয়।[৫৫]

বিংশ শতাব্দীতেও এই কুপ্রথার হ্রাস হয় নাই। স্নেহলতা নামে একটি বালিকা তাহার বিবাহের বরপণ যোগাইবার জন্য পিতা বসতবাটি বিক্রয় অথবা বন্ধক দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন—এই সংবাদ শুনিয়া নিজের গাত্রবস্ত্র কেরোসিন তেলে ভিজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করে। তাহার এই আত্ম-হত্যায় বরপণের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হয় এবং স্থানে স্থানে অবিবাহিত যুবকেরা বিবাহে পণ গ্রহণ করিবে না এইরূপ শপথ গ্রহণ করে। কিন্তু কিছুদিন পরেই এ সমস্তই অসার প্রতিপন্ন হয় এবং বরপণের কুপ্রথা পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে। বর্ত্তমানেও ইহা খুবই প্রচলিত আছে। কিন্তু কন্যাকে নির্দ্দিষ্ট অল্প বয়সের মধ্যে বিবাহ না দেওয়া অথবা একেবারে বিবাহ না দেওয়া আর পূর্ব্বের মত নিন্দনীয়

না হওয়ায় দরিদ্র পিতার উপর বরপণের বোঝা অনেকটা লাঘব হইয়াছে।

৬। সমুদ্র যাত্রার বিরোধিতা

কেহ সমুদ্র যাত্রা করিলে তাহাকে জাতিচ্যুত করা বাংলার হিন্দুসমাজের একটি কলঙ্ক। কেহ উচ্চ শিক্ষা বা উচ্চ চাকুরী লাভের উদ্দেশ্যে বিলাতে গমন করিলেও দেশে ফিরিয়া আসিলে তিনি স্বীয় পরিবারে স্থান পাইতেন না। এই কারণে বহু উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদস্থ হিন্দু ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অনেকে শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও সমাজে স্থান পান নাই। ইহার তীব্র প্রতিবাদ সমসাময়িক পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায়। ১২৯৩ সালের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখের সোমপ্রকাশ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:

"সম্পাদক মহাশয়! বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা শাস্ত্র সম্মত ইহা ভট্টপল্লি, নবদ্বীপ, কলিকাতা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের পতিতোদ্ধার গ্রন্থে ইহার বিশেষ স্বপ্রমাণ হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ব্যক্তি সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে, আর অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত অসচ্চরিত্র ব্যক্তিদ্বারা সমাজের সৌষ্ঠব সাধন হইবে ইহা কি আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসম্ভব নহে? বিশ্বাসই ধর্ম্ম। বিলাতাগত ব্যক্তিগণের হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা না থাকিলে কখন প্রায়শ্চিত্তাদি স্বীকার করিতেন না। যাঁহারা ইহাদিকে অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণা করেন তাঁহারা কি এদেশস্থ ধনশালী ব্যক্তিদিগের আচরণ জানেন না? অধিকাংশ ধনী সন্তানেরা যে অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্য গমন চিরব্রত করিয়াছেন অথচ ইহারাই আবার সমাজে মান্যগণ্য ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত। ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? যে সমাজ পবিত্রতার আধার, ন্যায় ধর্ম্মের আকর ছিল, তাহাতে এখন আর কি আছে। দেখুন কলিকাতার অদূরবর্ত্তী আদিগঙ্গার সমীপস্থ কোন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণদিগের বাটীতে মুসলমান সুপকার নিযুক্ত। ইহাতেও তাঁহারা সমাজের উচ্চ আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। সকল জাতির শবচ্ছেদ করিয়া ডাক্তারেরা জাতি প্রাপ্ত হইলেন। সুরাপান, কলের চিনি, লবণ এবং চর্ব্বি মিশ্রিত ঘৃত ভক্ষণ করিয়া হিন্দুত্ব গেল না। কেবল বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাত যাত্রাতেই হিন্দুত্ব বিলোপ হইল? যদিও ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় তথাচ তাঁহারা শাস্ত্রমত প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত। অপিচ ইঁহারা অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। তবে কি কারণে সমাজ হইতে দূরীভূত হইবেন?"[৫৬]

ইহার কয়েক মাস পূর্বে বিলাত প্রত্যাগত অমৃতলাল রায়ের প্রসঙ্গে, এই সমাজ বিধি যে দেশের কত অনিষ্টকর, সোমপ্রকাশে (১১ শ্রাবণ, ১২৯৩) তাহার সুদীর্ঘ আলোচনা আছে। উপসংহারে বলা হইয়াছে :

"কেহ কেহ লাভ ক্ষতি ছাড়িয়া কেবল ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বিলাত-ফেরতকে সমাজ হইতে তাড়াইতে চান। অনেকেই এই বৃদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ অনেকবার শুনিয়াছেন, এখন যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছেন তাঁহাদের অনেককেই বিদ্যাসাগরের ক, খ পড়িতে দেখিয়াছি। তাঁহারা একবার যেমন বৃদ্ধের কথা শুনিয়াছিলেন এখন তেমনি আর একবার শ্রবণ করুন। ম্লেচ্ছদেশে বাস, ম্লেচ্ছান্ন ভোজন ও ম্লেচ্ছ স্ত্রীগণ ইত্যাদি জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিলে শাস্ত্রানুসারে অপরাধীকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে প্রমাণের জন্য শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিবার অধিক আবশ্যক নাই। বাবু অমৃতলালকে সমাজে গ্রহণ করিবার জন্য ভট্টপল্লীবাসী পণ্ডিতবর চন্দ্রনাথ, রাখাল চন্দ্র ও মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহোদয় প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে সকল প্রমাণাদি প্রয়োগ-পূর্ব্বক ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাই আমাদের মত সমর্থনের জন্য যথেষ্ট হইবে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উদ্যোগী হইয়া পণ্ডিতগণের মতামত গ্রহণ পূর্ব্বক অমৃতলালকে সমাজে লইবার চেষ্টা করিতেছেন। বৈদ্য সমাজের অন্তর্ভূত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই মতের স্বপক্ষ হইয়াছেন। কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানে যে সকল বৈদ্যসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি অমৃতলালকে সমাজে লইবার পক্ষে প্রতিবাদী হইয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দি। বিলাত ফেরতগণকে সমাজে গ্রহণ করিলে সমাজবন্ধনী শিথিল হইবে না, ধর্ম্মের পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত হইবে না। আমাদের দেশের যে সকল ব্যক্তি বিলাতে না গিয়া ঘরে বসিয়া ম্লেচ্ছাচার করিয়া থাকেন তাঁহারা যেমন হিন্দু ধর্ম্মের শত্রু, বিলাতে গিয়া ম্লেচ্ছ ভোজনে বাধ্য হইয়া বিলাত ফেরতগণ হিন্দু ধর্ম্মের তত্দূর শত্রু হইতে পারেন না। যাঁহারা আমাদের মতের প্রতিবাদী তাঁহারা ঘরের শত্রু অগ্রে দূর করিতে পারিলে তবে বাহিরের লোককে শত্রু বলিবার অধিকার পাইবেন, লোকাচারের উপর ধর্ম্মের শাসনও তাঁহাদিগকে গ্রাহ্য করিতে হইবে।"[৫৭]

বিংশ শতকের প্রথমভাগে (১৯০৮-১৯১০) বর্তমান লেখকের ভ্রাতা বিলাত হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এদেশে উচ্চ সরকারী

পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু এই 'অপরাধের' জন্য বৈদ্য সমাজ প্রায় ২০ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার পরিবারের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ রহিত করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে এই প্রথা এখন একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। লেখকের ভ্রাতা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাঁহার পরিবার সমাজচ্যুত হইয়াছিল, কিন্তু ৫০ বৎসর পরে লেখক সস্ত্রীক বিলাত গেলেও সেই বৈদ্য সমাজে তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত তো দূরের কথা কোনরূপ উচ্চবাচ্যই হয় নাই।

স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথাও উনিশ শতকে খুবই কঠোর ভাবে প্রতিপালিত হইত কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে তাহা কমিতে থাকে এবং এখন একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে।

৭। বাংলার নাগরিক সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ক। সুরাপান

ইংরেজী শিক্ষার অশেষ কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে যে কয়েকটি কুফল ফলিয়াছিল সুরাপান তাহাদের মধ্যে প্রধান। ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে সুরাপান সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং পিতা পুত্রে একসঙ্গে সুরাপান করিতেন এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন:

"ডিরোজিও যে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন তাহা এই সময়ে বঙ্গসমাজে পূর্ণমাত্রায় কাজ করিতেছিল। শিক্ষিত দলের মধ্যে সুরাপানটা বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু কালেজের ষোল সতের বৎসরের বালকেরা সুরাপান করাকে শ্লাঘার বিষয় মনে করিত। বঙ্গের অমর কবি মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি এই সময়ে হিন্দু কালেজে পাঠ করিতেছিলেন। সে সময়ে লোকের মুখে শুনিয়াছি যে কালেজের বালকেরা গোলদিঘীর মধ্যে প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া মাধব দত্তের বাজারের নিকটস্থ মুসলমান দোকানদারের দোকান হইতে কাবাব মাংস কিনিয়া আনিয়া দশজনে মিলিয়া আহার করিত ও সুরাপান করিত। যে যত অসমসাহসিকতা দেখাইতে পারিত তাহার তত বাহাদুরী হইত, সেই তত সংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইত।"[৫৮]

রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'আত্মচরিতে' লিখিয়াছেন:

"তখন হিন্দু কালেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই।...আমাদিগের বাসা তখন পটলডাঙ্গায় ছিল। আমি

পাড়ায় ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল (ইনি পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শান্তিপুরে অনেক দিন কার্য্য করিয়াছিলেন), প্রসন্নকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কালেজের গোলদিঘীতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিক-কাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদিঘীর রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এই রূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য্য মনে করিতাম।"[৫৯]

সুরাপানের কুফল ও প্রসার যে এদেশের এক শ্রেণীর লোকের মনে বিষম উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছিল সমসাময়িক পত্রিকার মন্তব্য হইতে তাহার স্পষ্ট ধারণা করা যায়। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি :

"সুরাপান রূপ মহাপাপ এ দেশে প্রবিষ্ট হওয়াতে যে অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইতেছে, তাহা এক্ষণে সকলেরই বিদিত হইয়াছে…এবং তাহার নিবারণার্থ হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ি লোকে ইংলণ্ডস্থ পার্লিয়ামেণ্ট নামক রাজসভায় আবেদন করিয়াছেন।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কার্তিক, ১৭৭৪ শক)।[৬০]

উক্ত পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৭৭২ শক) মন্তব্য করা হইয়াছে যে হিন্দু ও মুসলমান যুগে এই পাপের বিশেষ প্রাচুর্য্য ছিল না। "কিন্তু অধুনা সুসভ্য ইংরাজদিগের রাজশাসনে সর্ব্বাপেক্ষা মদ্যপান অতি ভয়ানক রূপে বিস্তার হইয়াছে। প্রথমে যে সমস্ত পরিবারে মদ্যের নামগন্ধ মাত্র ছিল না, এই ক্ষণে তাহারদের মধ্যে অনেক ব্যক্তিকে অকুতোভয়ে এই মহা অনিষ্টজনক দ্রব্য ব্যবহার করিতে নিয়তই দেখা যায়।......

......"সংপ্রতি এই ভারত রাজ্য ইংরাজ জাতির অধিকৃত হওয়া অবধি মদ্য প্রস্তুত হইবার স্থান ও মদ্যালয় দিন দিন যাদৃশ বাহুল্য হইতেছে, তৎসহকারে পান দোষও অতি ভয়ঙ্কররূপে প্রবল হইয়া আসিতেছে।......

......"যখন রাজার আজ্ঞাক্রমে মদ্য প্রস্তুত করিবার স্থান স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং এই একমাত্র কলিকাতার মধ্যেই শতাধিক মদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তখন ইহা কে না কহিবে যে রাজাই এই পাপানল প্রবল করিবার প্রধান কারণ? কালের গতিকে ইদানীং মদ্যপানকে সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া অনেকে মানিতেছে,—প্রবল মোহাচ্ছন্নতা বশতঃ ইংরাজ জাতির উত্তমোত্তম রীতি অপেক্ষা যত অধম ব্যবহারের অনুকরণ করাই

তাহারদিগের বিশেষ লক্ষ্য হইয়াছে।...

......"ইংরাজ জাতির এ দেশ অধিকার হইবার পূর্ব্বে সাধারণরূপে মদ্য ব্যবহার কতিপয় নীচ জাতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু এইক্ষণে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরদের মধ্যেও সুরাপান অধিক দৃশ্য হয়; বিশেষত নব্য সম্প্রদায়ী প্রায় তাবৎ বিদ্বান্ ও ধনি যুবককে ইহাতে সাতিশয় লিপ্ত হইতে দেখা যাইতেছে।...

......"এদত্তিন্ন মদিরার অন্য এক দুর্জ্জয় প্রভাব এই, যে তদ্দারা মনুষ্যের বুদ্ধি নাশ হইয়া কুকর্ম্ম সাধনের দুই প্রধান প্রতিবন্ধক যে লজ্জা আর ভয় তাহা সম্যক্‌রূপে অন্তর্হিত হয়, তাহাতে আমারদিগের মনোগত যাবতীয় কু প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া ওঠে, এবং স্ব স্ব ক্ষমতা প্রকাশে পূর্ণ উৎসাহ প্রাপ্ত হয়। ইহার দ্বারা কামের আতিশয্য হইয়া নানাবিধ ঘৃণিত ইন্দ্রিয় দোষাচারে মনুষ্য সকল প্রবৃত্ত হয়, ক্রোধ প্রবৃদ্ধ হইয়া অল্প কারণে প্রলয় ব্যাপার উপস্থিত করে এবং লোভের প্রাদুর্ভাবে দস্যু বৃত্তিতে লোকের উৎসাহ জন্মে; ফলে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে, এই মর্ত্ত্য লোকে যত প্রকার অতি জঘন্য অসৎ কর্ম্ম মনুষ্য হইতে সম্ভব হইতে পারে, এক অতিরিক্ত মদিরা পান দ্বারা সে সমুদয়ের কিছুমাত্র অকৃত থাকে না।..

......"ইংরাজ রাজার অধীনতায় এদেশস্থ ভদ্র প্রজা সমস্ত যে যে কারণে অসন্তুষ্ট আছেন, তন্মধ্যে প্রচুর মদ্যপান দ্বারা মত্ততার বৃদ্ধি এক প্রধান কারণরূপে অবধারিত আছে। অতএব যাহাতে এদেশে অপর্য্যাপ্ত মদ্য প্রস্তুত না হয় এবং পাপের প্রধান আকর মদ্যালয় সকল এদেশ হইতে উঠিয়া যায়, তাহা অধন সধন সমুদায় বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রার্থনীয়, এবং তদ্বিষয়ে তাঁহারদিগের সকলেরই সমান অভিপ্রায় ব্যক্ত আছে। এই পত্রিকায় আমরা বারম্বার ইহার আন্দোলন করিয়াছি এবং এখনও ইহার উত্থাপন করিতেছি; ইহাতে রাজপুরুষদিগের আর উপেক্ষা করা উচিত নহে।"৬১

কলিকাতায় সুরাপানের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হয় এবং নানা সময়ে নানা স্থানে সুরাপান নিবারিণী সভা স্থাপিত হয়। প্যারীচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ইংরেজী শিক্ষিতগণ এই আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন।

খ। বিলাতের অনুকরণ

ইংরেজের সংস্পর্শে আসার আর একটি প্রত্যক্ষ ফল অশন বসন, গৃহ-সজ্জা প্রভৃতি জীবন যাত্রার প্রায় সকল বিভাগেই ইংরেজী সভ্যতা ও সমাজের অন্ধ অনুকরণ। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা এমন প্রবল আকার ধারণ

করিয়াছিল যে উচ্চ পদস্থ ইংরেজগণও ইহার নিন্দা করিয়াছেন। বাড়ী ঘর, বাগান বাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, বৈঠকখানার আসবাব পত্র সবই ইউরোপীয়দের অনুকরণে নির্ম্মিত হইত।

গ। সমাজ সংস্কার

প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষার ফলে হিন্দু সমাজের নানাবিধ গ্লানি ও কুপ্রথা দূর করিয়া সমাজ সংস্কারের চেষ্টা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার এবং রাজনীতিক অধিকারের আন্দোলন,—এ দুটিকে উনিশ শতকের বাংলার প্রধান বৈশিষ্ট্য বলিলে খুব অত্যুক্তি করা হয় না।

সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব কি রূপে ধীরে ধীরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার নিদর্শন স্বরূপ ১৭৮৯ শকের (১৮৬৭ খ্রীঃ) কার্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যে সুচিন্তিত সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"কোন সমাজের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি চিরকাল এক ভাবে থাকে না। কালক্রমে মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্ত হয়; সেই পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন আচার ব্যবহারও অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া উঠে। তাহা না হইলে সমাজস্থ লোকদিগকে অনেক প্রকার উন্নতি হইতে বঞ্চিত থাকিতে ও অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু জাতির যে রূপ অবস্থা ছিল, অধুনা তাহা বহু অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তৎকালে যে সকল আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি প্রচলিত ছিল, তদানীন্তন হিন্দু সমাজের পক্ষে তৎসমুদায় নিতান্ত হিতকর ও একান্ত আবশ্যক হইলেও তদ্দ্বারা ইদানীন্তন লোকদিগের হয়তো যৎপরোনাস্তি অপকার হইতে পারে। যখন এই রূপ অপকার ঘটনার সম্ভাবনা হইয়া উঠে, তখন লোক আপনা হইতেই পুরাতন রীতি পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। প্রতিবন্ধকতা করিতে গেলে কেবল বিবাদ বিসম্বাদই ঘটে; পরিবর্ত্তন রোধ করা যায় না।.....

"আমাদের হিন্দু সমাজ এক্ষণে এই দুঃস্থাবস্থায় নিপতিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার সভ্যগণের অধিকাংশের মন কলুষিত ও সংকীর্ণ; সৎকর্ম্ম সাধনের সাহস কিছুই লক্ষিত হয় না; পদে পদে ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করে। অধিকাংশের চিত্তই অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইহাদিগের মনের ভাব উন্নত না হইলে ভারতবর্ষের অবস্থা কখনই সমুন্নত হইবে না; সমাজ সংস্কারকদিগকে সেই মঙ্গল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, যে সকল আচার ব্যবহার তাহাদের উন্নতি

লাভের অন্তরায় হইয়া আছে, তাহা অবশ্যই পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।...

..."কার্য্যগতিকে নানাবিধ পরিবর্ত্তন অবশ্যই উপস্থিত হইবে। কিন্তু এই সকল অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনকে যদি যদৃচ্ছাক্রমে চলিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে তদ্দ্বারা হিন্দু সমাজ কখন সুখী হইতে পারিবে না। যদি কোন উন্নত লক্ষ্য এই সকল পরিবর্ত্তনের নিয়ামক না হয়, যদি কোন গম্য-স্থান মনে না রাখিয়া হিন্দু সমাজকে এই পরিবর্ত্তন স্রোতে ভাসিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে হিন্দু জাতি নিশ্চয়ই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।...

"এক্ষণে হিন্দু সমাজ এইরূপ লক্ষ্যহীন পরিবর্ত্তনের বিষময় ফল ভোগ করিতেছে, বোধ হয় এই পাপের ভোগ আরও বৃদ্ধি হইতে চলিল। আপনাদের পাপাচার, অবিমৃষ্যকারিতা ও আলস্য প্রভৃতি দোষে পূর্ব্বাবধিই আমরা প্রায় মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইয়া আছি; আবার নূতন নূতন পাপের ফল ভোগ করিতে হইলে আর আশা ভরসা থাকিতেছে না। এখনও সকলে সতর্ক হউন স্নেহের সহিত স্বদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যাহাতে স্বদেশানুরাগই সকলের মনে প্রদীপ্ত হইতে থাকে তাহার আন্দোলন করিতে থাকুন। স্বদেশানুরাগ স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রধান উপায়। স্বদেশানুরাগ ব্যতিরেকে স্বদেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা আর কৃত্রিম শোকে অভিভূত হইয়া নাটকের অভিনয় করা উভয়ই তুল্য। এক্ষণে যে চাকচিক্যশালী বাহ্য সভ্যতা আমাদের দেশে সঞ্চারিত হইতেছে তাহাতে স্বদেশানুরাগের সম্বন্ধ দেখা যায় না; এ সভ্যতা স্বদেশানুরাগ হইতে উৎপন্ন নহে; অনুকরণ দ্বারা ঋণ করা হইতেছে। সুতরাং কাকের ময়ূর-সজ্জাবৎ ঈদৃশ সভ্যতা দ্বারা ভারতবর্ষের স্থায়ী কল্যাণের সম্ভাবনা নাই।..

"আমরা এরূপ বলিতেছি না যে স্বদেশানুরাগে অন্ধ হইয়া স্বদেশের দোষ দর্শনে পরাঙ্মুখ হইয়া থাক; সেরূপ করা যথার্থ স্বদেশানুরাগীর লক্ষণ নহে। কি প্রকারে স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি হইবে, কি উপায়ে স্বদেশীয় আচার ব্যবহার সকল পরিশুদ্ধ হইবে, কিসে স্বদেশীয় লোকে বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্মে বিভূষিত হইবে এবং কি প্রকারে স্বদেশের সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, এই সকল চিন্তাতেই স্বদেশানুরাগীর অন্তঃকরণ উদ্যম ও উৎসাহে পরিপূর্ণ থাকে। যে সকল আচার ব্যবহার দ্বারা বাস্তবিক স্বদেশের অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, যে সকল কুসংস্কার স্বদেশীয়দিগের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং যে সকল রীতিনীতি স্বদেশীয়দিগের অভ্যুদয়ের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, তাহা স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় বলিয়া পরিবর্ত্তিত করিতে আমরা কখনই

সঙ্কোচ প্রকাশ করি না।

"এক্ষণে হিন্দু সমাজের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোন্ বিষয়ের অগ্রে সংস্কার সম্পাদন করা আবশ্যক, ইহা লইয়া অনেকে অনর্থক উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সংসারের গতি ও সংস্কারের রীতি অন্য প্রকার।......

"কে সংসারের কোন্ দিকে থাকিয়া কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইবে, কেহই অগ্রে বলিয়া তাহার নিয়ম করিতে পারে না। চতুর্দ্দিক হইতে নানা লোকে নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন; তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন চেষ্টা দ্বারা একই উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়। কেহ ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হন, কেহ বিদ্যা বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন; কেহ রাজনীতির সংশোধন করেন; কেহ আচার ব্যবহারের সংশোধনে অগ্রসর হন; কেহ কৃষিকর্ম্মে, কেহ বাণিজ্যে, কেহ শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহার যে বিষয়ে যতদূর ক্ষমতা, তাঁহা দ্বারা সেই বিষয়ের ততদূর উন্নতি সম্পাদিত হয়। এইরূপে নানাবিধ চেষ্টা দ্বারা এক এক সমাজ সংস্কৃত ও সংশোধিত হইতে থাকে, অতএব হিন্দু সমাজে যাঁহারা যে বিষয়ে যতদূর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা অনর্থক আলস্য-সলিলে নিক্ষিপ্ত না করিয়া হিন্দু সমাজের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত করুন। কেবল এই মাত্র নিয়ম করা যাইতে পারে যে, যাঁহার যে বিষয়ে সমধিক ক্ষমতা ও অভিরুচি, তিনি স্বদেশের সেই বিষয়ের উন্নতি সাধনে অগ্রসর হউন; কিন্তু ধর্ম্ম-সংস্কারে সকলেরই সহায়তা আবশ্যক।"৬২

সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলে একমত হইলেও মোটামুটি সামাজিক সংস্কারের প্রণালী কি হইবে ইহা লইয়া বিলক্ষণ মতভেদ ছিল। ১৮১১ শকের (১৮৮৯ খ্রী:) ভাদ্রমাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"আজকাল যাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষার আলোক লাভ করিয়াছেন এবং শিক্ষোপার্জ্জিত জ্ঞানকে যাঁহারা জীবনে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহারা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই সংস্কারেচ্ছুক। বাল্য বিবাহ, বিধবা বিবাহ, জাতি ভেদ প্রভৃতি অতি গুরুতর বিষয়ে আমরা আজকাল যাকে তাকেই বাদ প্রতিবাদ করিতে দেখি। এই সংস্কারের ভাব একপ্রকার দেশব্যাপ্ত দেখিতে পাই। একদল নূতন শিক্ষা, নূতন জ্ঞান ও নূতন আলোক লাভ করিয়া প্রাচীনকালের চিরপূজ্য প্রথা সকলকে সমূলে উৎপাটন করিবার চেষ্টা করিয়া সমাজে অশান্তি কোলাহল আনয়ন করেন। আর একদল চির সেবিত প্রথার মোহে মুগ্ধ হইয়া

আপনাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সূচনাকে অমঙ্গলের চিহ্ন মনে করিয়া প্রাণপণে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। ..

"যাঁহারা য়ুরোপীয় সমাজের অনুকরণে সমাজ সংস্কার করিতে চান, বিলাতে ইহা আছে, অতএব এখানেও না হইবে কেন, এরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া যাঁহারা সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে আমরা ভ্রান্ত মনে করি। অনুকরণ-প্রিয়তা সর্ব্বথা দূষণীয় নহে—কিন্তু অনুকরণ মাত্রেই প্রার্থনীয় নহে। দেশকালের প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া অনুকরণ করিলেই উপকারের সম্ভাবনা।......

"অনেক সময় বিদেশীয় সভ্যতার বাহ্য শোভা ও চাকচিক্যময় উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমরা দেশীয় স্নিগ্ধ মনোরম আমাদের প্রকৃতির যথোপযুক্ত অথচ দোষশূন্য সামাজিক প্রথাগুলিকে পদদলিত করিয়া সমাজ সংস্কারে অগ্রসর হই। ইহা আমাদের ভয়ানক ভ্রম সন্দেহ নাই। যাহা কিছু দেশীয়, তাহাই অপকৃষ্ট নহে, এবং যাহা কিছু বিলাতী আমদানী তাহাই উৎকৃষ্ট নহে। দোষণীয় প্রথা পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ হিতকর প্রথা প্রবর্ত্তিত করাই সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য। কিন্তু হঠকারিতা দোষে এই উদ্দেশ্য অনেক সময় সিদ্ধ হয় না। ....

"একশ্রেণীর সংস্কারক আছেন, যাঁহারা "জাতীয়" "দেশীয়" এই সকল কথা শুনিলেই অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন। তাঁহারা বৈদেশিক ভাবে এতই অন্ধ, যে দেশীয় কিছুই ভাল দেখিতে পান না। ভাষা, পরিচ্ছদ, আহার ব্যবহারাদি বিষয়ে ইঁহাদের স্বদেশের প্রতি অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহারা বৈতালিক (বৈলাতিক?) অনুকরণেই তৎপর। কিন্তু অনুকরণ মাত্রেই উন্নতি নহে—এ কথা ইঁহারা বুঝিতে পারেন না। .....

"যে শিক্ষা ও সভ্যতাতে আমাদের অন্তর্নিহিত সদ্ভাবগুলি প্রস্ফুটিত হয় ও দোষগুলি নির্ম্মূল হয়, সেই শিক্ষা ও সভ্যতা প্রবর্ত্তন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। যে সকল সামাজিক রীতি পদ্ধতির দোষে আমাদের অনিষ্ট হইতেছে তাহা দূর করিতে প্রাণপণে চেষ্টা কর, কিন্তু সংস্কারের নামে বিকৃত পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে সমাজ গঠন করিতে গিয়া আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারী হইও না।"[৬৩]

যে দুইটি বিরোধী মতের সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা যে উনিশ ও বিশ শতকে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই 'সনাতন পন্থী' ও চরম 'অগ্রগতিশীল' মতের বিরোধের মধ্য দিয়াই বাংলার সমাজ সংস্কারের কার্য্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ এই উভয়ের

মধ্যে সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে যে মতবাদ প্রচার করেন তাহাই সাধারণতঃ গৃহীত হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত দুই বিরোধী দলের অস্তিত্ব এখনও আছে।

যাঁহারা সামাজিক সংস্কার বিষয়ে একমত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও একটি বিষয়ে গুরুতর মতভেদ ছিল। একদলের মতে প্রয়োজন বোধ করিলে সরকারী আইন প্রণয়ন করিয়া সামাজিক কুপ্রথা রহিত করা আবশ্যক। অন্য দলের ইহাতে ঘোরতর আপত্তি ছিল—তাঁহারা বলিতেন বিদেশী সরকারকে আমাদের ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা আইন দ্বারা রহিত করিবার প্রস্তাব করিলে রাজা রামমোহন রায়ের মত উদার সমাজ-সংস্কারক ইহার প্রতিবাদ করেন। উনিশ শতকের শেষভাগে (১৮৯১) বিশেষভাবে বেহরাম মালাবারির চেষ্টায় স্ত্রীর বয়স ১২ বৎসরের কম হইলে স্বামী তাহার সহিত সহবাস করিতে পারিবে না এই মর্মে যখন সহবাস সম্মতি (Age of consent) আইন বিধিবদ্ধ হয়, তখন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পুরুষের বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন করার সপক্ষে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বাংলার বহু গণ্যমান্য লোক ইহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। বিধবা-বিবাহ অনুমোদক আইন প্রসঙ্গে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

প্রথম প্রথম ইংরেজ সরকার আইন দ্বারা সমাজ সংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু আইন দ্বারা সতীদাহ নিবারণ ও বিধবা-বিবাহ অনুমোদন প্রভৃতি সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ মনে করিয়া তাহার পর সরকার আইন দ্বারা সমাজ সংস্কারের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং এদেশীয় অনেকেই তাহা সমর্থন করে। এ সম্বন্ধে নিম্নে উদ্ধৃত সোমপ্রকাশের মন্তব্য (১২৯৩, ১৬ কার্তিক) বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"মালাবারি যে হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে আইন করিবার জন্য বড়লাটের নিকট আবেদন করেন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি। লর্ড ডফরিণ প্রত্যুত্তরে ইণ্ডিয়ান গেজেটে প্রকাশ করিয়াছেন যে এরূপ আইন করিতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সকল এবং গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারীগণের সম্মতি নাই। লর্ড ডফরিণও তাঁহাদের সহিত একমত হইয়া হিন্দুবিবাহে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত নহেন। তাঁহার অসম্মতির কারণগুলি গেজেটে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বড়লাট বলেন :

"মালাবারি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন তদনুরূপ কার্য্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট

কয়েকটি নীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। যেখানে জাতিগত অথবা দেশাচারগত কোন কার্য্যে বর্ত্তমান ফৌজদারী আইনের ব্যাঘাত হয় গভর্ণমেণ্ট সেখানে আইনের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবেন। যেখানে জাতি বা দেশাচারগত কোন নিয়ম দেওয়ানী আদালতের দ্বারা কার্য্যকরী হইতে পারে কিন্তু যাহাতে সাধারণনীতি অথবা ধর্ম্মনীতির ব্যাঘাত জন্মে গভর্ণমেণ্ট সে নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতে অস্বীকার করিবেন। যে কোন বিষয়ের নিয়মাদি করিবার ক্ষমতা প্রজাগণের হস্তে এবং যাহা কার্য্যে পরিণত করিতে দেওয়ানী আদালতের সাহায্য আবশ্যক করে না, তাহাতে গভর্ণমেণ্ট কোন সম্পাদক (?) রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

"এই সকল সাধারণ নীতি বিশেষ বিশেষ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার সময় অনেক মতভেদ হওয়া সম্ভব। সেজন্য একটি সামান্য নিয়মে এই সকল বিষয় স্থির করিতে হয়। সে নিয়মটি এই—গভর্ণমেণ্টের হস্তে যতটুকু শাসন ক্ষমতা আছে তাহার চালনা করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় কিনা, যদি না পারা যায় তবে বর্ত্তমান কার্য্য-পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিয়া কোন ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে। এই সামান্য নিয়মের প্রয়োগ করিয়াই মালাবারির প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্ট সম্মতি প্রদান করিতে পারেন নাই। এ সকল বিষয় প্রজাবর্গের বিবেচনার উপর নির্ভর। কালক্রমে দেশের ভিতর শিক্ষার ক্রমবিস্তার হইয়া অধিবাসিগণেরা যেমন উন্নত হইবেন সেই পরিমাণেই তাঁহাদের সমাজও উন্নত হইয়া উঠিবে।

"ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থামতে ধর্ম্মনীতির যেরূপ আদর্শ ধরা হইয়াছে তাহা এতদ্দেশীয় জাতিবৈষম্যগত ধর্ম্মনীতির সহিত কোন কোন স্থলে অসদৃশ। গভর্ণমেণ্টের আদর্শ ধর্ম্মনীতি প্রয়োগ করিলে দেশীয় নীতিপদ্ধতি ক্রিয়াকলাপ দেশাচার এবং চিন্তাপ্রণালী সংস্কৃত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উপদেশ দেওয়া আইনের উদ্দেশ্য নহে। এই কারণেই একদিক হইতে আইন এবং অন্যদিক হইতে জাতিভেদ ও দেশাচারের বিবাদ বাধিলে আইনের কর্ত্তব্য স্বীয় নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে কার্য্য করা।

"আমরা লর্ড ডফরিণের কথায় আপ্যায়িত হইয়াছি। কথাগুলি তাঁহার ন্যায় বিবেচক রাজনীতিজ্ঞের উপযুক্তই হইয়াছে। মালাবারি সমাজসংস্কার ভ্রমে সমাজের যে মহানিষ্ট সাধন করিতে গিয়াছিলেন লর্ড ডফরিণ তাহা নিবারণ করিয়া প্রজাবর্গের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মালাবারি একজন উন্নতমনা

শিক্ষিত ব্যক্তি। লর্ড ডফরিণের উপদেশবাক্যে তিনিও জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। আমাদের রাজা বিদেশী, তাঁহাদের রুচি ভিন্ন, চিন্তাপ্রণালী ভিন্ন এবং ধর্ম্মনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে যাওয়াও নিতান্ত অযুক্তি। রাজা যদি স্বদেশী হইতেন সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি থাকিত না। হিন্দুরাজাই পূর্ব্বাপর দেশাচারের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন এখন ইংরাজের হস্তে সেই ক্ষমতাটুকু যাচিয়া দিতে গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ। বিবেচক শাসনকর্ত্তাও তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া মালাবারির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সমাজসংস্কারের জন্য যদি মালাবারির তৃষ্ণা বাড়িয়া থাকে তিনি সামাজিক উপায় অবলম্বন করিয়া সে তৃষ্ণা নিবারণ করুন। একে ত যে সকল বিষয়ে আইনের প্রয়োজন, তাহাতেই আমরা আইনের জ্বালায় অস্থির, তাহার উপর আবার যদি সামাজিক বিষয়ে আইন প্রবিষ্ট করা হয় তাহা হইলে চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ পড়িয়া যাইবে। মালাবারি অনেকবারই রাজ-নীতি ছাড়িয়া সমাজসংস্কারক হইয়াছেন। তাই এখনও আইনের আকর্ষণ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যদি সমাজসংস্কারের প্রয়োজন হয়, তবে আমরা বলি মালাবারি অগ্রে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা করুন। যিনি স্বধর্ম্মের গূঢ় ভেদ করিতে না পারিয়াছেন তাঁহার পক্ষে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের সহিত হিন্দুর আচারব্যবহারের নিকট সম্বন্ধ। মালাবারি অগ্রে ধর্ম্মের আলোচনা না করিয়া সমাজসংস্কার করিতে গেলে পদে পদেই ভ্রমে পতিত হইবেন।"৬৪

৮। স্ত্রী জাতির উন্নতি

ক। স্ত্রী জাতির অবস্থা

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সম্পন্ন নিষ্ঠাবান হিন্দু গৃহস্থের গৃহিণীর জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল ১৮৫৬ সনের ১১ নভেম্বর তারিখের 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকার নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাঁহার দৈনন্দিন কর্মতালিকা হইতে সে সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়।

"সংসর্গজা দোষ গুণা ভবন্তি" নগরীর ঠাকুর গোষ্ঠী, রাজ গোষ্ঠী, দেব গোষ্ঠী, ঘোষ গোষ্ঠী, মিত্র গোষ্ঠী, দত্ত গোষ্ঠী প্রভৃতি প্রধান প্রধান সকল গোষ্ঠীর অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকেরা প্রাতঃস্নান ও পূজানুষ্ঠান, জপ, যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ভোজনাদি না

করাইয়া জলগ্রহণ করেন না, এক এক বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের নৈবেদ্যাদি নিত্য দানে গুরু, পুরোহিত ও আশ্রিত ব্রাহ্মণগণের পিত্ত রক্ষা হইতেছে, প্রতি স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম কর্ম্মাদির বিষয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত হইলে এতৎ প্রস্তাব গুরুতর হইয়া উঠিবে অতএব অন্য এক স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম দৃষ্টান্তে প্রস্তাস্তে (?) প্রস্তাব সমাপ্ত করি।

"আন্দুল নিবাসি ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের স্ত্রী প্রতিদিবস যে ব্যবহার করেন তাহা শ্রবণ করিলে ধর্ম্ম পরায়ণা হিন্দু রমণীরা ধর্ম্ম কর্ম্মে উপদেশ প্রাপ্তা হইবেন এই কারণ আমরা বিশেষ করিয়া লিখিতেছি, গঙ্গাতীর হইতে আন্দুল গ্রাম ছয় ক্রোশ ব্যবহিত, ইহাতেও প্রতিদিবস ঐ স্ত্রীলোকের প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নান ও পূজ্যাদি জন্য ভারে ভারে গঙ্গাজল যায়, তিনি গঙ্গাজলে প্রাতঃস্নান করিয়া পূজাগারে প্রবেশ করেন, বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত যথোপচারে পূজা, জপ সাঙ্গ করিয়া বাহিরে আইসেন, সেই সময় দাসীসকল নিকটে থাকে, জিজ্ঞাসা করেন রন্ধনাদির কি কি ব্যবস্থা হইয়াছে অন্তঃপুর বহিঃপুরে লুচী, রুটী, অন্নব্যঞ্জনাদি যাহা প্রস্তুত হইবে পূর্ব্ব রজনীতে সজনীগণকে তাহা বলিয়া রাখেন এবং সেই রাত্রিতেই বাজার আসিবার টাকা দেন, দাসীরা কহে এই এই হইয়াছে, সেই সময়ে পুত্র কন্যাদিকে ডাকেন, তাঁহারদিগকে অগ্রে জিজ্ঞাসা করেন কর্ত্তার আহারাদি হইয়াছে? তোমরা আহার করিয়াছ, বহির্ব্বাটীতে যাহারা খায় তাহারদিগের আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়াছে? অতিথি কতজন আসিয়াছেন? তাঁহারদিগের আহারীয় সমস্ত দিয়াছ? ইহাতে জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু যোগীন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এবং অন্যেরা গৃহিণীর কথায় যেমন যেমন উত্তর করিতে হয় করেন, সেই সময় দুইজন প্রাচীন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা তাঁহার শ্বশুরের কালে বিশ্বাসিত রূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিল শ্রীমতী তাহারদিগকে বৃত্তিভোগী করিয়াছেন, এইক্ষণে তাহারা অন্য কোন কর্ম্ম করে না, কেবল তাঁহার পূজার নৈবেদ্য এবং ইষ্টোদ্দিশ্যে উৎসৃষ্ট ভোজ্য লইয়া ব্রাহ্মণদিগের বাড়ী বাড়ী যায়, অতি প্রশস্ত এক থালের মধ্যস্থলে অভ্যু(ত্যু?)ত্তম ।৫ পাঁচ সের নৈবেদ্য তণ্ডুল সাজানো হয় তাহার চতুর্দ্দিকে দ্বাদশ বাটী, তৎসঙ্গে এক গ্লাস থাকে ঐ সকল পাত্রে ফলমূল দধি দুগ্ধ ঘৃত সন্দেশাদি ও পানীয় জল তাম্বুল পর্য্যন্ত দেন, এবং এক চাঙ্গারীতে ভোজ্য সাজান যায়, তাহার তণ্ডুল পরিমাণ পঞ্চশের, তাবৎ প্রকার আনাজ, অতি পরিষ্কৃত অড়হর দাইল, তৈল, ঘৃত, পান, সুপারি এবং তাম্বুলোপকরণ, এক যজ্ঞোপবীত দক্ষিণা চারি পয়সা, পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন দুই

ভৃত্য এই সকল দ্রব্যাদি লইয়া ব্রাহ্মণদিগের বাড়ী বাড়ী দিয়া আইসে, ইহাতে কি পাঠকমহাশয়েরা বুঝিতে পারিবেন না ঐ আর্য্যার নৈবেদ্য ভোজে পঞ্চদশ পরিবারস্থ এক গৃহস্থের এক দিনের দক্ষিণ হস্তের সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হয়, যোগীন্দ্র বাবুর মাতা এইরূপে প্রতিদিবস দলস্থ সমস্থ (স্ত ?) ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতেছেন, দরিদ্র লোকেরা প্রতিদিবস তাঁহার দানে প্রতিপালন হইতেছে, মাতৃদায়, পিতৃদায়, কন্যাদায়, যে দায় হউক দায় জানাইলেই দরিদ্রেরা তাঁহার নিকট কিছু কিছু পায়, বেলা দুই প্রহর তিনঘণ্টা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করেন সকলের আহারাদি হইয়াছে কিনা, তৎপরে শেষ বেলায় নিয়মিত যৎকিঞ্চিৎ আহার করেন, এই আহারেই আহার, রাত্রিতে কিঞ্চিদ্দুগ্ধপান মাত্র, এই সংযতা স্বামী সেবায় ভক্তি যুতা রহিয়াছেন, পরমেশ্বর ধর্ম্ম কর্ম্ম দৃষ্টে তাঁহার প্রতি শুভ দৃষ্টি করিয়াছেন, তিন পুত্র, দুই কন্যা, পতি বর্ত্তমান, প্রচুর বিষয়, আমরা অনুমান করি ভূম্যধিকার হইতে প্রতিবৎসর নির্ব্বিবাদে পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা আসিতেছে এবং প্রজাসকল ঐ শ্রীমতীর উন্নতি প্রার্থনা করিতেছে আমরা প্রার্থনা করি অন্যান্য ধনি স্ত্রী-লোকেরা এইরূপ ধর্ম্ম কর্ম্মে কালক্ষেপ করুন।”৬৫

কিন্তু নিম্নবিত্ত সাধারণ গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না।

১৮১৯ খ্রীঃ রামমোহন রায় সাধারণভাবে বাংলা দেশের স্ত্রীজাতির দুরবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যথাসম্ভব তাঁহারই ভাষায় সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

“দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম ভয়ে সহ্য করে। অনেক কুলীন কন্যারই বিবাহের পর যাবজ্জীবনের মধ্যে দুই চারি-বার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই পিতৃগৃহে বা ভ্রাতৃগৃহে নানা দুঃখ সহ্যপূর্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম নির্বাহ করেন।......আর সাধারণ গৃহস্থের বাটিতে স্ত্রীলোক কি দুঃখ না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু তাহাদের সহিত পশুর অধম ব্যবহার করেন। স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে অর্থাৎ অতি প্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম করিয়া থাকে; এবং বৃহৎ পরিবারের সুপকারের কর্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে।......ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোন অংশে ত্রুটি হয় তবে তাহাদের স্বামী, শাশুড়ি, দেবর প্রভৃতি কি কি তিরস্কার না করেন। এ সকলই স্ত্রীলোকেরা ধর্ম ভয়ে সহ্য করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে

তাহা সন্তোষপূর্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে। আর দরিদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা গো-সেবাদি কর্ম করে, পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেয়, বৈকালে পুষ্করিণী অথবা নদী হইতে জল আনয়ন করে, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম তাহাও করে, মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ ক্রটি হইলে তিরস্কার পায়। যদি দৈবাৎ ঐ স্বামী ধনী হয় তবে ঐ স্ত্রীর সর্বপ্রকার জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টিগোচরে প্রায়ই ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয় এবং মাসমধ্যে এক দিবসও স্বামী-স্ত্রীর আলাপ হয় না।

"যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়। কখনও স্বামী এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্বদা তাড়ন করে, আবার কেহ কেহ সামান্য ক্রটি পাইলে বা বিনা কারণে সন্দেহবশতঃ স্ত্রীকে চোরের তাড়না করে (অর্থাৎ চোরের ন্যায় প্রহার করে)। অনেক স্ত্রীই ধর্মভয়ে এ সকলই সহ্য করে, কিন্তু যদি কেহ এইরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথক থাকিবার নিমিত্ত পতির গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রভাব থাকায় পুনরায় পতির হস্তে আসিতে হয়, এবং পতিও পূর্বজাত-ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে স্ত্রীকে ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে।"[৬৬]

রামমোহনের এই বর্ণনার প্রায় শতবর্ষ পরে আমার বাল্যকালের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে তাঁহার উক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। উপসংহারে রামমোহন গোঁড়া হিন্দু নেতাদের লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—'এই সকল বর্ণনা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না, দুঃখ এই যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী স্ত্রীলোকদিগকে দেখিয়াও আপনাদের কিঞ্চিৎ দয়া উপস্থিত হয় না যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা (অর্থাৎ সহমরণ) হইতে রক্ষা পায়।'

সমাজে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দুর্ব্যবহার একটি সুপরিচিত ব্যাপার ছিল। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় ১৮৫৬ সনের ২০শে মার্চ তারিখের নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে এ বিষয়ে তৎকালীন জনমত জানা যায়।

"কোন সম্ভ্রান্ত হিন্দু স্বীয় রমণীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ স্ত্রীর আবেদন মতে অত্যাচারের প্রমাণ লইয়া দুর্জন স্বামী হস্ত হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে পারেন কি না? জেলা ২৪ পরগণার জজ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের মধ্যে এই বিষয়ের মতের অনৈক্য ঘটিয়াছিল, মাজিষ্ট্রেট কহিয়া-ছিলেন তিনি ঐ প্রকার রমণীকে স্বামী হস্ত হইতে মুক্তি দিতে পারেন, সেসন

জজ সাহেব কহেন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করণের কোন ক্ষমতা নাই, অবশেষে এই প্রশ্ন সদর দেওয়ানী আদালতে আইসে, সদরীয় জজেরা মাজিষ্ট্রেটের মতেই মত দিয়াছেন।

"এইক্ষণে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা ঐ প্রকার রমণীগণকে দুবৃর্ত্ত স্বামীদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার ক্ষমতা পাইলেন ইহাতে হিন্দুদিগের মধ্যে মান্য লোকেরা অপমানিত হইবেন, কুলবালারা অনেকে স্বামীর অত্যাচার অসদ্ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া মাজিষ্ট্রেটী আজ্ঞায় স্বতন্ত্র হইবেন, আমরা এ নূতন বিধি শ্রবণে দুঃখিত নহি কেন না এ দেশীয় অনেক লোকে স্ত্রীদিগকে দাসীজ্ঞানে তাহারদিগের প্রতি অত্যন্ত কুব্যবহার ও অত্যাচার করেন, এই বিধানে তাঁহারা নম্র হইবেন আর মহিলাদিগের উপর অকারণ কণ্ঠ গর্জ্জন করিতে পারিবেন না।"[৬৭]

এ দেশীয় স্ত্রীলোকের মানসিক অবনতি ও তাহার কুফল সম্বন্ধে সংবাদ প্রভাকরে লিখিত হইয়াছে :

"দ্বেষ, হিংসা, কলহ, দ্বন্দ্ব, ক্রোধ, অহঙ্কার, বিচ্ছেদ, আলস্য, মূর্খতা এবং দুঃখ প্রভৃতির এদেশে আধিক্য শুদ্ধ স্ত্রীজাতির দোষেই কহিতে হইবেক, কারণ আমরা যাঁহারদিগের উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাঁহারা অহরহ কেবল দ্বেষ হিংসায় প্রমত্তা। বালিকাদিগের কবে বিবাহ হইবেক তাহার নিশ্চয়তা নাই, বিবাহ হইলে তাহার একটি স্বতীন হইবে কি না তাহাও অনিশ্চিত, অথচ তিনি পঞ্চম বর্ষ বয়স্কা হইয়া এক ব্রত করত কল্পনা পূর্ব্বক অগ্রেই তাহার মাথা খাইয়া বসিতেছেন, যথা :

"হাতা হাতা হাতা, খা স্বতীনের মাতা"

"বেড়ী বেড়ী বেড়ী, স্বতীন বেটী চেড়ী"

ভগিনী ব্রত করিতেছেন, যথা :

"গুয়া গাছে গুয়া ফলে আমার ভাই চিব্‌য়ে ফ্যালে,
আর লোকের ভাই কুড়্‌য়ে খায়।"

বিবেচনা করুন, যাঁহারা আমাদের প্রসব করেন ও লালন পালন করেন যখন তাঁহারাই এরূপ হইলেন তখন আমরা কত ভাল হইব ?"[৬৮]

উনিশ শতকে যে সমুদয় সমাজ সংস্কার প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহাদের কেন্দ্রস্থল ছিল শিক্ষা, সাধারণ জীবনযাত্রা ও সামাজিক পদমর্যাদা প্রভৃতি বিষয়ে স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন এবং তাহাদের প্রতি প্রথাগতভাবে যে সমুদয় পীড়ন ও অত্যাচার সমাজে প্রচলিত ছিল তাহার দূরীকরণ। সুতরাং এই উন্নতির সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করিব।

এই উন্নতির মূলে ছিল নারী জাতির দুরবস্থা সম্বন্ধে জাতীয় চেতনার উদ্বোধন। সম্ভবতঃ ইংরেজী শিক্ষা ও তৎসহ পাশ্চাত্য জাতির প্রভাবেই এই চেতনার উন্মেষ ও বৃদ্ধি হয়। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই চেতনার অর্থাৎ স্ত্রীজাতির দুর্দশায় সমাজে বেদনার অনুভূতির কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। মহারাজা রাজবল্লভ নিজের বিধবা কন্যার দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবা-বিবাহের পুনঃ প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন—এইরূপ ব্যক্তিগত প্রয়াসের দৃষ্টান্ত হয়ত আরও দুই একটি আছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে হিন্দু সমাজে বহু শতাব্দী-ব্যাপী স্ত্রীলোকের দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া, ইহার প্রতীকার চেষ্টা তো দূরের কথা ইহার জন্য দুঃখ প্রকাশের কোন পরিচয়ও উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় না। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে এই বেদনাবোধ পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গমহিলাদের দুঃখময় জীবনের একটি জীবন্ত চিত্রও ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্বে উদ্ধৃত রামমোহনের উক্তির ন্যায় এ বিষয়ে এইরূপ প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট প্রমাণ ইহার পূর্বে পাওয়া যায় না।

রামমোহন রায়ের এই লেখা প্রকাশিত হইবার দুই বৎসর পূর্বে ১৮১৭ খ্রীঃ কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এই কলেজের ছাত্রেরা এবং অন্যান্য অনেকেও স্ত্রী-জাতির দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হন এবং তাহাদের উন্নতি সাধনকল্পে অগ্রসর হন। পারিপার্শ্বিক প্রভাবে ও শিক্ষার ফলে স্ত্রীজাতির মনেও নিজেদের দুরবস্থা সম্বন্ধে তীব্র চেতনার সঞ্চার হয়। ১৮৩৫ খ্রীঃ ১৪ই মার্চ 'সমাচার দর্পণ' নামে প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত 'কাচিৎ শান্তিপুর নিবাসিনী' স্বাক্ষরিত একখানি পত্রে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পত্রের সারমর্ম নিম্নে দিতেছি।

"ইংরেজ রাজ্যের অনেক স্থলেই বিধবাদের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল বাঙ্গালীর মধ্যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সমমেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমন পূর্বক উপস্ত্রী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না। বরং তাঁহারা মান্য হইয়া ধন্যবাদ পাইতেছেন। কেবল স্ত্রীলোকের নিমিত্ত সমন্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। বাঙ্গালা শাস্ত্রমতে এমত আছে যে অপ্রৌঢ়া বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হইতে পারে। প্রাচীনকালে রাণীরা পতি অভাবে

পুনঃ স্বয়ম্বরা হইয়াছেন এবং স্বামিসত্বে অনায়াসে উপপতি লইয়া সম্ভোগ করিয়াছেন তাহাতে ধর্ম বিরুদ্ধ হয় নাই। অদ্যাপিও তাঁহাদিগের নাম উচ্চারণে এবং স্মরণে পাপধ্বংস হয়। এইক্ষণে ঐ সকলে পুরুষদিগের ধর্মবিরুদ্ধ হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের সুখ সম্ভোগ নিষেধার্থে কি ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ তন্ত্র সৃজন হইয়াছিল? আমাদের বেশভূষা উত্তম আহার্য দ্রব্য ও পতি সংসর্গ বর্জিতা হইয়া অসহ্য বিরহ বেদনায় বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া কি নিমিত্ত কাল যাপন করিতে হয়? আমাদিগের ধর্মশাস্ত্রে এই যাতনা নিবারণের উপায় আছে। অতএব নিবেদন এই যে ধার্মিক রাজা ইংরেজ বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্বক প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে আইন করুন। কিম্বা বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়দিগের উপস্ত্রী সহিত সম্ভোগ রহিত করুন।"৬৯

এই পত্র প্রকাশিত হইবার এক সপ্তাহ পরে উক্ত পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় চুঁচুড়া নিবাসিনী স্ত্রীগণের একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে তাঁহারা তাঁহাদিগের 'পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের' উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন ও আবেদন করিয়াছেন। তাহার সারমর্ম এই:

১। সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় সেইরূপ আমাদিগের কেন হয় না?

২। অন্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমাদিগকে তদ্রূপ করিতে দেন না কেন?

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমাদিগকে কি নিমিত্ত পরহস্তে দান করেন? আমরা কি নিজেরা বিবেচনাপূর্বক স্বামী মনোনীত করিতে পারি না? আপনারা কুল, ধর্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য যাহাদের সঙ্গে আমাদের কখন কিছু জানা শোনা নাই এবং বিদ্যা বা রূপ ধনাদি কিছুই নাই এমত পোড়া-কপালিয়াদের সঙ্গে কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমাদের বিবাহ দিতেছেন এবং ১০।১২ বৎসর বয়সে অজ্ঞানাবস্থায় আমাদিগকে দান করিতেছেন। সংসারের মধ্যে প্রবেশের এই কি উচিত সময়? ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন।

৪। আপনারা কেহ কেহ টাকা লইয়া আমাদিগকে বিবাহ দিতেছেন। তাহাতে যাঁহারা মূল্য অধিক ডাকেন তাঁহারাই আমাদের স্বামী হন এবং আমরা তাঁহাদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হই।

৫। যাঁহাদের অনেক ভার্যা আছে তাঁহাদের সঙ্গে কেন আমাদের বিবাহ

দিতেছেন? যাঁহার অনেক ভার্যা আছে তিনি প্রত্যেক ভার্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি ও কর্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পারেন?

৬। ভার্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্বিবাহ করিতে পারে। তবে কেন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে? পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই? এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুষ্টতার দমন হয়?"৭০

এইরূপ আরও অনেক পত্র এবং তাহার উত্তর সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন যে পূর্বোদ্ধৃত পত্র দুইখানি বাস্তবিক স্ত্রীলোকের লেখা নহে—কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের নামে লিখিয়াছে। কিন্তু যাহারই লেখা হউক এই পত্রগুলি হইতে বেশ বোঝা যায় যে স্ত্রীজাতির দুরবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে বেদনাবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে এবং এই নবজাগ্রত চেতনা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মনেই সাড়া জাগাইয়াছে। এই সময় হইতে স্ত্রীজাতির সর্ববিধ উন্নতির জন্য যে আন্দোলনের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উনবিংশ শতাব্দীতে বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে সুফল প্রসব করিয়াছে। ইহার পূর্বে পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে স্ত্রীজাতির দুরবস্থা সম্বন্ধে এরূপ বেদনাবোধ বা প্রতিকারের চেষ্টা হইয়াছে এরূপ কোন প্রমাণ নাই। যদিও প্রধানতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেই ইহার সূত্রপাত হয়, তথাপি ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে এক শ্রেণীর শাস্ত্রজ্ঞ বাঙ্গালী পণ্ডিতও কালধর্মের প্রভাবে সমাজ সংস্কার বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলেন। ইহাদের সমবেত চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আরম্ভ হইয়া বিগত একশত বৎসরে স্ত্রীজাতি দ্রুতবেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আধুনিক যুগে বাঙ্গালী তথা ভারতীয় নারীর যে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সত্যই বিস্ময়কর ও অভাবনীয়। প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের শিক্ষা বিস্তারই এইরূপ অসাধ্য সাধন করিয়াছে। বংশপরম্পরাগত শত শত কুসংস্কারের ফলে স্ত্রীজাতির লেখা পড়া প্রায় লোপ পাইয়াছিল। কিরূপে ইহা ধীরে ধীরে বহুলোকের চেষ্টার ফলে আবার প্রসার লাভ করিয়াছে প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব।

খ। স্ত্রী শিক্ষা

অষ্টাদশ শতকে কয়েকজন বিদুষী মহিলা থাকিলেও সাধারণ গৃহস্থের ঘরে যে মেয়েদের লেখাপড়ার প্রথা একরকম উঠিয়া গিয়াছিল—এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা বিবৃত হইয়াছে (৩১৫ পৃঃ)।

সরকারের আদেশে মিঃ অ্যাডাম (Adam) বাংলাদেশে সর্বত্র ঘুরিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে যে রিপোর্ট দেন[৭১] তাহা পাঠ করিলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়। তখন মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোন পাঠশালা ছিল না—তুই চারিজন বাড়ীতে কিছু লেখা পড়া করিতেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ বাংলাদেশের রাজধানী ছিল, কিন্তু অ্যাডাম্‌স্‌ লিখিয়াছেন যে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জিলায় মাত্র নয়টি স্ত্রীলোক বই পড়িতে ও কোনমতে নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে পারিত। অন্য যে সব স্থানে তদন্ত করা হইয়াছিল সেখানে তুই একটি জমিদার পরিবার বা বৈষ্ণবের আখড়া প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের বাহিরে কোন মতে লিখিতে বা পড়িতে পারে এমন একটি স্ত্রীলোকও ছিল না। ইহার প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ, অবরোধপ্রথা ও তৎকালে প্রচলিত একটি বদ্ধমূল সংস্কার যে স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইবে। অবশ্য কলিকাতায় ও অন্যত্র সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কয়েকটি বিদুষী ছিলেন—কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প। ইঁহাদের মধ্যে মহারাজা সুখময় রায়ের পৌত্রী ও রাজা শিবচন্দ্র রায়ের কন্যা হরসুন্দরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে এক বৈষ্ণবীর নিকট অক্ষর শিক্ষা করেন এবং রাজবাটির এক প্রাচীন ব্রাহ্মণের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। কিন্তু এ সকলই গোপনে করিতে হইত। একদিন অন্তঃপুরে একাকিনী এক কক্ষে বসিয়া মৃদুস্বরে রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহার পিতা হঠাৎ অন্তঃপুরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ ঘরে পাঠ করে কে? রাজকন্যা ভীতা হইয়া গোপনীয় স্থানে গ্রন্থ রাখিয়া লজ্জিতভাবে পিতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি লেখাপড়া শিখিয়াছ, কি কি পড়িয়াছ, আমার সাক্ষাতে বল, কোন ভয় নাই। রাজকন্যা সমুদয় বলিলে পিতা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিয়া বলিলেন যে ইহার সুদ হইতে তুমি ইচ্ছামত গ্রন্থাদি ক্রয় করিবে। অতঃপর তাঁহার বিবাহ হইল। শ্বশুরবাড়ীতে প্রকাশ্যে গ্রন্থপাঠ করিতে পারিতেন না, কিন্তু গোপনে নানা পুস্তক পাঠ করিতেন। তাঁহার স্বামী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ লোকনাথ মল্লিক নিরক্ষর ছিলেন।[৭২] এই কাহিনী হইতে সেকালে সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাদেরও বিদ্যাভ্যাস কিরূপ তুরূহ ও আয়াসসাধ্য ছিল তাহা বুঝা যাইবে। এই প্রসঙ্গে দ্রবময়ী দেবীর নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যা পিতা চণ্ডীচরণ তর্কালঙ্কারের নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া, পিতা

বৃদ্ধ হইলে তাঁহার টোলে ছাত্রদের পড়াইতেন।[৭৩] কিন্তু এইরূপ দুই একটি ব্যতিক্রম থাকিলেও সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বালিকারা প্রায়ই নিরক্ষর ছিল। বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা করেন খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা। ১৮১৯ খ্রীঃ তাঁহারা Calcutta Female Juvenile Society নামে একটি সমিতি স্থাপিত করিয়া এ দেশীয় বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রথম বছরে ৮০ জন এবং ছয় বছর পরে ছয়টি স্কুলে মোট ১৬০ জন ছাত্রী ছিল। কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েরা এই সব বিদ্যালয়ে যাইত না। বাগদী, বৈরাগী, বেদে এবং গণিকাদের কন্যারাই পড়িত।

১৮২১ খ্রীঃ ইংলণ্ডের Foreign School Society কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সাহায্যে এদেশে নারীদের শিক্ষার জন্য বিলাতে চাঁদা তুলিয়া মিস্ কুক নামে একজন শিক্ষয়িত্রী পাঠাইলেন।[৭৪] এ বিষয়ে আলোচনার জন্য কলিকাতা স্কুল সোসাইটির একটি সভা আহ্বান করিবার প্রস্তাব হইলে ইহার ভারতীয় সম্পাদক রাজা রাধাকান্ত দেব ইউরোপীয় সম্পাদককে লিখিলেন যে "ভদ্র হিন্দু পরিবারেরা মিস্ কুকের স্কুলে মেয়ে পাঠাইবেনা এবং তাঁহাকে নিজেদের বাড়ীতে যাইয়া মেয়েদের শিখাইবার অনুমতি দিবে না। সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সভা ডাকিবার প্রয়োজন নাই।" মেমদের স্কুলে পাঠাইবার দুইটি গুরুতর বাধা ছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম শিক্ষার ভয় এবং নীচ জাতীয়া ও গণিকার কন্যাদের সঙ্গে একত্রে পড়াশুনা করা। এইসব বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও মিস্ কুকের যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলে প্রায় ৩০টি স্কুল স্থাপিত হইল—মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৬০০। অতঃপর আর ছোট ছোট স্কুলের সংখ্যা না বাড়াইয়া একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। পূর্বোক্ত মহারাজা সুখময় রায়ের পুত্র বৈদ্যনাথ রায় ইহার জন্য বিশহাজার টাকা চাঁদা দিলেন এবং ১৮২৬ খ্রীঃ বড়লাটের পত্নী লেডী আমহার্স্ট এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। এইরূপে মিশনারীরা বহু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন কিন্তু ভদ্র ঘরের মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ প্রসার হইল না। তাঁহাদের কুসংস্কার দূর করার জন্য ১৮২২ খ্রীঃ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। দুই বৎসরের মধ্যেই ইহার দুই সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। ১৮২৪ সনে প্রকাশিত ইহার তৃতীয় সংস্করণের গোড়ায় দুইটি বধূর কাল্পনিক কথোপকথন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"প্রথমা—ওগো এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা, কালে কালে কতই হবে—ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

দ্বিতীয়া—তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমাদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্রঃ—কেন গো। সে সকল পুরুষের কাজ। তাহাতে আমাদের ভাল মন্দ কি?

দ্বিঃ—স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কাজ করিয়া কাল কাটায়।

প্রঃ—স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কাজ, রাঁধা বাড়া, ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন? তাহা কি পুরুষেরা করিবে?

দ্বিঃ—না পুরুষেরা করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কাজ কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মত দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্রঃ—কিন্তু সেকালের স্ত্রীলোকেরা কহেন যে লেখা পড়া যদি স্ত্রীলোক করে তবে সে বিধবা হয়। যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

দ্বিঃ—না বইন; আমার ঠাকুরাণী দিদি ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই যে মেয়ে মানুষ পড়িলে বিধবা হয়। কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি—সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখনা কেন, বিবিরা তো সাহেবের মত লেখা পড়া জানে, তাহারা কেন বিধবা হয় না।

প্রঃ—যদি দোষ নাই তবে এতদিন এদেশের মেয়্যা মানুষে কেন শিখে নাই? কন্যারা পাঠশালায় যায় না কেন?

দ্বিঃ—হেদে দেখ দিদি বাহির পানে তাকাইতে দেয় না। যদি ছোট ছোট কন্যারা বাটির বালকের লেখা পড়া দেখিয়া সাধ করিয়া কিছু শিখে ও পাৎতাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহে যে এই মন্দা চেঁটি ছুঁড়ি বেটা ছেলের মত লেখা পড়া শিখে, এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখনি এই, শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরে জানা যায়।"

এই সুদীর্ঘ কথোপকথনের মধ্য দিয়া সে কালের চিত্র স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে—কিন্তু আর বেশী উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে। পরে এই দুইটি স্ত্রীলোক স্থির করিল যে পাড়ার যে সমুদয় নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকেরা পাঠশালায় যায় তাহাদের নিকট গোপনে অক্ষর পরিচয়ের ব্যবস্থা করিবে।

মিশনারীদের চেষ্টার ফলে যে বাংলার হিন্দু সমাজে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে খুব একটি সাড়া জাগিয়াছিল এবং ইহার বিরুদ্ধবাদী প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে ইহার সমর্থনকারী নব্য একদলের সংঘর্ষ বাধিয়াছিল, সমসাময়িক সংবাদ পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাচার দর্পণ, সমাচার চন্দ্রিকা প্রভৃতি পত্রিকায় এ বিষয়ে খুব বাদানুবাদ হয়—তাহার একটু নমুনা দিতেছি।

১৮২২ সনে ৬ই এপ্রিল জনৈক লেখক স্ত্রীশিক্ষার সমর্থনে প্রাচীন কালের মৈত্রেয়ী, অনসূয়া, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, চিত্রলেখা, লীলাবতী, কর্ণাট রাজ-স্ত্রী, লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী ও খনা ইত্যাদি এবং আধুনিক কালের মহারাণী ভবানী, হটী বিদ্যা-লঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী প্রভৃতির নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে পারদর্শিতা উল্লেখ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা এবং ইহাতে যে কোন দোষ নাই তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

১৩ই এপ্রিল আর একজন লেখকও কয়েকজন বিদূষী মহিলার উল্লেখ করিয়া পরে লিখিয়াছেন: "এখনও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে ইংলণ্ডীয় স্ত্রীগণের আনুকূল্যে কন্যাদিগের পাঠার্থে যে পাঠশালা হইয়াছে তাহাতে যে বালিকারা শিক্ষা করিতেছে তাহার মধ্যে কেহ এক বৎসরে কেহ দেড় বৎসরে লিখাপড়া শিখিয়াছে। তাহারা যে ভাষা পুস্তক কখন দেখে নাই তাহা অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। ইহাতে বোধ হয় যে স্ত্রীলোক যদি বিদ্যাভ্যাস করে তবে অতি শীঘ্র জ্ঞানাপন্না হইতে পারে। অতএব যেমত গৃহকর্মাদি শিক্ষা করান সেমত বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত। যেহেতু স্ত্রীলোক অবীরা (অনাথা) হইলেও বার্তা বিদ্যাদ্বারা আপন ধন রক্ষা করিয়া কাল যাপন করিতে পারে, অন্যের অধীন হইতে হয় না, এবং অন্যে 'প্রতারণা' করিতে পারে না।"

এবারে স্ত্রীশিক্ষা বিরোধীদের উক্তিরও দুইটি নমুনা দিতেছি।

১৮৩১ সনে একজন লিখিয়াছেন:

"স্ত্রীলোকের লেখাপড়া করাওনের প্রয়োজন কি? যদি বল লিখন পঠন বিনা তাহাদের জ্ঞান জন্মিতে পারে না তাহার উত্তর এই—প্রথমতঃ এমন কোন পুরুষবর্জিত দেশ নাই যেখানে পাটোয়ারিগিরি, মুহুরিগিরি, নাজীরী, জমিদারী ও আমীরী নারী বিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়ত কেবল বাংলা কলা বানান প্রভৃতি শিখিলেই যে পারমার্থিক ও নীতি ও পূর্ববৃত্তান্ত অথবা অন্য অন্য লৌকিক জ্ঞান জন্মিবে এমন ভাবা পাগলের প্রলাপ মাত্র। যেহেতু বাংলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহাতে এই সমুদয় বিষয়ে জ্ঞান জন্মে।"

ইহার একমাস পরে আর একজন লিখিয়াছেন : "দর্পণ প্রকাশক মহাশয় লেখেন যে মনুষ্য হইয়া অর্ধাঙ্গ স্ত্রীকে যে পশুভাবে দেখা এ কোন ধর্ম ? উত্তর—ইহাই তাবদ্ বিশিষ্ট হিন্দু জাতির কুলধর্ম। অপর লেখেন যে এখনকার রাণী ভবানী, হঠী বিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী ইহারাও দর্শন বিদ্যাতে অতি সুখ্যাতি পাইয়াছেন। উত্তর—শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে স্ত্রীজাতির আদৌ অধিকার নাই।..উক্ত কয়েকজন বিপ্রকন্যার বিদ্যাবিষয়ের উপাখ্যান আমাদিগের কোন শাস্ত্রে লেখা নাই। তবে কি শুদ্ধ স্কুল বুক সোসাইটির গদ্য পদ্য রচিত পুস্তকের প্রমাণে হিন্দু বিশিষ্ট সন্তানেরা আপন কুলাঙ্গনাদের পাঠশালায় পাঠাইয়া বারাঙ্গনা করিবেন।" আর একজন লিখিয়াছেন স্ত্রীলোকের বেদপাঠ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে যেহেতু তাহারা শূদ্রতুল্য। ইহার উত্তরে একজন লিখিয়াছেন তবে তাঁহার স্ত্রীর অন্নভোজনে শূদ্রান্ন ভোজনের দোষ হয়। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা যদি মেমদের মতন বিদ্যালয়ে যাইতে পারে তবে তাহাদের মতন একাধিকবার বিবাহও করিতে পারে। আবার কেহ কেহ লিখিয়াছেন মেয়েরা বিদ্যালয়ে গেলে দুশ্চরিত্রা হইবে, এবং এমন অনেক উক্তি করিয়াছেন যাহা বর্তমান যুগে ইতর ও অশ্লীল বলিয়া গণ্য হইবে।[৭৫]

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে নানা স্থানে অনেক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও যে বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন কিরূপ কষ্টকর ছিল তৎকালীন একটি বিখ্যাত ইংরেজী সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহার কতকটা ধারণা করা যাইবে।

১৮৪৯ সনে কয়েকটি নব্যপন্থী নেতার চেষ্টায় বারাসতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু আয়াসে তাঁহারা কয়েকটি ভদ্রগৃহস্থ ঘরের মেয়েদের ছাত্রীরূপে সংগ্রহ করিলেন। ইহাতে বিরোধীদল উত্তেজিত হইয়া এই সব ছাত্রীর অভিভাবকদের এবং বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে নানারূপ মিথ্যা অভিযোগ আনিয়া অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিল, প্রকাশ্য রাস্তায় তাহাদিগকে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি এবং নানা উপায়ে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। একদিন প্রাতে দেখা গেল স্কুল কমিটির এক সদস্যের বাড়ীর সম্মুখে রাতারাতি একটি প্রকাণ্ড নালা কাটিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই সব উৎপাত সহ্য করিয়াও স্কুলটি টিকিয়াছিল। অন্যান্য স্থানেও বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাগণকে বহু নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল।[৭৬]

বাংলার আধুনিক যুগের সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল কলিকাতার অনতিদূর-বর্তী বারাসত শহরের এই কাহিনী হইতে সহজেই বোঝা যায় যে সুদূর মফঃস্বলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার ছিল।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে ঔদাসীন্যের উল্লেখ করা আবশ্যক। ১৮৫৮ সনে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর তদানীন্তন বাংলার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর হ্যালিডে সাহেবের মত লইয়া বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। হ্যালিডে সাহেব পূর্বে এ বিষয়ে বড়লাটের মত গ্রহণ করেন নাই এই অজুহাতে মাসিক মাত্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় বডলাট মঞ্জুর করিলেন না। কিন্তু পরে তিনি ইহার অনুমোদন করিলেও ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ এই সামান্য ব্যয় অনুমোদন করিলেন না।[৭৭]

এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের অনেকগুলি বিঘ্ন ছিল। ইহা সত্ত্বেও জনমত ক্রমশঃ ইহার অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় এ সম্বন্ধে বহু মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। ১২৭২ সনের ১৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি:

"স্ত্রীশিক্ষার বান্ধবগণ সর্ব্বদা আমাদিগকে এ বিষয়ে স্বদেশীয়দিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া থাকেন। সেই অনুরোধ বশবর্ত্তী হইয়া অদ্য এবিষয়ে আমাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে হইতেছে। এ দেশের অবলাগণ বিদ্যাশিক্ষা করিলে যে যে বিষয়ের উন্নতি হয় এবং তাহার অভাবে যে কত অপকার হইতেছে তাহা একাল পর্য্যন্ত অনেকে বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। অতএব ঐ পুরাতন বিষয়ের আন্দোলন করা বিফল। তবে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে বালীরাজা একশত মূর্খ লইয়া স্বর্গ গমন কষ্টকর বিবেচনা করিয়াছিলেন। আমরা স্ত্রী কন্যা প্রভৃতি সহস্র সহস্র মূর্খ বেষ্টিত হইয়া যে এই মর্ত্ত্যলোকে সুখী হইব ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা দূর থাকুক, তাহার নামোল্লেখ করিলেও নিস্তার থাকিত না। এক্ষণে তাহার বহু বিপর্য্যয় হইয়াছে।

"স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত এখন অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি যত্ন পাইতেছেন, কিন্তু যে কয়েকটি প্রতিবন্ধক থাকাতে তাঁহারা আশানুরূপ ফললাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

১। এ দেশের পুরুষেরা অদ্যাপিও ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। সুতরাং যাঁহারা এদেশীয় অবলাগণের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ও (?) তাঁহারা

যখন স্বয়ং সিদ্ধ হইতে পারিলেন না, তখন অন্যকে কেমন করিয়া সিদ্ধ করিবেন ?

২। বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাকাতে বালিকারা অধিক দিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া শিক্ষা পায় না। সুতরাং অল্পবিদ্যা সবিশেষ ফলোপধায়িনী হয় না।

৩। অল্প বেতনের লোকদ্বারা শিক্ষাকার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না, দুর্ভাগা বালিকাগণের অদৃষ্টে প্রায় তাহাই ঘটিয়া থাকে। ইহা সামান্য প্রতিবন্ধক নয়।

৪। অল্পমাত্র শিখিতে শিখিতে বালিকাদিগকে শ্বশুরালয়ে গমন করিতে হয়। সেখানে গিয়া গৃহকার্য্যে এমনি ব্যাপৃত হইতে হয় যে পূর্ব্বে যে কিছু শিক্ষালাভ হয় তাহা বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন হইয়া যায়। বিশেষতঃ এদেশে জাত্যভিমান ও বিবাহ প্রণালীগত দোষ থাকাতে প্রায় অনেকেই উপযুক্ত পাত্রের হস্তগত হয় না, সুতরাং তৎকালে আলোচনার অভাবে তাহার বিবাহের পূর্ব্বে যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হয়, তাহা বৃথা হইয়া যায়।"৭৮

বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় ছিল। কিন্তু অন্যান্য বিঘ্ন দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে স্ত্রী-শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য স্ত্রী-নর্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মিস্ মেরী কার্পেণ্টার ১৮৬৬ সনে কলিকাতায় আসেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় গভর্নমেণ্ট ইহার ব্যবস্থা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রথমে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেও ইহা যে কার্যকর হইবে না তাহার আশঙ্কা করিয়া বাংলার ছোটলাটকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন :

"আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের গ্রহণযোগ্য একদল দেশীয় শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য মিস্ কার্পেণ্টারের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা কঠিন। এ দেশের ভদ্র পরিবারের হিন্দুরা যখন অবরোধপ্রথার গোঁড়ামির জন্য দশ এগার বছরের বিবাহিত বালিকাদেরই গৃহের বাহিরে যাইতে দেয় না, তখন তাহারা যে বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করিতে সম্মতি দিবে এ আশা দুরাশা মাত্র। বাকী থাকে অনাথা বিধবারা—কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে তাহারা যদি অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে তাহা হইলে লোকের কাছে অবিশ্বাসের পাত্রী হইয়া উঠিবে এবং তাহার ফলে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

"মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী যে-কত আবশ্যক ও অভিপ্রেত তাহা আমি বিশেষভাবে জানি। দেশবাসীর দৃঢ়মূল সামাজিক কুসংস্কার যদি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হইয়া না দাঁড়াইত তাহা হইলে সকলের আগে আমি ইহা কার্য্যে পরিণত

করিবার জন্য সহযোগিতা করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু যে কার্য্যে সফলতার কোন সম্ভাবনা নাই তাহা আমি নিজেও যেমন সমর্থন করি না তেমনি সরকারকেও তাহা করিতে পরামর্শ দিতে পারি না।"[৭৯]

বিদ্যাসাগরের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইল। তিন বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই নর্ম্যাল স্কুল বন্ধ হইয়া গেল।

অবরোধ প্রথার বাধা দূর করিবার নিমিত্ত প্রধানতঃ মিশনারীগণের চেষ্টায় 'অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালীর' প্রবর্তন হইয়াছিল।

সোমপ্রকাশের সম্পাদক লিখিয়াছেন (১২৭৫, ৬ আশ্বিন):

"বঙ্গদেশের অন্তঃপুরের স্ত্রীগণ আজিকালি যে শিক্ষানুরাগী হইয়াছেন, মিসনরিদিগের যত্নই তাহার প্রথম কারণ। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই, কয়েকজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী রমণী এদেশের অন্তঃপুরস্থিত স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত কয়েক বৎসরকাল বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতেছেন। তার কি ফল ফলিল, বোধ হয় পাঠকগণ তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত একান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইবেন সন্দেহ নাই। মৃত বিবি মলেন্স প্রথমতঃ আমাদিগের বর্ত্তমান অন্তঃপুর শিক্ষা প্রণালীর উদ্ভাবন করেন। তাহার পর বিবি মরে নামে এক গুণবতী মিসনরিপত্নী এই প্রণালীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হন। বিবি মরে কতগুলি ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রীকে স্থানে স্থানে প্রেরণ করেন, তাঁহারা লিখন পঠন ও সূচির কাজের শিক্ষা দিতেন। বিবি মরে সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন। ঐ গুণবতী রমণী ইংলণ্ডে গমন করিলে পর তাঁহার বিদ্যালয় সকল মিস ব্রিটনের হস্তে পতিত হয়। ইনি আমেরিকাবাসিনী। ডাক্তার জারবোর সাহায্যে তিনি অন্তঃপুরের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার অধীনে ১৭ জন ইউরোপীয় এবং ১৩ জন এতদ্দেশীয় শিক্ষয়িত্রী আছেন।......

"যাঁহারা শিক্ষা করিবার অভিলাষী হন, তাঁহাদিগের বাটীতে এক একজন এতদ্দেশীয় খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রী প্রেরিত হইয়া থাকেন। আপাততঃ সামান্য সাহিত্য পুস্তক, অঙ্ক ও বিদ্যাসাগরের বঙ্গদেশীয় ইতিহাস পাঠ করান হয়। ছাত্রীগণ সূচির কাজও শিক্ষা করেন। প্রতি সপ্তাহে একজন ইউরোপীয় শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীদিগের উন্নতির পরীক্ষা করেন। মিস্ ব্রিটন নিজে মধ্যে মধ্যে গিয়া সকল বিষয় স্বচক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। ছাত্রীরা প্রায় ২ টাকার অধিক বেতন দেন না। যেখানে ইংরাজী শিক্ষা হয়, তথায় ৪ টাকাই উর্দ্ধসংখ্যা বেতন। বিধবাদিগের নিকটে এক পয়সাও লওয়া হয় না, বরং অনেকে মিস্ ব্রিটনের নিকটে

সাহায্য পান। তিনি বিধবাদিগকে নিজের বাটীতে আসিয়া সঙ্গীত ও অন্ত অন্য বিষয় শিক্ষা দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই প্রকারে প্রায় ৮০০ শত এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক ও বালিকা মিস্ ব্রিটনের যত্নে শিক্ষা লাভ করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট প্রতি ছাত্রীকে একটাকা সাহায্য দান করেন। আমেরিকার মিসনরিরা মাসিক ১২০০ টাকা দিয়া থাকেন; কিন্তু যে ব্যয় হয় তাহাতে শিক্ষয়িত্রী ও মিস্ ব্রিটনকে নিজে অতি সামান্য অবস্থায় অবস্থান করিয়া কালহরণ করিতে হয়।......

"মিস্ ব্রিটনের বিদ্যালয় সকলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছাত্রী আছেন। ডাক্তর রবসনের স্ত্রী প্রায় ১৫০ স্ত্রীলোক ও বালিকাকে শিক্ষা দিতেছেন; কিন্তু বিবি রবসনের শিক্ষয়িত্রীগণ ইউরোপীয় বলিয়া অনেকে উচ্চ বেতনের ভয়ে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন না।......

"তৃতীয় মিসন মৃজাপুরের মিস্ নিকলসনের অধীনস্থ। এ মিসনে বিস্তর এতদ্দেশীয় শিক্ষয়িত্রী আছেন। উহাদিগের সুশিক্ষা ও সচ্চরিত্রতা নিবন্ধন অনেক উপকার হইতেছে। বিবি লুইস নিজের ব্যয়ে প্রায় ১৫০ ছাত্রীকে শিক্ষা দিতেছেন।

"এই প্রকারে বিনা আড়ম্বরে কতগুলি খৃষ্টীয়ান স্ত্রীলোক আমাদিগের অন্তঃপুরের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন।"[৮০]

কিন্তু এই ব্যবস্থায় যে সুফল হয় নাই তাহার প্রধান কারণ পূর্বোক্ত সম্পাদকের নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি পড়িলেই বুঝা যাইবে।

"বিবি রবসন ভিন্ন আর সকল শিক্ষয়িত্রীই খৃষ্টধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং মিস্ ব্রিটন প্রভৃতি নিজেই বলেন, খৃষ্টীয়ান করাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহাদের স্বধর্ম্মের প্রতি যে এত ভক্তি তন্নিমিত্ত তাঁহারা প্রশংসনীয় হইবেক, সন্দেহ নাই; কিন্তু এতন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের শিক্ষাদান কার্য্যটী সম্পূর্ণ ফলোপধায়ী হইতেছে না।"[৮১]

প্রায় ষোল বছর পরে, এ সম্বন্ধে ১৭ বৈশাখ, ১২৯১—সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে:

"এই দূষিত অন্তঃপুর শিক্ষা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে যে কয়েকটী বিষময় ফল ফলিয়াছে তদ্দ্বারা তাহার পরিণাম অনুমিত হইতেছে। মিশনারিগণ অন্তঃপুরে আপনাদিগের রমণীগণকে প্রেরণ করিয়া খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারের সদুপায় করিয়াছেন, কতকগুলি কুলবধূ ও কুলকন্যাকেও গৃহ হইতে লইয়া গিয়া আপনাদের

দলে নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, সমুদয় হিন্দুসমাজ যীশুমন্ত্রে দীক্ষিত হন, ইহাই তাঁহাদিগের মুখ্য অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায় সাধন জন্য তাঁহারা বিবিধ উপায় চিন্তা করিতেছেন।[৮২] ....

"হিন্দু সংসারে এপ্রকার বিকৃত সংঘটন হইতে দেওয়া কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তির উচিত নহে। প্রায় ৩০ বৎসর হইল, এইরূপ অন্তঃপুর শিক্ষা-প্রণালী এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কতগুলি কুলবধূ ও কুলকন্যা জাতীয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া মিশনরিদলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহা কে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন? হিন্দু পরিবারের মধ্যে এরূপ ঘটিবার মূল কারণ, খ্রীষ্ট মিশনরিদিগের অন্তঃপুর শিক্ষাদান।"[৮৩]

স্ত্রীলোকের বাল্য-বিবাহ, অবরোধপ্রথা, এবং উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব ব্যতীত স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে পুরুষের ঔদাসীন্য ছিল স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের আর একটি গুরুতর বাধা। নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ এবং বিশেষতঃ ইহার যুবক সভ্যদল এবং তাহাদের নেতা কেশবচন্দ্র সেন এই চারিটি বাধাই দূর করিবার চেষ্টা করেন, এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেন। অবরোধপ্রথা সে যুগে কতদূর কঠোর ছিল এবং কেশবচন্দ্র সেন কিরূপ দৃঢ়তার সহিত ইহা দূর করিয়া এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে সে বিষয়ে কিছু ধারণা করা যাইবে। ব্রাহ্মসমাজ অবরোধপ্রথার বিরোধী হইলেও প্রগতিশীল যুবক ব্রাহ্মেরা পর্যন্ত স্ত্রী বা পরিবারের মহিলাদের লইয়া প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইতেন না, বা সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন না। কেশবচন্দ্র সেন এই সমাজের আচার্য পদে নিযুক্ত হন এবং এই পদে অভিষেকের উৎসবে সস্ত্রীক জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহে যাইবেন এরূপ মনস্থ করেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য ও অন্যান্য বহু আত্মীয়-স্বজন ইহাতে বাধা দানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া ভোজপুরী দরওয়ান ও অন্যান্য ভৃত্যকে বাধা দিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন এবং নিজেরা সকলে সমবেত হইলেন। কেশবচন্দ্র স্থানীয় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকে সাহায্য করিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু পুলিশ আসিবার পূর্বেই ধীরপদক্ষেপে, দৃঢ়চিত্তে পঞ্চদশ বর্ষীয়া অবগুণ্ঠিতা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, আত্মীয়-স্বজনের ব্যূহ ভেদ করিয়া দরজার নিকট আসিলেন এবং দরজার হুড়কা খুলিতে আদেশ দিলেন। দরজা খুলিয়া গেল এবং কেশবচন্দ্র সস্ত্রীক জোড়াসাঁকোর উৎসবে যোগদান করিলেন। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের স্বাক্ষরিত এক পত্র পাইলেন যে, কলুটোলার যে পৈতৃক ভবন হইতে তিনি সকালে যাত্রা

করিয়াছিলেন সেখানে আর তাঁহার স্থান হইবে না। এই বিপদে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার নিজ ভবনে কেশবচন্দ্রকে আশ্রয় দিলেন এবং কেশবচন্দ্র দীর্ঘকাল তথায় ছিলেন।[৮৪] এই ঘটনার তারিখ—১৮৬২ সনের ১৩ই এপ্রিল—বাংলার অবরোধপ্রথা দূরীকরণের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন।

এই ঘটনার পূর্ব হইতেই কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগী নব্য যুবক ব্রাহ্মদল নিজ নিজ স্ত্রীকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অন্যান্য উপায়েও কেশবচন্দ্র স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধানে যত্নবান ছিলেন। ১৮৭২ সনে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি একটি স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সরকারী সাহায্য পাইলেন। ইহাতে স্ত্রী-শিক্ষার অনেক উন্নতি হইল। কেশবচন্দ্র নিজে, ধর্মজগতে প্রসিদ্ধ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ের কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ 'বামা-হিতৈষিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সমাজের অনেক গণ্যমান্য মহিলারাও ইহাতে যোগদান করিয়া নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং কিরূপে তাহারা কন্যা, গৃহিণী ও মাতার উচ্চ আদর্শ পালন করিতে পারে তাহার আলোচনা করিতেন। এই সময়ে 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা' নামে আর একটি সভা স্থাপিত হয় এবং ইহার প্রচেষ্টায় অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকের, অর্থাৎ বালিকা, বধূ, প্রবীণা, সকলের শিক্ষাদান ও পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। প্রশ্নপত্র পাঠাইয়া দেওয়া হইত এবং ঢাকা, রাজসাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান হইতে ছাত্রীরা উত্তর-পত্র পাঠাইত। পরীক্ষার ফল অনুসারে তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইত।

এইরূপ নানা ভাবে চেষ্টা হইলেও প্রধানতঃ সাধারণ বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই যে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়েও যে খ্রীষ্টীয় মিশনারীরাই প্রথম পথ-প্রদর্শক তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে বহু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এদেশীয় লোকেরা নানা স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৮৪৯ সনের ৭ই মে তারিখে বেথুন সাহেব (J. E. D. Bethune) কর্তৃক Hindu Female School বা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাংলা দেশে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহাই বেথুন কলেজ নামে অদ্যাবধি স্ত্রীশিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত এবং শতাধিক বৎসর যাবৎ স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন ইহাকে

স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া 'সংবাদ প্রভাকর' যে উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিস্তৃত মন্তব্য করিয়াছিল তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"অদ্যকার প্রভাত অতি সুপ্রভাত .....

"ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক তথা বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের অধিপতি করুণাময় ড্রিঙ্কওয়াটর বেথিউনি সাহেব বাঙ্গালি জাতির বালিকা বর্গের বঙ্গভাষার অনুশীলন নিমিত্ত বিপুল বিত্ত ব্যয় ব্যসন পূর্ব্বক "বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়" নামক এক অভিনব স্ত্রী বিদ্যাগার স্থাপন করিয়াছেন, অদ্য প্রাতে তাহার কর্ম্মারম্ভ হইবেক, আপাততঃ সিমুলার অন্তঃপাতি সুকিএস্ ষ্ট্রীট মধ্যে দয়ার্দ্রচিত্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানা বাটীতে কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক, পরে তাহার জন্য স্বতন্ত্র স্থানে এক স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করা যাইবেক, এই স্থলে স্থাপন কর্ত্তার কথাইতো নাই, তাঁহাকে এদেশের মহোপকারী অদ্বিতীয় বন্ধু বলিয়া বাচ্য করিতে হইবেক, যেহেতু দেশীয় ভ্রাতারা চিরদুঃখিনী আশ্রিতা সহোদরাদিগের প্রতি যে এক অতি প্রয়োজনীয় সদ্ব্যবহার করণে অদ্যাপি ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, সাহেব ভিন্ন দেশীয় মনুষ্য হইয়া তাহারদিগকে কন্যার ন্যায় জ্ঞান করত পিতার ন্যায় স্নেহ পূর্ব্বক সেই সদ্ব্যবহার দ্বারা তদ্দিগের অজ্ঞানাবস্থা দূরীকরনার্থ এক বলবৎ উপায় করিতেছেন, সুতরাং এতদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় স্থিরদর্শি মনুষ মাত্রকেই চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার সদ্‌গুণ সমূহ স্মরণ করিতে হইবেক, কিন্তু শ্রীমান্ দক্ষিণারঞ্জন বাবুর বদান্যতা এবং সদ্‌গুণের বিষয় এইক্ষণে বাক্যদ্বারা ব্যাখ্যা হইতে পারে না, ঐ মহাশয় কিছুদিনের জন্য পাঠশালার কর্ম্ম নির্ব্বাহ নিমিত্ত বিনা বেতনে বাটী দিয়াছেন এবং নূতন বাটী নির্ম্মাণার্থে এক কালীন্ ৮০০০ অষ্ট সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, আর সময়ানুসারে সাধ্যমত আনুকূল্য করণে অঙ্গীকার করিয়াছেন।" ৮৫

ইহার দুইদিন পরে উক্তপত্রিকায় লিখিত হইয়াছে যে 'শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এককালীন ৮০০০ টাকা দান ছাড়াও দশহাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যে দিয়াছেন এবং ইহার পরেও যাহা দান করিবেন তাহার মূল্য ততোধিক হইবেক।'৮৬

এই স্কুলের কার্য প্রণালী সম্বন্ধে ১২৬৩ সনের ১লা মাঘ নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশিত হয়।

"কলিকাতা ও তৎসান্নিধ্যবাসী হিন্দুবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপন।

"বীটন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যের তত্ত্বাবধান

করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। যে নিয়মে বিদ্যালয়ের কার্য্য সকল সম্পন্ন হয় এবং বালিকাদিগের বয়স ও অবস্থার অনুরূপ শিক্ষা দিবার যে সকল উপায় নির্দ্ধারিত আছে, হিন্দু সমাজের লোকদিগের অবগতি নিমিত্ত, আমরা সে সমুদায় নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি।

"উক্ত বিদ্যালয় এই কমিটির অধীন। বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক বিবি প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষাকার্য্যে তাঁহার সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আর দুই বিবি ও একজন পণ্ডিতও নিযুক্ত আছেন।

"বালিকারা যখন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে, প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতির স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে, নিযুক্ত পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পান না।

"ভদ্র জাতি ও ভদ্র বংশের বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তদ্ব্যতীত আর কেহই পারে না। যাবৎ কমিটির অধ্যক্ষদের প্রতীতি না জন্মে অমুক বালিকা সদ্বংশজাতা, এবং যাবৎ তাঁহারা নিযুক্ত করিবার অনুমতি না দেন, তাবৎ কোন বালিকাই ছাত্ররূপে পরিগৃহীত হয় না।

"পুস্তক পাঠ, হাতের লেখা, পাটিগণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান, ভূগোল ও সূচীকর্ম্ম, এই সকল বিষয়ে বালিকারা শিক্ষা পাইয়া থাকে। সকল বালিকাই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করে। আর যাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইঙ্গরেজী শিখাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা ইঙ্গরেজীও শিখে।

"বালিকাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা ও বিনা মূল্যে পুস্তক দেওয়া গিয়া থাকে, আর যাহাদের দূরে বাড়ী এবং স্বয়ং গাড়ী অথবা পাল্কী করিয়া আসিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে আনিবার ও বিদ্যালয় হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত গাড়ী ও পাল্কী নিযুক্ত আছে।"[৮৭]

কিন্তু এই সকল সতর্কতা সত্বেও এই বিদ্যালয়টিকে বহু বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল এবং ইহা নানা বিপত্তির ভিতর দিয়া ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহাতে সম্ভ্রান্তঘরের কন্যারা এই হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদান করিতে পারে সেইজন্য প্রথম হইতেই কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। ভর্তি করার পূর্বে ছাত্রীদের কুলশীলের পরিচয় নেওয়া হইত। বাটী হইতে মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার জন্য ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এরূপ নিয়ম করা হইয়াছিল যে, যে পর্যন্ত মেয়েরা বিদ্যালয়ে থাকিবে সে পর্যন্ত কোন পুরুষ তথায় যাইতে পারিবে না, এবং বিদ্যালয়ে খ্রীষ্টধর্মের কোন প্রসঙ্গ

আলোচনা করা হইবে না। এই সমুদয় ব্যবস্থা সত্ত্বেও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি অনুরাগী ছিল না এবং ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হয়। প্রথমে ছাত্রীসংখ্যা ৬০টির বেশী হয় নাই। বেথুন সাহেবের মৃত্যুতে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহ কষ্টকর হইলে বড়লাটের পত্নী লেডী ডালহৌসী ইহার ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ডালহৌসী ইহার খরচ দেন এবং তাঁহার সুপারিশে তাঁহার পদত্যাগের পরে ইহা সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

বেথুন স্কুলের সফলতার মূলে যে কয়জন বাঙ্গালী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরই বেথুন সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর অবৈতনিক সম্পাদক রূপে ইহার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রগতিশীল ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতারাও বেথুনকে খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রথম যে ২১ জন ছাত্রী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন তাঁহাদের মধ্যে মদনমোহনের দুই কন্যা ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল দল, ব্রাহ্মসমাজ ও ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান সমর্থন করিয়াছিলেন।[৮৮]

১৮৬২ সনের ১৫ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুল সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পাঠান তাহার সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—লিখন-পঠন, পাটীগণিত, জীবন চরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানা বিষয়ে মৌখিক পাঠ এবং সেলাইয়ের কাজ। বাংলা ভাষাতেই ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী, দুইজন সহকারী শিক্ষয়িত্রী এবং দুইজন পণ্ডিত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করেন। . ১৮৫৯ সাল হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা যেভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে কমিটি মনে করেন, যাহাদের উপকারের জন্য বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে ইহার সমাদর ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে।"[৮৯] কিন্তু এই আশা ফলবতী হয় নাই। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার খুব ধীরে ধীরেই অগ্রসর হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ অবরোধ প্রথা, বাল্যবিবাহ এবং সর্বোপরি সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঔদাসীন্য। ইহাদের অনেকেই স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থনে বক্তৃতা দিতেন অথবা মুখে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন, কিন্তু মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতেন না এবং গৃহেও শিক্ষা দিতেন না। ফলে বেথুন স্কুলের অবস্থাও ক্রমশঃ খারাপ হইতে লাগিল। ১৮৬৩

সনে উমেশ চন্দ্র দত্ত 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত করেন। ইহা নারীদের গদ্যে পদ্যে লিখিত অনেক রচনা প্রকাশ করিয়া এবং স্ত্রী-শিক্ষার সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া ইহার উন্নতি বিধানে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ১৮৬৮ সনে বামাবোধিনী পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়: "আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে এ দেশের সর্ব্বপ্রধান বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে এক্ষণে ৩০টি মাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' সংবাদপত্র লিখিয়াছে, যে এই বিদ্যালয় উনিশ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের ইহার শিক্ষার কার্য্যে এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাত শত ছিয়াত্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহার সংস্থাপক এককালে ষাট হাজার টাকা দান করেন এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর বাটির সংস্কারকার্য্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। এরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া যখন শুধু ৩০টি মাত্র সাত আট বৎসর বালিকার সামান্য শিক্ষালাভ হইতেছে, তখন ইহাতে অর্থের কেবল অপব্যয় হইতেছে বলিতে হইবে।"[৯০]

এই মন্তব্য যথার্থ হইলেও কালের পরিবর্তনে এই বেথুন স্কুলরূপ ক্ষুদ্র চারাটি য মহামহীরূহে পরিণত হইয়া বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার সাধন করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এই কার্য যে কিরূপ দুরূহ ছিল উদ্ধৃত মন্তব্য হইতে তাহা বোঝা যায়। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ধীরে ধীরে হইলেও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৮৬৬-৬৭ সনের শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে:

"এক্ষণে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয়বিধ স্ত্রী-বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ২৮১। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা গত এগার মাসে ৬৪টি বিদ্যালয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, পূর্ব্বে পাঠার্থিনীর সংখ্যা ৫৫৫৯ ছিল, গত এগার মাসে ৬৫৩১ হইয়াছে।"[৯১] ইহা হইতে বোঝা যায় গড়ে প্রতি বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা কুড়ির বেশী হয় নাই।

ইহার একটি কারণ সম্ভবতঃ এই যে হিন্দু সমাজের অনেক শিক্ষিত গণ্য-মান্য ব্যক্তিও বালিকাগণের বিদ্যালয়ে যোগদান সম্বন্ধে খুব বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন। প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে কুৎসিৎ মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের শঙ্কা আছে, কেননা বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টিপথে পড়িলে অসৎপুরুষেরা তাহার-দিগকে বলাৎকার করিবে, অল্প বয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না, কারণ খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা কি ছাগাদির শাবককে পশু বলিয়া দয়া করে,

ধনবানদিগের কন্যারা পথিমধ্যে ভৃত্যদ্বারা রক্ষিত হইয়া গমন করিলে তথাপি কৌমার হরণের ভয় আছে কেননা রক্ষকেরাই স্বয়ং ভক্ষক হইবেক।...যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করেন তাঁহারা মান্য ও পবিত্র হিন্দু কুলোদ্ভব না হইবেন।"[৯২]

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে 'সংবাদ প্রভাকরে' ইহার তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাংলার ভূম্যধিকারী সভাও বেথুন স্কুলের বিরোধী ছিল এবং উক্ত বিদ্যালয়ে কন্যা পাঠাইবার অপরাধে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সদস্যপদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিল। এই শ্রেণীর দলপতি মহাশয়দের অনুচরবর্গ গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী গিয়া ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে এইরূপ কার্য হইতে নিবৃত্ত করিত।[৯৩] সংবাদ প্রভাকরে এবং সোম প্রকাশে ইহার প্রতিবাদ করিয়া স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে বহু মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল।[৯৪]

বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠার ২১ বৎসর পরে ১৮৭০ সনে কেশবচন্দ্র সেন স্ত্রীশিক্ষার জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রধানতঃ কয়েকজন ব্রাহ্ম নেতার চেষ্টায় ১৮৭৮ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইল। ইহার পর হইতেই স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা মন্থর গতিতে হইলেও ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষের ন্যায় নারীকে শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে কেবল প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণ নহে, ব্রাহ্মসমাজের অনেকেও ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। 'আদি ব্রাহ্ম সমাজের' মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে (চৈত্র, ১৮০২ শকাব্দ) নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়। "স্ত্রী ও পুরুষ জাতির প্রকৃতির বিভিন্নতার নিমিত্ত দুইয়ের পক্ষে এক প্রকার শিক্ষার উপযোগিতা অসম্ভব। স্ত্রী-প্রকৃতি স্বভাবতঃ হৃদয়-প্রধান এবং পুরুষ-প্রকৃতি প্রধানতঃ বুদ্ধি-প্রধান। অতএব তাহাকেই প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা বলা যাইতে পারে, যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হৃদয়ের উন্নতি এবং গৌণ উদ্দেশ্য বুদ্ধির উন্নতি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহা বুদ্ধি-প্রধান শিক্ষা, হৃদয়-প্রধান শিক্ষা নহে; অতএব ঐ প্রকার শিক্ষা স্ত্রীজাতির পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষা নহে।"

বর্তমান কালেও এই প্রকার আপত্তি মাঝে মাঝে শোনা যায়, এবং ইহার যৌক্তিকতা বিচার বর্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। কিন্তু কার্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাই যে সমাজে মেয়েদের জন্যও গৃহীত হইয়াছে, বর্তমান কালে

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ক্রমবর্ধমান ছাত্রীসংখ্যাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সে যুগেও যে ইহার বহু সমর্থক ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় কবিতায়। ১৮৮৩ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু বি. এ. পরীক্ষা পাশ করেন। সর্বপ্রথম দুই বঙ্গললনার এই কৃতিত্ব উপলক্ষে কবিতাটি রচিত হয়। ইহার শেষ কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি :

"হরিণ-নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুন ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি "বাঙ্গালীর মেয়ে",[৯৫]
তারি মত সুখ আজি তোমা দোঁহে পেয়ে ॥
বেঁচে থাক, সুখে থাক, চিরসুখে আর
কে বলেরে বাঙ্গালীর জীবন অসার।
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে ?
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে।
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিরোধী হইলেও 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের' নেতৃবর্গ পুরুষের ন্যায় স্ত্রীর পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি এই মতের পৃষ্ঠপোষকগণ 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' নামে কলিকাতায় একটি বোর্ডিং স্কুল পরিচালনা করিতেন ; কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, লেডী অবলা বসু, সরলা রায় প্রভৃতি এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। এই বিদ্যালয়ের বাংলা শিক্ষক 'অবলা বান্ধব' নামে প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত সঙ্গীত, 'না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না', এখনও বাংলাদেশে সুপরিচিত। তাঁহার চেষ্টায় ছাত্রীগণের মনেও জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয় এবং তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া লেডী অবলা বসু ছাত্রী অবস্থায় হিন্দুমেলায় একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্ম নেতাদের চেষ্টায় নারী জাতির শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য পত্রিকা প্রচার ও নানা সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেশবচন্দ্র সেনের স্ত্রী 'আর্য্য নারী সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৭৯) এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 'পরিচারিকা' নামে মাসিক পত্র সম্পাদনা করেন। 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত' মহিলাবৃন্দ 'বঙ্গ মহিলা সমাজ'

নামে একটি সভা স্থাপনা করেন এবং একটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। কলিকাতা এবং মফঃস্বলে নারী প্রগতির উদ্দেশ্যে এইরূপ নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহাদের মধ্যে 'মধ্য বঙ্গ সম্মিলনী', 'বিক্রমপুর সম্মিলনী' ও 'উত্তরপাড়া হিতকারী সভার' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচার এবং বিধবাদের শিল্প-শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থার জন্য ১৮৮৬ সনে স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখী সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন।

হিন্দু সমাজের স্ত্রী-শিক্ষার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু বাধা, বিঘ্ন ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আজীবন তাহার উন্নতিকল্পে আত্ম-নিয়োগ করেন, তাহা আজ একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং তাঁহার স্মৃতির বিশিষ্ট নিদর্শন রূপে পরিগণিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার ফলেই যে বর্তমান কালে বাঙ্গালী নারী, নিরক্ষরতা, বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ ও অবরোধ-প্রথা প্রভৃতি বহু দিনের সঞ্চিত লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পাইয়া ও নানাবিধ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উপযুক্ত মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে অনেক পরিমাণে সমর্থ হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং সর্ববিধ উন্নতির মূলস্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, হিন্দু সমাজের স্ত্রীলোকের ইতিহাসে একটি অবি-স্মরণীয় ঘটনা।

এই প্রসঙ্গে উনিশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরেও নারীর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৫-৫৬ সনে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় কয়েকটি মহিলার কবিতা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নিজে ইহার কোন কোন কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। ইহার পরে দশ বৎসরের মধ্যে আরও সাতজন মহিলা লেখিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'রাস সুন্দরীর আত্মকথা' নামক পুস্তকে একটি হিন্দু রমণীর বিদ্যাচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থখানি বাংলা গদ্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

পরবর্তীকালে মানকুমারী দেবীর 'কাব্য কুসুমাঞ্জলি' ও কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ৺যোগেন্দ্র নাথ গুপ্তের "বঙ্গের মহিলা কবি" ও ৺ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ সাহিত্যে মহিলা'—এই দুইখানি গ্রন্থে বহু মহিলা সাহিত্যিকের পরিচয়

পাওয়া যায়। *Condition of Bengali Women*—গ্রন্থে ডক্টর শ্রীযুক্তা উষা চক্রবর্তী স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। ইহাতে আধুনিক যুগে রাজনীতিক ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে বঙ্গনারীর অবদান, উনবিংশ শতকের ১৬ জন সুপ্রসিদ্ধা বঙ্গমহিলার সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থরচয়িত্রী ১৯৩ জন বঙ্গমহিলার নাম ও গ্রন্থের তালিকা, ২৫ জন সংবাদপত্রের সম্পাদিকা ও এই শ্রেণীর ২১টি সংবাদপত্র, বিশেষভাবে মহিলাদের জন্য লিখিত ১৬টি পত্রিকার ও তাহাদের সম্পাদকদের নাম, এবং যে সকল বঙ্গনারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৮৪ হইতে ১৯০৮ সনের মধ্যে এম, এ, এবং ১৮৮৩ হইতে ১৯১০ সনের মধ্যে বি, এ, পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন তাঁহাদের তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী নিজে সুলেখিকা ছিলেন এবং তাঁহার সম্পাদনায় "ভারতী" একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রে পরিণত হয়। নয় বৎসর (১২৯১-৯৯) সম্পাদনা কার্যের পর তিনি অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী ইহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ও যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করেন। বাংলার জাতীয় জাগরণে এই পত্রিকার ও সরলা দেবীর দান অবিস্মরণীয়। বহুকাল অবধি লুপ্ত নারীর সঙ্গীত শিল্পের চর্চাও ঠাকুর বাড়ীর কয়েকটি মহিলার কল্যাণে পুনরুজ্জীবিত হয়।

শিক্ষিতা নারীর মনে নানাভাবে নবজাগ্রত জাতি-চেতনার উন্মেষের পরিচয় পাওয়া যায়। অবলা দাস ছাত্রী অবস্থায় হিন্দু মেলায় কবিতা আবৃত্তি করেন। সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাদণ্ডে ছাত্রীরা কালো ফিতা পরিয়াছিল। বড়লাট লর্ড রিপনের অভ্যর্থনায় প্রায় ৩০।৪০টি ছাত্রী এক রকম পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইয়া রেল স্টেশনে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করে।

১৮৯০ সনে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্গমহিলা প্রতিনিধিরূপে এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কাদম্বিনী দেবী সাধারণ অধিবেশনে প্রায় পাঁচ হাজার দর্শকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা অ্যানি বেসান্ত *How India Wrought for Freedom* নামক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই সর্বপ্রথম একজন মহিলা কংগ্রেস প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতা যে ভারতীয় নারীর মর্যাদা কতদূর উন্নত করিবে ইহা তাহারই প্রতীক। অ্যানি বেসান্তের এই ভবিষ্যবাণী সফল হইয়াছে।

গ। সতীদাহ[৯৬]

স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ব্যতীত উনিশ শতকে স্ত্রীজাতির উন্নতিমূলক যে সমুদয় সংস্কার সাধিত হইয়াছিল সতীদাহ নিবারণ তাহাদের মধ্যে প্রধান। মৃত পতির জলন্ত চিতায় সদ্য বিধবাকে জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ করা, অর্থাৎ সহমরণ প্রথা, আমাদের নিকট নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত বলিয়া মনে হইলেও ইহা যে প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন স্মৃতি শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে এবং খ্রীষ্ট জন্মের তিন চারিশত বৎসর পূর্ব হইতে এদেশে সহমরণের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মধ্যযুগে অনেক মুসলমান নরপতি, গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তা এবং হিন্দু রাজাদের মধ্যে কেবলমাত্র পেশোয়া বাজীরাও ইহা রহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নাই।

'শঙ্খ' ও 'আঙ্গিরস' সংহিতার মতে মানুষের গায়ে লোমের সংখ্যা অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটি পরিমিত বৎসর কাল সহমৃতা স্ত্রী স্বর্গে বাস করিবে এবং অপ্সরাগণের স্তুতি লাভ করিয়া অনন্তকাল স্বামীর সঙ্গে ক্রীড়ার আনন্দলাভ করিবে। স্বামী যদি ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন, মিত্রঘ্ন বা সুরাপায়ী হন তথাপি স্ত্রী সহমৃতা হইলে তাহার সর্বপাপ বিনষ্ট হইবে। 'বৃদ্ধ হারীতের' মতে স্ত্রী সহমৃতা হইলে তাহার পতি, পিতা ও মাতার কুল পবিত্র হয়। সাধ্বী নারীর সহমরণ ভিন্ন অন্য গতি নাই। ধর্মশাস্ত্রের এই সকল উক্তিই যে সহমরণের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বহু স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতেন, এবং বহু অনুরোধ ও উপরোধেও সংকল্প হইতে নিবৃত্ত হইতেন না।

ইংরেজ গভর্নমেণ্ট 'হিন্দুর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না' এই সাধারণ নীতি অনুসরণ করার ফলে, শাস্ত্রের এই বিধি অমান্য করিয়া সতী-প্রথা রহিত করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট তাহাদের অধিকারের সীমার মধ্যে ইহা দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষণা করায় কলিকাতার অধিবাসীরা কলিকাতা শহরের বাহিরে যাইয়া এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিত। ডেন, ওলন্দাজ, ফরাসী প্রভৃতি বণিক সম্প্রদায়ের এলাকায়ও সতী-প্রথা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু সেখানকার লোকেরাও উহার সীমানার বাহিরে যাইয়াই সহমরণ অনুষ্ঠান করিত।

ইংরেজ গভর্নমেণ্টের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি সত্ত্বেও কয়েকজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ১৭৯৭ খ্রীঃ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট লেখেন যে তিনি কোনমতে একটি নয় বৎসর বয়সের বালবিধবাকে আপাততঃ সহমরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন—কিন্তু সম্ভবতঃ সরকারী আদেশ জারি না করিলে

ইহা বন্ধ করা যাইবে না। অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেটরাও এইরূপ রিপোর্ট করেন। কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাহার উত্তরে বলেন যে উপদেশ দিয়া নিবৃত্ত করা ছাড়া তাঁহারা যেন আর কোন উপায় অবলম্বন না করেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ নদীয়ার এক কুলীন ব্রাহ্মণের ২২টি স্ত্রী তাহার সহিত সহমৃতা হয়। ঐ সময়েই শ্রীরামপুরের নিকট-বর্তী সুকচরা গ্রামে এক কুলীন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তাহার ৪০টি পত্নীর মধ্যে যে ১৮টি জীবিত ছিল সকলেই সহমৃতা হয়। ১৮০৪ খ্রীঃ কলিকাতার চতুর্দিকে ৩০ মাইল বিস্তৃত সীমানার মধ্যে প্রায় তিনশত বিধবা সহমৃতা হয়। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজার হইতে গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে যে প্রায় ৭০টি বিধবা সহমৃতা হইয়াছিল তাহার একটি তালিকা পাওয়া গিয়াছে।[৯৭] ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ হইতে আরম্ভ করিয়া কামার, কুমার, তেলী, ছুতার, স্বর্ণকার, কৈবর্ত, ধোপা, নাপিত, তাঁতী, বাগ্দী প্রভৃতি সব জাতির বিধবা আছে এবং তাহাদের বয়স ১৬ হইতে ৬০ বৎসর। ১৮১৩ খ্রীঃ একটি সরকারী আদেশ জারি হয় যে মাদক দ্রব্য দ্বারা বিধবাকে অজ্ঞান করিয়া এবং গর্ভিণী বা ঋতুমতী হইবার পূর্বে কোন বালবিধবার সহমরণ ম্যাজিস্ট্রেট রহিত করিতে পারিবেন। ১৮১৭ খ্রীঃ আদেশ হয় যে, যে সব বিধবার স্তন্যপায়ী শিশু অথবা সাত বৎসরের ছোট সন্তান আছে অথচ তাহাদের পালন করার আর কেহ নাই—তাহারা সহমৃতা হইতে পারিবে না এবং সহমরণের পূর্বে অভিভাবকেরা পুলিশকে না জানাইলে দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। ১৮১৮ হইতে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বেনারস, ও বেরিলী এই ছয় বিভাগে গড়ে প্রতি বৎসর ছয় শতেরও বেশী বিধবা সহমৃতা হইত। বাংলাদেশে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা সহমরণ বেশী হইত।

ইতিমধ্যে বহু ইংরেজ কর্মচারী, ও খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণ এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ গভর্নমেণ্টকে লিখিতে লাগিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উদারভাবাপন্ন বাঙ্গালীরাও ক্রমে ক্রমে প্রাচীন সংস্কারের বন্ধনমুক্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৮১৫ ও ১৮১৭ খ্রীঃ সতীপ্রথার নিয়ন্ত্রণ ও পূর্বোক্ত দুইটি রাজশাসন রহিত করিবার জন্য যখন হিন্দুরা গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করেন তখন রামমোহন রায় এবং তাঁহার বন্ধু ও সহযোগিগণ ইহার বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্টের নিকট পাল্টা আবেদন করেন (১৮১৮ খ্রীঃ)। এই সময় হইতে রামমোহন রায় সতীপ্রথার বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন করেন ও শ্মশান ঘাটে যাইয়া সহমরণার্থী বিধবাগণকে অনেক প্রকারে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন।

হিন্দুশাস্ত্রে যে বিধবাদের সহমরণে যাইতে হইবে এইরূপ কোন নির্দেশ বা বিধান নাই ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' এই নাম দিয়া ১৮১৮ ও ১৮১৯ খ্রীঃ দুইখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে দুই ব্যক্তির কথোপকথনচ্ছলে সহমরণের সপক্ষে ও বিপক্ষের যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে। ১৮২৯ খ্রীঃ তিনি সহমরণ বিষয়ে আর একখানি গ্রন্থ লেখেন।

উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন খুব তীব্র হইয়া ওঠে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে দুইটি পৃথক দল ছিল। একদলের অভিমত ছিল এই যে সরাসরি আইন করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করা হউক। আর এক দলের ইহাতে আপত্তি ছিল—এবং তাঁহাদের মতে এ বিষয়ে আন্দোলনের ফলেই ক্রমে ক্রমে লোকেরা এই প্রথার নিষ্ঠুরতা উপলব্ধি করিবে এবং আপনা হইতেই এই প্রথা রহিত হইবে। রামমোহন রায় এই শেষোক্ত দলে ছিলেন এবং লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যখন অনেক ইতস্ততের পর সতী প্রথা নিষেধের আইন জারি করা স্থির করিয়া রামমোহনের সহিত পরামর্শ করেন, তখন রামমোহন ইহার অনুমোদন করেন নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে বিদেশী গভর্নমেণ্ট আইন দ্বারা হিন্দু সমাজের ব্যবস্থা করিবেন ইহা সাধারণ নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে রামমোহন অনিচ্ছুক ছিলেন। রামমোহনের পরে অনেক উদারপন্থী হিন্দু নেতারাও অনুরূপ কারণে বিধবা-বিবাহ, বহু-বিবাহ প্রভৃতি রহিত করিবার জন্য আইনের আশ্রয় লওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই। কিন্তু রামমোহন বেণ্টিঙ্ককে পরামর্শ দিলেন যে আইন না করিয়া এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে নানা বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া পুলিশের সাহায্যেই ইহা রহিত করা সম্ভব হইবে। লর্ড বেণ্টিঙ্কের পূর্ববর্তী কোন বড়লাট সহমরণ নিষেধসূচক আইন করিতে সম্মত হন নাই। হিন্দুধর্মের ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে সাধারণ নীতি ছাড়াও তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল যে ইহাতে হিন্দু জনসাধারণ এবং বিশেষতঃ দেশীয় সৈন্য বিদ্রোহ করিতে পারে। বেণ্টিঙ্ক সামরিক কর্মচারী ও অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আলোচনা করিয়া এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং ১৮২৯ সনে ৪ঠা ডিসেম্বর এক আইন পাশ করিয়া সতীদাহ প্রথা দণ্ডনীয় ঘোষণা করিলেন।

এই আইন পাশ হওয়া মাত্রই প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণ ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। বহু বহু উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী হিন্দু এই বিরুদ্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর বাহাদুর, গোপীমোহন দেব

প্রভৃতি। ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা নিবাসী ৮০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদনে গভর্নমেণ্টকে সতীপ্রথা নিষেধ বিধি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করা হইল। সতীপ্রথার সমর্থনে ১২০ জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ-যুক্ত একখানি ক্রোড়পত্র এই আবেদনের সঙ্গে পাঠান হইয়াছিল। কলিকাতার নিকটবর্তী বেলঘরিয়া, আরিয়াদহ প্রভৃতি স্থানের নিবাসী ৩৪৬ জনের স্বাক্ষরিত অনুরূপ আর একখানি আবেদন পত্রও গভর্নমেণ্টের নিকট পাঠান হইল।

রামমোহন রায় আইনের দ্বারা সহমরণ রহিত করায় আপত্তি করিলেও এই আইন পাশ হইবার পর তাহা পুরাপুরি সমর্থন করেন। প্রাচীনপন্থীদের প্রতি-বাদের উত্তরে কলিকাতার ৩০০ হিন্দু ও ৮০০ খ্রীষ্টান অধিবাসীর স্বাক্ষরিত একখানি অভিনন্দন পত্র বড়লাটকে দিবার জন্য রামমোহন রায়, কালীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি ১৬ই জানুআরি (১৮৩০) বড়লাট ভবনে উপস্থিত হন। বাংলায় লেখা অভিনন্দন পত্রখানি ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করা হয়। এই অভিনন্দন পত্রে উক্ত দুইজন ব্যতীত দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির স্বাক্ষর ছিল। অনেকের বিশ্বাস যে রামমোহন রায়ই এই অভিনন্দন পত্র রচনা করেন। ইহার মর্মার্থ এই যে হিন্দুপ্রধানেরা আপন আপন স্ত্রীর প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া যাহাতে বিধবারা কোনক্রমে অন্যাসক্ত না হয় তাহার জন্য সজীব বিধবাদের দগ্ধ করার রীতি প্রচলন করেন; কিন্তু নিজেদের এই গর্হিত কর্ম নির্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রের দোহাই দিতেন।

এই অভিনন্দন পত্রেই সতীদাহের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে বিধবাদের আত্মীয় অন্তরঙ্গেরা এই বিহ্বলাদের দাহকালীন তাহাদিগকে প্রায় বন্ধন করিতেন এবং যাহাতে তাহারা চিতা হইতে পলাইতে না পারে এ নিমিত্ত রাশীকৃত তৃণ কাষ্ঠাদি দ্বারা তাহাদের গাত্র আচ্ছন্ন করিতেন।[২৮]

এই উক্তিটি অনেকে অতিরঞ্জন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ১৮২৭ খ্রীঃ ৫ই মে তারিখে 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত একখানি পত্রে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণেও ইহার উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন—"গরিফা গ্রামে ২২শে বৈশাখে ২২ বৎসর বয়স্কা এক ব্রাহ্মণের কন্যা সতী হইয়াছে। সাক্ষাৎ যমদূতের ন্যায় হস্তধারণপূর্বক ঘূর্ণপাকে সাত বার ঘুরাইয়া শীঘ্র চিতারোহণ করাইয়া শবের সহিত দৃঢ় বন্ধন পুরঃসরে জলদগ্নিতে দগ্ধকরণ ও বংশদ্বয় দ্বারা শবের সহিত তাহার শরীর চাবিয়া রাখন ও তাহার কথা কেহ শুনিতে না পায় এ নিমিত্তে গোলমাল ধ্বনি করণ অতি দুরাচার নির্দয়িক মনুষ্যের কর্ম।"[২৯]

বেণ্টিঙ্ক প্রাচীনপন্থীগণের আবেদন অগ্রাহ্য করিলে তাহারা বিলাতে সপারিষদ রাজার (King-in-Council) নিকট আপীল করেন। রামমোহন ইহার বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক সম্বলিত একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং উক্ত আপীলের প্রতিবাদে আর একখানি আবেদন রচনা করেন। তিনি ইহা নিজে সঙ্গে করিয়া বিলাতে লইয়া যান এবং Commons সভায় দেন। বিলাতে প্রিভি কাউন্সিল যখন প্রাচীনপন্থীদের আপীল বরখাস্ত করেন তখন রামমোহন উপস্থিত ছিলেন। এইরূপে সতীদাহ আন্দোলনের উপর যবনিকাপাত হইল এবং একটি নিষ্ঠুর প্রথা চিরকালের জন্য রহিত হইল।

ঘ। বিধবা বিবাহ[১০০]

সতীপ্রথা রহিত হওয়ায় এবং ব্রাহ্মসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়ায় হিন্দুসমাজেও বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনের সপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইহার ফলে ১৮৩৭ খ্রীঃ ভারতীয় আইন কমিশন কলিকাতা, এলাহাবাদ ও মাদ্রাজের সদর আদালতের বিচারকদিগকে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেন—কিন্তু সকলেই বাল-বিধবার পুনর্বিবাহ সমর্থন করিলেও ইহার জন্য আইন করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ইহার পর এ বিষয়ে দুই বিরোধী দলের মধ্যে বহু বাদানুবাদ হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজা রাজবল্লভ বিধবা-বিবাহের পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিকূলতায় ইহা ব্যর্থ হয়—ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহার শতবর্ষ পরে কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর রাজা শ্রীশচন্দ্র রাজবল্লভের অনুকরণে বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্রসিদ্ধ ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য স্মার্ত পণ্ডিতগণের নিকট হইতে একটি ব্যবস্থা-পত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন। অনেক পণ্ডিত ইহা স্বাক্ষর করিতে রাজী হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভয় হইল যে এরূপ মত ব্যক্ত করিলে সমাজে তাঁহারা 'এক ঘরে' হইবেন এবং বিবাহ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ বন্ধ হইবে। কেহ কেহ পরিষ্কার বলিলেন যে মহারাজা যদি চিরদিনের মত জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারেন তবে তাঁহারা ব্যবস্থা-পত্রে স্বাক্ষর করিবেন। শ্রীশচন্দ্র ইহাতে অসম্মত বা অসমর্থ হওয়ায় পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন নাই। কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য কয়েকজন দলবদ্ধ হইয়া এ বিষয়ে চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থকাম হন। পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস তাঁহার বাল-বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। অনেক পণ্ডিত এক ব্যবস্থা-পত্রে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু পরে তাঁহারাই

বিরোধিতা করেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ British India Society বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে 'ধর্মসভা' ও 'তত্ত্ববোধিনী' সভার সহিত আলোচনা করে; কিন্তু কোন সভাই কোন উৎসাহ দেখায় নাই। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি বিধবা-বিবাহ সমর্থন কল্পে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন মাসে (১৮৫৪ খ্রীঃ) 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইহার ফলে বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে আন্দোলন খুব তীব্র আকার ধারণ করে। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিপক্ষ পণ্ডিতগণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া বিধবা-বিবাহের সমর্থনে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত করেন। ইহাতে আন্দোলন সর্ব শ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত হয়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নানা ছন্দে কবিতা রচনা করেন। ইহা ছাড়াও পথে ঘাটে সুন্দর সুন্দর ছড়া, গান ও কবিতা লোকের মুখে মুখে ফিরিত। শান্তিপুরের তাঁতিরা বিদ্যাসাগরপেড়ে শাড়ী প্রস্তুত করিয়া চড়া দামে বিক্রয় করিত। ইহার পাড়ের উপর যে গানটি লেখা ছিল তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি—

"বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে,
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।
আর কেন ভাবিস লো সই ঈশ্বর দিয়াছেন সই,
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই।
রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন নাকো সই।"

সহমরণ বিষয়ে রামমোহনের ন্যায় বিদ্যাসাগরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিধবা-বিবাহ সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর হৃদয়-বৃত্তির কাছে মর্মস্পর্শী আবেদন করেন। কিন্তু কেবলমাত্র ইহার উপর নির্ভর না করিয়া তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য রাষ্ট্রীয় বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৫ খ্রীঃ ৪ঠা অক্টোবর তিনি হিন্দু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন স্তরের ৯৮৭ জনের স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন পত্র ভারত সরকারে প্রেরণ করেন। ইহাতে বলা হয় যে দেশাচার অনুসারে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু এই নিষেধ শাস্ত্রসঙ্গত নহে। আবেদনকারীরা মনে করেন, শাস্ত্রের অপব্যাখ্যার জন্য যে সামাজিক বাধা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে ব্যবস্থাপক সভার কর্তব্য তাহা অপসারণ করা।

১৮৫৫ খ্রীঃ ১৭ই নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ আইনের খসড়া পেশ করা হইলে ভারতের সর্বত্র ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন হয়।

রাজা রাধাকান্ত দেব ইহার বিরুদ্ধে প্রায় ৩৭,০০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র ভারত সরকারে প্রেরণ করেন। নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া) প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের পক্ষ হইতেও বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আবেদন পত্র পাঠানো হয়। অপর পক্ষে বাংলা দেশের বহু স্থান হইতে বিধবা-বিবাহ আইনের সমর্থনে আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। অবশেষে বহু আন্দোলন ও তর্ক বিতর্কের পর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হইল। কিন্তু এই আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও বিধবা-বিবাহ সমাজে খুব প্রসার লাভ করে নাই।

৬। বাল্য-বিবাহ

স্ত্রীজাতির মানসিক ও সামাজিক অধোগতির আর দুইটি প্রধান কারণ ছিল বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ।

ধর্মসূত্রে, স্মৃতিতে ও মহাভারতে বাল্যবিবাহের বিধি থাকিলেও ইহার ব্যতিক্রমের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মহাভারতে কোনো বালিকার বিবাহের উল্লেখ নাই—যে সকল মহিলার উল্লেখ আছে তাঁহারা প্রত্যেকেই পূর্ণ যুবতী অবস্থায় বিবাহ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে যে একাধিক স্বয়ম্বরের কাহিনী আছে তাহাও বাল্য-বিবাহের বিরোধী। কিন্তু মধ্যযুগে অন্ততঃ বাংলাদেশে বাল্য-বিবাহপ্রথা কঠোরভাবে প্রতিপালিত হইত। এ যুগের প্রধান স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তাঁহার ব্যবস্থাই বঙ্গদেশে বেদবাক্যের ন্যায় গৃহীত হইত। তিনি উদ্বাহতত্ত্বে লিখিয়াছেন: "কন্যার রজোদর্শন হইবার পূর্ব্বেই কন্যাদান প্রশস্ত। ৮ বৎসরের কন্যাকে গৌরী বলে, ৯ বৎসরের কন্যা রোহিণী, ১০ বৎসরে কন্যকা এবং ইহার পর রজঃস্বলা হয়। অতএব দশ বৎসরের মধ্যে যত্নসহকারে কন্যাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য।...যে কন্যা ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অপ্রদত্তা হইয়া পিতৃগৃহে বাস করে তাহার পিতা ব্রহ্মহত্যা পাপের ভাগী হয়; এরূপ স্থলে ঐ কন্যার স্বয়ং বর অন্বেষণ করিয়া বিবাহ করা উচিত।" অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে রঘুনন্দনের বিধি অনুসারে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অবশ্য রঘুনন্দন প্রাচীন শাস্ত্রকারদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই বিধি দিয়াছিলেন—কিন্তু মধ্যযুগের অন্ধ সংস্কার এই মতটিকে ধর্মের অঙ্গরূপে গণ্য করিয়া বিনা বিচারে ইহা পালন করিত এবং গৌরীদান করিয়া ঐ কন্যার গর্ভজাত সন্তানের পিতৃকুলে একুশ পুরুষ এবং মাতৃকুলে ছয় পুরুষের অক্ষয় স্বর্গবাসের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিত।

আঠারো ও উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথমে যে সাধারণত রজঃস্বলা হইবার পূর্বে, এবং অনেক স্থলে ইহার বহু পূর্বে, এমন কি তিন চারি বৎসর বয়সেও কন্যার বিবাহ হইত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অবশ্য সকল বিধির ন্যায় ইহারও যে ব্যতিক্রম না হইত তাহা নহে।

বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধেও নব্য-পন্থী হিন্দুরা আন্দোলন আরম্ভ করে। ১৮৮৪ খ্রীঃ পার্শী বেহরামজী মেরবানজী মালাবারি একখানি বই লেখায় এ বিষয়ে সরকারের ও সাধারণের দৃষ্টি এই প্রথার কুফলের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রাচীন-পন্থীরা এ সম্বন্ধে কোনো আইন করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও ঘোর আন্দোলন করেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ হরি মাইতি তাহার বালিকা স্ত্রী ফুলমণির সঙ্গে বলপূর্বক সহবাস করায় তাহার মৃত্যু হয়। ইহাতে বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে বাংলায় ও বাংলার বাহিরে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। কলিকাতায় Health Society এবং ৫৫ জন স্ত্রীলোক-ডাক্তার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট এক আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। অবশেষে প্রধানতঃ মালাবারির চেষ্টায় ১৮৯১ খ্রীঃ সহবাস-সম্মতি বয়স সম্বন্ধে এক আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে ১২ বৎসরের কম বয়সের বালিকা বধূর সঙ্গে সহবাস করিলে স্বামী দণ্ডনীয় হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হয়।[১০১]

বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বিবাহের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধির অনেক চেষ্টা করা হয়। নানা সভা সমিতিতে এ বিষয়ে আন্দোলন ও নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯২৭ খ্রীঃ হরবিলাস সর্দার প্রস্তাবিত আইন পাশ হওয়ায় ১৪ বৎসরের কম বালিকা ও ১৮ বৎসরের কম বালকের বিবাহ হইলে উভয়ের কর্তৃপক্ষ দণ্ডনীয় হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হয়।

চ। বহু বিবাহ[১০২]

বাল্য বিবাহের ন্যায় বহু বিবাহও যে প্রাচীন হিন্দু যুগে প্রচলিত ছিল তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু মধ্যযুগে বাংলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার ফলে যে বীভৎস অবস্থার সৃষ্টি হয় পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। মধ্য-যুগে এই প্রথার উৎপত্তি ও প্রকৃতি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে (পৃঃ ৩০১)।

বাংলা দেশে প্রবাদ এই যে বল্লাল সেন আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি নয়টি গুণ থাকার জন্য যে সকল ব্রাহ্মণকে কৌলীন্য মর্যাদা দেন তাঁহাদের সংখ্যা কুড়ির বেশী ছিল না। সমস্ত কুলীনই এক পর্যায়ভুক্ত ছিলেন এবং অকুলীনের কন্যা বিবাহ

করিতেও তাঁহাদের কোন বাধা ছিল না। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সময় একটি গুরুতর পরিবর্তন হইল। প্রথম প্রথম গুণানুসারে মাঝে মাঝে নূতন নূতন ব্যক্তিকে কুলীনের মর্যাদা দেওয়া হইত। লক্ষ্মণ সেন কুলীনের বৈবাহিক সম্বন্ধের বিষয়ে অনেক নিয়ম করিলেন এবং এই নিয়ম কাহারা কতদূর অনুসরণ করিয়াছে তাহার বিচার করিয়া কুলীনদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করিলেন। কিছুকাল পরে পরে এই শ্রেণী বিভাগ নূতন করিয়া করা হইত—ইহার নাম সমীকরণ। লক্ষ্মণ সেনের সময় এইরূপ দুইটি সমীকরণ হয়। ধ্রুবানন্দ মিশ্র সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে বর্তমান ছিলেন—তাঁহার কুলজী গ্রন্থে এইরূপ ১১৭টি সমীকরণের উল্লেখ আছে। এই সময়ের পূর্বেই কৌলীন্য মর্যাদা ব্যক্তিগত গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া পৈতৃক বংশগত মর্যাদায় পরিণত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য ইহাদের মধ্যে অনেকেরই পূর্বোক্ত নবগুণ তো দূরের কথা তাহার একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। বরং ক্রমে ক্রমে কুলীনদের মধ্যে নানা দোষ ঘটিতে লাগিল। ইহার ফলে দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোষ অনুসারে তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ে ভাগ করেন। অর্থাৎ যাহারা একই প্রকার দোষে দোষী তাহাদের লইয়া এক একটি ভিন্ন সম্প্রদায় হইল। এই সব সম্প্রদায়ের নাম হইল 'মেল'—সম্ভবতঃ মেলন শব্দের অপভ্রংশ। দেবীবর কুলীনদিগকে এইরূপ ৩৬ মেলে বিভক্ত করেন। স্থির হয় যে প্রত্যেক কুলীনকেই নিজ নিজ মেলের মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে এক একটি মেলের মধ্যে লোকসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় আঠারো ও উনিশ শতকে ইহার ফল হইল বিষময়। একদিকে, উপযুক্ত পাত্র মিলিত না সুতরাং কন্যাকে আজীবন কুমারী থাকিতে হইত। অন্য দিকে, পুরুষ একাধিক বিবাহ করিত। বহু কুমারীর বিবাহ হইত না। যাহাদের বিবাহ হইত তাহারা প্রায় সারা জীবন পিতৃগৃহেই থাকিত, স্বামীর সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হইত। কারণ অনেক কুলীনের ৫০, ৬০ বা তাহারও অধিক স্ত্রী থাকিত। সুতরাং ইহার মধ্যে মাত্র কয়েকজন তাহার গৃহে স্থান পাইত। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের পেশাই ছিল বিবাহ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। তাঁহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিবাহ করিতেন—প্রতি বিবাহের ফলেই কিছু অর্থ মিলিত। কখনও কখনও একই পরিবারের একাধিক অনূঢ়া কন্যা এক সঙ্গে একই বরের হস্তে সম্প্রদান করা হইত। এরূপ অনেক ঘটনা শোনা যায় যে এক মুমূর্ষু কুলীনের সঙ্গে দিদি, পিসি, ভাইঝি প্রভৃতি সম্পর্কের একই পরিবারস্থ ১০।১২টি কন্যার একসঙ্গে বিবাহ হইয়াছে—এবং ১০ হইতে ৫০ বা তদূর্ধ্ব বয়সের এই সকল স্ত্রী

কয়েক দিনের মধ্যেই এক সঙ্গে বিধবা হইয়াছে। তখনকার দিনে বিশ্বাস ছিল যে অনূঢ়া স্ত্রীলোক মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইতে পারে না। সুতরাং মৃত্যুপথযাত্রীর সঙ্গে একদল বালিকা-যুবতী-বৃদ্ধার বিবাহ দিয়া তাহাদের কুমারীত্ব ঘুচাইয়া স্বর্গের পথ মুক্ত করা হইত। কুলীনদের বিবাহের সংখ্যা প্রায়ই এত অধিক হইত যে স্বামী একটি খাতাতে বিবাহিতা স্ত্রীগণের নাম পরিচয় লিখিয়া রাখিতেন—প্রয়োজন বোধ করিলে এবং সময় পাইলে খাতা দেখিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইতেন—কারণ ইহাতে বেশ কিছু অর্থোপার্জন হইত। কুলীন জামাতা শ্বশুরবাড়ী গেলে তাঁহার মর্যাদার জন্য নানা উপলক্ষে টাকা দিতে হইত। একটি ছিল শয্যা-গ্রহণী—অর্থাৎ টাকা না দিলে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করিবেন না, ইত্যাদি। এইসমুদয় কাহিনী বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু ইহা যে অমূলক নহে সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। যে গ্রামে আমার জন্ম সেখানে এক বাড়ীতে দুই কুলীন ভাই ছিলেন। বাল্যকালে তাহাদের একজনের ছেলে গ্রামের বিদ্যালয়ে আমার সঙ্গে পড়িত এবং আমি তাহাদের বাড়ী যাইতাম। এইরূপে তাহাদের অনেক খবর শুনিয়াছিলাম। দুই ভাইয়ের প্রত্যেকেরই ৫০।৬০টি করিয়া স্ত্রী ছিল। কয়েকটি মাত্র তাঁহাদের সঙ্গে থাকিত—সম্ভবতঃ পালাক্রমে নূতন নূতন বধূর দল আসিত যাইত—কারণ আমার বেশ মনে আছে, গ্রামের নাম ধরিয়া তাহাদের ডাকা হইত—অমুক গ্রামের বউ, অমুক গ্রামের মা, খুড়ী, জেঠী ইত্যাদি সম্বোধন ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। তখনকার দিনে গল্প শুনিতাম যে কুলীন ব্রাহ্মণ স্ত্রীর পিত্রালয়ে কোন গ্রামে যাইয়া শ্বশুরবাড়ী চিনিতে পারিলেন না, কিন্তু খাতায় শ্বশুরের নাম লেখা ছিল—তাহার নাম করিয়া নদীর ঘাটে একটি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা অমুকের বাড়ীটা কোন দিকে'। পরে জানিতে পারিলেন ঐ মহিলাই তাঁহার স্ত্রী। এই ঘটনা সত্য কিনা জানি না, কিন্তু অনুরূপ ঘটনা আমি নিজে বাল্যকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের গ্রামে একটি ডাকঘর ছিল—সকালে চিঠি আনিবার জন্য অনেকেই সেখানে একত্র হইতেন। একদিন আমিও উপস্থিত ছিলাম। একটি অপরিচিত যুবক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী কোন পথে যাইব? প্রশ্নের উত্তরে জানাইল শ্যামাচরণ তাঁহার পিতা। শ্যামাচরণ ঐখানেই উপস্থিত ছিলেন—তিনি যুবকের মাতামহের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের পিতৃত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন। ঘটনাটি আমার নিকট এত অদ্ভুত মনে হইয়াছিল যে ৭৫ বৎসর পরে আজও মনে আছে। যতদূর মনে পড়ে সেখানে উপস্থিত বৃদ্ধের দল

কিঞ্চিৎ হাস্যকৌতুক করিলেও বিশেষ আশ্চর্য বোধ করিলেন না। ইহাতে মনে হয় তাঁহাদের কাছে এরূপ ব্যাপার খুব নূতন বা অদ্ভুত মনে হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে নিজের এই অভিজ্ঞতায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে প্রথাবদ্ধ-ভাবে পবিত্র বিবাহপদ্ধতির এরূপ অবমাননা এবং স্ত্রীর প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধার চিত্র বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও দেখা যায় না। নানা দেশের ইতিহাস পড়িয়াও আজ পর্যন্ত আমার মনে সেই ধারণাই আছে। এইরূপ প্রথার অবশ্যম্ভাবী ফলে কুলীন ব্রাহ্মণের পরিবার নানারূপ ব্যভিচারের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—এবং হিন্দু সমাজ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যে শতাব্দীর পর শতাব্দী এই অবস্থা মানিয়া চলিয়াছিল, ইহা হিন্দুর অধঃপতনের একটি চরম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

উনিশ শতকে ইংরেজী শিক্ষার ফলে বাংলাদেশে বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হয়। ১৮৩৬ খ্রীঃ ২৩শে এপ্রিল তারিখের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত একখানি পত্রে ২৭ জন ব্রাহ্মণের নাম, ধাম ও স্ত্রীর সংখ্যা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৩ জনের স্ত্রীর সংখ্যা ৬০ বা ততোধিক, ৩ জনের ৫০ হইতে ৬০, ২ জনের যথাক্রমে ৪৭ ও ৪০, ২ জনের যথাক্রমে ৩৪ ও ৩৭, ৭ জনের ২০ হইতে ৩০, ৯ জনের ১০ হইতে ২০, ও একজনের মাত্র ৮। আমার বাল্যকালে আমাদের গ্রামের দুই কুলীন ভ্রাতার প্রত্যেকের স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ৫০ হইতে ৬০। সুতরাং ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমেও এই কুপ্রথার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। বিদ্যাসাগর 'বহু-বিবাহ' নামক পুস্তকে এই প্রথার তীব্র নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন—"এ দেশের ভঙ্গ কুলীনদের মত পাষণ্ড ও পাতকী ভূমণ্ডলে নাই। তাঁহারা দয়া, ধর্ম্ম, চক্ষুলজ্জা ও লোকলজ্জায় একেবারে বর্জ্জিত।" বাংলা দেশের নব্য সম্প্রদায় সতীপ্রথার ন্যায় বহু-বিবাহের বিরুদ্ধেও আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ 'বন্ধুবর্গ সমবায়' বা 'সুহৃদ সমিতি' নামক সভা হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বহু-বিবাহ নিবারণের জন্য একটি আবেদন পত্র পাঠানো হয়।

ইহার অল্পকাল পরেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারত সরকারের নিকট এ বিষয়ে আবেদন করেন এবং ইহার পরে বাংলাদেশ হইতে কয়েক হাজার লোকের স্বাক্ষরিত ১২৭ খানি আবেদন পত্র ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ করা সঙ্গত কিনা ইহা লইয়া বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে মতভেদ হইল। অন্য দিকে. বাংলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ বহু-বিবাহ সমর্থন করায় বিদ্যাসাগর তাঁহাদের মতামত, যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের

অসারতা প্রতিপাদনপূর্বক বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একখানি পুস্তক লেখেন। ইহার ফলে এই আন্দোলন বাংলা দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হয়। এই প্রসঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক হইলেও বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়া বক্তৃতা দেন, গ্রন্থ প্রকাশ করেন ও অনেক ছড়া ও গান রচনা করেন। সেগুলি বহুদিন লোকের মুখে মুখে ফিরিত। অন্যান্য অনেকেও এইরূপ ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। তাহার একটি উদ্ধৃত করিতেছি। যাহাতে তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট ক্যাম্বেল রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা বহু-বিবাহ প্রথা রহিত করেন তজ্জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে অনুরোধ করিয়া এই লৌকিক গীতটি রচিত হইয়াছিল।

"কেম্বলকে মা মহারাণী কর রণে নিয়োজন।
(রাজা) বল্লালেরি চেলাদলে করিতে দমন।
কাজ নাই সিক সিফাইগণ, চাইনা গোলা বরিষণ,
(একটু) আইন অসি খরষাণ করগো অর্পণ,
বিদ্যাসাগর সেনাপতি
(মোদের) রাসবিহারী হবে রথী,
মোরা কুলীন যুবতী সেনা হব যে এখন।"[১০৩]

১৮৫৫ খ্রীঃ বিদ্যাসাগর ও বর্ধমানের মহারাজা বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ করিবার জন্য আইন সভায় আবেদন করেন। অপরদিকে রাধাকান্ত দেব ইহার সপক্ষে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। নানা কারণে বহুদিন ইহার আলোচনা স্থগিত থাকে এবং ১৮৬৬ খ্রীঃ বাংলা গভর্নমেণ্ট এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য বাঙ্গালী ও ইংরেজ সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। বিদ্যাসাগর ব্যতীত আর সকল বাঙ্গালী সদস্যই এ বিষয়ে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই মতের সমর্থন করেন। সুতরাং গভর্নমেণ্ট এই বিষয়ে আইন করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহার পর বহু বর্ষ অতীত হইয়াছে এবং বিনা আইনে কুলীনের বহু-বিবাহ প্রথা রহিত হইয়াছে।

৯। দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ[১০৪]

খুব প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রাচীন কালে গ্রীস ও রোমে এবং আধুনিক যুগে আমেরিকায় ক্রীতদাসদের উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার হইত তাহার তুলনায় এদেশে দাস-দাসীদের অবস্থা অনেক

ভাল ছিল। তাহারা অনেকটা পারিবারিক ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার পাইত। বাংলা দেশে এখনও দাসদাসী শব্দ 'সাধারণ বেতন-ভোগী ভৃত্য' এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ১৭৭২ খ্রীঃ কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী একটি সরকারী রিপোর্টে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে কোন কোন স্থলে যে ক্রীতদাসদের উপর নানাবিধ অত্যাচার হইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দাসের কপালে তপ্ত লোহার দাগ দিয়া চিহ্নিত করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

নানা কারণে ক্রীতদাসের উদ্ভব হইত। ১৭৭২ খ্রীঃ এক বিধান অনুসারে বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত দস্যুদের পরিবারবর্গ দাস-শ্রেণীভুক্ত হইত। দুর্ভিক্ষের সময় অনেকে প্রাণ রক্ষার জন্য নিজেকে ও সন্তান-সন্ততিকে অন্যের নিকট বিক্রয় করিত। অনেক সময় অর্থলোভে লোকে যুবতী কন্যা বা স্ত্রীকে বিক্রয় করিত— ধনীরা ইহাদিগকে ক্রয় করিয়া উপপত্নীরূপে রাখিত। দাস-ব্যবসায়ীদের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা বালক-বালিকা চুরি করিত এবং বলপূর্বক বয়স্ক স্ত্রী পুরুষকে ধরিয়া নিয়া নৌকাযোগে কলিকাতায় ও অন্যান্য শহরে এবং সেখান হইতে দূর দেশে দাসরূপে চালান দিত। ইংরেজ, পর্তুগীজ, ফরাসী. আর্মেনিয়ান প্রভৃতি এই দাস ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ করিত।

আঠারো ও উনিশ শতকে কলিকাতায় সাহেবেরা বহু দাসের মালিক ছিল এবং তাহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার করিত। এই সব দাসেরা, নফর, হুকাবরদার, বর্কাদার (মেসিনের চাকা ঘুরাইয়া জল ঠাণ্ডা করার লোক), পাখা-টানা, সহিস, নাপিত, মেথর প্রভৃতির কার্যে নিযুক্ত হইত। ক্রীতদাসীরা মেমসাহেবদের চুল বান্ধা, পোষাক পরান, এবং যাবতীয় গৃহকর্ম করিত। ইহারা কোন মাহিনা পাইত না। সাহেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার দাসদাসী উত্তরাধিকারীরা পাইত। বাঙ্গালীরা উচ্চ ইংরেজ রাজকর্মচারীদিগকে দাস উপহার দিত। অনেক দাসের মালিক কলকারখানায় ও কৃষি মজুর রূপে দাসগুলি ভাড়া দিয়া বহু অর্থ লাভ করিত, এবং সাধারণ সম্পত্তির ন্যায় প্রকাশ্য স্থানে দাসদাসীর ক্রয়-বিক্রয় হইত। মাল গুদামে হাতে পায়ে শিকল বান্ধা দাসদাসীরা সারি বান্ধিয়া দাঁড়াইত—ক্রেতাগণ তাহাদিগকে পছন্দ করিয়া ক্রয় করিত। অনেক বাজারে বান্দা, গোলাম প্রভৃতি নামে পরিচিত ক্রীতদাসের দল খুটিতে বান্ধা থাকিত, যাহাতে লোকে দেখিয়া তাহাদিগকে কিনিতে পারে।

অনেক সাহেব ও মেমসাহেবেরা এই সমুদয় দাসদাসীকে পশুর ন্যায় খাটাইতেন—কোনমতে জীবন রক্ষা পায় এই পরিমাণ আহার্য দিতেন, এবং

সামান্য দোষ ত্রুটি হইলে চাবুক মারিতেন। মেমেরা এবিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, এবং কেবল দাসী নহে দাসদেরও স্বহস্তে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিতেন; অনেক দাসদাসীর শরীরে রক্তস্রোত বহিত। সারাদিন খাটিয়া অনেক দাসকে খাঁচায় রাত্রি যাপন করিতে হইত। একজন ওলন্দাজ মহিলা লিখিয়াছেন যে ক্রীত-দাসীদিগকে প্রহারে জর্জরিত করা হইত এবং শীতকালে পরিবারস্থ লোক ও অন্যান্য দাসদাসীর সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ করিয়া তাহাদের গায়ে ঘড়া ঘড়া ঠাণ্ডা জল ঢালা হইত।[১০৫]

ক্রীত দাস-দাসীদের শাস্তি দিবার জন্য কলিকাতায় ইতর শ্রেণীর লোকদের দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি বেত্র-গৃহ (Whipping house) ছিল। চুরি, বাসনপত্র ভাঙ্গা প্রভৃতি অপরাধ করিলে অল্প বয়স্কা ক্রীতদাসীদের সেখানে পাঠান হইত। প্রত্যেক বেত্রাঘাতের জন্য মালিককে এক আনা দিতে হইত। কয়বার বেত্রাঘাত করিতে হইবে ইহা একখানি কাগজে লিখিয়া উপযুক্ত মূল্য সহ ক্রীতদাসীগণকে সেখানে পাঠান হইত। বলা বাহুল্য বেত্রাঘাত ছাড়াও তাহাদের উপর পাশবিক অত্যাচার হইত। অনেক সময় ক্রীতদাসীগুলি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িত। কোন দাসদাসী পলাইবার পর ধরা পড়িলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে বেত্রদণ্ডের শাস্তি দিতেন।

বিলাতে দাসত্ব প্রথার লোপ হইলে এ দেশেও তাহার প্রতিক্রিয়া হয়। ১৭৮৯ খ্রীঃ দাস চালান দেওয়া নিষিদ্ধ হয়। ১৮০৭ খ্রীঃ দাস-ব্যবসায় বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৮১১ খ্রীঃ বিদেশ হইতে ভারতে দাস আনা বন্ধ করা হয়। এক জিলা হইতে দাস কিনিয়া আনিয়া অন্য জিলায় বিক্রয় করা ১৮৩২ খ্রীঃ আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৮৪৩ খ্রীঃ দাসত্ব প্রথা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৮৬০ খ্রীঃ ভারতীয় পিনাল কোডে দাস-প্রথা বা দাস-ব্যবসায় দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়। এইরূপে একটি বর্বর প্রথা তিরোহিত হয়।

পাদটীকা

(সাংকেতিক চিহ্ন : ঘোষ=শ্রীবিনয় ঘোষ প্রণীত "সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র" (প্রথম সংখ্যাটি খণ্ড ও দ্বিতীয় সংখ্যাটি পৃষ্ঠার নির্দেশক) ।

১। ইহাদের বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।
২। শ্রীবিনয় ঘোষ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, ঘোষ ৫।১৬৯—২২৬ পৃষ্ঠা
৩। ঘোষ ৫।১৬৯
৪। ঐ, ১৭০
৫। ঐ
৬। ঐ, ১৭২
৭। ঐ, ১৭৩
৮। ঘোষ ৩।৪৮
৯। ঘোষ ২।৯৭—১০৩
১০। ঘোষ ৩।৩৭৫
১১। ঐ, ৩২৬
১২। ঘোষ ১।৪৬৯—৭০
১৩। ঘোষ ৩।৫১—২
১৪। ঐ, ৫২—৩
১৫। ঐ, ৩৩৭
১৬। ঘোষ ১।৪৮২
১৭। ঐ, ১৫১—২, ২১২
১৮। ঘোষ ৩।৫৭১—২
১৯। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ) দ্রঃ
২০। ঘোষ ১।৫১০—১১
২১। *The Days of John Company, Selections from Calcutta Gazette* 1824-1832, Compiled and Edited by Anil Chandra Das Gupta, pp. 155-6
২২। ঐ, ২৫৮
২৩। ঐ, ৪১৯
২৪। ঘোষ ১।৪৩৪—৫
২৫। ঘোষ ৩।৪৯৮
২৬। Calcutta Gazette (২১নং পাদটীকা) ১৫৬, ৪১৯ পৃঃ
২৭। ঘোষ ৪।৭৯৩—৪
২৮। ঐ, ৮১০
২৯। ঘোষ ২।২১৮—৯

৩০। ঘোষ, ২৭০—৭১

৩১। ঐ, ১।৪৩৫

৩২। ঘোষ, ৩।৪৮৯—৯০

৩৩। ঐ, ৫২৩

৩৪। ঐ, ৩৩১—২

৩৫। ঐ, ৫২৩—৪

৩৬। ঐ, ৪৭৬—৭

৩৭। ঘোষ, ৪।৭০২—৪

৩৮। ঐ, ৭০৫

৩৯। ঐ, ৩০৫

৪০। ঐ, ৩০৯—১১

৪১। ঐ, ৭০১

৪২। ঐ, ৭০০—৭০১

৪৩। ঐ, ১০০৭

৪৪। ঘোষ ১।৫৩৫

৪৫। ঐ, ৫৩৬। এখন যেখানে বিডন স্কোয়ার, আগে সেখানে একটি বিরাট মাঠ ছিল; সেখানেই এই খেলা হইত।

৪৬। Buckland, C. F., *Bengal under the Lieutenant Governors,* Vol. 1, p. 177. R. C. Majumdar, *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, pp. 15, 69—70.

৪৭। Buckland, op. cit., p. 323.

৪৮। ঐ, পৃঃ ৪২৮

৪৯। ঘোষ ১।৪৩২

৫০। ঐ

৫১। ঘোষ ৩।৪৫৯

৫২। ঘোষ ৪।১২০—২১

৫৩। ঐ, ২০৬—৭

৫৪। ঐ, ২৬০—৬১

৫৫। ঐ, ৩১২—১৫

৫৬। ঐ, ৩৭০—৭১

৫৭। ঐ, ৩৬১—২

৫৮। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

৫৯। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, কলিকাতা ১৩৫৯, পৃঃ ৪৫—৪৬।

৬০। ঘোষ ২।১৩৯

৬১। ঐ, ৫০৮—১১

৬১ ক। **Reginald Heber, *Narrative of a Journey from Calcutta to Bombay* 1824-5 (London, 1828), Vol. III, pp, 232, 234, 252.**

৬২। ঘোষ ২।২৩৭-৪৩

৬৩। ঐ, ৩৪৪-৪৬

৬৪। ঘোষ ৪।৩৬৯-৭০

৬৫। ঘোষ ২।৩৩৪-৩৫

৬৬। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সংবাদ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—"রামমোহন রায়", পৃঃ ৭৪-৫

৬৭। ঘোষ ৩।৪৭১

৬৮। ঘোষ ১।৩০৬

৬৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, (সং, সে, ক) ২।১৮৬

৭০। ঐ, পৃঃ ১৮৭

৭১। W. Adam, *Reports on Vernacular Education in Bengal and Bihar* 1835, 1836 and 1838.

৭২। ব্রজেন্দ্রনাথ—সং, সে, ক ১।৪০৫

৭৩। ঐ, ৪০৭

৭৪। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য *History and Culture of the Indian People* (Bombay) Vol. X, pp. 285 ff. দ্রষ্টব্য

৭৫। ব্রজেন্দ্রনাথ—সং, সে, ক, ১।১৩-১৫ ; ২।৬৭ ; ৩।২২১

৭৬। *The Calcutta Review*, 1855, p. 79

৭৭। ঘোষ ৪।৪৮৯

৭৮। ঐ, ৫০৮

৭৯। বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ১৪৮-৯

৮০। ঘোষ ৪।৫২৩-৫

৮১। ঐ, ৫২৫

৮২। ঐ, ৫৭৮

৮৩। ঐ, ৫৮০

৮৪। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ইংরেজীতে লিখিত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার বিরচিত কেশব চন্দ্রের জীবনী (৯০-৯১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য

৮৫। ঘোষ ১।৩০৫

৮৬। ঐ, ৩০৯

৮৭। ঐ, ৩৬৫

৮৮। ব্রজেন্দ্রনাথ, সং, সে, ক, ১।৪০৫

৮৯। বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর, ১৩৮-৩৯

৯০। ঐ, ১৪২-৩

৯১। ঘোষ ৪।৫১৯

৯২। ঐ, ১।৩১১

৯৩। ঘোষ ৩১৩

৯৪। ঘোষ ১।৩১৪-৭ ; ৪।৫০৮ ; ৫১৯-২০ ; ৫৭১-২

৯৫। এই ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় হেমচন্দ্র বঙ্গনারীর বহু নিন্দা করিয়াছিলেন।

৯৬। 'সতীদাহ' প্রথা এবং ইহা রহিত করিবার বিস্তৃত বিবরণের জন্য কালীকিঙ্কর দত্ত প্রণীত *Education and Social Amelioration of Women in Pre-Mutiny India* তৃতীয় অধ্যায় (৬৩-১২৬ পৃঃ এবং Appendix 1—VIII) দ্রষ্টব্য।

৯৭। ঐ, পৃঃ ৭৯-৮২

৯৮। ব্রজেন্দ্রনাথ, সং, সে, ক, ৩।১৪৮-৯

৯৯। ঐ, ১৪৭

১০০। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত বিবরণের জন্য, বিনয় ঘোষ প্রণীত 'বিদ্যাসাগর' (১৬০-২৩০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

১০১। এই বিলের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন হয়। বিপিন চন্দ্র পাল ইহার সমর্থন করায় একজন তাঁহাকে গুলি করিয়াছিল। (*Studies in the Bengal Renaissance*, Edited by Atul Chandra Gupta, pp. 433-4)

১০২। বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণের জন্য বিনয় ঘোষ প্রণীত 'বিদ্যাসাগর (২৩১-২৬২ পৃঃ) দ্রষ্টব্য

১০৩। ঐ, ২৫৮

১০৪। আধুনিক যুগে 'দাসত্ব প্রথার' বিস্তৃত বিবরণের জন্য অমল কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত '*Slavery in India*' চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১০৫। ঐ, ৫৪-৫৭ পৃঃ।

অষ্টম অধ্যায়
অর্থনীতিক অবস্থা

মধ্যযুগে বাংলাদেশের অতুল সম্পদ ও ঐশ্বর্যের কথা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে (পৃঃ ২২৭-২৩৭)। কিন্তু ইংরেজ শাসনের আরম্ভ হইতেই ইহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে অগাধ ঐশ্বর্যের পরিবর্তে চরম দারিদ্র্য উপস্থিত হয়। ইহার প্রধান প্রধান কারণগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

১। বিদেশী লুট

যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বাধীন ছিল ততদিন বাংলার অর্থ সম্পদ এই দেশেই থাকিত। বিদেশী শাসনের ফলে বহু অর্থ বাংলার বাহিরে চলিয়া যাইত—তাহার বিনিময়ে কোন সম্পদ এদেশে আসিত না। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে প্রতি বৎসর যে নানা কারণে বিপুল অর্থ এইরূপে বাংলাদেশের বাহিরে যাইত তাহার বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে (পৃঃ ২২৮)। পলাশি যুদ্ধের পরে ইংরেজদিগকে মীরজাফর প্রায় তিন কোটি টাকা দিয়াছিলেন (ঐ পৃঃ ১৮১)। মীর কাশিমও ঐভাবে বহু টাকা দিলেন (ঐ পৃঃ ১৯৩)। পলাশি যুদ্ধের পর নয় বৎসরের মধ্যে (১৭৫৭-৬৬ খ্রীঃ) এইভাবে অন্ততঃ পাঁচ কোটি টাকা ইংরেজ কর্মচারীদের হস্তগত হয়। ইংরেজ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করিবার পর ব্যবস্থা করিল যে মোট রাজস্ব হইতে শাসন সংক্রান্ত খরচ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা ইংরেজ কোম্পানি ইচ্ছামত ব্যয় করিবে। এই টাকায় এদেশের জিনিষপত্র কিনিয়া কোম্পানি বিলাতে চালান দিত—বিক্রয়-লব্ধ অর্থ বিলাতেই থাকিত। অর্থাৎ কোম্পানি বিনা মূলধনে লাভের ব্যবসা চালাইত—এবং বাংলা হইতে রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যের যে পরিমাণ টাকা প্রতি বৎসর বিদেশে যাইত, তাহার বিনিময়ে কোন দ্রব্য বা টাকা বাংলায় ফিরিয়া আসিত না। ১৭৭৩ খ্রীঃ বিলাতের পার্লামেণ্টে যে হিসাব দাখিল করা হয় তাহাতে দেখা যায় যে বাংলার মোট রাজস্ব তের কোটি টাকার মধ্যে নয় কোটি টাকা এ দেশে ব্যয় হইয়াছে বাকী চার কোটি টাকা বিলাতে চলিয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীগণ ভারত হইতে অবসর গ্রহণের পর বিলাতে যাইবার সময় যে বহু টাকা সঙ্গে নিয়া যাইতেন তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। ক্লাইব নিঃস্ব অবস্থায় এ দেশে আসিয়াছিলেন। বিলাতে ফিরিবার সময় তাঁহার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ টাকা এবং বাংলা

দেশে তাঁহার যে জমিদারি ছিল তাহার বাৎসরিক আয় ছিল দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে মাত্র দুই বৎসরে তিনি দশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বড়লাট হেষ্টিংসের কাউন্সিলের একজন সদস্য ৮০ লক্ষ টাকা বিলাতে লইয়া যান। এইরূপ অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীরাও সঞ্চিত টাকা বিলাতে পাঠাইতেন। দেওয়ানি লাভের পরে তিন বৎসরে (১৭৬৬-১৭৬৮ খ্রীঃ) মোট ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকার বেশী মূল্যের জিনিষ বাংলা দেশ হইতে বিলাতে রপ্তানি হয়—তাহার বিনিময়ে মাত্র ষাট লক্ষ টাকার জিনিষ আমদানি হয়; অর্থাৎ পাঁচ কোটি সত্তর লক্ষ টাকা বিদেশে চলিয়া যায়—তাহার বিনিময়ে কোন ধনসম্পদ এদেশে আসে না।

বাংলা সরকারের জন্য বিলাতে নানারকম অজুহাতে বহু টাকা খরচ হইত। ইহাকে বলা হইত Home Charge। ১৮৫১ সনে ইহার পরিমাণ ছিল আড়াই কোটি টাকা, ১৯৩৩-৩৪ সনে ইহা বাড়িয়া হয় সাড়ে সাতাশ কোটি টাকা।[১]

২। বাংলার শিল্পবাণিজ্যের ধ্বংস

মুঘল আমলে বহু টাকা বাংলার বাহিরে গেলেও বাংলার ঐশ্বর্য সম্পদ নষ্ট হয় নাই। কারণ তখন বাংলার শিল্পবাণিজ্য সম্পদের আকর ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কিরূপে ইহা ধ্বংস হইল তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা প্রয়োজন।

বাংলা দেশে ইংরেজের প্রভুত্ব স্থাপনের অল্পকাল পরেই ইংলণ্ডে নবাবিষ্কৃত যন্ত্রপাতির ও বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে শিল্পের নবযুগ আরম্ভ হয়। অনেকের মতে কেবলমাত্র নূতন নূতন আবিষ্কার দ্বারা এই শিল্প-বিপ্লব ঘটান (Industrial Revolution) সম্ভব হইত না। ইংরেজ বাংলা দেশ হইতে যে বিপুল অর্থ ইংলণ্ডে নিয়া যায় তাহাকে মূলধন করিয়াই এই বিপ্লব সম্ভবপর হইয়াছিল।[২] কারণ যাহাই হউক শিল্প-বিপ্লবের ফলে কারখানা-শিল্পের যে অদ্ভুত উন্নতি হয়, তাহার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে হস্ত-শিল্প অপেক্ষা বহু পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করা সম্ভব হয় এবং তাহার খরচও অনেক কম পড়ে। এদেশের তাঁতীরা হাতে যে কাপড় বুনিত তাহা বিলাতী কলে প্রস্তুত কাপড়ের প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু রাজকীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া নানা অবৈধ উপায়ে বাংলার কুটির-শিল্প সমূলে ধ্বংস করিয়া যাহাতে বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্যের একচ্ছত্র আধিপত্য হয় ইংরেজ সরকার সে বিষয়ে বদ্ধ-পরিকর হইল।

পলাশি যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানি রাজনীতিক ক্ষমতার বলে যেরূপ

বে-আইনী ও অবৈধ উপায়ে ব্যবসায় দ্বারা এদেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করিয়াছিল এবং মীরকাশিম তাহার প্রতিবাদ করার ফলে যে রাজ্যভ্রষ্ট হন, দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ১৯৮-২০৪) তাহা বিবৃত হইয়াছে। ১৭৬৫ খ্রীঃ দেওয়ানি লাভ করার পর রাজকীয় ক্ষমতা পুরাপুরি হাতে পাইয়া নানাবিধ আইনের সাহায্যে এই ধ্বংস-যজ্ঞের পূর্ণ আহুতি হয়। ১৮১৩ খ্রীঃ নূতন সনদ অনুসারে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ হয় এবং যে কোন ইংরেজ কোম্পানি বিনা শুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে এদেশে বাণিজ্য দ্রব্য আমদানি করিতে পারিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাংলার যে সমুদয় দ্রব্য বিলাতে আমদানি হইত তাহার উপর অসম্ভব শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়। আর বাংলার তাঁতীদের উপর নানা রকমের অত্যাচার চলিতে থাকে, যাহাতে তাহারা কম মূল্য পাইলেও তাহাদের মাল অন্য বিদেশী কোম্পানির নিকট বিক্রয় না করিয়া ইংরেজের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

১৮৩১ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর তুলা ও রেশমের কারবারী ১১৭ জন বাঙ্গালী ইংরেজ গভর্নমেণ্টের নিকট এক দরখাস্ত করে। তাহার সারমর্ম এই :

"সম্প্রতি বিলাতী কাপড়ের আমদানি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে আমাদের ব্যবসায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বিলাতী দ্রব্যের উপর এদেশে কোন শুল্ক আদায় করা হয় না। কিন্তু বাংলায় উৎপন্ন সুতি ও রেশমী কাপড়ের উপর বিলাতে যথাক্রমে শতকরা ১০ ও ২৪ টাকা শুল্ক দিতে হয়। সুতরাং আমাদের প্রার্থনা যে এদেশে আমদানী বিলাতী কাপড়ের উপর যখন যে শুল্ক নির্দ্ধারিত হয় বিলাতে আমদানী বাংলা দেশের কাপড়ের উপর তাহার অধিক শুল্ক যেন বসান না হয়"। এই প্রার্থনায় কোন ফল হয় নাই।[৩] কিন্তু ইংলণ্ডের অনুসৃত বাণিজ্যনীতি এত অসঙ্গত ছিল যে একদল ইংরেজ বণিকও বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের উক্ত আবেদন সমর্থন করে। তাহারা আরও বলে যে ইংলণ্ডে প্রস্তুত রেশমী দ্রব্যের রপ্তানির উপর পূর্বে যে শুল্ক ধার্য হইয়াছিল তাহার ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ উহার তুল্য পরিমাণ টাকা ব্যবসায়ীগণকে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট দিত— সুতরাং ঐ নীতি অনুসরণ করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ীরা তাহাদের রপ্তানী দ্রব্যের উপর যে শুল্ক দেয় তাহারও ক্ষতিপূরণ করা উচিত।[৪] ইংরেজ কোম্পানি ইহা করে নাই। বলা বাহুল্য যে ভারতবর্ষে কারখানা-শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের বয়ন-শিল্পকে বিলাতের প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা তো দূরের কথা, পরবর্তী-কালে যখন ভারতীয়েরা নিজের চেষ্টায় কাপড়ের কল তৈরী করিতে আরম্ভ করিল

তখন বিলাতী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থের খাতিরে ভারতে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর শুল্ক বসান হইল। ইহার ফলে এদেশের তুলার দ্রব্যের রপ্তানির হ্রাস ও বিলাতী দ্রব্যের আমদানি কিরূপে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছিল নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি হইতে তাহা সহজেই বোঝা যাইবে।[৫]

বৎসর	এদেশ হইতে রপ্তানী তুলার দ্রব্যের মূল্য সিক্কা টাকা	বিলাত হইতে আমদানী তুলার দ্রব্যের মূল্য সিক্কা টাকা
১৮১৬-১৭	১,৬৫,৯৪,৩৮০	৩,১৭,৬০২
১৮১৭-১৮	১,৩২,৭২,৮৫৪	১১,২২,৩৭২
১৮১৮-১৯	১,১৫,২৭,৩৮৫	২৬,৫৮,৯৪০
১৮১৯-২০	৯০,৩০,৭৯৬	১৫,৮২,৩৫৩
১৮২৩-২৪	৫৮,৭০,৫২৩	৩৭,২০,৫৪০
১৮২৬-২৭	৩৯,৪৮,৪৪২	৪৩,৪৬,০৫৪
১৮২৯-৩০	১৩,২৬,৪২৩	৫২,১৬,২২৬
১৮৩২-৩৩	৮,২২,৮৯১	৪২,৬৪,৭০৭

১৮২৪-২৫ সনের পূর্বে বিলাতী সূতা এদেশে আমদানি হইত না। ১৮২৫-২৬ সনে মোট ৭৫,২৭৬ টাকার বিলাতী সূতা আমদানি হয়। ছয় বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৩১-৩২ সনে ইহা বাড়িয়া মোট ৪২,৮৫,৫১৭ টাকার সূতা আমদানি হয়।

সার চার্লস ট্রেভিলিয়ান (Sir Charles Trevelyan) ১৮৩৪ সনে লিখিয়াছেন: "বাঙ্গালায় প্রস্তুত তুলার দ্রব্যের বিদেশে রপ্তানি প্রতি বৎসর এক কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে এবং এদেশের বাজারে বিক্রয় (সূতা সহ) বৎসরে আশী লক্ষ টাকা কমিয়াছে। অর্থাৎ মোটের উপর প্রতি বৎসর ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মাল কম বিক্রী হইয়াছে। অল্প যে কিছু দ্রব্য এখনও রপ্তানি হয় তাহাও ইংলণ্ডে প্রস্তুত সূতার তৈরী।"[৬]

অন্যান্য বিলাতী শিল্পদ্রব্যের আমদানিও এইরূপ দ্রুতবেগে বাড়িতে থাকে। ১৮১৩-১৪ সনে বিলাত হইতে বাংলায় মোট আমদানি হইয়াছিল ৮৭৭,৯১৭ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য। ১৮২৭-২৮ সনে ইহার পরিমাণ হইয়াছিল ২২,৩২,৭২৫ পাউণ্ড। ১৮১৪-১৫ সনে সমগ্র ভারত হইতে ৩,৮৪২ গাইট কাপড় বিলাতে চালান হয়। ১৮২৮-২৯ সনে ইহার সংখ্যা হয় ৪৩৩।

১৮৫১ সনে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যাধিক্য ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। ১৯৩৩-৩৪ সনে ইহার পরিমাণ ছিল ৬৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে ২৭ কোটির দ্রব্য ও প্রায় ৪৩ কোটি মুদ্রা রপ্তানি হইয়াছিল।[৭]

বাংলার বাণিজ্য ধ্বংসের আর এক কারণ ইংরেজ কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য। ১৭৬৫ সনে লবণ, সুপারি ও তামাকের বাণিজ্য একচেটিয়া করা হয়। অর্থাৎ বাংলা দেশের ভিতরও কেবলমাত্র কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত একটি ইংরেজ সমিতি ছাড়া আর কেহ পাইকারী হিসাবে এই সমুদয় দ্রব্য বেচা কেনা করিতে পারিবে না এই ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেক জমিদারের নিকট হইতে মুচলেকা নেওয়া হইল যে তাহাদের জমিদারির মধ্যে যে লবণ উৎপন্ন হইবে তাহার কণা মাত্রও কোম্পানির অনুমতি ব্যতীত কাহারও নিকটে বিক্রয় করা হইবে না। ইহার ফলে বাংলায় সাধারণ লোকের লবণ তৈরি করা বন্ধ হইল এবং হাজার হাজার লোকের জীবিকা নষ্ট হইল। আর পূর্বোক্ত ইংরেজ সমিতির ৬০ জন সভ্য দুই বৎসরে প্রায় ৭ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭০ লক্ষ টাকা মুনাফা করিলেন। ১৭৬৮ সনে এই সমিতি উঠিয়া যায় কিন্তু ১৭৭২ সনে হেষ্টিংস লবণ ব্যবসায় কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করেন এবং ইংরেজ এজেণ্ট দ্বারা লবণ তৈরির ব্যবস্থা করেন। ইংরেজদের এই একচেটিয়া ব্যবসায়ের লোভ নানা রকমে বাংলার শিল্প-বাণিজ্য নষ্ট করে। বাঙ্গালী তাঁতীরা বাংলা দেশে উৎপন্ন কাপাস সুতা ব্যবহার করিত এবং প্রয়োজন মত উত্তর প্রদেশ হইতে গঙ্গা যমুনা নদীর পথে সুতার আমদানি হইত। কিন্তু ইংরেজ কোম্পানি এই সকল সুতার উপর শতকরা ৩০ টাকা শুল্ক বসাইল যাহাতে সুরাট হইতে সমুদ্রপথে তাহাদের আমদানী সুতা বাংলার তাঁতীরা কিনিতে বাধ্য হয়।[৮]

বাংলা দেশের অনেক রকমের কাপড় ভারতের বাহিরে বসোরা, জেড্ডা, মোচা প্রভৃতি নানা দেশে চালান যাইত এবং ঐ সমুদয় দেশের বণিকেরা তাহা কিনিতে বাংলায় আসিত। ইংরেজ কোম্পানি এই সমুদয় কাপড়ের ব্যবসা করিত না, কিন্তু তাহাদের কর্মচারীরা এই ব্যবসা আরম্ভ করিল, এবং তাহাদের অত্যাচারে তাঁতীরা অন্য কাহারও নিকট ঐ সমুদয় বস্ত্র বিক্রয় করিতে পারিত না।

ইংরেজ কোম্পানি চা বাগান, লৌহের কারখানা প্রভৃতি আরম্ভ করিবার জন্য ইংরেজদিগকে নানারকম সুবিধা দিত ও অর্থ সাহায্য করিত, কিন্তু কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে তাহা জুটিত না।

বাংলার আভ্যন্তরিক বাণিজ্যে একাধিপত্য স্থাপনের জন্য ইংরেজ কোম্পানির

কর্মচারীগণ কিরূপ অত্যাচার করিত একজন প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন : "বিভিন্ন ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের ফলে ঐ সমুদয় ব্যবসায়ীগণের উপর সমগ্র দেশব্যাপী অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইংরেজ ব্যবসায়ী ইচ্ছামত যে সামান্য দাম দেয় তাহার চেয়ে ফরাসি ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা অনেক বেশী দাম দিতে প্রস্তুত—সুতরাং তাঁতীরা গোপনে তাহাদের নিকট বিক্রী করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ধরা পড়িলে সমূহ বিপদ, কারণ কোন তাঁতী তাহার মাল ফরাসি, ওলন্দাজ বা অন্যের নিকট বিক্রয় করিলে এবং কোন দালাল বা পাইকার এবিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিলে অথবা এইরূপ বিক্রয়ের কথা জানিয়াও কোন বাধা না দিলে কোম্পানির গোমস্তা বা পিওন তাহাদের সকলকে ধরিয়া হাতে কড়ি দিয়া কয়েদ করিয়া রাখে, মোটা টাকা জরিমানা করে, বেত মারে এবং এমন কি নানা উপায়ে তাহাদের জাত মারে"।[৯]

ইংরেজের প্রতিযোগিতা ও অত্যাচার বাংলার শিল্প ধ্বংসের প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ। কিন্তু ইংরেজের সহিত সংস্পর্শের প্রভাবও বাংলার কুটিরশিল্প ধ্বংসের অন্যতম অপ্রত্যক্ষ কারণ। এই প্রভাবের ফলে দেশের মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেক বিষয়ে রুচির পরিবর্তন হয়। বিশেষতঃ কলে তৈরী বস্ত্র ও অন্যান্য অনেক শিল্প দ্রব্য কুটিরশিল্প-জাত দ্রব্য অপেক্ষা দামে সস্তা, দেখিতে সুন্দর ও ব্যবহারের পক্ষে অনেক সুবিধাজনক হওয়ায় স্বভাবতই তাহার ব্যবহার বাড়িল। বিলাতের লোকের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাও বিলাতী দ্রব্যের আভিজাত্য স্থাপন করিবার পক্ষে সহায়তা করিল। প্রয়োজন ও সৌন্দর্যবোধের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক পরিবর্তিত হইল। সাহেবেরা যাহা ব্যবহার করেন, তাঁহারা যাহা ভাল মনে করেন, নব্য ইংরেজী শিক্ষিত ও ধনী অভিজাত সম্প্রদায় তাহার অনুকরণ করা আভিজাত্যের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। এই সমুদয় কারণে অনেক পুরাতন জিনিষের ব্যবহার কমিতে লাগিল এবং নূতন নূতন বিলাতী দ্রব্যের আকর্ষণ বাড়িতে লাগিল। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পুরাতন শিল্পের অবনতি ঘটিল—কিন্তু নূতন রুচি অনুযায়ী দ্রব্য এদেশে প্রস্তুত করার ইচ্ছা বা সম্ভাবনার যথেষ্ট অভাব ছিল। কারণ নূতন জিনিষগুলির বেশীর ভাগই কারখানা শিল্পের তৈরী। কুটিরশিল্পের স্থানে কারখানা শিল্পের প্রবর্তন অনেক আয়াস-সাধ্য, এবং গভর্নমেন্টের বিশেষ সহায়তা ব্যতীত ইহা অনেক স্থলেই সম্ভবপর হয় না। কিন্তু ইংরেজ তখন দেশের রাজা—এদেশে কারখানা শিল্প স্থাপন তাহাদের স্বার্থের বিরোধী—সুতরাং সহায়তা তো দূরের কথা তাহারা পুরাপুরি প্রতিবন্ধকতা করিল।

ভারতবর্ষে কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা হইলে বিলাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলগুলির সর্বনাশ হইবে এই আশঙ্কায় যখন আমেদাবাদ ও অন্যান্য স্থলে এদেশীয় লোকের চেষ্টায় কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হইল—তখন ইংরেজ সরকার ইহার উন্নতির পথে নানারকম বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। এক সময় কলে তৈরী বিলাতী কাপড় এদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল—এবং বাংলার বয়নশিল্প সমূলে ধ্বংস হইয়াছিল। আজ এদেশে কাপড়ের কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে এদেশ হইতে বিলাতী কাপড়ের ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে।

সর্বদেশে সর্বকালেই বৈজ্ঞানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের রীতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয়—এবং ইহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নূতন প্রণালী অনুসরণ করিতে না পারিলে শিল্পের অবনতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আঠারো ও উনিশ শতকে ইংলণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লব হয় গভর্নমেণ্টের আনুকূল্যে নানাবিধ উপায়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশ তাহার অনুকরণ করিয়া নিজেদের শিল্পকে তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উপযুক্ত করিয়া তোলে। কিন্তু এদেশের ইংরেজ সরকারের স্বার্থ ছিল ঠিক তাহার বিপরীত। অর্থাৎ ভারতবর্ষে যাহাতে নূতন প্রণালীর কারখানা শিল্প গড়িয়া না ওঠে এবং বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্য দ্বারা এদেশের অর্থ-শোষণ অব্যাহত থাকে সেই দিকেই তাহাদের দৃষ্টি ছিল। অনেকে তর্ক করেন যে বাংলার বস্ত্রশিল্পের পক্ষে কারখানা শিল্পের প্রতিযোগিতা সম্ভবপর ছিল না—সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই ইহা ধ্বংস হইয়াছে—ইহার জন্য ইংরেজ শাসনকে দায়ী করা উচিত নহে। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে প্রতি দেশের গভর্ন-মেণ্টেরই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য তদ্দেশীয় জনসাধারণের উন্নতি সাধন। ইউরোপের অন্যান্য দেশে গভর্নমেণ্ট যাহা করিয়াছিল—তাহা না করা, এবং এ বিষয়ে দেশের লোকের স্বাধীন চেষ্টা যাহাতে সফল না হইতে পারে তাহার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা—এই দুইটি অবিসম্বাদিত ঐতিহাসিক তথ্য মনে রাখিলে ইংরেজ গভর্নমেণ্টই যে এ দেশের বাণিজ্য ও শিল্পের ধ্বংসের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ইহা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না।

বাংলার শিল্প ধ্বংসের এই করুণ ইতিহাস এ দেশের লোক বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। সমসাময়িক পত্রিকায় এ বিষয়ে বহু আলোচনা দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষ ভাগে বাংলার শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে 'সোম প্রকাশ' সম্পাদক যে বিস্তৃত মন্তব্য করেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

"বর্ত্তমান প্রস্তাবে দেশাভিজ্জাত শিল্প সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবসায় হইয়াছে, তাহার

আলোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে বৈদেশিক বাণিজ্য সংশ্রবে দেশীয় শিল্প ব্যবসায় ক্রমেই লোপ হইতেছে। যে শিল্পকার্য্য সভ্যতার অকাট্য প্রমাণ, যে শিল্পকার্য্যে দেশের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও শ্রমশক্তি বৃদ্ধি ও অর্থের অভাব দূরীভূত হয়, বঙ্গের যাহাতে মানব সমাজের ভূরি পরিমাণে কল্যাণ সাধিত হয়, দারিদ্র্য দুঃখ অপহৃত হয়, বঙ্গের সেই শিল্পের কিরূপ হীনদশা উপস্থিত হইয়াছে, পাঠকবর্গ এতৎ প্রস্তাব পাঠে অনায়াসেই তাহার উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বঙ্গদেশের এমন কোন শিল্পজাত দ্রব্য নাই যাহা বিদেশে আগ্রহসহকারে নীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঢাকা অঞ্চলের নানাবিধ মনোহর সূক্ষ্ম বস্ত্রসকল নানা দেশে প্রেরিত হইত, এক্ষণে তন্তুবায়গণ সে প্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে না, ঢাকাই জামদান নবাব সুবারা পাইয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন, এক্ষণে সে সকল বস্ত্রের নামমাত্র অবশিষ্ট হইয়াছে। দেশীয় শিল্পীগণ আপন আপন ব্যবসায় ভুলিয়া যাইতেছে। ....এটি দেশের শ্রীবৃদ্ধির কি অবনতির চিহ্ন তাহা পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে বঙ্গদেশের মধ্যে যে কিছু শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা বঙ্গদেশ ছাড়িয়া বাহিরের মুখ দেখিতে পায় না। পূর্ব্বে যে যে শিল্পের সদ্ভাব ছিল, পাশ্চাত্য বাণিজ্য সংশ্রবে তাহার যে মহত্তর অনিষ্ট ঘটিয়াছে, চিন্তা-শীল লোকমাত্রেই তাহা অনুভব করিয়াছেন। ১৮৮২-৮৩-এর বঙ্গদেশীয় শাসন সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনীতে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে যে, "ইংলণ্ড হইতে বাহুল্যরূপে বস্ত্রের আমদানী হওয়াতে দেশীয় উৎকৃষ্ট শিল্প ও যন্ত্রসকল বিনষ্ট হইতেছে।" পূর্ব্বের ন্যায় আর ঢাকায় মসলিন প্রস্তুত হয় না, এখানকার ঢাকাই তন্তুবায়গণ আর সে প্রকার সূতা প্রস্তুত করিতে পারে না। তাঁহারাও সম্পূর্ণরূপে ম্যাঞ্চেষ্টারের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। দেশীয় তন্তুবায়েরা সুতার কাজ প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে। বিলাত হইতে যে সকল সুতার আমদানি হয়, এখানকার তাঁতীরা তাহারই ব্যবহার করে। বস্ত্রবয়ন কার্য্য প্রায় উঠিয়া গেল। এক্ষণে চটের থোলের ব্যবসায় তৎস্থান অধিকার করিয়াছে। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানাদ্রিতে চটের কলে খাটিয়া অধিকাংশ লোক জীবিকা উৎপাদন করে। এক্ষণে যে যে স্থানে যে যে সামান্য প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হয় তদ্‌বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে। বর্দ্ধমান বিভাগে কালনায় লালবাগানে যে সকল ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা এখনও উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিলাতের বস্ত্রের আমদানিতে ইহারও ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। বর্দ্ধমান জেলায় ৯টা পাটের কল ও ৩টা কাপড়ের কল আছে। এই সকল কলে চট ও বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রীরামপুর

উপবিভাগে পাটের দড়ি অধিক হইয়া থাকে। গত বৎসর পাটের কলে ৭১৪৭৫৭ মণ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল। হাবড়ায় তুলার কলের কার্য্যের ক্রমশই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। পশ্চিম অঞ্চলে তুলার কলে যেরূপ লাভ হইতেছে, হাবড়ার কলে সেরূপ হইতেছে না। কিন্তু চটের কলে উত্তমরূপ লাভ হইতেছে। পাটের গাঁইট কষার জন্য ৩টি কোম্পানী হইয়াছে। বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় কতকগুলি লাক্ষার কারখানা আছে। এক বাঁকুড়ায় ৩৪টা লাক্ষার কল হইয়াছে। উক্ত জেলায় লাক্ষার ব্যবসায়ই প্রধান। বীরভূমে ইসলামবাজার নামক স্থানে এ দেশীয়দিগের ৮টি লাক্ষার কারখানা আছে। এস্থলে বলাবাহুল্য যে বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে ঐ একটি পদার্থ এ দেশের প্রধান দ্রব্য। বর্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুর অঞ্চলে ধাতু পাত অধিকাংশ প্রস্তুত হয়, তাহাও বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ১৮৮২-৮৩ অব্দে বর্দ্ধমান জেলা হইতে আট লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকার কাঁসা বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ অব্দে হুগলি হইতে ছয় লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ও মেদিনীপুর হইতে আটাশ লক্ষ উনষাইট হাজার টাকার পিত্তল বিলাতে রপ্তানি হয়। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে কাঞ্চননগর শিল্পের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। তথায় ছুরি কাঁচি প্রভৃতি অস্ত্র সকল অতি উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাণীগঞ্জ ও বর্দ্ধমানের কাটরা বিভাগে কুম্ভকারের কার্য্যের কিছু কিছু উন্নতি আছে। বর্দ্ধমানের মধ্যে রঘুনাথ চক নামক স্থানে পোর্ট সিমেণ্ট প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা হইয়াছে। উহার বাণিজ্যে কিছু কিছু লাভ হইতেছে। রাণীগঞ্জে উক্ত সিমেণ্ট করিবার জন্য একটি বৃহৎ কারখানা প্রস্তুত হইতেছে। ইহার কার্য্য অদ্যাপি আরম্ভ হয় নাই। বালির কাগজের কার্য্য উত্তমরূপে চলিতেছে। ২৪ পরগনার মধ্যে ৩৪টি কল আছে। ঐ সকল কলে সাতাইশ হাজার লোক খাটিয়া থাকে। ঐ সকল কলে থোলে, কাপড, সুতা, ইট, চাউল, তৈল, লাক্ষা প্রস্তুত হয়। কেরোসিন তৈলের আমদানি নিবন্ধন রেড়ি তৈলের আমদানি কলের কার্য্য মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উক্ত বিভাগে মৃৎপাত্র, লৌহ ও পিত্তল পাত্র, অস্ত্রাদি ও শৃঙ্গের কার্য্য বহুল পরিমাণে হইতেছে। শান্তিপুরের উৎকৃষ্ট বস্ত্র-ব্যবসায় বিলাতি বস্ত্রের আমদানি নিবন্ধন ক্রমেই অবনতি হইতেছে। রেশম প্রস্তুত করিবার প্রধান স্থান মুর্শিদাবাদ। এ ব্যবসায়ও ক্রমে লোপ হইবার সূচনা হইয়াছে। নদীয়াতে রেশমের একটি কুটি আছে। বিলাতি সাটিন ও অন্যান্য বস্ত্রের আমদানি হেতু এ ব্যবসায়টিও লোপ পাইতে বসিয়াছে। খুলনা জেলাতে মৃত্তিকাপাত্র পাটও অধিক জন্মে। কোন কোন স্থানে লবণও প্রস্তুত

হইয়া থাকে। রাজসাহী ও কুচবিহার বিভাগ হইতে চটের থান ও থলে প্রস্তুত হইয়া জেলায় জেলায় আইসে। দিনাজপুর জেলাতেই উক্ত দ্রব্য অধিক প্রস্তুত হয়। পাবনা জেলায় উত্তম বস্ত্রসকল হইয়া থাকে। এই ব্যবসাতে উক্ত জেলা ক্রমশঃ খ্যাতি লাভ করিতেছে। রাজসাহী ও রঙ্গপুরের পিত্তলের বাসন বিদেশে অধিক রপ্তানি হইয়া থাকে। দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, পাবনা প্রভৃতি জেলাতে নানা প্রকার মাদুরের ব্যবসায় আছে। রঙ্গপুরের অন্তর্গত থানা বড়বাড়ীতে হস্তিদন্তে অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। রঙ্গপুরেও স্বর্ণ রৌপ্যের নানা অলঙ্কার প্রস্তুত হয়। ঢাকা বিভাগে অধিক পাটের গাঁইট প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বস্ত্রের বাণিজ্য অপেক্ষাকৃত বেশী হয় বটে কিন্তু পাটের তুল্য নহে। ঐ বিভাগে শঙ্খের কাজ, নারিকেল তৈল, চিনি, পিত্তল পাত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যের দ্রব্যাদি, মাদুর, সাবান, পনির ইত্যাদি অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ইহা ভিন্ন নৌকা নির্ম্মাণ প্রভৃতি সূত্রধরের কার্য্য ও কুম্ভকারের কার্য্যও অধিক হয়।''[১০]

মধ্যযুগের শেষে সপ্তদশ শতকে বাংলার ঐশ্বর্য পৃথিবীতে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল। বিদেশী পর্যটক মানুচী (Manucci) এদেশের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন: "মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে বাংলা দেশের নামই ফরাসীদের নিকট বেশী পরিচিত। এই দেশ হইতে যে অপরিমিত ধন সম্পদের দ্রব্য ইউরোপে চালান যায় তাহাই ইহার উর্ব্বরতার প্রমাণ। মিসর দেশ অপেক্ষা ইহা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে বরং রেশম, সুতা, চিনি ও নীল প্রভৃতির উৎপাদনে মিশরকেও ছাড়াইয়া যায়।"[১১]

সমসাময়িক ট্যাভার্নিয়ার (১৬৬৬ খ্রীঃ) লিখিয়াছেন যে অতি ক্ষুদ্র নগণ্য গ্রামেও ধান, গম, দুগ্ধ, তরী-তরকারী, চিনি, গুড় প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশির যুদ্ধের অব্যবহিত পরে (১৭৫৭ খ্রীঃ) ক্লাইব বলেন যে মুর্শিদাবাদ নগরীর বিস্তৃতি, লোক সংখ্যা ও ধন সম্পদ লণ্ডন সহরের তুল্য—কিন্তু মুর্শিদাবাদে এমন বহু ধনীলোক আছেন যাঁহাদের ঐশ্বর্য লণ্ডনের ধনীলোকের অপেক্ষা অনেক বেশি।

ইংরেজ রাজ্যের একশত বৎসর গত হইলে, ১৮৬৮ সনে ভারতীয়দের গড়ে মাথা পিছু বার্ষিক আয় ছিল কুড়ি টাকা। ১৮৯৯ সনে ইহার পরিমাণ সরকারী হিসাব অনুসারে ৩০ টাকা, বেসরকারী (ইংরেজ ডিগবীর) মতে ১৮ টাকা।

ইংরেজ বণিকদের আগমনের ফলে বাংলা দেশে যে দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল

তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। বাঙ্গালীরা যে ইহা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিল 'সোমপ্রকাশে'র পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে তাহা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু জগতে কিছুই অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ হয় না, অশুভের মধ্যেও শুভের বীজ নিহিত থাকে। ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর সংস্কৃতি এবং সামাজিক ও রাজনীতিক চেতনা যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল—ইহা পরে বিবৃত হইবে। অর্থনীতিক দিক দিয়াও কিছু শুভ ফল ফলিয়াছিল। ইংরেজ বণিকদের দেওয়ানি, বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দিগিরি এবং তৎসহ দালালি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া এদেশের এক দল লোক প্রভূত অর্থ সম্পদ অর্জন করিয়াছিলেন। ইঁহারা প্রধানতঃ সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে মদন দত্ত, রামদুলাল দে সরকার, মতিলাল শীল, প্রাণকৃষ্ণ লাহা, নিমাই চরণ মল্লিক, বিশ্বম্ভর সেন, সাগর দত্ত প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বা তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষ মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সপ্তগ্রাম সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত সমৃদ্ধিশালী বন্দর ছিল। কিন্তু সরস্বতী নদী স্রোতহীন হইয়া মরা নদীতে পরিণত হওয়ার ফলে বৃহৎ বাণিজ্য তরী এখানে আসিত না, সুতরাং এখানকার বণিকরা গঙ্গার উভয় তীরস্থ হুগলী, চুঁচুড়া, কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িলেন। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকগণ এই সমুদয় স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত করায় সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় তাহাদের বেনিয়ান প্রভৃতি পদে নিযুক্ত হইয়া বহু সাহায্য করে, নিজেরাও অনেক ধন উপার্জন করে।

পূর্বে যে সমুদয় ধনী বণিকের নাম করা হইয়াছে তাঁহাদের বংশের প্রাচীন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ইঁহাদের কেহ কেহ যে ইংরেজ শাসনের গোড়া হইতেই ইংরেজ বণিকদের সহযোগিতা করিয়া নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন এবং পরে তাঁহাদের পুত্র পৌত্রগণ উনবিংশ শতাব্দীতেও ধন-শালী ব্যবসায়ী এবং জমিদার সম্প্রদায়ভুক্ত হন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমেরিকার অনেক ক্রোড়পতিদের ন্যায় ইঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে প্রভূত ধন সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কয়েক-জনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি—

১৭৯২ খ্রীঃ মতিলাল শীলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার একখানি সামান্য দোকান ছিল। মতিলাল বাল্যাবস্থায় পিতৃহীন হইয়া দুরবস্থায় পড়েন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কয়েকজন সামরিক কর্মচারীর সাহায্যে তিনি ঐ দুর্গের প্রয়োজনীয়

ব্যবহার্য দ্রব্যাদির সরবরাহ করিয়া কিছু অর্থ উপার্জন করেন। তারপর খালি শিশি বোতল ও কর্কের (শোলা) ব্যবসায় করিয়া তিনি প্রচুর ধন লাভ করেন। ইহার ফলে ইউরোপীয় বণিক সমাজ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ১৮২০ খ্রীঃ তিনি একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ব্যবসায়ীর বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দি হইলেন। ইহাতে যে অর্থাগম হইল তাহা দ্বারা তিনি বিলাতি জাহাজ কলিকাতায় আসিলে তাহার পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া এবং ঐ সকল জাহাজ ফিরিবার সময় তাহাদের প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহ করিয়া প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হইলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ১০।১২টি ইংরেজ কোম্পানির মুৎসুদ্দি এবং তিনটি হৌসের অর্থাৎ ইউরোপীয় বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ হন। পরে স্বয়ং আমদানি রপ্তানির ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং ১২।১৩ খানি জাহাজ ক্রয় করিয়া তাহাতেই নিজের মাল চালান দিতেন। প্রচুর ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হইয়া জমিদারি ক্রয় করিতে লাগিলেন এবং বাংলার একজন বড় জমিদারে পরিণত হইলেন। তিনি এই অর্থের বহু সদ্ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাঁহার দানশীলতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে। নিজ ব্যয়ে কলেজ, গঙ্গাস্নানের ঘাট, চিকিৎসালয়, অতিথি-শালা, ঠাকুরবাড়ী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন। ১৮৫৪ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামদুলাল দে সরকারের কাহিনীও অতি বিচিত্র। তাঁহার পিতা এক সামান্য পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন এবং বাল্যে পিতৃমাতৃহীন হইয়া নিতান্ত দুরবস্থায় দরিদ্র মাতামহের গৃহে কালাতিপাত করেন। তাঁহার মাতামহী পূর্বোক্ত ধনী ব্যবসায়ী মদন দত্তের বাটিতে পাচিকা নিযুক্ত হওয়ায় রামদুলালও সেই গৃহে আশ্রয় পাইলেন। ঐ বাটির বালকগণের দৃষ্টান্তে ও সহায়তায় এবং নিজের অধ্যবসায়ে তিনি বাংলায় লিখিতে পড়িতে ও ইংরেজীতে কথাবার্তা বলিতে শিখিলেন। তাহার কার্যদক্ষতা ও শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া মদনমোহন দত্ত তাহাকে প্রথমে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে বিল সরকারের ও পরে দশ টাকা বেতনে শিপ সরকারের পদে নিযুক্ত করিলেন। এই কার্য-ব্যপদেশে তিনি বিলাতী মালবাহী জাহাজ সম্বন্ধে সর্বদা তথ্য সংগ্রহ করিতেন। একখানি জলমগ্ন জাহাজ নিলাম হইতেছে শুনিয়া তিনি তথায় গেলেন। এই জাহাজের বহুমূল্য মালের সম্বন্ধে তিনি সঠিক সংবাদ জানিতেন। সুতরাং তিনি অন্য এক নিলাম ডাকিবার জন্য তাঁহার প্রভুদত্ত চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়া এই জাহাজ নিলামে ক্রয় করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই একজন ইংরেজ আসিয়া এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকায় ঐ জাহাজ খানি ক্রয় করিলেন। রামদুলাল ইচ্ছা করিলে মুনাফা এক লক্ষ টাকা নিজেই আত্মসাৎ করিতে পারিতেন—কিন্তু তাহা না করিয়া প্রভুকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া সব টাকাই তাঁহাকে দিলেন। দরিদ্র বালকের এই সাধুতার পরিচয় পাইয়া মদন দত্ত ঐ লক্ষ টাকা রামদুলালকে দিলেন। এই টাকা মূলধন করিয়া রামদুলাল ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হইল এবং তিনি চারিখানি জাহাজ কিনিয়া আমেরিকার সহিত বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। তিনি আমেরিকার সমস্ত বাণিজ্যাগারের একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন এবং আমেরিকার বণিকগণ তাঁহাকে বাংলার 'রথচাইলড' বলিত। নানাবিধ ব্যবসা করিয়া তিনি কোটিপতি হইলেন। কথিত আছে যে মৃত্যুকালে তিনি এক কোটি তেইশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। রামদুলাল অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৩ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

এই সমুদয় অদ্ভুত কৃতকার্যতার কথা স্মরণ করিলে মনে হয় যে বাণিজ্য ও ব্যবসায়ে সফলতার জন্য যে সমুদয় সদ্‌গুণের প্রয়োজন, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাঙ্গালীর মধ্যে তাহার খুব অভাব ছিল না। অথচ উনবিংশ শতকের শেষার্ধ হইতেই বাংলা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালীদের প্রতিপত্তি কমিয়া যায় এবং সুদূর পশ্চিম ভারতের গুজরাটি, মারওয়াড়ীরা তাহাদের স্থান অধিকার করে। সে যুগের ব্যবসায়ী ধনী ব্যক্তিরা অনেকে জমিদারিতে অর্থ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, কলিকাতার লাহা ও মল্লিকেরা, হাটখোলা ও রামবাগানের দত্তরা, পাইকপাড়ার রাজা সিংহ-বংশ, এমন কি ব্যবসায় বাণিজ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ দ্বারকা নাথ ঠাকুরও শহরে ভূসম্পত্তি ও মফঃস্বলের জমিদারি ক্রয় করেন। তাঁহাদের পুত্র পৌত্রেরা অনেকেই শ্রমবিমুখ অলস জীবন যাপন করেন অথবা ভোগ বিলাসে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু ব্যবসায়ের দিকে তাহাদের কোন্ আকর্ষণ ছিল না। ইহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। অথচ এই সময়ের অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষার্ধের বাংলা সাময়িক পত্রিকায় শ্রম, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায় প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছে এবং 'জ্ঞানান্বেষণ', Bengal Spectator, প্রভৃতি পত্রিকায় বাঙ্গালীর এই বাণিজ্য বিমুখতার বিরুদ্ধে কঠোর আলোচনা করা হইয়াছে।

ভোগ বিলাসিতায়, মামলা মোকদ্দমায়, দান ধ্যানে, পুত্র-কন্যার বিবাহে, মাতাপিতার শ্রাদ্ধাদি কর্মে, দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা পার্বণে ও নানাবিধ ধর্মাচরণে,

ও মন্দির প্রতিষ্ঠায় বিপুল অর্থব্যয়ে পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধন নাশ ব্যবসায়ে বিমুখতার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ১২৬০ (বাংলা) সালে এ বিষয়ে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"অপিচ কেহ বলেন যে এই বঙ্গদেশ মধ্যে অনেক ধনাঢ্য লোক আছেন, তাঁহারা যদ্যপি আপনাপন ধন দ্বারা ইংরাজদিগের ন্যায় বাণিজ্য করেন তবে অন্যান্য লোক সকল তাঁহারদিগের দৃষ্টান্তের অনুগামি হইতে পারেন, সুতরাং এই রাজ্য মধ্যে বাণিজ্যের আতিশয্য হয়, এ কথা অতি যথার্থ বটে, ফলতঃ যাঁহারা অতুল ধনের অধিকারি হইয়াছেন, তাঁহারদিগের আবার সেই প্রকার সাহস নাই, তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া সাহেব বিশেষের অধীনে মুচ্ছদ্দিগিরি কর্ম্ম করিতে পারেন, তথাচ স্বাধীন রূপে বাণিজ্য করিতে পারেন না। বিশেষতঃ গত পাঁচ বছরের মধ্যে কতিপয় ধনি ব্যক্তি আফিম, নীল প্রভৃতি বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অতুল সম্পদের পদ হইতে দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে আর কোন ব্যক্তি বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করেন না, অনেকে কোম্পানির কাগজকেই ভাল জানিয়াছেন। আমারদিগের রাজপুরুষেরা কোম্পানির কাগজের সুদ এত ন্যূন করিতেছেন, তথাচ সকলে কাগজ রাখিবার ইচ্ছা করিতেছেন।

"পূর্ব্বে জমিদারী বিষয়ে জমিদারগণের বিশেষ সুখ ও আয় ছিল, কিন্তু আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত ক্রমে কঠিন নিয়ম সকল নির্দ্ধারণ করাতে এবং প্রজাসকল দুরবস্থায় পতিত হইয়ায় সেই সুখ ও আয়েরও অন্যথা হয়, এ কারণ অনেক জমিদারী কালেক্টর সাহেবের নিলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছে, পূর্ব্বে যাঁহারা সম্ভ্রান্ত জমিদার বলিয়া রাজদ্বারে ও সাধারণ সমাজে মান্য ও প্রতিপন্ন ছিলেন, অধুনা তাঁহারদিগের পরিবারগণ অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছেন।

"অতএব এতদ্দেশীয় লোকদিগের সৌভাগ্যোন্নতির কোন প্রকার বিশেষ উপায় দৃষ্ট করা যায় না। আমারদিগের রাজপুরুষেরা এখানকার কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত রাজকার্য্যের যে সমস্ত নিম্নপদ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহাতে পরিশ্রম বিস্তর করিতে হয়, অথচ অন্ন বস্ত্রের দুঃখ নিবারণ ব্যতীত কোনমতে সঞ্চয় হইতে পারে না এরূপ নানা কারণে এই বঙ্গদেশীয় লোক সকল ক্রমে ক্রমে দুরবস্থায় পতিত হইতেছেন, যে পর্য্যন্ত আমারদিগের রাজপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত রাজকীয় পদে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য লোকদিগকে নিযুক্ত করণের নিয়ম নির্দ্ধারণ না করিবেন এবং সাধারণে স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করণে প্রবৃত্ত না হইবেন তদবধি এই বঙ্গরাজ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবেক না।"[১২]

এই সুদীর্ঘ মন্তব্যটি উদ্ধৃত করার কারণ এই যে উনবিংশ শতকের শেষ দিক হইতে শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালীর মধ্যে যে চাকুরীজীবির মনোবৃত্তি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল এই অপ্রীতিকর সত্যটির স্পষ্ট আভাস ইহাতে পাওয়া যায়—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বাণিজ্য করণের প্রবৃত্তির উল্লেখ থাকিলেও ইহা যে মুখ্য নহে গৌণ উদ্দেশ্য, তাহারও ইঙ্গিত আছে। এবং সেইজন্যই ইহা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—এই মহাজন বাক্য বাঙ্গালীর জীবন রহস্যের সন্ধান দেয়। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী উচ্চ সরকারী পদ লাভই জীবনযাত্রা সুগম করিবার আদর্শ উপায় রূপে গ্রহণ করিয়াছিল—এবং তাহাতে অনেকটা সিদ্ধিলাভও করিয়াছিল—তদভাবে ডাক্তারী, ওকালতি পেশা গ্রহণ করিয়াছিল—কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে আকৃষ্ট হয় নাই। এ সম্বন্ধে ৯০ বৎসর পূর্বে লিখিত 'সোমপ্রকাশে'র নিম্নলিখিত উক্তিগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"আজকাল যেরূপ অবস্থায় ও নিয়মে এই বাণিজ্য ব্যবসায় আমাদিগের দেশে সম্পাদিত হইতেছে তাহা নিতান্ত শোচনীয়। সচরাচর বাণিজ্য ব্যবসায় এই যুগ্ম শব্দ আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এ দুটী শব্দের অর্থ ভেদ আছে কিনা নির্ণয় করা আবশ্যক। বাণিজ্য ব্যবসায় এই দুটি শব্দের অর্থগত বিস্তর বৈলক্ষণ্য আছে। ব্যবসায় অর্থে জীবনোপায়ের সাধারণ পথ। এক্ষণে যিনি জীবনোপায় নির্ব্বাহের জন্য যে পথ অবলম্বন করেন, তিনি সেই ব্যবসায়ী। কেহ ডাক্তার, কেহ উকীল, কেহ মোক্তার, কেহ সূত্রধর, কেহ কুম্ভকার, কেহ বণিক ইত্যাদি। এই বণিকের ব্যবসায়ের নামই বাণিজ্য ব্যবসায়।

"বাণিজ্য কি ? এক স্থানের দ্রব্যাদি নৌকা বা রেলওয়ে বা অন্য কোন সুযোগে অন্য কোন স্থানে বহন করিয়া লইয়া গিয়া তাহা বিক্রয় করা বা তদ্বিনিময়ে তদ্দেশজাত উত্তমোত্তম দ্রব্য আনয়ন করার নাম বাণিজ্য। প্রধানতঃ এই বাণিজ্য দুই প্রকার, বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য। এক দেশজাত দ্রব্য অন্য দেশে লইয়া গিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের নাম বহির্বাণিজ্য ও সে দেশজাত দ্রব্য, সেই দেশেই ক্রয় বিক্রয় করার নাম অন্তর্বাণিজ্য। পূর্ব্বে রেলওয়ে না থাকাতে নৌকা ও অর্ণবযানাদি দ্বারা বিদেশে দ্রব্যাদি প্রেরিত হইত। তাহাতে বহুকাল বিলম্ব হইত। এখন রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ হওয়াতে এই বাণিজ্যকার্য্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এক দিনে এক মাসের পথ্যে দ্রব্যাদি পৌছিয়া দিতেছে। সেখানে কোন বিপদ বা দ্রব্যাদির অসুবিধা হইলে তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফযোগে সমাচার পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যদিও ইহা ছিল না, কিন্তু পুরাকালের

বাণিজ্যের বিষয় ও অবস্থা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করা যায়, তবে তাহাকে এখন কাল্পনিক বলিয়া প্রতীতি হয়। সে সম্বন্ধে আধুনিক বাণিজ্য ব্যবসায়কে প্রকৃতরূপে বাণিজ্য ব্যবসায় বলিতে পারা যায় না। তখন ভারতের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক পল্লী, অধিক কি প্রত্যেক স্বাধীনচেতা মনুষ্য হৃদয় "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই হৃদয়োত্তেজক বীজমন্ত্রের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। প্রত্যেক স্বাধীনচেতা ব্যক্তিই এই বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অকাতরে পিতা মাতা পুত্র পরিবারবর্গের বিচ্ছেদক্লেশ তুচ্ছ করিয়া অর্ণবযান আরোহণ পূর্ব্বক সিংহল, সুমাত্রা, বালী প্রভৃতি দূরতর স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাঁদ সওদাগর ধনপতি সওদাগর প্রভৃতি তাহার নিদর্শনস্থল। এতদ্ব্যতীতও ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপিও বালী দ্বীপে হিন্দুগণ বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন অর্ণবপোতে দূরদেশে যাত্রা করা দূষণীয় ছিল না। করিলেও কেহ চিরকালের জন্য সমাজচ্যুত হইতেন না। এখন অর্ণবযানে আরোহণ করিলে তিনি আর হিন্দুসমাজে স্থানপ্রাপ্ত হন না। চিরকালের জন্য হিন্দুসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে না পারিলে আর কাহারও সমুদ্রপথে বিদেশে যাইবার উপায় নাই, সুতরাং অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে বিশেষতঃ স্ত্রীপুত্রদিগের প্রেমপাশ ছিন্ন করিতে না পারিয়াই বিদেশে যাইতে স্বীকৃত নহেন। এই সকল কারণে বহির্বাণিজ্য একালে অন্তর্হিত হইয়াছে।

....

"কালচক্রের কুটিল আবর্ত্তনে সেই ভারত প্রতিধ্বনিত "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই স্বাধীনতা ও হৃদয়োত্তেজক বীজমন্ত্র ভারতবাসীর অদৃষ্ট দোষে কালচক্রের নিম্নভাগে পড়িয়া গিয়াছে। এখন তৎপরিবর্ত্তে "হা অন্ন হা ভিক্ষাবৃত্তি!" এই হৃদয় বিদারক চীৎকার শব্দে কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত ভারত ভূমি স্থানে স্থানে পরিপূরিত হইতেছে। যাঁহার এই দুরন্ত কালচক্র, সেই অনাদি ঈশ্বর অবগত আছেন কতদিনে আবার ভারতের সুপ্রভাত হইয়া এই বর্ত্তমান হৃদয়-বিদারক ধ্বনি কালচক্রের নিম্নে পড়িয়া যাইবে এবং পুনরায় "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই বীজমন্ত্র ভারতের প্রত্যেক নগরে প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে অধিক কি প্রত্যেক স্বাধীন চিত্তে প্রতিধ্বনিত হইবে। সে দিন কি আর হইবে? যদি হয় 'ত' সাহস করিয়া বলিতে পারি তাহা বোম্বাইবাসীদিগের অসাধারণ অধ্যবসায় যত্ন ও প্রাণস্বরূপ প্রতিজ্ঞাবলে হইবে। আমাদিগের বঙ্গীয় ভ্রাতারা অদ্যাপিও চাকুরিতে শশব্যস্ত। চাকুরিই আমাদিগের জীবনের প্রধান লক্ষ্য

হইয়া উঠিয়াছে। কোনরূপে বহু অনুসন্ধানের পর যদি একটী কর্ম জুটিল ত তিনি জন্মের মত পরিশ্রমের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনেক শ্রমকাতর আত্মীয় কুটুম্বও আসিয়া তাঁহার গলগ্রহস্বরূপ হইয়া পড়িলেন। শতকরা ৩ টাকা করিয়া সুদে গবর্ণমেণ্টে টাকা জমা দিবেন, সেও সহস্র গুণে ভাল, তথাপি প্রাণান্তেও স্বাধীন দেশহিতকর বাণিজ্যকার্য্যে মনকে ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হইতে দিবেন না। সে চেষ্টাও নাই। তবে যে জনকতক লোক বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া থাকেন, সে সামান্য অন্তর্বাণিজ্য মাত্র। তদ্দ্বারা দেশের কিছুমাত্র উপকার হয় না।......

কিন্তু বোম্বাইবাসীরা সেরূপ নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে একবার ক্ষতিগ্রস্থ হইলেও বসিয়া না পড়িয়া কপাল ঠুকিয়া আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাহারও সাহায্যভাগী হইয়া বাণিজ্য কার্য্যে রত হয় এবং অসাধারণ অধ্যবসায় বলে অল্প দিনেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লয়। ফল কথা তাহারা আর বাঙ্গালীদিগের ন্যায় সামান্য একটি স্ঁচ হইতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যের জন্য পরমুখপ্রত্যাশী থাকিতে ভালবাসে না। তাহারা সাবান, দেশলাই, কাপড়, সূতা, প্রভৃতির কল বিলাত হইতে আনয়ন করিয়া এক্ষণে তাহার কতদূর উন্নতি করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহাদের কাছে কি কলিকাতার বাণিজ্য ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ী নামে অভিহিত হইতে পারেন ;..

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বঙ্গবাসীরা কোথায় এরূপ মূলধন পাইবে? কেই বা সাহস দান করিবে? এতদুত্তরে প্রথমেই বঙ্গবাসী জমিদার ও ধনী-দিগের উপর আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়, এবং হৃদয় হঠাৎ তাঁহাদিগের নিকটে তাঁহাদের হস্ত ধরিয়া এরূপ বলিতে প্রবৃত্ত হয় : ও ভ্রাতঃ কলিকাতা ও মফস্বল-বাসী জমিদার ও ধনিগণ! আপনারা অতঃপর ৩ পার্শেণ্ট ৪ পার্শেণ্ট সুদে গবর্ণমেণ্টে টাকা জমা না দিয়া ৪।৫।৬ জনে একত্রিত ও প্রণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া বিদেশ হইতে বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যাদি আনয়ন ও স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যে বাণিজ্য জাহাজে পরিপূরণ করিয়া সমুদ্রপথে দূর দেশে চালান দিয়া বহির্ব্বাণিজ্যে নিযুক্ত হও। আর মধ্যবিত্ত লোকেরা একত্র মিলিয়া আপন আপন অবস্থানুসারে মূলধন প্রয়োগ করিয়া মুঙ্গেরের হিন্দু-কো-অপারেটিব সোসাইটির ন্যায় স্থানে স্থানে বাণিজ্যিক সভা ও ব্যবসায় খুলিয়া অন্তর্বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মনোনিবেশ করুন।"[১৩]

এইরূপে সাময়িক পত্রিকায় শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি পুনঃ পুনঃ

আকৃষ্ট করা হইয়াছে। ১২৮৯ সনের ১৯ বৈশাখে সোমপ্রকাশে একটি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :

"অগ্রে শিক্ষা না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে উৎকর্ষ লাভ হয় না। এদেশে শিল্প-শিক্ষার প্রথা নাই বলিলেই হয়। শিক্ষা প্রথা না থাকাতেই শিল্পকার্য্যের প্রাচুর্য্য নাই। যাহারা যে কিছু শিল্পচর্চ্চা করে, তাহারা প্রায় না পড়িয়া পণ্ডিত। পিতৃপিতাদিক্রমে পুরুষপরম্পরা যে কার্য্যনীতি প্রচলিত আছে, তদনুসারে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এদেশে জাহাজ, রেলের গাড়ি ও মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যে কাহারও হস্তক্ষেপ দেখিতে পাই না। কামার, কুমার, কাঁসারি, তাঁতি প্রভৃতি যে যে ব্যবসায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল কাজ চালান গোছের ব্যবসায়। আমাদের এগুলি না হইলে চলে না, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি যথা কথঞ্চিৎ ঐগুলি প্রস্তুত করিয়া দেয়। কামার বৃদ্ধ হইলেন, লোহা শক্ত হইল, তিনি আর পারেন না, তাহার যুবা পুত্র সেই কার্য্যে ব্রতী হইল। পিতা যে রীতিতে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন, শিক্ষার মধ্যে তাহার সেই শিক্ষা হইল। সেই যন্ত্র সেই উপকরণ সেই কার্য্যপ্রণালী, কিছুরই পরিবর্ত্তন হইল না। তবে যেখানে ভদ্র সমাজে, সমাজের লোকে অধিক উৎসাহ দেন সেখানে কামার কুমারাদির কার্য্যের কিছু উৎকর্ষ হয় বটে, কিন্তু সে উৎকর্ষ সকল কামারে বা সকল কুমারে লাভ করিতে পারে না। যাহার কিছু অধিক বুদ্ধি যোগ থাকে, সেই কেবল কিছু উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। ঢাকা ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের তাঁতিরা সর্ব্বসাধারণ্যে অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে না। দুই চারিঘরের গুণে ঐ ঐ স্থান বিখ্যাত হইয়াছে। এ দেশের একটি মহৎ দোষ এই, যাহারা অসামান্য বুদ্ধিযোগে নূতন কৌশল উদ্ভাবন করে, তাহারা আপনা-দিগের লাভ ক্ষতির ভয়ে অন্যকে কৌশল শেখায় না; সুতরাং সেই সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সেই সেই কৌশলের লোপ হইয়া যায়। আমরা ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। শ্রীরামপুরের কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার নিজ বুদ্ধিগুণে অতি সুশ্রী সীসার অক্ষর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি সে কৌশল আর কাহাকে শিখান নাই। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই সুশ্রী অক্ষরগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান জিলার অন্তঃপাতী কুমারগঞ্জ নামক স্থানের কয়েকজন কাঁসারি পিত্তলে অতি সুন্দর রঙ করিতে পারিত। আমরা আমাদের বাসগ্রামের সন্নিহিত কয়েকজন কাঁসারিকে সেইরূপ রঙ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আদর্শ দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এখন শুনিতে পাই, কুমারগঞ্জের

সেই পূর্ব্ব কারিকরদিগের মৃত্যু হইয়াছে, এখন আর পিত্তলের সেরূপ রঙ হয় না।

"এই সকল কারণে আমরা প্রস্তাব করিতেছি, স্থানে স্থানে শিল্পকার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া এদেশীয়দিগকে শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য······ জর্জ্জ সি. এম. বার্ডউড সাহেব তাঁহার ভারতীয় শিল্প নামক গ্রন্থে শিল্পদ্রব্যের যেরূপ সুন্দর কতকগুলি প্রতিকৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্দর্শনে আমাদিগের কোনক্রমেই এরূপ বোধ হয় না যে ভারতবর্ষের লোকে শিল্প বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্ব্বে ভারতবাসিরা সর্ব্বপ্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যে বিক্রয় করিতেন তাহা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়; কিন্তু কাল-সহকারে অবস্থা-বৈগুণ্যে সে সমুদায়ই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এখন তাহার পুনরুদ্ধার করিতে হইলে দেশের লোকের ও গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রয়াস পাওয়া আবশ্যক। ·········এদেশের শিল্প বাণিজ্য কৃষি, সকলেরই অবস্থা অনুন্নত। অতএব দেশের অবস্থা হীন না হইবে কেন? যাঁহাদের হৃদয়ে দেশের এই হীন অবস্থা দূর করিবার ইচ্ছা না হয়, তাঁহারা যে স্বদেশকে ভালবাসেন না তাহা বলা বাহুল্য। দেশের লোকের স্বদেশের প্রতি মমতা বিনা কি উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে? যাঁহাদের পল্লীগ্রামে বাস, তাঁহারা চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখুন গ্রামের অধিকাংশ লোক কিরূপে কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। অধিকাংশেরই কোন কাজকর্ম্ম নাই, কোন কাজকর্ম্ম করিবেন, সে উপায়ও নাই; সুতরাং তাঁহাদের জীবন একপ্রকার বিড়ম্বনা হয়, তাঁহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া কাল-হরণ করেন। কিন্তু চতুর্দ্দিকে যদি কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা হয়, সকলেই কাজের লোক হইয়া উঠিবে। গবর্ণমেণ্টের ও দেশের লোকের চেষ্টা ব্যতিরেকে কি এ অভীষ্ট সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে?

"এ স্থলে আমাদের আর একটি বক্তব্য এই, স্থানে স্থানে শিল্পকার্য্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া কেবল অভিলষিত সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। এখানে নিবারক বিধি প্রচলিত করিয়া ক্ষুদ্র শিল্পী ও ব্যবসায়ীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি বল, এ বিধি প্রবর্ত্তিত করিলে রাজার পক্ষপাতদোষ ঘটিয়া উঠিবে, তদুত্তরে আমরা যদি বলি যদি রাজার সর্ব্ববিষয়ে সমব্যবহার দৃষ্ট হইত, তাহা হইলে এ প্রস্তাবে আমাদের ধৃষ্টতা প্রকাশিত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু সে পূজনীয় সমব্যবহার কোথায়?

"ইংরাজেরা নিষ্কর বাণিজ্যের পক্ষপাতী কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা ঘটিয়া উঠে না। বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিলে ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিকদিগের উপকার করা হইবে, তন্নিমিত্ত সকলেই নিষ্কর বাণিজ্যের প্রশংসাবাদ করিতেছে। কিন্তু এতদ্দেশ হইতে প্রেরিত

চা শর্করা প্রভৃতি পণ্য দ্রব্যের উপর শতকরা পঞ্চাশ টাকা করিয়া কর নির্দ্দিষ্ট আছে, এস্থলে কই, অপক্ষপাতিতা ও সমদর্শিতার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ নাই, নিষ্কর বাণিজ্যের গুণ ঘোষণাও এখানে নীরব হইয়া আছে। আমরা বলিতে না পারি, কিন্তু মনে মনে রাজনীতির মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি,—যে কার্য্যে ইংলণ্ডের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় তাহাই যুক্তিযুক্ত ও সমাজের হিতকর, আর যে কার্য্যে ভারতের উপকার সম্বন্ধ আছে, তাহা অবশ্য পরিত্যাজ্য, তাহা হইতে কল্যাণ হয় না।......

"ভারতবাসীরা শিল্পকৌশলে এখনও অজাতদন্ত নিঃসহায় শিশুর তুল্য। তাঁহারা কদাচিৎ দুই একটি শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করিতে অভিলাষ করিতেছেন। ইউরোপীয়েরা তাঁহাদের শিক্ষাগুরুর নিকট কতকাল উপদেশ গ্রহণ করিলে তবে তাঁহাদের শিল্পবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি জন্মিবে। এখনও এদেশীয়দিগের শিল্পকার্য্যে পরিপক্ক হইতে অনেক বিলম্ব আছে; এ সময় যদি শিক্ষকেরা শিষ্যের প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়ান, আর কি কখন তাঁহার মস্তক উন্নত করিতে পারিবেন? ভারতবর্ষ তো শিল্প বিষয়ে নিতান্ত নিম্নে পতিত হইয়া আছে; যে নিম্নে পড়িয়া আছে তাহার আর পতনের স্থান কোথায়?"[১৪]

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের বাণিজ্যের কিরূপ দ্রুত উন্নতি হইয়াছে তাহার বিবরণ দিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (১৭৯২ শক—৩২১ সংখ্যা) নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হইয়াছে:

"কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই বাণিজ্যে বঙ্গবাসীদিগের হস্ত প্রায় কিছুই নাই। এক্ষণে আমাদের দেশে আর সকল বিষয়ে উৎসাহ লক্ষিত হইতেছে। আমাদের যুবকেরা আর সকল বিষয়েই যশোলাভ করিতেছেন; কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি ওকালতি, কি চিকিৎসা, সকল বিষয়েই জয়লাভ করিতেছেন; কেবল এই এক বিষয়ে—বাণিজ্য ব্যবসায়ে এখনও তাঁহারা নিরুদ্যম রহিয়াছেন। এ বিষয়ে বোম্বাইএর ভ্রাতৃগণ আমাদের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, সম্প্রতি দুইজন বোম্বাই প্রদেশস্থ হিন্দু, মারকিন দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত, ও তত্রত্য কারখানা প্রভৃতির কার্য্য-প্রণালী স্বচক্ষে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত, তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। বঙ্গীয় যুবকেরা তাঁহাদের এই প্রশংসিত দৃষ্টান্ত কেন না অনুসরণ করেন? যদি তাঁহারা স্বদেশের উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, যদি তাঁহারা মাতৃভূমিকে অন্যান্য উন্নততর সভ্যতাসম্পন্ন জাতিদিগের সমকক্ষ করিতে চাহেন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি মনোযোগী হউন।......

"কেহ কেহ বলেন, যে বাঙ্গালিদিগের সাহস নাই বলিয়া এই বাণিজ্যে তাহারা পরাঙ্মুখ রহিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভ্রম মাত্র। এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে যেরূপ উদ্যম, যেরূপ সাহস, যেরূপ অধ্যবসায়, যেরূপ কার্য্যদক্ষতা ও চতুরতা লক্ষিত হয়, যদি তাঁহারদিগের বাণিজ্যপথে দেশাচারগত কতকগুলি বাধা না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহারা ব্রিটিশ কিম্বা আমেরিকার বণিক-দিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন হইতেন না। এই শ্রেণীর মধ্যে বিদ্যার আলোক যত প্রবেশ করিবে, যতই তাহাদিগের মন হইতে কুসংস্কার সকল তিরোহিত হইবে, ততই এতদ্দেশীয় বাণিজ্য-উদ্যম পরিসর প্রাপ্ত হইবে। অধুনাতন কৃতবিদ্যগণের এক্ষণে কর্ত্তব্য যে তাঁহারা এই শ্রেণীর লোকদিগকে অগ্রে পথ প্রদর্শন করেন।......

"কি উপায়ে আমাদের দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি হইতে পারে, সাধারণের মধ্যে বাণিজ্যস্পৃহা কিরূপে সঞ্চারিত হইতে পারে, এই সকল বিষয় আলোচনা করা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা এক ব্যক্তি কি দুই ব্যক্তির কর্ম্ম নহে। আমাদের মহাজনগণ একত্রিত হইয়া যদি একটি সভা স্থাপন করেন, তাহা হইলে উহা দ্বারা অনেক কাজ হইতে পারে। এই প্রকার সভা না থাকাতে আমাদের বণিকৃমণ্ডলীর মধ্যে একটি মহৎ অভাব রহিয়াছে।"[১৫]

ব্যবসায় বাণিজ্যের অভাবে বাঙ্গালীর দারিদ্র্য আলোচনা প্রসঙ্গে সোম-প্রকাশ পত্রিকা (১২৯২, ৯ ভাদ্র) বাঙ্গালীর উপজীবিকার বিভাগ ও তাহার প্রত্যেকের সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়াছে ৮৫ বৎসর পরেও বাঙ্গালী সমাজ সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য। নিম্নে উপজীবিকার বিভাগ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

"সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গালীর উপজীবিকা বিভাগ করা যাইতেছে।

১ম। সামান্য ব্যবসা বাণিজ্য; এই শ্রেণীতে আড়তদার, গোলাদার, দোকানদার হইতে সামান্য মুদি ও কেরিওয়ালা পর্য্যন্ত এবং যাহারা নগদ টাকা ও ধান্য ইত্যাদির তেজারত করে, সে সমস্তই বুঝিতে হইবে। কারণ ইহারা সকলেই একটা মূলধন লইয়া লাভ লোকসানের দায়িত্ব স্বীকারে জীবিকা অর্জ্জন করে।

২য়। ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ; এই বিভাগে জমীদার, পত্তনীদার, তালুক-দার, জোতদার, গাঁতিদার, বৃত্তি ব্রহ্মোত্তর ভোগী ও কৃষক শ্রেণী বুঝিতে হইবে। কারণ ঐ সকল সম্প্রদায় ভূমির উপস্বত্ব ভোগ দখল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

৩য়। দৈহিক ও মানসিক শ্রম বিক্রয় অথবা চাকুরি, হাইকোর্টের জজ হইতে সামান্য মুটে মজুর, চা বাগান অথবা রেলওয়ে প্রভৃতিতে নিযুক্ত কুলি ইত্যাদি সকলকেই বুঝিতে হইবে। উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতিও এই শ্রেণীভুক্ত। কারণ উহারা সকলেই অপরের কার্য্য উপকার সাধন অথবা অভাব মোচন জন্য নিরূপিত মাসিক সাপ্তাহিক, দৈনিক বা উপস্থিত বেতন গ্রহণে নিয়োগকর্ত্তার রুচি অনুসারে শ্রম বিক্রয় করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন ও সাংসারিক অভাব দূর করে।

৪র্থ। জাতীয় ব্যবসাযোগে জীবিকা-শিল্পী, ইহাতে পুরোহিত, ধোপা, নাপিত, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, সূত্রধর, কাংসকার, গন্ধ ও সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বুঝায়। কারণ উহারা প্রাচীনকাল হইতে কার্য্য ব্যবসায়ভেদে সেই জাতি বা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, সেই হেতু পুরাকালপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

৫ম। তোষামোদ, ভিক্ষা ও উঞ্ছবৃত্তি চাটুকার, পরভোগ্যোপজীবী, ভিক্ষুক, পরমুখাপেক্ষী, উঞ্ছবৃত্তিধারী, পরতেজ্যবস্তু সংগ্রহ করিয়া দিনপাত করে। নিতান্ত অক্ষমতায়, ধর্ম্মের জন্য অথবা আলস্য পরবশ হইয়া অনেকে ঐরূপ ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করে।

জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য অধুনা আরও কয়েকটি পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। পুরাকালে হিন্দুজাতির মধ্যে এরূপ কুপ্রবৃত্তিমূলক জঘন্য বৃত্তি অবলম্বিত হইত, এরূপ বোধ হয় না।

৬ষ্ঠ। আত্মবিক্রয় অথবা ধর্ম্মবিক্রয়, বেশ্যাবৃত্তি, বিবাহের কন্যা বিক্রয় ও বি-এ, এম-এ পাশযুক্ত পুত্রের প্রভূত পণ গ্রহণ, শিষ্যের নিকট গুরুর অর্থ গ্রহণ; এ সকল বৃত্তি প্রাচীন সমাজে বড় প্রচলিত ছিল না। হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ বৃত্তি অবলম্বনে বিশেষ নিষেধ আছে ও ঘোর অধর্ম্ম বলিয়া দণ্ডের বিধান আছে।

৭ম। প্রতিভা বিক্রয়: এই বিভাগে প্রতিভাসম্ভূত কাব্য নাটক নভেল বিক্রয়, বিজ্ঞান, রসায়ণশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র অথবা উপদেশপূর্ণ কোনরূপ সাময়িক পত্রাদি বিক্রয় দ্বারা আবিষ্কর্ত্তা, প্রণেতা, রচয়িতা যে স্বত্ব ভোগ করেন, সেই স্বত্বাধিকারিগণকে প্রতিভাবিক্রেতা বলা যায়। পুরাকালে এ প্রথাটি প্রচলিত ছিল না। ঐ সকল বৃত্তি ব্যতীত চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বৃত্তি কেহ কেহ অবলম্বন করেন। কিন্তু সাধারণ বা প্রকাশ্যবৃত্তি নহে বলিয়া উহাকে বৃত্তি মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে উল্লিখিত উপজীবিকা বিভাগের ব্যাঘাত সংঘটন কিভাবে হইতেছে, তাহাই দেখান যাইতেছে।"[১৬]

৩। কৃষকের অবস্থা

শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংসের ফলে সাধারণ শ্রেণীর অনেক লোকেই জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষিকার্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। এইভাবে বেশী লোকের এই জমি চাষের কার্যে অগ্রসর হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল কৃষির আয়ের হ্রাস। ইংরেজ কোম্পানিও সুযোগ পাইয়া রাজস্বের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইংরেজ কোম্পানি দেওয়ানি পাইবার পূর্ব বৎসর (১৭৬৪-৫) মোট রাজস্ব আদায় হইয়াছিল ৮১,৭০,০০০ টাকা। দেওয়ানি লাভের পর প্রথম বৎসর (১৭৬৫-৬) ১,৪৭,০০,০০০; ১৭৭১-৭২ সনে ২,৩৪,১০,০০০; এবং ১৭৭৫-৬ সনে ২,৮১,৮০,০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।[১৭]

১৭৬৯ সনে ইংরেজ কোম্পানির মুর্শিদাবাদে স্থিত রেসিডেন্ট (Resident) কোম্পানিকে লিখিলেন :

"ইংরেজ মাত্রেরই ইহা মনে করিতে ক্লেশ হইবে যে কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করিবার পর এই দেশের লোকের অবস্থা পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক খারাপ হইয়াছে। কিন্তু ইহা যে সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সুন্দর দেশে স্বেচ্ছাচারী রাজাদের অধীনেও স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ ছিল, কিন্তু যখন ইহার শাসন ভার প্রধানতঃ ইংরেজদের হাতে আসিল তখন হইতে ইহা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

"আমার এখনও মনে পড়ে যে এ দেশবাসীরা যখন স্বাধীন ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিত তখন ইহার কি ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ ছিল। ইহার বর্ত্তমান ধ্বংসের অবস্থা দেখিয়া আমি খুবই দুঃখিত, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যই ইহার প্রধান কারণ।"[১৮]

রেসিডেন্টের এই বর্ণনা যে কতদূর সত্য ১৭৭০ সালের (বাংলা ১১৭৬ সালের) দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই দুর্ভিক্ষের ফলে দেশের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ এক কোটি লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ কমে নাই। কোম্পানির কলিকাতাস্থিত কাউন্সিল ১৭৭১ সনের ১২ ফেব্রুআরি তারিখে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে বলা হইয়াছে : "সম্প্রতি যে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং ফলে বহুলোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল তাহা সত্ত্বেও বর্ত্তমান বৎসরে রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়াছে।" এক তৃতীয়াংশ

লোক ধ্বংস এবং তদনুরূপ কৃষির হ্রাস হওয়ায় রাজস্বও কম হইবার কথা—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ১৭৭১ সনের মোট রাজস্বের পরিমাণ ১৭৬৮ সন অপেক্ষাও যে বেশি হইয়াছে হেষ্টিংস বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে "জোর জবর করিয়া পুরাতন পরিমাণের রাজস্ব আদায় করা হইয়াছে"।[১৯]

অথচ এই দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল ইংরেজ লেখকগণই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ১৭৮৭ খ্রীঃ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভ্য উইলিয়ম ফুলার্টন (William Fullerton) লিখিয়াছেন: "পূর্ব্বে বাংলা দেশ সকল জাতির শস্যের ভাণ্ডার এবং প্রাচ্য দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও সম্পদের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু আমাদের অতিরিক্ত কুশাসনের ফলে গত বিশ বৎসরের মধ্যে এই দেশের অনেক স্থান প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। অনেক স্থলে জমিতে চাষ হয় না—বিস্তৃত জঙ্গল তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। কৃষকের ধন লুন্ঠিত, শিল্পীরা উৎপীড়িত। পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে—এবং ইহার ফলে লোকসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে।"

ভারতের বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস এদেশে কার্যভার গ্রহণ করার পরে ১৭৮৯ খ্রীঃ নিম্নলিখিত মন্তব্য (minute) লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন: "আমি একথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে কোম্পানির শাসনাধীন ভূভাগের এক-তৃতীয়াংশ কেবলমাত্র বন্য পশুর বাসস্থান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।" অথচ এই কর্ণওয়ালিস যখন জমিদারদিগের সহিত রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন তখন মোট রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত করিলেন তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১৭৬৫ সন হইতে এ যাবৎ যে বার্ষিক রাজস্ব আদায় হইত তাহার চেয়ে অনেক বেশি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নীতি অনুসারে অনেক জমিদার বর্ধিত হারে রাজস্ব দিতে না পারায় তাহাদের ভূসম্পত্তি নিলাম হইয়া যায় এবং কলিকাতার ধনশালী ব্যক্তিরা এই সমুদয় ক্রয় করায় এক নূতন জমিদার সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ইহারা জমিদারির এলাকায় বাস করিতেন না, কলিকাতায় বাস করিয়াই কর্মচারী দ্বারা কাজ চালাইতেন। অবশ্য প্রাচীন অনেক জমিদার বংশ টিকিয়া ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় বাড়ী নির্মাণ করিয়া বৎসরের বেশী ভাগ কলিকাতাতেই থাকিতেন, মাঝে মাঝে জমিদারি দর্শন করিতে যাইতেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক প্রতিপত্তি যথেষ্ট বাড়িল এবং বাংলা দেশে এক নূতন অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল।

কিন্তু প্রজার অবস্থা যে প্রথম প্রথম খুবই খারাপ ছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নানাবিধ—বিশেষতঃ ১৮৫৯ সনের—আইনের ফলে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা কতক দূর হইলেও মোটের উপর তাহাদের অনেক কষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত।

জমিদারেরা প্রজাদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় না করিতে পারিলে সরকারী রাজস্ব দিতে পারেন না—সুতরাং ইহার প্রতিষেধের জন্য সরকার নূতন আইন পাশ করিয়া প্রজাদের নিকট হইতে জোর জবরদস্তি করিয়া খাজনা আদায় করিবার অধিকার জমিদারদিগকে দিলেন। ইহাতে প্রজাদের উপর ঘোর অত্যাচার হয়—ইহার ফলে এই আইনটির কিছু সংশোধন হয়। এই দুইটি আইন 'হপ্তম পঞ্চম' নামে কুখ্যাত (Regulation VII of 1799, Regulation V of 1812)। ইহার বলে, "সংবাদ প্রভাকরের" ভাষায়, (জমিদার) "প্রজার বক্ষের উপর বাঁশ দিয়া টাকা সংগ্রহ করেন।[২০]

রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ও আরও ২০ জন মিশনারী বলেন (এপ্রিল ১৮৭৫): "জমিদাররা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ঠিক প্রজাদের মতো নয়, কতকটা ক্রীতদাসের মতো। তাঁরা নিজেদের রাজা মহারাজাদের মতো মনে করেন। প্রজাদের কাছে খাজনাদি যা তাদের ন্যায্য পাওনা, তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁরা নানা কৌশলে আদায় করেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে নিজেদের নানারকমের কাজে প্রজাদের খাটিয়ে নেন। তাছাড়া অত্যাচার যে কতরকমের করেন তা বলে শেষ করা যায় না।"[২১]

জমিদারগণ প্রজাদের উপর কিরূপ নৃশংস অত্যাচার করিতেন সমসাময়িক পত্রিকায় তাহার বিবরণ পড়িলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সমুদয় বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করা সম্ভবপর নহে। ১৭৭২ শকে (১৮৫০ খ্রীঃ) "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি[২২]:

"ভিন্ন ভিন্ন ভূস্বামী যে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ছল করিয়া প্রজা নিপীড়ন করেন, তাহার গণনা করা দুষ্কর। তাঁহারা স্বাধিকারস্থ সমুদায় প্রজার সমুদায় বস্তুই আত্মবস্তু জ্ঞান করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কাহার অবিদিত আছে, যে প্রজাদিগের ফল মূল বৃক্ষ পর্য্যন্ত ভূ-স্বামীর সর্ব্বগ্রাসক লোভের নিকট রক্ষা পায় না? কোন নিরাশ্রয় দুঃখিপ্রজা কোন ফল-বৃক্ষ রোপণ পূর্ব্বক যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া তাহাকে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত করিয়াছে, এবং বহুবৎসরের পর তাহার শাখা সকল ফলভারে অবনত দেখিয়া মনে মনে পরম

আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছে, ইতিমধ্যে যদি তাহার উপর ভূম্যধিকারির ক্রূর দৃষ্টি পতিত হয়, তবে আর তাহা রক্ষা করে কাহার সাধ্য ? যখন সে অনাথ ব্যক্তি তাঁহার নিদারুণ অনুমতি শ্রবণ করিলেক, তখনই নিশ্চয় জানিলেক, ভস্মেতে ঘৃতাহুতির ন্যায় আমার এত বৎসরের পরিশ্রম অদ্য বিফল হইল। কি বিষম নৈরাশ্য ! কি অসহ্য যন্ত্রণা !*

"বাঙ্গলাদেশের অনেক ভূস্বামিরই এই প্রকার উপদ্রব, এবং অনেক প্রজারই এই প্রকার যাতনা। সম্প্রতি কৃষ্ণনগর জেলার কোন ভূস্বামী ও তাঁহারদের কর্ম্মচারিদিগের চরিত্র শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হওয়া গেল। তাঁহারা প্রজাদের স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি দূরে থাকুক, তাহারদিগের শরীরও আপনার অধিকার-ভুক্ত জ্ঞান করেন, এবং তদনুসারে তাহারদিগের কায়িক পরিশ্রমও আপনার ক্রীত বস্তু বোধ করিয়া তাহার উপর দাওয়া করেন। তাঁহারদের এই প্রকার অখণ্ড্য অনুমতি আছে, যে বিনা মূল্যে বিনা বেতনে তাঁহারদিগকে গোপেরা দুগ্ধ দান করিবেক, মৎস্যোপজীবিরা মৎস্য প্রদান করিবেক, নাপিতে ক্ষৌর করিবেক, যান-বাহকে বহন করিবেক, চর্ম্মকারে চর্ম্মপাদুকা প্রদান করিবেক, ইত্যাদি সকলেই স্ব স্ব উপজীব্যোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারদিগের সেবা করিবেক।**

"ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর ও দেবতার দেবোত্তর গ্রহণ করা কোন কোন ভূস্বামির সঙ্কল্প হইয়াছে। আমারদিগের সর্ব্ব-শোষক গভর্ণমেণ্টকে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগের যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট আছে, তাঁহারা তাহা অপহৃত করিয়া আত্মসাৎ করেন। কত কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে প্রতীকারার্থে ব্যক্তি-

*অনেকানেক ভূস্বামির এরূপ আচরণ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, যে যদি তাঁহারা স্বকীয় প্রয়োজন সাধানার্থে আপন প্রজা বিশেষের আম্র, কাঁঠাল, বা অন্য বৃক্ষ ছেদন করিবার অনুমতি দেন, তবে সেই প্রজাকে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতে হয়। ইহাতে দীন দুঃখী প্রজার বৃক্ষটি যায়, কিন্তু তাহার ফল ভোগার্থে ভূস্বামিকে যে কর দিতে হইত তাহা রহিত হয় না। তিনি সেই বৃক্ষস্থানে আর একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ রোপণ করিতে কহিয়া পূর্ব্ববৎ করগ্রহণ করিতে থাকেন।

আর এ প্রকারও ঘটে, যদি কোন ভূম্যধিকারের পাঁচ অংশি থাকে, এবং তন্মধ্যে কেহ প্রজার নিকট কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন, তবে তাহাকে ক্রয় করিয়াও আর চারজনকে চারটি সেই দ্রব্য দিতেই হইবে, নতুবা তাহার নিস্তার নাই।

**কুমর, বারুই, মুটে, মজুর, ধোপা প্রভৃতি সকলকেই নায়েব, গোমস্তা, মুহুরি প্রভৃতির এইরূপ সেবা করিতে হয়। আর ভূস্বামী যখন স্বাধিকারে স্থিতি করেন, তখন তাঁহাকেও নিজধনে বাসার ব্যয় সম্পাদন করিতে হয় না। তদ্ভিন্ন তাঁহার বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে বিনা মূল্যে চতুর্দ্দিক হইতে নানা প্রকার সামগ্রীপত্র আসিতে থাকে।

বিশেষের দ্বারে দ্বারে ক্রন্দন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের অন্ন-হন্তা ভূস্বামিদিগের কঠোর হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হয় না। তাঁহারা রোদন করিলে তিনি বধিরবৎ ব্যবহার করেন ; বোধ হয়, যেন আপনাকে স্বাধিকারস্থ সমস্ত প্রজার সমস্ত বস্তুর অদ্বিতীয় স্বত্বাধিকারি জ্ঞান করিয়া তাহা অধিকার করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। কখন দেখ, তিনি লোভাক্রান্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভূমি পরিমাণ পূর্ব্বক নানা কৌশলে রাজস্বের বাহুল্য করিতেছেন,* কখন কোন প্রজার নিরূপিত কর পরিবর্ত্তন করিয়া যথেচ্ছা বৃদ্ধি করিতেছেন, কখন বা সাতিশয় ধন-তৃষ্ণা-পরবশ হইয়া স্বেচ্ছানুসারে এক প্রজার ভূমি গ্রহণ পূর্ব্বক অধিকতর করে, অন্যের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। ....

"প্রজারা এই প্রকার যন্ত্রণা নিরন্তর ভোগ করিতেছে, তথাপি তাহার প্রতীকার চেষ্টায় সমর্থ হয় না,—চিরদিন অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইতেছে, তথাপি অন্তরের ব্যথা ব্যক্ত করিতে পারে না ! কেহ কেহ কহেন, তাহারা বিচারালয়ে ভূস্বামির নামে অভিযোগ না করে কেন ? হায় ! তাহারদের কি সে সামর্থ্য আছে ?.....

"প্রজারা আপনারদের অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত কোথায় বা সাক্ষী পাইবে ? তাহারদের এ প্রকার প্রচুর ধনই বা কোথায়, যে তদ্দারা বিচারালয়ের কর্ম্মচারিদিগকে আয়ত্ত বশীভূত করিয়া রাখিবে ?

"অতএব তাহারা রাজদ্বারেও তাঁহাকে পরাভব করিতে পারে না, লাভ হইতে তাঁহার কোপানলে পতিত হইয়া তাহারদের উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হয়। খড়ি নদীর তীরবর্ত্তি গ্রাম বিশেষের কতকগুলি ইতর লোক ভূস্বামির অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এবং ধন-প্রাণ রক্ষার্থে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। এক দিবস তাহারা সবিশেষ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক নিজ নিজ ক্ষেত্রকর্ষণে নিযুক্ত ছিল, ইত্যবসরে ভূস্বামির শত শত দুরন্ত দূত যুগপৎ আগমনপূর্ব্বক তাহারদের সমস্ত গরু হরণ করিয়া লইয়া গেল। এই দস্যু ক্রিয়াতে তাঁহার মনস্কামনা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইল ; কারণ সেই অতি দীন পরাধীন প্রজাগণ যখন এইরূপে হৃত-সর্ব্বস্ব হইল, তখন চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিয়া নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া তাঁহার পদানত হইল, এবং তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিয়া মনের অগ্নি মনেতেই জাপ্য করিয়া রাখিল।... ..

"এ প্রকার ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটে ; আমারদিগের অন্তঃকরণে এইরূপ হৃদয়-

*কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে এইরূপ পরিমাণ প্রজার ভূমি প্রায়ই অধিক হইয়া থাকে, কখনও ন্যূন হইতে দেখা যায় না।

বিদীর্ণকারী কত ব্যাপারের উদয় হইতেছে! কিয়ৎ বৎসর হইল, সুপ্রসিদ্ধ পলাশিগ্রাম সন্নিহিত মাঙ্গনপাড়া নিবাসী এক ব্যক্তি নানামতে নিগৃহীত হইয়া এবং তৎপার্শ্ববর্তি প্রজাদিগের দারুণ দুর্দ্দশাদৃষ্টে দয়ার্দ্র হইয়া ভূস্বামির অত্যাচার নিবারণার্থে যত্ন পাইতেছিলেন, এবং অপরাপর প্রজাদিগকে তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতেছিলেন। তাহাতে ভূস্বামির ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল, এবং তিনি তাহার প্রতিফল প্রদানার্থে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। সে প্রতিফল স্মরণ করিলে শরীর লোমাঞ্চ হয়, কলেবর কম্পমান হয়, হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়! তাঁহার প্রেরিত দস্যুদল ঐ ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ ও সর্ব্বস্ব হরণ করে, তাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রীদিগের প্রতি অহিতাচরণ করে এবং তাঁহার কোন স্নেহপাত্রকে আনয়নপূর্ব্বক ভূস্বামির গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখে।"*

"সে বৎসর নবদ্বীপ অঞ্চলে ঢোলমারি, চাপড়া, কাপাসডেঙ্গা প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের কতগুলি এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টান আপনারদিগকে রাজ-ধর্ম্মাক্রান্ত ভাবিয়া ভূস্বামির অন্যায় অনুমতি সকল প্রতিপালনে অস্বীকার গিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলার ভূস্বামিরা ধর্ম্মবিশেষের অনুরোধ রাখেন না, এবং সামান্য সাহেবদিগকেও ভয় করেন না, অতএব উল্লিখিত ভূম্যাধিকারী তাহারদিগকে অন্যান্য ইতর প্রজার সহিত অবিশেষ জানিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি প্রদান করেন। তাহারদিগের সহায় স্বরূপ মিশনারীরা এবিষয় অবশ্যই অবগত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু কোন-প্রকার প্রতীকার করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং সেই সকল খ্রীষ্টান প্রজা তদবধি নত-মুণ্ড হইয়া তাঁহার পদানত হইয়া রহিয়াছে।

"এইরূপ অত্যাচার করা দুঃশীল দুরাশয় ভূস্বামিদিগের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে। যেরূপ নরহন্তা দস্যুরা অবলীলাক্রমে অম্লান বদনে মনুষ্যের মুণ্ডে দণ্ডাঘাত করে, সেইরূপ তাঁহারাও নিতান্ত নির্দ্দয় ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেচনা-শূন্য হইয়া লোকদিগকে অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান করেন। তাঁহারদের এইপ্রকার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে, যে আমার আজ্ঞা অখণ্ডনীয় ও আমিই সকলের মরণ জীবনের কর্ত্তা।"**

*শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এ বিষয় রাজপুরুষদিগের গোচর হইয়া বিচারারূঢ় হইয়াছিল। লোকে কহে, তিনি ৩০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া পরিত্রাণ পান। যাহার ধন ব্যয়ের সামর্থ্য আছে, সে ব্যক্তি দিবা দ্বিপ্রহর কালে দস্যুবৃত্তি করিয়া মুক্ত পুরুষের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারে!

**সম্প্রতি এবিষয়ে এক উদাহরণ উপস্থিত হইয়াছে। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তি কোন গ্রামের এক ভূস্বামী তৎপ্রদেশীয় গ্রামান্তরবাসি কোন ব্যক্তির কন্যাকে উদ্বাহার্থে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি তাহা স্বীকার না করাতে তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল, এবং তিনি বহুসংখ্যক লোক প্রেরণ করিয়া বল দ্বারা সেই কন্যাকে হরণ করিয়া আনিলেন।

প্রজাদিগের উপর জমিদার কতরকম অত্যাচার করেন তাহার নিম্নলিখিত বর্ণনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"ভূম্যধিকারির লোকে বল দ্বারা প্রজাদের ধান্যগ্রহণ করে, গো সকল হরণ করে, এবং তাহারদিগকে গোণী-বদ্ধ করিয়া জল-মগ্ন করে ও প্রহার করে। ভূস্বামী ও দারোগা এবং তাহারদের কর্ম্মচারিরা প্রজাদিগের যে প্রকার শারীরিক দণ্ড করে, তাহা কলিকাতাবাসি অনেক লোকে সবিশেষ অবগত নহেন। অতএব পশ্চাৎ কয়েক প্রকার কায়দণ্ডের বিবরণ করা যাইতেছে, যথা :

১—দণ্ডাঘাত ও বেত্রাঘাত করে।

২—চর্ম্মপাদুকা প্রহার করে।

৩—বংশকাষ্ঠাদি দ্বারা বক্ষঃস্থল দলন করিতে থাকে।

৪—খাপরা দিয়া কর্ণ ও নাসিকা মর্দ্দন করে।

৫—ভূমিতে নাসিকা ঘর্ষণ করায়।

৬—পৃষ্ঠভাগে বাহুদ্বয় নীত করিয়া বন্ধন করে এবং বন্ধন করিয়া বংশদণ্ডাদি দ্বারা মোড়া দিতে থাকে।

৭—গাত্রে বিছুটি দেয়।

৮—হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয় নিগড়-বদ্ধ করিয়া রাখে।

৯—কর্ণধারণ করিয়া ধাবন করায়।

১০—কাটা দিয়া হস্ত দলন করিতে থাকে।*

১১—গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড রৌদ্রে পাদদ্বয় অতি বিযুক্ত করিয়া ইষ্টকোপরি ইষ্টক হস্তে দণ্ডায়মান করিয়া রাখে।

১২—অত্যন্ত শীতের সময় জলমগ্ন করে ও গাত্রে জল নিঃক্ষেপ করে।

১৩—গোণীবদ্ধ করিয়া (ছালার মধ্যে পুরিয়া) জলমগ্ন করে।

১৪—বৃক্ষে বা অন্যত্র বন্ধন করিয়া লম্বমান করে।

১৫—ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধান্যের গোলায় পুরিয়া রাখে। (সে সময়ে গোলার অভ্যন্তর অত্যন্ত উষ্ণ হয়, এবং ধান্য হইতে প্রচুর বাষ্প উঠিতে থাকে।)

১৬—চুণের ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখে।

১৭—কারারুদ্ধ করিয়া উপবাসি রাখে, অথবা ধান্যের সহিত তণ্ডুল মিশ্রিত

---

* অর্থাৎ দুইখান কঠিন বাখারির এক দিক বাঁধিয়া তাহার মধ্যে হস্ত রাখিয়া মর্দ্দন করিতে থাকে। এই প্রাণ-ঘাতক যন্ত্রের নাম কাটা।

করিয়া তাহাই এক সন্ধ্যা আহার করিতে দেয়।

১৮—গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করিয়া লঙ্কা মরিচের ধূম প্রদান করে

প্রজাদের উপর অত্যাচার কেবল জমিদারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। জমিদারেরা রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য জমিদারী সম্পত্তি নানা লোকের মধ্যে বিলি করিয়া দিতেন—তাহারা একটা থোক টাকা দিতে স্বীকৃত হইত, সুতরাং জমিদারদের আর প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে আদায় করিবার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। যাহারা এই ভাবে এক খণ্ড জমির রাজস্ব আদায়ের ভার অর্থাৎ পত্তনি পাইত তাহারা আবার ইহাকে কয়েকটি ক্ষুদ্রতর খণ্ডে ভাগ করিয়া ইজারা দিত। অর্থাৎ এখন যেমন একজন কণ্ট্রাক্টর তাহার অধীনে সাব্-কণ্ট্রাক্টর নিযুক্ত করে, সরকারী রাজস্ব আদায়ের কণ্ট্রাক্টর জমিদারগণও সেইরূপ তাহাদের অধীনে সাব্-কন্ণ্ট্রাক্টার নিযুক্ত করিতেন, ইহারা আবার নিজেদের অধীনে সাব্-কন্ণ্ট্রাক্টার নিযুক্ত করেন। এইরূপে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে কতগুলি মধ্যস্বত্ব ভোগীর দল, উপদল প্রভৃতির সৃষ্টি হইল। ১৮১৯ সনের ৮নং রেগুলেসান (Regulation) অনুসারে এই সকল মধ্যস্বত্বভোগীর অধিকার জমিদারের স্বত্বের ন্যায় স্বীকৃত হইল এবং ইহার ফলে মধ্যস্বত্বভোগীর অর্থাৎ নানা স্তরের ইজারাদারদের শ্রেণী ও সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল যে প্রকৃত জমিদারের অধীনে খাস জমির পরিমাণ খুবই সামান্য থাকিত। ১৮৭২-৭৩ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে তখন জমিদারির সংখ্যা দেড় লক্ষেরও বেশী ছিল। ইহাদের বিভিন্ন স্তরের পরিমাণ এইরূপ

জমির পরিমাণ	জমিদারের সংখ্যা
৬০,০০০ বিঘার উপর	৫৩৩
৬০,০০০ হইতে ১৫০০ বিঘা	১৫,৭৪৭
১৫০০ বিঘার কম	১৩,৭৯,২০৩

১৮৭১-৭২ সালের সরকারী রিপোর্টে জমিদার ও কৃষকদের মধ্যবর্তী বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর যে তালিকা আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।[২৩]

১।	কৃষক	—	৬৩,৯১,০৭৪
২।	জমিদার	—	৪২,৬১৮
৩।	ইৎমামদার	—	৫৮৬
৪।	ঠিকাদার	—	৩০৩
৫।	ইজারাদার	—	৩,৩৫৪

৬।	লাখেরাজদার	—	২৩,০৭০
৭।	জায়গীরদার	—	৩৬৫
৮।	ঘাটোয়াল	—	৬৬৮
৯।	আয়মাদার	—	২,০০৪
১০।	মকরারীদার	—	৯,৯৩৩
১১।	তালুকদার	—	৯৬,০৫০
১২।	পত্তনিদার	—	৩,৩৭২
১৩।	খোদকস্ত প্রজা	—	৭,৫৫২
১৪।	মহলদার	—	১,১২৮
১৫।	জোতদার	—	১৯,৫৬৪
১৬।	গাঁতিদার	—	৩,৮২৪
১৭।	হাওলাদার	—	৯,৩৪৩

এই সকল মধ্যস্বত্বভোগীরা কিরূপে প্রজাদের অর্থশোষণ ও তাহাদের উপর নানা অত্যাচার করিত সমসাময়িক পত্রিকার নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি হইতে তাহার কতকটা ধারণা করা যায়।

"গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিয়া কেবল জমীদারেরাই ভূমির উৎপন্নের লাভাংশ ভোগ করিয়া থাকেন এমত নহে, জমীদারদিগের অধীনে যে সমস্ত তালুকদার ও পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা কৃষকের শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতি আপনাপন সুখসেবা ও সংসারযাত্রা নির্বাহ করণের সম্যক নির্ভর করিয়া থাকেন অর্থাৎ কৃষকদিগকে আপনাপন শ্রমার্জিত ধন দিয়া এই সকল লোকেরও পুষ্টিবর্ধন করিতে হয়"। (সংবাদ প্রভাকর ১২৯৯)

"কোন বৎসর শস্য হউক বা না হউক তাঁহারা নিয়মিত রাজস্বের একটি পয়সাও পরিত্যাগ করেন না। (ইহাতে) কৃষকের অবস্থা অতিশয় ক্লেশদায়ক হইয়াছে।"[২৪] (সংবাদ প্রভাকর, ১২৫৮)

"মফঃসলে অর্থাৎ পল্লীগ্রাম মাত্রে কৃষক লোকেরা প্রায় সকলেই নির্ধন অন্নাচ্ছাদনের সামর্থ্য রহিত, সুতরাং তাহারদিগের অন্ন জন্য উপায় কি আছে কাযেই ধান্যের বাড়ীদাতা মহাজনগণের নিকট যাইতে হয়। ঐ ধান্যের মহাজন সকলের মধ্যে অধিকাংশ তালুকদার, অপর লোক অত্যল্প, কৃষকেরা কর্ষণের সময়ে অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যত পরিমাণে ধান্য লইয়া খত লিখিয়া দেয়, পৌষ ও মাঘ মাসে তাহার দেড়া দিতে হয়, এরূপ নিয়মবদ্ধ আছে, অনন্তর যদি দৈব

বশতঃ ফসল না জন্মে তবেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়া উঠে, খতের লিখিত ধান্ত উক্ত নিয়মে পরিশোধ করিতে না পারিলে ঐ দেড়া ধান্তের খত লেখাইয়া লয়, তাহাতে দেড় বৎসরের ভিতর চারি শলি ধান্ত লইলে গুণশালি ঋণদাতাকে নয় শলি প্রদান করিতে হয়, দেখুন, প্রথম ৪ শলিতে ৬ শলি, পরে ৬ ছয় শলিতে ৯ নয় শলি, যাহারা একবার এ প্রকার ঋণগ্রস্ত হয়, তাহারদিগের মৃত্যু ব্যতীত ঐ ঋণ হইতে উদ্ধার হওনের অপর উপায় কিছুই দেখি না।"২৫ (সংবাদ প্রভাকর—সম্পাদকীয়—১২৫৮)

প্রজাদের দুরবস্থার আর একটি কারণও এথানে উল্লেখ করা আবশ্যক। জমিদারগণের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু প্রজাগণের কর সেরূপভাবে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। ভূমির জরিপও হয় নাই। ইহার ফলে পত্তনিদারেরা কৃষকের উপর অত্যাচার করিত। সমসাময়িক পত্রিকায় তাহার বর্ণনা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

"১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান মতে পত্তনি দিবার যেরূপ বন্দোবস্ত আছে, তাহা প্রজাগণের অধিকতর অনিষ্টের কারণ। সুচতুর জমিদারগণ স্বীয় অধিকারস্থ জমিদারী জরীপ ও নিরিখ ধার্য্য করিয়া পত্তনি দিবার ঘোষণা করিয়া দেন, নীলামের ডাকের ন্যায় উহার ডাক বাড়িতে থাকে, যে ব্যক্তি অধিক পণ জমা দিতে সম্মত হয়, তাহার সহিত পত্তনির বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। পত্তনিদার মহলে উপস্থিত হইয়া থাজনা আদায় করিবার পূর্ব্বে এই কথা প্রচার করিয়া দেয় যে যে প্রজা টাকায় সিকি বৃদ্ধি স্বীকার না করিবে তাহার সহিত বন্দোবস্ত হইবে না। এই নিমিত্তই প্রজারা ভূমিতে জমিদারের জরীপের রজ্জুপাতকে হৃদয়শল্য জ্ঞান করে.. ...ভূমি মাপিবার রসি স্থির না থাকাতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় পত্তনিদারের লোকেরা ১৮ কাঠায় বিঘা হয়, এমত রসি লইয়া মাপ আরম্ভ করে, এবং ১০ বিঘার বন্দকে জরীপ মুখে ১২ বিঘা করিয়া তুলে, যথন প্রজারা মাঞ্চেষ্টারের মজুরদিগের ন্যায় নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পত্তনিদারের দুরাকাঙ্খা পূর্ণ করিতে বাধ্য হয়। এই প্রকার দর-পত্তনিদার, ছে-পত্তনিদার ইজারদার, ছে-ইজারদারের হস্তে নিত্য নূতন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ইহাতে কি প্রজাদিগের সুখ-সৌভাগ্যের প্রত্যাশা আছে।"২৬ (সোমপ্রকাশ ১২৭০)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ও কৃষকের মধ্যবর্তী স্বত্ব ভোগী সম্প্রদায় ও তৎসংসৃষ্ট নানা লোক লইয়া এক নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত হইল। সমসাময়িক পত্রিকাগুলির বিস্তৃত বিবরণ আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, ছে-পত্তনিদার, ইজারাদার, গাঁতিদার, তালুকদার, জোতদার প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী, নায়েব গোমস্তা দেওয়ান ম্যানেজার তহশীলদার থেকে আরম্ভ করে পাইক-বরকন্দাজ, এমন কি জমিদারের বাজার-সরকার পর্য্যন্ত আমলাবর্গ, নতুন পুলিশের দারোগা কনেষ্টবল, মহাজন এবং আইন আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দালাল থেকে উকিল পর্য্যন্ত নানারকমের লোক নিয়ে বাংলার গ্রাম্যসমাজে যে বিপুল-কলেবর এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হল, অর্থনীতি-ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের (Production) সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক রইল না। পরনির্ভর স্বার্থপর অর্থপিশাচ বেতনভুক এই গ্রাম্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাজার নখদন্ত বাংলার কৃষকদের দিকে ধাবিত হল। বাংলার কৃষকরা, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' ভাষায়, "রজনীতে নায়েব, দারোগা, গোমস্তা, নালিশ, দণ্ড, এই সকলই স্বপ্ন দেখে! সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী নিদ্রাও তাহাদের উদ্বেগ দূরীকরণে সমর্থ নহে!" সহস্রমুখী জোঁকের মতো কৃষকদের শ্রম ও শ্রমার্জিত অর্থশোষণ করা ছাড়া গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর আর কোন উপায় রইল না। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখেছেন : "পত্তনিয়াদার তালুকদার দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি ভূমির উৎপন্ন ভোগির সংখ্যা রাজনিয়মবলে যত বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে ততই কৃষকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন খোদকস্তা, পাইকস্তা, যোতদার, বীজধান দাতা ইত্যাদিও ভূমির উৎপন্ন গ্রহণকারি বিস্তর আছে, তাহারা স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ বীজবপন ইত্যাদি ক্ষেত্রের কার্য্য কিছুই করে না, অথচ কৃষকের উপর কর্ত্তৃত্ব করে" (৫ ভাদ্র ১২৬৪)। কৃষকের শ্রমোৎপন্নভোগীর সংখ্যা গ্রাম্যসমাজে বেড়েছে, ব্রিটিশ শাসকরা আইনবলে তাঁদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। উৎপাদনকর্ম্ম থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন এরকম শোষণমুখী অর্থলোভী বিপুলাকার মধ্যশ্রেণী বাংলার গ্রাম্যসমাজে ব্রিটিশপূর্ব্ব যুগে, মুসলমান বা হিন্দু রাজত্বকালে, ছিল না। বাংলাদেশের গ্রাম্যসমাজের এই পরিবর্ত্তন একদিক থেকে যুগান্তকারী বললেও অত্যুক্তি হয় না।"[২৭]

৪। দ্রব্য ও শ্রমমূল্য

অর্থনীতি প্রসঙ্গের উপসংহারে সেকালের দ্রব্য ও শ্রম মূল্য সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকার বিবরণ হইতে কিছু উল্লেখ করিলে উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাঙ্গালীর নাগরিক জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু ধারণা হইবে।

"নগর মধ্যে দ্রব্যাদি সকল অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে, পূর্ব্বে যে মোটা তণ্ডুল মোন ১।০—১।৵০ মূল্যে বিক্রয় হইত গতকল্য সেই তণ্ডুল মোন ১৷৵০—১৸০

আনা হইয়া উঠিয়াছে। গোলাধারিরা মধ্যম প্রকার তণ্ডুল মোন ২ টাকার ন্যূনে দেয় না তাহাতেও দুই তিন কোর ওজন কমী হয়, টাকায় আড়াই মোন কাষ্ঠ বিক্রয় হইতেছে, প্রকৃত ওজনে তাহা দুই মোনও হয় না, দোকানি পসারিরা সকল দ্রব্যের ওজনে এই প্রকার অন্যায় করিতেছে…"[২৮] (সংবাদ ভাস্কর, ১৮৫৬)

বর্তমানের তুলনায় দ্রব্যের স্বল্প মূল্য দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে শত বৎসর পূর্বে বাংলায় রাম-রাজ্য ছিল, লোকে মহাসুখে জীবন ধারণ করিত, তাহা হইলে তিনি বিষম ভুল করিবেন। কারণ তখন শ্রমের মূল্যও ছিল অনেক কম। উনিশ শতকের শেষে গ্রামের চাষী মজুরের মাসিক বেতন ছিল গড়ে তিন টাকা, আর শহরের মুটে মজুর পাইত মাসিক পাঁচ টাকা—আর চাউলের মণ ছিল দুই টাকার কিছু বেশি।[২৯]

পাদটীকা

১। Dutt, R. Palme, *India Today*. ১১১ পৃঃ।

২। ঐ, ৯৪ পৃঃ।

৩। Basu, Major B. D, *Ruin of Indian Trade and Industries*, ৫২-৫৩ পৃঃ।

৪। ঐ, ৫৪-৫৫ পৃঃ।

৫। ঐ, ৩৫ পৃঃ

৬। ঐ

৭। Dutt, R. P.—১১১ পৃঃ।

৭ক। বিনয় ঘোষ—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, ৪৯৬ পৃঃ (পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থ অতঃপর বিনয়, ১, ২, ৩, ৪, ৫ এইভাবে উল্লিখিত হইবে)।

৮। Basu, B. D, ১২০ পৃঃ।

৯। ঐ, ১১৮-১৯ পৃঃ।

১০। বিনয় ৪/১৬৮-৭০ পৃঃ।

১১। Dutt, R. P. ২২ পৃঃ।

১২। বিনয়, ১। ৯২-৩ পৃঃ।

১৩। বিনয়, ৪। ১২৩-১২৮ পৃঃ।

১৪। বিনয়, ৪। ১৪৩-৭ পৃঃ।

১৫। বিনয় ২। ২৪৮-৫০ পৃঃ।

১৬। বিনয়, ৪। ১৮১-২ পৃঃ।

১৭। Dutt, R. P., ৯১ পৃঃ।

১৮। ঐ, ৯২ পৃঃ।

১৯। "Violently kept up to its former standard (Dutt, R. P., ৯২ পৃঃ)

২০। বিনয়, ১। ৯৫ পৃঃ।

২১। বিনয়, ৫। ২১ পৃঃ।

২২। বিনয়, ২। ১১৮-২৪ পৃঃ।

২৩। বিনয়, ৫। ২৮ পৃঃ।

২৪। বিনয়, ৫। ২৫ পৃঃ।

২৫। বিনয়, ১। ৭৭ পৃঃ।

২৬। বিনয়, ৫। ২৬ পৃঃ।

২৭। বিনয়, ৫। ৩০ পৃঃ।

২৮। বিনয়, ৩। ৩২৪ পৃঃ।

২৯। *History and Culture of the Indian People,* Vol. IX, p. 1161, f.n. 8.

নবম অধ্যায়

সাহিত্য

১। গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব

এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ১৭৬৫ হইতে ১৯০৫ খ্রীঃ বাংলার ইতিহাস। এই ১৪০ বৎসরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুতর বিবর্তন বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব। সুতরাং এই বিষয়টিই প্রথমে আলোচনা করিব।

(ক) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা গদ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা গদ্য ভাষার নমুনা ও বিবরণ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (৪৪৫—৪৪৯ পৃঃ) দেওয়া হইয়াছে। এই শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা গদ্য ভাষার কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছিল নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

১। ১৭৭২ খ্রীঃ পুত্রের নিকট লিখিত মহারাজা নন্দকুমারের পত্র।

"তোমার মঙ্গল সর্ব্বদা বাসনা করণক অত্র কুশল পরন্তু ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুক্ত ফেতরৎ আলি খাঁ-এর এখানে আইসনের সম্বাদ যে লিখিয়াছিলে এতক্ষণতক পঁহুছেন নাই পঁহুছিলেই জানা যাইবেক। শ্রীযুত রায় জগচ্চন্দ্র বিষ রোজের পর বাটি হইতে আসিয়াছেন যেমত ২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল। তিনি যথা ২ জাউন ফলত কার্য্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন স্পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক।"[১]

২। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লিখিত লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট কোচবিহার সরকারের পত্র।

"ধৈর্জেন্দ্র নারায়ণ রাজা আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে খানখা কাটিয়াছিল এ কারণ ভুটিয়ার স্থানে কএদ রহিল আমার ছাওাল শ্রীমান নাজির দেও খগেন্দ্র নারায়ণ রাজেন্দ্র নারায়ণকে রাজা করিল। তাহার পর রাজেন্দ্র নারায়ণ রাজার পরলোক হইলে পর কএদি রাজার পুত্র রাজার উপযুক্ত নহে তুমি রাজা হও অথবা অন্য কাহাকো রাজা করহ তাহা আমার ছাওাল মনজুর করিল না একারণ সন ১১৭৯ সালে ভুটিয়ার সহিত কাজিয়া (হইল)"

৩। শ্রীহরিমোহন বাবু কর্তৃক ওলন্দাজ কোম্পানির ডিরেক্টারের নিকট ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অগস্ট তারিখে লিখিত পত্র।

"যে ওয়াল সাহেব জবরদস্তী করিয়া তাতি লোককে কাপড় বুনিতে দেয় না মুচলকা লইয়াছেক সেওয়ায় ইঙ্গরেজের কোম্পানি আর কোন মহাজনের কাপড় বুনিতে পারিবে না ইহাত তাতীলোক আমাদের কাপড় বুনিতে রাজ জদি ছাপীয়া আমাদের কাপড় কেহ বোনে তাহা ছেনাইয়া লন এবং মারপিট করেন ইহাতে আমাদিগের কর্ম্মবন্ধ হইয়াছে—জাহাতে কাজ চলে এমন তদারক করিতে হুকুম হয়।"

৪। বহুলোকের স্বাক্ষরিত বীরভূম জিলার জজ সাহেবের নিকট দেওঘর বৈদ্যনাথ মন্দিরের ওঝা নিযুক্তির জন্য ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসের এক আর্জিপত্র : "আগে শ্রীশ্রী৺ঠাকুরের ওঝাগিরি কার্য্যের রামদত্ত ঝা ছিলেন তাহার ৺প্রাপ্তি হইলে হযুরের হুকুম মত ঝামত ওঝার (?) পুত্র শ্রীযুত আনন্দ দত্ত ওঝা সকল কার্য্যে খবর গিরি যুন্দর মত করিতেছেন কিন্তু ওঝা গিরি কার্য্যে নিযুক্ত না হওআতে শ্রীশ্রী৺ঠাকুরের সেবার অনেক কার্য্য আটক হইতেছেক তাহাতে যাত্রিক লোকের মনের খেদ হয়ে সংপ্রতিক ফালগুন মাসের সিবরাত্রির ব্রত নিকট হইতেছে নানাদেসের লোক দরসনে আসিবেক ইহার মৈদ্ধে ওঝাগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বড় ভালো হয়ে।"[২]

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত এবং বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'চিঠিপত্রে সমাজ চিত্র' নামক গ্রন্থে বহু চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে তিনখানি চিঠির কিয়ৎ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

১। বাংলা ১১৯৬ সনে (১৭৮৯ খ্রীঃ) লিখিত।

"আমার দ্বিতিয় কন্যার যুভ বিবাহ ২৯ ওনত্রিষ্যা অগ্রহায়ন রবিবার হইবেক অতয়েব অনুগ্রহপূর্ব্বক মহাশয় এবাটীকে আশীয়া যুভকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে আজ্ঞা হইবেক শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম।"

২। বাংলা ১২০১ সালে (১৭৯৪ খ্রীঃ) লিখিত।

"১০ পৌষ রবিবার দিবষ আমার পীতা ঠাকুরের শ্র্যার্দ্ধ আমার পুরহিত শ্রীযুত মধ্যম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে আশীতে পত্র লিখিতেছী তিহো বাড়িতে থাকেন তাহাকে অগুই আশীতে কহিবেন বাড়িতে না থাকেন তাঁহার তরফ জনেক ব্রাহ্মণকে পাঠাইবেন এখানের ক্রীয়া করাইয়া জায় ইহা নিবেদন করিলাম ইতি।"

৩। ১১৯৮ সনে (১৭৯১ খ্রীঃ) লিখিত ব্যবসায়ীর পত্র।

"শ্রীযুত কালীপ্রসাদ ঘোষজা খুড়া এখান হইতে দিবস আষ্টেক হইল মোকামে গিয়াছেন সকল কথা তাঁহার সাক্ষ্যাতে কহিয়াছি তাহাতেই জ্ঞাত হইয়া থাকিবা। অদ্যাপি কাপড় পাঠাইলা না এখানে ইঙ্গেরের সহিত কাপড় সওদা করিয়াছি অতয়েব রাতি বিরতে জে ষুরতে কাপড় আসিয়া পহুঁছে তাহা করিবা জল এইক্ষ্যনে হইল না মোকাম কাটঙায় নৌকাজোগে জে প্রকারে রাহি হয় তাহা করিবা কদাচ গৌন করিবা না গৌন হইলে সওদা চটিবেক আর আমাকে খেসারত দিতে হবেক ইহা বুঝিয়া কার্য্য করিবা আর কাপড় জত তৈয়ার থাকে তাহাই এ চালানে পাঠাইবা এখন জে কাপড় আসিবেক তাহাই বিক্রী হবেক ইহার পর গৌনে জে কাপড় আসিবেক তাহা বিক্রী হওয়া ভার হবেক।"

উপরে নানাশ্রেণীর লোকের রচিত বাংলা গদ্যের যে সমুদয় নমুনা উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাংলা গদ্য ভাষা সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী হইয়া উঠে নাই, তবে ইহার সম্ভাবনা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু ইহার অল্পকালের মধ্যেই বাংলা গদ্য একটি শক্তিশালী সাহিত্যের বাহন হইয়া উঠিল।

(খ) বাংলা গদ্য সাহিত্যে ইংরেজের অবদান

বাংলা গদ্যের এই সমৃদ্ধি সাধনে ইংরেজ কর্মচারীদের ও মিশনারীদের অবদান নিতান্ত সামান্য নহে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ানি ও পরে ক্রমে ক্রমে ইহার শাসনভার গ্রহণ করার পর হইতে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে। ইহার ফলে কোম্পানির অন্যতম প্রধান কর্মচারী ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ইংরেজী ভাষায় বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনা ও প্রকাশ করেন (১৭৭৮)। এই গ্রন্থের মধ্যেই সর্বপ্রথম বাংলা ছাপার হরফ ব্যবহৃত হয়। ইহার পরে জোনাথান ডানকান, এন. বি. এডমনষ্টোন, হেনরি ফরস্টার প্রভৃতি ইংরেজ লেখকগণ একাধিক আইনগ্রন্থ ইংরাজী হইতে বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করেন। জোনাথান ডানকানের অনূদিত আইন-গ্রন্থটি ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং এইটিই প্রথম বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা গ্রন্থ। এডমনস্টোন ও ফরস্টারের অনূদিত গ্রন্থদ্বয় যথাক্রমে ১৭৯১ ও ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এ. আপজন রচিত 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলারি' (ইংরেজী ও বাংলা শব্দকোষ) এবং জন মিলারের 'The Tutor' বা 'শিক্ষ্যা (sic) গুরু'—এই দুইটি শব্দ শিক্ষাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

এই বইগুলি রচনারীতির দিক দিয়া তেমন উল্লেখযোগ্য না হইলেও আরবী ও ফারসী শব্দ যথাসাধ্য বর্জন করিয়া বাংলা ভাষাকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দেয়।

ইহার অব্যবহিত পরে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরীরা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় বাইবেল অনুবাদ ও খ্রীষ্টচরিত সম্বন্ধীয় নিবন্ধ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জন টমাস ও উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)। তাঁহাদের সহযোগী ছিলেন জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড। রামরাম বসুর সাহায্যে টমাস ম্যাথু, মার্ক, জন প্রভৃতির গসপেল বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, মার্শম্যান এবং ওয়ার্ডও বাইবেলের কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। এইগুলি কেরীর অনুবাদের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কেরীর বাইবেলের অনুবাদ (যাহা অংশত টমাস, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের লেখনী প্রসূত) 'ধর্মপুস্তক' নামে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা ২৬টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বর্তমানকালের বিচারে কেরীর 'ধর্মপুস্তক'-এর ভাষা অপূর্ণাঙ্গ ও অমার্জিত হইলেও বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে একজন বিদেশীর রচনা-প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ইহার ভাষার কিছু নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হইল।

"দুই বৎসর পূর্ণ হইলে এত মত হইলে ফারোণ্ডা স্বপ্ন দেখিলেন। দেখ সে ডাণ্ডাইয়াছে নদীর কিনারায়; দেখ নদী হইতে উঠিল সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট সাতটা গাভী ও চরিতে লাগিল ধারের উপর; তাহার পরে আর সাতটা গাভী উঠিল নদী হইতে বড় কুচ্ছিত আর কৃশা, পরে নদিতীরে ডাণ্ডাইল আর সকল গাভীর কাছে; অতঃপর কুচ্ছিত কৃশা গাভীরা খাইয়া ফেলাইল সেই সাতটা সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট গাভীদিগকে। তখন ফারোণ্ডার চৈতন্য হইল।"[৩]

কেরীর বাইবেল-অনুবাদ প্রকাশের কয়েক মাস পূর্বে শ্রীরামপুর হইতে বাইবেলের The Gospel According to St. Mathew অংশ মূল গ্রীক হইতে অনূদিত হইয়া 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা কাহার রচনা তাহা জানা যায় না, তবে ইহার ভাষা সরল ও তদ্ভব-শব্দ-বহুল। কেরী ইংরেজী ভাষায় *A Grammar of the Bengali Language* নামে একটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত) এবং *A Dictionary of the Bengali Language* নামে একটি বাংলা-ইংরেজী অভিধানও (প্রথম খণ্ড ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত)

প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কেরী বাংলা ভাষাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন।

কেরী-কৃত বাইবেলের বঙ্গানুবাদ অল্পকালের মধ্যেই সবিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করে এবং কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন।

বাংলা গদ্যের উন্নতি সাধনে শ্রীরামপুর মিশনও দীর্ঘকাল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। জোশুয়া মার্শম্যান সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্র 'সমাচার দর্পণ' সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে। তাহার পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন ইহাদের নাম 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৩১), 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণ' (প্রথম খণ্ড ১৮৩১, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৩৬), 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ' (১৮৩৩), 'দেওয়ানি আইনের সংগ্রহ' (১৮৪৩), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৪৮) এবং 'দারোগাদের কর্ম প্রদর্শক গ্রন্থ' (১৮৫১)। মার্শম্যানের ভাষা অত্যন্ত সহজ ও অনাড়ম্বর। নানা দুরূহ বিষয় ও মৌলিক চিন্তাকে বাংলা গদ্যে সরলভাবে প্রকাশ করিয়া তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মার্শম্যান কেরীর বাংলা-ইংরেজী অভিধানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং নিজে একটি ইংরেজী-বাংলা অভিধান প্রণয়ন করেন।

উইলিয়ম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরীও উৎকৃষ্ট বাংলা গদ্য লিখিতে পারিতেন। তিনি 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা' (১৮২০), 'ব্রিটিন্ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (১৮২০), 'যাত্রিদের অগ্রেসর-বিবরণ' (১৮২১) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা'তে (ইহা একটি অসম্পূর্ণ কোষগ্রন্থের প্রথম খণ্ড) তিনি দুই জন বাঙালী পণ্ডিতের এবং পিতা উইলিয়ম কেরীর সাহায্য অবলম্বনে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ফেলিক্স কেরীই বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানচর্চা করিয়াছেন। ফেলিক্স কেরী ও জন ক্লার্ক মার্শম্যান নিতান্ত শৈশব কাল হইতেই বাংলা দেশে মানুষ হইয়াছিলেন এবং সেই বয়স হইতেই পিতাদের উৎসাহে খুব ভালভাবে বাংলা শিখিয়াছিলেন। ফলে ইহারা বাঙালীর মতই বাংলা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। সুতরাং ইহাদের বাংলা রচনা বাঙালীর রচনা হিসাবেই বিচার করা উচিত।

ইহাদের সমসাময়িক ও সহযোগী—শ্রীরামপুর মিশনের আর একজন কর্মী—স্কচ লেখক জন ম্যাক সরল বাংলা গদ্যে 'কিমিয়া বিদ্যার সার' (১৮৩৪) নামে একটি রসায়নবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ইঁহাদেরই সমসাময়িক—শ্রীরামপুর মিশনের আর একজন পাদ্রী—উইলিয়ম ইয়েট্‌স্ সরল বাংলা গদ্যে 'পদার্থবিদ্যাসার' (১৮২৫), 'জ্যোতির্বিদ্যা' (১৮৩০), 'সত্য ইতিহাস সার' (১৮৩০), 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়' (১৮৩০) ও 'সারসংগ্রহ' (১৮৪৪) নামে কয়েকটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সম্ভবত শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রীদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বর্ধমানস্থিত প্রভিনসিয়াল ব্যাটালিয়নের অ্যাডজুটাণ্ট ক্যাপ্টেন জেমস স্টুয়ার্ট ও বাংলা গদ্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন এবং 'ইতিহাস কথা' (১৮১৬) ও 'তমোনাশক' (১৮১৮) নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার প্রথম 'বর্ণমালা' (১৮১৮) ইনিই রচনা করেন।

(গ) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন; বর্তমান মহাকরণ বা Writers' Building-এ এই কলেজ অবস্থিত ছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের (ইহাদিগকে তখন Writer বলা হইত) বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা এবং এদেশের ইতিহাস ও সমাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময়ে ভারতীয় ভাষাগুলিতে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব ছিল বলিয়া এই কলেজের অধিকাংশ শিক্ষক ও কোন কোন কর্মচারী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বাংলা গদ্যে রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

উইলিয়ম কেরী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত, বাংলা ও মারাঠি ভাষার অধ্যাপক এবং বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন (১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে)। নিযুক্ত হইবার পরে কেরী তাঁহার কয়েকজন সহকর্মীর উপর বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার দেন। ইহার ফলে রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ, গদ্যে রচিত প্রথম বাংলা জীবনীগ্রন্থ, এবং বাঙালীর লেখা প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ। ইহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"এক দিবস রাজার বাহির গড়ের সেনাপতি কমল খোজা নামে একজন মহা পরাক্রান্ত এবং রাজার কাছে বড়ই প্রতিপন্ন হাত যোড় করিয়া নিবেদন করিল রাজার গোচরে। মহারাজা আমি দুই তিন দিবস হইতে দেখিতেছি রাত্রি দুই

প্রহরের পরে ঐ জঙ্গলটাতে অকস্মাত অগ্নি আকার প্রজ্বলিত হয় বড়ই দীপ্তিকর প্রচণ্ড অনলের ন্যায় তাহাতে প্রথম ঠাওরাইলাম বুঝি কোন রাখাল ইত্যাদি লোক এ বনে অগ্নি দিয়া থাকিবেক তাহাতে রাত্রে প্রজ্বলিত হইয়াছে। প্রাতে ঘোড় শোয়ারিতে যাইয়া দেখিলাম বন পূর্ব্ব মতই আছে বরং অধিক তেজস্ব। দুই তিন দিবস হইতে আমি এই মত দেখিতেছি। মহারাজা আমাকে ভ্রান্ত জ্ঞান করিবেন এ পরাভয় প্রযুক্ত নিবেদন করি নাই।"[৪]

অনেকে এই গ্রন্থের ভাষাকে অপরিণত ও বিশৃঙ্খল বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কিছু কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও যে ইহা সাধু বাংলা ভাষাই তাহাতে কোন সন্দেহ নাই তবে ইহার মধ্যে আরবী ও ফারসী শব্দের আধিক্য দেখা যায়।

রামরাম বসুর আর একটি গ্রন্থ—'লিপিমালা'—১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ পত্রাকারে রচিত কতকগুলি প্রস্তাবের সমষ্টি। এই গ্রন্থে লেখক সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অন্বয়ের দোষ পরিহার করিয়া এবং ফারসী শব্দের মোহ কাটাইয়া সরল সুখপাঠ্য বাংলা গদ্য রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

'লিপিমালা'র অব্যবহিত পরে গোলোকনাথ শর্মা নামক একজন পণ্ডিত কৃত 'হিতোপদেশ' এর বাংলানুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার ভাষা অনেকটা অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী পণ্ডিতদের গদ্য-রচনার মত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অপর দুইজন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামকিশোর তর্কচূড়ামণিও 'হিতোপদেশ'-এর বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামকিশোরের অনুবাদটি (১৮০৮-এ প্রকাশিত) বর্তমানে আর পাওয়া যায় না।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট লেখকদের অন্যতম। তাঁহার রচিত গদ্য যে তখনকার মান অনুসারে অতি উৎকৃষ্ট গদ্য কেবল তাহাই নহে—তাহার মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের সংযোগ সাধিত হইয়াছে। বাংলা গদ্যের প্রায় সমস্ত রীতির পরীক্ষাই সেই সুদূর অতীত-কালে তিনি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২) সংস্কৃত গ্রন্থ 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা'র ছায়ানুবাদ। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ রচনার সৌন্দর্য হানি করিয়াছে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের সতেজ প্রকাশভঙ্গী ও সবল শব্দবিন্যাসের পরিচয় তাঁহার এই প্রথম গ্রন্থেই পরিস্ফুট। ইহার ভাষার নিদর্শন:

"অবন্তী নাম নগরেতে ভর্তৃহরি নামে রাজা ছিলেন তাঁহার অভিষেককালে শ্রীবিক্রমাদিত্য নামে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপমান পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ

করিয়া বিদেশে গেলেন। শ্রীভর্তৃহরি অভিষিক্ত হইয়া পুত্রতুল্য প্রজাপালন দুষ্টের দমন এইরূপে পৃথিবী পালন করেন।..... সেই নগরে এক ব্রাহ্মণ ভুবনেশ্বরী দেবীর আরাধনা করেন আরাধনাতে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী প্রত্যক্ষ হইলেন ও কহিলেন। হে ব্রাহ্মণ বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ অনেক স্তব বিনয় করিয়া কহিল হে দেবি আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হইয়াছেন তবে আমাকে অজরামর করুন।"

মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) সংস্কৃত গ্রন্থের মূলানুবাদ হওয়ার ফলে অপেক্ষাকৃত কঠিন কিন্তু গোলোকনাথের 'হিতোপদেশে'র সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে, মৃত্যুঞ্জয়ের সাহিত্যিক চেতনা তাঁহার অনুবাদকে কতখানি সরস করিয়া তুলিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়ের তৃতীয় গ্রন্থ 'রাজাবলি' (১৮০৮)। এই গ্রন্থে কলিযুগের আরম্ভ হইতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থে মৃত্যুঞ্জয় একাধিক রচনারীতি অনুসরণ করিয়াছেন, স্থানে স্থানে আরবী ফারসী শব্দের ব্যবহার করিতেও দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার পূর্বের দুইখানি গ্রন্থের তুলনায় এই গ্রন্থের ভাষা অধিকতর সার্থক হইয়াছে। 'রাজাবলির ভাষার নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

"কান্যকুব্জ দেশের রাজা জয়চন্দ্র রাঠোর মহাবলপরাক্রম ছিলেন এবং বড় ধনী ছিলেন কাহাকে বলেতে কাহাকে প্রীতিতে এইরূপে প্রায় কুমারিকাখণ্ডস্থ সকল রাজাকে আপন বশীভূত করিয়াছিলেন তাঁহার অনঙ্গমঞ্জরী নামে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক কন্যা ছিলেন তাঁহার বিবাহের নিমিত্তে যে যে বর উপস্থিত হয় তাহারদের মধ্যে কেহ তাঁহার মনোনীত হইল না। পরে রাজা এক দিবস উদ্বিগ্ন হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।...রাজকন্যা কহিলেন আমি এই মনে করিয়াছি আপনি এক রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করুন তাহাতে সকল রাজারদের নিমন্ত্রণ করুন তবে সকল রাজারা অবশ্য আসিবেন সেই রাজারদের মধ্যে আপন মনোনীত যে রাজাকে দেখিব তাহাকে স্বয়ং বরণ করিব।"[৫]

'রাজাবলি'র চারি পাঁচ বৎসর পরে মৃত্যুঞ্জয় 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' রচনা করেন। ইহার মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্মৃতি, ব্যবহার, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি বহু শাস্ত্রের মর্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং অনেক উপাখ্যান আছে। বইটি মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যুর (১৮১৯) চৌদ্দ বৎসর পর প্রকাশিত হয় (১৮৩৩)।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের আর একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাহিরে প্রকাশিত 'বেদান্তচন্দ্রিকা'। বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের মত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে মৃত্যুঞ্জয় এই গ্রন্থ রচনা করেন। স্থানে স্থানে ইহার ভাষা

আক্রমণাত্মক হইলেও ইহাতে মৃত্যুঞ্জয় শিশু বাংলা গদ্যকে বিতর্কের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিয়া শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আদি পর্বের অন্যান্য লেখকদের রচনাবলীর মধ্যে তারিণীচরণ মিত্রের 'ঈশপের গল্পাবলী' ('ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট' নামক বহুভাষিক গ্রন্থের বাংলা অংশ—১৮০৩), চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫), রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্‌' (১৮০৫) এবং হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা'র (১৮১৫) নাম উল্লেখযোগ্য। তারিণীচরণ স্থানে স্থানে ইংরাজী ও ফারসী বাক্যগঠনরীতি অনুসরণ করিলেও তাঁহার ভাষা মার্জিত ও প্রাঞ্জল। 'তোতা ইতিহাস' 'তুতি নামা' নামে একটি ফারসী গ্রন্থের হিন্দুস্থানী অনুবাদের অনুবাদ। ইহাতে ফারসী শব্দের কিছু আধিক্য থাকিলেও বইটি সুখপাঠ্য—ইহার ভাষা অত্যন্ত সরল এবং কাহিনী-কথনের উপযোগী, তাহাতে অনুবাদের আড়ষ্টতা নাই। 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায়স্য চরিত্রম্‌' রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'র আদর্শে রচিত। অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার কর্তৃপদের অপ্রয়োগ এবং ফারসী "তক" শব্দের অতিপ্রয়োগ প্রভৃতি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহার ভাষা বেশ সরল ও মার্জিত, বাক্যের হ্রস্বতা ইহার বিশেষত্ব। এই গ্রন্থের ভাষার নিদর্শন নিম্নে দেওয়া হইল।

"এক দিবস জগৎসেটের বাটীতে রাজা মহেন্দ্র প্রভৃতি সকলে বসিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে আহ্বান করিলেন দূত আসিয়া রাজাকে লইয়া গেল যথাযোগ্য স্থানে সকলে বসিলেন। ক্ষণেক পরে রাজা রামনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন আপনারা সকলেই বিবেচনা করুণ দেশাধিকারী অতিশয় দুর্বৃত্ত উত্তর ২ দৌরাত্ম্যের বৃদ্ধি হইতেছে অতএব কি করা যায়।……

"পশ্চাৎ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিবেদন করিলেন এ দেশের উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এককালীন এত হয় না প্রথম যিনি দেশাধিকারী ইহার সর্ব্বদা পরানিষ্ট চিন্তা এবং যেখানে শুনেন সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহা বলক্রমে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে জাতি প্রাণ নষ্ট করেন দ্বিতীয় বরগী আসিয়া দেশ লুট করে তাহাতে মনোযোগ নাই তৃতীয় সন্ন্যাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে তাহাই ভাঙ্গিয়া কাষ্ঠ করে তাহা কেহ নিবারণ করে না।"[৬]

উইলিয়ম কেরীর নিজের নামেও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে দুইটি বই প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের একটির নাম 'কথোপকথন' (১৮০১), অপরটির নাম 'ইতিহাস মালা' (১৮১২)। 'কথোপকথন' দ্বিভাষিক গ্রন্থ, তাহার প্রতি

পাতার এক পৃষ্ঠা বাংলায় রচিত, অপর পৃষ্ঠা ইংরেজীতে। এই বইয়ে বিদেশীদের শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙালীর কথ্য ভাষার নমুনা সংগৃহীত হইয়াছে ; অবশ্য অবিমিশ্র সাধুভাষার রচনাও কয়েকটি আছে। 'কথোপকথন' হইতে বাংলা কথ্যভাষার খাঁটি উদাহরণ এবং বাঙালী সমাজের বাস্তব ও অন্তরঙ্গ যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সে যুগের অন্য কোন বইয়ে মিলে না। 'ইতিহাস মালা' প্রচলিত দেশী গল্প, সংস্কৃত কাহিনী ও ঐতিহাসিক কিংবদন্তীর একখানি সংকলন-গ্রন্থ। ইহার ভাষা—কয়েকটি গল্পের সংস্কৃতানুগ ভাষা বাদ দিলে—উন্নত স্তরের প্রাঞ্জল সাধুভাষা। বইটি মোটের উপর সুখপাঠ্য। প্রথম বাংলা গল্প-সংকলন হিসাবে 'ইতিহাসমালা'র একটি ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কেরী প্রকৃত পক্ষে এই বই দুইখানির রচয়িতা কিনা, সে সম্বন্ধে বিতর্ক আছে। কেরীর নিজস্ব রচনা 'ধর্মপুস্তক'-এর (কেরীর জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণ ১৮৩২-৩৩) ভাষা এই দুইটি বইয়ের ভাষার তুলনায় অনেক পঙ্গু ও আড়ষ্ট। 'কথোপকথন'-এর অন্তত কতকাংশ যে কেরীর লেখনীনিঃসৃত নহে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই ; কারণ কেরী এই বইয়ের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে ইহার গার্হস্থ্য বিষয় সংক্রান্ত সংলাপগুলি তিনি বিজ্ঞ বাঙালীদের ("sensible natives") দিয়া লিখাইয়াছিলেন। কেরী সম্ভবত এই দুটি গ্রন্থের সংকলন ও সম্পাদনা মাত্র করিয়াছিলেন ; অবশ্য তাহা করিয়া থাকিলেও তাঁহার কৃতিত্ব কম নহে। এই দুইটি বইয়ের ভাষার নিদর্শন নীচে উদ্ধৃত হইল।

(১) গ্রাম্য অশিক্ষিত নারী মজুরের কথাবার্তার নমুনা।

"ফলনা কায়েতের বাড়ী মুই কায করিতে গিয়াছিনু তার বাড়ী অনেক কায আছে। তুই যাবি।

না ভাই। মুই সে বাড়ীতে কায করিতে যাব না তারা বড় ঠেঁটা। মুই আর বছর তার বাড়ী কায করিয়াছিলাম মোর দুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বেটার বাড়ী আর যাব না।"[৭] (কথোপকথন)

(২) "সাধু স্বভাব এক ব্যক্তি পথে যাইতেছিলেন তথাতে এক সরোবরে কথগুলি লোক বড়িশীতে মাংসাদি অর্পণ করিয়া মৎস্য ধরিতেছে মৎস্য সকল আহারার্থ আসিয়া আপন ২ প্রাণ দিতেছে ঐ সাধু এইরূপ দেখিয়া নিকটস্থিত এক রাজসভাতে গিয়া কহিলেন অদ্য পুষ্করিণীর তটে আশ্চর্য দেখিলাম সভাস্থিত ব্যক্তিরা কহিল কি তিনি কহিলেন দাতা ব্যক্তি নরকে যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণত্যাগ করিতেছে..."[৮] (ইতিহাসমালা)

হেনরি সারজ্যাণ্ট নামে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একজন ছাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিষয়বস্তু অবলম্বনে বাংলা গদ্যে 'শ্রীমদ্ভাগবত' নামে একটি ছোট বই লিখিয়াছিলেন। বইটি মুদ্রিত হয় নাই, ইহার পাণ্ডুলিপি বর্তমানে এসিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে। ইহার ভাষা অনেক স্থানে বেশ সরল, কিন্তু স্থানে স্থানে বিদেশীয়ানা উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত : "ঈশ্বরের অত্যন্তাবির্ভাব দ্বারা তেজস্পুঞ্জা এবং উজ্জ্বলকারীরা", "ঈশ্বরীয়াষ্টহস্তপ্রকাশিত আশ্চর্য্য সন্তান"।

বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত প্রথম যুগের পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়া অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই বাংলা গদ্যের অনেকখানি অগ্রগতি সাধিত হইয়াছিল। কালক্রমে বহু লেখকের বহু আয়াসে ও সাধনায় বাংলা গদ্যের যে রমণীয় মূর্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল, এই গ্রন্থগুলিকে তাহার কাঠামো বলা যাইতে পারে।

বাংলা গদ্যের সহিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আরও একটু সম্পর্ক আছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪১-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিত এবং ১৮৪৭-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কলেজের প্রধান কেরানী ও খাজাঞ্চির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রথম দুইটি গ্রন্থ 'বাসুদেব চরিত' ও 'বেতালপঞ্চবিংশতি'—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেই রচিত হইয়াছিল। প্রথমটি মুদ্রিত না হইলেও দ্বিতীয়টি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত হইয়া (১৮৪৭) বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করে। বিদ্যাসাগরের 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতেই প্রকাশিত হিন্দী গ্রন্থ 'বেতাল-পচ্চিসী' (১৮০৫) অবলম্বনে রচিত।

(ঘ) রামমোহন রায়

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ কর্তৃক বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হওয়ার কয়েক বৎসর পরেই মনস্বী রামমোহন রায় (১৭৭২(?)-১৮৩৩) বাংলা গদ্য সাহিত্যে গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনা দ্বারা ইহার মর্যাদা ও পরিসর বৃদ্ধি করেন। তাঁহার প্রথম দুই পুস্তক 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' ১৮১৫ খ্রী:, 'তলবকার উপনিষৎ' (কেনোপনিষৎ) ও ঈশোপনিষৎ ১৮১৬, মুণ্ডকোপনিষৎ ১৮১৯, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার ১৮১৬-১৭, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার ১৮১৭, সহমরণ বিষয়ে তিনখানি গ্রন্থ (১৮১৮, ১৮১৯, ১৮২৩), পথ্যপ্রদান ১৮২৩,

বজ্রসূচী ১৮২৭, ও গৌড়ীয় ব্যাকরণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়াও তিনি আরও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। রামমোহনের ভাষার দুইটী নমুনা দিতেছি।

(১) "এস্থানে এক আশ্চর্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থবিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারি আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না আপনার বংশের পরম্পরা মতে আর কেহ ২ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেইরূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব।"[৯]

(২) দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন...[১০]

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে রামমোহনের স্থান যে অতি উচ্চে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা, বহুকাল অবধি এই মত প্রচলিত থাকিলেও ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। কারণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই যে সমুদয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাহার সাবলীল ও সহজ রচনারীতি সাহিত্যের বাহন হিসাবে রামমোহনের রচনারীতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখিয়াছেন "এখনকার দিনে ছেদচিহ্ন বিরল রামমোহনের বাক্যাবলী উদ্ভট ঠেকিতে পারে কিন্তু সে সময়ের কলেজি রচনার সঙ্গে মিশাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে কেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত প্রাচীনতার ভক্তও বলিয়াছিলেন, "দেওয়ানজী জলের মত বাংলা লিখিতেন।"[১১]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের রচনার যে নমুনা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার সহিত রামমোহনের ভাষার তুলনা করিলে এই উক্তি কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

সুকুমারবাবু আরও বলিয়াছেন যে "বিচার-বিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসাবে প্রথম ব্যবহারে লাগাইয়া (রামমোহন) বাংলা গদ্যকে জাতে তুলিলেন।" কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ও 'প্রবোধ

চন্দ্রিকা' নামক দুই গ্রন্থে বিচার বিশ্লেষণে উচ্চতর চিন্তার বাহন হিসাবে বাংলা ভাষারই ব্যবহার করিয়াছেন। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ১৮১৭ ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। অবশ্য এই দুই গ্রন্থের ভাষা ১৬ বৎসর পূর্বে রচিত গ্রন্থের মত সরল নহে, সংস্কৃত-বহুল; কিন্তু রামমোহনের শাস্ত্র বিচারের ভাষা হইতে খুব নিকৃষ্ট মনে হয় না। দুয়ের ভাষার তুলনা করিলেই তাহা বোঝা যাইবে।

১। রামমোহনের ভাষা:

"কেহ কেহ কহেন ব্রহ্মপ্রাপ্তি যেমন রাজ প্রাপ্তি হয়। সেই রাজ প্রাপ্তি তাঁহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেকে হইতে পারে না সেইরূপ রূপগুণ বিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবেক না।...ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী আর যাঁহাকে তাহার দ্বারী কহ তেহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন কখন তাঁহার স্থিতি হয় কখন স্থিতি না হয় কখন নিকটস্থ কখন দূরস্থ অতএব কিরূপে এমত বস্তুকে অন্তর্য্যামী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন কহা যায়।" (বেদান্ত গ্রন্থ—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় পৃঃ ১৭৫৪-৫)

২। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা—"আর যদি মন্দির মসজিদ গীর্জা প্রভৃতি যে কোন স্থানে যে কোন বিহিত ক্রিয়া দ্বারা শূন্য স্থানে ঈশ্বর উপাস্য হন তবে কি সুঘটিত স্বর্ণমৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠাদিতে ঐ ঈশ্বরের উপাসনা করাতে ঈশ্বরের অসম্মান করা হয় কিম্বা দৃষ্টি কৌরূপ্য হয়...কিংবা সর্ব্বত্রগ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর অন্যত্র প্রতিমাদিতে পূজাস্তবাদি যাহা যাহা হয় তাহা দেখিতে পান না ও শুনিতে পান না" (বেদান্ত চন্দ্রিকা ২০৭ পৃঃ)

শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন রামমোহনের দাবির সপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু গুপ্ত কবির সমসাময়িক দেওয়ান রামকমল সেন মহাশয় ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *A Dictionary in English and Bengalee* গ্রন্থে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে বাংলা গদ্য সাহিত্য সৃষ্টির কৃতিত্ব কেরী সাহেব ও তাঁহার সহযোগীদেরই প্রাপ্য।[১২] বর্তমান যুগে ডক্টর সুশীলকুমার দে ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছেন।[১৩]

'রামমোহন রায় বাংলা গদ্যের জনক', এই মত যখন প্রচলিত হয়, তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের গ্রন্থগুলি খুব সুপরিচিত ছিল না। এই সমুদয়ের উল্লেখ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: "বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দের দান অপরিসীম। তাঁহারা সকলেই রামমোহনের পূর্বগামী।"[১৪]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা গদ্য-গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রামমোহন সংশোধন করিয়াছিলেন—এই কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ডক্টর মনোমোহন ঘোষ বাংলা গদ্যের জনকত্বের গৌরব রামমোহনকে দিতে চাহেন।[১৫] কিন্তু ঐ কিংবদন্তী অলীক বলিয়া মনে হয়। তা ছাড়া অন্যের রচনা সংশোধন করাকে যদি বাংলা গদ্যের জনক-পদবাচ্য হইবার যোগ্যতা বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলে রামরাম বসুই বাংলা গদ্যের জনক, কারণ ইহার পূর্বেই তিনি টমাসের বাংলা গদ্য-রচনার ভাষা সংশোধন করিয়াছিলেন।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে একথা স্বীকার করা কঠিন যে রামমোহন রায়ই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক। তিনি বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন বা হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন, ইত্যাদি দাবি বহুল প্রচার সত্ত্বেও ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনকত্বও অনুরূপ ভ্রান্ত ধারণা। যে কোন মহৎ ব্যক্তির মুগ্ধ ভক্তগণের স্বভাব এই যে যাহা কিছু ভাল বা নূতন তাহার সকলের কৃতিত্বই ঐ একজনকে দিবার আগ্রহ হয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে।

কিন্তু রামমোহন রায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা নহেন ইহাও যে পরিমাণ সত্য, ইহার উন্নতি সাধনে তাঁহার দান যে অপরিসীম তাহাও তেমনি সত্য। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থ এবং তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ বহুলসংখ্যায় রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যে ভাবের গভীরতা ও ভাষার শব্দসম্পদ অনেক বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং বাক্য-বিন্যাস রীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়া বাংলা ভাষাকে সতেজ ও পুষ্ট করিয়াছেন।

রামমোহন কবিও ছিলেন। তাঁহার লেখা অনেকগুলি পরমার্থবিষয়ক গান 'ব্রহ্মসঙ্গীত' (১৮২৮) নামক গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বাংলা পদ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ এখন আর পাওয়া যায় না।

পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া এই সময় হইতে বাংলা সাময়িক পত্রও গদ্য সাহিত্য পুষ্টির বিশেষ সহায়তা করে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক "দিগ্‌দর্শন" এবং "সাপ্তাহিক বাঙ্গাল গেজেটি" ও "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে একমাত্র 'সমাচার দর্পণ' দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮২১ সনে "ব্রাহ্মণ সেবধি" ও "সম্বাদ কৌমুদী" প্রকাশিত হয়। রাজা রামমোহন রায় এই দুইটি পত্রিকার সহিতই বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী'র

অন্যতম প্রকাশক হইলেও ইহাতে সহমরণ প্রথার সমর্থন থাকায় ইহার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে সনাতনপন্থী নূতন একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন (১৮২২ খ্রীঃ)। ইহার পর বাংলা ভাষায় লিখিত বহু সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সমুদয় পত্রিকা বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রসারে ও উন্নতিতে যে কতদূর সাহায্য করিয়াছিল এবং ইহাদের প্রচারের ফলে বাংলা গদ্য ভাষা ও সাহিত্য যে কিরূপ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার সবিস্তার পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নহে। এই গ্রন্থের অন্যত্র বাংলা সাময়িক পত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি এবং এই গ্রন্থে সাময়িক পত্রগুলি হইতে যে বহু সংখ্যক উদ্ধৃতি আছে তাহা হইতেই ইহাদের গদ্য ভাষার রীতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাইবে। নিছক সাহিত্যের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ১২৫০ বাংলা সনে প্রকাশিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র অবদান খুবই মূল্যবান। ইহার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ইহার নিয়মিত লেখকবৃন্দের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণ। ইহাদের এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন সংবাদপত্রের লেখকগণের রচনায় পরিপুষ্ট হইয়া বাংলা সাহিত্যের বিশেষতঃ বাংলা ভাষার যে অপরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(ঙ) রামমোহনের পরবর্তী কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক

পূর্বোক্ত বাংলা গদ্য-গ্রন্থগুলির পরে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ নূতন গদ্য রীতিতে লিখিত হয়। ইহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনখানি গ্রন্থ—'নববাবু বিলাস' (১৮২৩ খ্রীঃ) 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩ খ্রীঃ) ও 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১ খ্রীঃ)[১৬] গদ্য সাহিত্যে তাঁহার লিপি-কুশলতার পরিচয় দেয়। যে কথ্য ভাষার প্রবর্তক হিসাবে "আলালের ঘরের দুলাল" প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এই তিনখানি গ্রন্থেই তাহার পূর্ব পরিচয় পাওয়া যায়।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ও প্রধান লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) বহু গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ভূগোল' (১৮৪১), 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' দুই খণ্ড (১৮৫২, ১৮৫৩), 'চারুপাঠ' তিন খণ্ড (১৮৫২, ১৮৫৪, ১৮৫৯), 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬), পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) এবং 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' দুই খণ্ড (১৮৭০, ১৮৮৩)। অক্ষয়কুমারের গদ্য-রীতি সহজ, পরিমিত এবং প্রকাশক্ষম, তবে তাহার মধ্যে স্বচ্ছন্দতা ও সাবলীলতার কিছু অভাব দেখা যায়। তাঁহার

সমস্ত রচনাই জ্ঞানপ্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত; ইহাদের অধিকাংশই ইংরেজ লেখকদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত। 'চারুপাঠ'-এর কয়েকটি প্রবন্ধে, বিশেষভাবে 'স্বপ্নদর্শন'-শীর্ষক তিনটি রূপক রচনার মধ্যে সাহিত্যরসের কিছু আস্বাদ পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাখ্যা করিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ও বক্তৃতা দিয়াছিলেন; সেগুলি প্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত ও পরে 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' (১৮৬১) প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের ভাষা অত্যন্ত সরল, উপরন্তু তাহাতে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও গভীর অধ্যাত্ম-অনুভূতির পরিচয় প্রস্ফুটিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের বৃদ্ধবয়সে রচিত 'আত্মজীবনী' (১৮৯৮) অত্যন্ত উপাদেয় সৃষ্টি—একাধারে তথ্যপূর্ণ ও সাহিত্যরসাপ্লুত রচনা।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) প্রধানতঃ খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক হিসাবে বিখ্যাত হইলেও বাংলা গদ্যের রচয়িতা হিসাবে তাঁহার দান অল্প নহে। 'ষড়দর্শন-সংবাদ' (১৮৬৭) এবং তের খণ্ডে বিভক্ত প্রথম বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়া 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৮৪৬-১৮৫১) তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রচনাশৈলীর নিদর্শন বহন করিতেছে। কৃষ্ণমোহনের গদ্যরীতি সহজ, তবে তাহার মধ্যে প্রসাদগুণের অভাব আছে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭-১৮৫৮) 'শিশুশিক্ষা' নামে তিন খণ্ডে যে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে প্রাঞ্জল ও উৎকৃষ্ট গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। মদনমোহন 'রসতরঙ্গিণী' (১৮৩৪) ও 'বাসবদত্তা' (১৮৩৬) নামে দুইটি কবিতাপুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত লেখকদের গ্রন্থরচনার ফলে সহজ বাংলা গদ্যের প্রচলন হয়। কিন্তু এই সঙ্গে সংস্কৃতশব্দবহুল পণ্ডিতী ভাষাও বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করে। এই শ্রেণীর লেখক তারাশঙ্কর তর্করত্নের রচনার নমুনা দিতেছি:

"পয়ঃপান দ্বারা পিপাসা শান্তি হইলে যে প্রকার আনন্দ হয় চির বিযুক্ত মিলন দ্বারা যেরূপ হৃদয়ে সুখ ধারা বর্ষণ করে নিবিড় ঘনঘটায় ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে রাজমার্গে আলোক অবলোকন করিয়া যেরূপ চিত্ত হর্ষে পুলকিত হয় তদ্রূপ বিদ্যামৃত অজ্ঞান তৃষ্ণা নষ্ট করিয়া হৃদয়কে হৃষ্ট ও প্রফুল্ল করে।"[১৬ক]

তারাশঙ্কর তিনটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—'ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণের বিদ্যা-

শিক্ষা', 'কাদম্বরী' ও 'রাসেলাস'। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি বই অনুবাদ-গ্রন্থ। তারাশঙ্করের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য থাকিলেও তাহাতে প্রসাদ-গুণের অভাব নাই; তাহার মধ্যে শিল্পগুণেরও নিদর্শন পাওয়া যায়।

(চ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

ইহাদের পরে আসিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁহার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ১৮৪৭ খ্রীঃ, 'শকুন্তলা' ১৮৫৪ খ্রীঃ, 'কথামালা' ও 'চরিতাবলী' ১৮৫৬ খ্রীঃ, এবং 'সীতার বনবাস' ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কয়খানি এবং তাঁহার রচিত অন্যান্য বহু গ্রন্থ বাংলা গদ্য সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে: "বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে।"[১৭]

বিদ্যাসাগরের গদ্য-রীতির বৈশিষ্ট্য—একদিকে প্রচুর সংস্কৃত শব্দের সুষ্ঠু ব্যবহারের মধ্য দিয়া ধ্বনিগাম্ভীর্য সৃষ্টি, অপরদিকে বহুল-পরিমাণে ছেদ-চিহ্নের ব্যবহারের দ্বারা বাক্যের অংশগুলিকে শ্বাসপর্ব ও সার্থপর্ব অনুসারে সাজাইয়া ভাষাকে ছন্দোময় করিয়া তোলা। তাঁহার ভাষায় গাম্ভীর্য ও মাধুর্যের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা ভাষার কি পরিবর্তন ঘটিয়াছিল পূর্বোদ্ধৃত বাংলা রচনার নমুনাগুলির সহিত বিদ্যাসাগর-কৃত নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তির তুলনা করিলেই তাহা সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে।

"তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এক কালে নির্মূল হইয়া যায়।...হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।"[১৮]

পূর্বে বিদ্যাসাগরের যে-সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলির মূল—হিন্দী,

সংস্কৃত ও ইংরেজীতে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ। বিদ্যাসাগরের মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), দুই খণ্ড 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫), দুই খণ্ড 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১৮৭১, ১৮৭৩) প্রভৃতি। প্রথমোক্ত গ্রন্থটিতে বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-রসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং ইহাই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সাহিত্য-ইতিহাস। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির ভাষা সরল ও স্বচ্ছন্দ, ইহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান ও নিপুণ বিচারশক্তির পরিচয় আছে। বিদ্যাসাগরের কয়েকটি বেনামী ব্যঙ্গ রচনায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'প্রভাবতীসম্ভাষণ' নামক ক্ষুদ্র শোক-নিবন্ধে ও তাঁহার অসম্পূর্ণ আত্মচরিতে উপভোগ্য সাহিত্য-রসের নিদর্শন পাওয়া যায়।

(ছ) প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক দুইজন লেখক সংস্কৃতমূলক সাধুভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত-শব্দবিরল লৌকিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন। "টেকচাঁদ ঠাকুর" ছদ্মনামধারী প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) এবং "হুতোম" ছদ্মনামধারী কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) প্রণীত কলিকাতা-সমাজের ব্যঙ্গচিত্র 'হুতোম প্যাঁচার নকৃশা' (১৮৬২) এই ভাষায় রচিত। শেষোক্ত গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে কথ্য ভাষায় লেখা। 'হুতোম প্যাঁচার নকৃশা' হইতে ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"পাঠকগণ! এই যে উর্দ্দি ও তকমা-ওয়ালা বিদ্যালঙ্কার, ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবাচস্পতিদের দেখছেন, এরা বড় ফ্যালা যান না, এঁরা পয়সা পেলে না করেন হেন কর্ম্মই নাই। পয়সা দিলে বানরওয়ালা নিজ বানরকে নাচায়, পোষাক পরায়, ছাগলের উপর দাঁড় করায়; কিন্তু এঁরা পয়সা পেলে নিজে বানর পর্য্যন্ত সেজে নাচেন। যত ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম এই দলের ভেতর থেকে বেরোবে, দায়মালী জেল তন্ন কল্লেও তত পাবেন না।"[১৯]

কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা মহাভারতের অনুবাদ সাধুভাষায় করান এবং বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ইহাতে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর 'সোমপ্রকাশ' মত প্রকাশ করে যে তাঁহার "হুতোম প্যাঁচা" ও "মহাভারত" তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।"[১৯ক]

প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষার নমুনা :

"রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বলদেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোবার গাধা থপাস থপাস করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হুহু করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন—মেয়েরা ঘাটে সারি সারি হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্ত্তা কহিতেছে। কেহ বলিতেছে পাপ ঠাকুরঝির জ্বালায় প্রাণটা গেল—কেহ বলে আমার শাশুড়ী মাগি বড় বৌকাঁটকি—কেহ বলে দিদি আমার আর বাঁচতে সাধ নাই—বৌছুঁড়ি আমাকে দু পা দিয়া থেত্‌লায়—বেটা কিছুই বলে না ; ছোঁড়াকে গুণ করে ভেড়া বানিয়েছে—কেহ বলে আহা এমন পোড়া জাও পেয়েছিলাম দিবারাত্রি আমার বুকে বসে ভাত রাঁধে, কেহ বলে আমার কোলের ছেলেটির বয়স দশ বৎসর হইল—কবে মরি কবে বাঁচি এইবেলা তার বিএটি দিয়ে নি।"[২০]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্যারীচাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার সুদীর্ঘ উক্তি হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :

"বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক।"

পূর্বোক্ত পণ্ডিতী ভাষার উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন : "এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্যা নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

"ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল—সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়া মাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজিগ্রন্থের সার সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু

তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতালপঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালী-লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই।......

"এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল ....."আলালের ঘরের দুলালের" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ।"[২১]

২। গদ্য সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্ব

(ক) উপন্যাসের আরম্ভ

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা ইংরেজি রোমান্টিক্ নভেলের প্রভাবে উপন্যাস রচনা।

বাংলা গদ্যে লিখিত এই শ্রেণীর উপন্যাস রচনার প্রথম ক্ষীণ প্রচেষ্টার ফল ১৮৫২ খ্রীঃ শ্রীমতী হানা ক্যাথেরীণ মলেন্স্ রচিত "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ"।[২২] খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত কয়েকটি বাঙ্গালীর জীবন কাহিনী ইহার বিষয়বস্তু। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে ইহার মূল্য খুব বেশী নহে।

ইহার পরবর্তী উপন্যাস ১৮৫৮ সনে রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল'। গ্রন্থকর্তা প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই ছদ্মনামে ইহা প্রকাশিত করেন। ইহা প্রায় কথ্য ভাষায়ই লিখিত, তবে ইহার ক্রিয়াপদগুলি সাধু ভাষার। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন যথার্থই বলিয়াছেন, "মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন নবীন কবিতার জন্মদাতা প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) তেমনি গল্প উপন্যাসের পথকর্তা"। 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে সংগৃহীত বালক-বালিকার শ্রবণপ্রিয়

উপকথা, এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি, আরব্য উপন্যাস প্রভৃতির বাহিরেও যে উচ্চ-শ্রেণীর চিত্তাকর্ষক গল্প থাকিতে পারে 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখিয়া প্যারীচাঁদ তাহাই প্রমাণিত করিলেন। এই গ্রন্থে সেকালের কলিকাতা শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বাস্তব ছবি পাওয়া যায়। কাহিনীর দিক্ দিয়া 'নববাবুবিলাস'-এর সহিত ইহার মিল আছে। সার্থকনামা ঠকচাচা চরিত্রটিই এই উপন্যাসের প্রাণস্বরূপ। এই গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলা চলে না।[২৩] কিন্তু ইহার মূল্য ও বিশেষত্ব কি, পূর্বোদ্ধৃত বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি হইতেই তাহা বোঝা যাইবে। প্যারীচাঁদ 'অভেদী' (১৮৭১) নামে একখানি আধ্যাত্মিক উপন্যাস এবং নারী-কল্যাণের জন্য 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) নামে আর একটি উপন্যাস লেখেন। প্যারীচাঁদের অন্যান্য গ্রন্থ, 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০) ও 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫)।

এই সময়ে আরও কয়েকখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) প্রণীত 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' নামক কাহিনীদ্বয় সংবলিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থ (১৮৬২) এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের রূপক-আখ্যায়িকা 'বিচিত্রবীর্য' (১৮৬২) ও 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৭), গোপীমোহন ঘোষের 'বিজয়-বল্লভ' (১৮৬৩) প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখ-যোগ্য। কয়েকখানি ইংরেজী উপন্যাসের অনুবাদও এই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের যে নূতন ধারা প্রবর্তন করে, উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত তাহা অব্যাহত ছিল। আজিও তাহার গৌরব ম্লান হয় নাই।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী (নৈহাটির সংলগ্ন) কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষা পাস করিয়া ঐ বৎসরই ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা। পুরাতাত্ত্বিক গল্প। তথা মানস।" ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; এটি কবিতার গ্রন্থ; ইহার অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি অপরিণত। বঙ্গসাহিত্য-লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কলিকাতার এক সভা প্রতি বৎসর বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য একটি পুরস্কার দিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ঐ পুরস্কার লাভের জন্য একখানি উপন্যাস রচনা

করেন, কিন্তু উপন্যাসটি পুরস্কারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।[২৪] কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত *Indian Field* নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় *Rajmohan's Wife* নামে বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি ইংরেজী উপন্যাস ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়। উপান্যাসটিতে বিশেষ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র পরে উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনা আরম্ভ হয়। উপান্যাসটি লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে ইহা পড়িতে দেন। তাঁহারা এই গ্রন্থ প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করেন। কিন্তু গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবামাত্র (১৮৬৫) ইহা বাঙ্গালী পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের মর্যাদা দিল। প্রসিদ্ধ লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত যথার্থই লিখিয়াছেন, "যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল।.. ...বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।"[২৫]

বর্তমান কালের বিচারে 'দুর্গেশনন্দিনী' অপরিণত উপন্যাস ; ইহার মধ্যে বহু অস্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশ ও সুলভ চমক সৃষ্টির নিদর্শন দেখা যায়, চরিত্রগুলিও সম্পূর্ণ জীবন্ত হয় নাই। কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলির সঙ্গে তুলনা করিলে ইহার বর্ণনার সরসতা ও রচনার শক্তিমত্তা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত। ইহার কাহিনীর অধিকাংশ এবং দুই একটি ব্যতীত সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক।

পরবর্তী উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'য় (১৮৬৬) অপরিণত উপন্যাসের কোন চিহ্নই দেখা যায় না। ইহা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অরণ্য-পালিতা কপালকুণ্ডলার জটিল রহস্যময় চরিত্র যেভাবে অঙ্কণ করিয়াছেন, তাহা অপরিসীম নৈপুণ্যের পরিচায়ক। উপন্যাসটির রহস্য-মণ্ডিত পরিবেশও খুব জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা' আকবরের মৃত্যুর (১৬০৫) অব্যবহিত পরবর্তী কালের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে। ইহার ঐতিহাসিক অংশ খুবই নগণ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) 'কপালকুণ্ডলা'র মত

উচ্চাঙ্গের রচনা নহে। ইহাতে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখা যায়। এই উপন্যাসের কাহিনীর পটভূমি ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বখতিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ-জয়। 'মৃণালিনী'র প্রধান অংশ—হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর প্রণয়কাহিনী নিতান্তই কৃত্রিম ও প্রাণহীন। তবে এই উপন্যাসে মনোরমার চরিত্রসৃষ্টিতে এবং পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশিত হয় (১৮৭৩)। ইহাও একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন চরিত্রসৃষ্টিতে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি একাধিক কাহিনীকে একসূত্রে গ্রথিত করার ব্যাপারেও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মানুষের আদিম রিপু বশীভূত না হইলে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে যে অনর্থ সৃষ্ট হয়, তাহাই বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে দেখাইয়াছেন। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নগেন্দ্র, সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী ও হীরার করুণ ট্রাজেডি যেভাবে রূপায়িত হইয়াছে, তাহা এই উপন্যাসখানিকে উচ্চস্তরের শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাস 'ইন্দিরা'তে একটি নারীর সাময়িক ভাগ্য-বিপর্যয় ও তাহা হইতে উদ্ধার লাভের কাহিনী খুব লঘু এবং সরস ভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার নারীচরিত্রগুলি, বিশেষত নায়িকা ইন্দিরার চরিত্র, খুবই জীবন্ত। 'ইন্দিরা' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সংক্ষিপ্ত আকারে এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়।

'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) বঙ্কিমচন্দ্রের আর একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে বাংলার নবাব মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষের পটভূমিকায় এই উপন্যাসটি রচিত। ইহার প্রধান কাহিনী কাল্পনিক বলিয়া ইহাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় না। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক পরিবেশ খুবই জীবন্ত। নবাব মীরকাশিমের চরিত্র ইতিহাসসম্মত ও সজীব। এই উপন্যাসের ইংরেজ-চরিত্রগুলির মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র যুগোচিত বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। উপন্যাসের নায়িকা—বিবাহিতা কিন্তু বাল্যপ্রণয়ীর প্রতি আসক্তা শৈবলিনীর জটিল চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'চন্দ্রশেখরে'র পরিবেশের রূপায়ণও খুব সুন্দর। তবে কেহ কেহ মনে করেন যে ইহার মধ্যে শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর-প্রতাপের কাহিনীর সহিত মীরকাশিম-দলনীর কাহিনীর একত্র গ্রন্থন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক শিল্পের আদর্শকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

'রজনী' (১৮৭৭) উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র এক অন্ধ পুষ্পনারীর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে কাহিনীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন চরিত্রের জবানীতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বলা যায় না, কারণ ইহার কাহিনীতে অনেকাংশে অবাস্তবতা দেখা যায় এবং স্থানে স্থানে অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনার নিদর্শনও পাওয়া যায়। লবঙ্গলতা ও অমরনাথ ভিন্ন 'রজনী'র আর কোন চরিত্র জীবন্ত নহে। বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী'র কাহিনীর ক্ষেত্রে লর্ড লিটনের *The Last days of Pompeii* উপন্যাসের এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে উইল্‌কি কলিন্‌সের *The Woman in White* কে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

পরবর্তী উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ (১৮৭৮) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষের'ই মত অসংযত রিপুর বিষময় পরিণামের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। রচনারীতি এবং কাহিনী-বর্ণনার অনায়াস, স্বচ্ছন্দ ও ক্ষিপ্রগতির দিক দিয়া উপন্যাসটি অতি উচ্চস্তরের বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তবে বর্তমান যুগের কোন কোন সাহিত্যিক ও সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে এই উপন্যাসে বর্ণিত রোহিণীর আকস্মিক হত্যাকাণ্ড শিল্পের দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ সুষ্ঠু হয় নাই।

ইহার পর 'রাজসিংহ' উপন্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয় (১৮৮২)। কয়েক বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে পরিবর্ধিত আকারে পুনঃ প্রকাশ করেন (১৮৯৩)। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক উপন্যাসে ঐতিহাসিক পটভূমিকা থাকিলেও একমাত্র 'রাজসিংহ'কেই তিনি "ঐতিহাসিক উপন্যাস" বলিয়াছেন! প্রধানত টডের রাজস্থান হইতে এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। অবশ্য আধুনিক ঐতিহাসিকদের বিচারে ঐ সব উপকরণের অনেকগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমি ও যুগপ্রতিবেশ খুবই জীবন্ত। রাজসিংহ ও চঞ্চলকুমারীর (ইতিহাসের 'চারুমতী') চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তবে এই উপন্যাসের ঔরঙ্গজেব ও জেবউন্নেসার চরিত্রে ইতিহাসের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ অংশ জেবউন্নেসা ও মবারকের প্রেম কাহিনী। বাদশাহজাদী জেবউন্নেসার বিচিত্র প্রণয় ও তাহার করুণ পরিসমাপ্তি অপরূপ শিল্প-সুষমায় মণ্ডিত হইয়া রূপায়িত হইয়াছে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের নিকট ঔরঙ্গজেবের শোচনীয় পরাজয়ের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস-সম্মত নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনখানি উপন্যাস—'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী'

(১৮৮৪) ও 'সীতারামে' (১৮৮৭) তাঁহার ঔপন্যাসিক জীবনের এক দিক্-পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল গল্পের খাতিরে গল্প লেখার নীতিকে ত্যাগ করিয়া গল্পের মধ্য দিয়া জনসাধারণকে নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'আনন্দমঠ' ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত, কিন্তু ইহার অধিকাংশ ঘটনা ও চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ইহার মধ্যে দেশোদ্ধারব্রতী সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দ প্রভৃতি "সন্তান"দের কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়া নিষ্কাম কর্মযোগের সার্থকতা ও ব্যর্থতা দুইই দেখানো হইয়াছে; এই সব চরিত্র আদর্শবাদের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত; মহেন্দ্র, কল্যাণী ও শান্তি অপেক্ষাকৃত বাস্তব। 'আনন্দমঠ' পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিপুল অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল। বিখ্যাত "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত এই উপন্যাসেরই অন্তর্ভুক্ত। 'দেবী চৌধুরাণী'তেও ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে, কিন্তু ইহার প্রায় সব চরিত্র ও ঘটনাই কাল্পনিক। এই উপন্যাসের নায়িকা প্রফুল্লকে লেখক নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শ সাধিকা হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রফুল্ল চরিত্র বাস্তব ও জীবন্ত না হওয়ার জন্য এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। এই উপন্যাসের হরবল্লভ চরিত্রটি অত্যন্ত সজীব ও উজ্জ্বল। 'সীতারামে' বঙ্কিমচন্দ্র নায়ক সীতারামের মধ্য দিয়া নিষ্কাম কর্মযোগ জীবনে গ্রহণ না করার শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ সম্ভব হয় নাই, কারণ সীতারাম ও শ্রী—কাহারও চরিত্রই সম্পূর্ণ জীবন্ত হয় নাই। বরং এই উপন্যাসের ক্ষুদ্রতর চরিত্রগুলি —রমা, নন্দা ও গঙ্গারাম বাস্তব ও প্রাণবন্ত। সীতারামের ঐতিহাসিক কাহিনীর খুব সামান্যই বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে গ্রহণ করিয়াছেন, কল্পনার পরিমাণই ইহাতে বেশি!

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে যে সমুদয় নরনারী চিত্রিত হইয়াছে, কাহিনীর সৌন্দর্য নষ্ট না করিয়াও তাহাদের মধ্য দিয়া তিনি গার্হস্থ্য জীবনের ও বিশেষতঃ নরনারীর প্রণয়ের ও মানসিক দ্বন্দ্বের যে ছবি আমাদের মনে গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা একাধারে সৌন্দর্য সৃষ্টির রস এবং উচ্চ ভাব ও আদর্শের প্রেরণা যোগায়। প্রায় সব উপন্যাসেই একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা ও সতীত্বের মহিমা এবং অপরদিকে মনুষ্য চরিত্রের দুর্বলতা, প্রলোভন ও নৈতিক অধঃপতনের বিচিত্র দ্বন্দ্বে মানুষের জয় পরাজয়ের মর্মন্তুদ কাহিনী পাঠকের মনে রোমান্টিক উপন্যাসের বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য সর্বদা স্মরণ করায়। ঊনবিংশ শতকে নীতিবোধের যে উচ্চ

আদর্শ ছিল বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ় হস্তে তাহা সর্বদা আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন ; তাঁহার মুষ্টি কখনও শিথিল হয় নাই। রোহিনীর মৃত্যু, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বর্তমান যুগের আদর্শ ও নীতিজ্ঞানের অনুযায়ী নহে বলিয়া অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার করিতে হইলে উনিশ শতকের মাপকাঠিই ব্যবহার করিতে হইবে—বিশ শতকের নহে। একাধারে ভাষার লালিত্য, অনবদ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি, রসের অবতারণা ও মহান আদর্শের অপূর্ব সমন্বয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি উনিশ শতকের বাঙ্গালী জীবনের প্রতীক-রূপে চিরদিনই গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র দুইটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছিলেন—'যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) ও 'রাধারাণী' (১৮৭৫)। এই দুইটি রচনা উপন্যাস নহে, আবার ছোট গল্পের শ্রেণীতেও ইহাদিগকে ফেলা যায় না। নিছক কাহিনী হিসাবে এ দুইটি কিছু সার্থকতা লাভ করিয়াছে—কিন্তু উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি লঘুরসাত্মক গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন—যথা, 'কমলাকান্ত' (১৮৮৫), 'লোকরহস্য, (১৮৭৪) ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪)। হাস্যরস সৃষ্টিতে তাঁহার অসামান্য দক্ষতার পরিচয় এই তিনটি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। 'কমলাকান্ত' তিন খণ্ডে বিভক্ত—কমলাকান্তের দপ্তর (ইতিপূর্বে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল), কমলাকান্তের পত্র ও কমলাকান্তের জোবানবন্দী। প্রথম খণ্ডে কয়েকটি উচ্চাঙ্গের ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখকের মনের চিন্তা ও অনুভূতি অত্যন্ত সরস ভঙ্গীতে উপস্থাপিত হইয়াছে ; অপর কয়েকটি প্রবন্ধ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের সূক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞান ও গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চিন্তা ও অনুভূতিকে পত্রের আঙ্গিকে রূপায়িত করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডটি একটি অত্যন্ত উপভোগ্য হাস্যরসাত্মক নক্শা। ইহাতে আদালতের বিচারপদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র হাসি ও ব্যঙ্গের আবরণে বাঙ্গালী জাতির অনেক মর্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। 'লোকরহস্য' গ্রন্থে কয়েকটি উপভোগ্য হাস্যরসাত্মক নক্শা ও প্রবন্ধ পাওয়া যায়। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'-এ—অযোগ্য লোকেরা ভাগ্যের প্রসাদে কি ভাবে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে, তাহাই বঙ্কিমচন্দ্র লঘু হাস্যরসের মধ্য দিয়া রূপায়িত করিয়াছেন। এই তিনখানি গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র যে সুনির্মল কৌতুকধারা প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না।

শুধু উপন্যাস রচনায় নহে, ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও বিবিধ প্রবন্ধ রচনায়ও বঙ্কিমচন্দ্র

অবিসংবাদিত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ 'কৃষ্ণ-চরিত্র' (১৮৮৬)। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতে এবং পুরাণগুলিতে বর্ণিত কাহিনী বিশ্লেষণ করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টা হয়ত সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই, কিন্তু যুক্তিমূলক রচনা হিসাবে ইহার বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব খুব উচ্চশ্রেণীর। ইহার রচনাভঙ্গীও অত্যন্ত চমৎকার। তাহার ফলে ইহা শুষ্ক গবেষণা-গ্রন্থে পরিণত হয় নাই, অত্যন্ত সরস ও সুখপাঠ্য রচনা হইয়া উঠিয়াছে। 'বিবিধ প্রবন্ধ' (প্রথম ভাগ ১৮৮৭ ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯২-এ প্রথম প্রকাশিত) গ্রন্থে নানা বিষয় সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে; এই গ্রন্থ হইতে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্য এবং তাঁহার চিন্তার মৌলিকতা ও যুক্তিশৃঙ্খলার পারিপাট্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হই। সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি 'বিবিধ প্রবন্ধ'র শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই গ্রন্থের ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম ও ইতিহাস-নিষ্ঠার পরিচয় বহন করিতেছে। 'সাম্য' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র মিলের মত অনুসরণ করিয়া সাম্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন; শেষ জীবনে তিনি এই গ্রন্থ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের মূলতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিতে পারে নাই। 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫) গ্রন্থে তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, অবশ্য পরে এই সব বিষয় সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে তাঁহার আলোচনা বর্তমানে অনেকাংশে মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। 'গদ্যপদ্য বা কবিতাপুস্তক' (১৮৯১) নামে আর একটি গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি কবিতা ও তিনটি সুন্দর কাব্যধর্মী গদ্য-রচনা সঙ্কলিত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি অবিস্মরণীয় দান—বাংলা গদ্যের একটি আদর্শ রীতির প্রতিষ্ঠা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থরচনার পূর্বে বাংলা গদ্যের দুইটি স্বতন্ত্র রীতি প্রচলিত ছিল—তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত-শব্দবহুল রীতি এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যবহৃত কথ্য-ভাষার রীতি। এই দুইটি রীতি পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং কেহই আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইটি রীতির সমন্বয় সাধন করিয়া এবং সংস্কৃত ও লৌকিক শব্দরাজির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস করিয়া যে এক অভিনব রীতির প্রবর্তন করিলেন তাহাই বাংলা গদ্যের

আদর্শ রীতি হিসাবে গৃহীত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার 'বাঙ্গলা ভাষা' প্রবন্ধে এই রীতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সম্প্রতি এক শ্রেণীর লেখক বঙ্কিমের সাহিত্যিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী উপন্যাসের নিকট কি পরিমাণ ঋণী, ইহা লইয়াও অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে সৃষ্ট চরিত্রের বাস্তবতা নাই এই অভিযোগ করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে মাঝারি নভেল-লেখক বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই সব ও অন্যান্য বিরুদ্ধ আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নহে।[২৬] আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের রচিত বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেগুলি পাঠ করিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতা ও আদর্শ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বাংলার নব্য লেখকদের প্রতি যে নিবেদন করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।...

"যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনীধারণ মহাপাপ।"[২৭]

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং যে এই নীতিগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার রচনাবলী তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 'বঙ্গদর্শন' নামে সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদন বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রধান কীর্তি। ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (১৮৭২ এপ্রিল) বঙ্গদর্শনের প্রথম সংখ্যা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। এই শ্রেণীর সাহিত্য-বিষয়ক পত্রিকা বাংলা দেশে ইহার পূর্বে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র তখন চাকুরি উপলক্ষে বহরমপুরে ছিলেন এবং সেখানে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতিকে লইয়া তিনি এক ক্ষুদ্র সাহিত্য সংঘ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই সংঘের সহায়তায় এবং বঙ্কিমের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া বাঙালীর চিত্ত উদ্বুদ্ধ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের লেখা উপন্যাস, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ-

সমালোচনা এবং তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী অপর লেখকের সামাজিক, ঐতিহাসিক রাজনৈতিক, দার্শনিক ও অন্যান্য বিষয়ক প্রবন্ধ ও গল্প প্রভৃতিতে বঙ্গদর্শন সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন:

"বঙ্কিমচন্দ্র যদি সেদিন সুকৌশলী সেনাপতির মত বঙ্গবাণীর বিচ্ছিন্ন সেবকদের 'বঙ্গদর্শনের' বৃহমধ্যে সংস্থাপিত করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে অত্যল্পকালমধ্যে বঙ্গ সাহিত্যের এতখানি প্রসার সম্ভব হইত না।"[২৮] ইহা একটুও অত্যুক্তি নহে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীত, সাহিত্য, সমালোচনা, ব্যঙ্গকৌতুক প্রভৃতি বিষয়ে স্বয়ং লিখিতেন। তাঁহার কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস, বিখ্যাত 'কমলাকান্তের দপ্তর' [২৯] ও নানা মূল্যবান প্রবন্ধ এই বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা সম্বন্ধে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

ব্রজেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:

বঙ্কিমচন্দ্র "একদিকে প্রাচ্য জড়তা ও অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর মোহজাত বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঙালী-জাতি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে স্বমর্যাদায় পাশ্চাত্যের অনুকরণবৃত্তির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।"[৩০]

মোহিতলাল মজুমদার লিখিয়াছেন:

বঙ্কিমচন্দ্র "শুধু সাহিত্য-স্রষ্টা শিল্পী নহেন, নব্য বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্য রচনায় আত্মবিস্মৃত শিল্পী যে আনন্দ মুক্তির আস্বাদ পায়, বঙ্কিমের তাহাতে লোভ ছিল না।······যে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইলে, জাতির জীবনে উৎকৃষ্ট সাহিত্য আপনিই সম্ভব হয়, বঙ্কিম সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠায় তাঁহার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।"[৩১]

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় লিখিত এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

"রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

"সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। .... বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজমূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।"৩২

(গ) বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্র যে নূতন শ্রেণীর উপন্যাসের ধারা প্রবাহিত করিলেন ক্রমে তাহা বিশাল নদীর স্রোতের ন্যায় বঙ্গসাহিত্য প্লাবিত করিল। উনিশ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত বহু ঔপন্যাসিক এই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং বহুসংখ্যক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল--ইহা সবিস্তারে বর্ণনা করা সম্ভব নহে, কয়েকখানির মাত্র উল্লেখ করিব।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-৯১) প্রণীত "স্বর্ণলতার" বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের প্রাত্যহিক জীবন অবলম্বনে লিখিত। এই শ্রেণীর বাঙ্গালীর চিত্রকে প্রাধান্য দিয়া ইহার পূর্বে কোন উপন্যাস রচিত হয় নাই। ১৮৭৪ খ্রীঃ ইহা প্রকাশিত হয় এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী ইহা বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল। ইহার কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'সরলা' নাটক বাংলার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত।

সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় বাংলায় চারিখানি উপন্যাস রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন—"বঙ্গবিজেতা", "মাধবী কঙ্কন" (১৮৭৭), "মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত" (১৮৭৮) ও "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা" (১৮৭৯)। এই চারিখানি উপন্যাসই ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত এবং ইহাদের মধ্যে বর্ণিত ঘটনাগুলি মুঘল যুগের একশত বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়াছিল—এই জন্য এই চারিখানি একত্রে 'শতবর্ষ' নামে অভিহিত হয়। ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও কাহিনীর সরস বর্ণনার গুণে ইহারা জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জীবনযাত্রা লইয়া রমেশচন্দ্র 'সংসার' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৩) নামে আরও দুইখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী কয়েকটি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) এবং শেষ উপন্যাস 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫)। তাঁহার রোমান্টিক-প্রণয়কাহিনী-মূলক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস এককালে জনপ্রিয় ছিল। 'কাহাকে?' (১৮৯৮) তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের উপসংহার—অর্থাৎ কপালকুণ্ডলা ও আয়েষার কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে শেষ করিয়াছেন তাহার পরে তাহাদের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে 'মৃন্ময়ী' ও 'নবাবনন্দিনী' নামে দুইখানি উপন্যাস লেখেন। কপালকুণ্ডলার জলে ঝাঁপ দিয়া অন্তর্ধান ও আয়েষার ব্যর্থ প্রণয় কাহিনীতে পাঠকের মনে যে একটা অতৃপ্তির ভাব হইত তাহা কতক পরিমাণে দূর করার জন্য এই উপন্যাস দুইখানি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। দামোদর বাবুর অন্যান্য উপন্যাস-গুলির তেমন আদর হয় নাই। 'নব্যভারত' পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী (১৮৫৪-১৯২০) ও ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) কয়েকখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর "মেজবৌ" (১৮৮০) ও "যুগান্তর" (১৮৯৫) এক সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল।

চণ্ডীচরণ সেন (১৮৪৫-১৯০৬) বিখ্যাত '*Uncle Tom's Cabin*'-এর বঙ্গানুবাদ—"টমকাকার কুটীর" লিখিয়া যশস্বী হন। পরে তিনি "মহারাজা নন্দকুমার" (১৮৮৫), "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ" (১৮৮৬), "অযোধ্যার বেগম" (১৮৮৬) ও "ঝান্সীর রাণী" (১৮৮৮) প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু এগুলিতে প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পল্লীগ্রামের চিত্রমূলক কয়েকখানি উপন্যাস রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে "ফুলজানি" (১৮৯৪) সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাধারণ উপন্যাস ছাড়া কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীর উপন্যাসও উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ ব্যঙ্গরচনা। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯১১) "কল্পতরু" (১২৮১ সাল) বাংলার প্রথম 'ব্যঙ্গ উপন্যাস'। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬) এককালে খুবই জনপ্রিয় ছিল। এ দুইখানিই ব্রাহ্ম সমাজকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিত। যোগেন্দ্রচন্দ্রের আরও কয়েকখানি ব্যঙ্গ উপন্যাস সমসাময়িক কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া রচিত।[৩৩]

যোগেন্দ্র চন্দ্র "শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী" নামে যে বিশুদ্ধ রোমান্টিক উপন্যাস লেখেন (১৯০২-৬) তাহা বাংলা ভাষার বৃহত্তম উপন্যাস বলিয়া পরিগণিত হয়।

ব্যঙ্গ ও কৌতুক মিশ্রিত সমাজের চিত্র অবলম্বনে "স্বর্গলোকে বঙ্গের পরিচয়" "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। স্বর্গ হইতে দেবগণ বঙ্গদেশে আসিয়া যাহা যাহা দেখিলেন এগুলি তাহার নক্সা

শ্লেষাত্মক বর্ণনা। সমাজ, ভাষা ও সাহিত্য এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিদ্রূপই এই শ্রেণীর গ্রন্থের উপজীব্য।

রূপকথার ছাঁচে ঢালিয়া সম্ভব অসম্ভব নানারূপ কল্পনাসৃষ্টির সাহায্যে ব্যঙ্গ মিশ্রিত রস রচনায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার "কঙ্কাবতী" (১২৯৯ সাল), "ফোকলা দিগম্বর" (১৩০৭ সাল) ও "ডমরু-চরিত" সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি। অনেকে এই সমুদয়ের রচনার খুব উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ একজন প্রথম শ্রেণীর ব্যঙ্গ শিল্পী।

কয়েকখানি ডিটেকটিভ উপন্যাসও এককালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের "দারোগার দপ্তর" (১৮৯৩-৯৯) এবং প্রায় সমসাময়িক শরচ্চন্দ্র সরকারের গোয়েন্দা কাহিনী শীর্ষক গ্রন্থমালা খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল। পরে পাঁচকড়ি দে ও দীনেন্দ্রকুমার রায় এই শ্রেণীর গ্রন্থ লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

(ঘ) বিবিধ রচনা

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুইজন সহপাঠী—ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) ও রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ-লেখক ছিলেন। ভূদেবের প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ সদাচার ও গৃহধর্ম বিষয়ক; সেগুলি 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮১), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯৩), 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯৪) প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। এগুলি হইতে ভূদেবের রক্ষণশীল অথচ উদার মনের পরিচয় মিলে। মারাঠারা পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে বিজয়ী হইলে কিরূপ হইত, তাহার একটি কাল্পনিক চিত্র "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" গ্রন্থে ভূদেব সুন্দরভাবে অঙ্কন করিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসুর রচনারীতি ঋজু ও সরস, সাধুভাষা হইয়াও কথ্যভাষার কাছাকাছি। 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪), 'গ্রাম্য উপাখ্যান' (১৮৮৩) ও 'আত্মচরিত' (১৯০১) তাঁহার শ্রেষ্ঠ তিনটি গ্রন্থ। ইহা ভিন্ন তাঁহার অন্য কয়েকখানি গ্রন্থও—'ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা' (১৮৬১), 'বক্তৃতা' (দুই খণ্ড, ১৮৫৫, ১৮৭০), 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩) 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৮), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৮২) এবং 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' (১৮৮৭) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান্ প্রবন্ধ এই যুগে রচিত

হইয়াছিল। কয়েকজন ব্রাহ্ম লেখক—শিবনাথ শাস্ত্রী, গিরিশচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রভৃতি জীবনী ও প্রবন্ধ রচনায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (১৮৯৭) ও 'আত্মচরিত' (১৯১৮) তথ্যের দিক্ দিয়া অত্যন্ত মূল্যবান। শশধর তর্কচূড়ামণির প্রবন্ধ গোঁড়া হিন্দু-সম্প্রদায়ের প্রিয় ছিল। রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) ইতিহাস ও জীবনী-গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন।

গুরুগম্ভীর চিন্তামূলক প্রবন্ধের জন্য ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রভাত চিন্তা' (১৮৭৭), 'নিভৃত চিন্তা' (১৮৮৩), 'নিশীথ চিন্তা' (১৮৯৬) প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের রচনা। কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বলবাসী কোন সাহিত্যিকই এরূপ খ্যাতি লাভ করেন নাই। তিনি পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

মীর মশারফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২) এই যুগের একজন বিশিষ্ট গদ্য-লেখক। কারবালার করুণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত ইঁহার 'বিষাদ-সিন্ধু' (তিন খণ্ড, ১৮৮৪-১৮৯০) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও (১৮৪০-১৯২৬) সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল। আলোচ্য যুগে তিনি দার্শনিক প্রবন্ধ রচনায় বাংলা সাহিত্যের অগ্রদূত ছিলেন এবং চারিখণ্ড 'তত্ত্ববিদ্যা' (১৮৬৬-৬৯) সহ বহু দর্শনবিষয়ক গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও (১৮৪২-১৯২৩) ভাল বাংলা লিখিতেন। তিনি 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯০১), 'বোম্বাই চিত্র' (১৮৮৮) এবং 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস' (১৯১৫) প্রভৃতি বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক 'বঙ্গদর্শন'-গোষ্ঠীর কয়েকজন প্রবন্ধলেখকের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-গ্রন্থে ইঁহাদের লেখা দুইটি প্রবন্ধ আছে। রাজকৃষ্ণের 'নানা প্রবন্ধ' গ্রন্থে (১৮৮৫) অনেকগুলি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে, সেগুলি হইতে ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে লেখকের গভীর পাণ্ডিত্যের এবং সহজ সর্বজনবোধ্য ভাষায় তাহাকে প্রকাশ করার শক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনারীতি ছিল অত্যন্ত লঘু ও সরস। তাঁহার

প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে 'সমাজ-সমালোচনা' (১৮৭৪), 'আলোচনী' (১৮৮২), 'সনাতনী' (১৯১১), 'মোতিকুমারী' (১৯১৭) এবং 'রূপক ও রহস্য' (১৯২৩) উল্লেখ-যোগ্য। এগুলির মধ্যে জ্ঞান-গাম্ভীর্য ও কল্পনাবিলাস উভয়েরই নিদর্শন আছে। আত্মজীবনীমূলক নিবন্ধ 'পিতাপুত্র' এবং হেমচন্দ্রের জীবনী ও কাব্যসমালোচনা অবলম্বনে লিখিত 'কবি হেমচন্দ্র' অক্ষয়চন্দ্রের দুইটি বিশিষ্ট রচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও (১৮৩৪-১৮৮৯) সুলেখক ছিলেন। তাঁহার লেখা 'পালামৌ' (১৮৮০) একটি সরস ভ্রমণ কাহিনী। 'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮৩) গ্রন্থে তিনি একটি মামলার বর্ণনাকেও রসমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সঞ্জীবচন্দ্র 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭) ও 'মাধবীলতা' (১৮৮৪) নামে দুইটি উপন্যাস ও কয়েকটি গল্পও লিখিয়াছিলেন।

চন্দ্রনাথ বসুও (১৮৪৪-১৯১০) বঙ্কিমচন্দ্রের গোষ্ঠীভুক্ত লেখক। তাঁহার 'শকুন্তলাতত্ত্ব' (১৮৮১), 'ত্রিধারা' (১৮৯১), 'সাবিত্রীতত্ত্ব' (১৯০০) প্রভৃতি প্রবন্ধ-গ্রন্থে যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার অতি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য প্রবন্ধগুলি বর্তমান যুগে জনপ্রিয় নহে।

বীরেশ্বর পাঁড়ে এ যুগের আর একজন রক্ষণশীল লেখক। প্রাচীন হিন্দু আদর্শ "ক্ষুণ্ণ" করার জন্য তিনি নবীনচন্দ্র সেনকে আক্রমণ করিয়া 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' (১৮৯৭) নামে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'মানবতত্ত্ব' (১৮৮৩), 'অদ্ভুত স্বপ্ন বা স্ত্রীপুরুষের দ্বন্দ্ব' (১৮৮৮), ও 'ধর্মবিজ্ঞান' (১৮৯০)।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩) বীরেশ্বর পাঁড়েরই মত প্রধানতঃ সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তবে তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে উদার মতবাদ ও সূক্ষ্ম রসাস্বাদন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'সাহিত্যমঙ্গল' (১৮৮৮) গ্রন্থে তাঁহার কিছু প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২) তাঁহার স্ত্রীবিয়োগের পর 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' (১৮৭৬) নামে যে শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এককালে তাহা খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার অপর গ্রন্থ 'সারস্বতকুঞ্জ' (১৮৯০), 'স্ত্রীচরিত্র' (১৮৯০) এবং 'কুন্দলতার মনের কথা'।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক ও গবেষক। তাঁহার প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই প্রত্নতত্ত্ব এবং প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয়। তাঁহার ভাষা অতিশয় সরল ও সরস, এবং নিতান্ত দুরূহ বিষয়ের আলোচনাও

তিনি সর্বজনবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে পারিতেন। তিনি অত্যন্ত লঘু ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে কালিদাসের মেঘদূত-এর সুন্দর একটি ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন। তিনি 'কাঞ্চনমালা', (১৯১৪) ও 'বেণের মেয়ে' (১৯১৯) নামক দুইখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত গ্রন্থে একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাংলাদেশের উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। তাঁহার 'বাল্মীকির জয়' (১৮৮১) উপন্যাসধর্মী পুরাণাশ্রিত আখ্যায়িকা। 'ভারতমহিলা' (১৮৮০) তাঁহার একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধগ্রন্থ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪) লেখা উপদেশ-গ্রন্থগুলি এবং আত্মজীবনীগ্রন্থ 'জীবন বেদ' (১৮৮৪) ও সাহিত্যিক প্রবন্ধের নিদর্শন স্বরূপে গণ্য হইতে পারে। কেশবচন্দ্রের সরল ও স্পষ্ট ভাষা, প্রগাঢ় মনস্বিতা এবং ভগবৎ-স্বরূপ উপলব্ধির জন্য প্রগাঢ় আবেগ এই গ্রন্থগুলির প্রধান সম্পদ।

স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত' ও 'ভাববার কথা' বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অবশ্য তাঁহার বাংলা রচনার মধ্যে পত্রের সংখ্যাই অধিক। দেশের মাটি ও সাধারণ মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার পরিচয় বিবেকানন্দের রচনার অসংখ্য স্থানে ছড়াইয়া আছে। তাঁহার লিপিভঙ্গী অত্যন্ত সরস। তাঁহার অনেক বাংলা রচনা চলিত ভাষাতেই লিখিত। 'ভাববার কথা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রবন্ধে তিনি চলিত ভাষাকেই সাহিত্যের বাহন করিয়া তোলার সপক্ষে সুদৃঢ় যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি প্রমথ চৌধুরীর অগ্রগামী।

বাংলা গদ্যের উন্নতিসাধনে সাময়িক-পত্রগুলির ভূমিকাও অল্প নহে। এ সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য যুগের ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে রামদাস সেনের (১৮৪৫-৮৭) "ঐতিহাসিক রহস্য" ও "ভারত রহস্য" এবং কার্তিকেয় চন্দ্র রায় সঙ্কলিত "ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত" (নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ) বিশেষ মূল্যবান। আর্যদর্শন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪) ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি বিদেশীয় দেশপ্রেমিকের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও জাতীয়তা আন্দোলনের সহায়তা করেন। সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'শিবাজী' ও 'প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত' এই শ্রেণীর রচনা।

আধুনিক যুগের বাঙ্গালী মনীষীদের কয়েকটি জীবন বৃত্তান্তও এই সময়ে রচিত

হয়। ইহার মধ্যে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (১৮৮১), যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩) এবং চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য যুগে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। তথ্যগত ভ্রম ও অপূর্ণতা সত্ত্বেও তখনকার মান অনুযায়ী এগুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় রচনা। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'কবি-চরিত' (১৮৬৯), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (১৮৭১) এবং রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২-৭৩) উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত গ্রন্থটি বৃহদায়তন ও সুলিখিত এবং ইহার আদর্শ বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'।

৩। কাব্য

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গল' কাব্য ১৬৭৪ শকাব্দে (১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ হয়। তাঁহার পর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পূর্বে আর কেহ বাংলা সাহিত্যে কবি রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। এ দুয়ের অন্তবর্তী কাল বাংলায় রাজনীতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক বিপ্লবের যুগ—উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে হয়ত ইহাই একটি প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল। কারণ যাহাই হউক, কার্যতঃ কীর্তন ও অন্যান্য ধর্মসঙ্গীত এবং কবিগান, পাঁচালি, তর্জা, টপ্পা, আখড়াই, সারি, ঝুমুর প্রভৃতি লোক-সঙ্গীতই এ যুগে কবিতার একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল। এইগুলির সম্বন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

এই যুগের সাহিত্য-রস-জ্ঞানের সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তখন* পাঁচালি রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ দাশরথি রায় সম্বন্ধে বলা হইত, "কালিদাসের উপমা গুণ, নৈষধের পদলালিত্য গুণ ও ভারবির অর্থগৌরব গুণ—এই সকল কবিগণের গুণের ইয়ত্তা আছে কিন্তু দাশরথি রায়ের গুণের সীমা নির্ধারণ করা যায় না।"[৩৪] বর্তমান কালের পাঠক অবশ্য ইহা শুনিয়া হাস্য করিবেন এবং সে যুগের কবিত্ব-রসের উপলব্ধি সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ করিবেন। দাশরথি রায়ের শব্দ-চাতুর্যেই প্রধানতঃ লোক মুগ্ধ হইত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :

"পণ্ডিতের ভূষণ ধর্মজ্ঞানী, মেঘের ভূষণ সৌদামিনী, সতীর ভূষণ পতি।
যোগীর ভূষণ ভস্ম, মৃত্তিকার ভূষণ শস্য, রত্নের ভূষণ জ্যোতি॥"

এই প্রকার উপমার রাশি জলস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া সেকালের শ্রোতা ও পাঠকগণেকে মধুর রসে প্লাবিত করিত।

(ক) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১১-১৮৫৯) প্রসিদ্ধ 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক এবং সে যুগের একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক কবিতা-রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম, সমাজ ও প্রেম বিষয়ক বহু কবিতা এবং অনেক কবি-গানও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল লোক-সঙ্গীতের উপর।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার মধ্যে খাঁটি বাংলা ও সমসাময়িক বাঙালী-জীবনের প্রতিচিত্র পাওয়া যায়। তাঁহার পরেই বাংলা কাব্যে মার্জিত সাধুভাষা ও পাশ্চাত্য প্রভাব সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় রচনা-চাতুর্য আছে কিন্তু ভাবের গভীরতা নাই। সুতরাং ইহা উচ্চাঙ্গের কবিতা বলিয়া গণ্য করা যায় না। দুইটি বিষয়ে ইহাদের মধ্যে আধুনিকতার আভাস পাওয়া যায়—দেশপ্রেম ও ইতিহাস-চেতনা। "বিদেশী ঠাকুর" ফেলিয়া তিনি "দেশের কুকুর"-এর আদর করিতেন।

ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য-রচনাগুলির অধিকাংশেরই ভাষা অনুপ্রাসবহুল ও কৃত্রিম। প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে লেখা তাঁহার প্রবন্ধগুলির ভাষা সরল ও স্বচ্ছন্দ। তিনি রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী রচনার জন্য গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পূর্বে বাংলা-সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরিচিত ছিল। অনেক লুপ্ত রচনার পুনরুদ্ধার তাঁহার একটি বিশেষ কীর্তি। ঈশ্বর গুপ্তের অনেক কবিতা ব্যঙ্গাত্মক। ইহাদের মধ্যে উপভোগ্য হাস্যরসের নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে তাঁহার অনেক কবিতা অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট। বিলিতী ফ্যাসানের ও নব্য ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে তাঁহার ব্যঙ্গোক্তিমূলক কবিতাগুলি এককালে খুব জনপ্রিয় ছিল। দৃষ্টান্ত :

"যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব
ডুবিয়া জবর টবে চ্যাপেলেতে যাব।
কাঁটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা
দুই হাতে পেট ভরে খাব থাবা থাবা॥"

অন্যত্র

"ইচ্ছা করে ধন্না পাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে।
ভুক হয়ে মুখখানি লুক করি সুখে॥"

ঈশ্বর গুপ্তের শ্লেষ ও শব্দ-চাতুর্যের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত তাঁহার নিজের সম্বন্ধে উক্তি :

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচরে।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকরে॥"

('প্রভাকর' পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন।)

(খ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেম তাঁহার শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৮৬) কবিতায় অনেক বেশী পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' (১৮৫৮) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

টডের 'রাজস্থানে' বর্ণিত পদ্মিনীর রূপে মুগ্ধ আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযান ও চিতোরের পতনের কাহিনী এই ঐতিহাসিক কাব্যখানির বিষয়বস্তু। ইহার একটি উক্তি— "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।"

বাংলা সাহিত্যে রঙ্গলালের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। বাংলাদেশ রঙ্গলাল এবং তাঁহার কাব্য ভুলিয়া গিয়াছে—কিন্তু তাঁহার এই উক্তি এখনও লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে।

রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য 'কর্মদেবী'ও রাজপুত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ইহা ১৮৬২ সনে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার পূর্বেই মধুসূদন দত্ত বাংলা পদ্য-সাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করেন। রঙ্গলালের তৃতীয় কাব্য 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮) রাজপুত-ইতিহাসের একটি কাহিনী অবলম্বনে এবং চতুর্থ কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯) উড়িয়া কবি পুরুষোত্তম দাসের লেখা ঐ নামের একটি প্রাচীন উড়িয়া কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

(গ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও পদ্য সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৪) যুগান্তর আনয়ন করেন এবং উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে। উভয়েই ইংরেজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য; উভয়েই প্রথমে ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া সাহিত্যিক জীবন আরম্ভ করেন কিন্তু শীঘ্রই বাংলা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হন, এবং উভয়েরই রচনা পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত। একজন

উপন্যাসে, আর একজন কাব্যে, বিষয়বস্তু ও ভাষার রীতিতে যে সম্পূর্ণ এক নূতন পন্থা প্রদর্শন করেন তাহা উনিশ শতকের শেষার্ধে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত উপন্যাস ও কাব্য রচনার আদর্শ ভাষা ও বিষয়বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন উপন্যাস ব্যতীত, ধর্মতত্ত্ব, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, এবং গ্রন্থ সমালোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের পথ প্রদর্শক, মধুসূদনও তেমনি মহাকাব্য ব্যতীত 'খণ্ডকাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা', সনেট (চতুর্দশপদী কবিতাবলী) এবং নাটক ও প্রহসন লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের নূতন নূতন দ্বার খুলিয়া দিলেন।

মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় সংস্কৃতের অনুকরণে ত্রিপদী, পয়ার প্রভৃতি ছন্দেরই ব্যবহার হইত এবং তাহাতে যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতির বাহুল্য ছিল। মধুসূদন এই সমুদয় বর্জনপূর্বক পয়ারের বাঁধ ভাঙ্গিয়া এবং দুই চরণের অন্ত্য অক্ষরের মিল উপেক্ষা করিয়া যে এক প্রকার নূতন ছন্দের প্রবর্তন করেন তাহা সাধারণতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলিয়া পরিচিত। ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে সুকুমার সেন বলেন:

"অমিত্রাক্ষর বিদেশি প্রভাবজাত কিন্তু বিদেশি বস্তু নয়, আসলে ইহা পয়ারই। তফাতে মধ্যে এই যে পুরাণো পয়ারে যেমন দুই চরণে (অর্থাৎ আটাশ অক্ষরে) শেষ যতি পড়ে, অমিত্রাক্ষর পয়ারে তেমন নয়, এখানে শম যত-খুসি চরণের পর যে-কোন পূর্ণ যতিতে (অর্থাৎ প্রথম আট বা শেষ ছয় অক্ষরের পরে) অথবা অর্দ্ধ যতিতে (অর্থাৎ প্রথম অর্দ্ধে চার ও শেষ অর্দ্ধে তিন অক্ষরের পরে হইতে পারে। পয়ারের মিলের বন্ধনীতে দুই চরণের মধ্যে বাক্য শেষ করিতেই হয়। পয়ারের এই দুই-চরণের নিগড় ভাঙ্গিয়া মধুসূদন ছন্দের ওসার বাড়াইয়া বাক্য-প্রসারের অবকাশ দিলেন,—ইহাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল রহস্য। বস্তুত মিল না থাকাটাই বড় কথা নয়, যতিসংখ্যার উপচয় অর্থাৎ ছন্দের প্রবহমাণতাই অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্য।"[৩৫]

অমিত্রাক্ষর ছন্দে মধুসূদনের প্রথম রচনা "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" (১৮৫৯-৬০) বিশেষ সমাদর লাভ করে নাই। কিন্তু সাহিত্য-রসিকগণ ইহাতেই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সম্ভাবনা দেখিতে পান। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক পত্রিকায় ইহার প্রথম সর্গ মুদ্রিত করেন (১৮৫৯) এবং ভূমিকায় লেখেন—"ইহার রচনা প্রণালী অপর সকল বাঙ্গালী কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ছন্দ ও ভাবের অনুশীলন ও অন্ত্যযমকের পরিত্যাগ করা হইয়াছে।" ইহার বাইশ বৎসর পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন: "আমরা মাইকেলের

তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব। যদি ইহার পূর্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদিগের সেই অন্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব।"৩৬

মহাভারতে বর্ণিত সুন্দ, উপসুন্দ ও তিলোত্তমার কাহিনী অবলম্বনে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচিত হইয়াছে। কাব্যটির স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও সমগ্রভাবে কাব্যটি আকর্ষণীয় হইতে পারে নাই। ইহার কোন চরিত্রও জীবন্ত হয় নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম বাংলা কাব্য বলিয়া ইহার বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কিন্তু এই কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নহে, ইহার মধ্যে ধ্বনিপ্রবাহ খণ্ডিত হওয়ার যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে পুরাপুরি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মধুসূদনের অমর কাব্য 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এই যে ঐ বৎসরেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। 'মেঘনাদবধ'কে সমালোচকেরা "মহাকাব্য" আখ্যা দিয়াছেন। রামায়ণ-মহাভারত যে অর্থে মহাকাব্য, 'মেঘনাদবধ' সেই অর্থে মহাকাব্য নয়। কিন্তু দান্তের *Divina Comedia* এবং মিল্টনের *Paradise Lost*-এর মত 'মেঘনদবধ'কে Literary Epic বা সাহিত্যিক মহাকাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর মহাকাব্যের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যসমূহ—প্রাচীন কালের পটভূমি, ভাষার সারল্য ও স্পষ্টতা, ভাবের গভীরতা ও বলিষ্ঠতা—'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মধ্যে পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়। উপরন্তু মধুসূদন বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণে' নির্দেশিত মহাকাব্যের লক্ষণসমূহের মধ্যে অনেকগুলি 'মেঘনাদবধে' রূপায়িত করিয়াছেন। এই শ্রেণীর মহাকাব্যে সমসাময়িক যুগচেতনার প্রতিচ্ছায়া পড়িয়া থাকে, 'মেঘনাদবধে'ও পড়িয়াছে। প্রচলিত মূল্যবোধ ও সনাতন ভারতীয় আদর্শের বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী তরুণদের বিদ্রোহ ও তাহাদের স্বাধীন চিন্তার প্রতিচ্ছায়া এই কাব্যে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'মেঘনাদবধে' মধুসূদন রাম-লক্ষ্মণ অপেক্ষা রাবণ-মেঘনাদকে বড় করিয়া প্রচলিত আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন; এই কাব্যের রাবণ ও মেঘনাদ অসভ্য রাক্ষস নয়, তাহারা সুসভ্য রাজা ও রাজপুত্র—মহত্ব, বীরত্ব, দেশপ্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভূষিত। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রত্যেকটি মুখ্য চরিত্রই জীবন্ত। বিশেষত রাবণ-চরিত্রটি কবির এক আশ্চর্য সৃষ্টি। একদিকে বিরাট ঐশ্বর্য, বিরাট গৌরব, অপরদিকে নিয়তির

বিরূপতা, উপর্যুপরি পুত্রশোক—এই দুয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মহাতেজস্বী রাজেন্দ্র রাবণ ট্রাজেডির মূর্ত প্রতীকরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের স্ত্রী প্রমীলাও তাঁহার এক অভিনব সৃষ্টি। রামায়ণের কাহিনী তিনি এই কাব্যে সম্পূর্ণ এক নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন। ইহার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত—সরমার নিকট সীতার বিলাপ—

ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরী তীরে
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বান্ধি নীড় থাকে সুখে।

আর একটি দৃষ্টান্ত এই মহাকাব্যের শেষাংশে প্রমীলা ও রাবণের বিলাপ। মধ্যযুগের কবিতায় ইহা দুর্লভ। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে কোন বাঙ্গালী কবি এই শ্রেণীর কবিতা লেখেন নাই।

বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই কাব্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই কাব্যের ভাষা অপূর্ব ওজোগুণে মণ্ডিত; প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া এবং বহুল মাত্রায় নামধাতু প্রয়োগ করিয়া মধুসূদন এই ওজোগুণ সৃষ্টি করিয়াছেন। মধুসূদনের ভাষায় কোথাও কোথাও দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন—'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে'। এইরূপ আভিধানিক সংস্কৃত শব্দের বিন্যাসের বিরুদ্ধে অনেকেই তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—কিন্তু মধুসূদনের কঠোর সমালোচক কিশোর রবীন্দ্রনাথের মতে এই ছত্রটিতে "ভাবের অনুযায়ী কথা বসিয়াছে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গ বার বার আসিয়া তটভাগে আঘাত করিতেছে"।[৩৭] ইহাও একেবারে অমূলক বলা যায় না।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' বহু ভারতীয় ও পাশ্চাত্য কবির প্রভাব দেখা যায়। ভারতীয় কবির মধ্যে প্রধান বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস; ইঁহাদের রচিত সংস্কৃত ও বাংলা রামায়ণ হইতে মধুসূদন তাঁহার কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সে জন্য তিনি ইঁহাদের কাছে ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই কাব্যের কাহিনী, বর্ণনা এবং চরিত্র-চিত্রণে মধুসূদন অনেকাংশে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিদের দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছেন। মিল্টন কর্তৃক ব্যবহৃত Blank Verse-এর আদর্শেই মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য কবিদের নিকট হইতে সংগৃহীত উপকরণগুলি মধুসূদন সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহার কাব্যে বৈদেশিক গন্ধ পাওয়া যায় না।

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যও ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কারণে অনেকেই ইহাকে 'মেঘনাদবধে'র সমকালীন রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু মধুসূদনের চিঠিপত্র হইতে জানা যায় যে, 'ব্রজাঙ্গনা'র রচনা ইহার প্রকাশের বৎসরাধিককাল পূর্বে সমাপ্ত হইয়াছিল। 'ব্রজাঙ্গনা' মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহাতে রাধার বিরহ বর্ণিত হইয়াছে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশিত হয়। ইহা যীশুখ্রীষ্টের সমসাময়িক রোমান কবি ওভিদের Heroides নামক ল্যাটিন কাব্যের আদর্শে রচিত। ওভিদের কাব্যে যেমন গ্রীক পুরাণ ও কাব্যের নায়িকারা পত্রের মধ্য দিয়া তাহাদের স্বামী বা প্রণয়ীর কাছে প্রেম নিবেদন করিয়াছে, তেমনই 'বীরাঙ্গনা' কাব্যেও সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্যের নায়িকারা পত্রের ভিতর দিয়া তাহাদের স্বামী বা প্রণয়ীর কাছে অন্তরের কথা ব্যক্ত করিয়াছে। 'বীরাঙ্গনা'র পত্রগুলিতে বিভিন্ন ধরণের ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। সুর্পণখা, উর্বশী, শকুন্তলা প্রভৃতি নায়িকাদের পত্রে প্রেম, দুঃশলা ও ভানুমতীর পত্রে ভয়, জাহ্নবীর পত্রে ঔদাসীন্য এবং কেকয়ী ও জনার পত্রে ক্রোধের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যে শুধু ওজোগুণ-সমন্বিত বিষয়বস্তু নহে, নারী-হৃদয়ের সুকুমার অনুভূতিও রূপায়ণে সক্ষম, 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে মধুসূদন তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন; আবার নারীর উক্তির মধ্যেও যে ওজোগুণ স্ফূর্ত হইতে পারে, 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' ও 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্রিকায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

ইহার পর মধুসূদন অনেকগুলি কাব্য এবং 'হেক্‌টর বধ' নামে একটি গদ্যগ্রন্থও রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু কোনটিই শেষ করিতে পারেন নাই। হেক্‌টর বধ অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই তিনি প্রকাশ করেন (১৮৭১)। ইহাতে ইলিয়াড কাব্যের কাহিনীর একাংশ বর্ণিত হইয়াছে।

১৮৫৮ হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মধুসূদনের প্রায় সব বিশিষ্ট গ্রন্থই প্রকাশিত হয়। তাঁহার দুইটি বিখ্যাত কবিতা—'আত্মবিলাপ' ও 'বঙ্গভূমির প্রতি'ও এই সময়েই রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই সময়ের মধ্যেই তিনি প্রথম একটি বাংলা সনেট রচনা করেন; তাহার নাম 'কবি-মাতৃভাষা'। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন ইংলণ্ডে যান। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে কয়েক বৎসর কাটাইবার পর তিনি ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরেন। বিদেশে অবস্থানের সময়ে মধুসূদন অনেকগুলি বাংলা সনেট রচনা করেন; তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থে (১৮৬৬) সেগুলি

সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই সনেটগুলি মধুস্থদনের বিশিষ্ট সৃষ্টিসমূহের অন্যতম। ইহাদের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও অপরিসীম। ইহাদের কতকগুলি পেত্রার্ক ও দান্তে প্রভৃতি বিদেশী কবিদের ও কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি স্বদেশী কবিদের প্রতি মধুস্থদনের শ্রদ্ধা নিবেদন। সুদূর প্রবাসে বসিয়া দেশের জন্য তাঁহার মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিত; তাহারই ছাপ রহিয়া গিয়াছে 'নদীতীরে দ্বাদশ শিবমন্দির', 'কপোতক্ষ নদ', 'বৌ কথা কও' প্রভৃতি সনেটের মধ্যে। আবার কোন কোন সনেটে তাঁহার সাময়িক অনুভূতি অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে; যেমন—'কোন পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া'। মধুস্থদনের সনেটগুলি চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার ছন্দে রচিত। আঙ্গিকের দিক্ দিয়া বা রসের দিক দিয়া তাঁহার সব সনেট নিখুঁত নহে। কিন্তু দুইটি কারণে ইহাদের গুরুত্ব অপরিসীম; প্রথমত, বাংলা সাহিত্যে এই সর্বপ্রথম কবির আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস এ রকম সংহত রূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে; দ্বিতীয়ত, এই সনেট-গুলিতে মধুস্থদনের মনোরাজ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

মধুস্থদন ছোটদের জন্য অনেকগুলি সুন্দর নীতি-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; যেমন 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা', 'গদা ও সদা', 'দেবদৃষ্টি' প্রভৃতি। ইহাদের কোনটি মৌলিক, আবার কোনটিতে Æsop's Fables ও 'হিতোপদেশে'-এর প্রভাব দেখা যায়। বাংলা শিশুসাহিত্যেরও মধুস্থদন পথিকৃৎ।

যতদূর জানা যায়, মধুস্থদনের বিখ্যাত সমাধি লিপিটিই তাঁহার শেষ কবিতা।

মধুস্থদনের অনুকরণে বহু কাব্য ও কবিতা রচিত হইয়াছে। ব্রজনাথ মিত্রের "কাদম্বরী কাব্য" মধুস্থদনের প্রায় আক্ষরিক অনুকরণ। দীননাথ ধরের "কংশবিনাশ কাব্য" (১৮৬১), রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'দানবদলন কাব্য' প্রভৃতি 'মেঘনাদবধ'-এর অক্ষম অনুকরণের নিদর্শন। 'বীরাঙ্গনা' ও 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর'ও অনেক অনুকরণ হইয়াছিল। মেঘনাদবধের 'প্যারডি' হিসাবে জগবন্ধু ভদ্র 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' রচনা করেন। মুসলমান কবি মুহম্মদ কাজেম ওরফে "কায়কোবাদ" (১৮৫৪-১৯৫১) রচিত 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) মেঘনাদবধ' কাব্যের অনুসরণে—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ও মারাঠা শক্তির পতনকাহিনী অবলম্বনে রচিত "মহাকাব্য"।

(ঘ) মধুসূদনের পরবর্তী কবিগণ

মধুস্থদন ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী সময়ে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন এই দুই কবিই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—এবং কবিতার এই যুগ

সাধারণতঃ হেম-নবীনের যুগ বলিয়াই অভিহিত। কিন্তু ইঁহাদের সমসাময়িক বিহারীলাল চক্রবর্তী ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার খুব খ্যাতনামা না হইলেইও কবি-প্রতিভার বিশিষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে বিহারী-লালের প্রসঙ্গ থাকায় তিনি বর্তমান যুগে খানিকটা পরিচিত, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বর্তমান যুগে বিস্মৃত প্রায়।

বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-৯৪) শ্রেষ্ঠ কাব্য "সারদামঙ্গল" (১২৮৬ সাল)। তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে 'সাধের আসন', 'প্রেমপ্রবাহিনী', 'বন্ধু-বিয়োগ', 'নিসর্গসন্দর্শন', ও 'বঙ্গসুন্দরী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমুদয় কাব্যে যে 'আত্মগত অন্তরঙ্গ' ভাব ফুটিয়াছে তাহা তখনকার বাংলা সাহিত্যে অভিনব বস্তু ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "বিহারীলালের মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত,—তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল।[৩৮]" বর্তমান একজন সমালোচক যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন, "হৃদয়াবেগের প্রবলতা ফেনোচ্ছ্বসিত হওয়ায় বিহারীলালের কাব্যের বিষয় তলাইয়া গিয়া প্রায়ই স্পষ্ট ও সুসংহত হইতে পারে নাই ···· তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে বিহারীলালের কাব্যে কল্পনা যেমন মৌলিক ভাষাও মোটামুটি তেমনি প্রকাশক্ষম।"[৩৯]

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের (১৮৩৮-৭৮) শ্রেষ্ঠ কাব্য 'মহিলা' তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৮০ সনে প্রকাশিত হয়, কিন্তু ইহা প্রায় দশ বৎসর পূর্বে রচিত। কেহ কেহ মনে করেন এই কাব্যের পরিকল্পনা বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' পাঠের ফল। বিহারীলালের মত সুরেন্দ্রনাথও প্রেমের কবি। নারীর মহিমা সম্বন্ধে কবির খুব উচ্চ ধারণা ছিল। 'মহিলা' কাব্যে তিনি নারীপ্রকৃতি যে নরপ্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই ধারণা নারীর 'মাতা' ও 'জায়া' রূপের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। 'ভগ্নী'-রূপের বর্ণনাও তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

সুরেন্দ্রনাথের আরও অনেক খণ্ড কবিতা ও কাব্য আছে। সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার সুরেন্দ্রনাথের কাব্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বাংলার এই উপেক্ষিত কবিকে স্ব মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই।

গদ্য সাহিত্য প্রসঙ্গে উল্লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাংলার একজন উপেক্ষিত কবি। তাঁহার 'স্বপ্ন প্রয়াণ' (১৮৭৫) মনোজগতের রূপক এবং এই হিসাবে

স্পেন্সারের 'ফেয়ারী কুইন' এবং বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস' এই দুইখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়। ইহা আধ্যাত্মিক কাব্য নয়, পুরাপুরি রসাত্মক কাব্য।[৪০] ইহার মধ্যে কবি স্বপ্নদর্শনের রূপকের মধ্য দিয়া নিজের অন্তর্জীবনের সাধনা ও সংগ্রামের আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন।

ইঁহাদের তুলনায় উনিশ শতকের আর দুই জন কবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র অনেক বেশী পরিমাণে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের কবিতার সমাদর হ্রাস পাইলেও এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) প্রধানতঃ দেশপ্রেমমূলক কবিতার জন্যই আজও স্মরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার 'ভারত বিলাপ', 'ভারত ভিক্ষা', 'ভারত সঙ্গীত',[৪১] 'রিপন উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ' প্রভৃতি কবিতাগুলি এই শতকের প্রথমে লোকের মুখে মুখে ফিরিত ও অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিত। ইলবার্ট বিল উপলক্ষে সাহেবদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে 'নেভার—নেভার' এবং কলিকাতার একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে ব্রিটিশ যুবরাজের অভ্যর্থনা ও সমাদর উপলক্ষে রচিত "বাজিমাৎ"—হেমচন্দ্রের এই দুইটি ব্যঙ্গ কবিতাও এককালে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। হেমচন্দ্রের প্রথম ক্ষুদ্র কাব্য "চিন্তা তরঙ্গিণী" ১৮৬১ ও দ্বিতীয় কাব্য "বীরবাহু" ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১৮৭৫-৭৭) পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে লিখিত হইলেও ইহাতে তাঁহার নিজস্ব অবদান ও ইংরেজী কাব্যের অনুকরণ আছে। এক শ্রেণীর লেখক, এবং কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথও, 'মেঘনাদবধে'র তুলনায় 'বৃত্রসংহার'কে উচ্চতর আসন দিয়াছেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করা কঠিন। "সাধারণ পাঠকের কাছে বৃত্রসংহারকে ছন্দের সহজ লালিত্য, রচনার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সরলতা সবিশেষ সহজ বোধ্য করিয়াছিল"[৪২]—বর্তমান একজন সমালোচকের এই উক্তি আংশিক সত্য হইলেও মধুসূদনের ভাষার ওজস্বিতার তুলনায় হেমচন্দ্রের ভাষার মৃদুমন্থর গতি সকলেই অনুভব করে এবং অনেককেই পীড়িত করে। মধুসূদনের "সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি".........অথবা নবীনচন্দ্রের "দ্বিতীয় প্রহর নিশি নীরব অবনী"—ইত্যাদি "মেঘনাদ বধ" ও "পলাশির যুদ্ধ" কাব্যের গ্রন্থারম্ভের প্রথম কয়েক পংক্তির সহিত 'বৃত্রসংহারের' আরম্ভ—"বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ" ও পরবর্তী কয়েক পংক্তির তুলনা করিলে—হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব মানিয়া লওয়া যায় না। বিষয়বস্তুর বিন্যাস, চরিত্র গঠন ও কবিত্বময় সৌন্দর্য বর্ণনা বিচার করিয়াও অনেকে ঐ একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমান

শতকের গোড়ায় 'বৃত্রসংহার' ব্যতীত হেমচন্দ্রের পূর্বোক্ত দুইখানি ও পরবর্তী অন্য দুইখানি কাব্য 'আশা কানন' (১৮৭৬) ও 'ছায়াময়ী' (১৮৮০) প্রভৃতির বিশেষ কোন সমাদর ছিল না। তাঁহার কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত ছিল 'কবিতাবলী'র (দুই খণ্ড ১৮৭০, ১৮৮০) উপর। 'কবিতাবলী'র অন্তর্গত দেশাত্মবোধক ও অন্যান্য কবিতাই (বৃত্রসংহার নহে) এখনও তাঁহার কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ কবিতা 'হুতোম প্যাঁচার গান' আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। তিনি 'নাকে খৎ' নামে একটি হাস্যরসাত্মক কাব্যও লিখিয়াছিলেন। ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় তাঁহার সহজাত দক্ষতা ছিল। হেমচন্দ্রের অন্যান্য রচনার মধ্যে 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২) আধ্যাত্মিক ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকে ইহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন—কিন্তু প্রাচীন ও প্রবীণ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মন্তব্য করিয়াছিলেন "দুর্ভাগ্যক্রমে দশমহাবিদ্যার দর্শন-ভাগ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই।" হেমচন্দ্র শেক্সপীয়রের দুইখানি নাটকের ছায়া অবলম্বনে 'নলিনী বসন্ত' (১৮৬৮)[৪৩] ও রোমিও জুলিয়েত (১৮৯৫) রচনা করেন।

নবীন চন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশ রঞ্জিনী' প্রথম খণ্ড (১৮৭১) বিভিন্নকালে রচিত কতকগুলি কবিতার সমষ্টি। ইহার মধ্য দিয়াই প্রকৃত 'লিরিক' বা পাশ্চাত্য গীতিকবিতার প্রথম গুঞ্জন শোনা যায়। ইহার প্রথম কবিতা 'পিতৃহীন যুবক', এবং 'বিধবা কামিনী' ও অন্যান্য কয়েকটি কবিতা কবির ছাত্রাবস্থায় রচিত হইলেও, প্রবীণ সাহিত্যিক প্যারীচরণ সরকার ও কৃষ্ণ-কমল ভট্টাচার্য এগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং 'এডুকেশন গেজেটে' ইহা ছাপা হয়। নবীনচন্দ্রের কয়েকটি দেশপ্রেমমূলক কবিতা 'অবকাশ রঞ্জিনী'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে যুবরাজ এডওয়ার্ডের ভারত আগমন উপলক্ষে রচিত 'ভারত-উচ্ছ্বাস' (১৮৭৫) একটি প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলিয়া আদৃত হয় এবং ইহার জন্য ভারত সরকার কবিকে পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার দেন। হিন্দুর অতীত গৌরবের স্মৃতি এই কবিতার মাধ্যমে যেরূপ মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহা প্রায় অতুলনীয় বলা যায়। ইহাকে হেমচন্দ্রের অনুকরণ মাত্র মনে করিলে[৪৪] কবির প্রতি অবিচার করা হইবে। ১৮৭৬ খ্রীঃ 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হইলে নবীনচন্দ্রের কবিখ্যাতি সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয়। এই কাব্যে রূপায়িত সিরাজউদ্দৌলার চরিত্র ও ঘটনার পরিবেশ যে অনেক স্থলে ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী বর্তমান যুগের গবেষণায় তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু যে যুগে

প্রচলিত ধারণার উপর কিছু কল্পনা মিশ্রিত করিয়া কবি যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া তাহা খুব উচ্চশ্রেণীর কাব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার 'বান্ধব' পত্রিকায় ইহার "অসাধারণ কবিত্বের" উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলেন, "যতদিন বঙ্গভাষা জীবিত থাকিবে, তত দিনই ইহার প্রফুল্লকান্তি বঙ্গবাসীর হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হইবে।"

পলাশির যুদ্ধের পর নবীনচন্দ্রের 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) ও 'রঙ্গমতী' (১৮৮০) প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামের অধিবাসী। রঙ্গমতী বা রাঙ্গামাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল ও বিশেষ হৃদয়গ্রাহী।

ইহার ছয় বৎসর পরে ক্রমান্বয়ে 'রৈবতক' (১৮৮৬) 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬) প্রকাশিত হয়। এই তিনখানি কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা যথাক্রমে সুভদ্রাহরণ, অভিমন্যুবধ এবং যদুবংশ-ধ্বংস।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৯২) ঐতিহাসিক বিচার দ্বারা কৃষ্ণচরিত্রের যে অপরূপ ও অভিনব ব্যাখ্যা করেন, নবীনচন্দ্রও উক্ত 'কাব্যত্রয়ীর' মাধ্যমে সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে এক নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হন। তাঁহার কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণ যে মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা মূলতঃ নিষ্কাম কর্ম ও নিষ্কাম প্রেমের আদর্শ স্থাপন ও তাহার ফলস্বরূপ আর্য ও অনার্যের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপন পূর্বক হিন্দু সংস্কৃতির উন্নতি সাধন। অনেক সমালোচকের মতে কবিত্বের রস ও মাধুর্য, চরিত্রের (বিশেষতঃ নারী চরিত্রের) সৃষ্টি এবং কল্পনার বিশালতা এই সকলের অপূর্ব সংমিশ্রণে নবীনচন্দ্রের এই কাব্যত্রয়ী "বাংলা ভাষার কণ্ঠে একটি কমনীয় হার স্বরূপ" বিরাজ করিবে।

নবীনচন্দ্র প্রথমে যীশুখ্রীষ্ট, এবং পরে বুদ্ধ ও চৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে সুললিত ও সহজ ভাষায় তিনখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। ইহাদের নাম যথাক্রমে খৃষ্ট (১২৯৭ সাল), অমিতাভ (১৩০২ সাল), ও অমৃতাভ (১৩১৬ সাল)। নবীনচন্দ্র ভাগবদ্গীতার এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পদ্যানুবাদ করেন (১৮৮৯, ১৮৯৪)। নবীনচন্দ্রের 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২) 'ভানুমতী' (আখ্যায়িকা, ১৩০৭) ও আত্মজীবনী 'আমার জীবন' (১৩১৪-২০) গদ্যরচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক আরও কয়েকজন কবির রচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ বলেন, 'উদাসিনী' (১৮৭৪) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের

রচয়িতা অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৮৯৮) "বাঙ্গালা সাহিত্যে রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কবিতার প্রবর্তন করিয়াছিলেন।"[৪৫] এই শ্রেণীর একজন ছন্দজ্ঞ কবি বলদেব পালিত (১৮৩৫-১৯০০)। ইঁহার 'কাব্যমঞ্জরী' (১৮৬৮), 'ভর্তৃহরি কাব্য' (১৮৭২) ও 'কর্ণার্জুন কাব্যে' (১৮৭৫) ছন্দোনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও (১৮৫৬-১৮৯৭) কবি ছিলেন। তিনি কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪) গদ্যে ও পদ্যে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুতঃ মধুসূদনের পর বাংলায় কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল বহু—কিন্তু তাঁহাদের অনেকেরই নাম ও রচনা বিস্মৃতির গহ্বরে বিলীন হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০) বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হইলেও তাঁহার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি কয়েকখানি কাব্য ও অনেকগুলি সরস কবিতা লিখিয়াছেন। নারীপ্রেমের বিচিত্র প্রকাশ তাঁহার কাব্যে মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে—পরিণত বয়সের কবিতায় বাৎসল্যরসও আছে। সনেট রচনাতেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফুলবালা' (১৮৮০) ও 'অশোকগুচ্ছ' (১৯০০)।

সমসাময়িক কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) হতাশ প্রেমের কবি। তাঁহার জন্ম পূর্ববঙ্গে এবং এই অঞ্চলের কতকগুলি বিশেষত্ব গোবিন্দচন্দ্রের কবিতায়ই প্রথম পরিস্ফুট হইয়াছে। যৌবনের একাধিক সঙ্গিনী ও সহধর্মিনীর প্রতি ভালবাসা এবং তাঁহাদের অকাল মৃত্যুই গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার উৎস। ইহার মধ্য দিয়া যে দেহসর্বস্ব প্রেমের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়াছে তাহা গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। গোবিন্দচন্দ্র ইংরেজী সাহিত্যের সহিত পরিচিত ছিলেন না এবং তাঁহার কবিতায় অমার্জিত সরল সহজ গ্রাম্য ভাব যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা সে যুগে অপরিচিত ছিল। ভাওয়ালের রাজপরিবারের অত্যাচারে উৎপীড়িত, হৃতসর্বস্ব পূর্ববঙ্গের এই জনপ্রিয় কবি শেষ জীবনে দারিদ্র্যের ও অভাবের তাড়নায় কয়েকটি মর্মন্তুদ কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই শ্রেণীর ব্যঙ্গ কাব্য 'মগের মুলুক' (১২৯৯ সাল) ও অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—'প্রেম ও ফুল' (১২৯৪), 'কুঙ্কুম' (১২৯৮), 'কস্তুরী' (১৩০২), 'চন্দন' (১৩০৩), 'ফুলরেণু' (১৩০৩) প্রভৃতি কবিতা পূর্ববঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৮) পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—

'প্রদীপ' (১৮৮৪), 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫), 'ভুল' (১৮৮৭), 'শঙ্খ' (১৯১০) এবং 'এষা' (১৯১২)। তাঁহার কাব্যে বিহারীলাল চক্রবর্তীর হৃদয়োচ্ছ্বাস এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সংযম ও যুক্তিনিষ্ঠ ভাবাবেগের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। 'এষা' কাব্যে তাঁহার পত্নীবিয়োগজনিত শোক অভিব্যক্ত হইয়াছে; সমালোচকদের মতে এইটিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) রচিত 'আর্যগাথা' (১৮৮২,১৮৯৩), 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯), 'হাসির গান' (১৯০০), 'মন্দ্র' (১৯০২), 'আলেখ্য' (১৯০৭) এবং 'ত্রিবেণী' (১৯১২) কবি হিসাবে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। দ্বিজেন্দ্র লালের কবিতার দুইটি প্রধান গুণ—গীতি-মাধুর্য এবং ব্যঙ্গরস; তাঁহার অনেক কবিতায় এই দুইটি পরস্পরবিরোধী গুণের বিস্ময়কর সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কবিতার ভাষা গদ্যের ভাষার কাছাকাছি, কিন্তু ছন্দোমণ্ডিত ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রলালের অননুকরণীয় হাসির গানগুলি অনাবিল কৌতুকরসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ও অত্যন্ত উপভোগ্য। তিনি অনেকগুলি স্বদেশী গানও রচনা করিয়াছিলেন; উচ্ছ্বসিত দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি হিসাবে এগুলির জনপ্রিয়তা আজিও অম্লান। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি সুরের দিক দিয়াও অনবদ্য সৃষ্টি।

রজনীকান্ত সেন (১৮৮৫-১৯১০) প্রধানতঃ সঙ্গীত রচয়িতা। তাঁহার জীবিত-কালে 'বাণী' (১৯০২), 'কল্যাণী' (১৯০৫) এবং 'অমৃত' (১৯১০) এই তিনটি, এবং মৃত্যুর পরে 'আনন্দময়ী' (১৯১০), 'বিশ্রাম' (১৯১০), 'অভয়া' (১৯১০), 'সদ্ভাব-কুসুম' (১৯১৩) এবং 'শেষ দান' (১৯২৭) এই পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রজনীকান্ত ভক্তিমূলক গান, হাসির গান, স্বদেশী গান ও নীতিকবিতা রচনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু ভক্তিমূলক গান-গুলিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, এবং ইহার মধ্য দিয়াই কবির গভীর ভক্তিভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু এবং প্রিয়ম্বদা দেবী প্রভৃতি কয়েকজন মহিলা কবির নামও উল্লেখযোগ্য।

৪। নাটক

(ক) প্রস্তুতি-পর্ব।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে আধুনিক বাংলা নাট্য সাহিত্যের আবির্ভাব হয়। তাহার পূর্বে প্রধানতঃ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইত তাহা-

দিগকে প্রকৃত নাটক সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, তবে বাংলা নাটকের প্রস্তুতি-পর্বের নাটকরূপে তাহাদের কিছু মূল্য আছে। এই সমুদয় নাটকের অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত হইয়াছে—এবং কোন্‌গুলি সত্য সত্যই অভিনীত হইয়াছিল তাহাও সঠিক বলা যায় না। 'সাজবদল বা কাল্পনিক সংবদল' নামে যে বাংলা নাটকটি বাংলার রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম অভিনীত হয় (১৭৯৫ খ্রীঃ, ২৭ নভেম্বর) তাহা একখানি ইংরেজী নাটকের[৪৫ক] অনুবাদ।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 'প্রস্তুতি-পর্বের' আরও কয়েকখানি নাটক রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের যে কয়েকখানি বাংলা অনুবাদ রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে বিশ্বনাথ ন্যায়রত্নের অনুবাদ ১২৪৬ সালে প্রণীত ও ৩১ বৎসর পর ১৮৭১ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ১৮২২ খ্রীঃ প্রকাশিত 'আত্মতত্ত্ব কৌমুদী' নামক ঐ গ্রন্থের অপর একটি অনুবাদ সম্ভবত প্রথম মুদ্রিত বাংলা নাটক। ঐ বৎসরই 'হাস্যার্ণব', 'ধূর্ত নাটক' ও 'ধূর্ত সমাগম' নামে সংস্কৃত হইতে অনূদিত তিনখানি প্রহসন প্রকাশিত হয়। অশ্লীলতার অপবাদে সম-সাময়িক পত্রিকায় এগুলির বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ১৮২৮ খ্রীঃ সংস্কৃত 'কৌতুক-সর্বস্ব' নাটকের, ১৮৪৮ খ্রীঃ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' এবং ১৭৭১ শকাব্দে (১৮৪৯-৫০ খ্রীঃ) 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মৌলিক রচনার মধ্যে দ্বারকানাথ রায়ের 'বিশ্বমঙ্গল' (১৮৪৫ খ্রীঃ) এবং পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রমণী নাটক' (১৮৪৮ খ্রীঃ) ও 'প্রেমনাটক' (১৮৫৪ খ্রীঃ), এই তিন খানি নক্‌শা বা প্রহসন জাতীয় নাটকের উল্লেখ করা যায়—ইহাতেও আদিরসের প্রাচুর্য আছে। শেষের দুইখানি ও পূর্বোক্ত 'কৌতুক সর্বস্ব' নাটকে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি নাটক নামে অভিহিত হইলেও প্রকৃত নাটকের মর্যাদা-লাভের অধিকারী নহে। নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি বা যাহা বোঝা উচিত, উপন্যাসের ন্যায় ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণেই তাহার সৃষ্টি হয়। ১৮৫২ খ্রীঃ প্রকাশিত জি সি গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' ও তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' বাংলায় মৌলিক নাট্য রচনার প্রথম নিদর্শন। প্রথম নাটকখানি 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার' বিপত্তি দেখাইবার উদ্দেশ্যে রচিত এবং ইহার বিষয়-বস্তু বাংলার প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন 'বিজয়-বসন্ত' নামক কাহিনী। নাটকটি বিয়োগান্ত। 'ভদ্রার্জুন' মিলনান্ত পৌরাণিক নাটক—ইহা যাত্রাগানের ঈষৎ পরি-মার্জিত সংস্করণ। এই নাটকের সংলাপের অধিকাংশই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে

রচিত। এই নাটক অনেকাংশে সংস্কৃত নাটকের আদর্শ অনুসরণ করিলেও ইহাতে নান্দী, প্রস্তাবনা এবং বিদূষক-ভূমিকা নাই। ইংরেজী নাটকের ন্যায় ইহার অঙ্কগুলি 'সংযোগস্থল' অর্থাৎ দৃশ্যে বিভক্ত, এবং ইংরেজী নাটকের Prologue-এর মত এই নাটকের আরম্ভে মূল কাহিনীর পূর্বকথা পয়ারে বর্ণিত হইয়াছে।[৪৬] এইগুলি এবং ইহাদের অব্যবহিত পরবর্তীকালে রচিত কয়েকখানি নাটক সাহিত্যিক মর্যাদা লাভের উপযুক্ত ছিল না; কিন্তু ইহাদের কোন কোনটি একাধিকবার কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। এই সব নাটকের মধ্যে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' (*Merchant of Venice* অবলম্বনে রচিত), 'চারুমুখ-চিত্তহরা' (*Romeo and Juliet* অবলম্বনে রচিত), 'কৌরব-বিয়োগ' (কাশীরাম দাসের মহাভারত অবলম্বনে রচিত) এবং 'রজতগিরি' (ব্রহ্মদেশীয় কাব্য অবলম্বনে রচিত) উল্লেখযোগ্য।

বাংলার প্রথম প্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬)। তাঁহার 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' (১৮৫৪) নামক প্রহসন খুবই খ্যাতি ও অর্থ অর্জন করিয়াছিল। ইহা ছাড়া তিনি আরও কয়েকখানি সামাজিক প্রহসন, তিন খানি পৌরাণিক নাটক ও একখানি প্রচলিত আখ্যায়িকাঘটিত নাটক রচনা করিয়াছিলেন এবং চারিখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কৌলীন্য-জনিত বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পুরুষের লাম্পট্য প্রভৃতি সামাজিক দোষ প্রদর্শনই তাঁহার সামাজিক প্রহসনগুলির উদ্দেশ্য। রামনারায়ণের সমসাময়িক কয়েকজন নাট্যকার তাঁহার প্রহসনগুলির অনুকরণে প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন।

(খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)

রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' (১৮৫৮) নাটকের অভিনয় দেখিয়া মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত হন। এই অনুপ্রেরণার ফলে মধুসূদনের প্রথম বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে (মতান্তরে ১৮৫৯-এর জানুআরি মাসে) প্রথম প্রকাশিত হয়। 'শর্মিষ্ঠা'ই "বাংলা ভাষায় প্রথম দস্তুরমত নাটক"।[৪৭] এই নাটকের প্রস্তাবনায় মধুসূদন দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন—

> "অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
> নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"

এই দুঃখ দূর করিবার জন্যই তিনি "শর্মিষ্ঠা" নাটক লেখেন। মহাভারতের আদি পর্বে বর্ণিত যযাতির উপাখ্যান হইতে এই নাটকের কাহিনী সংগৃহীত এবং কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের আদর্শে ইহা গঠিত। ইহা গদ্যে লেখা,

কিন্তু ইহাতে পয়ার ছন্দে আট ছত্র কবিতা ও ছয়টি গান আছে। ইহা নাট্যমঞ্চে অভিনীত হইয়া যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

মধুসূদনের অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) ও 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'পদ্মাবতী'তে গ্রীক পুরাণের একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী—সোনার আপেল লইয়া তিন দেবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তাহার আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী—নাট্যে রূপায়িত হইয়াছে; তবে এই নাটকে মধুসূদন গ্রীক দেবদেবীদের নাম পরিবর্তিত করিয়া হিন্দু দেবদেবীদের নাম দিয়াছেন। নাটকটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভিন্নমুখী দুইটি ধারা একত্রে মিলিয়াছে। ইহার সংলাপের কয়েকটি ছত্রে মধুসূদন সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে টডের 'রাজস্থানে' বর্ণিত রাজপুত ইতিহাসের একটি আখ্যান রূপায়িত হইয়াছে। রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীকে লইয়া দুইজন রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিবাদ এবং তাহার ফলস্বরূপ কৃষ্ণকুমারীর আত্মবিসর্জনের করুণ কাহিনী এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। নাটকটি ট্র্যাজেডির পর্যায়ভুক্ত। মৃত্যুর পূর্বে এক রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অগ্রিম অর্থ লইয়া মধুসূদন 'মায়াকানন' ও 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে দুইটি নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; প্রথমটি তিনি শেষ করিয়াছিলেন, কিন্তু মুখ্যত অভিনয়ের প্রয়োজনে রঙ্গালয়-কর্তৃপক্ষ ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দিয়া ইহার কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করান। সেই পরিবর্তিত রূপটিই প্রকাশিত হইয়াছে (১৮৭৫)। 'বিষ না ধনুর্গুণ' মধুসূদন সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) নামে দুইখানি উৎকৃষ্ট প্রহসনও রচনা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রহসনটিতে তিনি উন্মার্গগামী নব্য বাঙ্গালীদের দুর্নীতি ও গ্লানি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে তিনি একজন চরিত্রহীন ধর্মধ্বজী বৃদ্ধের চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রাচীনপন্থীদের পাপ ও ভণ্ডামির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। দুইটি প্রহসনেরই ব্যঙ্গ অত্যন্ত ক্ষুরধার ও উপভোগ্য। এই দুইটি প্রহসনের প্রভাব দীনবন্ধু মিত্রের নাটকগুলিতে বিশেষভাবে দেখা যায়।

মধুসূদন তাঁহার নাটকের সংলাপ রচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রহসন দুইটির সংলাপ আশ্চর্য রকমের জীবন্ত। শুধু প্রহসনগুলির নয়, তাঁহার নাটকগুলির সংলাপও মধুসূদন চলিত বাংলায় রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার সমসাময়িক বাঙালী নাট্যকারদিগের মধ্যে প্রায় কেহই তাহা করেন নাই।

মধুসূদন তিনটি বাংলা নাটক ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন—রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী', নিজের 'শর্মিষ্ঠা' এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'।

(গ) মধুসূদনের পরবর্তী নাট্যকারগণ

এই যুগের নাটক রচনায় মধুসূদনের পরেই দীনবন্ধু মিত্রের (১৮২৯-১৮৭৩) স্থান। তাঁহার প্রথম রচনা 'নীলদর্পণে' (১৮৬০) নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র সে যুগে যে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নাট্য প্রতিভার বিশেষ স্ফুরণ না হইলেও ইহাতে উৎপীড়িত অসহায় এক শ্রেণীর বাঙ্গালীদের প্রতি যে মর্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা এই নাটকটিকে অমরত্ব দান করিয়াছে। 'নীলদর্পণ'-এর ভদ্র চরিত্রগুলির তুলনায় নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি খুব জীবন্ত; তাহাদের সংলাপে যশোহর অঞ্চলের কথ্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। 'নীলদর্পণ'-এর পরে দীনবন্ধু আরও তিনখানি নাটক লিখিয়াছিলেন—'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), 'লীলাবতী' (১৮৬৭) এবং 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩); এগুলি খুব উচ্চ শ্রেণীর রচনা নহে। কিন্তু প্রহসন রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন—এবং এ বিষয়ে তিনি মধুসূদনের সহিত তুলনীয়। 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন এবং ইহার নায়ক মত্তপ চরিত্রহীন নিমচাঁদ একটি বাস্তব চরিত্র ও অনবদ্য সৃষ্টি। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) একটি গ্রাম্য বৃদ্ধের শেষ বয়সে বিবাহের উদ্যোগ ও তজ্জনিত লাঞ্ছনার চিত্র—কাহারও কাহারও মতে ইহা একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত। 'জামাই বারিক' (১৮৭২) প্রহসনে কলিকাতার কোন ধনী পরিবারের 'ঘরজামাই'-রাখার প্রথা লইয়া ব্যঙ্গ করা হইয়াছে—ইহার মধ্যে দুই সতীনের ঝগড়ার কাহিনীটি একটি বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। দীনবন্ধুর নাটকগুলিতে অনেক পরিমাণে বিশুদ্ধ কৌতুকরস থাকায় তৎকালে ইহাদের অভিনয় খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। তবে রুচি পরিবর্তিত হওয়ায় বর্তমানে তাঁহার প্রহসনগুলি আর তেমন উপভোগ্য নহে।

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন। ইহার মধ্যে 'সতী' নাটকই (১৮৭৩) সর্বশ্রেষ্ঠ। এই নাটকগুলি পুরাতন যাত্রা-পাঁচালী-কথকতার সহিত নবীন নাট্যরীতির যোগাযোগ ঘটাইয়া "পুরাতন-নূতনের গ্রন্থি-বন্ধন" এবং "বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাসের আদি ও মধ্যযুগের মধ্যে সেতু সংযোগ করিয়াছে।"[৪৮] ইহা ছাড়াও তাঁহার নাটকগুলির জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ এই যে ইহাদের মধ্য দিয়া সে যুগের নবজাগ্রত

জাতীয়তার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১৮৭৪ খ্রীঃ রচিত "দিনের দিন, সবে দীন, হয়ে পরাধীন! অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, অপমানে তনু ক্ষীণ!" এই বিখ্যাত গানটি এবং করভার প্রপীড়িত দেশের দুঃখের বর্ণনামূলক আর একটি গান মনোমোহনের 'হরিশ্চন্দ্র' নাটকের অন্তর্ভুক্ত।

সে যুগের রঙ্গশালা প্রতিষ্ঠার ফলে বহু নাটক লিখিত হয়। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ, সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের আখ্যান এবং আধুনিক ও পুরাতন কাব্যের বিষয় অবলম্বনে বহু নাটক রচিত হইয়াছিল। 'মেঘনাদবধ' কাব্য অবলম্বনে অন্ততঃ ছয়খানি নাটক রচিত হয়। সামাজিক সমস্যা, সমসাময়িক ঘটনা, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কুৎসা প্রভৃতি লইয়া বহু নাটক রচিত হইয়াছিল। নাট্যাকারে অনেক যাত্রার পালাও রচিত হয়। নাট্যকারদের মধ্যে মীর মশারফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২) ও অন্য দুই জন মুসলমান ও কয়েকজন মহিলা ছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি নাট্যকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৮-১৯২৫) মৌলিক রচনার মধ্যে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামক একাঙ্ক প্রহসন (১৮৭২) (কেশবচন্দ্র সেনের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কটাক্ষ), 'অলীকবাবু' নামে আর একটি প্রহসন, দেশপ্রেম-মূলক 'পুরু বিক্রম' (১৮৭৪) ও 'সরোজিনী' বা 'চিতোর আক্রমণ' (১৮৭৫) নাটক এবং 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) নাটক বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু বহু সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের অনুবাদ, এবং মারাঠি ভাষার কয়েকখানি গ্রন্থের অনুবাদই বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট কীর্তি।

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪) বহুসংখ্যক পৌরাণিক নাটক ও নাট্যগীতি রচনা করেন। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮) ও 'হরধনুর্ভঙ্গ' (১৮৮১)। শেষোক্ত নাটকের সংলাপে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ছন্দ বাংলা নাটকে রাজকৃষ্ণ প্রথম ব্যবহার করেন।

এই যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) একাধারে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, সুদক্ষ অভিনেতা ও বহুসংখ্যক নাটকের রচয়িতা ছিলেন। তিনি বহু প্রসিদ্ধ কাব্য ও উপন্যাসের নাট্যরূপ, অনেক অপেরা বা নাট্যগীতি, এবং বহু মৌলিক নাটক রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মৌলিক নাটকগুলি পৌরাণিক কাহিনী, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি

ধর্মগুরু ও সাধুসন্তের জীবনী, গার্হস্থ্য ও সামাজিক চিত্র এবং ঐতিহাসিক কাহিনী প্রভৃতি অবলম্বনে লিখিত। ইহাদের মধ্যে 'জনা', 'চৈতন্যলীলা' ও 'বুদ্ধদেব-চরিত' বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' (১৩১২ সালে), 'মীরকাশিম' (১৩১৩) ও 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৩১৪)—এই তিনখানি নাটক অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার পর তিনি আবার পুরাতন যুগের ন্যায় 'শঙ্করাচার্য', 'অশোক', 'তপোবল' প্রভৃতি পৌরাণিক বা প্রাচীন-যুগাশ্রিত নাটক রচনা করেন।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে করুণ-রসাত্মক নাটক 'প্রফুল্ল' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। তাঁহার অন্যান্য সামাজিক নাটকের মধ্যে 'হারানিধি', 'শাস্তি কি শান্তি' ও 'বলিদান' উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত নাটকে পণপ্রথার বিষময় ফল প্রদর্শিত হইয়াছে।

নাট্যরচনার সংখ্যায় গিরিশচন্দ্র আর সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহার নাট্য-প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন—কিন্তু এ বিষয়ে সমালোচকেরা একমত নহেন। ডঃ সুকুমার সেন লিখিয়াছেন, "গীতিনাট্যের কথা বাদ দিলে তাঁহার প্রায় পঁয়তাল্লিশখানি নাটকের বদলে চার পাঁচখানি মাত্র লিখিলে তাঁহার যশের হানি হইত না।"[৪৯]........."গিরিশের নাটকে উঁচু দরের সাহিত্যশিল্পের পরিচয় নাই।"[৫০]

পৌরাণিক নাটকগুলিই গিরিশচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট সৃষ্টি। ইহাদের বহিরাঙ্গিক পাশ্চাত্য নাটকের মত হইলেও মূলতঃ এইগুলি যাত্রারই অনুরূপ। সুতরাং পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে বিচার করিলে ইহাদের মধ্যে অনেক পরিমাণে নাট্যগুণের অভাব দেখা যাইবে। কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এইগুলি আমাদের দেশের ঐতিহ্য অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে।

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) গিরিশচন্দ্রের ন্যায় সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন এবং সমসাময়িক সামাজিক চিত্র অবলম্বনে অনেক অভিনয়োপযোগী প্রহসন ও বিদ্রূপাত্মক নক্শা রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 'চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে', 'কৃপণের ধন', 'বিবাহ-বিভ্রাট,' 'তাজ্জব ব্যাপার', 'রাজা বাহাদুর', 'অবতার,' 'বাবু' (ইহার 'দেশহিতৈষী বাবু'-চরিত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কটাক্ষমূলক), 'ডিসমিস', 'খাসদখল', 'বন্দে মাতরম্' ("বন্দেমাতরম্"-এর ব্যঙ্গ) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণ নাটকও তিনি কয়েকখানি রচনা করিয়াছিলেন। অমৃতলালের নাটকে তাঁহার রক্ষণশীল ও প্রগতি-বিরোধী

মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এগুলির মধ্যে, বিশেষভাবে তাঁহার প্রহসন-গুলিতে, হাস্যরস সৃষ্টিতে তাঁহার দক্ষতার নিদর্শন আছে। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) বহুসংখ্যক নাটক লিখিয়াছিলেন এবং ইহার অনেক-গুলি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত। তাঁহার প্রথম যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'আলিবাবা' (১৩০৪ সাল) ক্লাসিক থিয়েটারে বহুদিন যাবৎ অভিনীত হইয়া যেরূপ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল খুব কম বাংলা নাটকের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু এই যশের প্রধান কারণ সুদক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর গীত ও নৃত্যকৌশল। ইহা আরব্য উপন্যাসের একটি সুপরিচিত কাহিনী অবলম্বনে লঘু ভঙ্গীতে লিখিত। এই শ্রেণীর আরও অনেকগুলি নাটক তিনি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ও পরে তিনি কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। 'পদ্মিনী', 'চাঁদবিবি', 'প্রতাপ-আদিত্য', 'নন্দকুমার', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'বাঙ্গালার মসনদ' প্রভৃতি এই জাতীয় রচনা। ইহা ছাড়াও তিনি অনেক ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও রোমান্টিক নাটক রচনা করেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'ভীষ্ম', 'নরনারায়ণ' ও 'উলুপী' এবং ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'আলমগীর' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

ক্ষীরোদপ্রসাদের সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তিনি প্রথমে কয়েকখানি প্রহসন রচনা করেন। 'সমাজবিভ্রাট ও কল্কি অবতার' (১৮৯৫) প্রহসনে তিনি প্রাচীন ও নবীন উভয়-পন্থী হিন্দুদিগের উপর বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন। 'বিরহ' (১৮৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০১) প্রভৃতি প্রহসনগুলি প্রধানতঃ হাস্যরসাত্মক গান-গুলির জন্য বিশেষ উপভোগ্য। অবশ্য ইহাদের মধ্যে অনাবিল কৌতুক-রসেরও প্রাচুর্য দেখা যায়। 'পুনর্জন্ম' (১৯১১) দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশেষ প্রহসন। দ্বিজেন্দ্রলালের দুইখানি সামাজিক নাটক, 'পরপারে' (১৯১১) ও 'বঙ্গনারী' (১৯১৫) প্রথম শ্রেণীর না হইলেও উৎকৃষ্ট রচনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল তিনটি পৌরাণিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন—'পাষাণী' (১৯০২), 'সীতা' (১৯০২) ও 'ভীষ্ম' (১৯১২)। গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটকের মত ভক্তিরসাশ্রিত নাটক না হইলেও এগুলিতে নাট্যকারের মনন-শীলতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'সীতা'ই শ্রেষ্ঠ।

দ্বিজেন্দ্রলালের নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক নাটকগুলিই নাট্যকার হিসাবে

তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে—'তারাবাই' (১৩১০ সাল), 'প্রতাপসিংহ' (১৩১২), 'দুর্গাদাস' (১৩১৩), 'নূরজাহান' (১৩১৪), 'মেবারপতন' (১৩১৫), এবং 'সাজাহান' (১৩১৭), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৩১৮?) ও 'সিংহলবিজয়' (১৩২২)। প্রথম ছয়খানি নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল যথাসম্ভব ঐতিহাসিক সত্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শেষোক্ত দুইখানি অনেকাংশে কাল্পনিক। এই নাটকগুলিতে পাত্র-পাত্রীর সংলাপে নাট্যকারের অনন্যসাধারণ দীপ্তি, গরিমা ও আভিজাত্য দেখা যায়। অধিকাংশ নাটকেই দ্বিজেন্দ্রলাল জটিল ও জীবন্ত চরিত্র এবং নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টিতে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। পাশ্চাত্য নাটকের সংজ্ঞা অনুসারে নাট্য-রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকারদের অপেক্ষা অধিকতর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে শুধু তাঁহার নাট্য-প্রতিভার নহে তাঁহার দেশপ্রেমেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি কটাক্ষ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল 'আনন্দবিদায়' (১৯১২) নামে একটি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ন্যায় সাহিত্যিকের পক্ষে নিন্দার কারণ হইয়াছে।

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাংলা সাহিত্যের দুই বিভাগে যুগান্তর আনিয়াছিলেন উনিশ শতকের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথও সেই প্রকার সাহিত্যের প্রায় সর্ব বিভাগেই আর এক নূতন যুগের প্রবর্তন করেন। ইহার প্রভাব অদ্যাবধি চলিতেছে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার প্রবর্তিত নবযুগের আলোচনায় একটি গুরুতর বাধা আছে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ ও মৃত্যু ১৯৪১ খ্রীঃ। এই গ্রন্থের সমাপ্তি কাল ১৯০৫ খ্রীঃ। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের বেশী ভাগ পরবর্তী খণ্ডের বিষয়-বস্তু। কিন্তু তিনি গীতি-কবিতা ও ছোট গল্পে যে নূতন রীতি প্রবর্তিত করেন তাহা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অপর পক্ষে উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা, সঙ্গীত প্রভৃতি সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে তাঁহার অবদান ঐ তারিখের পরেই বাংলা সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্তন করে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভাবান সাহিত্য-স্রষ্টার সমগ্র রচনার মধ্যে যে একটি নিবিড় যোগসূত্রের বন্ধন থাকে তাহা এইরূপ দুই খণ্ডে বিভক্ত করা যায় না। সুতরাং সামগ্রিক ভাবে রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁহার প্রবর্তিত সাহিত্যযুগ ও তাঁহার অনুবর্তী সাহিত্যিকদিগের আলোচনা

পরবর্তী খণ্ডেই বিশদভাবে করা হইবে। কিন্তু সাহিত্যের এই যুগ-সন্ধির উপক্রমণিকা স্বরূপ এই গ্রন্থেও সংক্ষেপে কয়েকটি মন্তব্যের প্রয়োজন বোধ করি।

রচনার বৈচিত্র্য সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ও মূলতঃ কবি। 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাত সঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) এবং 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)—এই কয়খানি গ্রন্থে কবি-মানসের যে অস্ফুট ও কতকটা বিস্ময়কর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা যে এক অপূর্ব কবিপ্রতিভার সূচনা, আজিকার দিনে তাহা যেরূপ স্পষ্ট বোঝা যায় তখনকার দিনে তাহা সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৩), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' (১৮৯৬), ও 'কল্পনা' (১৯০০) প্রকাশের পর কবির স্বাতন্ত্র্য ও তৎপ্রবর্তিত গীতিকবিতার অভিনব ধারা ও আদর্শ স্বীয় মহিমায় ও মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। অবশ্য তখনও রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব সর্বত্র স্বীকৃত হয় নাই এবং ইহার অসারত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু সে যুগের কয়েক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বাংলার সাহিত্যগগনে নব-যুগ প্রবর্তক নব রবির আবির্ভাব সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই কিশোর কবিকে নিজের হস্তে জয়মাল্য পরাইয়া স্বীয় সাহিত্য সম্রাটের সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। কবি নবীনচন্দ্র সেনও রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ-স্তরের কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

উনিশ শতক শেষ হইবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ 'ছোট গল্প' রচনার নূতন যুগ প্রবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, "আমার ছোট গল্প রচনার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে ইহার অস্তিত্ব ছিল না"। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিতে বাংলাদেশের—বিশেষত ইহার গ্রামের—পটভূমিকায় বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙ্গালীর ছবি যে প্রকার ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহার পূর্বে কোন সাহিত্যিক তাহা কল্পনাও করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই যে, রোমান্টিক উপন্যাস বাঙ্গালীর মনে যখন প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, তখন সাধারণ বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের ছোটখাট সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা, অভাব, অভিযোগ প্রভৃতি নিজের কবি-হৃদয়ের অনুভূতির সাহায্যে ছোট গল্পের আকারে উপস্থিত করিয়া তিনি বাঙ্গালীর হৃদয়কে এমনভাবে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাহার প্রভাবে পরবর্তী বঙ্গ-সাহিত্যে ছোট গল্প সর্বপ্রধান আসন গ্রহণ করিয়াছে, ইহা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার ছোট গল্পে নানা শ্রেণীর, নানা বয়সের নরনারীর যে কত বিচিত্র চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। অথচ ইহার

প্রত্যেকটিকে তিনি কবিত্বময় ভাষা ও ভাবের সাহায্যে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করিয়া দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা হইতে অনেক ঊর্ধ্বে তুলিয়া আমাদের নিকট বাঙ্গালী জীবনের এক অননুভূতপূর্ব রসের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন।

১৮৮৪ খ্রীঃ রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোট গল্প প্রকাশিত হয়—'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা'। ইহার সাত বৎসর পরে রচিত গল্পগুলি তাঁহার স্বকীয় রীতির পরিচায়ক। এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দীকাল তিনি বাংলার পল্লী ও নাগরিক জীবনের বিচিত্র রূপ অঙ্কিত করিয়া ছোটগল্পের মাধ্যমে সৌন্দর্যের যে বিশাল চিত্রশালা রচনা করিয়াছেন, তাহা চিরকাল সাহিত্যিক সৃজনী প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন রূপে বিরাজ করিবে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অবদান—প্রধানতঃ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী রচনা—পরবর্তী খণ্ডে আলোচিত হইবে।

৬। উপসংহার

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের (১৮৬৪-১৯৩০) 'আলো ও ছায়া' ১৮৮৯ খ্রীঃ রচিত হইয়া মহিলা কবিদের মধ্যে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁহার এ সম্মান আজিও অক্ষুণ্ণ আছে।

উনিশ শতকের শেষভাগে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইঁহাদের কেহ কেহ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সাহিত্যিক-জীবন আরম্ভ করিলেও পরবর্তী কালেই সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সুতরাং তাঁহাদের নাম মাত্র উল্লেখ করিব—বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী খণ্ডে দেওয়া হইবে।

কবিদের মধ্যে—যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৭-১৯৪৮), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) এবং কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের (১৮৮২-১৯৭০) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপন্যাস ও গল্প লেখকদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (১৮৭৬-১৯৩৮) —এই তিনজন লেখকই সর্বপ্রধান।

প্রবন্ধলেখকদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য —যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (১৮৫৯-১৯৫৬) ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধ লেখক। জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩) বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ ও গ্রন্থলেখক।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬০-১৯২১) ও অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (১৮৬২-

১৯৫০) ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, এবং বিজয় চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) বৌদ্ধ থেরগাথা ও থেরীগাথার এবং গীতগোবিন্দের অনুবাদক এবং গল্প ও কবিতার রচয়িতা। সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২) জাতিতে মারাঠী হইয়াও কয়েকখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাংলায় রচনা করেন। তাঁহার 'দেশের কথা' (১৩১১ সাল) স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

দীনেন্দ্র কুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪২) প্রধানতঃ ডিটেকৃটিভ কাহিনী রচনার জন্য খ্যাত। কেবলমাত্র পল্লীসমাজ সম্বন্ধে কয়েকখানি বই ইহার ব্যতিক্রম। তাঁহার 'পল্লীচিত্র' (১৩১১ সাল) উৎকৃষ্ট রচনা।

পাদটীকা

এই পাদটীকায় নিম্নলিখিত সাংকেতিক চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে :—

সং=সংস্করণ ;

সা-সা-চ=সাহিত্য সাধক চরিতমালা

সা-প=সাহিত্য পরিষৎ

বা-সা=শ্রীসুকুমার সেন প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড-৩য় সং

দ্র=দ্রষ্টব্য (১৩৬২)

১। "ভারতবর্ষ", ১৩৭১, পোষ, ৯৬ পৃঃ।

২। ২, ৩ ও ৪ নং উদ্ধৃতি সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'প্রাচীন বাংলা পত্র সঙ্কলন' পৃঃ ৬৩ ও ৭৬ হইতে যথাক্রমে গৃহীত।

৩। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ১৯৫৯, পৃঃ ১২৪।

৪। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত সং, ৪৮ পৃঃ।

৫। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত 'বত্রিশ সিংহাসন', পৃঃ ৪ এবং 'রাজাবলী' পৃঃ ১৪১।

৬। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত—সা-সা-চ, পৃঃ ৩৪-৩৫।

৭। "উইলিয়ম কেরী",—সা-সা-চ, ৩৭ পৃঃ।

৮। ঐ, ৪৬ পৃঃ।

৯। "রামমোহন রায়", সা-সা-চ, ৭৩ পৃঃ।

১০। ঐ, ৭৪ পৃঃ।

১১। বা-সা, ৬ পৃঃ।

১২। "উইলিয়ম কেরী"—সা-সা-চ, ২৪ পৃঃ।

১৩। S. K. De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century* p, 156; উইলিয়ম কেরী, ৫৬ পৃঃ।

১৪। রামমোহন রায়, সা-সা-চ, ৭০ পৃঃ।

১৫। "বাংলা গদ্যের চার যুগ" ২য় সংস্করণ (১৯৪৯), ২৬ পৃঃ।

১৬। এই তিন খানি গ্রন্থ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম ও তৃতীয় গ্রন্থের সঠিক তারিখ জানা নাই—"ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়" গ্রন্থের (সা-সা-চ) ১৭, ২৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

১৬ (ক)। সা-সা-চ (১১) ৯ পৃঃ।

১৭। চারিত্র পূজা (রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৭-৪৭৮)।
"ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর" (সা-সা-চ) ৯৯ পৃঃ। ইহা একটি পঠিত প্রবন্ধের অংশ (সাধনা, ভাদ্র, ১৩০২), কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশ কালে ও রবীন্দ্র রচনাবলীতে শেষের প্যারা বর্জন করা হইয়াছে।

১৮। বিধবা বিবাহ ২য় পুস্তক। বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী—সমাজ (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস) ১৮৭ পৃঃ।

১৯। হুতোম প্যাঁচার নকশা, (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস) ৯৮ পৃঃ।

১৯ (ক)। বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড, ৭১২-১৩ পৃঃ।

২০। প্যারীচাঁদ মিত্র" (সা-সা-চ), ২৭-২৮ পৃঃ।

২১। ঐ, ২৪-২৬ পৃঃ।

২২। ১৮৪১ সনে রচিত অপ্রকাশিত 'মধুমল্লিকা বিলাস' নামে পদ্যে লিখিত একটি আখ্যায়িকার বিবরণ দিয়া শ্রীসুকুমার সেন লিখিয়াছেন, যে ইহা ইংরেজী সাহিত্যের দ্বারা কোন রকমে প্রভাবান্বিত নহে, অথচ ইহাতে গার্হস্থ্য উপন্যাসের লক্ষণ বিদ্যমান (বা-সা, ১৬০ পৃঃ)।

২৩। বা-সা, ১৬৭ পৃঃ ইহার কারণ আলোচিত্র হইয়াছে।

২৪। বা-সা, ১৮৩ পৃঃ।

২৫। সা-প পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩০১, ৪ পৃঃ।

২৬। বঙ্কিমের বিরুদ্ধ সমালোচনা, নিন্দা, ও ব্যঙ্গকৌতুক প্রভৃতির জন্য, বা-সা, ১৮৮, ২০২, ২০৩ পৃঃ দ্র।

২৭। "বিবিধ প্রবন্ধ" ২য় ভাগ (সা-প-সং) ২০৬ পৃঃ।

২৮। "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়", সা-সা-চ, ৫১ পৃঃ।

২৯। "কমলাকান্তের দপ্তর" ১২৮০-৮২ সনের "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হয় এবং ১৮৭৫ সনে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১২৯২ সালে ইহার সহিত "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" এই দুই খানি নূতন গ্রন্থ যোগ করিয়া "কমলাকান্ত" নামে পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ঐ, ৭৫ পৃঃ।

৩০। ঐ, ৫১ পৃঃ।

৩১। "আধুনিক বাংলা সাহিত্য", ৪৭-৪৮ পৃঃ।

৩২। "আধুনিক সাহিত্য" ৪-৯ পৃঃ।

৩৩। S. K. De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century*, 2nd Ed., p, 336.

৩৪। দীনেশ চন্দ্র সেন, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (ষষ্ঠ সং) ৫৪৫ পৃঃ।

৩৫। বা.সা, ১২১-২২ পৃঃ।

৩৬। সা-প-সং ভূমিকা।

৩৭। বা-সা, ১৩৪-৩৫ পৃঃ।

৩৮। ঐ, ৩৯৭ পৃঃ।

৩৯। ঐ।

৪০। ঐ, ৪১৯ পৃঃ।

৪১। শ্রীসুকুমার সেন লিখিয়াছেন : "ভারত সঙ্গীত লিখিয়া হেমচন্দ্র দেশের রাজশক্তির কাছে যে অপরাধ করিয়াছিলেন তাহা 'ভারত ভিক্ষা' (১৮৭৫) লিখিয়া ক্ষালন করিতে হইল" (বা-সা, ৩৪৪)। ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত এই যে 'ভারত ভিক্ষা' দেশ-প্রেম মূলক কবিতা নহে, রাজভক্তি সূচক। কিন্তু 'ভারত ভিক্ষা'য় তৎকালে প্রচলিত মহারাণীর নিকট আবেদন নিবেদন থাকিলেও ভারতের প্রাচীন গৌরব সূচক ও দেশপ্রেম উদ্দীপক অনেক আবেগপূর্ণ উক্তি আছে।

৪২। ঐ, ৩৫০

৪৩। শেক্‌স্‌পীয়ারের *"Tempest"* নাটক অবলম্বনে লিখিত।

৪৪। "হেমচন্দ্রের উদ্দীপনা নবীনচন্দ্রকেও স্পর্শ করিয়াছে" (বা-সা, ৪৫৮ পৃঃ)।

৪৫। শ্রীসুকুমার সেনের এই উক্তি (বা-সা-৩৭০) এবং বিশেষতঃ এই প্রসঙ্গে অন্য একটি উক্তি, "উদাসিনী কাব্য এককালে রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র প্রমুখ কবিদিগকে নূতন প্রেরণা দিয়াছিল", সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। এগুলি অত্যুক্তির পর্যায়ে পড়ে।

৪৫ (ক)। M. Goddrell রচিত *"The Disguise"*।

৪৬। বা-সা, ৩১ পৃঃ।

৪৭। ঐ, ৪৮-৪৯ পৃঃ।

৪৮। ঐ, ৭৭ পৃঃ।

৪৯। ঐ, ৩১৫ পৃষ্ঠা। এই মত গ্রহণ করা কঠিন। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত "গিরিশ প্রতিভা" দ্র।

৫০। বা-সা, ৩২০ পৃঃ।

দশম অধ্যায়

সংবাদপত্র ও তৎসংক্রান্ত আইন

১। সংবাদপত্র (১৭৮০-১৮৫৭)

(ক) ইংরেজী পত্রিকা

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি ব্যবসায়ী দল—ভারতের সাধারণ ইংরেজ অধিবাসীরা তাহাদের গবর্ণমেণ্ট বা কর্মচারীবৃন্দকে খুব শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিত না। সংবাদপত্রেও এই মনোভাব প্রতিফলিত হইত। সুতরাং ইংরেজ সরকার ও ইংরেজী সংবাদপত্র, এ দুয়ের মধ্যে একটি দ্বন্দ্বের ভাব ছিল। বাংলা দেশের প্রথম সংবাদপত্র, ইংরেজী ভাষায় লেখা হিকি সাহেব (James Augustus Hicky) সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা—বেঙ্গল গেজেট (Bengal Gazette)। ইহা ১৭৮০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার আর এক নাম ছিল Calcutta General Advertiser। দুই পাতার এই ক্ষুদ্র পত্রিকার অধিকাংশই বিজ্ঞাপনে ভরা থাকিত—বাকী অংশে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের সম্বন্ধে বহু কুৎসা প্রচার করা হইত—বড়লাট, তাঁর পত্নী, চীফ জাষ্টিস্, পাদ্রী, রাজকর্মচারী ;—কেহই হিকির কুৎসা হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। গবর্ণমেণ্ট হিকিকে জব্দ করার জন্য সাধারণ ডাকের মারফৎ তাঁহার সংবাদপত্র পাঠানো বন্ধ করিলেন। প্রত্যুত্তরে হিকি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা যে 'ইংরেজ জাতির জন্মগত অধিকার এবং সুশাসনের একটি প্রধান অঙ্গ', এই উচ্চ আদর্শ প্রচার পূর্বক এক তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়া বলেন যে এই স্বাধীনতা হরণ করা স্বৈরতন্ত্রের পরিচায়ক। চল্লিশ বৎসর পরে রামমোহন রায়ও বাঙ্গালীর পক্ষ হইতে এই স্বাধীনতার দাবি করেন। হিকির কাগজ বেশী দিন চলে নাই। ১৭৮১ সনে একজন পাদরী ও বড়লাট স্বয়ং হিকির বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ করেন। হিকির কারাদণ্ড হয় ও তাঁহার কাগজ বন্ধ হইয়া যায়। ১৭৮০ হইতে ১৭৯৩ সনের মধ্যে কলিকাতায় আরও ছয়টি কাগজ বাহির হয়। ইহাদের মধ্যে ইণ্ডিয়া গেজেট (India Gazette) (১৭৮০), কলিকাতা গেজেট (Calcutta Gazette) (১৭৮৪), এবং হরকরা (Hurkaru বা Hircarrah) (১৭৯৩) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমুদয় পত্রিকায় বিদেশের ও ভারতীয় রাজনীতিক সংবাদ থাকিলেও ইহাতে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না এবং এগুলি প্রধানতঃ ইংরেজদের

জন্য লিখিত হইত। তবে কয়েকটি পত্রিকায় ইংরেজ শাসনের কঠোর সমালোচনা হইত এবং ইহার জন্য সম্পাদকদের কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। Bengal Journal (১৭৮৫) ও Indian World পত্রিকার সম্পাদক আমেরিকাবাসী-আইরিস William Duane বহু দুর্গতি ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হইলেন। পূর্বোক্ত Bengal Hurkaru (হরকরা) নামে যে পত্রিকা ১৭৯৩ সনে প্রচারিত হয় তাহা নীলকরদের সমর্থন করিত। ১৭৯৮ সনে ঐ (অথবা ঐ নামে নূতন এক) পত্রিকা বাহির হয়। ১৮১৯ সনে ইহা দৈনিকে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য Bengal Hurkaru পত্রিকার সম্পাদক Charles Maclean-কে গ্রেপ্তার করিয়া অনেক কষ্ট ও লাঞ্ছনা দেওয়ার পর নির্বাসিত করা হয়। ১৮১৮ সনে প্রতিষ্ঠিত Calcutta Journal পত্রিকার সম্পাদক James Silk Buckingham শাসন-নীতির বিরুদ্ধে মন্তব্য করায় তাঁহাকেও নির্বাসিত করা হয়। এই পত্রিকাটি ভারতীয় ইংরেজ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা দ্বারা খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহার সম্পাদক বাকিংহামও সম্পাদক হিসাবে খুবই সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। পত্রিকাটি প্রথমে সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হইত কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই দৈনিকে পরিণত হয় (মে ১৮১৯)। সম্ভবতঃ ইহাই ভারতের প্রথম দৈনিক পত্রিকা। বাকিংহাম একজন উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকের কার্যের নিন্দা ও তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা করায় তাঁহার কাগজ বন্ধ হয়, এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সহকারী সম্পাদককে ভারত হইতে বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বিলাতে তিনি Oriental Herald নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন—ইহাতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ প্রচার হইত।

১৮৩০ সনে অর্থনীতিক জগতে বিষম দুর্বিপাক ঘটে এবং বহু ইংরেজ ব্যবসায়ীর গুরুতর লোকসান হয়। সংবাদপত্র-জগতেও ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। John Bull নামক পত্রিকা বিক্রয় হইয়া যায় এবং Englishman নামে প্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর India Gazette ক্রয় করিয়া Bengal Hurkaru-র সাথে সংযুক্ত করেন। Calcutta Courier বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৩১ সনে ডিরোজিও (Derozio) East India ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Inquirer পত্রিকা প্রকাশিত করেন।

১৮৩১ সনে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সম্পাদনায় Indian Reformer পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহা নব্য বাংলার প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের মুখপত্র বলিয়া গৃহীত হইত। এই শ্রেণীর আর একটি পত্রিকা ছিল রামগোপাল ঘোষ সম্পাদিত

Bengal Recorder (১৮৪২)। ইহা প্রথমে মাসিক, পরে পাক্ষিক ও সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ইহা সে যুগে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আর একখানি উচ্চশ্রেণীর পত্রিকা ছিল কাশীপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদিত Hindu Intelligencer (১৮৪৬)—ইহাতে তাঁহার দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি প্রকাশিত হইত। সে যুগে নব্য বঙ্গ সমাজের আর একজন প্রধান নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তী Quill নামে পত্রিকা প্রকাশিত করেন (১৮৪২)। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা, Parthenon (১৮৩০), Gyananneshun (জ্ঞানান্বেষণ) (১৮৩১-৪৪), Hindu Pioneer ও Bengal Spectator (১৮৪২) পত্রিকার মাধ্যমে রাজনীতিক ও সামাজিক বিষয়ে নূতন প্রগতিশীল মত প্রচার করে। ১৮৩৯ সনে কলিকাতায় ২৬টি ইউরোপীয় সম্পাদিত পত্রিকা ছিল। ইহার মধ্যে ৬টি ছিল দৈনিক। ১৮৫১ সনের পূর্বে আরও কয়েকটি প্রকাশিত হয়, ইহার মধ্যে Englishman এবং Friend of India বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুই একটি ব্যতীত এ সমুদয় পত্রিকাই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লিখিত।

১৮৫৩ সনে প্রকাশিত Hindoo Patriot নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাতে বাংলার নবজাগ্রত রাজনীতিক চেতনার উন্মেষের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে (১৮৪৯) কলিকাতার একটি সম্ভ্রান্ত ঘোষ পরিবারের তিন ভ্রাতা Bengal Recorder নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিন চারি বৎসর পরে স্বনামধন্য হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী ইহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ও ইহার নাম হয় Hindoo Patriot। সম্পাদক ও রাজনীতিক নেতা হিসাবে উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে হরিশ্চন্দ্র মুখার্জীর নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

এই পত্রিকার প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—দেশের স্বার্থ এবং যে সমুদয় রাজনীতিক ও সামাজিক কুব্যবস্থা দেশের বর্তমান দুর্দশার কারণ, নিরপেক্ষ ভাবে তাহার বিচার ও প্রচার করা। আরও বলা হইয়াছে যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারত শাসনে নূতন সনদ দেওয়ার উপলক্ষে যে আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের সূত্রপাত হইয়াছে তাহার ফলে যাহাতে ভারতের শাসনের সংস্কার হয় সে জন্য ভারতবাসীর পক্ষ হইতে উপযোগী যুক্তি উপস্থাপিত ও সমর্থন করা এবং এ সম্বন্ধে যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করা প্রত্যেক ভারতবাসীরই কর্তব্য।

এই পত্রিকাখানি দেশের শাসন সংস্কার ও নানাবিধ দুঃখ দুর্দশা দূর করার কার্যে কি পরিমাণ সাহায্য করিয়াছিল এই গ্রন্থের নানা স্থানে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

(খ) বাংলা পত্রিকা[১]

১৮১৮ সনের পূর্বে বাংলা ভাষায় কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নাই। ঐ বৎসর 'বাঙ্গাল গেজেটি' (Weekly Bengal Gazette) নামে একখানি সাপ্তাহিক কলিকাতায় প্রকাশিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে ইহার সম্পাদক ছিলেন রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার সম্পাদক হরচন্দ্র রায়—আবার কাহারও মতে ইহার সম্পাদকের নাম গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। এই দুইজনই এই পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। ইহার সডাক বার্ষিক মূল্য ছিল দুই টাকা।

ঐ বৎসরই (১৮১৮) শ্রীরামপুর হইতে পাদরী মার্শম্যানের (J. C. Marshman) সম্পাদনে এপ্রিল মাসে 'দিগ্‌দর্শন' নামে একখানি মাসিক ও মে মাসে 'সমাচার দর্পণ' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির হয়। দিগ্‌দর্শন খুব অল্প দিন পরেই বন্ধ হয় কিন্তু ইহাই বাংলায় লিখিত প্রথম সাময়িক পত্র। সমাচার-দর্পণ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল! ১৮১৮ সনের ২৩শে মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। মার্শম্যান সাহেব নামে সম্পাদক হইলেও প্রকৃতপক্ষে এ দেশীয় পণ্ডিতেরাই ইহার সম্পাদনা করিতেন।

বাঙ্গাল গেজেটির কোন সংখ্যাই এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই—সুতরাং ইহার প্রথম সংখ্যা সমাচার দর্পণের প্রথম সংখ্যার পূর্বে কি পরে প্রকাশিত হইয়াছিল এ সম্বন্ধে কেবল বর্তমান কালে নহে উক্ত পত্রিকা দুটি প্রকাশিত হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যেই মতভেদ দেখা যায়। ব্রজেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী তাঁহার প্রণীত 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থে এই প্রশ্নটি আলোচনা করিয়াছেন। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি দুইটি বিরোধী মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীরামপুর হইতে ১৮২০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া' পত্রের প্রথম সংখ্যায় লিখিত মন্তব্য হইতে জানা যায় যে সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হইবার পর এক পক্ষকালের মধ্যেই বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশিত হয়। অপরপক্ষে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, এই দুইজন বিখ্যাত সাংবাদিকের—এবং আরও অনেকের মতে "বাঙ্গাল গেজেটি" সমাচার দর্পণের অগ্রজ। এই সমুদয় উল্লেখ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু মন্তব্য করেন: "তবে 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়ার' উক্তি সর্বাপেক্ষা পুরাতন"—এবং অনুমান করেন যে 'সমাচার দর্পণই' প্রথম প্রকাশিত হয়।

ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে (১৩৫৪) এ বিষয়ে একটি নূতন প্রমাণের উল্লেখ করেন। 'এশিয়াটিক জার্নালে'র ১৮১৯ সনের জানুআরি সংখ্যায় ১৬ মে, ১৮১৮ তারিখের 'ওরিয়েণ্টাল ষ্টার' হইতে এই মর্মে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হয় যে একখানি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে (the publication of a Bengalee newspaper has been commenced)। এই পত্র যে বাঙ্গাল গেজেটি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং ব্রজেন্দ্রবাবুও ইহা স্বীকার করেন। কিন্তু যে কয়েকটি কারণে তিনি উদ্ধৃত পংক্তির স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া বলেন যে ইহার অর্থ "বাঙ্গাল গেজেটির" প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে—তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ১৮১৮ সনের ১৪ই মে তারিখের "গবর্নমেণ্ট গেজেটে" বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় যে বাঙ্গাল গেজেটি শীঘ্রই বাহির হইবে। প্রতি শুক্রবারে ইহা বাহির হইত। সুতরাং ১৫ মে শুক্রবার যে বাঙ্গাল গেজেটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং ইহাই প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।[২] ১৮২৯ সনে সমাচার দর্পণ দ্বিভাষিক হইল, অর্থাৎ ইহাতে বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষার লেখা থাকিত। ১৮৩২ সনে সপ্তাহে দুইবার ইহা প্রকাশিত হইত। দুই বৎসর পরেই ইহা পুনরায় সাপ্তাহিকে পরিণত হইল। ১৮৪০ সনের ১লা জুলাই হইতে মার্শম্যান একখানি নূতন বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিলেন এবং ইহার ফলে ১৮৪১ সনের ২৫শে ডিসেম্বরের সংখ্যা বাহির হওয়ার পর সমাচার দর্পণ বন্ধ হইল। ১৮৪২ সনের প্রথম ভাগে বাঙ্গালীদের চেষ্টায় সমাচার দর্পণের দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হয়। ইহাতে ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। বহুদিন বন্ধ থাকার পর শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ১৮৫১ সনের ৩রা মে আবার সমাচার দর্পণ প্রকাশ করিলেন। এই তৃতীয় পর্যায়ের সমাচার দর্পণ দেড় বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তার পরে ইহা চির দিনের মত লুপ্ত হয়।

সমাচার দর্পণে রাজনীতিক আলোচনা বেশী না থাকিলেও ইহাতে এদেশের ও ইউরোপের নানা সংবাদ প্রকাশিত ও নানা বিষয় আলোচিত হওয়ার ফলে আধুনিক যুগের জ্ঞান ও চিন্তা ধারার সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় লাভের যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইউরোপের নূতন নূতন আবিষ্কারের সংবাদ প্রদান, নূতন নূতন ইংরেজী গ্রন্থ হইতে নূতন শিল্পকলা প্রভৃতির বিবরণ, এবং ভারতবর্ষের

প্রাচীন ইতিহাস, বিদ্যা, জ্ঞানী লোক ও গ্রন্থাদির বিবরণ প্রকাশ যে এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞপ্তিতেই সম্পাদক তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। মোটের উপর মধ্যযুগে বহির্জগতের সহিত সর্বপ্রকার সম্বন্ধ শূন্য বাংলাদেশে সমাচার দর্পণ যে নূতন জাতীয় চেতনা জাগরণে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

১৮২১ সনে রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণ সেবক ও মিশনারী সংবাদ' নামে পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ঐ বৎসরই ৪ঠা ডিসেম্বর কলুটোলা নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় এই পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধ লিখিতেন। কিন্তু সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে লেখায় ভবানীচরণ ইহার সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করেন। ইহার পর রামমোহন রায়ই ইহার কার্যতঃ সম্পাদক হইলেন। কিন্তু ভবানীচরণ সনাতন ধর্মের সপক্ষে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে নূতন একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করায় সম্বাদ কৌমুদীর প্রচার বন্ধ হইয়া যায় (১৮২২ সন)। পর বৎসর ইহা পুনরুজ্জীবিত হয় এবং নানা পরিচালক ও সম্পাদকের অধীনে আরও দশ বৎসর জীবিত ছিল।

১৮২২ সনের ৫ই মার্চ সমাচার চন্দ্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য সম্বাদ কৌমুদীর সহিত ইহার 'মসীযুদ্ধ' কিছুদিন চলিয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে সমাচার দর্পণে মন্তব্য করা হইয়াছে "উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব স্ব কাগজে ছাপাইতেছেন"।[৩]

"চন্দ্রিকা-কার ধর্ম্মসভার, কৌমুদী-কার ব্রহ্মসভার সাহায্যকারক। সতীবিষয়ক ব্যাপার সম্প্রতি ঐ উভয় সমাচার পত্রে লিখিত বাদানুবাদমাত্রের আশ্রয় হইয়াছে।"[৪] গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র হওয়ায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রাধান্য ও গ্রাহকসংখ্যার বৃদ্ধি হয়। ১৮৪৮ সনে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ইহার প্রসার প্রতিপত্তি কমিয়া যায়। নানা অবস্থা বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া ইহা ১৮৫৩ সন পর্যন্ত টিকিয়া ছিল।

১৮৩১ সনে অনেকগুলি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয় :—

দুর্লভ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত দৈনিক 'নিত্য প্রকাশ', ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সম্বাদ সৌদামিনী', মধুসূদন দাস সম্পাদিত সপ্তাহিক 'সম্বাদ রত্নাকর', ভুবন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সম্বাদ ময়ূখ'। যথাক্রমে ভোলানাথ সেন, প্রেমচাঁদ রায় ; এবং রামচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণধন মিত্র সম্পাদিত

'অনুবাদিকা,' 'সম্বাদ সুধাকর' ও 'জ্ঞানোদয়' নামে তিনখানি মাসিক পত্রিকা ছাড়া 'সম্বাদসার সংগ্রহ' নামে একখানি সাপ্তাহিক এবং শেখ আলিমুল্লা সম্পাদিত বাংলা ও ফার্সী মাসিক, 'সমাচার সভা রাজেন্দ্র' প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

১৮৩১ সনের ২৮শে জানুআরি কবিবর ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। ইহাই সাহিত্যিক মর্যাদাসম্পন্ন প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা কবির অদ্বিতীয় কীর্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেড় বৎসর চলিবার পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। চারি বৎসর পরে ১৮৩৬ সনের ১০ই অগষ্ট ইহা পুনরায় সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হয়। তিন বৎসর সগৌরবে চলিবার পর ১৮৩৯ সনের ১৪ জুন হইতে সংবাদ প্রভাকর দৈনিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়। ইহাই বোধ হয় ভারতীয় পরিচালিত দ্বিতীয় দৈনিক সংবাদপত্র।[৫]

সংবাদ প্রভাকর সে যুগে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে সেকালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই পত্রিকায় লিখিতেন এবং সম্পাদক নিজেও বহু মূল্যবান মন্তব্য লিখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম বয়সের অনেক রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার অনেক অংশ এই গ্রন্থে নানা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

১৮৫৩ সন হইতে সংবাদ প্রভাকরের একটি মাসিক সংস্করণ বাহির হয়। ইহাতে "নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবন বৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য পদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্ব্বশেষে—মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম্ম প্রকটিত" হইত। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র আরও একটি জিনিষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহার উল্লেখ করা একান্ত কর্তব্য। দীর্ঘকাল পরিশ্রম ও নানা স্থান পর্যটন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন কবিদিগের বহু অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এগুলি তিনি প্রধানতঃ ১৮৫৪-৫৫ সনের মাস পয়লার কাগজগুলিতে মাঝে মাঝে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি অগ্রসর না হইলে বোধ হয় এতদিন কবিদিগের এই সকল রচনার কোন অস্তিত্বই থাকিত না। এই সমুদয় কবিদের নাম : রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত, রাম [মোহন] বসু, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, কেষ্টা মুচী, লালু নন্দলাল, গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, রাসু, নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস।[৬]

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৯ সনের ২৩ জানুআরি তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত ইহার সম্পাদক হন।

১৮৩১ সনের ১৮ই জুন 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহাকে ইংরেজী শিক্ষিত উদারমতাবলম্বী যুবকদের মুখপত্র বলা যাইতে পারে। প্রথমে দক্ষিণানন্দন (পরে দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পর রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং মাধবচন্দ্র মল্লিক ইহার পরিচালনা করেন। ইঁহারা সকলেই হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র। দুই বৎসর পরে এই পত্রিকায় ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষারই ব্যবহার হয়। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কিছুদিন এই পত্রিকার বাংলা বিভাগের সম্পাদক ছিলেন এবং সাধারণভাবে সমগ্র পত্রিকার সম্পাদনা কার্যে বিশেষ সহায়তা করিতেন। পরে ১৮৩৯ সনে তিনি ইহা ছাড়িয়া 'সম্বাদ ভাস্কর' নামে পৃথক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। রামগোপাল ঘোষ ও আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ লোক জ্ঞানান্বেষণের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে উদার মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া এই পত্রিকা খুবই প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। ১৮৪০ সনের নভেম্বর মাসে ইহা বন্ধ হয়।

১৮৩১ সনের পরে প্রকাশিত নূতন সংবাদপত্রের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতে থাকে। তাহার মধ্যে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি—

১৮৩৫ সনের ৮ই জুন মাসে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রতি পূর্ণিমায় প্রকাশিত হইত বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। ১৮৩৬ সনের ৯ই এপ্রিল ইহা সাপ্তাহিক হয় এবং প্রধানতঃ সাহিত্য ও রাজনীতি আলোচনা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ১৮৪৪ সনে ইহা দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। এই দৈনিক পত্রিকাখানি ১৯০৮ সনের ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত প্রচারিত ছিল। খুব কম সংখ্যক বাংলা পত্রিকাই এরূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। ইহার বাংলা সাল ১২৫৮, বৈশাখ সংখ্যায় (১৪ এপ্রিল ১৮৫১) তৎকালে প্রচলিত 'প্রাত্যহিক, দিনান্তরিক, অর্ধসাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, অর্ধমাসিক ও মাসিক' সংবাদপত্রের এক তালিকা প্রকাশিত হয়।

১৮৩৯ সনের মার্চ মাসে 'সম্বাদ ভাস্কর' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। নামে শ্রীনাথ রায় সম্পাদক হইলেও প্রকৃতপক্ষে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই যে ইহার পরিচালক ছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আন্দুলের রাজার কোন কার্য সম্বন্ধে 'ইহা অনুচিত' এই মন্তব্য করায় তাঁহার কুড়ি পঁচিশ জন সশস্ত্র প্রহরী সম্পাদক শ্রীনাথ রায়কে দিবাভাগে কলিকাতার রাস্তা হইতে ধরিয়া নিয়া আটক করিয়া রাখে এবং তাঁহার উপর অনেক অত্যাচার করে। আদালতে অভিযোগ হইলে রাজা কিছুদিন আত্মগোপন করিলেন ও শ্রীনাথ রায়কেও নানাস্থানে

লুকাইয়া রাখিলেন। অবশেষে রাজাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কিছুদিন হাজতে রাখিয়া সুপ্রীম কোর্ট তাঁহাকে মাত্র এক হাজার টাকা জরিমানা করেন। সমস্ত ব্যাপারটিই খুব বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। সম্বাদ ভাস্কর প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল। ১৮৪০ সনে শ্রীনাথ রায়ের মৃত্যু হইলে গৌরীশঙ্করই সম্বাদ ভাস্করের একমাত্র সম্পাদক হন। ১৮৪৮ সনে ইহা সপ্তাহে দুইবার এবং পরের বৎসর তিনবার করিয়া প্রকাশিত হয়। ১৮৫৯ সনে গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পরেও বহুকাল ইহা প্রচলিত ছিল। ইহা সে যুগের একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা বলিয়া পরিগণিত হইত।

১৮৩৯ সনে 'সম্বাদ ভাস্করের' সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের পরিচালনায় 'সম্বাদ রসরাজ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অন্য কয়েকজন ব্যক্তি পর পর নামে মাত্র ইহার সম্পাদক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে অর্ধ সাপ্তাহিক হইয়াছিল। পরের কুৎসা ও অশ্লীল গালিগালাজ এই পত্রিকার বৈশিষ্ট্য ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই "ইহার গ্রাহক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছিল; সে যুগের কোন ভাল সংবাদপত্রেরও এত গ্রাহক ছিল না।"

কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ ও তাঁহার পত্নী রাণী স্বর্ণময়ী সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করায় ১৮৪৩ সনে রাজা গৌরীশঙ্করের নামে মানহানির মকদ্দমা করেন। ১৮৫৫ সনে লালা ঈশ্বরীপ্রসাদও ঐরূপ মামলা করেন। উভয় মামলার বিচারেই গৌরীশঙ্করের ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড ও ছয় মাস করিয়া কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল। অবশেষে শোভাবাজার রাজপরিবারের বিরুদ্ধে 'অকথ্য অসত্য' প্রকাশ করাতে মহারাজ কমলকৃষ্ণ বাহাদুর সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগের উদ্যোগ করাতেই ১৮৫৭ সনে সম্বাদ রসরাজ বন্ধ হইয়া গেল। ১৮৫৯ সনে গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পর ইহা পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৬১)। কিন্তু পুনরায় 'অযথা গালা-গালি ও নিন্দাবাদের ফলে' নূতন সম্পাদকের ৫০০ টাকা জরিমানা ও ৩ মাস মিয়াদ হয়। ইহার পরেও কিছুদিন এই পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছিল—ইহাতে কোন অশ্লীল বিষয় থাকিত না।

১৮৪২ সনের এপ্রিল মাসে প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহযোগিতায় রামগোপাল ঘোষ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (The Bengal Spectator) নামে এক ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। প্রথম পাঁচ মাস মাসিক, পরে ছয় মাস পাক্ষিক, এবং ১৮৪৩ সনের মার্চ মাস হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রিকা হয়। অবশেষে বহু আর্থিক ক্ষতি হওয়ার ফলে ১৮৪৩ সনের নভেম্বর মাসে ইহা বন্ধ হইয়া যায়। এই পত্রিকার

প্রথম সংখ্যায় ইহার প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে সে যুগের সাময়িক পত্রের লক্ষ্য, কর্তব্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মে। এই জন্য ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"যে প্রকার সময় উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমারদিগের উদ্যোগের আনুকূল্যের সম্ভাবনা, যেহেতু রাজ্যশাসনকারিরা প্রজার মঙ্গল বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সচেষ্ট হইতেছেন এবং ভারতবর্ষস্থ ও ইংলণ্ডদেশস্থ ইংরাজের মধ্যে অনেকের অন্তঃকরণে আমারদিগের হিতেচ্ছা প্রবল হইতেছে। অপর এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে এবং তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক উপকার দর্শিতে পারে। আর তদ্ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদিগের স্বস্ব মতের বিরুদ্ধ কথা শ্রবণে যে দ্বেষ তাহার হ্রাস হইতেছে। অতএব এতদ্রূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সমীপে দুঃখ সমূহ নিবেদনপূর্ব্বক যাহাতে ঐ ক্লেশ নিবারণ এবং দেশের অবস্থার উৎকৃষ্টতা হয় তাহার প্রার্থনা এবং আমারদিগের প্রার্থিত বিষয়ে সাহায্য করণার্থে ইংরাজদিগের অনুরোধ করা, আর সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে স্বদেশের মঙ্গলার্থে সম্যক্ প্রকারে যত্ন করিতে প্রবৃত্তি প্রদান, এবং অস্মদ্দেশীয় সাধারণ জনগণকে স্বস্ব হিতাহিত উত্তমরূপে বিবেচনা দ্বারা উৎসাহাবলম্বন পূর্ব্বক আপনারদিগের মঙ্গলার্থে সচেষ্টিত হইতে প্রার্থনা করা আমারদিগের যথাসাধ্য অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে।

"পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ানুসারে আমরা এতৎপত্রে ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করিব যদ্দারা রীতি ব্যবহারাদির উত্তমতা এবং বিদ্যা, কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্যাদির বৃদ্ধি আর রাজ্যশাসন কার্য্যের সুনিয়ম হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বপ্রকারে উন্নতি হয়।"[৭]

১৮৪৩ সনের ১৬ অগষ্ট তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস প্রসঙ্গে এই সভা ও পত্রিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। এ পর্যন্ত যত সাময়িক পত্রিকার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে এই পত্রিকাখানিই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবি। বাংলা দেশের আধুনিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসে এই পত্রিকাখানির অবদান অমূল্য।

ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকিলেও ইহাতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্বাদি বহু বিষয় আলোচিত হইত। বাংলা দেশের বহু মনস্বী এই পত্রিকাখানির সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ইহার প্রবর্তক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এশিয়াটিক সোসাইটির অনুকরণে একটি প্রবন্ধ নির্বাচনী সভা গঠন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, আনন্দ চন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি ইহার সভ্য ছিলেন। নিয়ম ছিল যে এই সভার সভ্যগণের অধিকাংশ কর্তৃক মনোনীত না হইলে কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না এবং প্রয়োজন হইলে উক্ত সভা তাহা পরিবর্তিত ও সংশোধিত করিতে পারিবে।

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম বারো বৎসর (১৮৪৩-৫৫) এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। তিনি মাসিক ৩০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন, পরে ইহা বাড়িয়া ৬০ টাকা পর্যন্ত হইয়াছিল। তাঁহার পর ক্রমান্বয়ে সম্পাদক হন নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৫-৫৯), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫৯-৬২, ১৯০৯-১০), অযোধ্যা নাথ পাকড়াশী (১৮৬৫-৬৭, ১৮৬৯-৭২), সীতানাথ ঘোষ (১৮৭২-৭৭?), হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৬৭-৬৯, ১৮৭৭-৮৪), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৪-১৯০৮), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১০-১৫), সত্যেন্দ্রনাথ ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সহযোগে—১৯১৫-২৩) এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯২৩-১৯৩২)। ক্ষিতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৪৬ সনে "বিদ্যাকল্পদ্রুম অর্থাৎ বিবিধ বিদ্যাবিষয়ক রচনা শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা সংগৃহীত" হইয়া প্রকাশিত হয়। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা-খানির ইংরেজী নাম ছিল "Encyclopaedia Bengalensis"। ইহার এক একটি খণ্ড সাধারণতঃ তিন মাসের ব্যবধানে প্রকাশিত হইত। মোট ১৩ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে, রোম ও ঈজিপ্ত দেশের পুরাবৃত্ত, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূগোল বৃত্তান্ত, নীতিবোধক ইতিহাস এবং 'চিত্তোৎকর্ষবিধান' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১৮৪৯ সনে 'সংবাদ রসসাগর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। কয়েক মাস পরে ইহা সপ্তাহে তিন দিন বাহির হয়। প্রথমে ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর (১৮৫০) কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার সম্পাদনা করেন। রঙ্গলাল ইহার নাম করেন 'সংবাদ সাগর'। ১৮৫৩ সনে এই পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৪৯ সনে জয়কালী বসু 'মহাজন দর্পণ' নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু ইহাই বাংলা ভাষায় দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত তৃতীয় সাময়িক পত্র। বাণিজ্য সংক্রান্ত সাময়িক পত্র বোধ হয় ইহাই প্রথম।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কর্তৃক ১৮১৮ সনে প্রতিষ্ঠিত 'সমাচার দর্পণ' কিছুকালের জন্য বন্ধ হইয়াছিল। এই সময় ১৮৫০ সনে ৪ঠা মে মেরিডিথ্‌ টৌনসেণ্ড নামক এক সাহেব 'সত্য প্রদীপ' নামে একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। পর বৎসর 'সমাচার দর্পণ' পুনরায় প্রকাশিত হইলে সত্য প্রদীপের প্রচার বন্ধ হয়। সত্য প্রদীপের প্রথম সংখ্যায় ইহার প্রচারের যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা সাময়িক পত্র সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়। এই জন্য ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"সত্যপ্রদীপ প্রকাশ······এইক্ষণে অন্যূন সপ্তদশ পত্র বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে ইহার মধ্যে কএক পত্রের তিন চারি শত পর্য্যন্ত গ্রাহক সত্তাই সম্বাদ-পত্র পাঠ করেন এতদ্দেশীয় লোকেরদের অত্যন্ত লালসার প্রমান। ইদানীং বঙ্গ-দেশীয় বিজ্ঞজনগণ স্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ স্বীয় ভাষায় সপ্তদশ পত্র প্রকাশ করিতেছেন অতএব বিদেশীয় লোকেরদের এতৎকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করণের কি প্রয়োজন কেহ যদি অসন্তুষ্ট হইয়া এইমত আপত্তি করেন তবে উত্তর এই। কোন দেশীয় লোক কিঞ্চিৎ সভ্যতাবিশিষ্ট হইলে তাঁহারা অবশ্য সম্বাদপত্র প্রকাশ করেন ক্রমে সভ্যতার বর্দ্ধনানুসারে পত্রের উত্তমতা বৃদ্ধি হয়। এদেশীয় লোকেরদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে তথাপি যে যে পত্র প্রকাশ হইতেছে তাহার তিন চারি পত্র ভিন্ন অন্যান্য পত্রবিষয়ে সভ্যজনগণ নানা দোষার্পণ করেন। প্রথম এই। কোন কোন সম্পাদক মহাশয় কোন স্থানে কোন সম্বাদ শ্রুত হইলে তাহার সত্যাসত্যতা নির্ণয়ার্থে উপযুক্ত অনুসন্ধান না করিয়া অথবা তদ্রূপ অনুসন্ধান করণাক্ষম হইয়া সহসা তাহা প্রকাশ করেন। ফলতঃ কোন কোন সময়ে সদাচারি সভ্য বিশিষ্ট লোকেরদের নামে অনুপযুক্তরূপে দোষার্পণ ও নানাপ্রকার গ্লানি হয়। দ্বিতীয় এই। কএক সম্বাদপত্রে অত্যন্ত অনুপযুক্ত শব্দাদি ব্যবহার প্রযুক্ত সভ্যলোকেরা প্রায় তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারেন না। ফলতঃ এতদ্বিষয়ে নিশ্চিন্ত মহাশয়ের-দের ঐ সকল পত্র পাঠ করাতে তাঁহারদের নীতিবৃদ্ধি না হইয়া অসভ্যতা বর্দ্ধন হইতেছে। এইক্ষনে আমরা দেশবিদেশীয় সত্য সম্বাদ অনুসন্ধানপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া যাহা অসত্য তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঠক মহাশয়দের মনঃসন্তোষ করণাভি-প্রায়ে সত্যপ্রদীপ নামক এই সম্বাদপত্র প্রকাশ করিতেছি। কোন অন্যায়া-চরণের বিশ্বাস্ত সংবাদ প্রাপ্ত হইলে তদাচারের দোষ প্রকাশ করণে কোনক্রমে শৈথিল্য করিব না পরন্তু ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিও করিব না। ফলতঃ এতদ্দেশীয়

লোকেরদের সৎজ্ঞান ও গুণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় এমত উপায় করা সত্যপ্রদীপের প্রধান অভিপ্রায়।"[৮]

১৮৪৯ সনে কলিকাতায় সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত 'সর্বশুভকরী সভা' পর বৎসর 'সর্বশুভকরী পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। বহুকালাবধি প্রচলিত কতকগুলি সামাজিক কুপ্রথা—'কৌলীন্য ব্যবস্থা', বিধবা বিবাহ প্রতিষেধ, অল্প বয়সে বিবাহ প্রভৃতি—যে সমাজের কতদূর অনিষ্টকারী তাহা জনসমাজে প্রচার করাই ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ইহার প্রথম সংখ্যায় 'বাল্যবিবাহের দোষ', দ্বিতীয় সংখ্যায় 'স্ত্রী শিক্ষা', ও তৃতীয় সংখ্যায় মাংসাহারের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে এই পত্রিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"ইনি (মদনমোহন তর্কালঙ্কার) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সর্বশুভকরী' নামে পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটি প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।"[৯]

এই পত্রিকার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ইহার কোন নির্ধারিত মূল্য ছিল না। চারি আনা বা তাহার অধিক যাহা কেহ স্বেচ্ছায় দান করিতেন তাহাই গৃহীত হইত। ১৮৫১ সনে কাগজের প্রচার কিছুদিন বন্ধ থাকে, কিন্তু সম্ভবতঃ কয়েক বৎসর পর ইহা পুনঃ প্রকাশিত হয়।

১৮৫১ সনে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' (Vernacular Literature Committee) স্থাপিত হয়। বাংলার কয়েকজন মনস্বী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, রাজেন্দ্র লাল মিত্র—, পাদরি লং সাহেব ও আর কয়েকজন ইংরেজ ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। এই সমাজের পক্ষ হইতে এবং ইহার অর্থ সাহায্যে ১৮৫১ সনে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাই সম্ভবতঃ বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র পত্রিকা। নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনে এই কাগজের উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে :

"পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা, শিল্পসাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিক পত্র।—যাহাতে বঙ্গদেশস্থ জনগণের জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং সৎ ও আনন্দজনক প্রস্তাব সকল প্রচার করা উক্ত সমাজের মুখ্য কল্প, এবং ইংরাজী ভাষায় "পেনি মেগজিন" নামক পত্রের অনুবর্ত্তিত এতৎপত্রে তদভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে অবিরত সম্যক্ চেষ্টা করা যাইবেক। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের পাঠযোগ্য করণার্থে উক্ত পত্র অতি কোমল ভাষায়

লিখিত হইবেক, এবং তত্রত্য প্রস্তাবিত বস্তু সকলের বিশেষ পরিজ্ঞানার্থে তাহাতে নানাবিধ ছবি থাকিবেক।[১০] ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্র লাল মিত্র। ১৮৬১ সনে কালীপ্রসন্ন সিংহ ইহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকা-খানি গবর্নমেণ্টের অর্থ সাহায্য পাইত। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'নীলদর্পণের' বিস্তারিত সমালোচনা এবং নীলকরদিগের অত্যাচার প্রকাশ করায় গবর্নমেণ্ট অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হন এবং ইহার ফলে পত্রিকাখানি উঠিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে এই পত্রিকার খুব প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন: "চীৎ হইয়া (শুইয়া) পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে। এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন? সর্ব্ব-সাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না।"[১১]

বিবিধার্থ সংগ্রহের অভাব দূর করিবার জন্য কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ও ভার্ণাকিউলার লিটারেচার সোসাইটির আনুকূল্যে ১৮৬৩ সনে 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে:—

"পূর্ব্বে বিবিধার্থ সংগ্রহ যে উদ্দেশে বহুল পাঠকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত ইহাও সেই অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত।....এইরূপ পত্র সম্প্রতি আর প্রচলিত নাই।

"পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, নীতি-গর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনায় উক্ত পত্র অতি অল্পকালে সংখ্যাতিরিক্ত ব্যক্তির প্রেমাস্পদ হইয়াছিল; এই মাসিক পত্র তদনুকরণ দ্বারা তাহার পুরস্কার প্রার্থনা করে।[১২]

১৮৫৪ সনে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে বাংলা ও হিন্দী এই দুই ভাষা এবং বাংলা ও নাগরী এই দুই অক্ষর ব্যবহৃত হইত। ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুত শ্যামসুন্দর সেন এবং ইহাতে প্রধানতঃ জাহাজের সংবাদ, জিনিষ পত্রের দর প্রভৃতি থাকিত। ইহাই বাংলা ভাষায় লিখিত চতুর্থ ও বাংলাদেশে হিন্দীভাষায় লিখিত প্রথম দৈনিক পত্র।

১৮৫৬ সনে শিক্ষাবিভাগের ইন্‌স্‌পেক্টর হজসন প্র্যাট সাহেবের

প্রতিপোষকতায় 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' প্রকাশিত হয় এই বাংলা সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন রেভারেণ্ড ও'ব্রায়েন স্মিথ (Rev. O' Brien Smith)। সরকার মফঃস্বলের লোকদের নিকট সংবাদ সরবরাহের জন্য এই পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং মাসিক দুইশত টাকা সাহায্য দান করেন। "ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা ও মাসিক অগ্রিম মূল্য সাড়ে চারি আনা মাত্র।"

প্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন ইহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। স্মিথ সাহেব বিলাত যাইবার কিছুকাল পরে ১৮৬৬ সনের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক খ্যাতনামা প্যারীচরণ সরকার ইহার সম্পাদক হন। তাঁহার সম্পাদনায় পত্রিকাখানির উন্নতি হইয়াছিল এবং গ্রাহক সংখ্যাও বাড়িয়াছিল। কিন্তু আড়াই বৎসর পরে যে কারণে তিনি পদত্যাগ করেন তাহা নানা দিক হইতে বাংলা দেশের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই জন্য ইহার একটু বিস্তৃত বিবরণ দিতেছি।

১৮৬৮ সনের মে মাসে একটি রেলওয়ে দুর্ঘটনায় বহুলোক হতাহত হইয়াছিল। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করিয়া গভর্নমেণ্ট যে বিবরণী প্রকাশিত করেন জনসাধারণ তাহা বিশ্বাস করে নাই এবং বহু পত্রিকায় ইহার অতি ভয়াবহ বিবরণ প্রকাশিত হয়। এডুকেশন গেজেটে যে সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"বিগত ২৬শে বৈশাখ ঈষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর স্টেশনে যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, তাহার অত্যন্ত ভয়ানক বিবরণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা তৎকালে ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্যরূপেই বলিতেছেন যে, প্রায় তিন শত লোক মারা পড়িয়াছে। আবার উহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর কয়েকটি বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। অনেকেই এরূপ অনুভব করিতেছেন যে রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা যখন তাড়াতাড়ি ভগ্ন গাড়ী হইতে হত আহত ব্যক্তিগণকে বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ অত্যন্ত নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন।......

"হত আহত ব্যক্তিরা যে স্থানে ছিল, তথা হইতে ৬।৭ হাত দূরে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার গাড়ি আনিয়া রাখা হয়, এবং এই ৬।৭

হাত ভূমির উপর দিয়া মৃত ও মৃতপ্রায় ব্যক্তিগণকে যে প্রকার ভয়ানকরূপে নিক্ষেপ করা কিম্বা টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে যাহারা মৃতপ্রায় ছিল, তাহাদের জীবিত থাকিবার অধিক সম্ভাবনা ছিল না।......

"হত ব্যক্তিকেও যেমন বলপূর্ব্বক টানিয়া অথবা উৰ্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া স্থানান্তরিত করিবার গাড়িতে রাখে, যে সকল আহত ব্যক্তিরা মৃতপ্রায় হইয়াছিল, অথবা কথা কহিতে অসমর্থ ছিল, তাহাদের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করে ।.....

"তাড়াতাড়ি হত ব্যক্তিসমূহকে রাত্রিকালে গোপনে নূতন ট্রেন আনাইয়া স্থানান্তরিত করা, এবং কোথায় নিক্ষেপ করা হইল তাহা কাহাকেও না জানান, অত্যন্ত সন্দেহের কারণ, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।......

"যখন রাত্রি মধ্যেই চুপে চুপে সমস্ত মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়া কুষ্টীয়ার নীচে পদ্মাতে বা অপর স্থানে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তখন প্রকাশ্য রিপোর্টের লিখিত সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল বলিয়া অনায়াসেই লোকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে ।......

"সকলেই বলিতেছে যে তাড়াতাড়িতে কতকগুলি মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও মৃত-ব্যক্তির সহিত এক গাড়ীতে নিক্ষেপ করিয়া পদ্মায় বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে।...

"যে সকল ব্যক্তি হত বা আহত হইয়াছিল তাহাদের ঘড়ী, অলঙ্কার, টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কোথায় গেল, কে লইল তাহারও কিছুই অনুসন্ধান হয় নাই। শুনা গেল জনৈক আহত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রেলওয়ে কর্ম্মচারীর দুই একজন তাঁহার পকেটে হাত দেওয়াতে তিনি যেমন সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখেন তৎক্ষণাৎ দস্যুবৎ কর্ম্মচারীরা অন্যদিকে যায়। এই সকল কর্ম্মচারী লুট করিতে গিয়াছিল, সাহায্য দিতে যায় নাই।

"যাহাতে এই দুর্ঘটনা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হয়, এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্ত সত্য প্রকাশ পায়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করুন ।"[১৩]

সরকারী অর্থ সাহায্যে প্রতিপালিত পত্রিকায় এইরূপ বিবরণ বাহির হওয়ায় গভর্নমেণ্ট সম্পাদককে লিখিলেন: "যাহাতে সত্য ঘটনা জানিয়া জনসাধারণ মতামত গঠন করিতে পারে তাহাই ছিল এডুকেশন গেজেটকে গভর্নমেণ্টের অর্থ সাহায্যের প্রধান শর্ত বা উদ্দেশ্য । রেলওয়ে দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্ধারণের চেষ্টা না করিয়া যে মিথ্যা বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ প্রতিকূল এবং ইহা দ্বারা এ দেশীয় জনসাধারণ বিভ্রান্ত এবং সন্ত্রস্ত হইবে।"

ইহার উত্তরে প্যারীচরণ লিখিলেন: "Hindoo Patriot, National Paper, Indian Mirror, 'সোম প্রকাশ,' 'প্রভাকর,' এবং 'চন্দ্রিকা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ এবং আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়া যে সমুদয় নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাইয়াছি তাহাতে আমার লিখিত বিবরণ সত্য বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। সুতরাং গভর্নমেণ্ট যে শর্তের বা উদ্দেশ্যের কথা লিখিয়াছেন তাহা যে কোন রকম ভঙ্গ বা ব্যর্থ হইয়াছে আমি তাহা মনে করি না।"

এই উত্তরে গভর্নমেণ্ট সন্তুষ্ট না হওয়ায় প্যারীচরণ পদত্যাগ করেন। প্যারীচরণ নিজে একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন, কিন্তু এই পদত্যাগপত্র গ্রহণ ভিন্ন গভর্নমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে আর কিছু করেন নাই। পরবর্তী কালের তুলনায় সম্পাদক প্যারীচরণের চিত্ত-স্বাধীনতা যেমন প্রশংসনীয়, সরকারের অপেক্ষাকৃত অকঠোর ভাবও তেমনি উল্লেখযোগ্য। স্বাধীন ভারতে এরূপ সরকার বা সরকারী কর্মচারী সুলভ নহে।

পূর্বোক্ত দুর্ঘটনার বিবরণ যে অনেকাংশে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ পরবর্তীকালেও রেলওয়ে দুর্ঘটনায় সত্য গোপনের জন্য কর্মচারীদের অনুরূপ নৃশংস ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শতাধিক বর্ষ পূর্বে এইরূপ একটি ঘটনার সমসাময়িক বিস্তৃত বিবরণ বিশেষ মূল্যবান।

প্যারীচরণের পরে তৎকালে স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ও পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন, এবং গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে এডুকেশন গেজেট পত্রিকাখানির সর্বস্বত্ব দান করিয়াছিলেন। হুগলী হইতে প্রকাশিত এই পত্রিকাখানি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ও দীর্ঘজীবি হইয়াছিল।

১৮১৮ হইতে ১৮৫৭ সন এই ৪০ বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যক নূতন বাংলা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাহার মধ্যে মাত্র কয়েকটির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।[১৪] শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে তালিকা দিয়াছেন তদনুসারে সময়ানুক্রমে ইহাদের সংখ্যা এইরূপ—

১৮১৮-২২ সন	৯
১৮২৩-৩৫ "	২০
১৮৩৬-৩৯ "	৮
১৮৪০-৪৬ "	২২
১৮৪৭-৪৮ "	২০
১৮৪৯-৫০ "	১৯
১৮৫১-৫৫ "	২৬
১৮৫৬-৫৭ "	১২
মোট	১৩৬

ইহার মধ্যে কলিকাতার বাহিরে মফঃস্বল হইতেও কতকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত

হইয়াছিল যথা—সাপ্তাহিক 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী' (১৮৪০), সাপ্তাহিক 'সংবাদ বর্ধমান' (১৮৫০) ও 'বর্ধমান চন্দ্রোদয়, দ্বিভাষিক (ইংরেজী ও বাংলা) মাসিক 'মেদিনীপুর ও হিজিলি অঞ্চলের অধ্যক্ষ' (১৮৫১), সাপ্তাহিক 'রংপুর বার্তাবহ' (১৮৪৭)। বিশেষ কোন বিষয় অবলম্বনেও কয়েকখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল যেমন, 'আয়ুর্বেদ দর্পণ' (মাসিক, ১৮৪০), 'কায়স্থ কৌস্তুভ' (১৮৪৪), 'পশ্বাবলী' (১৮২২), 'পক্ষির বিবরণ' (১৮৪৪), এবং ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে কয়েকখানি পত্রিকা। 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' নামে মুসলমান পরিচালিত একখানি সাপ্তাহিক পত্র ১৮৪৬ সনে প্রকাশিত হয়। ইহা বাংলা ছাড়া আরও চারিটি ভাষায়—ইংরেজী, হিন্দী, ফার্সী এবং উর্দু বা হিন্দুস্থানীতে প্রকাশিত হইত।

রামমোহন রায় ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ ফার্সী পণ্ডিতদের জন্য 'মীরাৎ-উল আখবার' নামে সাপ্তাহিক পত্র ১৮২২ সনে প্রকাশিত করেন। 'জাম-ই-জুহান-নুমা' নামে প্রথম উর্দু সাপ্তাহিকও ঐ বৎসরই প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়াও আরও কতকগুলি ফার্সী ও উর্দু সাময়িক পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞান বিষয় আলোচনার জন্য কয়েকখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে Society for Translating European Sciences কর্তৃক ১৮৩২ সনে প্রকাশিত মাসিক 'বিজ্ঞান সেবধি' ও ১৮৩৩ সনে প্রকাশিত পাক্ষিক 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রেভারেণ্ড লং সাহেব ১৮৫০ সনে বাংলা সাময়িক পত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন, এবং ১৮৫৫ ও ১৮৫৭ সনে এ বিষয়ে দুইটি রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন। তাঁহার মতে—"বাংলা সাময়িক পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য হাজার হাজার শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও প্রতিপত্তিশালী হিন্দুর মতামত গঠিত করিতেছে। যদি ধরা যায় যে গড়পরতা দশজন লোক একটি পত্রিকা পাঠ করে তাহা হইলে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সাময়িক পত্রের মতামত মফঃস্বলের অন্ততঃ ত্রিশ হাজার লোকের নিকট পৌছে। 'ভাস্করের' ন্যায় বাংলার কয়েকটি পত্রিকা সুদূর পঞ্জাবে পর্যন্ত পঠিত হয় এবং ইংলণ্ডেও ইহার গ্রাহক আছে।"

নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষীদের আন্দোলন উপলক্ষে যে সরকারী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার নিকট সাক্ষ্যদানের সময় রেভারেণ্ড লং সাহেব বলেন, যে "নীলচাষীরা এই আন্দোলনে যে প্রকার ঐক্য ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছে, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে বাংলা সাময়িক পত্রিকার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতীয় জনসাধারণের মুখপাত্র হিসাবে বাংলা সাময়িক পত্রিকার এখন একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রাজনীতিক এবং ভারতীয়দের সম্বন্ধে আলোচনা যে বইতে

থাকে তাহা লোকে খুব আগ্রহের সহিত কেনে এবং পড়ে। বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা হইতেই ইহা বেশ বোঝা যায়। কারণ ১৮২৬, ১৮৫৩ ও ১৮৫৭ সনে কলিকাতায় মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে আট হাজার, তিন লক্ষ, ও ছয় লক্ষ। 'ভাস্কর' ও 'প্রভাকরের' ন্যায় বাংলা পত্রিকা সুদূর পঞ্জাব পর্যন্ত বহুলোকে পাঠ করে। বাংলা পত্রিকার মফঃস্বলস্থ সংবাদদাতারা সমগ্র জিলার সংবাদ সরবরাহ করে এবং প্রত্যেক পত্রিকায়ই ইংরেজী সংবাদ অনুবাদের জন্য লোক আছে। সুতরাং ভারত ও ইউরোপের নানা রাজনীতিক ঘটনার যথেষ্ট জ্ঞান তাহাদের আছে......কাছারীর আমলা, পুলিশের কার্যাবলী, ম্যাজিস্ট্রেটগণের চরিত্র—প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রায়ই বাংলা সংবাদপত্রে সমালোচনা করা হয়। আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি যে গত ১৬ বৎসর যাবৎ নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই সমস্ত সংবাদপত্রে প্রায়ই কঠোর সমালোচনা থাকিত—এবং এই সব পত্রিকার মতামত অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকটও পৌঁছিয়াছে।"

১৮৭৩ সনে ছোটলাট ক্যাম্বেলের নির্দেশে বঙ্গদেশে প্রচলিত পত্রিকার এক তালিকা প্রস্তুত হয়। ইহাতে ৩৫টি পত্রিকার নাম আছে। ইহার মধ্যে ৩৩টি বাংলা, একটি ফার্সী ও একটি উর্দু ভাষায় লিখিত। উনিশটি কলিকাতা এবং ষোলটি মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত।[১৫]

২। সংবাদপত্র বা মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন (১৮৫৭ সন পর্যন্ত)

ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর গভর্নমেণ্ট যে ইংরেজী সাময়িক পত্রগুলির প্রতি প্রসন্ন ছিল না এবং কয়েকজন সম্পাদক তাহাদের হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ করেন অথবা নির্বাসিত হন এবং তাঁহাদের কাগজ বন্ধ হইয়া যায় ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অতঃপর বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (গভর্নমেণ্টের মতে স্বেচ্ছাচারিতা) খর্ব করা হয়। ১৭৯৯ সনে বড়লাট ওয়েলেসলীর আমলে এক নিয়ম হয় যে প্রকাশের পূর্বে প্রত্যেক সংবাদপত্র গভর্নমেণ্টের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং সেক্রেটারী ইহার পরীক্ষা ও অনুমোদন না করিলে ইহা প্রকাশ করা যাইবে না। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে সম্পাদককে ইউরোপে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে—অর্থাৎ ভারত হইতে নির্বাসন করা হইবে। ফলে সম্পাদকীয় মন্তব্যের যে যে অংশ সরকারী পরীক্ষক বাদ দিতেন, তাহা তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করিতে না পারিয়া—অথবা এই নিয়মের প্রতি বিক্ষোভ প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ—সম্পাদকেরা সেই সেই অংশ শূন্য রাখিয়া তারকা চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করিতেন।

সতের বৎসর এইভাবে চলিবার পর বড়লাট লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৮ সনে এইরূপ পূর্বাহ্নে পরীক্ষার প্রথা রহিত করিয়া সম্পাদকদের পরিচালনার জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্দেশ করিলেন। বড়লাটের কৌন্সিল বা সভার সদস্য অ্যাডাম (John Adams), চীফ সেক্রেটারী বেইলী (W. B. Bayley) ও অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীরা হেষ্টিংসের কার্যের বিরোধী ছিলেন এবং বড়লাটের পূর্বোক্ত কৌন্সিল Calcutta Journal পত্রের সম্পাদক বাকিংহামকে ভারত হইতে নির্বাসিত করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু হেষ্টিংস "মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা"-নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন—এবং এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। বাকিংহামের দুর্ভাগ্যবশতঃ লর্ড হেষ্টিংস পদত্যাগ করিলে অ্যাডামস্ অস্থায়ী বড়লাট হইলেন। অতঃপর বাকিংহামের যে দুরবস্থা হইল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

লর্ড হেষ্টিংসের সহযোগীদের ন্যায় বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টর্সও মনে করিতেন যে গণতন্ত্র শাসিত রাজ্যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় হইলেও ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের ন্যায় পরাধীন দেশে তাহা চলিতে পারে না। ১৮১৮ সনের নূতন বিধি তাহারা মঞ্জুর করেন নাই, কিন্তু বোর্ড অব কন্ট্রোল (Board of Control) তাহাদের মত অনুমোদন না করায় লর্ড হেষ্টিংসের বিধান বাংলাদেশে কার্যকর হইয়াছিল। অ্যাডাম বড়লাট হইয়াই ১৮২৩ সনের ১৪ই মার্চ সংবাদপত্র সম্বন্ধে এক কড়া আইন (Press Ordinance) জারি করিলেন।

যে সকল মুদ্রিত পুস্তক, পুস্তিকা বা সাময়িক পত্রে সংবাদ এবং সরকারী আইন ও বিচার পদ্ধতির বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সমালোচনা থাকিত, কেবল সেইগুলির জন্য নূতন আইনের সৃষ্টি হইল। এই আইন অনুসারে কোনো সাময়িক পত্র বাহির করিবার পূর্বে স্বত্বাধিকারী, মুদ্রাকর ও প্রকাশককে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স বা অনুমতি লইতে হইবে, এইরূপ নির্দেশ ছিল। কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হলফ করিয়া, সেই হলফনামা গভর্নমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইলে তবে লাইসেন্স বা অনুমতি পাওয়া যাইত, কিন্তু সে জন্য কোনও ফি দিতে বা খরচ করিতে হইত না। কি কি বিষয়ের আলোচনা সংবাদপত্রে নিষিদ্ধ ছিল, তাহার মুদ্রিত বিবরণ পূর্ব হইতেই প্রত্যেক সম্পাদককে দেওয়া থাকিত। তাহা সত্ত্বেও আইনবিরুদ্ধ কোন বিষয়ের আলোচনা করিলে কাগজের লাইসেন্স বাতিল করিয়া দেওয়া হইত এবং বে-আইনিভাবে কাগজ চালাইলে চারিশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।[১৬]

এই কুখ্যাত আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন রায় যে তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলন

করিয়াছিলেন বাংলার—তথা ভারতের—ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সেকালের আইন অনুসারে প্রত্যেক নূতন আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করা যাইত। রামমোহন ও কলিকাতার পাঁচ জন বিশিষ্ট নেতা এই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে একটি আবেদন পত্র (Memorial) দাখিল করিলেন। এই আবেদনে যেরূপ যুক্তিপূর্ণ ও ওজস্বিনী ভাষায় সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা হরণের প্রতিবাদ করা হইয়াছিল তাহার তুলনা নাই। একজন ইংরেজ মহিলা ইহাকে ইংরেজ মহাকবি মিল্টন (Milton) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যে জগদ্বিখ্যাত *Areopagitica* নামক পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।[১৭] কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি আবেদনের যুক্তিতর্কে কিছুমাত্র কর্ণপাত করিলেন না। উপরন্তু বলিলেন যে তিনি এই আবেদন পাইবার পূর্বেই গভর্নমেণ্টকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তিনি ইহা অনুমোদন করিবেন। কিন্তু রামমোহন ইহাতে নিবৃত্ত না হইয়া বিলাতে সপারিষদ রাজার (King in Council) নিকট আপীল করিলেন। এই আপীলের রচনাও এদেশে ও বিলাতে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য আবেদন ও আপীল উভয়ই রামমোহন নিজে রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ আপীলেও কোন ফল হইল না। ১৮২৩ সনের সংবাদপত্র আইন বলবৎ রহিল।

নূতন আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন প্রতিবাদস্বরূপ তাঁহার সম্পাদিত 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' নামক ফার্সী ও উর্দু ভাষায় লিখিত সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহার শেষ সংখ্যায় তিনি জানাইলেন যে নূতন আইনের অপমানজনক শর্তে রাজী হইয়া তিনি ঐ কাগজ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক।

সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইলেও, এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন ও তাঁহার পাঁচ-জন সহযোগীর আন্দোলন ভারতের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে তাহার সারমর্ম দিতেছি:

"রামমোহন ও তাঁহার যে পাঁচজন সহযোগী—চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ ব্যানার্জী ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর—এই আইনের বিরুদ্ধে আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমগ্র দেশবাসীর নিকট নির্ভীক দেশপ্রেমিক বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন—কারণ তাঁহারা যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও রাজার আদালতের বিরুদ্ধে সগর্বে ও সৎসাহসের সহিত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা কেবল ভারতীয়দের স্বার্থের জন্য নহে, স্বাধীনভাবে জ্ঞান

অর্জন করিবার যে মানুষের জন্মগত অধিকার আছে তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য। আবেদন পত্র হইতে বেশ বোঝা যায় যে ইংরেজ জাতির রাজনৈতিক চিন্তা ও আদর্শ দ্বারাই তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে ইংলণ্ডে প্রজাদের যে অধিকার আছে ভারতীয় প্রজারাও তাহা তুল্য ভাবে দাবি করিতে পারে, কিন্তু এই নূতন আইন এইরূপ একটি প্রধান অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, অথচ কোন রকমেই তাঁহারা এই অধিকারের অপব্যবহার করেন নাই। এই আইনের ফলে ইংলণ্ডের রাজা ও পার্লিয়ামেণ্টের নিকট ভারতীয় প্রজারা দেশের প্রকৃত অবস্থা ও সরকারী কর্মচারীদের প্রকৃত আচরণ জানাইতে সক্ষম হইবে না। আর ইহাতে সর্বপ্রকারে দেশবিদেশের গ্রন্থাদি হইতে জ্ঞান আহরণের পক্ষে বিষম বাধার সৃষ্টি করিবে।"[১৮]

এই আন্দোলনের আর একটি ফল হইল—দেশবাসীর মনে রাজনীতিক চেতনার সঞ্চার। সংবাদপত্র লইয়া সেকালের খুব কম লোকই মাথা ঘামাইত—এবং খুব কম লোকই সংবাদপত্র পড়িত। কিন্তু কারাবাস, নির্বাসন বা অন্য কোন দণ্ডের ভয়ে ভীত না হইয়া রামমোহন ও তাঁহার সহযোগীগণ যেভাবে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন তাহাতে বহু দেশবাসীর চিত্ত আকৃষ্ট হইল এবং রাজনীতিক অধিকারের সমস্যা তাহাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইল।

বস্তুতঃ রামমোহন রাজনীতিক আন্দোলনের যে পন্থা দেখাইলেন, শতাধিক বর্ষ পর্যন্ত ভারতে তাহাই আইন-সম্মত আন্দোলন (constitutional agitation) নামে পরিচিত হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম প্রস্তুতি রূপে স্বীকৃত ও অনুসৃত হইয়াছিল। ১৯৩০ সনে ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম যখন প্রায় শেষ অঙ্কে পৌছিয়াছিল তখন একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী লিখিয়াছিলেন, "লণ্ডনে এক গোল টেবিল বৈঠকে (Round Table Conference) ভারতীয় ও ইংরেজ নেতৃবৃন্দ সমবেত হইয়া ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিবেন, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে কোন ইংরেজ ইহা কল্পনাও করিতে পারিত না। আর ইহা কখনও সম্ভব হইত না, যদি রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে তিনজন ঠাকুর, একজন ঘোষ, ও একজন ব্যানার্জী তাঁহাদের আন্দোলনের দ্বারা ইহার পথ প্রস্তুত না করিতেন।"[১৯]

১৮২৩ সনের কুখ্যাত আইনটি বারো বৎসর ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিয়াছিল এবং এই সময়ের মধ্যে যত সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল সকলকেই লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইত। লর্ড আমহার্ষ্ট যখন ১৮২৩ সনে স্থায়ী

বড়লাট নিযুক্ত হন তখন কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে ভারতীয় সংবাদপত্র কঠোর হস্তে দমন করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং তিনিও সাধ্যমত এই নির্দেশ পালন করিয়াছিলেন। ১৮২৭ সনে তিনি সরকারী কর্মচারীদিগকে সংবাদপত্রের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। ১৮৪১ সনে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়, কিন্তু লর্ড লিটন ১৮৭৫ সনে ইহা পুনঃ প্রচার করেন। ১৮২৭ সনে লর্ড আমহার্ষ্ট Calcutta Chronicle নামক সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ করেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫) নানাভাবে উদারনীতির পরিচয় দিলেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। তবে তাঁহার আমলে কোন খবরের কাগজের প্রচার বন্ধ হয় নাই। লর্ড বেন্টিঙ্কের পর মেটকাফ (Sir Charles Metcalfe) অস্থায়ীভাবে বড়লাট নিযুক্ত হন। তিনি ১৮২৩ সনের আইন রহিত করিয়া ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৩৫ সেপ্টেম্বর)। তাঁহার স্বল্পকাল স্থায়ী শাসন ইহার জন্য ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। ভারতবাসীরা ইহাতে খুবই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইলেন কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ইহাতে বিরক্ত হইলেন, এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই মেটকাফকে পাকাপাকিভাবে বড়লাটের পদে নিযুক্ত করিলেন না।

ইহার পর ১৮৫৭ সন পর্যন্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং কোন অভিযোগের কারণও ঘটে নাই। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজী ও দেশীয় কাগজের নানারকম মিথ্যা সংবাদে ও উত্তেজনা মূলক উক্তিতে সিপাহীরা বিচলিত হইয়া বিদ্রোহ করিয়াছে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া বড়লাট ক্যানিং ১৮৫৭ সনে আইন করিয়া এক বৎসরের জন্য ইংরেজী ও দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অনেক পরিমাণে খর্ব করেন। এই আইনের ফলে বাংলাদেশের 'সুলতান-উল-আখবর' ও 'দূরবীন' নামক দুইটি ফার্সী পত্রিকা, 'সমাচার সুধাবর্ষণ' নামে হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত পত্রিকা, এবং দুইটি ইংরেজী পত্রিকা 'Friend of India' এবং Bengal Hurkaru' অভিযুক্ত হয়।

৩। সংবাদপত্র (১৮৫৭-১৯০৫)

(ক) ইংরেজী পত্রিকা

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় পরিচালিত পত্রিকার সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গেল। ইহার মধ্যে ইংরেজী পত্রিকার সংখ্যা খুব অল্পই ছিল—বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় লিখিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এই গুলির মধ্য দিয়া ভারতীয়দের মনে রাজনীতিক চেতনা জাগ্রত হইল এবং দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি ও অনুপ্রেরণা

বাড়িয়া চলিল। অপর পক্ষে ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকাগুলিতে ভারতীয়দের প্রতি একটা আক্রোশের ভাব এবং তাহাদের রাজনীতিক অধিকার ও দাবির বিরোধিতা প্রকট হইয়া উঠিল। ইহার প্রধান কারণ এতদিন ভারতবর্ষ ছিল একটি কোম্পানির অধিকারে। এখন হইতে ইহা প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ রাজের ও ইংরেজ জাতির অধীন হইল, সুতরাং প্রত্যেক ইংরেজই নিজেকে ভারতের প্রভু বলিয়া মনে করিত।

বাংলা দেশে বহুদিন পর্যন্ত Hindoo Patriot-ই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ পত্রিকা ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই পত্রিকা স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিয়া খুব সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। নীলকরদের অত্যাচার ও চাষীদের দুর্দশা বর্ণনা করিয়া এই পত্রিকা তীব্র ভাষায় ইংরেজ শাসনের নিন্দা ও ইহার বিরুদ্ধে দেশীয় লোকদের সক্রিয় প্রতিরোধ সমর্থন পূর্বক এক নূতন জাতীয় মনোবৃত্তি গঠনের অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল। ১৮৬১ সনে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ইহার প্রভাব কিছু কমিয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণদাস পাল ইহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করায় আবার ইহার পূর্বগৌরব ফিরিয়া আসিল। তেইশ বৎসর কাল কৃষ্ণদাস পাল ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং এই সময় ইহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল খুব কম সংবাদপত্রের ভাগ্যেই তাহা ঘটিয়াছে। গভর্নমেণ্টও ইহার মতামতকে মূল্যবান জ্ঞান করিতেন।

এই সময় আর কয়েকটি পত্রিকাও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ১৮৬১ সনে Indian Mirror প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পরে কেশবচন্দ্র সেন ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—এবং পরে ইহার সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন। অন্যান্য পত্রিকাগুলির মধ্যে কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত সাপ্তাহিক Indian Field (১৮৫৯), শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত Mukherji's Magazine (১৮৬১) এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত Bengalee (১৮৬২) প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৮৬৫ সনে নবগোপাল মিত্র বিশেষ-ভাবে জাতীয়তার উদ্দীপক National Paper প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসরই Indian Field পত্রিকা Hindoo Patriot-এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

ইংরেজী পরিচালিত কাগজের মধ্যে Statesman সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহার সম্পাদক রবার্ট নাইট (Robert Knight) ইংরেজ সম্পাদকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে বম্বে নগরী হইতে প্রকাশিত The Times of India পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৫ সনে

তিনি ইহার সংশ্রব ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং শ্রীরামপুরের মিশনারী—কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড—কর্তৃক ১৮১৮ সনে প্রতিষ্ঠিত Friend of India পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করেন। ইহা প্রথমে ছিল মাসিক, পরে সাপ্তাহিক হয়। সিপাহী বিদ্রোহের প্রারম্ভে ১৮৫৭ সনের ২৫শে জুন তারিখে এই পত্রিকায় "পলাশীর শতবার্ষিকী" নামে একটি প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—গভর্নমেণ্ট ইহাতে বিচলিত হইয়া ইহাকে সতর্ক করিয়া দেন। ১৮৭৫ সনে নাইট সাহেব Statesman পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরিণামে এই দুইটি কাগজ যুক্ত হইয়া The Statesman and the Friend of India এই নামে প্রকাশিত হয়। এই নামেই এই কাগজটি এখনও প্রচারিত হইতেছে। ইংরেজ পরিচালিত সাময়িক পত্রের মধ্যে Statesman পত্রিকার সম্পাদক নাইট সাহেব ভারতের প্রগতির প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিকতর সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। আর একখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিকপত্র Englishman—ইহা ১৮৩২ সনে প্রতিষ্ঠিত John Bull পত্রিকার পরিবর্তিত নূতন নাম। ইহা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ও কনসার্ভেটিভ (Conservative বা Tory) দলের মুখপত্র, সুতরাং ভারতীয়বিদ্বেষী এবং প্রতিক্রিয়াশীল। এই দুইখানি পত্রিকার মধ্যপন্থী ছিল Indian Daily News। এই পত্রিকা ও Englishman, এই দুই দৈনিকের মূল্য ছিল চারি আনা। Statesman এক আনায় বিক্রয় হইত। সুতরাং ঐ দুই পত্রিকা Statesmanকে পছন্দ করিত না। কিন্তু ভারতীয় জনসাধারণের কাছে Statesman খুবই প্রিয় ছিল। দামে সস্তা এবং মতামতের উদারতাই ইহার কারণ।

বাংলা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কিরূপে প্রথমে শিশিরকুমার ও পরে মতিলাল ঘোষের সম্পাদনায় ইংরেজী দৈনিক কাগজে পরিবর্তিত হয় তাহা পরে বিবৃত হইবে। ইংরেজী Bengalee ও Amrita Bazar Patrika উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথমে সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। Bengalee পত্রিকার প্রতিষ্ঠার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৭৯ সনের ১লা জানুআরি তারিখে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ইহার সম্পাদক ও অধ্যক্ষ হন। এই সময় হইতে Bengalee খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ইহা Amrita Bazar অপেক্ষাও অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল। মোটের উপর এই দুই পত্রিকা যে বাংলার—তথা ভারতের—জাতীয়তা-চেতনা উদ্বোধনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দুঃখের বিষয় এই দুই পত্রিকার সম্পাদকের মধ্যে বহুদিন যাবৎ একটি রেষারেষির ভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'হিতবাদী' পত্রিকা সে যুগের একজন সুপরিচিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির পারিবারিক কুৎসা প্রচারের জন্য মানহানির অপরাধে অভিযুক্ত হন। এই উপলক্ষে এই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। রাজনীতিক মতভেদও ইহার অন্যতম কারণ ছিল, কারণ সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন নরমপন্থী আর মতিলাল ছিলেন কতকটা চরমপন্থী। ১৯০০ সনে ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক সভা (Bengal Provincial Conference) সম্বন্ধে মতিলাল মন্তব্য করেন যে ইহা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় নাই, কয়েকজন বক্তা ও সম্পাদকের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ইহাতে ইংরেজী Bengalee ও বাংলা বসুমতী পত্রিকা মতিলালের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছিল। বহুদিন পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ ও মতিলালের ন্যায় দুইজন প্রবীণ সাংবাদিক পরস্পরের প্রতি যে সমুদয় ব্যক্তিগত উক্তি ও নিন্দা করিতেন—তাহা সর্বসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। এক সময়ে এমন সম্ভাবনাও দেখা দিয়াছিল যে এই কলহ আদালত পর্যন্ত গড়াইবে। সৌভাগ্যের বিষয় তাহা হয় নাই। দুইজনের মধ্যে মাঝে মাঝে সদ্‌ভাবের লক্ষণ দেখা গেলেও ইহা স্থায়ী হয় নাই—প্রীতির বন্ধন গড়িয়া ওঠা ত দূরের কথা।

(খ) বাংলা পত্রিকা

আলোচ্য যুগের প্রারম্ভেই, ১৮৫৮ সনের ১৫ই নভেম্বর (১ অগ্রহায়ণ ১২৬৫), বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ইহা প্রথমে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত। তারপর রেল-লাইন দ্বারা কলিকাতার সহিত সম্পাদকের জন্মস্থান চাংড়িপোতার সংযোগ হইলে ঐ গ্রাম হইতেই সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হইত।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই এই পত্রিকার পরিকল্পনা করেন। তাঁহার ন্যায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও খুব স্বাধীনচেতা ও উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা পত্রিকায় রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার প্রবর্তন করেন। এই গ্রন্থে সোমপ্রকাশের নানা সংখ্যা হইতে যে সমুদয় অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতেই বাংলার জাতীয় জাগরণে এই পত্রিকার অবদান সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যাইবে। Hindoo Patriot পত্রিকার ন্যায় সোমপ্রকাশও চাষীদের প্রতি নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

১৮৭৮ সনে দেশীয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইন হয় তদনুসারে লাহোরস্থ সংবাদদাতার এক পত্র প্রকাশ হওয়াতে গভর্নমেণ্ট ঐ পত্রিকার নিকট হাজার টাকা আমানত (ডিপোজিট) ও মুচলেকা চান। তাহা না দেওয়ায় সোমপ্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। পরে কৃষ্ণদাস পাল, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতির চেষ্টায় আমানত ও মুচলেকা বিনাই গভর্নমেণ্ট ঐ পত্রিকা পুনঃ প্রচারের অনুমতি দেন এবং নির্দেশ দেন যে 'সোমপ্রকাশে' যেন কোন অসঙ্গত বিষয় প্রকাশ না হয় এবং সম্পাদক স্বচক্ষে না দেখিয়া যেন কোন বিষয় মুদ্রিত হইতে না দেন। ১৮৮০ সনে সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রকাশিত হয়। শেষ বয়সে দ্বারকানাথ অসুস্থ হওয়ায় পত্রিকা সম্পাদনে পূর্বের ন্যায় সময় দিতে পারিতেন না; ফলে ইহার প্রভাব কমিয়া যায়। ১৮৮৬ সনে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়।

১৮৬১ সনে 'সোমপ্রকাশের' অনুকরণে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'ঢাকাপ্রকাশ' বাহির হয়। পত্রিকার পরিচালকগণের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মধর্মের সমর্থক ছিলেন—সুতরাং পত্রিকাখানিতে ঐ ধর্মের প্রভাব ছিল। চারি বৎসর পর প্রথম দীননাথ সেন (পরবর্তীকালে ইন্‌স্‌পেক্‌টর অব স্কুলস্) ও পরে আরও কয়েকজন ইহার সম্পাদক হন। এই পত্রিকাখানি ৭০ বৎসরেরও অধিক-কাল প্রচলিত ছিল।

১৮৬১ সনে 'পরিদর্শক' নামে একখানি দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়। প্রথমে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন গোস্বামী, এবং ১৮৬২ সনের ১৪ই নভেম্বর হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ এই পত্রিকার সম্পাদক হন এবং ইহার কলেবর বৃদ্ধি করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই ইহার প্রচার বন্ধ হয়।

পরিদর্শকের প্রথম সংখ্যায় প্রস্তাবনায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে সে সময়কার বাংলা সংবাদপত্রের সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যায়। এই নিমিত্ত ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক সংবাদপত্রের তাদৃশ সমাদর করেন না, অনেকে ইহার ফলোপধায়কতার বিষয়ও অবগত নহেন। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে যদিও সংবাদপত্র পাঠে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইংরাজী পত্র পাঠেই তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ঔৎসুক্য নিবৃত্তি হয়। ইংরাজী পত্র না পাইলেও তাঁহাদিগের বাঙ্গলা পত্র পাঠ করিতে ভক্তি জন্মে না। তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গলা সংবাদপত্রের অধিকাংশই অসার ও অকর্ম্মণ্য, কেহ কেহ ইংরাজী পত্র হইতে একমাসের পুরাতন সংবাদ

অনুবাদ করিয়া কাগজ পূর্ণ করিয়া থাকেন, কোন কোন বাঙ্গলা সংবাদপত্র কোন একখানি ইংরাজী পত্রের কিয়দংশের অনুবাদ মাত্র বলিলেও অসঙ্গত হয় না .....

"যে সকল কারণে বাঙ্গালা পত্রে সাধারণের অনাস্থা জন্মিয়াছে, যাহাতে সেই সকল কারণ সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে জ্ঞান পূর্ব্বক সত্য পথ হইতে বিচলিত হইব না, যাহাতে কোন বিষয়ের অতিবর্ণন না হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব, যদিও পৃথিবীর কোন মনুষ্যই পক্ষপাতের হাত এড়াইতে পারেন না তথাপি আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, জ্ঞান পূর্ব্বক কখন পক্ষপাত দোষে লিপ্ত হইব না। যাহাতে দেশের কুসংস্কাররাশি নিরাকৃত হয় তদ্বিষয়ে নিয়ত নিযুক্ত থাকিব, দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, অজ্ঞানান্ধ ভ্রাতৃগণকে জ্ঞাননেত্র প্রদান করা, পরাপকারি ও প্রজাপীড়ক দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ এই সমস্ত কার্য্যই আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য।"[২০]

১৮৬৩ সনে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—

"এই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের আবশ্যক সমুদয় বিষয় লিখিত হইবে। তন্মধ্যে যাহাতে তাহাদের ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হইয়া প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, যাহাতে তাহাদের উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়, এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। ইহাতে যে সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া লেখা হইবে, পত্রিকার শিরোভাগে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।"[২১]

প্রথম সংখ্যার শিরোভাগে নিম্নলিখিত বিষয়-তালিকা ছিল।

লেখ্য বিষয়

১। ভাষাজ্ঞান	৬। বিজ্ঞান	১১। গৃহচিকিৎসা
২। ভূগোল	৭। স্বাস্থ্যরক্ষা	১২। শিশুপালন
৩। খগোল	৮। নীতি ও ধর্ম্ম	১৩। শিল্পকর্ম্ম
৪। ইতিহাস	৯। দেশাচার	১৪। গৃহকার্য্য
৫। জীবন চরিত	১০। পদ্য	১৫। অদ্ভুত বিবরণ[২২]

স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে এই পত্রিকা যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল তাহা ঐ প্রসঙ্গে

উল্লেখ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকদের লেখায় উৎসাহিত করা এবং যোগ্য বোধ করিলে তাহা পত্রিকায় প্রকাশ করা ইহার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল।

বামাবোধিনী পত্রিকা ১৯২৩ সন (১৩২৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র) পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ষাট বৎসর প্রচলিত ছিল।

উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে মফঃস্বলের শহর হইতে কয়েকখানি পত্রিকা বাহির হইত। ইহাদের মধ্যে সাপ্তাহিক 'রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ' (১৮৬০), মাসিক 'ত্রিপুরা জ্ঞানপ্রসারিণী' (১৮৬০), পূর্বোক্ত সাপ্তাহিক 'ঢাকাপ্রকাশ' (১৮৬১), পাক্ষিক 'ফরিদপুর দর্পণ' (১৮৬১), সাপ্তাহিক 'ঢাকাবার্তা প্রকাশিকা' (১৮৬২), সাপ্তাহিক 'ঢাকাদর্পণ' (১৮৬৩), মাসিক 'পাবনাদর্পণ' (১৮৬৪), ঢাকার 'হিন্দু হিতৈষিণী' (১৮৬৫), 'বর্ধমান মাসিক পত্রিকা' (১৮৬৬), পাক্ষিক 'মুর্শিদাবাদ সংবাদসার' (১৮৬৬), খুলনার 'সমাজ দর্পণ' (১৮৭১) ও মৈমনসিংহের 'ভারতমিহির' প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ১৮৬৩ সনে (১২৭০ সাল) প্রকাশিত কুমারখালির প্রসিদ্ধ কাঙ্গাল হরিনাথ সম্পাদিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' একখানি উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্র। গ্রাম ও গ্রামবাসীর দুরবস্থার কথা প্রচার করাই ছিল ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য। ১৯ বৎসর কাল এই পত্রিকা মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি নানা আকারে প্রচলিত ছিল। পরে ১২৮৯ সালের বৈশাখ মাসে জলধর সেন ও অক্ষয়কুমার মৈত্রের পরিচালনায় সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্তা' পুনঃ প্রকাশিত হইল। ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৬৫ সনে ঢাকা হিন্দুধর্মরক্ষিনী সভার মুখপত্র 'হিন্দু হিতৈষিণী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মিত্র। ইহা ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিত।

রাজসাহী জিলার বোয়ালিয়া হইতে ১৮৬৬ সনে শ্রীনাথ সিংহ রায়ের সম্পাদনায় 'হিন্দুরঞ্জিকা' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিবাদ ও হিন্দুধর্মের প্রচার করাই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। দুই বৎসর পরে ইহা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ইহা ৬৫ বৎসর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

১৮৬৭ সনে ঢাকা হইতে 'পল্লী-বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। গ্রামে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৮৬৯ সনে স্ত্রীলোকের উন্নতিসাধনের জন্য ঢাকা হইতে দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর সম্পাদনায় 'অবলাবান্ধব' নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরে ইহা কলিকাতা হইতে প্রচারিত হয় এবং মাসিকে পরিণত হয়।

১৮৭০ সনে ঢাকা হইতে বঙ্গচন্দ্র রায় 'বঙ্গবন্ধু' নামে পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ইহা ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র ছিল এবং ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিত। ইহা ১৯০৭ সনে বন্ধ হয়।

১৮৭৭ সনে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন 'ধর্মপ্রচারক' নামে সনাতনপন্থী হিন্দুদের মুখপত্র প্রথমে মুঙ্গের ও পরে কাশী হইতে প্রকাশিত করেন। ইহা ২৫ বৎসর প্রচলিত ছিল।

বাঁকুড়া হইতে ১৮৯২ সনে পাক্ষিক 'বাঁকুড়া দর্পণ' প্রকাশিত হয়। দুই বৎসর পরে ইহা সাপ্তাহিক হয় এবং মফঃস্বলের পত্রিকাগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। রামনাথ মুখার্জী ১৮৯২ হইতে ১৯০৭ সন পর্যন্ত ইহার সম্পাদনা করেন।

১৮৯৭ সনে রাজসাহী জিলার বোয়ালিয়া হইতে 'উৎসাহ' নামক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সাহা। রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় কুমার মৈত্র, জলধর সেন প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা লেখকের রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইত।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' সংপ্রতি ইহার শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছে। যশোহর জিলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম 'চরমাগুরা' হইতে শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার এক ভ্রাতা হেমন্তকুমারের সহযোগে ১৮৬৮ সনের ২০ ফেব্রুআরি এই বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। ছোট একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কিনিয়া নিজেদের গ্রামে তাহা প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেরাই, প্রেসের কম্পোজিটর ও মুদ্রাকর এবং পত্রিকার সম্পাদক এই সমুদয়ের কার্য নির্বাহ করিতেন। ইহার প্রথম সংখ্যায় লিখিত হইয়াছিল: "যে স্থান হইতে এই পত্রিকা বাহির হইতেছে তাহার পশ্চিমে ও উত্তরে ৩ দিনের পথ, পূর্বে দেড় বৎসরের ও দক্ষিণে ৩ বৎসরের পথ পর্যন্ত একটিও মুদ্রাযন্ত্র নাই, সুতরাং সম্বাদপত্র থাকাও অসম্ভব।" এই অসমসাহসিক কার্যে ব্রতী হইয়া ঘোষ ভ্রাতারা এই পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণের যে কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহার তুলনা বিরল। সে যুগে নির্ভীকভাবে গভর্নমেণ্টের দোষ ত্রুটির আলোচনা এবং জনসাধারণের অভাব অভিযোগ ও দুর্দশার কথা প্রচার করিয়া এই পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ অনন্যসাধারণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই পত্রিকাকে 'স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারক ও বাহক' করাই ছিল শিশিরকুমারের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এবিষয়ে যে তিনি বহু পরিমাণে সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পত্রিকার শিরোভূষণ (motto) স্বরূপ নিম্নলিখিত দুইটি লাইন মুদ্রিত হইত:

"অধীনতা কালকূটে মরি হায় হায়।
করেছে কি আর্যসুতে চেনা নাহি যায়॥"

"অমৃতবাজার পত্রিকাই সর্বপ্রথম অতি জোরের সহিত পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করিলেন—শাসক ইংরেজ ও শাসিত ভারতবর্ষের স্বার্থ কখনও এক হইতে পারে না, প্রত্যুত উহা পরস্পরের পরিপন্থী। সুতরাং ভারতবাসীকে ইংরেজের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে, এবং তখনই শাসকের দৃষ্টিতেও তাহার মর্যাদা বাড়িবে।"[২৩]

১৮৬৮ সনের ৭ মে সংখ্যায় মন্তব্য করা হইয়াছে: "জাতি-ঐক্যতার সংস্থাপন করিতে গেলে একটি এমন উদ্দেশ্য আবশ্যক করে যেথানে সকলের স্বার্থ সমানরূপে সম্মিলিত হয়। ..সেটি ভারত ভূমিকে দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে উন্মোচন করা।"[২৪] নবগোপাল মিত্রের প্রচারিত জাতীয়তা অপেক্ষা এই জাতীয়তার আদর্শ উচ্চতর।

ইহার তিন সপ্তাহ পরে "ভারতবর্ষীয়েরা ক্রমে স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত হইবে" এইরূপ উক্তির উত্তরে সম্পাদক লিখিয়াছেন, "ইহা কি কখনও হইয়া থাকে? স্বাধীনতা শিখিবার পুস্তক ইতিহাসও নয়, রাজনৈতিক বিজ্ঞানও নয়। স্বাধীনতা শিখিবার পুস্তক স্বাধীনতা।"[২৫] এই সমুদয় ও ইহার অনুরূপ উক্তি ৪০ বৎসর পরে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের মূলমন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হইত।

মফঃস্বলে নীলকর ও অন্যান্য সাহেবদের অত্যাচারের কথা অমৃতবাজার পত্রিকায় নির্ভীকভাবে প্রকাশ করা হইত—তাহার জন্য সম্পাদক আদালতে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ সে যুগের ইংরেজী বা বাংলা কোন পত্রিকায়ই অমৃতবাজারের ন্যায় স্বাধীনচিত্ততা এবং সরকারী কার্যাকার্যের কঠোর সমালোচনা দেখা যায় না।

পত্রিকার দ্বিতীয় বৎসরে (২৫ ফেব্রুআরি ১৮৬৯) বাংলার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ইংরেজী অংশও থাকিত। ১৮৭২ সন হইতে প্রতি সপ্তাহেই ইংরেজী অংশ বেশী পরিমাণে ও রীতিমত বাহির হইত। সুতরাং বাংলার বাহিরেও ইহা লোকে পাঠ করিয়া স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা পাইত। ১৯১৭ সনে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক লিখিয়াছেন: "৪০ বৎসর পূর্বে অমৃতবাজার পত্রিকার জন্য প্রতি সপ্তাহে মহারাষ্ট্রের লোকেরা উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। ইহার বিদ্রূপ ও শ্লেষাত্মক রচনা এবং কঠোর সমালোচনা সকলেই খুব উপভোগ করিত। মহারাষ্ট্রের লোকেরা বলাবলি করিত যে শিশিরবাবু এক পা জেলের দিকে বাড়াইয়াই

লিখিতে বসিতেন, আর তাঁহার ভাই মতিবাবু অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন কখন তিনি জেলে যাইবেন।"[২৬] বাংলার বাহিরে এমন কি সুদূর মহারাষ্ট্রেও অমৃত-বাজার পত্রিকা কিরূপ জনপ্রিয় ছিল—ইহা হইতে তাহা জানা যাইবে। অনেকে মনে করেন প্রধানতঃ অমৃতবাজার পত্রিকার মুখ বন্ধ করার জন্যই ১৮৭৮ সনের দেশীয় সম্বাদ-পত্র আইন বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু ইহার কবল হইতে এড়াইবার জন্য ১৮৭৮ সনে ২১শে মার্চ রাতারাতি অমৃতবাজার ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ সনের ১৯ ফেব্রুআরি ইহা দৈনিক কাগজে পরিণত হয়। ১৮৬০ সনে মাসিক 'বিজ্ঞান কৌমুদী' ও ১৮৬৩ সনে সাপ্তাহিক 'আয়ুর্বেদ পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ১৮৬৩ সনে 'অবোধ বন্ধু' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ও আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের বহু রচনা ইহাতে প্রকাশিত হয়। ১৮৭০ সনে কেশবচন্দ্র সেন 'সুলভ সমাচার' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ইহার মূল্য ছিল এক পয়সা মাত্র—এবং ইহার গ্রাহক সংখ্যা ছিল তিন হইতে চারি হাজার। সেকালে ইহার অপেক্ষা বেশী গ্রাহক কোন কাগজেরই ছিল না এবং এরূপ সস্তা সংবাদপত্রেরও ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। জনশিক্ষায় এই পত্রিকা বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। বাংলা ১৩১৮ সালে ইহা দৈনিক হয় এবং পর বৎসরই ইহা বন্ধ হয়।

১৮৭১ সনে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় "মদ না গরল" নামে মাসিক ও ১৮৭৩ সনে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় চুঁচুড়া হইতে সাপ্তাহিক 'সাধারণী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'সাধারণী' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার জীবনচরিতে ইহাকে 'শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মুখপত্র' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৭৩ সনে প্রকাশিত 'সহচর' নামে আর একখানি পত্রিকাও এককালে একখানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা বলিয়া গণ্য হইত।

১৮৭৯ সনে 'নববিভাকর' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ও কয়েক বৎসর পরে ইহা 'সাধারণী'র সহিত যুক্ত হইয়া 'নববিভাকর-সাধারণী' নামে পরিচিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'নবজীবন' নামে একখানি মাসিক পত্রও সম্পাদনা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণ অক্ষয়চন্দ্রের পত্রিকায় লিখিতেন। কিন্তু ১৮৯০ সনে 'নববিভাকর-সাধারণী' বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৮১ সনে 'বঙ্গবাসী' ও ১৮৮৩ সনে 'সঞ্জীবনী' এই দুইটি সাপ্তাহিক পত্রিকা

প্রকাশিত হয় এবং উভয়েই বহুদিন স্থায়ী হইয়াছিল ও খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। তিনি নামতঃ সম্পাদক হইলেও ১৮৮৩ হইতে ১৮৯৫ সন পর্যন্ত কার্যতঃ কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জীই ইহার সম্পাদনা করিতেন। ১৮৯১ সনে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' প্রকাশিত হয়। এই তিনটি সাপ্তাহিকই বাংলার জনসাধারণের বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ ও জাতীয়তা বিকাশের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ১৮৯৬ সনে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তফী। আলোচ্য যুগের পরে ইহা দৈনিকে পরিণত হয় (১৯১৪) এবং পরে ইহার মাসিক সংস্করণও প্রকাশিত হয় (১৯২২)। বিংশ শতকে উল্লিখিত তিনখানি পত্রিকার ন্যায় দৈনিক ও মাসিক বসুমতী বিশেষ জনপ্রিয় হয়। বঙ্গবাসীর মূল্য ছিল এক পয়সা এবং ইহার বহুল প্রচার ছিল। বঙ্গবাসী কাগজটি আমাদের বাল্যকালে মফঃস্বলে এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে গ্রামের লোকেরা সকল বাংলা সংবাদপত্রকেই 'বঙ্গবাসী' বলিয়া অভিহিত করিত। ইংরেজী শিক্ষার ফলে হিন্দুদের যে এক সম্প্রদায় নিজেদের সংস্কৃতি তুচ্ছ করিয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণে ব্যগ্র ছিল বঙ্গবাসী তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও তীব্র কটাক্ষে তাহাদের জর্জরিত করিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চেতনা উদ্বোধনের জন্য আবেগপূর্ণ ভাষায় আবেদন করিত এবং গভর্নমেণ্টের অনেক কার্যের কঠোর সমালোচনা করিত। ইহার ফলে ১৮৯১ সনে প্রকাশিত কয়েকটি মন্তব্যের জন্য বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক, পরিচালক ও মুদ্রাকর ফৌজদারী আইনের ১২৪-এ ও ৫০০ ধারা অনুযায়ী বিদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হন। এদেশের সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে এরূপ সরকারী মামলা এই প্রথম। এই বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে। মোটের উপর রাজনীতিক এবং সামাজিক বিষয়ে প্রাচীনপন্থী হইলেও বঙ্গবাসী বাঙ্গালীর উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করে। ইহার গ্রাহক সংখ্যা ছিল বিশ হইতে ত্রিশ হাজারের মধ্যে। ইহার একটি হিন্দী সংস্করণও ছিল।

'সঞ্জীবনী' ছিল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র এবং ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে বঙ্গবাসীর প্রতিদ্বন্দ্বী। ইহার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। হিতবাদীর প্রথম সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ইহার এক অংশ (magazine) সম্পাদনা করিতেন এবং তাঁহার কয়েকটি ছোট গল্প ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯৪ সনে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ইহার সম্পাদক হন—এবং ক্রমে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা সাপ্তাহিক বলিয়া পরিগণিত হয়।

কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের মৃত্যুর পর (১৯০৭) সখারাম গণেশ দেউস্কর ও জলধর সেন ইহার সম্পাদক হন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই তিনখানি পত্রিকা জনমত গঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

পূর্বে 'বামাবোধিনী' পত্রিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও সাধারণ উন্নতির জন্য আরও কয়েকখানি পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত 'পরিচারিকা' নামে মাসিক পত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ইহা ২৮ বৎসর চলিয়াছিল।

ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী একজন সুলেখক ছিলেন। তিনি সুপাঠ্য সামাজিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' ও শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র 'মুকুল' (১৮৯৫) সম্পাদনা করিতেন। 'মুকুল' এককালে খুব জনপ্রিয় ছিল।

জাতীয়তা ভাবের উদ্বোধক ও প্রচারক হিসাবে আলোচ্য যুগের শেষভাগে প্রকাশিত কয়েকখানি পত্রিকা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক Dawn (১৮৯৭) ও বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত সাপ্তাহিক New India (১৯০২)—এই দুইখানি ইংরেজী এবং ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত দৈনিক এক পয়সা মূল্যের 'সন্ধ্যা' (১৯০৪) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুইখানি শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের উপর এবং চলতি ভাষায় লিখিত ও গাল গল্প শ্লেষ সমন্বিত 'সন্ধ্যা' সর্বসাধারণের—বিশেষতঃ অর্ধ শিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ধর্ম সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পত্রিকা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৯৯ সনে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধন' এই শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। ইহা প্রথমে পাক্ষিক ছিল, দশ বৎসর পরে মাসিকে পরিণত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির অনেক রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মাসিক পত্রিকা-খানি এখনও সগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত। পূর্বের ন্যায় ধর্ম, দর্শন, প্রভৃতি বিষয়ে এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহাদের শিষ্য ও অনুবর্তীদের মতবাদ, কাহিনী ও উক্তি অবলম্বনে বহু মূল্যবান রচনা ও জগদ্ব্যাপী রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের বিবরণ ইহাতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের নানাবিধ বিভাগের আলোচনা ও উন্নতির জন্য ১৮৯৩ সনে

"The Bengal Academy of Literature" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহার মুখপত্র ছিল মাসিক "The Bengal Academy of Literature"। ১৮৯৪ সনে এই দুই নাম 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' ও 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' এইরূপ পরিবর্তিত হইল। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা এখনও প্রচলিত আছে এবং বাংলা সাহিত্যের অশেষবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছে।

আলোচ্য যুগে একখানি মাত্র ঐতিহাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল—ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র'। ইহাতে অনেক সারবান ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। কিন্তু ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

উনিশ শতকের শেষভাগে সাপ্তাহিক পত্রিকাই জনপ্রিয় ছিল। কারণ লোকে টাটকা সংবাদ অপেক্ষা মন্তব্য ও আলোচনাই বেশী পছন্দ করিত। তবে দৈনিক পত্রিকাও ছিল। ১৮৯০ সনে ইহার সংখ্যা ছিল পাঁচ। ইহাদের মধ্যে 'দৈনিক' নামক পত্রিকাই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল।

এই সময়ে পাঁচখানি পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন মুসলমান। ইহার মধ্যে ১৮৯০ সনে সাপ্তাহিক 'সুধাকরে'র গ্রাহক সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। ইহার সম্পাদক ছিলেন রেয়াজউদ্দিন আহমদ। বঙ্গবাসীর হিন্দু গোঁড়ামির ন্যায় মুসলমান গোঁড়ামিই ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল। সুতরাং ইহাতে হিন্দুর প্রতি বিরোধী মনোভাব প্রায়ই দেখা যাইত।

১৮৮৬ সনে ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল হইতে 'আহমদি' নামক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক ছিলেন মৌলবি আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজাৎ। এই পত্রিকার কোন সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ছিল না এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য।

অপর তিনখানি মুসলমান পত্রিকার নাম গওহর, দার-উস্-সলতনৎ ও Urdu Guide।

বাংলা ভাষায় পত্রিকার সংখ্যা মোটের উপর ক্রমশই বাড়িতেছিল। ১৮৮০ হইতে ১৮৯২—এই ১৩ বৎসরে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৭, ৩৮, ৫৬, ৬৩, ৬৪, ৬৩, ৬২, ৬৩, ৬৭, ৭১, ৬২, ৭১, ৭৪। ১৮৮০ সনে সমুদয় দেশীয় সংবাদ-পত্রের গ্রাহক সংখ্যা সমগ্র ইংরেজ শাসিত ভারতে ছিল ৬৫,১৭৯। ১৮৯০ সনে কেবল বাংলা দেশে এই সংখ্যা ৬৬,০০০ ছাড়াইয়া গিয়াছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে সাধারণতঃ, বিশেষতঃ মফঃস্বলে, প্রতি সংবাদপত্র বহু শ্রোতার সম্মুখে

পড়া হইত। অনেক সময় গ্রামে একখানি মাত্র কাগজ যাইত এবং সারা গ্রামের লোক তাহা পড়িত ও শুনিত। জনমতের উপর যে ইহার খুব বেশী প্রভাব ছিল—অনেক ইংরেজ কর্মচারীরাও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

প্রধানতঃ সুকুমার সাহিত্যের আলোচনা ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাংলায় কয়েকখানি মাসিকপত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) কেবল সর্বপ্রথম নহে, সর্বশ্রেষ্ঠ ও এই জাতীয় পত্রিকার পথপ্রদর্শক ও আদর্শ বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত কয়েকখানি উপন্যাস, জাতীয়তার উদ্দীপক প্রবন্ধগুলি, বিবিধ জ্ঞানভাণ্ডার হইতে আহৃত রচনাবলী ও অমর রম্যরচনা 'কমলাকান্তের দপ্তর' ইহাতেই প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনেই সর্বপ্রথম গ্রন্থসমালোচনার সম্পূর্ণ অভিনব এক উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেন। সে যুগের বহু জ্ঞানী ও চিন্তাশীল লেখকের উৎকৃষ্ট রচনা বঙ্গদর্শনকে অলঙ্কৃত করিত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। 'প্রচার' নামে প্রধানতঃ ধর্মসম্বন্ধীয় আধুনিক যুগের উপযোগী একখানি মাসিক পত্রও বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় চারি বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল।

জোড়াসাঁকোর 'ঠাকুর-বাড়ী' হইতে 'ভারতী' ও 'সাধনা' এই দুইখানি প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। ১৮৭৭ সনে প্রথম প্রকাশিত ভারতীর সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে ইহার সম্পাদিকা হন তাঁহার ভগ্নী স্বর্ণকুমারী ও স্বর্ণকুমারীর দুই কন্যা সরলা ও হিরণ্ময়ী দেবী। রবীন্দ্রনাথও কিছুদিন ইহার সম্পাদক ছিলেন।

১৮৯১ সনে প্রকাশিত 'সাধনা'র সম্পাদক ছিলেন প্রথমে সুধীন্দ্রনাথ ও পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নব পর্যায়ের 'বঙ্গদর্শন' ও খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল ইহার সম্পাদক ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'আর্যদর্শন', কালী-প্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'বান্ধব' (১৮৭৪), দেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী সম্পাদিত 'নব্যভারত' (১৮৮৩), সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' (১৮৯০), ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মুকুল' (১৮৯৭) বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। 'নব্যভারত' ৪০ বৎসরেরও অধিককাল প্রচলিত ছিল। 'সাহিত্য' বহুকাল উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকারূপে প্রসিদ্ধ ছিল। কঠোর সমালোচনা ইহার একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়া

পরিগণিত হইত। অনেক খ্যাতনামা লেখকের বিরুদ্ধ সমালোচনা ইহাতে স্থান পাইত।

এই সমুদয় মাসিক পত্রে বহু খ্যাতনামা লেখকের উপন্যাস ও ছোট গল্প এবং সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি সম্বন্ধে সুচিন্তিত ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই সকল মাসিক পত্র একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত বাংলার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুলি উনিশ শতকে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক নবজাগরণ (Renaissance), বিশেষতঃ সামাজিক সংস্কার ও রাজনীতিক চেতনার উদ্বোধনে, এবং বিশ্বের নবযুগের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপনে যে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিধবা-বিবাহ প্রচলন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, বহুবিবাহ নিবারণ, ধর্মের নামে প্রচলিত বহু সামাজিক কুসংস্কার উচ্ছেদ, এবং সাময়িক বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে জনমত গঠনে বাংলা সংবাদপত্রের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সংবাদপত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে সাহেবদের আন্দোলন, সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মামলা ও তাঁহার কারাদণ্ড (১৮৮৩), ভারতের জাতীয় কনফারেন্‌স্‌ ও কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫), সহবাস-সম্মতি আইন (১৮৯১), ১৮৯২ সনের 'Indian Councils Act', ১৮৯৬ সনে প্লেগ মহামারী, ১৮৯৭ সনে তিলকের কারাদণ্ড, ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উপলক্ষে বাংলার সংবাদপত্রে সুচিন্তিত ও সুদীর্ঘ সমালোচনা হইয়াছিল। বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালী পরিচালিত ইংরেজী পত্রিকা জাতীয় ভাবের প্রসারে খুব সাহায্য করিয়াছে : অধিকাংশ ইংরেজ সম্পাদিত পত্রিকা ছিল ইহার বিরোধী। সহবাস সম্মতি আইনের আন্দোলনে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'বঙ্গবাসী' ছিল ইহার ঘোরতর বিরোধী এবং 'Indian Mirror' ও 'সঞ্জীবনী' ছিল ইহার প্রবল সমর্থক।

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজন্যবর্গের পক্ষ সমর্থনের জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভূপাল রাজ্যের বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করায় গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট Sir Lepel Griffin এই পত্রিকার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করার প্রস্তাব করেন—কিন্তু লর্ড ডাফরিণ ইহার অনুমোদন করেন নাই। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

৪। সংবাদপত্র বিষয়ক আইন (১৮৫৮—১৯০৫)

১৮৫৮ সনের পরে দেশে যে নূতন জাতীয়তাভাবের স্রোত বহিতে থাকে সংবাদপত্রে তাহা প্রতিফলিত হয় এবং তাহার অনুপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রগুলি এই ভাবধারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের প্রধান বাহক ও ধারক হইয়া ওঠে। সুতরাং ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ভীত হইয়া ইহার দমনে কৃতসংকল্প হন। ১৮৭০ সনে বিদ্রোহমূলক লেখা বন্ধ করিবার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে নূতন এক ধারা (Section 124A) যোগ করা হয়। কিন্তু বাংলার ছোটলাট সার জর্জ ক্যাম্বেল ইহা পর্যাপ্ত মনে না করিয়া ১৮৭৩ সনে 'হালিসহর পত্রিকা'য় প্রকাশিত কয়েকটি মন্তব্যের প্রতি বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলা পত্রিকায় ক্যাম্বেলের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করা হইত। তাঁহার শিক্ষা নীতির নিন্দা করিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা তাঁহাকে সংহারের দেবতা 'মহেশ্বর' এবং শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরকে 'বুড়া বৃষ' বলিয়া উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে এই বুড়া বৃষের উপর চড়িয়া শিব বাংলাদেশের শিক্ষা ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ক্যাম্বেলের বিশ্বাস ছিল যে বিদ্রোহমূলক লেখার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ মামলা করিলে ইহার প্রচার বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সংক্ষেপে সরাসরি বিচার করিয়া লেখকদের শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। নর্থব্রুক এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ১৮৭৫ সনে বরোদার মহারাজা যখন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট (Resident) কর্ণেল ফেয়ারকে (Phayre) বিষ প্রয়োগে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত হন—তখন অমৃতবাজার পত্রিকায় ইহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য-সহ দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহার একটির শেষাংশ এইরূপ: "ইংরেজ রাজ নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিবার জন্য একটি সমগ্র জাতিকে পৌরুষত্বহীন করিয়া রাখিয়াছে (emasculate)। একজন কর্নেলকে বিষ দান করা ইহার অপেক্ষা অনেক লঘুতর অপরাধ।"

বিলাতী সংবাদপত্রে (Pall Mall Gazette) এই দুইটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত হয় এবং সেক্রেটারি অব ষ্টেট ও ভারতের বড়লাট উভয়েই সংবাদপত্রের এইরূপ উক্তি কিরূপে বন্ধ করা যায় তাহার আলোচনা করেন। কিন্তু বড়লাট নর্থব্রুক (১৮৭২-৭৬) কোন নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করার পূর্বেই পদত্যাগ করেন। তবে তাঁহার আমলে (১৮৭৫) এই মর্মে একটি সরকারী ইস্তাহার জারী হয় যে সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোন সরকারী কর্মচারী কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক বা স্বত্বাধিকারী হইতে পারিবে না; তাহারা সংবাদপত্রে লিখিতে পারিবে কিন্তু তাহাদের

মতামত যেন যুক্তিসঙ্গত আলোচনার সীমা অতিক্রম না করে; এবং পদানুরোধে বা সরকারী কার্যব্যপদেশে যে সব কাগজ বা দলিলপত্র তাহাদের হাতে পড়ে সরকারের অনুমতি ব্যতীত তাহারা তাহা প্রকাশ করিতে পারিবে না। পরবর্তী বড়লাট লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০) কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করেন। বাংলার ছোটলাট অ্যাস্‌লি ইডেন প্রকাশ্য এক বক্তৃতায় বাংলা সংবাদপত্রে বিদ্রোহ-সূচক লেখার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং ভারত সরকারকে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার উক্তির সমর্থনে ১৮৭৬-৭৭ সনে অমৃতবাজার পত্রিকা, ভারত মিহির, সাধারণী, সমাজদর্পণ, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকাতে প্রকাশিত প্রবন্ধের আপত্তিজনক অংশগুলি অনুবাদ করিয়া পাঠান লর্ড লিটন বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে লিখিলেন এবং মাদ্রাজ ব্যতীত অন্যান্য সকল গভর্নমেণ্টই ইডেনের সঙ্গে একমত হইলে নূতন এক আইন প্রস্তাব করিলেন। ইহাই ১৮৭৮ সনের কুখ্যাত Vernacular Press Act। ১৪ই মার্চ কাউন্সিলের এক অধিবেশনেই ইহা পাশ হইল। ইহাতে কোন মামলা মোকর্দমা না করিয়া গভর্নমেণ্ট বিদ্রোহাত্মক লেখার জন্য দেশীয় ভাষায় লিখিত পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক প্রভৃতিকে শাস্তি দিবার সরাসরি ক্ষমতা পাইলেন। ক্যাম্বেলের প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইল।

বাংলা পত্রিকায়—বিশেষতঃ 'অমৃতবাজারে'—যে সমুদয় জাতীয় উদ্দীপনামূলক মন্তব্য প্রকাশিত হইত তাহাতে ভয় পাইয়াই যে গভর্নমেণ্ট এই আইন করিতে তৎপর হইয়াছিলেন তাহাতে বিশেষ কোন সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে মতিলাল ঘোষ লিখিয়াছেন: "এই সময় শিশিরকুমার খুবই গরীব ছিলেন, কলিকাতাতেও তাঁহার বিশেষ কোন প্রতিপত্তি ছিল না। তাঁহাকে হাতে রাখিবার জন্য ছোটলাট নিজে তাঁহাকে ডাকিয়া নিয়া অর্থের লোভ দেখাইলেন। বহু লোক এই লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না। কিন্তু শিশিরকুমার ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি ধীরভাবে বলিলেন—'দেশে অন্ততঃ একজন সৎ সাংবাদিক থাকা উচিত।' ছোটলাট অ্যাসলি ইডেন ইহাতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন: 'আপনি বোধহয় ভুলিয়া গিয়াছেন কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। আমি যে কোন দিন ইচ্ছা বিদ্রোহাত্মক লেখার জন্য আপনাকে জেলে পাঠাইতে পারি এবং ছয় মাসের মধ্যেই আপনাকে জিনিষপত্রসহ যশোহরে ফেরৎ পাঠাইয়া দিব।' শিশিরকুমারের দাম্ভিক উক্তির প্রতিশোধ লইবার জন্যই ইডেন বড়লাটকে অনুরোধ করায় একদিনেই 'ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন' পাশ হইল (১৮৭৮)।"[২৭]

কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই নূতন আইন করা হইয়াছিল তাহা সিদ্ধ হয় নাই। বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা এবং অন্যান্য ইংরেজও স্বীকার করিয়াছেন যে বাংলা পত্রিকার সুর কিছু নরম হইলেও গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব বিশেষ হ্রাস পায় নাই। খোলাখুলি বিদ্রোহ প্রচার বন্ধ হইয়াছে—কিন্তু রাজভক্তি কিছুমাত্র বাড়ে নাই। বাংলা পত্রিকার মনোভাব পূর্ববৎই আছে।

যে সমুদয় বিদ্রোহাত্মক রচনার ভিত্তিতে এই নূতন আইনের ব্যবস্থা হইল এবং যাহার নমুনা সকল প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টকে পাঠান হইয়াছিল তাহার সব-গুলিই বাংলা পত্রিকা হইতে গৃহীত। এই সময় বাংলা সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল ৩৫, ইহার মধ্যে ১৫টি হইতে ৩৬টি দৃষ্টান্ত নির্বাচিত করা হয়। এই আইনের বলে বাংলার ছোটলাট 'ভারত মিহির', 'ঢাকা প্রকাশ', 'ঢাকা হিতৈষিণী', 'সুলভ সমাচার' এবং 'সহচর' পত্রিকার উপর মুচলিকা (Bond) দিবার আদেশ জারী করেন—কিন্তু ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে ইহা প্রত্যাহার করেন। কেবলমাত্র 'সোমপ্রকাশে'র নিকট এইরূপ দাবি ভারত সরকার সমর্থন করেন। ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে কলিকাতায় এবং সমগ্র ভারতে কিরূপ তীব্র আন্দোলন হইয়াছিল—এবং ইহা যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিল তাহা অন্যত্র বিবৃত করা হইয়াছে। এই সময় বিলাতে মন্ত্রীসভার পরিবর্তনের ফলে লর্ড লিটনের স্থানে লর্ড রিপণ বড়লাট হইয়া আসেন এবং ১৮৮২ সনে এই আইন রদ করা হয়।

১৮৮৯ সনে কাশ্মীরের রাজাকে পদচ্যুত করার প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকা ভারত সরকারের একটি গোপনীয় রিপোর্ট (Foreign Office Document) প্রকাশ করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে যে ঐ রাজার বিরুদ্ধে প্রজার প্রতি অত্যাচার প্রভৃতি তাঁহার পদচ্যুতির অজুহাত মাত্র, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পার্বত্য গিলগিট অঞ্চলে ইংরেজের প্রভুত্ব স্থাপন করার উদ্দেশ্যই ইহার প্রকৃত কারণ। বড়লাট ইহার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিলেও পত্রিকার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনিলেন না—কিন্তু ১৮৮৯ সনে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করিলেন (Official Secrets Act)। ইহাতে কোন গোপনীয় সরকারী তথ্য বা দলিল প্রকাশ করা দণ্ডনীয় বলিয়া ঘোষিত হইল। বাংলার ছোটলাট স্যর চার্লস এলিয়ট (১৮৯০-৯৫) এই আইনের বলে তাঁহার দপ্তরের সমস্ত নথিপত্র ক্রিয়াকলাপই গোপনীয় তথ্য বা দলিল বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং তদনুযায়ী 'Reis and

Rayyet' ও 'Indian Mirror' পত্রিকার দুই সম্পাদককে এই আইনভঙ্গের জন্য সাবধান করিয়া দিলেন।

অন্যান্য আইনের সাহায্যেও সংবাদপত্রের শাস্তি বিধান করা হইল। চন্দননগর হইতে প্রকাশিত 'প্রজাবন্ধু' নামে বাংলা পত্রিকায় ১৮৮৯ সনে অশ্লীল ও বিদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ রচনার জন্য ১৮৭৮ সনের Sea Customs Act-এর ১৯ ধারা এবং ১৮৬৬ সনের Indian Post Office Act-এর ৬০-এ ধারা অনুসারে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে এই পত্রিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইল এবং ইহার স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক শিক্ষা বিভাগের জনৈক কেরানীবাবু তিনকড়ি ব্যানার্জীকে বরখাস্ত করা হইল।

অতঃপর সাধারণ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারেই সংবাদপত্রের বিদ্রোহাত্মক উক্তির বিচার করা হয়। ইহার প্রথম দৃষ্টান্ত স্বরূপ বঙ্গবাসী পত্রিকার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৮৯১ সনে বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২৪-এ এবং ৫০০ ধারা অনুসারে অভিযোগ আনা হয়। ২০শে মার্চ, ১৬ই মে এবং ৬ই জুন তারিখে প্রকাশিত যে তিনটি আপত্তিজনক প্রবন্ধের জন্য এই অভিযোগ করা হয় তাহার কয়েকটি অংশের সারমর্ম এই:

"আমরা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের অধীন। ইংরেজ রাজ ইচ্ছা করিলে আমাদের সম্পত্তি কাড়িয়া নিতে পারে, আমাদের পরিবারবর্গকে নানারূপ কষ্ট ও লাঞ্ছনা করিতে পারে, এবং আমাদের ধর্ম ও সামাজিক আচার ব্যবহার পালন করিতে বাধা দিতে পারে। ইংরেজ বড়লাট ল্যান্সডাউন সাহেব বাহাদুর বিধান সভায় জোর গলায়, স্পষ্ট ভাষায় এবং বুক টান করিয়া ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে ইংরেজ যাহা ভাল মনে করে হিন্দুদের তাহাই করিতে হইবে, এবং ইংরেজ যাহা মন্দ মনে করে তাহা বর্জন করিতে হইবে। ইহার জন্য যদি তোমার ধর্ম নষ্ট হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। যদি তাই হয় তবে হে প্রভু একেবারে সরাসরি আমাদের ধর্ম, সমাজ সকলই নষ্ট করিয়া ফেল। যদি হিন্দুদের ধ্বংস করাই তোমার সংকল্প তবে বল আমরা তোমার পায়ে আজীবনের জন্য দাসখত লিখিয়া দেই।"[২৮]

'সহবাস সম্মতি আইনে'র বিরুদ্ধে আন্দোলনের সমর্থনেই এই সকল প্রবন্ধ লিখিত হয়। এই আইন প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছে: "এই আইন পাশ করায় ইংরেজ সাধুতার মুখোস খুলিয়া ভয়ঙ্কর মূর্তিতে প্রকট হইয়াছে। সীতা যেমন সাধুবেশী রাবণের স্বরূপ দেখিয়া ভীত হইয়াছিল আজ আমাদের অবস্থাও

সেইরূপ—হে মধুসূদন—এই কি আমাদের ইংরেজ রাজ ! ইংরেজের কামান হিন্দুদিগের বহু অনিষ্ট করিতে পারে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মকে ধ্বংস করিতে পারিবে না।"[২৯]

'বঙ্গবাসী'র বিরুদ্ধে মোকদ্দমার ফলে সমগ্র দেশে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার আইনের কূটতর্ক করেন। বিচারের ফলে জুরীদের অধিকাংশের মতে অভিযুক্ত স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক, পরিচালক, মুদ্রাকর সকলেই দোষী সাব্যস্ত হন। কিন্তু জুরীগণ একমত না হওয়ায় চীফ জাষ্টিস্ আপাততঃ চূড়ান্ত আদেশ স্থগিত রাখেন। ইতিমধ্যে নেটিভ্ প্রেস অ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি 'বঙ্গবাসী'র সপক্ষে ছোটলাটের নিকট আবেদন করে—এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিগণও পুনরায় এইরূপ রাজদ্রোহাত্মক কিছু লিখিবেন না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় সরকার এই মামলা তুলিয়া লন।[৩০]

'বঙ্গবাসী'র বিরুদ্ধে সরকারী মোকদ্দমার ফলেই দেশীয় সংবাদপত্রের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সর্ববিধ ন্যায়সঙ্গত উপায়ে ইহার উন্নতি সাধন, এবং যাহাতে ইহা লোকমতের ধারক ও বাহকরূপে সর্বরকম অতিভাষণ পরিহার করিয়া গভর্নমেণ্ট ও জনসাধারণের মতামত উভয়ের নিকট সুষ্ঠুভাবে উপস্থিত করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে নেটিভ্ প্রেস অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী রাজকুমার সর্বাধিকারী নেটিভ প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি হন। 'Indian Mirror', 'Indian Nation' এবং 'Reis and Rayyet'—এই তিনটি পত্রিকা ছাড়া বাংলাদেশের আর সকল ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ইহাতে যোগদান করেন।

পাদটীকা

১। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাংলা সাময়িক পত্র' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য (অতঃপর এই গ্রন্থ 'সাময়িক পত্র' বলিয়া উল্লিখিত হইবে)।

২। *Calcutta Review* (December, 1969, pp. 213-16) পত্রিকায় এই প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমার এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পরে দেখিলাম যে ১৩৪৭ সালের প্রবাসী পত্রিকায় (ফাল্গুন সংখ্যা, পৃঃ ৬৫৪) এই প্রসঙ্গটি আলোচিত হইয়াছে।

৩। সতীদাহ প্রথার নিবারণের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে আপীল করা ও সাধারণ ভাবে সনাতন হিন্দু-ধর্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাচীনপন্থী হিন্দুরা মিলিয়া ১৮৩০ সনের ১৭ই জানুআরি 'ধর্মসভা'র প্রতিষ্ঠা করেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার সম্পাদক ছিলেন।

৪। 'সাময়িক পত্র', ৩১-২ পৃঃ।

৫। 'সংবাদ অরুণোদয়' নামে একখানি দৈনিক পত্র ১৮৩৯ সনের শেষাশেষি জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহা কয়েকমাস পরেই বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে ১৮৩৯ সন পর্যন্ত জীবিত ও মৃত বাংলা সাময়িক পত্রের একটি তালিকা প্রকাশিত হয় (সাময়িক পত্র, ১০২-৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৬। 'সাময়িক পত্র', ৫০ পৃঃ।

৭। ঐ, ৭৬ পৃঃ।

৮। ঐ, ১৭২ পৃঃ।

৯। দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩৩ পৃঃ।

১০। 'সাময়িক পত্র', ১৯২ পৃঃ।

১১। জীবন স্মৃতি (১৩৪০) ১১৯ পৃঃ।

১২। 'সাময়িক পত্র', ২৮৩ পৃঃ।

১৩। ঐ, ২২৩-৫ পৃঃ।

১৪। এই বিবরণ প্রধানতঃ 'সাময়িক পত্র' অবলম্বনে লিখিত।

১৫। Margarita Barns, প্রণীত *Indian Press*, ২৭২ পৃঃ।

১৬। সাময়িক পত্র, ৩৯ পৃঃ।

১৭। S. D. Collet. *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy* (Ed. by D.K. Biswas, p. 177)

১৮। O'Malley, L. S. S. (Ed), *Modern India and the West*, pp. 198-99

১৯। ঐ, ১৯৮ পৃঃ।

২০। 'সাময়িক পত্র', ২৬৮-৯ পৃঃ।

২১। ঐ, ২৯৭ পৃঃ।

২২। ঐ, ২৯৬ পৃঃ।

২৩। যোগেশচন্দ্র বাগল—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ২০ পৃঃ।

২৪। ঐ, ৯ পৃঃ।

২৫। ঐ, ১২ পৃঃ।

২৬। ঐ, ১৮ পৃঃ।

২৭। Paramananda Datta, *Memoirs of Motilal Ghose*, p. 48.

২৮। C. E. Buckland, *Bengal Under the Lieutenant Governors*, p. 917.

২৯। ঐ, ৯১৯ পৃঃ।

৩০। জাতীয়তার বিকাশে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার অবদান ও ইহার বিরুদ্ধে মামলার বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। *"National Awakening and the Bangobasi"* by Shyamananda Banerjee (Calcutta, 1968)

একাদশ অধ্যায়

দেশাত্মবোধ ও রাজনীতিক আন্দোলন

ক। প্রথম পর্ব (১৮০০-১৮৫৮)

১। রাজনীতিক চেতনার উদ্বোধন

উনিশ শতকে বাংলায় যে নব জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত হয় তাহার প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য, জাতীয়তা ভাবের স্ফুরণ ও রাজনীতিক চেতনার উদ্বোধন। ইংরেজীতে nationalism (জাতীয়তা) বলিলে যাহা বুঝায় ভারতবর্ষে তাহার অস্তিত্ব মধ্যযুগে ছিল না এবং প্রাচীন হিন্দু আমলেও ছিল কিনা সন্দেহ। এই জাতীয়তার ভিত্তি ও বিশিষ্ট লক্ষণ অথবা উপাদান কি সে সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। কেহ কেহ মনে করেন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় সহাবস্থান, এক রাজার শাসনে বাস, এবং ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ প্রভৃতির ঐক্যই জাতীয়তার মূল ভিত্তি, এবং পরাধীন হইলে তাহার পরিবর্তে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার অনেকে মনে করেন যে, এই সমুদয় উপাদানগুলি বাঞ্ছনীয় হইলেও, ইহার কোন কোনটির অভাব সত্ত্বেও জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে সুইৎজার-ল্যাণ্ডে তিনটি বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে, ইউরোপের অনেক দেশে বিরোধী এমন কি বিবদমান ধর্মসম্প্রদায় আছে অথবা কিছুদিন পূর্বেও ছিল, আইরিশ জাতি পরাধীন ছিল এবং তাহাদের একাংশের ভাষাও ইংরেজী ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। অথচ এই সকল দেশে জাতীয়তা ছিল ও আছে। এইরূপ বিভিন্ন মতবাদ থাকিলেও মোটামুটি সকলেই স্বীকার করেন যে বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী এক দেশে বসবাস করিলেও ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি মনোবৃত্তির অভাব থাকিলে তাহাদিগের মধ্যে জাতীয়তা-ভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না।

প্রথমতঃ এই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে এমন সহানুভূতি ও ঐক্য-বোধ থাকা চাই, যাহা ইহার অন্তর্ভুক্ত কোন গোষ্ঠী, ও ইহার বহির্ভূত কোন গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমান নাই, এবং এই কারণে উক্ত গোষ্ঠীসমূহ সকলে মিলিত হইয়া তাহাদের গণ্ডীর বহির্ভূত যে কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একযোগে কার্য করিতে সর্বদাই ইচ্ছুক ও তৎপর থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর একই রাজ্যশাসনের অধীনে থাকিবার ইচ্ছা।

তৃতীয়তঃ রাজ্যশাসনের ক্ষমতা এই সমুদয় গোষ্ঠীর সকলের বা ইহাদের কতকের হস্তে থাকিবে, কিন্তু ইহাদের বহির্ভূত কোন গোষ্ঠীর সে বিষয়ে কোন অধিকার থাকিবে না এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ।

জাতীয়তার এই সংজ্ঞা মানিয়া লইলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে আঠারো শতকের শেষে বা উনিশ শতকের প্রথমে ভারতে জাতীয়তাভাবের অস্তিত্ব ছিল না। নিম্নলিখিত কয়েকটি অবিসংবাদিত তথ্যের সাহায্যে ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

প্রথমতঃ ভারতের রাজনীতিক ঐক্য সম্বন্ধে ইহার অন্তর্গত কোন প্রদেশই সচেতন ছিল না। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে (১৮২৪ সনে) বিশপ হিবার উত্তর ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালীদিগকে ইংরেজের মতই বিদেশী মনে করে, বাঙ্গালীরাও হিন্দুস্থানীদের সম্বন্ধে অনুরূপ মনোভাব পোষণ করে।

ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে। আঠারো শতকে মারাঠী বর্গী সৈন্য বাংলাদেশে যে উপদ্রব ও অত্যাচার করিয়াছিল তাহার ফলে যে বাঙ্গালীরা মারাঠাদিগকে ইংরেজের ন্যায় বিদেশী এবং ইংরেজের অপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণা ও বিদ্বেষের চোখে দেখিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। মারাঠীরাও ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া একযোগে বাংলাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিল। তখন ভারতের অন্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গালীরাও পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, মারাঠী, মাদ্রাজী, আসামী, ওড়িয়া প্রভৃতির উল্লেখ করিত কিন্তু ভারতীয় বলিয়া কোন সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণা ছিল না। বাঙ্গালী নেতাদের মনেও এইরূপ ধারণা ছিল। যখন বাংলায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজ, মারাঠী শক্তিবৃন্দ ও নেপাল, পঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করিতে যুদ্ধযাত্রা করিত তখন বাঙ্গালী নেতারা ইংরেজদের বিজয়ের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং যুদ্ধে ইংরেজদের অর্থ সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতেন। উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী রাজা রামমোহন রায়ও এই দলভুক্ত ছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালীর সহিত কেবল যে ভারতের অন্য প্রদেশের অধিবাসীর সহিত ঐক্যবোধ ছিল না তাহা নহে। বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। প্রথমতঃ ধর্মবিশ্বাস,

ধর্মানুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রথম হইতেই যে গুরুতর মৌলিক প্রভেদ ছিল সাত শত বৎসর একত্র বাস ও বাংলার বহু হিন্দু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিলেও তাহার বিশেষ হ্রাস হয় নাই। আমার বাল্যকালেও দেখিয়াছি যে বাংলাদেশে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আহার বিহার বৈবাহিক প্রভৃতি কোন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ছিল না; হিন্দুরা মুসলমানদিগকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিত; ভোজ্য তো দূরের কথা তাহাদের স্পর্শে পানীয়ও দূষিত বলিয়া বিবেচিত হইত এবং কোন মুসলমান—যতই শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত হউন না কেন—হিন্দুর সঙ্গে ভোজন ও তাহার শয়ন-গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। শিক্ষা ও সাহিত্য ব্যাপারেও উভয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য অটুট রহিল। হিন্দুর ধর্ম ছিল বহু দেবদেবীর মূর্তি গড়িয়া পূজা করা, মুসলমানেরা কেবল যে ইহাতে বিশ্বাসী ছিল না তাহা নহে, তাহাদের ধর্মমতে হিন্দুর মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করা পুণ্যকার্য ছিল। আরবী ও ফারসী ছিল মুসলমানদের সাহিত্যের ভিত্তি, হিন্দুদের অনেকে ফার্সী জানিলেও সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যই ছিল তাহাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি। বহুকাল একত্র বাস করার এবং বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমানসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার ফলে ছোটখাট দৈনন্দিন আচার ব্যবহার ও অনেক লৌকিক বিশ্বাস সংস্কার প্রভৃতি এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এই উভয়ের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে যে গুরুতর মৌলিক প্রভেদের কথা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে[১] বর্ণিত হইয়াছে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত তাহার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। বিংশ শতকে হিন্দু নেতারা রাজনীতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ইহা স্বীকার না করিলেও এই ঐতিহাসিক সত্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান পণ্ডিত আলবেরুণী একাদশ শতকের প্রথম ভাগে এই মৌলিক প্রভেদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "অন্য সকল জাতির মধ্যে যে সমুদয় বিষয়ের মতের ঐক্য আছে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তাহার সকলগুলিতেই মতের প্রভেদ। ধর্ম বিষয়ে এই মতানৈক্য চরমে পৌঁছিয়াছে, কারণ আমরা যাহা বিশ্বাস করি হিন্দুরা তাহা বিশ্বাস করে না, এবং হিন্দুরা যাহা বিশ্বাস করে আমরা তাহা বিশ্বাস করি না"।[২] নয় শত বৎসর পরে (১৯৩৫ সনে) পাকিস্তানের পরিকল্পক রহমৎ আলি ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন: "হিন্দু ও মুসলমান দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতি। আমাদের ধর্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস, প্রাচীন কিংবদন্তী (tradition), সাহিত্য, অর্থনীতিক ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ-বিধি প্রভৃতির মধ্যে মূলগত প্রভেদ বর্তমান।

দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারেও এই প্রভেদ দেখা যায়। আমরা—হিন্দু ও মুসলমানেরা—পরস্পরের সঙ্গে আহার করি না, আমাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইতে পারে না, আমাদের জাতীয় আচার ও প্রথা, বর্ষগণনার রীতি (calendars) এমন কি খাদ্য ও পোষাক পরিচ্ছদও পৃথক।"[৩] এই প্রভেদের ভিত্তির উপরই জিন্নার দ্বি-জাতিমূলক রাজনীতি ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুর কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। উনিশ শতকের গোড়ায় প্রসিদ্ধ নেতা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে অনন্যসাধারণ উদার মত পোষণ করিতেন। কিন্তু তিনিও মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছেন যে তিনি ইংরেজদিগকে ভারতে পাঠাইয়া হিন্দুদিগকে নয় শত বর্ষব্যাপী মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি ইংরেজ শাসনের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরও প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন যে হিন্দুদের সর্ববিধ দুঃখ দুর্দশা ও অবনতির মূল কারণ মুসলমান-রাজ্যশাসন নীতি। প্রসন্নকুমার ঠাকুরও বলিয়াছেন যে ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি স্বাধীনতা চাও না ইংরেজের অধীন হইয়া থাকিতে চাও, আমি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই বর বলিয়া গ্রহণ করিব।[৪]

এইরূপ মনোভাব কেবল মুষ্টিমেয় হিন্দু নেতা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দু বাঙ্গালী জনসাধারণও উনিশ শতকে এই মতই দৃঢ়ভাবে পোষণ করিত।

সমসাময়িক পত্রিকাগুলিতে মুসলমান শাসনের অনিয়ম ও অত্যাচারের সঙ্গে তুলনা করিয়া ইংরেজ শাসনের উৎকর্ষ সম্বন্ধে বহু মন্তব্য দেখা যায়। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত ১৮৪০ সনে 'বিজ্ঞানদায়িনী সভা'য় বলেন:

"যবন নৃপতিগণের অধীনে বাঙ্গালীরা যদ্রূপ দুর্দশা সাগরে নিমগ্ন ছিল, তাহা স্মরণ করিতে হইলে কঠিন হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাঁহারা এদেশের রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু প্রজারা প্রায় তাঁহারদিগের অধীনে সুখি ও সুস্থির চিত্ত থাকিতে পারিতেন না বরং নিয়তই অনিয়ম ও অত্যাচারের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, যেহেতু প্রথমতঃ যবন রাজাদিগের রাজকীয় বিষয়ে বর্ত্তমান দেশাধিপতিদিগের ন্যায় সুচারু নিয়ম ও ঐক্য ছিল না, ...
যবনাধিকারে এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ শান্তির সহিত প্রায় কখনই সাক্ষাৎ করেন নাই,

একে রাজার দৌরাত্ম্য তাহাতে আবার দুর্দ্দান্ত ও দুরাচারি লোকেরা অনায়াসে দিবসে নির্ভয়ে ডাকাইতি করিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিত, এবং এক এক বার বর্গির হাঙ্গামায় লোকেরদিগের ধনপ্রাণ প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে যদ্রূপ দুর্দ্দশা ঘটিত, তাহা স্মরণ মাত্রে আমারদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কোন সময়ে কি বিপদ ঘটিবে, এই দুর্ভাবনাতেই লোকেরা দিবারাত্র সশঙ্কিত থাকিত।"[৫] 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ১৮৪২ সনে 'মুসলমানরূপী পিশাচ কর্তৃক বিবিধ অত্যাচারের' কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং "ইংরেজদের প্রাদুর্ভাবে ৮০০ বছর পর্যন্ত যে দুঃখ এদেশে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা ক্রমে দূরীকৃত হইতেছে" এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে।[৫ক] ১৮৫০ সনে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় উক্ত হইয়াছে :

"এই দেশ যখন দুরন্ত যবনজাতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তৎকালে ঐ দুর্বৃত্ত-জাতির দৌরাত্ম্যে আমাদিগের সুখ সম্পত্তির একেবারেই লোকাপত্তি হইয়াছিল।... দুশ্চরিত্র যবনজাতির ভয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন ও বিদ্যানুশীলন সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইয়া গেল। সকলেই আপনাপন জাতি প্রাণ কুলশীল লইয়া শশব্যস্ত, স্ত্রী জাতিকে বিদ্যাদান করিবেক কি পুরুষদিগেরও শাস্ত্রালোচনা মাথায় উঠিল। তদবধি স্ত্রীদিগের অন্তঃপুর নিবাস ও বিদ্যাভ্যাস নিরাশ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে জগদিশ্বরের কৃপায় আমাদিগের আর সে দুরবস্থা নাই, অত্যাচারী রাজা নাই। শুভদিন পাইয়া সকল শুভকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিতেছি। আমাদিগের লুপ্তপ্রায় অন্যান্য সদ্ব্যবহার সকল পুনরুদ্ধার করিতেছি।"[৬]

১৮৭০ সনে 'সোমপ্রকাশে' লেখা হইয়াছে :

"...মুসলমানদিগের রাজত্বকালে প্রজাদিগকে যে সমস্ত অত্যাচার ও পীড়া সহ্য করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ সকল অত্যাচারের কথা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। সিরাজউদ্দৌলার রাজত্ব কাল স্মরণ হইলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ রাজ্যকে "রাম রাজ্য" বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অত্যাচারের কথা দূরে থাকুক এক্ষণে কেহ কাহাকে একটি উচ্চ কথা বলিতে সমর্থ হয় না। প্রজাগণ নিশঙ্কচিত্তে ও পরম সুখে ব্রিটিশ রাজ্যে বাস করিতেছেন। এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ভারতবর্ষের সৌভাগ্য সূর্য ক্রমশঃ উদয় হইতেছে।"[৭]

এরূপ আরও বহু উক্তি নানা গ্রন্থে ও সাময়িক পত্রিকায় দেখিতে পাই। এই সমুদয় উক্তির মধ্যে যে অসত্য ও অতিরঞ্জন আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উনিশ শতকের হিন্দুগণ মুসলমান রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যে কিরূপ

ধারণা পোষণ করিতেন তাহা এই সমুদয় উক্তি হইতে বেশ বোঝা যায়। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি হিন্দু নেতৃবৃন্দও যে ঠিক এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। বর্তমান কালে একদল রাজনীতিক এবং অনেক বিশিষ্ট নেতাও প্রকাশ্যে এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে ইংরেজ অধিকারের পূর্বে হিন্দুরা কখনও স্বাধীনতা হারায় নাই। কিন্তু উপরে যাহা বলা হইল নিরপেক্ষভাবে তাহা বিচার করিলে এ সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে না যে উনিশ শতকের হিন্দু জনসাধারণ ইহার বিপরীত মতই পোষণ করিত। কোন মত সত্য এখানে তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হইবে যে জাতীয় চেতনা বা স্বাধীনতার প্রেরণা অন্ততঃ বাংলা দেশে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ছিল না। ক্রমে ক্রমে কিরূপে বাংলা দেশে এই উভয়েরই উদ্ভব হইল অতঃপর তাহাই আলোচনা করিব।

রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সহযোগিগণ ইংরেজ শাসনের অনুরক্ত ভক্ত হইলেও ইহার কোন কোন ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৮২৩ সনে যখন সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষমতা খর্ব করিবার অভিপ্রায়ে এক নূতন বিধি (Press Ordinance) প্রচলিত হয় তখন রামমোহন রায় ও তাঁহার সহযোগিগণ যে ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করেন, উনিশ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাহা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। চারি বৎসর পরে বিচার কার্যে হিন্দু ও মুসলমান জুরীদের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া যে নূতন আইন (Jury Act) হয় রামমোহন তাহার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন। ইহা ছাড়াও রামমোহন ইংরেজ শাসনের নানাবিধ সংস্কারের দাবি করেন—দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কৃষকের খাজনার উচ্চতম বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ধারণ, ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজী ভাষায় বিচারালয়ের কার্য পরিচালনা, জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিস পৃথক্ করণ, আইন বিধিবদ্ধ করণ, জুরী ও অ্যাসেসর (assessor) প্রথার প্রবর্তন ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কিন্তু এই সমুদয় প্রাচীন নেতাগণ ইংরেজ শাসনের বিলোপ হউক কখনও এরূপ মনোভাব পোষণ করেন নাই। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ রাজনীতিক আদর্শের দিক দিয়া আরও একটু অগ্রসর হয়, এবং কোন কোন বিষয়ে রামমোহনের জীবিতকালেই তাঁহার মতের বিরোধিতা করে। রামমোহনের ধারণা ছিল যে ভারতে একদল ইংরেজের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিলে এদেশের উন্নতি

হইবে। হিন্দু কলেজের একটি সমিতির অধিবেশনে এই বিষয়টি আলোচিত হয় এবং একটি ছাত্র একটি লিখিত প্রবন্ধে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করে। এই প্রবন্ধটি ১৮৩০ সনের ১২ই ফেব্রুআরি ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রাচীন ও বর্তমান যুগের ইউরোপীয় উপনিবেশের দোষ দেখাইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলা হয় যে অবশ্য সুরাপান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক আমোদ প্রমোদের প্রবর্তনের ফলে ঐ সব দেশের অসভ্য বর্বর অধিবাসীরা শীঘ্রই পাশ্চাত্য প্রভাবে সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল।[৮]

হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, বিশেষত ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায়, ইংরেজ শাসনের দোষক্রটি সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং এমন কি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিত সে বিষয়ে কিছু কিছু প্রমাণ আছে। আঠারো শতকের শেষ ভাগে ফরাসী বিদ্রোহ ও ১৮৩০ সনে ইউরোপের নানা দেশে স্বাধীনতা লাভের জন্য যে সকল গণ-আন্দোলন হয় হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ তাহার সংবাদ রাখিত এবং তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইত। কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮৩০ সনে এবং তাহার কাছাকাছি সময়ে যে কয়েকটি দেশপ্রেমাত্মক কবিতা ইংরেজীতে লিখিয়াছিলেন বাংলা দেশে তাহাই দেশাত্মবোধের প্রথম সূচনা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। কিন্তু ইহা নিছক কবির কল্পনা ও উচ্ছ্বাস মাত্র—এবং তরুণ ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কাশীপ্রসাদ নিজেই একটি কবিতায় লিখিয়াছেন যে তাঁহার জীবিতকালে দেশের স্বাধীনতা স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।[৯]

হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ পূর্বোক্ত হিন্দু নেতাদের ন্যায় ইংরেজ শাসনের সম্পূর্ণ অনুরাগী ছিল না—ইহার দোষ ক্রটি সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন ছিল এবং পূর্বে উল্লিখিত তাহাদের পরিচালিত পত্রিকায় ও প্রকাশ্য সভায় ইহার আলোচনা করিত।

'হিন্দু পাইওনিয়র' (Hindu Pioneer) পত্রিকায় 'স্বাধীনতা', 'বিদেশীর অধীন ভারতবর্ষ' প্রভৃতি শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এই শেষোক্ত প্রবন্ধে ভারতে ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহার কিয়দংশের মর্ম বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিতেছি:

"ইংরেজ সরকার এক অভিজাত সম্প্রদায়। আইন প্রণয়নে বা বিধান পরিষদে এ দেশীয় লোকের কোন স্থান নাই। সরকারী চাকুরীতে ইংরেজের একচেটিয়া অধিকার, বিচার বিভ্রাট, কর্মচারীগণের ঔদ্ধত্য, শাসনকার্যে অত্যধিক

ব্যয়, ভারতে ধনরত্ন সঞ্চয় করিয়া ইংরেজদের স্বদেশে প্রস্থান, অতিরিক্ত করভার —প্রভৃতি অনিষ্টগুলি এতই সুপরিচিত যে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা অনাবশ্যক। মুসলমানদের আমলে রাজারা গুণের আদর করিতেন, কিন্তু প্রাচীন হিন্দু যুগের ন্যায় ইংরেজ আমলে শাসনকর্তারা একটি পৃথক সম্প্রদায়ভুক্ত। বল-প্রয়োগের দ্বারা এদেশে বিদেশী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং এদেশে লোকদের সর্বপ্রকার শাসন ক্ষমতা ও উচ্চ রাজপদের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। রাজনীতিক বা বাণিজ্যের দ্বারা যেটুকু ইষ্ট হইয়াছে তাহার বিনিময়ে পূর্বোক্ত অনিষ্টগুলির সমর্থন করা যায় না।"[১০]

হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের রাজনীতিক চিন্তা ও আদর্শ যে আরও কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল নিম্নে তাহার কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হইল।

হিন্দু কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮) কলিকাতার পুলিশ এবং ইংরেজ আমলের বিচার পদ্ধতির তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন যে 'সুশাসন বলিতে যাহা বোঝা যায় এ দুই বিভাগেই তাহার সম্পূর্ণ অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক গভর্নমেণ্টেরই প্রাথমিক কতর্ব্য পক্ষপাত-শূন্য সুবিচারের ব্যবস্থা করা। যে গভর্নমেণ্ট সম্পূর্ণভাবে প্রজার স্বার্থ ও মঙ্গলকে নিজের স্বার্থ ও মঙ্গল বলিয়া মনে করে ইহা কেবল সেই গভর্নমেণ্টের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ কোন গভর্নমেণ্ট নাই—একদল বণিকেরাই কেবল তাহাদের নিজেদের লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এদেশ শাসন করে।'[১১]

হিন্দু কলেজের আর একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রচার করেন যে 'ভগবান সকল মানুষকে সমান অধিকার দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন। রাজ্যশাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, বহুলোকের কল্যাণ, মুষ্টিমেয়ের ইষ্ট-সাধন নহে। শাসনকর্তা বিদেশী হইলে তাহারা নিজ জাতির স্বার্থই সাধন করেন, এদেশীয় লোকের স্বার্থ সাধনরূপ মহানুভবতা তাহাদের মধ্যে কচিৎ প্রত্যক্ষ করা যায়। বিদেশী শাসনই ভারতের দারিদ্র্যের কারণ।'[১২]

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের স্বাধীন ও বলিষ্ঠ মনোবৃত্তির পরিচয়স্বরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াই এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত "Society for the Acquisition of General Knowledge" সভার একটি অধিবেশনে (৪ঠা ফেব্রুআরি, ১৮৪৩) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 'বাংলা প্রেসিডেন্সীতে ফৌজদারী আদালত ও পুলিশ' এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। হিন্দু কলেজের আর একটি প্রসিদ্ধ ছাত্র তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছিলেন

সভাপতি। প্রবন্ধটি যখন প্রায় আধাআধি পড়া হইয়াছে তখন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন সাহেব (D. L. Richardson) বাধা দিয়া বলিলেন যে 'এরূপ রাজদ্রোহ সূচক প্রবন্ধ তিনি এই কলেজের হলে পাঠ করিতে দিবেন না।' সভাপতি তারাচাঁদ ইহার প্রতিবাদে বলিলেন, "কাপ্তেন রিচার্ডসন, আমি যথা-বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন করিতেছি যে আপনার এই উক্তি ও আচরণ অত্যন্ত অসঙ্গত ও অশোভন এবং আমাদের সভার পক্ষে অসম্মানজনক। আপনি যদি আপনার উক্তি প্রত্যাহার না করেন আমরা ইহা হিন্দু কলেজের কমিটিকে, এবং প্রয়োজন বোধ করিলে, গভর্নমেণ্টকে জানাইব। আমরা কমিটির নিকট হইতে এই কক্ষে সভা করিবার অনুমতি আনিয়াছি—এবং আপনার ব্যক্তিগত কোন অনুগ্রহের উপর নির্ভর করি নাই। আপনি এখানে একজন দর্শক ও শ্রোতা মাত্র এবং আমাদের সভার কোন সদস্যকে তাহার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার আপনার নাই। আমি আশা করি কাপ্তেন রিচার্ডসন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই প্রবন্ধের লেখক ও এই সভার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন।"১৩

পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রভাবে ও হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফলে একদল বাঙ্গালী যুবক ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধেই কিরূপ স্বাধীন রাজনীতিক চেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল উপরোক্ত ঘটনাটি তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ঐ বৎসরই হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ টাউন হলে সভা করিয়া বিলাতে কর্তৃপক্ষের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করে। ইহাতে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রার্থনা করা হইল শিক্ষিত ভারতীয়েরা যেন উচ্চতর সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হন। এই উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী নিয়োগের সপক্ষে অনেক যুক্তি দেখান হইল।

রামমোহন রায় ও তাঁহার সহযোগীবৃন্দ শাসন সংস্কারের যে দাবি তুলিয়া-ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক পরবর্তী যুগের নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিলেন। Young Bengal বা 'যুব-বাঙ্গালী' নামে পরিচিত এই তরুণ দল নানাবিধ সংস্কার সাধনের দিকে গভর্নমেণ্ট ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, এবং কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নহে, হাতে কলমে অর্থকরী বৃত্তির উপযোগী বিদ্যাশিক্ষা যে গভর্নমেণ্টের প্রধান কর্তব্য, এবং দেশে শান্তি রক্ষা করাই যে তাহাদের একমাত্র কার্য্য নহে, সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চতর

করাও যে অবশ্য করণীয়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী তাহা প্রচার করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিলেন যে শিক্ষার প্রসার ব্যতীত দেশের সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক দুর্দশা কখনও দূর হইবে না। এমন কি কয়েক বৎসর পরে (১৮৫৫ সনে) তিনি ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালকদের বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষা দিবার প্রস্তাবও করেন—এবং সামরিক ব্যয় কমাইয়া ইহার খরচ চালাইবার যুক্তি দেন। তিনি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের যে প্রণালী নির্দেশ করেন তাহাতে কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, জাহাজ নির্মাণ ও অন্যান্য নানাবিধ কারিগরী শিক্ষার (Vocational and technical education) ব্যবস্থাও ছিল। কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও অক্ষয়কুমার দত্ত খুব তীব্র আন্দোলন করেন।[১৪]

কতকগুলি রাজনীতিক সংস্কার বিষয়ে এদেশে গুরুতর মতভেদ ছিল। রামমোহন রায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে ভারত গভর্নমেণ্টের পরিবর্তে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করিবেন। আর এক দলের মত ছিল যে আইন প্রণয়নের জন্য ভারতে একটি স্বতন্ত্র বিধান সভা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আর একটি দাবি করা হইল যে কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধিকে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য করা হউক। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রস্তাব করিলেন যে বাংলা, বম্বে ও মাদ্রাজ এই তিন প্রেসিডেন্সী হইতে দুজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠান হউক।

শাসন সংস্কার সম্বন্ধে এই সমুদয় ও অন্যান্য অনুরূপ উক্তি ও আন্দোলন বিশেষ কোন ফল প্রসব করে নাই—কিন্তু তথাপি পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বাংলা দেশে যে রাজনীতিক চেতনার নবজাগরণ হইয়াছিল ইহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

ইহার আরও পরিচয় পাওয়া যায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে ও স্থায়ী সভা সমিতির প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিক মতামত ব্যাপকভাবে প্রচারের চেষ্টায়। বলাবাহুল্য এই দুইটি উপায় অবলম্বনও পাশ্চাত্য অনুকরণের ফল। সংবাদপত্রের সাধারণ বিবরণ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। অনেক সংবাদপত্রে অন্যান্য প্রসঙ্গের সহিত রাজনীতিক বিষয়, বিশেষতঃ ইংরেজ শাসনের ত্রুটি ও ইহার সংস্কার বিষয়ে আলোচনা থাকিত। কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রধানতঃ রাজনীতিক আন্দোলনের বাহন বা মুখপত্র হিসাবে 'Reformer' নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। ইহাই প্রথম ভারতীয় পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্র। ইহাতে সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, আইন, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়

আলোচিত হইলেও রাজনৈতিক বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হইত। মিশনারী ডাফ, 'এই পত্রিকা খানি জনসাধারণের না হইলেও-ধনে মানে খ্যাতিসম্পন্ন রামমোহন রায়ের অনুগামী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মনোভাবের পরিচয় দেয়,' এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ সনে ইহার গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৪০০। সে যুগে Bengal Hurkaru-র গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৯৩৪—কিন্তু আর কোন সংবাদপত্রের ৪০০ অপেক্ষা অধিক গ্রাহক ছিল না।

দ্বারকানাথ ঠাকুর এক নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। নূতন কাগজ বাহির না করিয়া তিনি প্রভাবশালী ইংরেজী পত্রিকার স্বত্বের অনেক অংশ (share) ক্রয় করিয়া ইহার মাধ্যমে স্বীয় মত ও নীতি প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি India Gazette কিনিয়া ইহার সহিত প্রথমে Bengal Chronicle ও পরে Bengal Hurkaru যুক্ত করিলেন এবং ইহার মাধ্যমে John Bull নামক পত্রিকায় ভারতীয়দের যে নিন্দা ও কুৎসা বাহির হইত তাহার জবাব দিতেন।

অন্যান্য যে সমুদয় কাগজে রাজনৈতিক চর্চার প্রাধান্য ছিল তাহাদের মধ্যে Parthenon (১৮৩০), Bengal Spectator (১৮৪২) এবং Hindu Pioneer বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার কথা পূর্ব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কেবল মাত্র সংবাদপত্র প্রচারের উপর নির্ভর না করিয়া বাঙ্গালী রাজনৈতিক আন্দোলনকারীগণ স্থায়ী সভা সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন।

১৮৩৬ সনে বাংলায় সর্বপ্রথম 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' নামে এইরূপ একটি সভার প্রতিষ্ঠা হয়। ইহা প্রায় বিস্মৃতির অতল গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তাহা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। এই সভায় প্রথমে ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইত এবং প্রতি বৃহস্পতিবার ইহার অধিবেশন হইত। 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার ১৮৩৬ সনের ১৭ ডিসেম্বরের সংখ্যায় পূর্বের বৃহস্পতিবারের সভায় উপস্থিত একজন পত্র প্রেরক যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

'"পূর্ব্বে এই সভার লোকসংখ্যা যেরূপ ছিল আমি গত বৃহস্পতিবারে দেখিলাম তদপেক্ষা দশগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।...সভাপতি শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ পূর্ব্ব সপ্তাহে স্থিরীকৃত আলোচনার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন—'দুঃখ হইতে সুখ জন্মে কি সুখ হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়।'

"তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে শেষ আমুষ্ট

পর্য্যন্ত মানিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে বিচার করিতে হইবেক কিন্তু সভার দশম নিয়মে লিখিত আছে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাতে ধর্ম্মবিষয়ক বিচার হইবেক না অতএব আমার বোধ হয় এই প্রস্তাব ঘটিত বিচার না করিয়া নীতি এবং রাজকার্য্যাদি সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে আমারদিগের ইষ্টানিষ্টের সম্পর্ক আছে তাহা বিবেচনা করিলে দেশের অনেক উপকার হইবেক ইহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ পোষকতাবিষয় নানা দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া যেরূপ বক্তৃতা করিলেন তাহা শ্রবণে সভাময় ধন্যবাদ ধ্বনি উপস্থিত হইল তৎপরে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় কহিলেন রাজসংক্রান্তাদি বিবিধ বিষয় যাহাতে দেশের অনিষ্ট হইতেছে তর্কদ্বারা স্থিরীকৃত হইলে এই সভাই তাহা নিবারণের চেষ্টা করেন অতএব এমত নিয়ম স্থির করা যায় যে রাজদ্বারে আবেদন বা অন্য উপায় যাহাতে দেশের অনিষ্ট নিবারণ হয় বঙ্গভাষা প্রকাশিকা মনোযোগপূর্ব্বক তাহা করিবেন ইহাতে সকল সভ্য ঐ বাবুকে ধন্যবাদপূর্ব্বক স্ব স্ব সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।...পরে শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ ইংলণ্ডীয় লোকেরদের সভাতে সভ্যেরা চৌকিতে উপবিষ্ট এবং মধ্যস্থলে টেবিল রাখিয়া থাকেন· আর সভ্যেরা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বক্তৃতা করেন তবে এ সভাতে সেরূপ করণের বাধা কি ইহাতে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদকের সহিত অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকল সভ্যেরাই স্থির করিলেন চৌকিতে উপবিষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বক্তৃতা করিতে হইবেক।... অনেক বিষয়ে বহু সভ্যের বক্তৃতার পর শ্রীযুত বাবু রামলোচন ঘোষ কহিলেন সংপ্রতি শাসনকর্ত্তারা নিষ্কর ভূমির কর স্থাপন আরম্ভ করিয়াছেন অতএব আগামী সভার বিবেচনার্থ এই প্রশ্ন স্থির করা যায় যে রাজকর্ত্তৃক নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ উচিত কিনা তাহাতে শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়ের ও সভাপতির পোষকতানুসারে সকল সভ্যই সম্মত হইলেন এবং সভার নিয়মানুসারে চারি ব্যক্তির প্রতি উত্তর লিখনের ভারার্পণ হইল অনন্তর দশ ঘণ্টা রাত্রির পর সভা ভঙ্গ করিলেন।"[১৫] এই প্রস্তাবানুযায়ী নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক হয়। নদীয়া জিলার প্রধান সদর আমীন পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর গভর্নমেণ্টের নীতির সমর্থন করেন এবং তাঁহার যুক্তিতর্ক লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন। অন্য কেহ কেহ 'সংবাদ প্রভাকরে' (এবং সম্ভবতঃ অন্য পত্রিকায়) রামলোচনবাবুর যুক্তির অসারতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সমালোচক বলিয়াছেন যে রামলোচনবাবু গভর্নমেণ্টের চাকরী করেন, সুতরাং অন্যায় জানিয়াও ভয়ে বা

অনুগ্রহ লাভের আশায় গভর্নমেণ্টের নীতি সমর্থন করিয়াছেন তবে "ইহাতে আমরা ঘোষজ বাবুকে কদাচ দুষ্য করিতে পারি না কেন না প্রতিপালকের বিরুদ্ধ বক্তৃতায় পাপের সম্ভাবনা।"

এই সমুদয় আলোচনার ফলে প্রস্তাব করা হইল যে গভর্নমেণ্টের নীতির বিরুদ্ধে চারি পাঁচ হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক দরখাস্ত রাজদ্বারে পাঠান উচিত কিনা তাহার বিবেচনা করার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা এক সভা আহ্বান করা হউক। এই উদ্দেশ্যে এক অনুষ্ঠান পত্র লিখিত হইল এবং স্থির হইল যে কর্তৃপক্ষ "এই অনুষ্ঠান পত্র ছাপিয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ করিবেন এবং তাহাতে হিন্দু মোসলমান সাধারণ সকলের নাম স্বাক্ষর হইলে সভার স্থান ও দিন স্থির করিয়া সমাচার পত্রে বিজ্ঞাপন দিবেন।"

এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল কিনা এবং হইয়া থাকিলে কি কার্য পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে বিশেষ কিছু হয় নাই বলিয়াই মনে হয়—কারণ ইহার নয় মাস পরে ১৮৩৭ সনের ১৪ অক্টোবর নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

"নূতন সমাজ। কথিত আছে যে দেওয়ান শ্রীযুক্ত রামকমল সেন এক নূতন সমাজ স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় যে নিষ্কর ভূম্যধিকারি-দিগের পক্ষে এবং রাজকীয় কর্ম্মে বঙ্গভাষা চলন হওন বিষয়ে এক আবেদন পত্র ইংলণ্ড দেশে প্রেরণ করেন।"[১৬]

উনিশ শতকে যে প্রণালীতে রাজনীতিক আন্দোলনের জন্য নানা সভা সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৩৭ সনে 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাই' তাহার পথ প্রদর্শন করে। এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া এই শ্রেণীর আরও কতকগুলি সভা হয়—কিন্তু কোন সভাই বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। এ সম্বন্ধে ১৮৫২ সনের ২রা মার্চ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' এই সমুদয় সভার ব্যর্থতার আলোচনা করা হইয়াছে। 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকার' পূর্বোক্ত নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ সম্বন্ধে আন্দোলনের প্রশংসা করিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে "কিন্তু কেবল একতার অভাবে ঐ সভার উচ্ছেদ হইয়াছে। বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার পতন কারণ স্মরণ হইলে আমারদিগের অন্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ তরঙ্গ বৃদ্ধি হয়, ঐ সভার পরে মৃত মহাত্মা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিশেষ প্রযত্নে ভূম্যধিকারী সভা নামে অপর এক সভা স্থাপিত হয়, মেম্বর মহাশয়েরা যদি(ও) অনেক প্রকার সৎকর্ম্ম সাধনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত গবর্নমেণ্টের পত্রাদি লেখা চলিয়াছিল, দশ বিঘা

পর্য্যন্ত ব্রহ্মত্র ছাড় দিবার নিয়ম ঐ সভার উদ্যোগেই হইয়াছে, তথাচ তাহা স্থায়ী হয় নাই, দ্বারকানাথ বাবুর পতনেই সভার পতন হইয়াছে। বিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় আপনি উদ্যোগী হইয়া দেশ হিতৈষিণী সভা নামে এক সভা করিয়াছিলেন ঐ সভায় সমুদয় বাঙ্গালা পত্র সম্পাদকদিগের সংযোগ হইয়াছিল, যোড়াসাঁকোর ৺কমল বসুর বাটীতে যে কয়েকবার তাহার প্রকাশ্য সভা হয়, সেই সকল বারেই সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য লোকেরা আগমন করিয়াছিলেন, নিয়মাদি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু কি আক্ষেপ ঐ সভার দ্বারা এমত কোন কার্য্য হয় নাই যদ্দারা তাহা আমারদিগের স্মরণীয় হইতে পারে, তদনন্তর ইয়ং বাঙ্গাল মতাবলম্বিদিগের দ্বারা বাঙ্গাল ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সভা স্থাপিত হয়, মান্যবর মেং জর্জ তামসন সাহেব এখানে আসিয়া ঐ সভায় কয়েক দিবস বক্তৃতা করিয়া মহা ধুমধাম করিয়াছিলেন, বাঙ্গাল স্পেক্টেটর নামে ঐ সভার মতপোষক একখানা পত্র প্রকাশ হইয়াছিল, সাধারণের সাহায্য ও সংযোগ বিরহে তাহাও স্থায়ী হইল না, ইতিপূর্ব্বে বাগবাজার নিবাসী মৃত বাবু কাশীনাথ বসু 'ভূম্যধিকারী সভার' পুনর্জ্জীবন দানে দৃঢ় সংকল্প করিয়া যে উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন তাহার শুভ চিহ্নের মধ্যে বসু বাবু রাজদত্ত আশাবোঁটা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অন্য উপকার কিছুই দর্শে নাই, এইরূপ এতদ্দেশীয় লোকেরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনার জন্য যে কয়েকটা সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন একতা ও যত্নের অভাবে তত্তাবতেরই পতন হইয়াছে, রাজকীয় বিষয়ের চিন্তা করা যদ্যপি এতদ্দেশীয় লোকেরা অতি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন এবং তাহার প্রতি তাঁহার-দিগের মনোযোগ থাকিত তবে ঐ সকল সভার পতন না হইয়া বরং তাহার স্থায়িত্ব হওয়া সম্ভব হইত।..."[১৭]

'সংবাদ প্রভাকর' সমসাময়িক লোকের দৃষ্টিভঙ্গীতে যাহা ব্যর্থ প্রয়াস বলিয়া মনে করিয়াছিল তাহার মধ্যেই যে ভবিষ্যৎ সার্থকতার বীজ নিহিত ছিল—আজ আমরা তাহা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই সমুদয় ব্যর্থতার মধ্যে বাঙ্গালীর রাষ্ট্র চেতনার যে উন্মেষ হইয়াছিল তাহা কালক্রমে সার্থক রাজনীতিক সভা সমিতির সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহা আলোচনা করিলে রবীন্দ্রনাথের সেই প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—

"জীবনে যত পূজা হল না সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে-ফুল না ফুটিতে,
ঝরেছে ধরণীতে

যে-নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

'সংবাদ প্রভাকরে' যে 'ভূম্যধিকারি সভা' ও 'বাঙ্গাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সভা'র কথা উল্লিখিত হইয়াছে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

১। ভূম্যধিকারী সমাজ

ভূম্যধিকারীদের "সমাজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও ইহা উচিত কিনা" এই বিষয়ের আলোচনার জন্য রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টায় ১৮৩৭ সনে ১২ নভেম্বর হিন্দু কলেজে একটি বৈঠক হয়। ইহার ঔচিত্য ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইলে "এই সমাজের এক পাণ্ডুলেখ্য ও বিধিসকল নির্ব্বন্ধ-করণার্থ ক্ষণেকের নিমিত্ত এক কমিটি স্থাপন করেন অর্থাৎ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন এবং শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এই কমিটি মহাশয়েরদিগকে কেবল এই উপদেশ জ্ঞাপন করা গেল যে সমাজের বিধান প্রস্তুতকরণ সময়ে ইহা স্মরণ করিবেন যে এই সমাজ জাতি কি দেশ কি বর্ণ কিছু বিভেদ না করিয়া সর্ব্বপ্রকার লোকের নিমিত্ত স্থাপন হইল অতএব তাহার বহির্ভূত কেহই থাকিবেন না। এই সমাজের এমত সাধারণ নিয়ম হইবে যে তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিই তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। এবং দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ভূমি সম্পর্কীয় হন তিনি স্বচ্ছন্দে ঐ সমাজের অন্তঃপাতী হইতে পারেন। এই কমিটির কার্য্য সমাপন হইলে পর ঐ সকল বিধির বিবেচনার্থ ও সমাজ স্থাপনার্থ সাধারণ এক বৈঠক হইবে।"[১৮]

তখনকার দিনেও পরবর্তী কালের ন্যায় ইংরেজী ভাষায়ই এই সকল সভার কার্য নির্বাহ হইত। উপরের উদ্ধৃতিতে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় ইংরেজীর অনুবাদে বাংলায় অপরিচিত ভাব ও সংজ্ঞা প্রকাশের জন্য নূতন নূতন শব্দের চয়ন—অর্থাৎ একটি পরিভাষা গঠন। উপরের উদ্ধৃতিতে যে কয়টি শব্দ অধোরেখ করা হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত ইংরেজী বাক্যের অনুবাদ বলিয়াই মনে হয়—"A provisional committee was appointed to prepare the draft of a prospectus and a set of rules, regulations and bye-laws"। ইহার সুষ্ঠু বাংলা প্রতিশব্দ আজ পর্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই—যদিও ১৩০ বৎসর যাবৎ এই চেষ্টা চলিতেছে।

১৮৩৮ সনের মার্চ মাসে পূর্বোক্ত প্রস্তাবানুসারে 'শিষ্টবিশিষ্ট মান্ত জমিদারদের'

এক বৈঠক হয়। উপস্থিত 'মান্তবরদের' মধ্যে 'শ্রীযুক্ত মুনসী আমির' নামে একজন মুসলমান এবং তিনজন ইংরেজ—ডিকিন্স, প্রিন্সেপ ও হেয়ার ছিলেন। অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন বাঙ্গালী হিন্দু—এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, সত্যচরণ ঘোষাল, রামকমল সেন প্রভৃতি অনেক সুপরিচিত সম্ভ্রান্ত নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই সভার সভাপতি পদে বৃত হইলেন। তিনি এই নব প্রতিষ্ঠিত ভূম্যধিকারী সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া বলিলেন যে ইংরেজ শাসনে "প্রথমতঃ লোক সকল বিলক্ষণ সুখে কালযাপন করিতেন কিন্তু এইক্ষণে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ বিষয়ে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে এবং ভূম্যধিকারীরাও উদ্বিগ্ন আছেন।" আরও যে দুই একটি সরকারী বিধানে জমিদার ও প্রজাদের অনিষ্ট হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "অতএব সময় মতে আমাদের এক সমাজ স্থাপন করা উচিত হয়। এইরূপ সমাজের দ্বারা উপকার কেবল কলিকাতার মধ্যে হইবে এমত নহে কিন্তু তাবৎ দেশেরই হইবেক যেহেতুক দেশের নানা জিলার সঙ্গে এই সমাজের লিখন পঠন চলিতে পারিবে। এই সমাজের দ্বারা যাহার যে অনিষ্ট বিষয় অনায়াসে গভর্ণমেণ্টের নিকট জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। এমত উক্ত আছে যে একগাছি তৃণ অঙ্গুলির দ্বারা অনায়াসে ছিন্ন হইতে পারে কিন্তু অনেক তৃণ একত্র করিলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তি বন্ধন করিতে পারা যায়। অতএব প্রজা লোকের ঐক্য বাক্য হওয়া অতি উচিত এবং গভর্ণমেণ্টের কর্মকারকদের উপর চৌকি দেওনের নিমিত্ত এবং গভর্ণমেণ্টের নিকটে আমাদের দরখাস্ত জ্ঞাত করণের নিমিত্ত এমত এক সমাজ স্থাপন করা উপযুক্ত বোধ হয়।"

অতঃপর যথারীতি 'প্রস্তাব' ও 'প্রতিপোষকতার' পরে সর্বসম্মতিক্রমে "ভূম্যধিকারী সভা নাম্নী এক সভা" প্রতিষ্ঠিত ও "তাহার নিয়ম সকল নির্ধার্য্য করা" হইল। অতঃপর ডিকিন্স সাহেব 'অতি উত্তম' বক্তৃতা করিলেন এবং রামকমল সেন বলিলেন যে "এই বৈঠকের তাবৎ ব্যাপার বঙ্গভাষাতে প্রকাশ করিতে আমাদের কল্প আছে"। অতঃপর তাঁহার প্রস্তাবে ও কালীনাথ চৌধুরীর পোষকতায় ১২ জন সদস্য লইয়া একটি 'কর্মনির্বাহার্থ' কমিটি গঠিত হইল। "অপরাহ্ন চারি ঘণ্টা সময়ে বৈঠক আরম্ভ হয়", "আর সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময়ে, শ্রীযুত সভাপতির নিকটে বাধ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইল।" বর্তমান সভা-প্রণালীর নিয়ম কানুন—এমন কি Vote of Thanks—সকলই অনুসৃত হইল।[১১]

বাংলাদেশের সর্বপ্রথম না হইলেও উল্লেখযোগ্য প্রধান রাজনীতিক "সমাজ" (Political Association) হিসাবে ১৮৩৮ সনে প্রতিষ্ঠিত এই 'ভূম্যধিকারী সভা' বাংলার—তথা ভারতের—আধুনিক যুগের রাজনীতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। বর্তমানকালে আমরা যাহাকে 'জনসাধারণ' বলি তাহারা ইহার পশ্চাতে ছিল না। প্রধানত ভূম্যধিকারীর স্বার্থেই ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। অবশ্য সমাজের মূল বিধানে বলা হইয়াছে যে "এই সমাজ জাতি কি দেশ কি বর্ণ কিছু বিভেদ না করিয়া সর্বপ্রকার লোকের নিমিত্ত স্থাপন হইল অতএব তাহার বহির্ভূত কেহই থাকিবে না এবং দেশের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি ভূমি সম্পর্কীয় হন তিনি স্বচ্ছন্দে ঐ সমাজের অন্তঃপাতী হইতে পারেন।" কিন্তু কার্যতঃ 'ভূমি সম্পর্কীয়' অর্থে এখানে জমিদার, প্রজা নহে। সমাজের প্রত্যেক সদস্যকে ৫৲টাকা প্রবেশিকা এবং বার্ষিক ২০৲টাকা চাঁদা দিতে হইত। সেকালে এই টাকা দিয়া কোন সাধারণ প্রজার সদস্য হইবার সাধ্য বা সম্ভাবনা খুব বেশী ছিল না। সুতরাং এই সমাজ প্রধানতঃ যে জমিদারদের স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি রাখিত সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ না হইলে প্রজাদের ও সাধারণ ভাবে জনসাধারণের উপকার করাও যে সমাজের আদর্শ ও অভিপ্রায় ছিল—এবং তাহা কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছিল সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

মোটামুটিভাবে এই সমাজের কার্য পদ্ধতি গণতন্ত্র পদ্ধতিতেই পরিচালিত হইত। প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার সকল সদস্যেরা মিলিত হইতেন। ইহাদের গোপন ভোট (Ballot) দ্বারা ১২ জন সদস্য কর্মকারী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইতেন। প্রতি বৎসর ইহাদের মধ্যে চারিজন পদত্যাগ করিতেন এবং আবার সকল সদস্যদের গোপন ভোট দ্বারা তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করা হইত। প্রত্যেক জিলায় এই সমাজের শাখা প্রতিষ্ঠার জন্যও চেষ্টা করা হইত। মোটের উপর বাংলাদেশে—তথা ভারতে—'রাজনীতিক সভা বা সমাজ' যে প্রণালীতে গঠিত ও পরিচালিত হইত 'ভূম্যধিকারী সভা' তাহার পথপ্রদর্শক ছিল বলিলে কিছুমাত্র অতিরঞ্জন হইবে না।

নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম ছিল প্রথমে Zamindary Association। পরে ইহার নাম হয় Landholders' Society। ইহার প্রথম যুগ্ম অবৈতনিক (Honorary) সম্পাদক ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও Englishman পত্রিকার সম্পাদক William Cold Hurry। বস্তুতঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে ইংরেজ ও বাঙ্গালীর একযোগে কার্য করা এই সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—এ বিষয়েও ইহা পরবর্তী কালের পথপ্রদর্শক।

সে যুগের বাঙ্গালী নেতারা এই 'রাজনীতিক সমাজ' সম্বন্ধে কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন ১৮৬৮ সনে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের একটি ভাষণের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে তাহা কতকটা অনুমান করা যায় :—"এই সমাজই সর্বপ্রথমে জনসাধারণকে বিধিসঙ্গত উপায়ে (Constitutionally) নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ন্যায্য অধিকারের দাবি করা এবং এ বিষয়ে প্রকাশ্যে স্বাধীন মত প্রকাশের পথ প্রদর্শন করে। বাহ্যতঃ জমিদারের স্বার্থের দিকেই ইহার দৃষ্টি ছিল, কিন্তু জমিদার ও প্রজাদের স্বার্থ এমন ভাবে বিজড়িত যে একের উপকারে অন্যের উপকার, একের অপকারে অন্যের অপকার। সুতরাং এই সমাজের দ্বারা পরোক্ষে প্রজাদেরও স্বার্থ রক্ষা হইত।" এই উক্তি সর্বথা সত্য বলিয়া মানিয়া না লইলেও 'ভূম্যধিকারী সমাজের প্রতিষ্ঠাকে' এ দেশের রাজনীতিক আন্দোলন ও তাহার ফলে যে মুক্তি সংগ্রামের উদ্ভব হয় তাহার অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। কারণ এই সমাজ দ্বারা যে শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের রাজনীতিক লক্ষ্য ও আদর্শ অনেক প্রগতিশীল হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার সমর্থনে ১৮৩৯ সনের ৩০ নভেম্বর এই সমাজের অধিবেশনে ইংরেজ টার্টন যে বক্তৃতা করেন তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :

"ভারতীয়েরা ব্রিটিশের অধীনস্থ থাকে ইহা আমার ইচ্ছা নহে; তাহারা যাহাতে ইংরেজের সহিত সমান অধিকার লাভ করিয়া সর্বপ্রকারে তাহাদের সমকক্ষ ও সহযোগী হইয়া ইংরেজ রাজ্যের অন্য প্রজার ন্যায় জীবন ধারণ করিতে পারে তাহাই আমার কামনা। প্রাচীন রোম যেমন বিজিত রাজ্যের অধিবাসীদিগকে রোম নগরীর অধিবাসীর সমান অধিকার দিয়া ঐ সমুদয় রাজ্য রোমের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এক বিরাট সম্রাজ্য গঠিত করিয়াছিল, ইংলণ্ডও যাহাতে সেই মহান আদর্শ অনুসরণ করে তাহাই আমার ইচ্ছা।"[২০]

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে Durham Report-এর ভিত্তির উপর ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্গত ক্যানাডা প্রভৃতি উপনিবেশগুলি Dominion Status লাভ করে তাহা এই বক্তৃতার সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং টার্টন সাহেবের বক্তৃতা যে দূরদৃষ্টির পরিচায়ক এবং শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে যে এই আদর্শ গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরবর্তী একশত বৎসর কাল পর্যন্ত ভারতীয় নেতাদের রাজনীতিক দাবি এই Dominion Status ছাড়াইয়া যায় নাই। 'ভূম্যধিকারী সমাজেই' ১৮৩৯ সনে যে এই বাণী প্রচারিত হইয়াছিল তাহা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

আর একদিক দিয়াও 'ভূম্যধিকারী সমাজ' ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে। ১৮৩৯ সনে রামমোহন রায়ের বন্ধু মিঃ অ্যাডাম (Adam) ও জর্জ টমসন (George Thompson) ভারতীয়দের অবস্থার উন্নতির জন্য British India Society প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের অনেক বড় বড় শহরে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৪১ সনে অ্যাডাম সাহেবের সম্পাদনায় 'British India Advocate' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ভূম্যধিকারী সমাজের প্রাণস্বরূপ। তাঁহার অনুপ্রেরণায় এই সমাজ বিলাতের British India Societyর সহিত যোগ স্থাপন করে এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি ইহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১। নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করণের ব্যবস্থা রহিত করা।

২। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্রিটিশের ভারতীয় রাজ্যে সর্বত্র প্রচলিত করা।

৩। সর্বসাধারণের সুখ, সুবিধা ও আত্মরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, বিচার, পুলিশ, ও রাজস্ব বিভাগের সংস্কার সাধন করা।

৪। পতিত জমিগুলি সুবিধাজনক শর্তে ইজারা দেওয়া।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বহুবার—প্রায় প্রতি বাৎসরিক অধিবেশনেই—গভর্নমেণ্টের নিকট পাঠাইয়াছে। চতুর্থ প্রস্তাবটি সম্প্রতি, ১৩০ বৎসর পরে, স্বাধীন ভারতে বাংলার গভর্নমেণ্ট কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতেছে।

২। বেঙ্গল ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়া সোসাইটি
(Bengal British India Society)

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৪২ সনে বিলাত গিয়া বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। কিন্তু তিনি ভারতের শাসন সংস্কারের কথা প্রচার করিতে ভোলেন নাই। অনেকটা এই উদ্দেশ্যেই তিনি পূর্বোক্ত জর্জ টমসনকে ভারতে আনিবার ব্যবস্থা করেন। দুই জনেই এক জাহাজে ১৮৪২ সনের ডিসেম্বর মাসে ভারতে পৌঁছেন। ১৮৪৩ সনের ১১ জানুআরি 'জ্ঞানোপার্জিকা সভার' মাসিক অধিবেশনে টমসন সাহেব এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ইহা ছাড়াও তিনি বাংলা দেশে আসিয়া অনেকগুলি বক্তৃতা করেন। সৌভাগ্যের বিষয় এগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমসাময়িক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার অনেকগুলি এখনও দুর্লভ নহে। এই সকল বক্তৃতা হইতে বেশ বোঝা যায় যে টমসন সাহেব সত্যই

ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী ও দরদী বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে যাহাতে বৃটিশ শাসনের সকল ত্রুটি দূর করিয়া ভারতীয় প্রজাদের সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় ইহার জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, ভারতের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লোকের অজ্ঞতা দূর করা। ইংলণ্ডের লোকই পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নির্বাচন করে, এবং ভারত শাসন বিষয়ে পার্লিয়ামেণ্টই সর্বময় কর্তা। ইংলণ্ডের লোকেরা ভারতের কল্যাণ কামনা করে, "কিন্তু তাহারা এদেশের বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত না থাকায় এদেশে ইংরেজ শাসনের দোষ শোধনের উপায় করণে অক্ষম।" "এখানকার গভর্নমেণ্ট এদেশের লোকদিগের সুখের নিমিত্ত আবশ্যক নিয়ম করণে অক্ষম অথবা অনিচ্ছুক; অতএব মহাপরাক্রান্ত পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্য সকল যাঁহাদিগের মতানুসারে নিষ্পন্ন হয় ঐ বিষয়ে তাহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে মহৎ পরিবর্ত্তন হইতে পারে কেন না রাজকীয় ব্যাপারে তত্রস্থ প্রজাদিগের ক্ষমতা আছে এবং তাহারাই পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য নিযুক্ত করেন ইহাতে ঐ পার্লিয়ামেণ্টে স্বাধীন ও বুদ্ধিমান একত্রিত বহু প্রজার ন্যায্য প্রার্থনা অধিককাল অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

'আমি ভরসা করি ইংলণ্ডের লোকেরা অধীনস্থ প্রজার সুখ বৃদ্ধি বা উন্নতির নিমিত্ত তাহাদের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়া যৎকালে তদ্রূপ ব্যবহার করিবেন সেই সময় অতি শীঘ্রই উপস্থিত হইবে। ইহার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমি এদেশের প্রাকৃতিক শোভা ও প্রাচীন আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি দর্শনের জন্য এদেশে আসি নাই। এদেশের বর্তমান অবস্থা এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে কি উপায়ে ইহার মঙ্গল হইতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ জানিবার জন্যই আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছি।

'আমার এতদ্দেশে আগমনের আর এক তাৎপর্য্য এই, এদেশের যদি কোন দুঃখজনক বিষয় বা নিয়ম থাকে এবং যদি ব্যবস্থাপকদের দ্বারা তন্নিবারণ হইবার সম্ভব হয় তবে এখানকার বুদ্ধিমান লোকেরা যাহাতে স্বয়ং আত্মদুঃখ বর্ণন করেন তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিব।...অতএব আমি আপনাদিগকে ব্যগ্রতা পূর্ব্বক কহিতেছি আপনারা স্বদেশের মঙ্গলার্থে বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ করিয়া স্বয়ং চেষ্টা করুন এবং এদেশের তাবৎ বৃত্তান্ত সংকলন পূর্ব্বক শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া প্রথমে এখানকার গভর্নমেণ্টের নিকট বিজ্ঞাপন করিয়া পরে ইংলণ্ডের লোকদিগের নিকট প্রেরণ করুন, কিন্তু এবিষয়ের জন্য সকলে একমত হইয়া এক সভা স্থাপন করা আবশ্যক বোধে আমি কহিতেছি, আপনারা বিবেচনা করুন নানা বিষয়ের

অনুসন্ধানার্থে একটা সভা স্থাপন করা কর্ত্তব্য কিনা তাহাতে আপনারা বিবিধ বিষয়ের সন্ধান পাইবেন এবং আপনাদের পরস্পর মিল ও ঐক্য থাকিবেক।"[২১]

টমসন সাহেব এদেশের রাজনীতিক চেতনা ও প্রয়াস বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন উনিশ শতকে আরও কয়েকজন সদাশয় ভারতবন্ধু ইংরেজও তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত এদেশের রাজনীতি আন্দোলনের ধারা তাঁহাদের প্রদর্শিত পথেই প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

১৮৪৩ সনের ৬ এপ্রিল তারিখে পুনরায় টমসন কলিকাতায় একটি বক্তৃতায় একটি নূতন রাজনীতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা ব্যক্ত করেন। ইহা কেবল ভূম্যধিকারীর সভা না হইয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সভা হইবে—এবং ইহার উদ্দেশ্য হইবে সর্বশ্রেণীর প্রজার ন্যায্য অধিকার ও দাবি প্রতিষ্ঠা দ্বারা তাহাদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা ও ভারতের শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার এবং অন্য যে কোন ন্যায্য ও আইন-সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা। টমসনের বক্তৃতার পরে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইহার সমর্থন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কলিকাতার বাহিরে বিচার বিভ্রাট, গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নানা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং ১৮৩৩ সনের অনুশাসন সত্ত্বেও উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ না হওয়া প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে প্রবল জনমতের সৃষ্টি না হইলে ইংরেজ শাসনের এই সকল গুরুতর দোষ-ত্রুটির সংশোধনের কোন আশা নাই, এবং এইরূপ জনমত গঠন করাই প্রস্তাবিত নূতন সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য।

ইহার ফলে ১৮৪৩ সনের ২০ এপ্রিল টমসনের সভাপতিত্বে এক প্রকাশ্য সভায় 'Bengal British India Society' নামক নূতন এক রাজনীতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার সভাপতি হইলেন জর্জ টমসন। G. F. Remfrey ও রামগোপাল ঘোষ ইহার সহকারী সভাপতি এবং প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত সভার কার্য চালাইতেন এবং ভারত সরকার ও লণ্ডনের British Indian Society—এ উভয়ের সহিত বহু পত্রালাপ করিতেন। অনেকে মনে করেন যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ প্রথা এবং অন্য কয়েকটি শাসন সংস্কার প্রধানতঃ এই নূতন রাজনীতিক সমাজের চেষ্টারই সুফল। সরকারী কার্যে আরও অধিক সংখ্যক ভারতীয়

নিয়োগ এবং আদালতে দেশীয় ভাষার ব্যবহার প্রভৃতি সংস্কারের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করা হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়ৎগণের দুরবস্থা বাড়িয়াছে এই মর্মে প্রবন্ধ লেখেন। সম্ভবতঃ এই কারণে রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি Bengal British India Society স্থাপনে কোন প্রকার সাহায্য করেন নাই এবং ১৮৪৩ হইতে ১৮৫০ সন পর্যন্ত এই সমাজ ও পূর্বে প্রতিষ্ঠিত Landholders' Society (ভূম্যধিকারী সমাজ) অনেকটা পরস্পর-বিরোধী ছিল। টমসন উভয়ের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।

৩। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (British Indian Association)

১৮৫০ সনে ইহার কোনটিই বিশেষ কার্যকরী ছিল না। কিন্তু দুইটি ঘটনায় বাংলার মুমূর্ষু রাজনীতিক আন্দোলন আবার সক্রিয় হইয়া উঠিল। প্রথমটি হইল ১৮৪৯ সালের 'কালো আইন'।

এযাবৎ কাল পর্যন্ত ইংরেজ জাতীয় কেহ বাংলা দেশে বাস করিলে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্ট ভিন্ন অন্য কোন আদালতে তাহার বিচার হইত না। ইহার ফলে মফঃস্বলের লোকেরা ইংরেজরা কোন অবৈধ কার্য করিলেও তাহার প্রতীকার পাইত না—কারণ সে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া অভিযোগ করা যেমন ব্যয়-সাধ্য তেমন আয়াস-সাধ্য ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই তাহা সম্ভব ছিল না এবং নীরবে অত্যাচার সহ্য করা ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর ছিল না। এই কুব্যবস্থা রহিত করিবার জন্য আইন সদস্য মিঃ বেথুন (Bethune) ১৮৪৯ সনে চারিটি নূতন আইনের খসরা (Bill) উপস্থাপিত করেন। কিন্তু ইংরেজগণ এই 'কালো আইনের' (Black Act) বিরুদ্ধে এমন তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিল যে গভর্নমেণ্ট এই 'বিল'গুলি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। শিক্ষিত বাঙ্গালীরা ইহাতে মর্মাহত হইল—এবং ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনীতিক আন্দোলনের মূল্য বুঝিতে পারিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হইল কোম্পানির নূতন সনদ প্রাপ্তি।

ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের যে সনদের বলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারত শাসন করিতেন তাহার মিয়াদ থাকিত মাত্র বিশ বৎসর। সুতরাং প্রতি বিশ বৎসর

অন্তর নূতন সনঁদ দেওয়া হইত। ১৮৩৩ সনে যখন শেষ সনদ দেওয়া হয় তাহার কিছু পূর্বে রামমোহন রায় বিলাত যান এবং অনেকটা তাঁহার চেষ্টায় ঐ সনদে ভারতবাসীর সুবিধাজনক কয়েকটি ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং ১৮৫৩ সনে পুনরায় নূতন সনদ দিবার পূর্বে ভারতবাসীর অভাব অভিযোগগুলি ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের নিকট উপস্থিত করিতে পারিলে অনেক সুফল হইবার সম্ভাবনা—এবং ঐক্যবদ্ধ-ভাবে কোন বিশিষ্ট রাজনীতিক সমাজের পক্ষ হইতে শাসন সংস্কারের দাবি না করিলে বিশেষ কোন ফল হইবে না—এই চিন্তা বাঙ্গালীর রাজনীতিক উদ্যম পুনরুজ্জীবিত করিল।

ইহার ফলে ১৮৫১ সনের ১৪ সেপ্টেম্বর (মতান্তরে ১৯ সেপ্টেম্বর) National Association বা 'জাতীয় সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার দেড়মাস পরে (২৯ অক্টোবর, ১৮৫১) British Indian Association (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) প্রতিষ্ঠিত হইল। তুইটিরই সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথমটি সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন সম্বাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু দ্বিতীয়টি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং এখন পর্যন্তও—অন্ততঃ নামে মাত্র—টিকিয়া আছে। সুতরাং মনে হয় যে এই তুটি একই 'সমাজ', কেবল নাম পরিবর্তন হইয়াছিল মাত্র। অনেকের মতে ইহার কারণ এই যে 'জাতীয়' এই শব্দটি প্রাচীন-পন্থী জমিদারেরা পছন্দ করিতেন না—কারণ ইহাতে ইংরেজ শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিবার ইঙ্গিত আছে—বিশেষতঃ এই সমাজের প্রতিষ্ঠা পত্রে 'রাজভক্তি সূচক' কোন কথা ছিল না। দ্বিতীয় 'সমাজের' উদ্দেশ্য সূচক পত্রে বিধিসঙ্গত ভাবে ইংরেজ শাসনের সংস্কারের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আর একটি প্রভেদও লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমটিতে এবং ইহার পূর্বে এই জাতীয় সভায় বা সমাজে ইংরেজ সভ্য ছিলেন—কিন্তু দ্বিতীয়টিতে কোন ইংরেজই যোগদান করেন নাই। ইহা এবং পূর্বোক্ত 'জাতীয় সমাজের' প্রতিষ্ঠা সম্ভবতঃ 'কালো আন্দোলনে' ইংরেজ ও ভারতীয়দের বিরোধিতার ফল। সম্ভবতঃ এই কারণেই পূর্বোক্ত "ভূম্যধিকারী সমাজ" ও Bengal British India Society-ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপ-যোগিতা উপলব্ধি করিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়শনের সহিত যুক্ত হইল। অন্ততঃ তাহাদের পৃথক অস্তিত্বের আর কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম উদ্বোধনী সভায় ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ দান সম্বন্ধে বিলাতের পার্লিয়া-মেণ্টে বিচারবিতর্কের সময় যাহাতে ভারতের শাসন সংস্কার হয় এবং লোকের

সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয় সে সম্বন্ধে আবেদন করা, এবং এই উদ্দেশ্যে ভারত ও ইংরেজ গভর্নমেণ্টের নিকট মাঝে মাঝে আবেদনপত্র প্রেরণ করা। ইহার প্রধান কর্মকারক ছিলেন :

সভাপতি—রাজা রাধাকান্ত দেব ; সহকারী সভাপতি—রাজা কালীকৃষ্ণ দেব (শোভাবাজার) ; সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; সহকারী সম্পাদক—দিগম্বর মিত্র।

কার্যকরী সমিতির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, রামগোপাল ঘোষ, হরিমোহন সেন প্রভৃতি।

রাধাকান্ত দেব তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সভার সভাপতি ছিলেন, পরে ১৮৬৭ সনে প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ ঠাকুর সভাপতি হন (১৮৬৯—১৮৭৯)। দেবেন্দ্রনাথের পরে পাইকপাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক ছিলেন। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস পাল প্রথমে সহকারী সম্পাদক—পরে ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৪ সন পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কার্যকারিতায় এই অ্যাসোসিয়েশন বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করে। হরিশ্চন্দ্র মুখার্জীও ইহার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার সম্পাদিত Hindu Patriot পত্রিকা ইহার মুখপত্ররূপে পরিগণিত হইত। এই অ্যাসোসিয়েশনের অনুরোধে ও অনুপ্রেরণায় মাদ্রাজ ও বম্বেতে অনুরূপ ও 'সহযোগী' প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। মাদ্রাজের প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শাখারূপেই কল্পিত হইয়াছিল পরে স্বতন্ত্র হয়।

১৮৫২ সনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টের নিকট ভারতের নানাবিধ শাসন সংস্কারের প্রস্তাব সম্বলিত এক সুদীর্ঘ আবেদনপত্র প্রেরণ করে। ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনের ও মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ইহা একখানি অমূল্য দলিল পত্র বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। কারণ উনিশ শতকের মধ্যভাগে—সিপাহী বিদ্রোহ অথবা ভারতের প্রথম মুক্তি সংগ্রামের এবং ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের ৩৩ বৎসর পূর্বে বাংলার রাজনীতিক চেতনা কতদূর প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, এবং পরবর্তী অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত ভারতের রাজনীতিক চিন্তার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—এই আবেদনপত্রখানিতে তাহার স্পষ্ট প

প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এ স্থলে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ভারতের ব্রিটিশ শাসিত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে একযোগে রাজনীতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা এবং ইহা কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এই নাম গ্রহণ ও মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের সহিত এবিষয়ে সহযোগিতা স্থাপন যে উন্নত রাজনীতিক মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় ইহার পূর্বে ভারতে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এইজন্য এই আবেদনপত্রে যে সকল শাসন সংস্কারের দাবি করা হইয়াছিল বিভিন্ন দফায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। বলা বাহুল্য আবেদনপত্রখানি এত সুদীর্ঘ যে মূল পত্রখানি উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে এবং তাহা পাঠ না করিলে এ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত ও যথার্থ ধারণা করা যাইবে না।[২২]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং অন্যান্য ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে ১৮৫২ সনে এই মর্মে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করা হয় যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতশাসনের জন্য নূতন সনদ দিবার পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যেন বিবেচনা করা হয়।

১। যাহাদের হাতে শাসনের দায়িত্ব তাহাদের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকিলে প্রজার স্বার্থের হানি হয় সুতরাং এই দুইটি পৃথক করা দরকার। আইন প্রণয়নের জন্য যে পৃথক বিধান পরিষদ গঠিত হইবে তাহার মধ্যে জনসাধারণের প্রতিনিধি রাখা আবশ্যক, যাহাতে ইহা লোকের দুঃখ, অভাব, অভিযোগ প্রভৃতি বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারে।

বর্তমানে আইন প্রণয়ন, কর নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যাপারে লোকের কোন মতামত নেওয়া হয় না এবং তাহাদের অভিযোগ প্রতিবাদ প্রভৃতিতে কর্ণপাত করা হয় না। সুতরাং ব্রিটিশ সম্রাটের অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে আইন প্রণয়নের জন্য যেরূপ বিধান পরিষদ (legislature) আছে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষেও সেইরূপ পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। অতএব আবেদনকারীরা প্রস্তাব করিতেছে যে ১৭ জন সদস্য লইয়া কলিকাতায় এরূপ একটি বিধান পরিষদ গঠিত হউক। বাংলা, বম্বে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে তিনজন করিয়া ভারতীয় নির্বাচিত হইবেন এবং প্রতি গভর্নর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী মনোনীত করিবেন। ব্রিটিশরাজ একজন আইনজ্ঞ লোক মনোনীত করিবেন। তিনিই বিধান পরিষদের সভাপতি হইবেন। যাহাতে সদস্যেরা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারে তাহার জন্য এরূপ নিয়ম থাকিবে যে প্রতি সদস্য পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন, নিয়মিত বেতন পাইবেন, অন্য কোন চাকুরী

করিতে পারিবেন না, এবং এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ রাজাও তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। তবে কোন সদস্য অপরাধ করিলে ফৌজদারী আদালতে তাহার বিচার হইতে পারিবে। এই পরিষদের অধিবেশন ও আলোচনা প্রকাশ্যভাবে হইবে। বর্তমানে সপারিষদ বড়লাটের হাতে আইন প্রণয়নের যে ক্ষমতা আছে এই পরিষদেরও তাহা থাকিবে—তবে তাহাদের প্রণীত আইনগুলি সপারিষদ বড়লাটের অনুমোদন সাপেক্ষ হইবে। তাহারা অনুমোদন না করিলে পরিষদ ইচ্ছা করিলে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের নিকট আপীল করিতে পারিবে। যতদিন পর্যন্ত ভারতীয়েরা নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে অক্ষম বলিয়া বিবেচিত হইবে—ততদিন পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট এই বিধান পরিষদের সদস্যদিগকে মনোনীত করিবে তবে কোন মনোনীত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে জনসাধারণ আপত্তি করিতে পারিবে এরূপ লিখিত নিয়ম থাকিবে।

এই বিধানসভা যে সমুদয় আইন প্রণয়ন করিবে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরেরা তাহা নাকচ করিতে পারিবেন না। সে ক্ষমতা কেবল ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের হাতে থাকিবে। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট এইরূপ নাকচ করিবার বা ভারত সম্বন্ধে নূতন আইন প্রণয়ন করিতে হইলে এক বৎসর পূর্বে ইহার বিজ্ঞপ্তি দিবেন যাহাতে ভারতীয় বিধানসভা ও ভারতের অধিবাসীরা এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ পায়।

২। অর্থের অভাবের অজুহাতে অনেক প্রয়োজনীয় সংস্কার স্থগিত রাখা হইয়াছে। বড়লাট, তাঁহার পরিষদের সদস্য, এবং ছোটলাটদের বেতন ও ভ্রমণ প্রভৃতির জন্য যে টাকা ব্যয় হয় তাহা অনেক কমাইলেও শাসন কার্যের কোন অবনতি হইবার সম্ভাবনা নাই। দেশীয় রাজ্যগুলিতে যে সমুদয় রেসিডেণ্ট (Resident) আছেন তাঁহাদের জন্য অযথা বহু খরচ হয়। এই সমুদয় কমাইলে প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য অর্থ পাওয়া যাইবে।

বর্তমানে ইংরেজ বড় কর্মচারীরা অত্যধিক, এবং দেশীয় কর্মচারীরা অতিশয় কম বেতন পান। প্রথমটি কমাইয়া দ্বিতীয়টির বৃদ্ধি করাই সঙ্গত। দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে যে উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীরা মাসিক পাঁচ হইতে আট হাজার টাকা বেতন পান আর গরীব ভারতীয় কেরানীরা পায় ত্রিশ টাকা।

৩। যে ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে পুলিশের কার্য তদন্ত করেন তাঁহারই হাতে ফৌজদারী মামলার বিচারভার থাকায় বিচার বিভ্রাট হয়। সুতরাং এই ব্যবস্থা রহিত করা আবশ্যক।

৪। লবণ নিত্যব্যবহার্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য। ইহার ব্যবসায়ে গভর্নমেণ্টের একচেটিয়া অধিকার থাকায় লোকের নানারূপ ক্ষতি হয় এবং লবণের দর অযথা বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে বিলাতী লবণের আমদানি বাড়িতেছে। লোনা জলের নিকটবর্তী জমি চাষের অযোগ্য অথচ প্রজারা লবণ তৈরী করিলে তাহাদের গুরুতর অর্থদণ্ড দিতে হয়।

৫। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য আবকারি দোকানের লাইসেন্স দেওয়ার ফলে মাদক দ্রব্য ব্যবহারের প্রসার হয়। ইহা দুর্নীতির পরিপোষক। মোকদ্দমা করিতে হইলে ষ্ট্যাম্প কিনিতে হয়। ইহা দরিদ্রের পক্ষে বিচারের জন্য আদালতের আশ্রয় লাভে যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করে।

৬। ভারতে ইংরেজের সংখ্যা খুবই কম—হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি। সুতরাং সাধারণ রাজস্ব হইতে খ্রীষ্ট ধর্মের গির্জা, বিশপ ও অন্যান্য পাদ্রীদের ব্যয় বহন করা অসঙ্গত। ইহা রহিত করা হউক। এক কথায় Secular State হউক—অর্থাৎ গভর্নমেণ্ট কোন ধর্মকেই আর্থিক সাহায্য করিবে না।

এতদ্ব্যতীত আবেদনপত্রে আরও বহু প্রয়োজনীয় শাসন সংস্কার সাধনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য: রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস; ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সাধন; দেশের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য নানারূপ সরকারী প্রচেষ্টা; বিচার বিভাগে উপযুক্ত লোকের নিয়োগ; ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে যোগ্য ব্যক্তি পুলিশ বিভাগে গ্রহণ; শিক্ষার বিস্তার; অন্যান্য সভ্য দেশে জনসাধারণের যে সমুদয় আইনগত অধিকার আছে তাহার প্রবর্তন।

এই আবেদনপত্রে ৫,৯০০ লোকের স্বাক্ষর ছিল। ১৮৫৩ সনের এপ্রিল মাসে ইহা বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে দাখিল করা হয়।

বম্বে ও মাদ্রাজ হইতেও ভিন্ন ভিন্ন আবেদনপত্র পাঠান হইয়াছিল। এই সমুদয় আবেদনপত্রে বিশেষ কিছু ফল হয় নাই, তবে এগুলি একেবারে নিষ্ফল হইয়াছিল এরূপ মনে করিবারও কারণ নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকটি দাবি বা প্রার্থনা আংশিক ভাবে ১৮৫৩ সনের নূতন সনদে গৃহীত হইয়াছিল। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:

(১) প্রার্থনা ছিল যে প্রতি ২০ বৎসরের পর না হইয়া প্রতি দশ বৎসর অন্তর ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ পরিবর্তন হউক।

ফল—এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন সময়ের উল্লেখ করা হইল না।

(২) বড়লাট পরিষদ হইতে স্বতন্ত্র বিধানসভার প্রার্থনা মঞ্জুর হইল, কিন্তু ইহাতে ভারতীয় সভ্য থাকিবে এরূপ কোন নির্দেশ ছিল না।

(৩) প্রার্থনা ছিল যে বাংলার জন্য একজন স্বতন্ত্র গভর্নর করা হউক (এতদিন পর্যন্ত বড়লাটই ইহার শাসনকর্তা ছিলেন)। নূতন সনদে বাংলার জন্য একজন লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর নিয়োগের ব্যবস্থা হইল।

(৪) সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত একত্র করার প্রার্থনা মোটামুটি গৃহীত হইল।

বিফলমনোরথ হইলেও অ্যাসোসিয়েশন তাহাদের প্রস্তাবিত এবং অন্যান্য নানাবিধ সংস্কার, বিশেষতঃ নূতন বিধান সভায় ভারতীয় সদস্য নিয়োগ, সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ আবেদন করিতে বিরত হইল না। বিলাতে এই সমুদয় আন্দোলন করিবার জন্য তাহারা এজেণ্ট নিয়োগ করিল। প্রথম তিন বৎসরে এই বাবদ বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রধানতঃ হিন্দু শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মিলন ক্ষেত্র ছিল। গভর্নমেণ্ট ইহাকে যথেষ্ট মর্যাদা দিত। যদিও, অন্ততঃ কিছুকাল পর্যন্ত, জমিদার শ্রেণীর প্রভাব খুব বেশী ছিল, তথাপি জমিদারদের বিশেষ স্বার্থ ছাড়া সাধারণভাবে রাজনৈতিক সংস্কার দ্বারা জনসাধারণের সর্ববিধ উন্নতি সাধন, এবং তাহাদের রাজনীতিক চেতনা ও শাসন ব্যাপারে ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে সর্বদাই ইহার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তথাপি দুই শ্রেণীর বাঙ্গালী ইহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না। প্রথমতঃ, একদল শিক্ষিত বাঙ্গালী মনে করিত যে, যে নিম্নবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায় সংখ্যায় দেশের শতকরা নব্বই জন তাহাদের এই সভায় কোন স্থান ছিল না এবং তাহাদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে ইহা যথেষ্ট সচেতন ও সক্রিয় ছিল না।

এই মনোবৃত্তির ফলেই ক্রমে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে আরও নূতন নূতন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। এ বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে তাহাদের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিত না। ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রাজনীতিক ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে দিবার প্রস্তাবেই সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র বিধান সভা সম্বন্ধে ১৮৫২ সনে পার্লিয়ামেণ্টে সাক্ষ্যদান কালে মিঃ হ্যালিডে বলেন যে এরূপ বিধান

পরিষদের সদস্য হইবার উপযুক্ত ভারতীয় আছেন, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ এত গুরুতর যে কোন ব্যক্তিকেই সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। লর্ড এলেনবরা ইহার অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব করেন যে আইন প্রণয়নের জন্য হিন্দু ও মুসলমানের দুইটি পৃথক পরামর্শ সমিতি গঠন করা হউক। প্যারীচাঁদ মিত্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম ও সমাজের ব্যাপারে গুরুতর প্রভেদ থাকিলেও, যে সকল শাসনসংক্রান্ত নীতি আইন-পরিষদে আলোচিত হইবে তাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ ও দৃষ্টি-ভঙ্গীতে কোনই তফাৎ নাই। কিন্তু হ্যালিডের মত যে কেবল মুষ্টিমেয় ইংরেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে, এদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ও ইহা বিশ্বাস করিত। ইহার ফলেই পৃথক ভাবে কেবল মুসলমানদের জন্য 'কলিকাতার মহমেডান অ্যাসো-সিয়েশন' (Muhammadan Association of Calcutta) প্রতিষ্ঠিত হইল। আরও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ১৮৫৬ সনের ৩১ জানুয়ারী এক প্রস্তাবে এই মুসলমান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করিল, এবং কিছু দিন পরে ইহার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দিল। প্যারীচাঁদ মিত্র যাহাই বলুন, বাংলার সর্বপ্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান পরোক্ষ ভাবে প্রকাশ্যে স্বীকার করিল যে রাজনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারেও হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের স্বার্থ, আদর্শ, ও উদ্দেশ্য অভিন্ন নহে। ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিবার কিছুই নাই। কারণ উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলার সাময়িক পত্রে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য ও মধ্যযুগের মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে একটি কঠোর মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিংশ শতকে হিন্দু-নেতাগণ গদ গদ ভাষায় আবহমান কাল হইতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ভ্রাতৃ-ভাব পরিকল্পিত করিয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেন, তাহা যে কত বড় মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত উনিশ শতকের বাংলার সাহিত্য ও ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। এ সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে—এবং পরেও হইবে।

খ। দ্বিতীয় পর্ব (১৮৫৮—১৯০৫)

১। জাতীয়তাভাবের বিকাশ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে জাতীয়তা ভাবের উন্মেষের পরিচয় পাওয়া যায়, শেষার্ধে তাহা প্রায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই জাতীয়তাভাব ও রাজনীতিক

আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ। একের বৃদ্ধিতে অপরের গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। সুতরাং প্রথমে এই জাতীয়তাভাবের বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জাতীয়তাভাবের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ কি তাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। কতকগুলি কারণে ধীরে ধীরে উনিশ শতকের শেষার্ধে ইহার স্ফুরণ হইতে থাকে। ইহার মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, এবং রেলওয়ে টেলিগ্রাফ পোষ্ট অফিস প্রভৃতির দ্বারা এই বিশাল উপ-মহাদেশের বিভিন্ন অংশে গমনাগমন ও পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধা সর্বপ্রধান বলা যাইতে পারে। ইহার ফলে বহু প্রদেশের মধ্যে বিভিন্ন ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান দূর হইয়া পরস্পরের মধ্যে স্বচ্ছন্দে মনোভাব ব্যক্ত করা সম্ভবপর হয়—এবং প্রত্যক্ষ ভাবে সাক্ষাৎ ও আলাপ করার সুযোগ সুবিধা হয়। এইরূপে ভারতবাসীর মধ্যে যে ঐক্যের ভাব এতদিন কেবলমাত্র একটি ভাবগত আদর্শ মাত্র ছিল বাস্তব জীবনে তাহা রূপায়িত হইতে থাকে। একই ইংরেজ শাসনের অধীনে থাকায় এবং তাহার সর্বপ্রকার সুবিধা, অসুবিধা ও সুখদুঃখের তুল্য অংশীদার হওয়ায় এই ঐক্যের ভাব আরও বৃদ্ধি পায়।

আরও একটি বিশেষ কারণে হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই জাতীয়তা ও ঐক্যের ভাব জাগিয়া ওঠে। অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগেও মুসলমানেরা ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাগের উপর আধিপত্য করিত—হিন্দুরা তাহাদের অধীন ছিল। এই ঐতিহাসিক স্মৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ ঐক্য, জাতীয়তা ও স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা জোগাইয়াছিল—ওয়াহাবী আন্দোলনে তাহার প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে মারাঠা ছাড়া অন্য কোন হিন্দুর মনে এইরূপ কোন ঐতিহাসিক স্মৃতি ছিল না। এবং বাংলা হইতে রাজস্থান পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে মারাঠারা হিন্দুর উপর যে অত্যাচার করিয়াছিল তাহার নির্মম স্মৃতি হিন্দুস্থানে মারাঠার গর্বে গর্ব করিবার পক্ষে বিষম অন্তরায় ছিল। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে, প্রধানতঃ ইউরোপীয়দের চেষ্টায়, মুসলমান আক্রমণের পূর্বে হিন্দুদের যে গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল তাহার লুপ্ত স্মৃতি পুনরায় জাগরূক হয়। বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনার ফলে ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি ইউরোপীয় মনীষিগণ প্রাচীন হিন্দুর সহিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীক ও রোমক এবং বর্তমান কালের ইউরোপের ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি জাতির যে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ উদ্ঘাটিত করেন, এবং জগতের এই সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দুর

বেদ যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য, এবং উপনিষদ প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রাচীন হিন্দু যে একদিন মানবজাতির শিক্ষাগুরুর পদে অধিষ্ঠিত ছিল, এই সত্য প্রচার করেন, তাহার ফলে আসমুদ্র হিমাচল এই বিশাল দেশের কোটি কোটি হিন্দুর মধ্যে যে প্রাচীন গৌরব-সূত্রের অচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপিত হয় তাহা সমগ্র হিন্দুদের ঐক্য ও জাতীয় ভাবের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। ২২০০ বৎসর পূর্বে মৌর্য সম্রাট অশোক যে প্রায় সমগ্র ভারত ও হিন্দুকুশ পর্যন্ত ভূভাগ শাসন করিতেন এই তথ্য বহু সংখ্যক শিলাস্তম্ভ ও পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিদ্বারা লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকটিত হয়—এবং সেই সুদূর প্রাচীন কালে যে এক ভাষা, এক লিপি, এক ধর্ম, ও এক রাজ্যশাসন সমগ্র ভারতে প্রচলিত ছিল এই সত্যও প্রমাণিত হয়। প্রত্নানুসন্ধানের ফলে ভূগর্ভ হইতে অপরূপ শিল্পকলার নিদর্শন স্বরূপ মন্দির, দেব-মূর্তি, স্তম্ভ, ভাস্কর্য প্রভৃতির আবিষ্কারে হিন্দুদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি মহামহিমময় চিত্র জগতের সম্মুখে প্রতিভাত হয় এবং হিন্দুর অতীত ঐশ্বর্য ও গৌরব সমগ্র জগতে স্বীকৃতি লাভ করে। এই সমুদয়ের ফলে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয়তার ভাব বৃদ্ধি পায়।

বাংলা দেশে এই জাতীয়তাভাবের পরিচয় পাওয়া যায় সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই। এই কালগত সম্বন্ধ ছাড়া এ দুয়ের মধ্যে যে ভাবগত কোন সম্বন্ধ ছিল এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, যে রাজনারায়ণ বসু বাংলায় প্রথমে প্রকাশ্যে এই জাতীয়তার ভাব প্রচার করেন, তিনি যে সিপাহীদের বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিদ্বেষভাবই পোষণ করিতেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

১৮৬৬ সনে রাজনারায়ণ বসু "Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal" (স্বজাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ-সঞ্চারিণী সভা)[২২ক] এই নামে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়া একখানি ক্ষুদ্র ইংরেজী অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার করেন। সে যুগের বাঙ্গালীর মনে ইহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ১৮৭৬ সনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'স্বদেশানুরাগ' নামক একটি প্রবন্ধ হইতে তাহার কতকটা ধারণা করা যায়। ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে স্বদেশানুরাগ কিরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে সে সম্বন্ধে প্রবন্ধকার লেখেন :

"প্রথমে যখন ইংরাজী শিক্ষা এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হয় তখন ইংরাজীতে কৃত-

বিদ্য ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষ করিতেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু আচার ব্যবহার সকলই অপকৃষ্ট নহে, ইহা এক্ষণকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোকেরা ক্রমে অনুভব করিতেছেন। এক্ষণে ভারতের প্রাচীন মহিমা এবং হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু আচার ব্যবহারের প্রশংসাসূচক বক্তৃতা হইলে তাহারা উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। এক্ষণকার লোকে প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছে, যে হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বর বিষয়েও এমত সকল ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহা অন্য কোন জাতির ধর্ম্মপুস্তকে পাওয়া যায় না, এবং এমন সকল সুরীতি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে যাহা অন্য কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই। লোকের মনে স্বদেশানুরাগ ক্রমে বিলক্ষণরূপে সঞ্চারিত হইতেছে। দেশীয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের প্রতি পূর্ব্বকার বিদ্বেষভাব ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ আমরা নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি।

প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উৎসাহে ও যত্নে "ন্যাশন্যাল পেপর" অর্থাৎ "স্বজাতীয় সম্বাদপত্র" প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ সম্বাদপত্রকে তিনিই উক্ত নাম প্রদান করেন। ঐ আখ্যা প্রদান অল্প কার্য্যকর হয় নাই। তৎপরে প্রায় দশ বৎসর হইল "স্বজাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ সঞ্চারিণীসভা সংস্থাপনের প্রস্তাব" নামক একটি প্রস্তাব ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। তাহাতে হিন্দু ব্যায়াম, হিন্দু সঙ্গীত, হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যা এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনী, যত পারা যায় বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিয়া আমাদিগের কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদনা, বাঙ্গালা ভাষায় পরস্পর পত্রলেখা এবং বাঙ্গালীর সভাতে বাঙ্গলায় বক্তৃতা করা, সুরাপানাদি বিদেশীয় অনিষ্টকর প্রথা এতদ্দেশে যাহাতে প্রচলিত না হয় তাহার উপায় অবলম্বন করা, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করা, স্বদেশীয় সুপ্রথা সকল রক্ষা করা, নমস্কার প্রণামাদি স্বদেশীয় শিষ্টাচার পালন করা, বিদেশীয় রীতিতে পরিচ্ছদ পরিধান ও আহার কার্য্য সম্পাদন পরিত্যাগ করা, দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় করা ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়। ঐ প্রস্তাবটি সমুদায় আমরা এই পত্রিকায় উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। উক্ত পুস্তিকায় উল্লিখিত বিষয় সকল প্রস্তাবিত হইয়াছিল মাত্র। প্রস্তাব লেখকের প্রস্তাব সকল কখনই কার্য্যে পরিণত হইত না যদ্যপি হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভাসংস্থাপক মহাশয় উহা অবলম্বন করিয়া হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন না করিতেন। উক্ত পুস্তিকা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেও কোন উপলক্ষে সমস্ত হিন্দুবর্গকে মধ্যে মধ্যে একত্রিত করিবার এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের

মধ্যে সদ্ভাব ও ঐক্য সঞ্চার করিবার ভাব হিন্দুমেলা সংস্থাপকের মনে উদিত হইয়াছিল। জাতীয় সভায় অভিব্যক্ত বক্তৃতা সকলের দ্বারা বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা দ্বারা বিস্তর উপকার সাধিত হইয়াছে। হিন্দু-মেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন জন্য তৎসংস্থাপক মহাশয় কতদূর প্রশংসাযোগ্য তাহা বলা যায় না। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা বিরচিত স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত আমাদিগের দেশের লোকের মনে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপন কার্য্যে অল্প সহকারিতা করে নাই"।[২৩]

অতঃপর এই প্রবন্ধে আমাদের জাতীয়তার অভাব সূচক বিষয়গুলি এবং কিভাবে তাহার সংশোধন করা উচিত তাহার বিস্তৃত আলোচনা আছে। যাঁহারা বাংলাদেশে জাতীয়তার উন্মেষ ও বিকাশের পরিচয় জানিতে চাহেন তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠ করিলে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

এই প্রবন্ধে রাজনারায়ণ বসুর চেষ্টার পরিপোষকরূপে যে হিন্দু মেলার উল্লেখ আছে, বাংলাদেশে জাতীয় ভাবের জাগরণের ইতিহাসে তাহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই বাৎসরিক মেলাটি আরম্ভ হয় ১৮৬৭ সনে এবং ১৮৮০ সন পর্যন্ত, মোট ১৪ বার ইহার বার্ষিক সম্মিলন হইয়াছিল।[২৪]

ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন: "শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার' অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করাতে হিন্দু মেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ঐ হিন্দু মেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় 'জাতীয় সভা' সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার' আদর্শে গঠিত হইয়াছিল।"[২৫]

জোঁড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ীর সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যে ইহার পশ্চাতে ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "আমার বাল্য কথা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "আমি বোম্বায়ে কার্য্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক 'স্বদেশী মেলা' প্রবর্ত্তিত হয়। বড় দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা (গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাহাতে যোগদান করায় প্রকৃত পক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হল। কলিকাতার প্রান্তবর্ত্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসর বৎসর তিন চারদিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হ'ত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা

কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন, আর সেই মেলাই ভারত-সঙ্গীতের জন্মদাতা—

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনঃ প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।"[২৫ক]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন স্মৃতি' তে লিখেছেন: "আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দু-মেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময় বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সব ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণী-লোক পুরস্কৃত হইত।" [২৬]

কিশোর রবীন্দ্রনাথও এই মেলায় তাঁহার স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর অনুপ্রেরণা ও ঠাকুরবাড়ীর সহযোগিতা থাকিলেও হিন্দুমেলার কৃতিত্ব যে প্রধানতঃ নবগোপাল মিত্রেরই প্রাপ্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাল্যকথায়' নবগোপাল বাবুকেই ইহার প্রধান উদ্যোগী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। [২৭] শেষ পর্যন্ত যে এই হিন্দু মেলার অনুষ্ঠান বিশেষ জাঁকজমকের সহিত হইত 'সংবাদ প্রভাকরের' ১২৮৬ সালের ১০ই ফাল্গুনের (২১-২-১৮৭৯ সন) সংখ্যায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়। এইজন্য ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:

"বিগত মাঘ সংক্রান্তির দিবস উক্ত জাতীয় মেলা টালার রাজা বদনচাঁদের উদ্যানে আরম্ভ হইয়া গত সোমবারে সমাপ্ত হইয়াছে।

...বাবু চন্দ্রশিখর বসু হিন্দু ধর্ম্মের সারবত্তা সম্বন্ধে এবং বাবু পদ্মনাভ ঘোষাল ভারতবর্ষের ইতিহাস নবীনরূপে লেখা আবশ্যক সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। ..... মেলার দ্বিতীয় দিবস ১২ই ফেব্রুয়ারি বুধবার বৈকালে ন্যাসনাল স্কুলে নর্ম্মাল স্কুল, চাঁপাতলা স্কুল এবং ন্যাসনাল স্কুলের ছাত্রগণ নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন।

......তৃতীয় দিবস বৃহস্পতিবারে এক সভা হয়, এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। মেলার সুযোগ্য সহসম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্র ছাত্রবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি সারযুক্ত উক্তি দ্বারা নীতিগর্ভ উপদেশ দান করেন।...

মেলার প্রধান দিবস রবিবারে উপরোক্ত উদ্যানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় নানাবিধ প্রদর্শনী, ক্রীড়া, গীত, বাদ্য এবং অগ্নি ক্রীড়া হইয়াছিল। সর্ব্ব প্রথমে বেলা সার্দ্ধ নবম ঘটিকার সময় ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট হইতে মহা সমারোহে মেলাস্থলে যাত্রারম্ভ হয়। পতাকা, আশা, সোঁটা এবং জাতীয় কীর্ত্তন করিতে করিতে মেলার অনুষ্ঠাতা এবং হিতসাধকগণ বরাবর মেলাস্থলে গমন করেন। এতদ্দর্শনার্থ সহস্র সহস্র লোক রাজপথে সমবেত এবং অসংখ্য নরনারী নিজ নিজ বাটীর গবাক্ষাদি হইতে দেখিতে থাকেন। এ দৃশ্যটি পরম রমণীয় হইয়াছিল। মেলাস্থল নানাবিধ পতাকা, পত্র এবং পুষ্পাদিতে পরম রমণীয়রূপে শোভিত হইয়াছিল। দ্বারদেশে হিন্দু প্রথামত কদলী বৃক্ষাবলী রোপিত হইয়াছিল। মেলাস্থলে নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং ব্যায়াম প্রদর্শিত হইয়াছিল। একজন বাঙ্গালীর সহিত একজন পঞ্জাবী পালোয়ানের কুস্তী হইয়াছিল, ...

"ইতিহাস যে বাঙ্গালী ও পঞ্জাবীকে শৃগাল এবং সিংহরূপে প্রভেদ করিত, সেই বাঙ্গালী যে এখন পঞ্জাবীর সহিত কুস্তী করিতে সমর্থ হইল, ইহাই প্রশংসার বিষয়।...

"মেলাস্থলে নানাবিধ দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। কৃষি বিভাগে নানাবিধ ফল, মূল, পুষ্প এবং বৃক্ষাদি বহুল পরিমাণে আনীত হইয়াছিল। সূচিকার্য্য কারুকার্য্য এবং নানাস্থানের বহুবিধ প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিখ্যাত বিদুষি রমাবাই ভারতীয় ভাষাশিক্ষা আবশ্যক, হিন্দু ললনাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য এবং পুরাকালের আর্য্য নারীদিগের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে দর্শকমাত্রেই বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দান করেন। রজনীতে অগ্নি ক্রীড়ার পর মেলা ভঙ্গ হয়। দিবা ভাগে বৃষ্টি হওয়ায় আশামত লোক সমবেত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে মেলার সুযোগ্য সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারী সম্পাদক বাবু রাম (?) নবগোপাল মিত্রের যত্নে, শ্রমে এবং অধ্যবসায়ে এই মেলা জাতীয় মান রক্ষা করিতেছে।"[২৮]

হিন্দুমেলার চতুর্থ অধিবেশনের পরে নবগোপাল মিত্র National Society অর্থাৎ 'জাতীয় সভা' প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য ও জাতীয় ভাব সঞ্চারিত করা। প্রতি মাসে ইহার একটি অধিবেশন ও ঐ সম্বন্ধে বক্তৃতা হইত। ইহারই এক অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার সারাংশ পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসের 'বঙ্গদর্শনে' ইহার সমালোচনা করেন। তিনি বক্তৃতার নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন:

"আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্বে যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, ধর্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে"।

অতঃপর মিল্‌টন তাঁহার স্বজাতির উন্নতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া রাজনারায়ণ বাবু বলেন: "আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবল পরাক্রান্ত হিন্দু জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দু জাতির কীর্তি, হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি।"

(অতঃপর রাজনারায়ণ বাবু "মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনঃ প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান। ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?")
এই সুদীর্ঘ সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন।

উল্লিখিত বক্তৃতার এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন: "রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"[২৯]

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা এবং নবগোপাল মিত্রের হিন্দু মেলা ও ইহার মুখপত্র 'National Paper' সম্বন্ধে তৎকালে অনেকে মন্তব্য করিয়াছিলেন—যে এ সমুদয়ই 'হিন্দু' সম্বন্ধে প্রযোজ্য সুতরাং ইহাকে 'জাতীয়' আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নহে। ইহার উত্তরে নবগোপাল মিত্র 'National Paper'-এ লেখেন "হিন্দু নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র জাতি।" তিনি তাঁহার নানা লেখায় ইহার সমর্থনকল্পে বলিয়াছেন: "ঐক্যই জাতির ভিত্তি। নানা সূত্রে ও বিভিন্ন রকমে এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। দেশ-প্রেম গ্রীকদের, মোসেসের বাণী ইহুদিদের, খ্যাতি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রোমের ও স্বাধীনতা-প্রীতি ইংরেজদের জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। সেইরূপ ধর্ম হিন্দুদের জাতীয় ঐক্যের মূল ভিত্তি। হিন্দু জাতি বাংলায়

সীমাবদ্ধ নহে—সমগ্র ভারতের যেখানে হিন্দু আছে—তাহাদের লইয়াই হিন্দু জাতি।"[৩০]

পূর্বোক্ত সমালোচনা হইতেই বোঝা যায় যে বাংলা দেশের এক সম্প্রদায় নবগোপাল মিত্রের ন্যায় হিন্দু এক পৃথক জাতি ইহা স্বীকার না করিয়া সমগ্র ভারতবাসীই যে এক জাতি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে এই আদর্শ অধিকতর লোক গ্রহণ করিলেও, 'হিন্দু জাতি'র আদর্শ কখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, হিন্দু ধর্ম যে এদেশে জাতীয়তার মূল ভিত্তি এই ধারণার প্রভাব বরাবরই ছিল, এবং এখনও আছে; এই সত্য অপ্রিয় হইলেও অস্বীকার করা কঠিন। তবে কেবলমাত্র হিন্দু নহে মুসলমানেরাও যে প্রথম হইতেই একটি পৃথক জাতি বলিয়া নিজেদিগকে মনে করিত ওয়াহাবী আন্দোলনই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

উনিশ শতকের শেষার্ধে যে এই দ্বি-জাতি-মূলক রাজনীতি প্রভাবশালী হইয়াছিল তাহার মূলে ছিল উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্য, ঐতিহ্য ও কতক পরিমাণে মুসলমানের রাজনীতিক স্বার্থ। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য রচনায়, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির উদ্দীপনাময় কবিতায় একদিকে যেমন দেশ-প্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি তাহা হিন্দুদের মনে পৃথক জাতীয়তা ভাবের ইন্ধন যোগাইতেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' যে প্রধানতঃ হিন্দুদের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল—কালীমাতার প্রতিমূর্তিই তাহার জলন্ত প্রমাণ। মৃণালিনী ও রাজসিংহ—এই দুই উপন্যাসের পটভূমি মুসলমান আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে হিন্দুর আত্মরক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধ। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন: "দুর্গেশ-নন্দিনীই আমার মনে প্রথম দেশপ্রেম জাগরিত করে। কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল বীরেন্দ্র সিংহের দিকে। বীরেন্দ্র সিংহের মৃত্যুর প্রতিশোধে সদ্য বিধবা বিমলা মুসলমান আক্রমণকারীকে ছুরিকার আঘাতে বধ করে—এই চিত্র আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।"[৩১] কমলাকান্তের দপ্তরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন:

"আমি কেন দিবস গণিব? গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গনি। যে দিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়,

শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গণি...যাহা চাই তাহা মিলাইল কই ? ...শ্রীহর্ষ কই ? ভট্টনারায়ণ কই ? হলায়ুধ কই ? লক্ষ্মণ সেন কই ? আর কি মিলিবে না ?" "আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই ?......সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন দিকে ? সে গৌড় কই ? সে যে কেবল যবন-লাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ......চাহিবার এক শ্মশানভূমি আছে—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই।"

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনায় মুসলমানের নবদ্বীপ আক্রমণের যে বীভৎস চিত্র আঁকিয়াছেন, আজিও তাহা পড়িলে বাঙ্গালী হিন্দুর রক্ত খরতর প্রবাহে বহিতে থাকে। মৃণালিনীর চতুর্থ খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে "বিংশতি সহস্র যবন কর্তৃক নবদ্বীপ জয়" বর্ণনা করিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন : "যে সূর্য্য সেই দিন অস্ত গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না, আর কি উদয় হইবে না ?" নবদ্বীপ জয় করিবার পর মুসলমান সৈন্যের পৈশাচিক অত্যাচারের বর্ণনা অতি আধুনিক যুগের হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। "ক্ষুদ্রকায় যবন কহিল, যেখানে যাহাকে পাও বধ কর।" ..."ভয়ানক শব্দে নৈশাকাশ পরিপূর্ণ হইতে লাগিল...মাতার রোদন, শিশুর রোদন, বৃদ্ধের করুণাকাঙ্খা, যুবতীর কণ্ঠবিদার।"

১৮৭২ সনে বঙ্কিমচন্দ্র "ভারতকলঙ্ক—ভারতবর্ষ পরাধীন কেন ?" এই শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তিনি যে 'Nationality বা Nation' —এই অর্থে জাতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ইহা প্রবন্ধের পাদটীকায় লিখিয়াছেন। সুতরাং 'হিন্দু জাতি' এই শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করায় তিনি যে হিন্দুকে একটি পৃথক জাতি মনে করিতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না—বিশেষতঃ যখন তিনি হিন্দুগণকে "যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্মাবলম্বী জাতিগণ" হইতে পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধে হিন্দু জাতির প্রতিষ্ঠা ও মঙ্গল সম্বন্ধে তিনি যে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা বাংলা দেশে হিন্দুদের জাতীয়তা ভাবের উদ্বোধনের মূল দার্শনিক তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৮৭২ সনে বা তাহার পূর্বে এই বিষয়ে আর কেহ এইভাবে চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দু, যদু হিন্দু, আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে

তাহাদের মঙ্গল নাই, আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তব্য। যাহাতে কোন হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ কর্তব্য আর এইরূপ অকর্তব্য··· সকল হিন্দুরই তদ্রূপ। সকল হিন্দুরই যদি একরূপ কার্য হইল, তবে সকল হিন্দুর কর্তব্য যে এক পরামর্শী, এক মতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কার্য করে, এই জ্ঞান জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্ধাংশ মাত্র। হিন্দুজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয় করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সেজন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিত হয় তাহাও করিব। জাতি প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় ভাগ।

"দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।···

"স্বজাতি প্রতিষ্ঠা ভালই হউক বা মন্দই হউক, যে জাতিমধ্যে ইহা বলবতী হয় সে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা প্রবলতা লাভ করে।

··· ··· ··· ···

"ইতিহাসকীর্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দু সমাজমধ্যে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। এক বার মহারাষ্ট্রে শিবাজী এই মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন··· দ্বিতীয় বারের ঐন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ।···

"যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশ খণ্ডে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদয় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?

··· ··· ··· ···

"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে।..... সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্ত ভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।" বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র লিখিয়াছেন আমরা

Independence শব্দের পরিবর্তে স্বতন্ত্রতা এবং Liberty শব্দের স্থানে স্বাধীনতা শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।[৩২]

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।"

শতাধিক বর্ষ যাবৎ রঙ্গলালের এই প্রসিদ্ধ কবিতা প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর মুখে মুখে ফিরিতেছে। কিন্তু ইহা আক্রমণকারী মুসলমানের বিরুদ্ধে রাজপুতের উদ্দীপনা অবলম্বনে রচিত।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন যুবরাজ (পরবর্তী সম্রাট) এডওয়ার্ডের ভারত আগমন উপলক্ষে যে প্রসিদ্ধ কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহাতে হিন্দু জাতির অতীত কীর্তির কথা আছে:

"এই ধরাতলে আদি হিন্দু জাতি,
ধরাতলে আদি হিন্দু সিংহাসন,
... ...
আজি হিন্দুস্থান হিন্দুর শ্মশান।"

তারপর রাজপুত, মারাঠা ও শিখ জাতির অতুল বিক্রমের ও স্বাধীনতার জন্য প্রাণদানের কাহিনী অপূর্ব কবিত্বসহকারে উদ্দীপনাময় ভাষায় উল্লেখ করিয়াছেন।

"যাও যুবরাজ! রাজপুতনায়
বীর ইতিহাসে পরিপূর্ণ যার
প্রতি পদ;............
এখনো 'চিতোরে' স্মৃতির নয়নে
দেখিবে 'পদ্মিনী' চিতার অনল;
সেই স্মৃতি তব দয়ার্দ্র নয়নে
আনিবে কি আহা এক বিন্দু জল?"

মহারাষ্ট্র সম্বন্ধে:—

মহারাষ্ট্র জাতি,—নিদ্রাতেও যার
শিয়রে তুরঙ্গ কটিবন্ধে অসি;
হলো অস্তমিত বিক্রমে যাহার,
মোগলের বিশ্বত্রাস 'অর্দ্ধ-শশী'!

... ...

স্বাধীনতা তরে মত্ত সিংহপ্রায়
যুঝিল যে জাতি প্রাণপণ করে,
যুবরাজ! আজি সে জাতি কোথায়?

শিখদের সম্বন্ধে :—

সেই শিখ জাতি—বীরের আতঙ্ক।
যুবরাজ! আজি সে জাতি কোথায়?

রাজপুত, মারাঠা, শিখ প্রভৃতি বীর জাতির উল্লেখ আছে, কিন্তু মারাঠা প্রসঙ্গে মোগলের পরাজয়ের কথা ছাড়া মুসলমানদের কোন উল্লেখ পর্যন্ত নাই। ভারতীয় মুসলমানদেরও মহান ঐতিহ্য ও অতীত গৌরবের নিদর্শন আছে, তাহাদের মধ্যেও বাবর, শেরশাহ, আকবর প্রভৃতি জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু নবীনচন্দ্রের কবিতা পড়িলে মনে হইবে না যে ভারতবর্ষে মুসলমান বলিয়া এক সম্প্রদায় আছে এবং তাহাদেরও একটা ঐতিহ্য আছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত বিলাপ', 'ভারত সঙ্গীত' প্রভৃতি বহু কবিতা বাঙ্গালীর মনে স্বদেশ-প্রেম ও স্বাধীনতার বীজ বপন করিয়াছিল—কিন্তু তাহার মধ্যেও যবন কর্তৃক হিন্দুর পরাজয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। যে 'ভারত সঙ্গীত' বহু বর্ষ ধরিয়া বাঙ্গালীকে জাতীয়তাভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টি প্রত্যেক বাঙ্গালীর কণ্ঠস্থ ছিল ও প্রাণে বিপুল সাড়া জাগাইত।

"বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহাই হউক কবি মুঘল কর্তৃক মারাঠা দেশের আক্রমণ উপলক্ষ করিয়া সেই পটভূমিতে দেশের জন্য বিলাপ করিলেন। সুতরাং তাঁহার কবিতায় দেখিতে পাই—

"বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্য্যাবর্ত্ত জয়ী পুরুষ যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?

… … …

ধিক হিন্দুকুলে! বীর ধর্ম্ম ভুলে
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু করতলে
সোনার ভারত করিতে ছার।”

যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে হেমচন্দ্র 'ভারত ভিক্ষা' নামে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রাচীন হিন্দু রাজ্য ধ্বংসের সঙ্গেই ভারতের ধ্বংস হইল না কেন, তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন।

“হায় পাণিপথ, দারুণ প্রান্তর,
কেন ভাগ্য সনে হলিনে অন্তর?
কেন রে চিতোর, তোর সুখ-নিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হলি—কেন রে রহিলি?
জাগাতে ঘৃণিত ভারত-নাম?”

সারাটি কবিতায় কেবল হিন্দুর প্রাচীন গৌরবের কথাই আছে, মুসলমানদের নামগন্ধও নাই।

আবার 'ভারত-বিলাপ' নামক কবিতাতে হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে বিধাতা যদি ভারতকে সম্পদশালিনী না করিয়া মরুভূমি করিতেন তাহা হইলেই ভাল হইত—কারণ

“তা হ'লে এখানে করিত না গতি
পাঠান, মোগল, পারস্য দুর্ম্মতি,
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি,
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায়।”

পূর্বোক্ত সমস্ত গদ্য রচনা ও কবিতার মধ্য দিয়াই যে একটি সুর প্রধানতঃ কর্ণে বাজে তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত এই, যে ভারতবর্ষ হিন্দুর দেশ, মুসলমানেরা অনধিকারী, অবাঞ্ছিত, অত্যাচারী, বিদেশী, বিজেতা মাত্র। ইহা ঐতিহাসিক সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি কোন মুসলমান ইহা পাঠ করিয়া হিন্দুর সহিত ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন ও সৌহার্দ্য স্থাপন পূর্বক এক জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যগ্র না হয়, তবে তাহার এই মনোবৃত্তি যে অতি স্বাভাবিক, এবং অন্ততঃ তাহা যে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য করা অসঙ্গত—ইহাও অনুরূপ সত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের রচনার যে কয়টি নমুনা উদ্ধৃত হইল উনিশ শতকের শেষার্ধের বাংলা সাহিত্যে ইহার অনুরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। এগুলি যে বাংলায় জাতীয়তা-ভাবের এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল, এবং যে জাতীয়তা উনিশ শতকের প্রথমে বাংলার সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহা প্রসার করিয়া রাজপুতানা, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ লইয়া মহাদেশ ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবিষয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙ্গালীর যে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল শেষার্ধে যে তাহার আমূল পরিবর্তন হইয়াছিল, তাহার জন্য বাংলা সাহিত্যের অবদান অবিস্মরণীয়। কিন্তু ইহাও অনস্বীকার্য যে ইহার প্রভাবে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে হিন্দুর জাতীয়তার আদর্শ হিন্দুধর্মের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার একটি বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিল।

সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ এই সঙ্কীর্ণভাব দূর করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর মনে এক অখণ্ড জাতীয়তার ভাব সঞ্চার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন—সে কথা পরে বলা হইবে। বাংলা সাহিত্যেও—কবিতা, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতিতে—সমগ্র ভারতবাসীর বর্তমান দুর্দশা ও পরাধীনতা কলঙ্ক দূর করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

কিন্তু কেবল যে হিন্দুদের মধ্যেই এই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক জাতীয়তার ভাব বিদ্যমান ছিল তাহা নহে। ঠিক অনুরূপ কারণে, অর্থাৎ ধর্ম, সমাজ ও ঐতিহ্যের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যেও—তাহারা যে হিন্দু হইতে বিভিন্ন এক স্বতন্ত্র জাতি—এই ধারণা বরাবরই ছিল—এবং উনিশ শতকের শেষার্ধে তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। কারণ হিন্দু নেতাগণ যেমন জাতীয়তার গণ্ডী ক্রমশঃ বাড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—সৈয়দ আহমদ প্রমুখ মুসলমান নেতাগণ তেমনি স্বতন্ত্র জাতীয়তার দিকেই মুসলমানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। ফলে উনিশ শতকের শেষার্ধে যেমন দেশপ্রেম স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল তেমনি হিন্দু ও মুসলমানের একজাতীয়ত্ববোধ ক্রমশঃই কমিতে লাগিল।

যে মারাঠা বীর মুসলমানদের সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া হিন্দুর রাজ্য ও ধর্ম রক্ষা করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কতক সফলতাও লাভ করিয়াছিলেন হিন্দুরা যে তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। লোকমান্য তিলক 'শিবাজী উৎসব' অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার দৃষ্টান্তে বর্তমান যুগে ভারতবাসীকে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন—ইহার জন্য তিনি হিন্দুর

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। বাংলা দেশেও এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—এবং রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, যতদিন বাংলা ভাষা বিদ্যমান থাকিবে ততদিন তাহা বিস্মৃতির গহ্বরে ডুবিবে না। কিন্তু শিবাজী মারাঠা জাতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং তাহাই মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ,—এই সাধারণ জ্ঞান যে মুসলমানের আছে সে যদি শিবাজী উৎসবে যোগ দান না করে, এমন কি ইহার বিরোধী হয় তবে তাহাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। এইরূপ মুহম্মদ বিন কাশিম, গজনীর মামুদ, বক্তিয়ার খিলজী, বাবর, ঔরংজেব প্রভৃতি মুসলমান বীরগণের কাহিনী একদিকে যেমন মুসলমানদের মনে গর্ব বোধ, হিন্দুদের মনে তেমনি পরাজয়ের লাঞ্ছনা ও অপমান এবং পরাধীনতার বিষাদ স্মৃতি জাগাইয়া তুলিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং ইহাদের উৎসব যদি মুসলমানেরা অনুষ্ঠান করিত, তবে তাহাতে হিন্দুরা খুব উৎফুল্ল হইয়া যোগ দিত—অন্ততঃ ১৯০৫ সনের পূর্বে ইহা কদাচ সম্ভবপর ছিল বলিয়া মনে হয় না।

ধর্ম ও সমাজের যে গুরুতর ব্যবধান হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথক করিয়াছে, ঐতিহাসিক ঘটনা সেই বিভেদ আরও সুদৃঢ় করিয়াছে। এই সমুদয়ের ফলে হিন্দু ও মুসলমান যদি স্বীয় সম্প্রদায়কে একটি স্বতন্ত্র জাতি মনে করে, তবে তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় হইলেও অযৌক্তিক বা 'অস্বাভাবিক' মনে করার কোন কারণ নাই। সুতরাং সাহিত্যে যে এই মনোবৃত্তি প্রতিফলিত হইবে ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই।

হিন্দুদের বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন কীর্তি এবং গৌরবের স্মৃতি ও কাহিনীর মধ্যে যেমন মুসলমানদের কোন স্থান নাই, উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের উর্দু সাহিত্যেও তেমনি হিন্দু বা ভারতবর্ষের কোন স্থান ছিল না। আরব ও পারস্য দেশের ঐতিহ্যেই ইহার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল। উর্দু কবিরা ফার্সী কবিতার ভাবেই বিভোর ছিলেন, তাঁহাদের কল্পনা ও কাহিনী আরব ও পারস্য দেশের ঐতিহাসিক ঘটনা ও নৈসর্গিক দৃশ্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহাদের কবিতা পারস্যের প্রদেশ, শহর, নদ, নদী, পাহাড়, পর্বত, ফুল, ফল প্রভৃতির কথায় ভরা, কিন্তু ভারতের কোন শহর, নদ, নদী, পাহাড় বা ফুল, ফলের উল্লেখ মাত্র নাই—প্রাচীন হিন্দুর ঐতিহাসিক কাহিনী তো দূরের কথা। যে দেশে তাঁহাদের জন্ম, যে দেশে তাঁহারা বহু শতবর্ষ বাস করিয়াছেন, সে দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন কৌতূহল ছিল না, সে দেশের প্রাকৃতিক শোভা তাঁহাদের মনে কোন রেখাপাত

করিত না—একজন উর্দু কবি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে জন্মভূমি হইলেও সে দেশ 'নাপাক' (অপবিত্র)।"৩৩

বিংশ শতকে যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে এবং যাহার ফলে পাকিস্থানের সৃষ্টি হয়—উনিশ শতকের জাতীয় জাগরণের মধ্যেই যে তাহার বীজ নিহিত ছিল এ সত্য অস্বীকার করা কঠিন।

২। রাজনীতিক আন্দোলন

সংঘবদ্ধভাবে যে রাজনীতিক আন্দোলন ১৮৫৮ সনের পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল তাহার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল যে ইহা ক্রমশঃই আভিজাত্যের নেতৃত্ব হইতে শিক্ষিত জনসাধারণের নেতৃত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। পূর্বোক্ত 'ভূম্যধিকারী সমাজ' (Landholders' Society), Bengal British India Society, ও British Indian Association—পর পর এই তিনটির প্রতিষ্ঠাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৮৫৮ সনের পর জাতীয়তাভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বিশিষ্ট লক্ষণটি আরও স্পষ্ট হইল। ইহার ফলে উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা দেশে ইণ্ডিয়ান লীগ, ভারত সভা (Indian Association) ও জাতীয় কনফারেন্স (National Conference), এবং পরিশেষে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ প্রথম তিনটি অবলম্বন করিয়াই বাংলার রাজনীতিক আন্দোলন গড়িয়া ওঠে—সুতরাং প্রথমেই এই তিনটির সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক। ইণ্ডিয়ান লীগ (Indian League)

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এ দেশের শাসনবিধির যে সমুদয় সংস্কার দাবি করিয়াছিল তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষিত বাঙ্গালীর ইংলণ্ডে যাতায়াত ও সেখানকার শাসন প্রণালীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালীর রাজনীতিক দৃষ্টিতে কেবল উচ্চতর সরকারী পদ ও শাসনকার্যে কিছু পরিমাণে অধিকার লাভই পর্যাপ্ত মনে হইল না। ১৮৬৭ সনে ২৫ জুলাই ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী (W. C. Bonnerjee) ভারতে প্রতিনিধিমূলক দায়িত্বপূর্ণ গভর্নমেণ্ট স্থাপন (representative and responsible Government of India) সম্বন্ধে ইংলণ্ডে এক বক্তৃতা করেন।৩৪ ১৮৭৩ সনে আনন্দমোহন বসুও ইংলণ্ডের ব্রাইটন শহরে অনুরূপ প্রস্তাব করেন। ১৮৭৪ সনে কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কাগজে

ভারতে স্বায়ত্ত শাসন (Home Rule) প্রতিষ্ঠার সমর্থনে এক প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন, সমস্ত ইংরেজ উপনিবেশেই এইরূপ শাসন প্রচলিত আছে—এবং যাহারা কর দেয় তাহাদের হাতেই শাসনভার ন্যস্ত থাকিবে, এই নীতি অনুসৃত হয়। কেবল ভারতে ইহার অন্যথা হইবে কেন?[৩৫]

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এইরূপ রাজনীতিক চেতনা সম্পন্ন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অগ্রগতির সহিত তাল রাখিতে পারিল না। কারণ ইহার সহিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল না এবং রাজনীতিক চেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লোকমত গঠন করার জন্য আন্দোলন—ইহাদের কার্যসূচীর অন্তর্গত ছিল না। বিশেষতঃ তখনও এই অ্যাসোসিয়েশন অভিজাত সম্প্রদায়ের সভা বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস ছিল—এবং এই বিশ্বাস একেবারে অমূলক বলা যায় না। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ১৮৭২ সনে ইহার বার্ষিক চাঁদা ৫০৲ টাকা হইতে কমাইয়া ১০৲ কি ৫৲ টাকা করার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু ইহা গৃহীত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার আত্মচরিতে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন।

"আনন্দমোহন বাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতেই আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোন রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। আমরা তিন জনে কথাবার্তার পর স্থির হইল যে, অপরাপর দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য।"

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে অতঃপর শিশিরকুমার ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত পরামর্শ করা হয়।[৩৬]

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে তিনি ও আনন্দ-মোহন এই উদ্দেশ্যে 'ভারত সভা' স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন—এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীও বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও এই প্রকার সভার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন এবং ইহার কয়েকজন বিশিষ্ট সভ্য এই 'ভারত সভার' উদ্বোধন উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠার মাত্র দশ মাস পূর্বে ঠিক একই উদ্দেশ্য লইয়া এবং একই প্রণালীতে ১৮৭৫ সনে ২৫ সেপ্টেম্বর 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত

হয়। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ। আনন্দমোহন বসু এই শ্রেণীর একটি সভা প্রতিষ্ঠার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন অথচ তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে এই সভার প্রতিষ্ঠা করায় কোন কোন পত্রিকা শিশিরকুমারকে নিন্দাও করিয়াছিলেন। কিন্তু 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক ইহাতে মন্তব্য করিলেন—"আনন্দমোহনকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু দেশে কি তিনি ছাড়া আর কোন লোক নাই? তাঁহাকে ছাড়া কিছু করা যাইবে না এরূপ চিন্তা বাঙ্গালীর পক্ষে কলঙ্ক।"

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে সুরেন্দ্রনাথ 'ভারত সভা'র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন কিন্তু শিশিরকুমার ঘোষের সহযোগিতা বা ইহার পূর্বে 'ইণ্ডিয়ান লীগের' প্রতিষ্ঠার কথা বিশেষ কিছুই বলেন নাই। তাঁহার বর্ণনা হইতে মনে হয় যে ভারত সভার পূর্বে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিমূলক এই শ্রেণীর আর কোন সভা ছিল না। কিন্তু তিনি অন্যত্র ইহার অস্তিত্ব প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী সভায় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা কালীচরণ ব্যানার্জী এই সভার প্রতিষ্ঠায় আপত্তি করেন—কারণ কয়েক মাস পূর্বেই 'ইণ্ডিয়ান লীগ' নামক এই শ্রেণীর আর একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন 'আমি তাহার যুক্তির জবাব দিলাম এবং সাধারণ সভায় 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইল।' সুরেন্দ্র-নাথ কি জবাব দিয়াছিলেন তাহার আভাষ দেন নাই। তবে এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে 'ইণ্ডিয়ান লীগ' অনেক ভাল কাজ করিয়াছিল এবং ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, শিশিরকুমার ও মতিলাল ঘোষ এবং Rais and Rayyet পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী।

পূর্বোক্ত সমস্ত বিবরণ পড়িয়া মনে হয় যে প্রথমে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ একযোগে এইরূপ একটি সভা স্থাপনের কল্পনা করিতেছিলেন। কিন্তু কোন কারণে ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল গড়িয়া ওঠে। একটির নেতা শিশির-কুমার ঘোষ; অন্যটির নেতা আনন্দমোহন বসু অথবা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। সহসা প্রথম দল ইণ্ডিয়া লীগ প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং ইহাতে কিছু পরিমাণে মনোমালিন্য ও অসন্তোষ দেখা দিলেও দ্বিতীয় দল—অর্থাৎ আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ নেতাগণ—এই লীগে যোগ দিলেন। কিন্তু শীঘ্রই এই দুইজন এবং আরও অনেকে পদত্যাগ করিলেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল বলেন যে লীগের সভাপতি শম্ভুচন্দ্র মুখার্জির উদ্ধত ব্যবহারই এই সমুদয় সদস্যের

পদত্যাগের কারণ। কিন্তু তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই—এবং ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ পদত্যাগকারী সদস্যদল ১৮৭৬ সনের ২৬ জুলাই 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠা করিলেন অথচ ইহার বহু পূর্বেই, জানুআরি মাসে শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি লীগের সভাপতি পদ ত্যাগ করেন। প্রস্তাবিত কার্যপ্রণালী ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া এই দুই সভার মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে উভয় সভাই 'ভারতীয়' (Indian) এই বিশেষণটি ব্যবহার করিয়াছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দৃষ্টি ছিল ব্রিটিশ ভারতে সীমাবদ্ধ—নব্য মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার স্থানে সমগ্র ভারতবর্ষের ঐক্যের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইলেন।

রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে 'ইণ্ডিয়ান লীগ'-এর যে বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা ছিল তাহা সকলেই অনুভব করিত। এমন কি Englishman পত্রিকাও ইহাকে 'ভারতের এই প্রান্তে জাতীয় জাগরণের প্রথম বিশেষ নিদর্শন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। লীগও দেশের নানা হিতকর কার্যে হাত দিয়াছিল। কলিকাতা পৌরসভার সদস্য যাহাতে জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হয় তাহার আন্দোলন, এবং কারিগরী শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয় (Technical Institute) প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি লীগকে পছন্দ করিত না, এবং পৌরসভার সদস্য নির্বাচনপ্রস্তাবে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে। মোটের উপর লীগের প্রচেষ্টা যে জাতীয় চেতনায় একটি নূতন সাড়া জাগাইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু 'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠার পর একই উদ্দেশ্য ও প্রণালীতে গঠিত দুইটি পৃথক সভার অনাবশ্যকতা ও ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কা অনেকের মনেই দেখা দিল। সুতরাং এই দুইটি মিলিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করিলেন। ফলে ইণ্ডিয়ান লীগ উঠিয়া গেল এবং ইহার সভাপতি কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি অধিকাংশ প্রধান প্রধান সদস্য 'ভারত সভায়' যোগ দিলেন।

'ইণ্ডিয়ান লীগ' স্বল্পকাল স্থায়ী হইলেও বাংলার রাজনীতিক আন্দোলনের ইতিহাসে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। "শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতার প্রথম সংঘবদ্ধ রূপ 'ভারত সভা'" 'একথা সুরেন্দ্রনাথ বারংবার বলিয়াছেন।"[৩৭] কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে বলিতেই হইবে যে 'ইণ্ডিয়ান লীগ'-ই এই গৌরবের যথার্থ দাবি করিতে পারে।

খ। ভারত সভা (Indian Association)[৩৮]

১৮৭৬ সনের ২৬ জুলাই গোলদীঘির নিকটবর্তী অ্যালবার্ট হলে 'ভারত-সভা' প্রতিষ্ঠার উদ্বোধন-সভা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর ল লেকচারার' ও 'ব্যবস্থা-দর্পণ' প্রণেতা শ্যামাচরণ শর্মা সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সভায় প্রায় সাত আট শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দুইজন বিশিষ্ট নেতা—মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও কৃষ্ণদাস পাল—সভায় যোগদান করেন। ঐ দিন প্রাতঃকালে প্রধান উদ্যোক্তা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হয়—কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সভার প্রারম্ভে যখন 'ইণ্ডিয়ান লীগের' পৃষ্ঠপোষক রেভারেণ্ড কালীচরণ ব্যানার্জী এই প্রকার আর একটি সভার প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন তখন সুরেন্দ্রনাথই তাহার জবাব দেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

সভায় মোট তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে সভার 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য', দ্বিতীয় প্রস্তাবে ইহার নামকরণ, ও তৃতীয় প্রস্তাবে কার্যকরী সমিতির গঠন—অনুমোদিত হয়।

প্রথম প্রস্তাবটির মূল শব্দগুলি জানা যায় না। তবে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনচরিতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চারিটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) দেশে জনমত গঠন করা ; (২) রাজনীতিক স্বার্থ ও লক্ষ্যের ঐক্যকে ভিত্তি করিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের ঐক্যবদ্ধ করা ; (৩) হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীর প্রসার ; (৪) রাজনীতিক আন্দোলনে যাহাতে অশিক্ষিত জনসাধারণ যোগ দেয় তাহার ব্যবস্থা করা।

তৃতীয় উদ্দেশ্যটি বিশেষ লক্ষণীয়। ইহাতে প্রকারান্তরে অন্ততঃ রাজনীতিক বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বা ব্যবধান স্বীকার করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই উদ্দেশ্যের সফলতার কিছু নিদর্শন স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে এই সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে 'সর্বসম্মতিক্রমে নবাব মীর মহম্মদ আলি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।'

দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "ম্যাৎসিনির (Mazzini) অনুপ্রেরণায় সমগ্র ভারতবাসীকে এক রাজনীতিক গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ করার মহান আদর্শ তখন বাংলার নেতাগণের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—সেই জন্যই আমরা 'ভারত সভা' নাম গ্রহণ করিলাম। এস্থলেও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে

ইহার পূর্বেই 'ইণ্ডিয়ান লীগ' এই নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহা তখনও বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এই নামকরণ বিষয়ে নূতন সভার উদ্যোক্তারা কোন মৌলিকতা বা নূতন আদর্শ অবলম্বনের কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন না।

'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' ন্যায় 'ভারত সভা' আজ পর্যন্তও, নামে মাত্র হইলেও, টিকিয়া আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল ইহা বাংলার—তথা ভারতের—একটি বিশিষ্ট রাজনীতিক সংস্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না যে প্রথম দশ বৎসরে অর্থাৎ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে রাজনীতিক সচেতনতার যে অপূর্ব বিকাশ হয় এবং যাহার জন্য কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছিল—তাহার প্রধান কৃতিত্ব এই ভারত সভার, এবং বিশেষভাবে ইহার প্রধান কর্মী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীরই প্রাপ্য। তাহা বর্ণনা করার পূর্বে সুরেন্দ্রনাথের জীবনী সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

১৮৪৮ সনে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বি, এ পাশ করিয়া তিনি রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সহিত একত্রে বিলাত যান এবং তিন জনেই ১৮৬৯ সনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করেন। নিয়মানুযায়ী দুই বৎসর প্রোবেশনারী করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং সিলেটের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন (১৮৭১)। তিন বৎসর পর আফিসের কার্যে সামান্য একটি ত্রুটির জন্য তাঁহাকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি বিলাতে যাইয়া এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করেন, কিন্তু কোন ফল হয় না। ব্যারিষ্টারীর জন্য ভর্তি হইবার আবেদনও অগ্রাহ্য হয়। হতাশ হৃদয়ে দেশে ফিরিয়া তিনি মেট্রপলিটন কলেজে অধ্যাপকের কার্য গ্রহণ করেন।

এই উপলক্ষে বিলাতে থাকিতেই তিনি ইউরোপের নানাদেশে উনিশ শতকে স্বাধীনতার আন্দোলন বিষয়ে বহু গ্রন্থ পাঠ করেন। সর্বত্র এই সমুদয় আন্দোলনে তরুণ ছাত্রদের একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করে। দেশে ফিরিয়া তিনি আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ছাত্র সভাতে (Calcutta Students' Association) যোগদান করেন এবং ইহার প্রাণ স্বরূপ বলিয়া গণ্য হন। শীঘ্রই তিনি অসাধারণ বাগ্মিতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন—এবং নানা ঐতিহাসিক বিষয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া তরুণ সম্প্রদায়ের মনে দেশের প্রতি অনুরাগের উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। তাঁহার এই সব বক্তৃতায় যুব সম্প্রদায়ের কি উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছিল তদানীন্তন ছাত্র এবং

পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি গ্রন্থে' তাহার কিছু আভাস দিয়াছেন। "শিখ জাতির অভ্যুদয়" এবং "ম্যাৎসিনি ও যুব-ইটালী" (Joseph Mazzini and the Young Italy Movement) এই দুইটি বক্তৃতা তাঁহার শ্রোতাদের মনে কিরূপ স্বদেশের প্রতি অনুরাগ ও ইংরেজের প্রতি বিরাগের গভীর অনুভূতি জাগাইয়াছিল বিপিনচন্দ্র নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহার চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। এই সমুদয় বক্তৃতার ফলে ভারতীয় যুবকদের মনে পরাধীন ইটালীর প্রতি সমবেদনা—এবং তাহার মুক্তি-সংগ্রামের সহিত সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল এবং কলিকাতার ছাত্রসমাজে ইটালীর অনুকরণে কতকগুলি গুপ্ত বিপ্লব সমিতির সৃষ্টি হইয়াছিল। বিপিনচন্দ্র বলেন যে সম্ভবতঃ সুরেন্দ্রনাথ নিজেও এইরূপ কয়েকটি গুপ্ত সমিতির সভাপতি ছিলেন।[৩৯] কিন্তু ইহা সত্য হইলেও সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া প্রকাশ্যে যে সমুদয় বক্তৃতা দিতেন তাহাতে স্পষ্ট বলিতেন, যে আমাদের দুর্দশা দূর করিবার জন্য হিংসাত্মক কার্য বা বল-প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। অন্য দেশ জোর জবরদস্তি করিয়া রাজ্য শাসনের যে সকল সুবিধা বা অধিকার আদায় করিয়াছে আমরা আইন-সম্মত আন্দোলন (constitutional agitation) দ্বারাই তাহা লাভ করিতে পারিব। কিন্তু শান্তির পথ হইলেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এই আন্দোলন আমাদের সম্মুখে একটি কঠোর কর্তব্য রূপে বিদ্যমান—এবং এই কর্তব্য পালনে বিমুখতা ভগবান ও মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সমতুল্য।

সুরেন্দ্রনাথ যে জাতীয়তা প্রচার করিতেন তাহা সর্বভারতীয়। নানকের দৃষ্টান্ত স্মরণ করাইয়া তিনি শ্রোতাগণকে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী, শিখ প্রভৃতি ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ঐক্য ও প্রীতির বন্ধনের উপর জাতীয়তা স্থাপনের জন্য উদাত্তস্বরে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আইস আমরা পুরাতন কলহ বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন বদ্ধ হইয়া আমাদের সকলের প্রিয় মাতৃভূমির দুঃখ ঘুচাইবার জন্য একযোগে কার্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হই।'[৪০] পূর্বে হিন্দু ও মুসলমানদের যে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের উল্লেখ করা হইয়াছে সুরেন্দ্রনাথ তাহার বহু ঊর্ধে উঠিয়া আজীবন ভারতে ভাষা, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে এক অখণ্ড জাতীয়তা প্রচার করিয়াছেন এবং এই নূতন আদর্শ যে বিংশ শতকে অন্ততঃ হিন্দুদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহার কৃতিত্ব অনেক পরিমাণে সুরেন্দ্রনাথের প্রাপ্য।

সুরেন্দ্রনাথ যে সময়ে রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন বাংলাদেশে

ধর্ম ও সমাজের সংস্কার লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিক উন্নতির দিকে দেশের দৃষ্টি ফিরাইলেন। বাংলার শিক্ষিত যুবকগণ যে ক্রমশঃ ধর্ম ও সমাজের সংস্কার অপেক্ষা দেশের রাজ্যশাসনে অধিকার স্থাপনেই বেশী আগ্রহশীল হইল,তাহার প্রধান কারণ সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা সহকারে এক নূতন বাণী ও নূতন আদর্শ তাহাদের হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত করিলেন। ইহাই বাংলার নব জাগরণে সুরেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট এবং হয়ত সর্বশ্রেষ্ঠ দান। বিপিনচন্দ্র পাল নিজে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে বাগ্মীবর কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক অনুপ্রাণিত ব্রাহ্ম সমাজের চেষ্টায় বঙ্গদেশে ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবের যে প্রবল স্রোত বহিয়াছিল তাহা অপেক্ষা সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতিক প্রচার ক্রমশঃই অধিকতর সংখ্যক যুবক দলকে আকৃষ্ট করিল।[৪১] ব্রাহ্মসমাজের জনপ্রিয়তা হ্রাসের ইহাও একটি অন্যতম কারণ এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে।

'ভারত সভা' প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিক প্রচারের কার্যে তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। মাত্র কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করিব।

১৮৭৬ সনে বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্বন্ধে এক নূতন বিধি প্রবর্তিত হইল। ইহার ফলে পরীক্ষার্থীদের উর্ধতন বয়স ২১ বৎসর হইতে কমাইয়া ১৯ বৎসর করা হইল। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় ভারতবাসী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এতদিন পর্যন্ত যে সমুদয় উচ্চ রাজপদে কেবলমাত্র ইংরেজই নিযুক্ত ছিল তাহা অধিকার করিবে এই সম্ভাবনা দেখা দিল—এবং ইহা দূর করিবার জন্যই যে নূতন বিধান প্রচলিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ অনধিক ১৯ বৎসর বয়স্ক কোন ভারতীয় ছাত্রের পক্ষে সুদূর বিলাতে সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করিয়া এবং তদনুযায়ী পরীক্ষায় ইংরেজ ছাত্রদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করা খুবই দুরূহ ব্যাপার—ইহা সহজেই বুঝা যায়। সুতরাং যে একটি মাত্র উপায়ে ভারতীয়েরা ইংরেজ শাসনে উচ্চপদ অধিকার করিতে পারিতেন তাহা বিশেষভাবে সঙ্কোচ করা হইল। ইহাতে ভারতের শিক্ষিত মহলে বিশেষ ক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ভারত সভা ইহা ভারতের জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির এক অপূর্ব সুযোগ মনে করিয়া এ বিষয়ে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিল। ১৮৭৭ সনের ২৪ মার্চ ভারত সভার উদ্যোগে আহুত এক প্রকাশ্য সভায় এই নূতন বিধির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করা

হইল। এই আন্দোলনকে একটি নিখিল-ভারতীয় রূপ দিবার জন্য ভারত সভার তরফ হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতাদের মতামত জানিবার প্রার্থনা করিয়া চিঠি লেখা হইয়াছিল—এবং উত্তরে যে সমুদয় চিঠি ও টেলিগ্রাম আসিয়াছিল উক্ত সভায় তাহা পাঠ করা হইল। এই অভিনব পন্থা পরবর্তীকালে রাজনীতিক আন্দোলনে খুব সুপরিচিত হইলেও ভারত সভাই এই উপলক্ষে ইহার প্রথম প্রবর্তন করে। সমগ্র ভারত হইতে প্রতিবাদের অনুমোদন পঠিত হইলে উক্ত সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল যে বিলাতে পার্লিয়ামেণ্টে এই মর্মে একটি আবেদনপত্র (Memorial) পাঠানো হউক যে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা একই সময়ে লণ্ডনে এবং ভারতবর্ষের দুই একটি কেন্দ্রে গ্রহণ করা হউক এবং পরীক্ষার্থীদের উর্ধ্বতন বয়স ২২ বৎসর নিরূপিত হউক। এই যে আন্দোলন আরম্ভ হইল, উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের বহু বৎসর যাবৎ ইহা চলিয়াছিল। অবশেষে সুদীর্ঘকাল পরে ইংরেজ সরকার এই প্রস্তাব মোটামুটিভাবে কার্যে পরিণত করিয়াছিল।

ভারত সভা কেবল সভায় প্রতিবাদ এবং পার্লিয়ামেণ্টে আবেদনপত্র পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হইল না। সমগ্র ভারত এই নূতন বিধানের বিরুদ্ধে একমত হওয়ায় যাহাতে এই সুযোগে সমগ্র ভারতে একই অসুবিধা ও অভিযোগ এবং একই রাজনীতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি মাত্র রাজনীতিক গোষ্ঠীর, এবং সেই ভিত্তির উপর একটি নিখিল ভারতীয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা যায় সেই দিকে ভারত সভা দৃষ্টি দিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুরেন্দ্রনাথকে ভারত সভার বিশেষ প্রতিনিধিরূপে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পাঠানো হইল। ১৮৭৭ সনে ২৬ মে সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া উত্তর ভারতে, বারাণসী, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, দিল্লী, আগ্রা, মীরাট, অমৃত-শহর ও লাহোর, এবং পরবর্তী বৎসরে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিলেন। প্রতি স্থানেই তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রকাশ্য সভায় বহু লোকের সমাগম হইত এবং কলিকাতার সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহার অনুমোদন করা হইত। আলিগড়ের সভায় প্রসিদ্ধ মুসলমান নেতা সৈয়দ আহমদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন স্থানে যে সমুদয় রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল সুরেন্দ্রনাথ তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া একই পদ্ধতিতে কার্য করিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, মীরাট ও লাহোরে তিনি কলিকাতার ভারত সভার

সহিত একযোগে কার্য করার জন্য নূতন নূতন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিলেন। এইরূপে ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে কার্য করিবার যে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হইল, উনিশ শতকের ইতিহাসে তাহা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা, এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামে ইহা ভারত সভা ও সুরেন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

সুরেন্দ্রনাথের ভারত ভ্রমণের প্রসঙ্গে পরবৎসর সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী হেনরী কটন (Henry Cotton) মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ২৫ বৎসর পূর্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে পাঞ্জাবে বাঙ্গালী কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে, কিন্তু আজ সুরেন্দ্রনাথের নাম ঢাকা হইতে মুলতান পর্যন্ত সমান উৎসাহ সৃষ্টি করে, এবং বাঙ্গালী বাবুরাই এখন পেশওয়ার হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত লোকমত গঠন করে। সুরেন্দ্রনাথের এই সার্থক রাজনীতিক সফরের ফলে প্রমাণিত হইল যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এমন একটি ঐক্যসূত্রের বন্ধন আছে যাহা পূর্বে কেহ কল্পনাও করে নাই—এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন অপেক্ষা রাজনৈতিক আন্দোলন জনসাধারণের চিত্ত বেশী আকৃষ্ট করিতে পারে। সুরেন্দ্রনাথের অনুকরণে ১৮৭৮ সনের প্রথম ভাগে পুনা ও পাঞ্জাবের রাজনীতিক নেতারা কলিকাতায় আসিলেন। ঐক্যবদ্ধভাবে সমগ্র ভারতে একটি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের পথ সুগম হইল।

এই সময়ে গণ আন্দোলনের আর একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৮৭৮ সনে ১৪ মার্চ বড়লাট লর্ড লিটনের আমলে দেশীয় সংবাদপত্র আইন (Vernacular Press Act) আইন পরিষদের একদিনের অধিবেশনে পাশ হইয়া গেল। জাতীয় চেতনার উদ্বোধক ও বাহক দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করাই এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই জনসাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর আরও দুইটি আইন পাশ হইল। প্রথমটি অস্ত্র আইন (Arms Act)—ইহার ফলে কোন ভারতীয় বিনা লাইসেন্সে বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি রাখিলে দণ্ডনীয় হইবে। দ্বিতীয় লাইসেন্স আইন (License Act)। ইহার ফলে ব্যবসায়ীদিগকে টাকা দিয়া লাইসেন্স লইতে হইত।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশ্যে জনসভার আহ্বান করিয়া এই সব আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিল। দেশীয় সংবাদপত্রে আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন খুব তীব্র আকার ধারণ করিল। কলিকাতায় টাউন হলে যে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা হইল (১৮৭৮, ১৭ই এপ্রিল) তাহাতে প্রায় পাঁচ হাজার

লোক উপস্থিত ছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ছাড়া আর সকল রাজনীতিক সম্প্রদায় এই সভায় প্রতিবাদ প্রস্তাব সমর্থন করিল। পূর্বেই এই জনসভার প্রস্তাব অন্য সব প্রদেশের নেতাদিগকে জানান হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সমর্থনসূচক চিঠি ও টেলিগ্রাম আসিয়াছিল। রাজনীতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব যে অভিজাত সম্প্রদায়ের হাত হইতে ধীরে ধীরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে গিয়া পড়িতেছিল এই সব সভা সমিতি তাহার স্পষ্ট নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পূর্বোক্ত কলিকাতা টাউন হলের জনসভার নির্দেশমত দেশীয় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে একটি দরখাস্ত বিলাতে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সরকারের বিরোধীপক্ষের নেতা প্রসিদ্ধ রাজনীতিক গ্লাডষ্টোনের (Gladstone) নিকট পাঠানো হইল। গ্লাডষ্টোন এই আইনের বিরুদ্ধে পার্লিয়ামেণ্টে একটি প্রস্তাব আনিলেন। ইহা লইয়া বহু বিচার বিতর্ক ও অবশেষে ভোট নেওয়া হইল। গ্লাডষ্টোনের প্রস্তাবের স্বপক্ষে ছিলেন ১৫২ ও বিপক্ষে ছিলেন ২০৮ জন। ইহাতে বেশ বোঝা গেল যে বিলাতের একটি বড় রাজনৈতিক দল ভারতবাসীর বিরোধিতা সমর্থন করিয়াছিল। ইহার পূর্বে এরূপ সমর্থন আর কখনও পাওয়া যায় নাই। এই আন্দোলনেও ভারতের রাজনীতিক ঐক্যবদ্ধতার আর একটি নিদর্শন পাওয়া গেল। আর এই আন্দোলন একেবারে নিষ্ফল হয় নাই—কারণ ইহার ফলে গভর্নমেণ্ট দেশীয় সংবাদপত্র আইনের কিছু পরিবর্তন করিয়াছিল।

ইহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আর একটু অগ্রসর হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সুরেন্দ্রনাথ ভারতের নানাস্থানে জনসভায় বক্তৃতা করেন এবং সর্বত্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের বয়স কমানোর প্রতিবাদ-মূলক একটি আবেদনপত্রের খসড়া গৃহীত হয়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন স্থির করিল যে এই আবেদনপত্র ডাকে না পাঠাইয়া তাহাদের একজন প্রতিনিধিকে এই আবেদনপত্র দাখিল করিবার জন্য বিলাতে পাঠানো হইবে—কারণ তিনি এ বিষয়ে বক্তৃতার সাহায্যে ভারতবাসীর মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে পারিবেন। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ এই প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন এবং প্রাতঃস্মরণীয়া কাশিমবাজারের দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী তাঁহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট ভবনের একটি কক্ষে (Wills's Rooms) একটি জনসভা হইল—সভাপতি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ নেতা জন ব্রাইট (John Bright)। এই সভায় লালমোহন ঘোষ যে অপূর্ব বাগ্মিতা সহকারে

ভারতবাসীর অভিযোগ ব্যাখ্যা করিলেন—তাহাতে ইংরেজ শ্রোতারা বিস্মিত ও মুগ্ধ হইল। ইহার ফলও হাতে হাতে পাওয়া গেল। এই বক্তৃতার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই—Statutory Civil Service এর নিয়মাবলী বিলাতের কমন্স সভায় পেশ করা হইল। ইহার সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লালমোহন ঘোষ বিলাত হইতে ফিরিবার পথে বোম্বাই শহরের লোকেরা তাঁহাকে এক প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দন করে। এই সভার সভাপতি লালমোহনকে অভ্যর্থনা করিয়া বলেন যে লালমোহন কলিকাতা হইতে প্রতিনিধিরূপে বিলাত গিয়াছিলেন—কিন্তু আমরা তাঁহাকে কেবল কলিকাতার নহে সমস্ত পশ্চিম ভারতেরও প্রতিনিধি বলিয়া অভ্যর্থনা করিতেছি। স্থরেন্দ্রনাথ ভারতময় যে রাজনীতিক ঐক্যের বীজ বপন করিয়াছিলেন তাহা কিরূপ দ্রুত অঙ্কুরিত হইয়াছিল বম্বে শহরে লালমোহনের অভ্যর্থনা তাহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। লালমোহনের একটি উক্তিও বিশেষ স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছিলেন, 'ভারতের যে জনমত আজ ক্ষীণকায় স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে—আমাদের সমবেত চেষ্টায় তাহা একদিন জাতীয় সচেতনতার বেগবতী বিশাল নদীতে পরিণত হইবে।' অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত—এবং ভারতবাসীর স্বার্থহানি-জনক কোন ব্যাপার ঘটিলে সভা ডাকিয়া তাহার প্রতিবাদ করিত। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভার ভারতের উপর চাপানো এবং বিলাতে ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্রশিল্পের স্বার্থে বিলাতী বস্ত্রের আমদানি কর হ্রাস করিয়া দেশীয় বস্ত্রশিল্পের অনিষ্ট সাধন—এই দুয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিবার জন্য যে সভা আহূত হয় তাহাতে প্রায় তিন হাজার লোক উপস্থিত ছিল—এবং এই সভার উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি জানাইয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু চিঠি ও টেলিগ্রাম আসিয়াছিল। দেশের শাসনকার্যে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা দেওয়া এবং তাহার সফলতার সোপানস্বরূপ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে—অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি, জিলা বোর্ড প্রভৃতি পরিচালনায় সরকারী কর্মচারীর প্রভাব কমাইয়া দেশীয় সদস্যদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি নানা বিষয়ে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলন ও কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে। এই সমুদয়ের ফলে একদিকে জাতীয় সচেতনতার এবং অন্যদিকে সর্বভারতীয় রাজনীতিক ঐক্যের বৃদ্ধি হয়।

গ। ইলবার্ট বিল

১৮৮৩ সনে ইলবার্ট বিল আন্দোলনে এই জাতীয়তা ও ঐক্যবোধ সহসা অসম্ভব রকমে জাতীয় চেতনায় সাড়া জাগায়। এই সময় ইংরেজ বিচারক ভিন্ন আর কেহ—এমন কি এদেশীয় সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটও—ইংরেজ অপরাধীর বিচার করিতে পারিত না। ১৮৪৯ সনে গভর্নমেণ্ট এইরূপ অসঙ্গত অধিকার রহিত করার জন্য আইন পাশ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু এদেশীয় ইংরেজ সম্প্রদায়ের বিরোধিতায় সেই "কালো আইন" (Black Acts) প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়—ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৮৮৩ সনে বড়লাটের সভার আইন সদস্য ইলবার্ট সাহেব আবার এই কুপ্রথা বিলোপ করার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। এই উপলক্ষে এদেশের সকল শ্রেণীর ইংরেজগণ যে তুমুল ও অত্যন্ত বিশ্রী রকমের আন্দোলন এবং টাউন হলে প্রকাশ্য সভায় প্রতিবাদ উপলক্ষে যে কুৎসিৎ ভাষা ব্যবহার ও অভদ্র আচরণ করেন তাহার তুলনায় পূর্ববারের আন্দোলন অতিশয় নগণ্য বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু ১৮৪৯ সনের তুলনায় ১৮৮৩ সনে বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনা অনেক বেশী জাগ্রত হইয়াছিল সুতরাং তাহারাও পাল্টা জবাব দেয়। ইংরেজ ও বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের মধ্যেও অভদ্র ভাষায় গালাগালি চলিতে থাকে। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপলক্ষে যে চমৎকার একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখেন তাহা তখন বাঙ্গালীর মুখে মুখে ফিরিত। ইহার আরম্ভ এইরূপ :

"গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান,
ডাক ছাড়ে ব্রান্‌শন্ কেশুয়িক মিলার—
'নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার—নেভার।'
... ...
হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে
সরা ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে ? "নেভার—নেভার" ॥
"নেভার"—সে অপমান হতমান বিবিজান,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা" ?
দেহে প্রাণ, বিবিজান ! কখনো তা হবে না ॥"

ইংরেজেরা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া ভারতের নানাস্থানে প্রতিরক্ষা সমিতি (Defence Association) গড়িল এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা

রটাইতে লাগিল। হেমচন্দ্রের কবিতায় যে ব্রানশনের নাম আছে তিনি ছিলেন একজন ব্যারিষ্টার। কদর্য ভাষায় ভারতীয়দের কুৎসা গাহিয়া তিনি কলিকাতায় বিশেষ কুখ্যাত হইয়াছিলেন—তবে বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষও ইহার "উতোর" (উত্তর) অর্থাৎ পাল্টা জবাব দিয়াছিলেন।

ইংরেজের দল ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। তাহারা বড়লাট রিপনকে কলিকাতা রাজভবনের তোরণের সম্মুখে অপমান করে। রিপন যখন দার্জিলিং হইতে ফিরিতেছিলেন তখন নীলকর ইংরেজের দল এক রেলওয়ে ষ্টেশনে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার প্রতি অশিষ্ট মন্তব্য করে। কটন সাহেব লিখিয়াছেন যে সরকারী কর্মচারী ছাড়া আর সকল শ্রেণীর ইংরেজই ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে যোগদান করে—এবং তাহাদের মধ্যে একদল গোপনে ষড়যন্ত্র করে যে বড়লাট যদি এই আইন পাশ করার সঙ্কল্প ত্যাগ না করেন তবে রাজভবনে ঢুকিয়া তাঁহাকে চাঁদপাল ঘাটে এক ষ্টীমারে জোর করিয়া উঠাইয়া বিলাত পাঠাইয়া দিবে। কটন লিখিয়াছেন যে সরকারী ইংরেজ কর্মচারী—এমন কি উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ানরা—পরোক্ষে এই বিরোধী আন্দোলনের সমর্থন করিত—অর্থাৎ এক কথায় নীলকর, ব্যবসায়ী, ব্যারিষ্টার ও কর্মচারী—সকল ইংরেজই ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে একজোট হইয়াছিল। ইহার ফলে বড়লাট লর্ড রিপন ইচ্ছা থাকিলেও ইলবার্ট বিল পাশ করিতে ভরসা পাইলেন না। উক্ত আইনের খসড়া এমনভাবে পরিবর্তন করা হইল যে মূল উদ্দেশ্যের কিছুই সিদ্ধ হইল না।

ঘ। নিখিল ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন

বাঙ্গালীরা ইহাতে মর্মান্তিক আঘাত পাইল। কারণ সাহেব ও ভারতীয়ের এই দ্বন্দ্ব বাংলায়ই বেশী এবং বম্বেতে কিছু পরিমাণ হইয়াছিল। ভারতের অন্য প্রদেশে এই আন্দোলন বেশী ছড়ায় নাই।

কিন্তু একদিক দিয়া শাপে বর হইল। ইংরেজদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি দেখিয়া বাঙ্গালীরাও ইহার মূল্য বুঝিতে পারিল এবং জাতীয় সচেতনতা ও রাজনীতিক ঐক্যবোধের প্রেরণা এই ঘটনায় অসম্ভব রকমে বাড়িয়া গেল। আর একটি অবান্তর ফল হইল এই যে বিলাত ফেরৎ একদল বাঙ্গালী—যাঁহারা মনে প্রাণে সাহেবীভাবে ডুবিয়া সাহেবদের সমাজে ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের মত মিশিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন—তাঁহাদের এই চেষ্টা ও ভাব অনেকটা শিথিল হইল। এই শ্রেণীর বাঙ্গালীর আত্মচেতনা অনেক পরিমাণে ফিরিয়া আসিল এবং ইংরেজ ও বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে একটি গুরুতর ব্যবধানের সৃষ্টি হইল।

ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা শেষ হইতে না হইতেই আর একটি ঘটনা কেবল বাংলাদেশে নহে ভারতের জাতীয় জীবনে বিষম আলোড়নের সৃষ্টি করিল। হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেব একটি মোকদ্দমায় এক হিন্দুকে তাঁহার বাড়ীর শালগ্রাম শিলা আদালতে আনিবার আদেশ দেন। ইহার বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' (Bengalee) কাগজে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি নরিসকে ইংলণ্ডের ইতিহাসে কুখ্যাত বিচারক জেফ্রির (Jeffreys) সহিত তুলনা করেন এবং মন্তব্য করেন যে নরিস জজের পদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ইহাতে নরিস সাহেব আদালতের অবমাননা (Contempt of Court) করার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করেন। সুরেন্দ্রনাথ ক্ষমা প্রার্থনা করা সত্ত্বেও ইংরেজ জজেরা তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া দুইমাস কারাদণ্ডের আদেশ দেন—যে একজন মাত্র দেশীয় জজ ছিলেন তিনি ইহাতে আপত্তি করেন।

জজ নরিস সাহেব ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। অনেকটা এই কারণেও প্রথম হইতেই এই বিচারপর্ব তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করে। বিচারের সময় আদালতে লোক ধরিত না এবং দণ্ডের আদেশ শুনিয়া বিপুল জনতার এক অংশ—বেশীর ভাগ ছাত্রের দল—উত্তেজিত হইয়া আদালত কক্ষের জানালা ঢিল ছুড়িয়া ভাঙ্গিয়া দেয় এবং পুলিশের গায়েও ঢিল মারে। ব্যাপার এত গুরুতর হইয়া দাঁড়ায় যে সুরেন্দ্রনাথকে প্রকাশ্যে কয়েদীর গাড়ীতে নিতে ভরসা না পাইয়া পুলিশ পশ্চাতের দ্বার দিয়া ঠিকা গাড়ীতে সুরেন্দ্রনাথকে জেলে নিয়া যায়।

ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে ইংরেজদের আন্দোলনের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডও শাপে বর হইল। সমস্ত বঙ্গদেশে ইহা যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি করিল ইহার পূর্বে কখনও সেরূপ দেখা যায় নাই। সমস্ত কাজকর্ম দোকানপাট বন্ধ হইল এবং বাংলার প্রতি শহরে ও বাংলার বাহিরে বহু সংখ্যক প্রতিবাদ সভা হইল। কখনও কখনও শ্রোতার সংখ্যা এত অধিক হইত যে বাহিরে খোলা জায়গায় সভা করিতে হইত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যে সভার ব্যবস্থা করিয়াছিল কলিকাতার বিডন স্কোয়ারে তাহার অধিবেশন হয় (১৮৮৩ সনের ১৬ মে)। প্রায় বিশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল—কলিকাতায় এত বড় সভা পূর্বে কখনও হয় নাই। মফঃস্বলের বহু প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং বহু চিঠি ও টেলিগ্রাম আসিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে বাংলাদেশে এরূপ জনবিক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যায় না। আর কেবল

বাংলাদেশে নহে ভারতের সর্বত্র—আগ্রা, ফৈজাবাদ, অমৃতসর, লাহোর, পুনা প্রভৃতি শহরে—সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সহানুভূতি ও তাঁহার কারাদণ্ডের প্রতিবাদ জানাইবার জন্য জনসভা আহূত হয়। কাশ্মীরে ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ একজন পণ্ডিত "আমাদের ভাই সুরেন্দ্রনাথ আজ জেলে" এই বলিয়া সভাস্থলে কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের ভাব কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল এই সমুদয় সভা সমিতি হইতে তাহা বুঝা যায়।

১৮৮৩ সনের ৪ঠা জুলাই সুরেন্দ্রনাথ মুক্তিলাভ করিলেন। ১৭ই জুলাই তাঁহার অভিনন্দনের জন্য এক বিরাট সভা হয়। দশ হাজারের বেশী লোক হইয়াছিল। এই সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ভারতে ও বিলাতে রাজনীতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে বিধিসম্মত প্রণালীতে আন্দোলন (constitutional agitation) চালাইবার জন্য একটি জাতীয় তহবিল (National fund) গঠন করা হউক। প্রায় কুড়ি হাজার টাকা চাঁদা উঠিল এবং ইহা রাজনীতিক কার্যের জন্য ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের হাতে দেওয়া হইল।[৪৩]

ইলবার্ট বিলের সপক্ষে ও সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের প্রতিবাদে যে উত্তেজনাময় ব্যাপক আন্দোলন হয় তাহাতে ছাত্রগণ একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। তাহারা সভার অনুষ্ঠানে নানা প্রকার সাহায্য করিত এবং গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিত। কোন কোন স্থলে তাহারা যে আইনের সীমা লঙ্ঘন করিয়া ঢিল ছোঁড়া, জানালা ভাঙ্গা প্রভৃতি হিংসাত্মক কার্যেও ব্রতী হইত তাহা পূর্বে বলিয়াছি। বিশ শতকে, বিশেষতঃ বিগত ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে, ইহা খুব সাধারণ ও সুপরিচিত নিত্য ঘটনা হইলেও ১৮৮৩ সনের পূর্বে ইহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ছাত্রগণের রাজনীতিক আন্দোলনে প্রকাশ্যে ও সক্রিয়ভাবে যোগদান করার ইহাই প্রথম ঐতিহাসিক নিদর্শন।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন সমগ্র ভারতের সহিত রাজনীতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিলেও ইহা ছিল একটি প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান মাত্র, সুতরাং ইহার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া অনেকেই একটি নিখিল ভারতীয় রাজনীতিক সংঘের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। ইলবার্ট বিলের প্রতিরোধের জন্য সমগ্র ভারতের ইংরেজ অধিবাসীরা মিলিয়া যে একটি প্রতিরক্ষা সমিতি গঠিত করিয়াছিল, এবং যাহার ফলে তাহাদের সাফল্যের পথ অনেক পরিমাণে সুগম হইয়াছিল তাহাও সম্ভবতঃ এই প্রয়োজনীয়তার দিকে ভারতীয়গণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইলবার্ট বিল ও সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডে ভারতময় যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি

হইয়াছিল ইহাই এইরূপ সংঘ প্রতিষ্ঠার অপূর্ব সুযোগ মনে হইল। ১৮৮৩ সনে গভর্নমেণ্ট কলিকাতায় এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর (International Exhibition) ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই উপলক্ষে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ভারতের নানা প্রদেশ হইতে কলিকাতায় আসিবেন—সুতরাং ইহাও এইরূপ সংঘ প্রতিষ্ঠার অনুকূল হইবে। এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন উত্তর-ভারতে তাহাদের সভার শাখাগুলি এবং বম্বে ও মাদ্রাজের রাজনীতিক সভাগুলির নিকট হইতে অনুমোদন ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি পাইয়া ১৮৮৩ সনের ২৮, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর কলিকাতায় একটি জাতীয় মহাসভা (National Conference) আহ্বান করিল।[৪৪]

এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে দেশের বিভিন্ন রাজনীতিক সম্প্রদায় বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলন করে—ইহাতে অযথা শক্তি ক্ষয় হয়। যদি একই কেন্দ্র হইতে পরস্পর আলোচনার ফলে আমরা একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী স্থির করিতে পারি তাহা হইলে সফলতার সম্ভাবনা অনেক বৃদ্ধি পায়। এই উদ্দেশ্যেই 'জাতীয় মহাসভা' আহূত হইয়াছে। ইহা কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা কোন প্রদেশের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সমগ্র ভারতের যাহাতে কল্যাণ হয় কেবলমাত্র তাহারই চেষ্টা করিবে।

কলিকাতা আলবার্ট হলে ১৮৮৩ সনে ২৮ ডিসেম্বর জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী—মারাঠি, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, বিহারী ও ওড়িয়া—এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শতাধিক প্রতিনিধি এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। রামতনু লাহিড়ী, কালীমোহন দাস, ও অন্নদাচরণ খাস্তগীর যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় দিনের অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত দ্বারা সভার উদ্বোধন করা হইল। প্রধান প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল: (১) কারিগরী শিক্ষা (Industrial and Technical Education); (২) সিভিল সার্ভিসে অধিকতর সংখ্যায় ভারতীয়ের নিয়োগ (Covenanted and Statutory Civil Service); (৩) বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্ করণ; (৪) জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা (Representative Government), (৫) একটি জাতীয় তহবিল (National Fund) সংগঠন, (৬) অস্ত্র আইন (Arms Act) রহিত করণ।

প্রত্যেকটি বিষয় একজন প্রস্তাব ও একজন সমর্থন করিলে আলোচনা হইত

ও অতঃপর ভোটে পাশ হইত। প্রস্তাব ও সমর্থনকারী এবং বক্তাদের মধ্যে ছিলেন মাদ্রাজের ধনকোটি রাজ, বম্বের শ্রীপদ বাবাজী ঠাকুর, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মনমোহন ঘোষ ইত্যাদি।

এই মহাসভার অধিবেশনে দুইজন ইংরেজ উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের একজন, ব্লাণ্ট (Wilfrid Scawen Blunt), *India under Ripon* নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে এই অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। ইহার এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"বেলা বারোটায় আমি এই জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত হইলাম। ইহার গুরুত্ব খুব বেশী—কারণ অনেক বড় বড় শহরের প্রতিনিধিরা সমবেত হইয়াছিলেন এবং আনন্দমোহন বসু তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় যথার্থই মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ইহাই জাতীয় পার্লিয়ামেণ্ট গঠনের প্রথম স্তর। সভার প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়—Covenanted Civil Serviceএর বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের আক্রমণ। ইহার অপেক্ষা সুন্দর বক্তৃতা আমি জীবনে শুনি নাই এবং তাঁহার মতের সহিত আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। অন্য বক্তৃতাগুলিও মোটের উপর ভালই। তবে (সুরেন্দ্রনাথ) ব্যানার্জী ও (আনন্দমোহন) বসু খুবই উচ্চশ্রেণীর বক্তা। সভায় প্রায় একশত জন উপস্থিত ছিল এবং সভার কার্য বেশ প্রশংসাজনক ভাবেই পরিচালিত হইয়াছিল।"

এই অধিবেশনের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া এই মহাসভাকে স্থায়ী রূপ দিবার জন্য ১৮৮৪ সনে সুরেন্দ্রনাথ আবার উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করিলেন এবং লাহোর, অমৃতসর, মূলতান, রাওলপিণ্ডি, অম্বালা, দিল্লী, আগ্রা, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী ও বাঁকিপুর প্রভৃতি স্থানে ভারতের রাজনীতিক ঐক্যের প্রচার করিলেন। ইহার ফলে এই জাতীয় কন্‌ফারেন্‌সের বা জাতীয় মহাসভার লক্ষ্য ও আদর্শ জনপ্রিয়তা লাভ করিল এবং ইহার পুনরায় অধিবেশনের পথ সুগম হইল।

১৮৮৫ সনে ২৫,২৬,ও২৭ ডিসেম্বর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের গৃহে "জাতীয় মহাসভার" দ্বিতীয় অধিবেশন হইল। ইহার প্রথম অধিবেশনে (১৮৮৩ সনে) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যোগদান করে নাই, এবারে তাহারা শুধু যোগ দিল না; ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও কেন্দ্রীয় মুসলমান (Central Muhammadan) অ্যাসোসিয়েশন—কলিকাতার এই তিনটি প্রসিদ্ধ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান মিলিত হইয়া জাতীয় মহাসভা আহ্বান

করিল। এই অধিবেশনে অভিজাত সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রতিনিধিও যোগদান করিয়াছিলেন—ইঁহাদের মধ্যে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, নেপালের রাজদূত, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, দুর্গাচরণ লাহা, জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, রায় বদ্রীদাস বাহাদুর, প্যারীমোহন মুখার্জী, কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক, কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে মহেন্দ্রলাল সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কালীশঙ্কর সুকুল, আমীর আলী, গুরুদাস ব্যানার্জী, কালীমোহন দাস এবং আরও অনেকে ছিলেন।

প্রথম অধিবেশনের ন্যায় এবারেও প্রতিদিনের জন্য একজন সভাপতি নির্বাচিত হইতেন। দুর্গাচরণ লাহা, জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, এবং মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের সভাপতি ছিলেন। সর্বপ্রথমে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আইনসভার পুর্নগঠন (Reconstitution of the Legislative Councils) সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। যাহাতে পরিণামে এদেশে বিলাতের ন্যায় পার্লিয়ামেণ্টের শাসন প্রবর্তিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিধান পরিষদ্গুলিতে অধিকতর সংখ্যায় ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করা প্রয়োজন এবং কি উপায়ে ইহা সম্ভবপর হয় তাহার নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন—ইহাই ছিল প্রস্তাবটির মূল কথা। সুরেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাব ১৩ জন প্রতিনিধি সমর্থন করেন এবং ১৯ জনকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। ইহার সদস্যেরা সকলেই পরবর্তীকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

(১) অস্ত্র আইন রহিত করণ; (২) সামরিক ও সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগ; এবং হোম চার্জ (Home Charge) প্রভৃতি দফায় ব্যয় হ্রাস করার সম্ভাব্যতা ও প্রয়োজনীয়তা; (৩) সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষার সংস্কার এবং ভারতে ও লণ্ডনে একসঙ্গে ঐ পরীক্ষা গ্রহণ; (৪) বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক করণ।

তৃতীয় দিনের অধিবেশনে স্থির করা হইল যে প্রতি বৎসর ভারতের এক একটি বড় শহরে এইরূপ জাতীয় সভার অধিবেশন করা হউক।

কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। কলিকাতায় জাতীয় কনফারেন্সের (National Conference) দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষ হয় ২৭ ডিসেম্বর (১৮৮৫)। ঠিক তাহার পরদিনই বম্বে শহরে 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের' প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হইল। কলিকাতায় জাতীয় কনফারেন্সের শেষ অধিবেশনের পর উপস্থিত প্রতিনিধির পক্ষ হইতে কংগ্রেসের সহিত সহানুভূতি জানাইয়া এক

তারবার্তা প্রেরণ করা হইল। একই উদ্দেশ্যে গঠিত এই দুই রাজনীতিক সভার অধিবেশন প্রায় একই সময়ে কেন হইল, এবং অতঃপর কেন কলিকাতার জাতীয় কনফারেন্‌সের আর কোন অধিবেশন হইল না এবং ইহা কংগ্রেসের অঙ্গীভূত হইল—ইহা একটি রহস্যময় ব্যাপার। কলিকাতার জাতীয় কনফারেন্‌সের কথা কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ জানিতেন—অথচ একই সময়ে অধিবেশন করিলেন, এবং জাতীয় কনফারেন্‌সের প্রবর্তক ও প্রাণস্বরূপ সুরেন্দ্রনাথকে দলে নেওয়া তো দূরের কথা এ বিষয়ে পূর্বে কিছুই জানাইলেন না—ইহা খুবই বিস্ময়কর সন্দেহ নাই।

সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"আমরা যখন কলিকাতায় জাতীয় কনফারেন্‌সের অধিবেশনে ব্যস্ত ছিলাম তখন একই উদ্দেশ্যে কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ইহার নির্বাচিত সভাপতি উমেশ ব্যানার্জী (W. C. Bonnerjee) আমাকে ইহাতে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম যে আমি কনফারেনস অধিবেশনের ব্যবস্থার জন্য খুব বেশী কাজ করিয়াছি, এবং এখন ইহা বন্ধ করিবার সময় নাই—সুতরাং ইহা ত্যাগ করিয়া আমার পক্ষে বম্বে যাওয়া সম্ভব নহে।"

অন্যত্র সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"জাতীয় কনফারেন্‌স ও জাতীয় কংগ্রেস একই উদ্দেশ্যে গঠিত—উভয়ের মত, অভিযোগ, ও আশা একই—উভয়েরই অধিবেশন এক সময়ে হইল। অতঃপর যাহারা আমাদের সঙ্গে কাজ করিত তাহারা কংগ্রেসে যোগ দিল এবং সম্পূর্ণভাবে ইহার সহযোগিতা করিত।" সুরেন্দ্রনাথের আর একটি উক্তি হইতে মনে হয় যে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ইংরেজ জাতি ক্ষীণ দুর্বল বাঙ্গালী অপেক্ষা হিন্দুস্থান ও পাঞ্জাবের সামরিক অধিবাসীদের বেশী মর্যাদা দেয়—সুতরাং বাঙ্গালীর দ্বারা অনুষ্ঠিত জাতীয় কনফারেন্‌স অপেক্ষা, একজন ইংরেজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে'র মতামতকে বেশী মূল্য দিবে। সম্ভবতঃ এই কারণেই জাতীয় কনফারেন্‌সের দল লইয়া তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এইরূপ স্বার্থ-ত্যাগ প্রকৃত দেশপ্রেমের লক্ষণ।

যদিও জাতীয় কনফারেন্‌স্ খুব অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল—তথাপি নিখিল ভারতের প্রথম রাজনীতিক সম্মেলন এবং পরবর্তীকালে সুপ্রসিদ্ধ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পথপ্রদর্শকরূপে ইহা আধুনিক যুগের ভারতের ইতিহাসে

চিরদিনই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। আর ইহাই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সর্বপ্রধান কীর্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬। নিখিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress)

১৮৮৫ সনের পর হইতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই রাজনীতিক আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইল। বাংলাদেশের ইতিহাসে ইহার উৎপত্তি ও কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে এ প্রসঙ্গে বাংলার দিক হইতে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ও আলোচনার বিষয় প্রভৃতির দিক হইতে ১৮৮৫ সনের কংগ্রেস অধিবেশন—কলিকাতার জাতীয় কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন তো দূরের কথা, ইহার প্রথম অধিবেশন অপেক্ষাও কম গুরুত্বপূর্ণ, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

১৮৮৬ সনে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের সময় হইতেই ইহার প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাঙ্গালী নেতাদের সহযোগিতাই যে ইহার মূলে ছিল তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এই সিদ্ধান্ত ভারতের অন্য প্রদেশের অনেকেই মানিবে না, সুতরাং ইহার সপক্ষে কয়েকটি যুক্তি দিতেছি।

১। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথকে বিশেষ আমল দেওয়া হয় নাই। কিন্তু কলিকাতায় দ্বিতীয় অধিবেশনের পূর্বে কংগ্রেসের প্রধান উদ্যোক্তা হিউম সাহেব সুরেন্দ্রনাথের সাহায্য লাভ করিবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ চেষ্টা করেন[৪৫]—এবং সুরেন্দ্রনাথও এই অধিবেশনের সফলতার জন্য বিশেষ আগ্রহ সহকারে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

২। প্রথম অধিবেশনে মাত্র ৭২ জন লোক ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত ছিল—কিন্তু কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানের প্রকাশ্য সভায় প্রায় পাঁচশত প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ৪৩৪ জন তাঁহাদের নির্বাচনপত্র দেখাইয়া নাম রেজেষ্ট্রী করাইয়াছিলেন। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, জনসাধারণের দর্শকরূপে অধিবেশনে যোগদানের ব্যবস্থা করা। ইহা ছাড়া কি কি প্রস্তাব এই অধিবেশনে উপস্থিত করা হইবে এবং কি কি বিষয় ইহাতে আলোচনার যোগ্য সে সম্বন্ধে পূর্বেই প্রতিনিধিদের নিকট সার্কুলার পাঠানো

হইয়াছিল। মোটের উপর ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অপেক্ষা কলিকাতায় দ্বিতীয় অধিবেশনে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও জাতীয়তার ভাব অনেক বেশী দেখা গিয়াছিল।

৩। এই সমুদয় যে বাংলার অধিকতর জাতীয় সচেতনতার প্রতিক্রিয়া মাত্র তাহার একটি পরোক্ষ প্রমাণ এই যে দ্বিতীয় অধিবেশনের পর হইতে জাতীয় কংগ্রেসকে অনেকেই বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে করিত। অনেকেই বিশ্বাস করিত যে কংগ্রেসের দাবি বাঙ্গালীর দাবির প্রতিধ্বনি মাত্র। এইরূপ ভাবের এক মন্তব্য শুনিয়া ডেরা ইসমাইল খানের প্রতিনিধি মালিক ভগবান দাস বলিয়াছিলেন—"আমাকে কি বাঙ্গালীবাবুর মত দেখায়? কংগ্রেস যে শাসন সংস্কারের দাবি করিতেছে—বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা চায়।"

কিন্তু অনেক বড় বড় লোকেরাও বিশ্বাস করিতেন যে কংগ্রেস-আন্দোলনটা বাঙ্গালীরই ব্যাপার। আলিগড়ের সৈয়দ আহমদ খান কংগ্রেসের ঘোর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ইহা যে মুসলমানের স্বার্থ-বিরোধী তিনি ইহা প্রকাশ্যে প্রচার করিতেন। যাহাতে মুসলমানেরা কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান না করে তাহার জন্য তিনি প্রচার কার্য ছাড়াও অন্যান্য অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন—এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশ তাঁহার প্রভাবে কংগ্রেসে যোগদান করে নাই। মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হইবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি এক সভায় বলিয়াছিলেন: "যদি তোমরা চাও যে বাঙ্গালীরা এদেশে প্রভুত্ব করুক এবং দেশের উৎপীড়িত লোকেরা বাঙ্গালীর জুতা চাটুক, তবে ভগবানের নাম নিয়া রেলগাড়ীতে চড়ে সোজা মাদ্রাজ চলে যাও।"[৪৬]

ভারতের বড়লাট লর্ড ডাফরিন ১৮৮৭ সনের ৪ঠা জানুআরি—অর্থাৎ কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের অব্যবহিত পরে—বিলাতে সেক্রেটারী অব ষ্টেটকে লিখিয়াছিলেন: "আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে মুসলমানেরা কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করে নাই......তাহারা বেশ বুঝিয়াছে যে বাঙ্গালীর শাসনে (under a Bengali constitution) তাহাদের অবস্থা আরও খারাপ হইবে।" ইহার তিন বৎসর পরে "সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস"-লেখক প্রসিদ্ধ ম্যালিসন সাহেব (Malleson) মন্তব্য করিয়াছিলেন যে "গলাবাজিতে পটু বাঙ্গালীরাই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহারা যে প্রকার গণতন্ত্র শাসন (representative institution) দাবি করে, ভারতের সামরিক জাতি—শিখ, রাজপুত, রোহিলা, জাঠ, এবং সীমান্তের পাঠান—সকলেই তাহা ঘৃণা করে।"[৪৭]

১৮৮৪ সনে—অর্থাৎ কলিকাতায় প্রথম জাতীয় কনফারেন্সের পরে এবং দ্বিতীয় কনফারেন্স্ ও জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বে—সুরেন্দ্রনাথ যে উত্তর ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া রাজনীতিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে লিখিয়াছি। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার 'আত্মজীবনচরিতে' লিখিয়াছেন : "এই ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্য এবং বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীদের সাথে উত্তরের সামরিক জাতিদের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন। সে যুগে আমাদের কেহই গণ্য করিত না ; সর্বদাই কানে কেবল এই কথাই শুনিতে হইত যে আমাদের যে সমুদয় রাজনীতিক দাবি, তাহা কেবল গঙ্গানদীর মোহনায় যাহারা বাস করে—সৈন্যদলে যাহাদের একজনও নাই এবং উত্তরের সামরিক জাতি হইতে যাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—তাহাদেরই দাবি। আজ কংগ্রেসের গঠনে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে স্বদেশভক্তিমূলক রাজনীতিক প্রচেষ্টায় পূর্বোক্ত উক্তি মিথ্যা ও অসার প্রতিপন্ন হইয়াছে।"[৪৮]

এই উক্তিতে সুরেন্দ্রনাথ যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন সম্ভবতঃ তাহার প্রভাবেই বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কনফারেন্সের প্রাচীনত্বের দাবি থাকিলেও ইহার পরিবর্তে ইহারই অনুকরণে পরে গঠিত জাতীয় কংগ্রেসে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। ইহা সত্যই মহানুভবতার পরিচায়ক। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে ইহাতে বাংলার অগ্রগতি অনেকটা রুদ্ধ হইল। বিপিনচন্দ্র পাল বলেন যে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগদান করিয়া রাজনীতিক 'হারিকিরি' (আত্মহত্যা) করিলেন।[৪৯]

এই সকল মন্তব্যের মূলে যে মনোভাব ছিল—তাহা একেবারে তুচ্ছ বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না। কংগ্রেস বৎসরে একবার মাত্র তিন দিনের জন্য সমবেত হইত—বাকি সারা বৎসর রাজনীতিক আন্দোলনের বড় একটা ধার ধারিত না। আর কংগ্রেসে সর্বভারতীয় ব্যাপারই আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল—কোন প্রদেশের কোন সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিলেও কংগ্রেসে ইহার সম্বন্ধে কোন আন্দোলন হইতে পারিত না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে যখন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা চা-বাগানের কুলিদের দুর্দশা ও তাহাদের প্রতি অত্যাচারের বিষয় কংগ্রেসে উত্থাপন করিতে চাহিলেন তখন ইহা কেবল মাত্র প্রাদেশিক ব্যাপার বলিয়া ইহার আলোচনা নিষিদ্ধ হইল।

এই সমুদয়ের প্রতিবিধানের জন্য বাংলাদেশে কংগ্রেসের অধীনে প্রাদেশিক কনফারেন্স্ (Bengal Provincial Conference) প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাতে

বাংলাদেশের বিভিন্ন জিলার প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে বাংলাদেশের সমস্যাগুলির আলোচনা করিতেন। ১৮৮৭ সনে ইহার প্রথম অধিবেশন হইল। ইহারও বৎসরে একবার করিয়া বৈঠক হইত। ইহার পরে অনেক জিলায়ও প্রতি বৎসর একটি রাজনীতিক কনফারেন্স্ হইত। ওদিকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া পূর্বের ন্যায় রাজনীতিক আন্দোলন চালাইত। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় ছিল যে অতঃপর কংগ্রেসই ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হইবে—এবং অন্যান্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল মাত্র তাহার সহযোগী হইবে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ইহাতে সম্মত হইল না। ইহা পূর্বের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে দেশের কল্যাণকর কার্যে আত্মনিয়োগ করিল এবং স্থির করিল যে মাঝে মাঝে কনফারেন্স্ ডাকিয়া ভারতীয় ও বিদেশী প্রসিদ্ধ লোকদের সঙ্গে দেশের শাসন সংক্রান্ত নানা ব্যাপার আলোচনা করিবে। ১৮৯৬ সনে ১৫ ফেব্রুআরি প্রথম কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। ইহাতে লাখেরাজ কর, (Cess), জুরী প্রথা ও মফঃস্বলের জলকষ্টের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ২১ ফেব্রুআরি আলাপ আলোচনার জন্য একটি বৈঠক হয়। ইহাতে বাংলার ছোটলাট, বড়লাটের সভার সদস্যবৃন্দ, হাইকোর্টের জজ, অনেক বড় বড় সরকারী কর্মচারী ও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৭ সনে কংগ্রেস ও বাংলা প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেসের প্রেরিত প্রতিনিধিদের উপর নির্দেশ ছিল যে বিধান পরিষদ (Legislative Council) এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের আলোচনায় তাহারা যোগ দিবে না।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কংগ্রেসের ন্যায় ব্যাপকভাবে রাজনীতিক আন্দোলন ও শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব না করিলেও দেশের কল্যাণ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিল না। গভর্নমেণ্টের নিকট ইহার খুব প্রতিপত্তি ছিল—এবং গভর্নমেণ্ট অনেক বিষয়ে ইহার মত জানিতে চাহিত। অ্যাসোসিয়েশন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও অনেক বিষয়ে গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত ও মতামত ব্যক্ত করিত। গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিষয় অ্যাসোসিয়েশনকে লিখিলে, অ্যাসোসিয়েশন গান্ধীর সমর্থন করিয়া এ বিষয়ে ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট তীব্র প্রতিবাদ করে, এবং তিলকের কারাদণ্ড হইলে বিক্ষোভ প্রকাশ করে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ভারতের

জাতীয় কংগ্রেসকে কেন্দ্র স্বীকার করিয়া তাহার সহযোগিতা করে—এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশের অভাব অভিযোগ ও সমস্যাগুলির সম্বন্ধেই আলোচনা ও আন্দোলন করে। বাংলাদেশের নানা স্থানে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এব জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিক সচেতনতার সঞ্চার ও অন্যান্য নানাপ্রকার হিতকর কার্যে ইহারা ব্রতী হয়।

চা-বাগানের কুলীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের বিষয় সরেজমিনে অনুসন্ধান ও তাহার প্রতীকারের জন্য আন্দোলন ইহার একটি বিশেষ প্রশংসনীয় উদ্যম। বাংলার প্রাদেশিক কনফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশনের ব্যবস্থাও বহুদিন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনই করিত—এবং এই সমুদয় অধিবেশনে দেশের শাসন-সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। বাংলা ও ভারত গভর্নমেণ্ট শাসন-সংক্রান্ত বড় বড় ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মতামত ও পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইত। বাংলার রাজনীতিক সচেতনতা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে নবপ্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি অনেক বাঙ্গালী নেতার মনঃপূত হইত না। ১৮৯৭ সনে অমরাবতী শহরে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত 'ইহাকে তিন দিনের তামাসা' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।[৫০]

কংগ্রেস যে আবেদন করা ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে না, এবং কংগ্রেসের সহিত জনসাধারণের যে কোন যোগাযোগ ছিল না বাঙ্গালীরা ইহাই তাহার সর্বপ্রধান ত্রুটি বলিয়া মনে করিত। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সরস ভাষায় অনেক ব্যঙ্গ করিয়াছেন। 'কমলাকান্তের পত্রে', 'পলিটিকস্' এবং 'লোক রহস্যের' 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল'—ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রীঅরবিন্দের সমালোচনার কথাও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৯৭ সনে অশ্বিনীকুমার দত্ত ভারতে গণতন্ত্রমূলক শাসন-ব্যবস্থা (Representative System of Government) প্রতিষ্ঠার জন্য বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে এক আবেদনপত্র পাঠান। ইহাতে চল্লিশ হাজার লোকের স্বাক্ষর ছিল—ইহাদের মধ্যে কৃষক, তাঁতি, ছুতার, মুচি, দোকানদার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই ছিল।[৫১]

বাংলাদেশের অনেক পত্রিকায় কংগ্রেসের তীব্র নিন্দা দেখা যায়। 'ভারতবাসী' (১৮৮৬, ১১ ডিসেম্বর) মন্তব্য করে যে জনসাধারণের স্বার্থের দিকে কংগ্রেসের লক্ষ্য নাই—সুতরাং ইহাকে জাতীয় কংগ্রেস বলা যায় না; ইহা কেবল ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কংগ্রেস। 'গরীব' নামক পত্রিকাও ঐরূপ মন্তব্য করে (১৮৮৬,

২৯ ডিসেম্বর)। ১৮৮৭ সনের ৯ জানুআরি সংখ্যায় 'দৈনিক' পত্রিকা কংগ্রেসের নেতাগণকে 'ভাবপ্রবণ বাক্যবাগীশ বাবুর দল' বলিয়া বিদ্রূপ করে। 'ঢাকা গেজেটে' (১৮৮৮, ২৩ জুলাই) বলা হয় যে, যাহাদের পেটে অন্ন নাই, গায়ে বস্ত্র নাই তাহাদের পক্ষে রাজনৈতিক দাবির মূল্য কি ? 'হিতকারী' (২৯ ডিসেম্বর, ১৮৯০), 'বঙ্গনিবাসী' (৯ জানুআরি, ১৮৯২) প্রভৃতি পত্রিকাও জনগণের সহিত কোন সংস্রব না রাখার জন্য কংগ্রেসের সমালোচনা করে, এবং যাহাতে মফঃস্বলের সাধারণ লোকের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হইতে পারে তাহার জন্য অনুরোধ করে। ১৮৯০ সনের ২৭ ডিসেম্বর সংখ্যায় 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় লেখা হয়, "ভিক্ষা দ্বারা কিছু লাভ করা যায় না। আগে মানুষ হও তারপর রাজনীতিক অধিকারের দাবি করিও"। বঙ্গবাসী পত্রিকা সাধারণত কংগ্রেসকে "কঙ্গ-রস" এই বিদ্রূপাত্মক সংজ্ঞায় অভিহিত করিত।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের (১৮৮৬) উদ্বোধনে যুবক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার স্বরচিত "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে .... " এই গানটি গাহিয়াছিলেন। কিন্তু দশ বৎসর পরে অন্যান্য অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর ন্যায় তাঁহার কিরূপ মত পরিবর্তন হইয়াছিল তাঁহার পুত্রের লিখিত "পিতৃস্মৃতি" গ্রন্থে বর্ণিত (১১-১২ পৃঃ) নিম্নলিখিত কাহিনীতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

১৮৯৬ সনে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে তিন দিন নানা প্রদেশের বড় বড় নেতারা দেশোদ্ধার সম্বন্ধে অনেক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন। ইহা পরে শ্রীতারক পালিত ইঁহাদের সকলকে নৈশ ভোজের নিমন্ত্রণ করেন। রবীন্দ্রনাথকেও নিমন্ত্রণ করিলেন এবং গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ধুতি পরিধান করিয়া সেই হ্যাট কোটধারী নেতৃবর্গের সঙ্গে ভোজন করিলেন। বিলাতী প্রথা মত আহারান্তে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করিলে রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন :

"আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা ?
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস, কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে গভীর মরম বেদনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা ?
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি, কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি—
মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে, মিছে কাজে নিশিযাপনা !

কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা ?
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা ?"

কাহিনীটির উপসংহার এইরূপ : "গান শুনে সকলে স্তব্ধ। ডিনার পার্টি মাটি হয়ে গেল। মুখ বিষণ্ণ করে একে একে সবাই চলে গেলেন।"

কিন্তু কংগ্রেসের সমর্থকও বাংলাদেশে অনেক ছিল। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় কংগ্রেসকে 'নিদ্রামগ্ন জাতির নবজাগরণের প্রথম সূচনা, দেশমাতৃকার পূজার প্রথম বোধন, এবং হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী, শিখ প্রভৃতি দেশজননীর বহু সন্তানের মিলন ক্ষেত্র' বলিয়া অভিনন্দিত করা হয়। জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের যোগ না থাকিলেও সর্বদেশে ও সর্বকালে যে শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণ লোকের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবার জন্য অগ্রসর হয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 'সঞ্জীবনী' মন্তব্য করে যে, এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে কংগ্রেস যে ভারতবাসীর প্রতিনিধিমূলক সভা ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। উইলবারফোর্স নিজে ক্রীতদাস ছিলেন না, গ্ল্যাডষ্টোনও আইরিশ ছিলেন না—কিন্তু তাঁহারা ইহাদের মুক্তি সংগ্রামের নেতা ছিলেন। কংগ্রেস যে কেবল আবেদন নিবেদন করে ইহার সমর্থনে বলা হয় যে কংগ্রেস স্বাধীনতা চায় না, শাসনের উন্নতি চায়, সুতরাং বিদ্রোহ বা সংগ্রামের পরিবর্তে আবেদন ও আন্দোলনই অবলম্বন করে।

সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে উত্তর ভারতের অনেক মুসলমানই যে কংগ্রেসের বিরোধী ছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিবার কিছু নাই। কারণ উনিশ শতকের গোড়া হইতেই যে রাজনীতি বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে চিন্তা ও আদর্শের মৌলিক প্রভেদ দেখা যায়, তাহার ফলে এই দুই সম্প্রদায় পৃথক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে স্বতন্ত্রভাবে রাজনীতিক আন্দোলন করে, এবং হিন্দুরা যে এইরূপ প্রভেদ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে করিয়া তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করে ; বিধান পরিষদের প্রস্তাব হইলে দুই সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক দুইটি সমিতি করার জন্য লর্ড এলেনবরোর প্রস্তাব ও তাহার বিরুদ্ধে প্যারীচাঁদ মিত্রের আপত্তি,—এ সমুদয়ই পূর্বে বলা হইয়াছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে এই ভেদ-বুদ্ধি আরও প্রসার লাভ করে। ১৮৬৩ সনে আবদুল লতিফ কলিকাতায় 'মুসলমান সাহিত্য সমাজ' (Mohammedan Literary Society) প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক রাজনীতি, জ্ঞান ও চিন্তা প্রচার করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। নবগোপাল মিত্র হিন্দু মেলা ও জাতীয় সভা (National

Society) স্থাপন করার পরে ১৮৭৭ সনে সমুদয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা উদ্বোধন ও ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে নবাব আমির আলি খান National Muhammadan Association প্রতিষ্ঠা করেন।

এই ভেদ বুদ্ধি ক্রমশঃ কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল ১৮৮৩ সনে তাহার দুইটি স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে মুসলমানেরা হিন্দুদের সহিত যোগ দেয় নাই। এই সময়ে পূর্বোক্ত ব্লাণ্ট সাহেব (Blunt) কলিকাতায় ছিলেন, তিনি বহু মুসলমান নেতাদের সঙ্গে দেখা করিয়া নানারূপ যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা মুসলমানেরা যাহাতে হিন্দুর সহিত একযোগে ইলবার্ট বিলের প্রতিবাদ করে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মুসলমানদের রাজি করাইতে পারিলেন না। তিনি লিখিয়াছেন যে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পর হইতেই মুসলমানেরা তাঁহার নিকট হিন্দুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে থাকে।[৫২]

দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে আইন প্রণয়নের সময় এই সাম্প্রদায়িক ভেদ আরও প্রকট হইয়া ওঠে। প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার তাঁহার রিপোর্টে লেখেন যে এবিষয়ে হিন্দুরাই আন্দোলনকারী এবং তাহাদের প্রস্তাব অনুযায়ী যদি 'লোকাল বোর্ড' স্থাপিত হয় তাহা হইলে নির্বাচিত প্রায় সকল সদস্যই হইবে হিন্দু। এই মন্তব্য সমর্থন করিয়া মুহম্মদ ইউসুফ ১৮৮৩ সনে ৩রা মে বিধান সভায় (Legislative Council) বলেন "অধিকাংশ স্থানে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ—সুতরাং সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য কয়েকটি সদস্যের পদ সংরক্ষিত (reserved) করা হউক।

১৮৫২ সনে লর্ড এলেনবরো ও আরও কয়েকজন ইংরেজ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—এবং একজন হিন্দু ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ও মুসলমানেরা কিছুই বলেন নাই। কিন্তু এবারে মুসলমানেরাই এইরূপ দাবি করিলেন।[৫৩]

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এই প্রভেদ চরমে পৌঁছিয়াছিল। ইহার নেতা ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ ও ইহার প্রধান কেন্দ্র ছিল আলিগড়। ইহার বিশেষ কারণও ছিল। কংগ্রেস প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্রের দাবি করিত। প্রতিনিধিরা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। ভারতে মুসলমানেরা সংখ্যায় হিন্দুর চারিভাগের এক ভাগ। সুতরাং নির্বাচনের ফলে শাসন পরিষদে বা বিধান সভায় মুসলমানেরা চিরকালই সংখ্যায় কম থাকিবে —এবং যেহেতু ভোটের দ্বারাই সব বিষয় নিরূপিত হইবে, ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে যে মুসলমানদের চিরকালই হিন্দুর অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। এই আশঙ্কা যে একেবারে ভিত্তিহীন ছিল এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

৩। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের বৃদ্ধি

উনিশ শতকের শেষার্ধে একদিকে যেমন জাতীয়তাভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল অন্যদিকে তেমনি ইংরেজ ও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও অভিযোগেরও বৃদ্ধি হইল। এ দুয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে। উনিশ শতকের প্রথমে জাতীয়তা-ভাবের জাগরণের পূর্বে হিন্দু নেতাগণ মুসলমান শাসনের পরিবর্তে ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে তিনি স্বাধীনতা অপেক্ষা ব্রিটিশের অধীনতাই পছন্দ করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে এই মনোভাবের পরিবর্তন হইল। বাঙ্গালীর মনে স্বাধীনতার আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল—এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ইংরেজ শাসনের কুফল এবং তাহাতে দেশের যে অনিষ্ট হইতেছে সে সম্বন্ধে বাঙ্গালীরা ক্রমশঃ অধিকতর সচেতন হইল। অন্যদিকে ইংরেজ শাসনে দেশের অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তা ভাবেরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইল। সুতরাং এই দুইটি মনোবৃত্তি যে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বদ্ধ তাহা অস্বীকার করা কঠিন।

অবশ্য উনিশ শতকের শেষার্ধেও যে বাঙ্গালীরা ইংরেজ শাসনের গুণ ও উপ-কারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমসাময়িক পত্রিকাগুলি পড়িলে বেশ বোঝা যায় যে পূর্বের ন্যায় ইংরেজ শাসনের গুণ কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরুদ্ধ মনোভাবও ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে। বস্তুতঃ একটু প্রণি-ধান করিলেই দেখা যায় যে বিংশ শতকের আরম্ভে ভারতের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগত ভাবে এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনীতিক সভার মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের যে সব ত্রুটি, বিচ্যুতি ও সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন ৭০।৮০ বৎসর পূর্বেই তাহার প্রায় সবগুলিই বাংলাদেশের নানা সাময়িক পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছে।[৫৪]

১৮৫০ সনের ১লা মে 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদক "ব্রিটিশ জাতি এ দেশের যথার্থ হিতকারী কিনা" এই বিষয়ে যে সুদীর্ঘ মন্তব্য করিয়াছেন তাহা সাধারণ জনমতের একটি উৎকৃষ্ট সার সঙ্কলন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। তিনি প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন যে "এই প্রস্তাব লইয়া অনেকেই বাদানুবাদ করিয়া থাকেন, এবং কেহ বা ইহার অনুকূলে এবং কেহ বা ইহার প্রতিকূলে অভিমত ব্যক্ত করেন।" ইহা হইতে বোঝা যায় যে ঐ সময়ে দেশের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষিত জন-

সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশানুরাগের সূচনার ইহা একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

পূর্বোক্ত 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদকীয় মন্তব্যে ব্রিটিশ শাসনের উপকারিতা ও অনিষ্ট এ দুয়েরই যে বিবরণ আছে নিম্নে তাহার সারমর্ম দিতেছি।

উপকারিতা

১। উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী ও তাহার ফলে দেশে শান্তি স্থাপন ও প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা।

২। যাতায়াতের উত্তম ব্যবস্থা, Post অর্থাৎ ডাক গমনাগমন।

৩। বিদ্যা শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

কিন্তু এই উপকারের বিনিময়ে ব্রিটিশ জাতি ভারতবর্ষ হইতে যে উপকার পাইতেছেন তাহা অনেকগুণে বেশি।

১। ভারতের অর্থলুণ্ঠন।

"ভূমিকর, স্টাম্পের কর, আদালতের খরচা, লবণের কর, আফিমের কর, বাণিজ্য দ্রব্যের মাসুল ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা যে বিপুলার্থ উপার্জ্জন হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশ গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রধান প্রধান কর্ম্মকারকগণ ও তাঁহারদিগের জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের উদরেই যায়,......এইরূপে এদেশের অনেক টাকা সিবিলদিগের গর্ভেই যায়, এতদ্ভিন্ন মিলিটরী অর্থাৎ সেনাদিগের ব্যয় ও জাহাজ বিষয়ক ব্যয় আছে তাহাতেও ইংরাজরা অনেক টাকা পাইয়া থাকেন, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে সিপাহী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি তাহার অংশ প্রাপ্ত হয় না।"

২। লবণের ও আফিমের একচেটিয়া বাণিজ্য।

"একে রাজার বাণিজ্য করাই অন্যায় ও অনীতিসূচক তাহাতে আবার একচেটিয়ারূপে বাণিজ্য করা কত বড় অন্যায় তাহা বিজ্ঞ মণ্ডলী বিবেচনা করিবেন, অতএব যে রাজা স্বীয় শক্তি প্রচার পূর্ব্বক একচেটিয়া বাণিজ্য করেন সেই রাজা কিরূপে প্রজার যথার্থ হিতবর্দ্ধকরূপে গণ্য হইতে পারেন এইস্থলে আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে ব্রিটিস রাজপুরুষেরা যদ্যপি এই দেশ হইতে অর্থ গ্রহণ করণ পরিত্যাগ করেন ও সিবিলিয়ানদিগের বেতন কর্ত্তন করিয়া দেন ও ঘৃণিত একচেটিয়া বাণিজ্য পরিত্যাগ করেন, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের পদোন্নতি করিয়া দেন ও সাধারণের হিতবর্দ্ধনে বিহিত যত্ন ও অনুরাগ করেন তবে তাঁহারা এই ভারতবর্ষের যথার্থ হিতকারি বন্ধু বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।"[৫৫]

এ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ মন্তব্য ও এই প্রসঙ্গে পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি আলোচনা আছে। ইহাতে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেক ইংরেজের মত উদ্ধৃত হইয়াছে এবং "হাইণ্ডম্যান সাহেব (Hyndman) দেশীয় রাজ্যের প্রজার সহিত ইংরেজ রাজ্যের প্রজার অবস্থার তারতম্য করিয়া" যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম উদ্ধৃত হইয়াছে।[৫৬] ইহার মধ্যে প্রজাদের করভারের আধিক্য ও ইহা আদায়ের জন্য উৎপীড়ন, দেওয়ানী আদালতের ভয়ানক সর্বস্বান্তকারী খরচ, বাৎসরিক বিশ কোটি টাকা ভারত হইতে ইংলণ্ডে প্রেরণ, পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব, ও প্রজাদের চরম দারিদ্র্য প্রভৃতি এবং এগুলি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আফগান যুদ্ধের ব্যয়ভারের এক অংশও ইংরেজ সরকার দিতে অস্বীকার করায় তাহার বিরুদ্ধে সুকঠোর মন্তব্য করা হইয়াছে। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও ইংরেজ শাসন দূর করার কথা তখন কোন হিন্দু কল্পনাও করে নাই।

তবে ১৮৮২ সনে 'সোমপ্রকাশে' জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।[৫৭] কয়েকটি বিষয়ে ইংরেজ জাতির প্রতি বিরুদ্ধভাব পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

ইংরেজ পাদ্রীগণের ছলে বলে কৌশলে সুকুমারমতি হিন্দু কিশোরগণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা করান, চা বাগানের কুলি ও নীলচাষীদের উপর সাহেবদের অত্যাচার, এবং অন্যান্য ইংরেজদের বিশেষতঃ সিভিলিয়ান ও গোরা সৈন্যের এদেশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার, মুসলমানদের প্রতি সরকারের পক্ষপাত,[৫৮] উচ্চ রাজকার্যে উপযুক্ত হইলেও দেশীয় লোককে নিযুক্ত না করা,[৫৯] ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা দেশের আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধনে সরকারের ঔদাসীন্য ও কোন কোন স্থলে বিরোধিতা,[৬০] ছলে বলে কৌশলে দেশীয় রাজ্যগুলি অধিকার, ইত্যাদি। খ্রীষ্টান মিশনারীদের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের ও জনসাধারণের যে অভিমত পূর্বে খ্রীষ্টধর্ম প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ১৯৫-৮) তাহার অনুরূপ উক্তি উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সাময়িক পত্রিকায় প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

১ মফঃস্বলে সিভিলিয়ানদের বহু অত্যাচার ও অবিচারের কাহিনী সমসাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে—এবং সম্পাদক ও পত্রপ্রেরকরা এ বিষয়ে কঠোর মন্তব্য করিয়াছেন। ১৮৫০ সনের নূতন এক নিয়ম অনুসারে যে কোন সিভিলিয়ান কোন ব্যক্তির ৫০ টাকা জরিমানা অথবা ১৫ দিন কারাবাসের দণ্ড বিধান করিলে তাহার বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিত না। ইহাতে তাহাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া যায়। নড়াইলের সুপ্রসিদ্ধ এক জমিদার এইরূপ বিনাদোষে দণ্ডিত

হইয়া বহু অর্থব্যয় ও আয়াসের পর নিষ্কৃতি পান। ১৮৫৪ সনে 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদক লিখিয়াছেন :

"অশিক্ষিত সিবিলিয়ানদের অত্যাচার ও অবিচারে মফঃসলবাসি নিরিহ প্রজাকুল ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতেছেন, যদিও এই বিষয়ে অনেক প্রমাণ ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে তথাচ আমারদিগের রাজপুরুষগণের এমত পক্ষপাত যে তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই।"[৬১]

অন্যান্য শ্বেতাঙ্গেরাও 'নেটিভ'দের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতেন। হিন্দু কলেজের প্রধান অধ্যাপক লজ্‌ সাহেব একবার তাঁহার সহিসকে চাবুক মারেন। সহিস নালিশ করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট লজ্‌কে 'মিষ্ট ভর্ৎসনা' করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার সহিসকে প্রহার করায়—সহিসও তাহার প্রত্যুত্তরে "সপাৎ করিয়া সেলামি দাখিল করিয়াছিল" এবং অধিকন্তু নালিশও করিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত সাহেবের এক টাকা দণ্ড করিলেন।[৬২]

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে এক মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সরকার ইহার একখণ্ড দিবার মানসে হরেকৃষ্ণ আঢ্যের স্কুলে গমন করিলে ডাক্তার ন্যাস (Nash) নামে উক্ত বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক "সহসা আগমনপূর্বক ঐ নির্দোষি সরকারকে স্বহস্তে বেত্রাঘাত করিয়াছেন।" উক্ত সরকার বিদ্যালয়ের কর্তার নিকট এই ব্যাপার জানাইলে তিনি উত্তর করিলেন "আমি কি করিব সাহেব মারিয়াছেন।"[৬৩]

চা-বাগানের কুলীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার বাংলাদেশে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৮৬ সনে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন :

"কুক্কুট হত্যার ন্যায় কুলিহত্যাও চা-কর সাহেবদের অভ্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নরহত্যা করিতে পাষণ্ডদিগের প্রাণে একটু আঘাত লাগে না। ইংরাজ বিচারকও আবার এমনি মনুষ্যত্ববান যে স্বজাতি বলিয়া তাঁহারা হত্যা-কাণ্ডে অপরাধীকেও নিষ্কৃতি দিয়া থাকেন। পাঠক কি কখন কুলিহত্যার জন্য কোন সাহেবকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে দেখিয়াছেন? অথচ ইংরাজের এই কুলি-হত্যার কথা শুনিতে শুনিতে আপনাদেরও কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। আসাম প্রদেশ কুলির বধ্যভূমি, চা-কর ও নীলকর সাহেব বাহাদুর সেই বধ্যভূমির জল্লাদ। অনবরতই কুলির প্রাণ সেই আসামের বধ্যভূমিতে প্লীহা ফাটিয়া বাহির হইতেছে। কুলি একটু রূঢ় কথা কহিলে, মনিব গরম হইয়া অমনি তাহার বুকে

জুতার সহিত লাথির প্রহারে তাহার অনাবশ্যকীয় ঘৃণ্য জীবন বাহির করিয়া ফেলেন, কুলি ঘরে যাইবার প্রস্তাব করিলে মনিবের দোদুল্যমান চাবুক পৃষ্ঠের উপর পঞ্চাশ বার পতিত হইয়া দরিদ্রকে ইহজগতের পরপারে রাখিয়া সে কুলির রমণী লইয়া সাহেব বিহার করিতে লাগিল। কালানিগার যদি আপত্তি করিতে আসে দোনলা বন্দুকের একটি শব্দ শুনিয়া অমনি তাহার প্লীহা ফাটিয়া যায়।"৬৪

এই মন্তব্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ চা-কর হেনরী সাহেব কর্তৃক লালা মাটুনকে আঘাত ও তাহার ফলে তাহার মৃত্যুর কাহিনী ও বিচার বিভ্রাটের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

আসামের ডেপুটি কমিশনার "দুই ঘণ্টার মধ্যে এই খুনী মকদ্দমার বিচার করিয়া সামান্য অপরাধে হেনরীর একশত টাকা জরিমানা করেন।" ইহার পর হাইকোর্টের আদেশে সেসনসে ইহার পুনর্বিচার হয়। 'সোমপ্রকাশের' সম্পাদক লিখিয়াছেন:

"মকদ্দমা সেসনগৃহ চা-কর সাহেবে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। পাঁচজন জুরি বসিয়া বিচার আরম্ভ করে। জুরিরা স্থির করিলেন লালা মাটুনের মৃত্যু হইয়াছে। হেনরি তাহাকে আঘাত করিবার কিয়ৎক্ষণ পরে মাটুন মূর্চ্ছা যায়। সেই মূর্চ্ছাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। ডাক্তারেরা বলিলেন প্লীহা ফাটিয়া মাটুনের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু কোন্ আঘাতে যে তাহার প্লীহা ফাটিয়াছে একথা বলিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। জুরি ও জজ বাহাদুর একে বুদ্ধির বৃহস্পতি, তাহাতে আবার স্বজাতি প্রেম তাঁহাদের হৃদয়ে উদ্বেলিত, স্বজাতীয় সহচরগণ চতুঃপার্শ্বে ঘেরিয়া বসিয়া আছে। কাযেই তাঁহাদের একটা সূক্ষ্ম বিচার করিতে হইল। লালা মাটুনের প্লীহা রোগ ছিল, সে হেনরির হস্তে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। ক্রোধেই সে অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়, সেই ক্রোধের বেগেই তাহার প্লীহা ফাটিয়া প্রাণ বাহির হয়। হেনরির প্রহার অথবা ভূমিতে পড়িয়া যাইবার কারণে তাহার জীবন বহির্গত হয় নাই। হেনরি হত্যাপরাধে কোনমতেই অপরাধী হইতে পারেন না। সুতরাং ডেপুটী কমিশনার যে বিচার করিয়াছেন তাহা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। জুরিদের এই সুন্দর বিচারে হেনরি অব্যাহতি পাইবেন।"৬৫

'সোমপ্রকাশের' সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন:

"আজ যদি বিলাতে এইরূপ একটা নরহত্যা রাজদ্বারে উপেক্ষিত হইত, তিনশত ওয়াট টাইলার উদ্ভূত হইয়া তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইত।

ভারতে ইংরাজের সে ভয় নাই, সুতরাং পিশাচের সম্মুখে নরহত্যার দ্বার নিয়তই উদ্ঘাটিত।"[৬৬]

এই সুদীর্ঘ উক্তি ও মন্তব্যে এদেশীয়দিগের প্রতি সাহেবদের মনোভাব, এবং বাঙ্গালীর মনের যে ক্ষুব্ধ নিষ্ফল বেদনাবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহা যে উনিশ শতকে এই উভয় সম্প্রদায়ের সুপরিচিত মনোবৃত্তির অতিশয় যথার্থ পরিচয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্লীহা-ফাটানো ছাড়াও যে চা বাগানের কুলি ও কুলিরমণীর উপর কত রকম অত্যাচার হইত—তাহার বর্ণনা বহু স্থানে আছে।[৬৭]

চা-করদের অপেক্ষাও নীলকরদের অত্যাচার আরও ব্যাপক ও দুর্বিষহ ছিল। অন্যত্র (৭৮-৯ পৃষ্ঠা) এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সমসাময়িক পত্রিকায় এই সম্বন্ধে বহু কাহিনী ও মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে।[৬৮] আমেরিকায় ক্রীতদাসদের উপর অত্যাচার সমস্ত বিশ্বের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু ভারতে চা-কর ও নীলকর সাহেবের দুষ্কৃতি তাহা অপেক্ষা কোন অংশে হীন না হইলেও ভারতের বাহিরে প্রচারিত হয় নাই। তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, যে সমুদয় কারণে ইংরেজ শাসনের বহু গুণ থাকা সত্ত্বেও তাহাদের জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল, চা-কর ও নীলকরদের অত্যাচার তাহাদের মধ্যে গুরুতর স্থান অধিকার করে।

মফঃস্বলে পুলিশ, কনষ্টেবল, দারোগা প্রভৃতির অত্যাচারের বহু কাহিনী সাময়িক পত্রে বর্ণিত হইয়াছে—ইহাও উনিশ শতকের বিশেষ সুপরিচিত কাহিনী।

পাদটীকা

১। ২৪২-৪৩, ৩২৮-৩৮ পৃঃ।

২। E. C. Sachau, *English Translation of Alberuni's account*, pp, 17, 19

৩। Halide Edib, *Inside India*. *History of Freedom Movement in India* by R. C. Majumdar, Vol III. p. 573

৪। '*Reformer*' quoted in the *India Gazette* of 4 July, 1831. Quoted in B. Majumdar, *History of Political Thought*, pp. 186-7.

৫। বিনয় ১।১৬০-৬১

৫ ক। বিনয় ২।৩৯৩-৪

৬। ঐ, ৩।৫৪৫

৭। ঐ, ৪।৫৩২

৮। R. C. Majumdar, *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, pp. 40-41

৯।

১০। ঐ, পৃঃ ৩৯

১১। ঐ, পৃঃ ৪১

১২। ঐ, পৃঃ ৪১-২

১৩। ঐ, পৃঃ ৪২

১৪। ঐ, পৃঃ ৮২

১৫। সং সে ক ২।২৯০ পৃঃ।

১৬। ঐ, ২।২৯২

১৭। ঐ, ২৯১-২

১৮। ঐ, ২৯৩

১৯। ঐ (দ্বিতীয় সং) ৪০৭ পৃঃ।

২০। B. Majumdar op. cit, p. 164

২১। বিনয়, ৩।২৩৫-৬

২২। মূল আবেদনপত্রখানির জন্য B. Majumdar, op. cit, pp. 474-89 দ্রষ্টব্য।

২২ ক। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অনুবাদ। রাজনারায়ণ বসু স্বয়ং ইহার অনুবাদ করিয়াছেন "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা"।

২৩। বিনয় ২।২৬৫-৬

২৪। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (৬৭ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৬৭, পৃঃ ১০২) রাজনারায়ণ বসুর পুস্তিকা প্রকাশের যথার্থ তারিখের আলোচনা ও হিন্দুমেলার বিস্তৃত বিবরণ আছে। *Modern Review* (June, 1944, pp. 444 ff.) পত্রিকায় মূল পুস্তিকা মুদ্রিত হইয়াছে।

২৫। রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, ২০৮ পৃঃ।

২৫ ক। বিনয় ১।৫২২

২৬। রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, (১৩৪০) ১৪৬ পৃঃ।

২৭। বিনয়, ২।৬৩৪

২৮। বিনয়, ১।৪৭৬-৮। হিন্দু মেলার বিস্তৃত বিবরণের জন্য সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (১৩৬৭) পৃঃ ১০২ দ্রষ্টব্য।

২৯। বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ), "বিবিধ", ৩২৯-৩১ পৃঃ।

৩০। B. Majumdar, op. cit, pp. 293-4.

৩১। B. C. Pal, *Memoirs of My Life and Times*, I. 227.

৩২। বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ), 'কমলাকান্তের দপ্তর', ৬৯, ৭১, ৭২ পৃঃ; মৃণালিনী, ১০৪, ১০৬; বিবিধ প্রবন্ধ, ১৪১-১৪৪, ১৪৭ পৃঃ।

৩৩। *History and Culture of the Indian People (HCIP)*. Vol. X, p. 214.

৩৪। *Bengal Celebrities*, p. 41. *HCIP*. X. p. 499.

৩৫। *HCIP*, X, p. 500.

৩৬। বিনয়, ১।৫২৫

৩৭। ঐ, ৫২৬

৩৮। ইহার বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য : Jogesh Chandra Bagal, *History of the Indian Association*, 1876-1951, *HCIP*, X. pp. 500-506.

৩৯। B. C. Pal, *Memoirs of my Life and Times*, I. pp. 242-8.

৪০। *Speeches and Writings of Surendra Nath Banerjea*, pp. 227-31.

৪১। B. C. Pal, op. cit, p. 235.

৪২। Sir Henry Cotton, *New India* (1907 Edition) p. 28 (এই গ্রন্থ ১৮৮৫ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়)।

৪৩। Surendra Nath Banerjea, *A Nation in Making*, pp. 76-81. *HCIP*, Vol. X. pp. 510-11.

৪৪। ইহার বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য J. C. Bagal, op. cit, pp. 80-1 ; S. N. Banerjea op. cit, p. 85, 98-9, R. C. Majumdar, *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, pp. 97-104. *HCIP*, X. pp. 512-15.

৪৫। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার আত্মজীবনীতে (২য় খণ্ড ১৪ পৃঃ) লিখিয়াছেন ঃ "কংগ্রেসের উদ্যোক্তা হিউম সাহেব দ্বিতীয় অধিবেশনের আয়োজনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন যে বাঙ্গালী নেতাদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করিতে হইলে সুরেন্দ্র-নাথকে কংগ্রেস হইতে বাদ দিলে চলিবে না। সুতরাং তিনি সুরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে কংগ্রেসে যোগদান করিতে সম্মত করাইলেন"।

৪৬। Sayid Ahmad, "*On the Present State of Indian Politics*, pp. 11-12

৪৭। Malleson, G. B. *The Indian Mutiny of 1857*, p. 412.

৪৮। S. N. Banerjea, op. cit, p. 87.

৪৯। *Studies in the Bengal Renaissance*, Edited by Atulchandra Gupta, p. 169.

৫০। ঐ, ১৭০ পৃঃ।

৫১। ঐ

৫২। *HCIP*, X. p. 299.

৫৩। ঐ, ৩০২ পৃঃ।

৫৪। বিনয়, ১।৭৪

৫৫। ঐ, ৭৫

৫৬। বিনয়, ৪।৩৯২-৭

৫৭। ঐ, ৪০৭-৮

৫৮। ঐ, ৩৪৩

৫৯। বিনয়, ৩।৯৫, ১২১, ১৩১, ১৩৭, ১৪১, ১৭১, ১৯৩, ৩৬৭

৬০। বিনয়, ১।১৮৬
৬১। ঐ, ২০৬, ৪৫২
৬২। ঐ, ৩৩০-৩১
৬৩। ঐ, ১৮৮-৯
৬৪। বিনয়, ৪।৪৫৬-৭
৬৫। ঐ, ৪৫৭-৮
৬৬। ঐ, ৪৫৮
৬৭। ঐ, ৪৬১
৬৮। বিনয়, ১।৭৩-৪, ৮১-২, ৯৮, ১০২-৪, ১০৬, ১০৯-১৩ ; ৪।৫৫-৫৮

দ্বাদশ অধ্যায়

নাট্য ও সঙ্গীত

১। রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়

নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বর্তমানকালে আমরা নাটক বলিতে যাহা বুঝি, ইংরেজী সাহিত্যের অনুকরণেই তাহার সৃষ্টি হয়। প্রাচীন হিন্দু যুগে নাটক রচিত ও অভিনীত হইত ইহাতে কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু সে যুগের রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় প্রণালী কিরূপ ছিল তাহা আমাদের জানা নাই। সংস্কৃত 'যবনিকা' শব্দ হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে যবন অর্থাৎ গ্রীকদের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইত। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র—এবং 'যবনিকা' বা পর্দা থাকিলেও দৃশ্য-পটের ব্যবহার, পট পরিবর্তন প্রভৃতি ছিল কিনা তাহা সঠিক কিছু বলা যায় না। বর্তমানকালের ন্যায় রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্য-পট, প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতি ইংরেজেরাই এ দেশে প্রচলিত করে। সুতরাং কলিকাতায় ইংরেজদের রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যাভিনয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রথমেই বর্ণনা করা প্রয়োজন।

ক। কলিকাতায় বিলাতী রঙ্গালয়

১৭৫৩ সনের পূর্বেই বর্তমান লালদীঘির অনতিদূরে Old Play House নামে একটি রঙ্গালয় কলিকাতাবাসী ইংরেজেরা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে স্ত্রী পুরুষ সকল ভূমিকার অভিনেতাই ছিলেন পুরুষ ও অবৈতনিক (amateur) এবং বিলাতের খ্যাতনামা অভিনেতা ডেভিড গ্যারিকের নিকট হইতে তাঁহারা বহু উপদেশ ও অন্যান্য প্রকার সাহায্য পাইয়াছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা অধিকার উপলক্ষে যে সংঘর্ষ হয় তাহাতেই এই রঙ্গালয়টি ধ্বংস হয় (১৭৫৬)। ইহার সম্বন্ধে আর কোন বিবরণ জানা যায় না।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান Writers Building-এর পশ্চাতে নূতন এক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা Calcutta Theatre ও The New Play House এই দুই নামেই অভিহিত হইত। নিলাম বিভাগের অধ্যক্ষ জর্জ উইলিয়ামসন প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রঙ্গালয় নির্মাণ করেন এবং হাজার টাকার ১০০ শেয়ার বিক্রয় করিয়া এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্, ইম্পে প্রভৃতি সর্বোচ্চ ইংরেজ কর্মচারী অনেকেই ইহার পৃষ্টপোষক ছিলেন। এবারেও নটরাজ গ্যারিক বিলাত হইতে শিল্পী ও দৃশ্য-পট পাঠাইয়া এই প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করেন। এখানেও

শল্পীরা সকলেই ছিলেন অ্যামেচার—সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। অভিনয় খুব সুন্দর হইত। মিসেস ফে নামক একটি ইংরেজ মহিলা এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে এখানকার অভিনয় ইউরোপীয় নাটকের অভিনেতাদের তুলনায়ও নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইবার কোন কারণ নাই। বেঙ্গল গেজেটেও এইরূপ মন্তব্য দেখা যায়। এই রঙ্গালয়ের প্রবেশ মূল্য ছিল একটি সোনার মোহর—কিন্তু তথাপি দর্শকের অভাব হইত না। লর্ড কর্নওয়ালিস সরকারী কর্মচারীর অভিনয়ে যোগদান বন্ধ করায় ইহাতে উৎকৃষ্ট অভিনেতার অভাবে রঙ্গালয়টির অবনতি ঘটে। এই রঙ্গালয়ে স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় পুরুষ শিল্পী এমন দক্ষতা দেখাইতেন যে একজন ইংরেজ মহিলা লণ্ডনেও এই ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তিত হইলে তিনি সুখী হইবেন এরূপ মত প্রকাশ করেন। প্রায় ৩৩ বৎসর শেকৃসপীয়র ও অন্যান্য খ্যাতনামা ইংরেজ কবির নাটকের অভিনয় দ্বারা সুনাম অর্জন করিলেও ইহার আর্থিক ক্ষতির জন্য ১৮০৮ সনে এই রঙ্গালয়টি বন্ধ হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে দুইটি প্রতিযোগী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়—কিন্তু কোনটিই খুব বেশী দিন চলে নাই। কলিকাতায় ইংরেজ সমাজে সুন্দরী এবং সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় পটীয়সী মহিলা মিসেস ব্রিষ্টো ১৭৮৯ সনে একটি Private Theatre প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে স্ত্রীলোকেরা কেবল স্ত্রী নয় পুরুষ চরিত্রের ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হইতেন। সে যুগের কলিকাতা সম্বন্ধে বিশিষ্ট গ্রন্থের প্রণেতা Busteed লিখিয়াছেন যে 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে Lucius-এর ভূমিকায় মিসেস ব্রিষ্টো অসাধারণ সাফল্য (triumph) লাভ করেন। কিন্তু ১৭৯০ খ্রীঃ জানুআরি মাসে তিনি ইংলণ্ডে যাওয়ায় রঙ্গালয়টি বন্ধ হইয়া যায়।

১৭৯৭ সনে হোয়েলার প্লেস থিয়েটারের (Wheler Place Theatre) প্রতিষ্ঠা হয়; কিন্তু খুব জাঁকজমকের সঙ্গে আরম্ভ করিলেও ইহা খুব অল্পদিন পরেই বন্ধ হয়।

'ক্যালকাটা থিয়েটার' বন্ধ হওয়ার চারি বৎসর পরে সার্কুলার রোডে 'এথেনিয়াম থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় (৩০শে মার্চ, ১৮১২ খ্রীঃ)। কিন্তু এটি বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই, এবং অল্পকাল পরেই বন্ধ হইয়া যায় (১৮১৪)।

ইতিমধ্যে, ১৮১৩ সনের ২৫ নভেম্বরে 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিন পূর্বেও দক্ষিণ কলিকাতার যে রাস্তাটি থিয়েটার রোড নামে পরিচিত ছিল —সেই রাস্তা ও চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলেই এই রঙ্গালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং থিয়েটার রোড নামটি তাহারই স্মৃতি-জ্ঞাপক। সেকালের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং

দুইজন বিখ্যাত পণ্ডিত এই রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক হোরেস্ হেম্যান উইলসন এবং ইংরেজী সাহিত্যে, বিশেষতঃ শেক্‌সপীয়ারের নাটক বিষয়ে, হিন্দু কলেজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ডি, এল, রিচার্ডসন। রাজনারায়ণ বসু তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন : "রিচার্ডসন শেক্‌সপীয়ার যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই।" তাঁহার শেক্‌সপীয়ারের আবৃত্তি শুনিয়া মেকলে বলিয়াছিলেন "ভারতের আর সবই ভুলিতে পারি কিন্তু আপনার শেক্‌সপীয়ারের আবৃত্তি ভুলিতে পারিব না।" সেযুগে যে শিক্ষিত সমাজের সহিত রঙ্গালয়ের নিকট সম্বন্ধ ছিল—উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে তাহা বুঝা যাইবে। দ্বারকানাথ ঠাকুরও এই রঙ্গালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইংলণ্ডের সম্রাট চতুর্থ উইলিয়মের পুত্র জর্জ ফিজক্লেয়ারেন্স তখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনিও চৌরঙ্গী রঙ্গালয়ের পরিচালকবৃন্দের সঙ্গে যোগ দেন।

অনেক উৎকৃষ্ট নাট্যকুশল অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই রঙ্গালয়ে যোগ দিয়াছিলেন। অভিনেতারা অবৈতনিক কিন্তু অভিনেত্রীরা বেতন পাইতেন এবং রঙ্গালয়-গৃহেই তাঁহাদের বাসের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম উদ্বোধন রজনীতে বড়লাট লর্ড ময়রা ও তাঁহার পত্নী এবং কলিকাতার বহু গণ্যমান্য লোক প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন, এবং অসংখ্য দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। সমসাময়িক সংবাদ-পত্রে অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ক্রমশঃই আর্থিক অবস্থার অবনতি ও বিস্তর ঋণ হওয়ায় ১৮৩৩ সনে, প্রথমে এক ইতালীয় কোম্পানি এবং পরে এক ফরাসী কোম্পানিকে এই রঙ্গালয় মাসিক হাজার টাকায় ভাড়া দেওয়া হইল। তারপর প্রকাশ্য নিলামে এই রঙ্গালয় বিক্রীত হয় (১৮৩৫ খ্রীঃ)। দ্বারকানাথ ঠাকুর ৩০,১০০ টাকায় ইহা ক্রয় করিলেন এবং রঙ্গালয়টি চালাইবার নূতন ব্যবস্থা করিলেন। কিছুদিন ইহা চলিল। কিন্তু ১৮৩৯ খ্রীঃ ৩১শে মে মধ্যরাত্রে আগুন লাগিয়া ২৬ বৎসরের পুরাতন রঙ্গালয়টি একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল।

ইহার অল্পকাল পরেই 'চৌরঙ্গী থিয়েটারের' খ্যাতনামা অভিনেত্রী মিসেস লীচ এবং অন্যান্য কয়েকজন পৃষ্ঠপোষক ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা অভিনেত্রীর উদ্যোগে ১৮৩৯ সনের ২১ অগষ্ট 'সাঁ সুসি (Sans Souci)' নামে লালদীঘির কাছে নূতন এক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম প্রথম এটিও খুব জনপ্রিয় ছিল, এবং পার্ক ষ্ট্রীটে এখন যেখানে St. Xaviers College সেখানে ইহার নিজস্ব বাড়ী নির্মিত হইল। কেহ কেহ এই সুপরিসর ও সুরম্য গৃহকে উনিশ 'শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়',

এবং 'রঙ্গালয়ের ইতিহাসে নব অভ্যুদয়' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ১৮৪১ সনের ৮ই মার্চ এই নূতন রঙ্গালয়গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে যে নাটক অভিনীত হয় তাহাতে বড়লাট সদলবলে উপস্থিত ছিলেন। ১০ই মার্চের 'হরকরা' পত্রিকায় লেখা হয়: "প্রেক্ষাঘরের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সব আসনই ভর্তি হইয়া যায়। কোনখানে তিলধারণের জায়গা ছিল না—এমন কি ভিতরের চলাফেরার রাস্তাটুকুও খালি ছিল না।" প্রধানতঃ মিসেস লীচের উদ্যোগেই যে এই রঙ্গালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। ১৮২৬ সনে ষোল বৎসর বয়সে চৌরঙ্গী থিয়েটারে তাঁহার প্রথম অভিনয় দর্শনেই শ্রোতারা মুগ্ধ হন। তিনি সেখানে প্রতি রাত্রের অভিনয়ের জন্য দেড়শত টাকা পাইতেন এবং প্রতি বৎসর তাঁহার উপলক্ষে এক বিশেষ অভিনয়ে লব্ধ সমস্ত অর্থই তাঁহাকে দেওয়া হইত। ১৮৩৮ সনে বিলাত যাওয়ার প্রাক্কালে চৌরঙ্গী থিয়েটারে তাঁহার শেষ অভিনয় রজনীতে তিনি ছন্দোবদ্ধ কবিতায় রচিত হৃদয়ের আবেগপূর্ণ যে সুদীর্ঘ বিদায় সম্ভাষণটি আবৃত্তি করেন তাহার মাধুর্য সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। 'Sans Souci' রঙ্গালয়ের নূতন গৃহে প্রথম রজনীতে বিশিষ্ট অতিথি, অভ্যাগত এবং দর্শকদের স্বাগত জানাইয়া তিনি যে সুদীর্ঘ কবিতাটি আবৃত্তি করেন—তাহাতে নাট্য-জগতের অনেক পুরাতন কথার উল্লেখ ছিল, এবং দর্শকবৃন্দও তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেকালের রঙ্গালয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে এই দুইটি কবিতার যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

এই নূতন রঙ্গালয়েও বহু নূতন অভিনেতা ও অভিনেত্রী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং Macbeth প্রভৃতি নাটক খুব নৈপুণ্যের সহিত অভিনীত হয়। ১৮৪৩ সনের ২রা নভেম্বর খুব জাঁকজমকের সহিত Merchant of Venice নাটকের অভিনয় হয়। শাইলক ও পোর্শিয়ার অভিনয়ে দর্শকেরা বিমুগ্ধ হইয়াছিল। অবিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতার মধ্যে যবনিকা পতন হইল, এবং তারপর একটি প্রহসনের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময় মঞ্চের উপরের একটি বাতির শিখায় মিসেস লীচের পরিচ্ছদে আগুন লাগে এবং তিনি দারুণভাবে আহত হন। ১৮ই নভেম্বর মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে এই অপূর্ব প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর মৃত্যু হয়।

মিসেস লীচের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে "সাঁ সুসি"র সৌভাগ্যও যেন অস্তমিত হইল। ফলে আর একজন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মিসেস্ ডিকলও চলিয়া গেলেন। ক্রমশঃই আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু স্তিমিতপ্রায় এই রঙ্গালয়ের ১৮৪৮

সনের একটি ঘটনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মহারাজা রাধাকান্ত দেব, মহারাজা বৈদ্যনাথ রায়, মহারাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি সেকালের কলিকাতার অভিজাত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের কয়েকজনের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বিশিষ্ট অভিনয়ের আয়োজন হইল। ১০ই অগষ্ট এই অনুষ্ঠানে ওথেলো নাটকের ভূমিকায় নায়িকা ডেসডিমোনা সাজিবেন মিসেস্ লীচের কন্যা আর নায়ক ওথেলোর ভূমিকা গ্রহণ করিবেন একজন বাঙ্গালী এইরূপ ঘোষণাপত্র বাহির হইল। /এই সংবাদে কলিকাতার দেশীয় ও সাহেবমহলে বিশেষ উত্তেজনা দেখা দিল—এবং অভিনয় রজনীতে প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখে বিষম ভীড় হইল। কিন্তু রঙ্গালয়ের দরজা খুলিল না—ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া দর্শকেরা ফিরিয়া গেলেন। কারণ নির্বাচিত অভিনেতাদের মধ্যে সৈনিক বিভাগের কয়েকজন কর্মচারী ছিলেন। হঠাৎ শেষ মুহূর্তে দমদমের সৈন্যাধ্যক্ষ (কমাণ্ডিং অফিসার) তাঁহাদিগকে অভিনয় করিতে নিষেধ করায় এই বিভ্রাট ঘটিল। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে নূতন শিল্পীর সাহায্যে ওথেলো নাটক মঞ্চস্থ হইল। ওথেলোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। ইংরেজী ও বাংলা সমসাময়িক পত্রিকার বিবরণে দেখা যায় যে 'প্রেক্ষাগৃহে তিলধারণের স্থান ছিল না'। ওথেলো মঞ্চে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত দর্শকবৃন্দ করতালি ধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্ধনা করেন, এবং বৈষ্ণবচরণ এই ভূমিকায় বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। 'বেঙ্গল হরকরার' মতে তাঁহার এই প্রথম আবির্ভাবে কোন সঙ্কোচ বা জড়তা ছিল না এবং ইংরেজী উচ্চারণও ছিল একজন বিদেশীর পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয়। বিভিন্ন ইংরেজী সংবাদপত্র উচ্ছ্বসিত ভাষায় এই 'হিন্দু ওথেলোর' অভিনয় নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছিল। কিন্তু প্রদীপ উচ্চ শিখায় জ্বলিয়াই নিবিয়া গেল। ১৮৪৯ সনে ২১শে মে 'সাঁ সুসি'র শেষ অভিনয় হইয়া চিরদিনের মত যবনিকা পতন হইল। এই রাত্রের অভিনয়ের গোড়াতেই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ ব্যারী সাহেব একটি মর্মস্পর্শী বিদায়সম্ভাষণ সূচক কবিতা আবৃত্তি করেন। ইহার আরম্ভ এইরূপ :

"Let down the curtain, put the candles out" (নিবাইয়া দাও বাতি, ফেল যবনিকা)।

'সাঁ সুসি'র পর উনিশ শতকের শেষার্ধে 'সেণ্ট জেমস থিয়েটার', মিসেস্ লিউইস-এর থিয়েটার 'অপেরা হাউসে' মিসেস্ ইংলিস-এর রঙ্গালয়, ফোর্ট উইলিয়মে 'থিয়েটার রয়াল' এবং 'গ্যারিসন' থিয়েটার প্রভৃতি অনেকগুলি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—কিন্তু ইহাদের অভিনয়ে অনেক শিল্পী খ্যাতিলাভ করিলেও

ইহার কোনটিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮৭৬ সনের ১লা জানুআরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুবরাজ ও ভবিষ্যৎ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের উপস্থিতিতে 'অপেরা হাউসে' (বর্তমান গ্লোব সিনেমা) খুব জাঁকজমকের সহিত একটি অভিনয় হইয়াছিল।

উপসংহারে বলা আবশ্যক যে বাংলাদেশে কলিকাতার বাহিরেও ব্যারাকপুর ও বহরমপুরে ইংরেজেরা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[১]

খ। কলিকাতার বাঙ্গালী নাট্যশালা

১৭৯৫ খ্রীঃ সর্বপ্রথম বাংলা নাটক আধুনিক প্রথানুযায়ী নির্মিত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। কিন্তু ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হেরাসিম লেবেডেফ (Herasim Lebedeff) নামে একজন রাশিয়ান। সমসাময়িক পত্রিকায় উক্ত হইয়াছে যে রঙ্গমঞ্চটি বাঙ্গালার রীতিতে সজ্জিত করা হয় (decorated in the Bengali style)। কিন্তু এই রীতিটি কি এবং পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত ইংরেজী ধরণের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ইহার কি প্রভেদ ছিল তাহা বোঝা যায় না। লেবেডেফ দুইখানি ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। ইহার একখানি ২৭শে নভেম্বর মঞ্চস্থ হয়। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৭৯৬ খ্রীঃ ২১ মার্চ এই নাটকের পুনরভিনয় হয়। এ দেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাই সকল ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রথম বারের অভিনয়ে দুই শত আসন ছিল—প্রবেশ মূল্য, উচ্চ শ্রেণী (Box-Pit) আট টাকা, গ্যালারী চারি টাকা। দ্বিতীয় অভিনয়ে প্রবেশমূল্য ছিল একটি সোনার মোহর।

লেবেডেফ স্বদেশে ফিরিয়া গেলেই এই নাট্যশালাটিও বন্ধ হয়—এবং ইহার পর চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে আর কোনও রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। লেবেডেফের নাট্যশালা যে বাঙ্গালীদের মন এই নূতন প্রণালীর অভিনয়ের দিকে আকৃষ্ট করিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু যে কোন কারণেই হউক তাহা হয় নাই। কারণ পরবর্তীকালে বাংলা সাময়িকপত্রে ইংরেজী নাট্যশালার অনুরূপ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আছে—কিন্তু লেবেডেফের বাংলা নাট্যাভিনয়ের কোন উল্লেখ নাই।[২] 'সমাচার চন্দ্রিকায়' ১৮২৬ সনে লেখা হয়: "ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত 'শেয়ার' (share) গ্রহণ করিয়া একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। এইরূপে শ্রেণীনির্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি হইবে।"[৩]

১৮৩১ সনের ১৭ সেপ্টেম্বর একটি পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে: "কিয়ৎকালাবধি

কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়েরদের মধ্যে এক নর্তনাগার গ্রন্থননিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে" কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে লইয়া একটি কমিটি হয়। "ঐ নর্ত্তনশালা ইংলণ্ডীয়েরদের রীত্যনুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায়।"[৪]

এই চেষ্টার ফলে ১৮৩১ সনের ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগানে 'হিন্দু থিয়েটারের' উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষে শেকস্‌পীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের এক অংশ এবং ভবভূতির 'উত্তর রামচরিতের' ইংরেজী অনুবাদ অভিনীত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি মন্তব্য বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। প্রথমতঃ, দুইজন লেখকই এই নাটককে যাত্রার ইংরেজী সংস্করণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, অভিনয় করাকে 'পাঠ করা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের একজন 'হিন্দু থিয়েটারের' প্রথম রজনীর অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "শ্রীযুক্ত ডাক্তার উইলসন সাহেব কর্তৃক সংস্কৃত রামচরিত্র-বিষয়ক ইঙ্গরেজীতে ভাষান্তরীকৃত সুসজ্জ যাত্রানুষ্ঠায়ি কর্তৃক উচ্চারিত হইল। পরিশেষে জুলিয়শ সিজর নামক এক কাব্যের শেষ প্রকরণ পাঠ হইল।"

আর একজন লেখকের বিস্তৃত মন্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি: "রামলীলা নাটকের মত যাহা যাহা ইঙ্গরেজী ভাষায় তরজমা হইয়াছে হিন্দু বালকেরা তরজমা ভাষাভ্যাস করিয়া সেই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ইত্যাদি সং সাজিয়া যাত্রা করিয়াছেন.........এদেশে পূর্ব্বকালে রাজারা নানা-প্রকার যাত্রা দর্শন করিতেন তৎপ্রমাণ নাটক গ্রন্থ সকল বর্ত্তমান আছে এক্ষণে কেবল কালীয়দমন রামযাত্রা চণ্ডীযাত্রা যাহা রাঢ় দেশীয় ক্ষুদ্রলোকের সন্তানেরা করিয়া থাকে তাহাতেই দেখা যায়। এক্ষণে ভদ্রলোকের সন্তানেরা ঐ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন ইহা অবশ্যই উত্তমরূপে হইতে পারিবেক। অধিকন্তু সুখের বিষয় ইঁহারা ধনিলোকের সন্তান ইঁহারদিগকে প্রতিপদে পেলা দিতে হইবেক না।"[৫]

ইংরেজীর অনুকরণে এই নূতন প্রণালীর যাত্রা যে পুরাতন যাত্রার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উক্ত লেখক তাহার আর এক নিদর্শন দিয়াছেন: "ইঁহারা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া নানা প্রকার বেশভূষণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং একজন ইঙ্গরেজ শিক্ষক রাখিয়া ঐ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন আমারদিগের দেশীয় অধিকারী ও বেশকারী বেটারা চিরদিন এক রকম বেশ করিয়া দেয় কেবল থরকাটা প্রেমচাঁদ কতগুলিন

বাইআনা বেশের সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র ইঙ্গরেজাধিকারী তাহা হইতে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ কি তাঁহারা যে যে সং সাজাইয়া দিবেন তাহা অবিকল হইবেক ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা।"[৬]

'সমাচার দর্পণে' এক সুদীর্ঘ পত্রে জনৈক লেখক নূতন নাট্যাভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পূর্বক মন্তব্য করিয়াছেন যে ইংরেজেরা বলেন তাঁহারা যেরূপ সভ্য হিন্দুরা কখনও সেরূপ হইতে পারিবে না, ইহা অতি হাস্যাস্পদ কথা কারণ ঈশ্বর পক্ষপাতী নহেন। তাহার পর লিখিয়াছেন: "যদি ইহাতে ঐ শ্রেষ্ঠাভিমানিরা ক্ষান্ত না হন তবে হিন্দুর নাট্যশালা এবং হিন্দুর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা কিরূপে তত্তৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন তাহা দৃষ্টি করুন। অল্পকালের মধ্যে বুঝি হিন্দু ঐচ্ছিক যাত্রাকারিরা চৌরঙ্গীর ঐচ্ছিক যাত্রাকারিদের তুল্য হইবেন।"[৭০]

ইংরেজী নাট্যশালা প্রসঙ্গে 'অ্যামেচার' (অবৈতনিক) অভিনেতার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। উক্ত লেখক 'ঐচ্ছিক যাত্রাকারি' দ্বারা সম্ভবতঃ তাহাদিগকেই নির্দেশ করিয়াছেন—অর্থাৎ যাঁহারা পেশাদার অভিনেতা নহে—স্বেচ্ছায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বস্তুতঃ হিন্দু থিয়েটার ও তাহার অনুকরণে বহু বৎসর যাবৎ কলিকাতায় যে সব নাট্যামোদীর দল নূতন নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া বাংলা নাট্যশালার উন্নতি সাধন করিয়াছিল তাহাদের সদস্যেরা সকলেই 'ঐচ্ছিক' ছিলেন এবং দুই উপায়ে পরবর্তীকালের পেশাদারী থিয়েটার প্রচলনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা অভিনয় শিল্পের ও শিল্পীর উৎকর্ষ সাধন, ও দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান প্রণালীর নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয়ের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনুরাগ বৃদ্ধি। ইহার ফলে যখন পেশাদারী নাট্যশালা গঠিত হইল তখন উৎকৃষ্ট অভিনেতা ও প্রবেশ মূল্যের বিনিময়ে অভিনয় দর্শনেচ্ছুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল।

হিন্দু থিয়েটারের পরে 'ঐচ্ছিক' বা সখের অভিনয় অনুষ্ঠানের জন্য বহু সংখ্যক দলের সৃষ্টি হয়। ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

১। এখন যেখানে শ্যামবাজারের ট্রামের ডিপো সেখানে বা তাহারই সন্নিকটে নবীনচন্দ্র বসু নিজের বাড়ীতে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৩৩ খ্রীঃ)। এখানেই সর্বপ্রথমে বাঙ্গালীর চেষ্টায় বাংলা নাটক অভিনীত হয়। ১৮৩৫ সনের ২২শে অক্টোবর 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের অভিনয় হয় এবং কে কোন ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয়ও সর্বপ্রথম এই উপলক্ষেই পাওয়া যায়। দেখা যায় যে তিনটি মহিলা বিদ্যা, বিদ্যার সখী, এবং রাণী ও মালিনীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নামক পত্রিকায় একজন লিখিয়াছেন (১৮৩৫ নভেম্বর) যে নবীনচন্দ্র বসু মহাশয় যাহাদিগকে অভিনয় দর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তাহারা ছাড়াও অনেকে অভিনয় দেখিতে বিশেষ উৎসুক সুতরাং "নবীনচন্দ্র বসু বাবুর প্রতি নিবেদন যে ভবিষ্যতে অনাহুত দর্শক ভদ্রসন্তানদিগের প্রতি কোন নিয়ম স্থির করেন।"৮

২। সম্ভবতঃ এই নিবেদনের ফলেই পূর্বোক্ত নবীনচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন বসু যখন 'জোড়াসাঁকো থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'জুলিয়াস সীজারের' অভিনয় হয় (৩রা মে, ১৮৫৪) তখন জনসাধারণের জন্য প্রবেশ-মূল্যের ব্যবস্থা হয়—অর্থাৎ এখনকার ভাষায় টিকিট বিক্রয় করিয়া নাটক দেখার ব্যবস্থা হয়।

৩। নবীনচন্দ্র বসুর রঙ্গমঞ্চের অবসান এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বারা 'জোড়াসাঁকো থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তী সুদীর্ঘ ব্যবধান কালে অনেক স্কুল কলেজের সৌখীন রঙ্গমঞ্চে নাট্যাভিনয় হইত—কিন্তু সবগুলিই ইংরেজী ভাষার নাটক। এই শ্রেণীর সৌখীন থিয়েটারের মধ্যে ডেভিড হেয়ার স্কুলের রঙ্গমঞ্চ ও 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরেজ অধ্যাপক এই উভয় রঙ্গমঞ্চেই এবং এলিস নামে একজন ইংরেজ মহিলা শেষোক্ত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কৌশল শিক্ষা দিতেন। ১৮৫৩ সনে প্রথমটি 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' ও দ্বিতীয়টি 'ওথেলো'র অভিনয় দিয়াই রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন করে।

৪। ১৮৫৭ সনে 'জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা'র সদস্যগণ সাতুবাবু নামে খ্যাত আশুতোষ দেবের বাড়ীতে একটি এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী সভার' সদস্যেরা আর একটি রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন করেন, এবং প্রথম রজনীতে যথাক্রমে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' ও 'বেণীসংহার' এই দুইখানি সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনীত হয়। ঐ বৎসরই বড়বাজারের গদাধর শেঠের বাড়ীতে 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক অভিনীত হয়। দর্শকদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কিশোরীমোহন মিত্র প্রভৃতি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা ছিলেন। 'বিদ্যোৎসাহিনী' রঙ্গমঞ্চে সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি, ভারত সরকারের প্রধান সেক্রেটারী প্রভৃতি দর্শক ছিলেন। ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বেই এই তিনটি অভিনয় হইয়াছিল।

৫। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বেলগাছিয়ায় তাঁহাদের বাগান-বাড়ীতে যে নাট্যশালা স্থাপন করেন এ যুগে তাহাই বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের বাংলা "রত্নাবলী"

অভিনয়ের দ্বারা 'বেলগাছিয়া নাট্যশালার' উদ্বোধন (৩১ জুলাই, ১৮৫৮) কলিকাতার অভিজাত মহলে খুব উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে, কারণ ইহার সাজ সজ্জা, দৃশ্যপট প্রভৃতি উচ্চ শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক ছিল। বিভিন্ন ভূমিকায় ইংরেজী শিক্ষিত যুবকেরা খুব সুন্দর অভিনয় করেন এবং রাজা ঈশ্বরচন্দ্র স্বয়ং একটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বিদূষকের ভূমিকায় উৎকৃষ্ট অভিনয়ের জন্য কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী খুবই প্রশংসা লাভ করেন; এমন কি তাঁহাকে বাংলার 'গ্যারিক' বলিয়া অভিহিত করা হয়। লেফটেনাণ্ট গভর্নর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা 'রত্নাবলী'র অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অকালমৃত্যু হওয়ায় প্রায় তেইশ বৎসর সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়া এই রঙ্গমঞ্চ বন্ধ হইয়া গেল। বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'র দান অবিস্মরণীয়।

৬। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের আদি বাসভবনে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যোগে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫৯ ও ১৮৬০ সনে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক অভিনীত হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বনামধন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজ বাটিতে নবরঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৬৫ সনের ডিসেম্বর মাসে 'বিদ্যাসুন্দর' পালার অভিনয় দ্বারা ইহার উদ্বোধন হয়। এই অভিনয় দেখিয়া রেওয়ার মহারাজা এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে অভিনেতা-বর্গকে তিন হাজার টাকা এবং প্রত্যেক অভিনেতাকে একখানা করিয়া কাশ্মীরী শাল উপহার দেন। কিন্তু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত অভিনেতাগণ এই 'দান' গ্রহণ করেন নাই। ১৮৭৩ সনের ২৫শে ফেব্রুআরি বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক পাথুরিয়া-ঘাটা রাজবাড়ীতে আগমন করিলে তাঁহার সম্মানার্থ 'রুক্মিণী হরণ' নাটক ও 'উভয় সঙ্কট' প্রহসনের অভিনয় হয়।

৭। উনিশ শতকের সপ্তম দশকে অর্থাৎ ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সনের মধ্যে আরও যে কয়েকটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে স্থাপিত 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি', বহুবাজারের 'বঙ্গনাট্যালয়' ও 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার' এবং জোড়াসাঁকো 'ঠাকুর বাড়ী'র রঙ্গমঞ্চ।

জোড়াসাঁকোর 'ঠাকুরবাড়ী' সাহিত্য, শিল্প, নৃত্য, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি সংস্কৃতির নানা বিভাগে বাংলাদেশে যে উচ্চস্থানের অধিকারী জগতের ইতিহাসে সেরূপ আর কোন একটি পরিবারের নাম করা কঠিন। অভিনয়ের উপযোগী

অথচ লোকশিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের সহায়ক নাটকের অভাব বোধ করিয়া এই শ্রেণীর নূতন নাটক লিখাইবার জন্য তাঁহারা উপযুক্ত পুরস্কার দানের ঘোষণা করেন। 'বহু বিবাহ', 'হিন্দু মহিলাদের দুরবস্থা', ও 'পল্লীগ্রামস্থ জমিদারদের অত্যাচার' প্রভৃতি বিষয় নির্দিষ্ট হয়। রামনারায়ণ তর্করত্ন 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে কৌলীন্য প্রথার কলুষতা বর্ণনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহা বহুস্থানে অভিনীত হয়। তিনিই 'বহু বিবাহ' বিষয়ে 'নব নাটক' লিখিয়া দুই শত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহা ঠাকুর বাড়ীর রঙ্গমঞ্চে ১৮৬৭ সনে আট নয় বার অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু অপর বিষয়ে পুরস্কৃত নাটকগুলি অভিনীত হইবার পূর্বেই এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার রুদ্ধ হয় (১৮৬৭)।

এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে সামাজিক কুসংস্কার দূর করিবার উদ্দেশ্যে আরও অনেক নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময় রচিত উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটক (১৮৫৬) স্বনামধন্য কেশবচন্দ্র সেন সদলবলে মেট্রোপলিটান কলেজ গৃহে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত একাধিকবার অভিনয় করেন এবং "কলিকাতায় এই নাট্যাভিনয় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল।"

বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে পূর্বোক্ত 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার'ও একটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে সকল অভিনেতাগণের সাহায্যে পরবর্তী যুগে প্রসিদ্ধ পেশাদার থিয়েটারগুলির সৃষ্টি ও উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই দলেই প্রথম অভিনয় করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্ধেন্দু-শেখর মুস্তফীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দল 'শ্যামবাজার নাট্য সমাজ' নাম গ্রহণ করিয়া নানাস্থানে অভিনয় করেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়-চন্দ্র সরকার প্রমুখ সে যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের উদ্যোগে প্রথমে চুঁচুড়ায় এবং পরে কলিকাতায় দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' অভিনয়ের দ্বারা সমসাময়িক পত্রিকার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন। স্বয়ং গ্রন্থকার ইহাদের নাট্যাভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হন।

এই সমুদয় সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয়ের সাফল্যে তৎকালে জনসাধারণের মনের ভাব 'এডুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত একখানি পত্রের নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়: "আমার বোধ হয় এই নাটকাভিনেতৃগণ মনোযোগ করিলে এমন একটি দেশীয় নাট্যশালা সংস্থাপন করিতে পারেন, যেখানে লোকে ইচ্ছা করিলে টিকিট ক্রয় করিয়া যাইতে পারেন এবং দেশেরও অনেকটা সামাজিকতার পরিচয় হয়।"[৯]

সমসাময়িক পত্রিকার সম্পাদকগণ ও বহু পত্রলেখকের এইরূপ প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া পূর্বোক্ত 'শ্যামবাজার নাট্য সমাজের' কয়েকজন সদস্য 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭২ সনের ৭ই ডিসেম্বর চিৎপুরে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে 'নীলদর্পণে'র অভিনয় দ্বারা ইহার উদ্বোধন হইল। প্রবেশ মূল্য ধার্য হইল এক টাকা ও আট আনা। সমসাময়িক অনেক পত্রিকাই এই উদ্যমের প্রশংসা ও ইহার স্থায়িত্ব কামনা করিল। এই রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ছাড়াও 'জামাই বারিক', 'সধবার একাদশী', 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রভৃতি নাটক প্রথমে প্রতি শনিবারে ও পরে প্রতি সপ্তাহে শনি ও বুধবারে অভিনীত হইত।[১০]

ন্যাশনাল থিয়েটারের অনুকরণে শ্যামবাজারে কৃষ্ণচন্দ্র দেবের বাড়ীতে 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার' নামে একটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় (১৮৭৩)। ইহার কিছুকাল পরে ঐ বৎসরই 'বেঙ্গল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়—এবং অল্পদিনের মধ্যেই নিজস্ব স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করে। পূর্বোক্ত কোন থিয়েটারই ইহা পারে নাই। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে স্ত্রীলোকেরাই নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন জগত্তারিণী, গোলাপ (সুকুমারী), এলোকেশী ও শ্যামা। সমসাময়িক পত্রিকাগুলিতে এই অভিনব প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদ দেখা যায়। এই রঙ্গালয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য—৺মধুসূদন দত্তের সহায় সম্বলহীন সন্তানদের সাহায্যার্থে ইহার উদ্বোধন হয়।—এই উপলক্ষে শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় হয় (১৬ অগষ্ট, ১৮৭৩)। পরে ইহার অনুকরণে বাংলার রঙ্গালয়ে অনেক 'সাহায্য রজনীর' অভিনয় হইয়াছিল।

'বেঙ্গল থিয়েটার' বহুদিন স্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৮৪ সনের ডিসেম্বর মাসে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনয়ে "দর্শকের ভীড় বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা—ইহার অনতিকাল পূর্বে ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত 'চৈতন্যলীলার' জনপ্রিয়তাই কেবলমাত্র ইহার সঙ্গে তুলনীয়।"

'প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনয় উপলক্ষে বেঙ্গল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে অপমানিত বোধ করিয়া নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে 'বীণা' রঙ্গালয় স্থাপন করেন (ডিসেম্বর, ১৮৮৭)। তিন বৎসর পরেই ইহা বন্ধ হয়। সম্ভবতঃ নারীর ভূমিকায় পুরুষ অভিনেতার অভিনয়ই ইহার কারণ।

বেঙ্গল থিয়েটারের সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে বাংলার রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতি হয়। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠার পর উনিশ শতকে 'ওরিয়েণ্টাল' ও 'বেঙ্গল'

থিয়েটার ছাড়া আরও কয়েকটি পেশাদার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ ইহার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল দলের মধ্যে অন্তর্বিরোধ এবং তাহার ফলে সুদক্ষ অভিনেতাদের দলাদলি ও এক রঙ্গালয় ছাড়িয়া স্বতন্ত্র রঙ্গালয় গঠন অথবা অন্য রঙ্গালয়ে যোগদান। এই যুগের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ—একাধারে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিজ্ঞ নাট্য শিক্ষক ও পরিচালক গিরিশচন্দ্র ঘোষ নিজেই ৪।৫টি বিভিন্ন রঙ্গালয়ে একাধিকবার যোগদান করিয়াছেন। সুতরাং সাধারণ ভাবেই এই যুগের রঙ্গালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

এক বৎসরের মধ্যেই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ছাড়িয়া একদল, 'হিন্দু ন্যাশনাল (পরে 'গ্রেট ন্যাশনাল') থিয়েটার' নামে আর এক থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে। উভয় দলই কলিকাতায় অভিনয় ছাড়াও বাংলাদেশে মফঃস্বলের নানা স্থানে এবং ১৮৭৫ সনে পশ্চিম ভারতে কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, মীরাট, লাহোর প্রভৃতি শহরে অভিনয় করে। ইহার পর 'গ্রেট ন্যাশনাল' থিয়েটারের এক অংশ স্বতন্ত্র ভাবে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল' থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করে। বাংলাদেশের বহু প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রী—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, অমৃতলাল মিত্র এবং কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী, রাজকুমারী প্রভৃতি ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় করেন। ন্যাশনাল থিয়েটারের পর পাঞ্জাবী গুরুমুখ রায় বিডন ষ্ট্রীটে 'ষ্টার থিয়েটার' নামে এক নূতন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৮৩ খ্রীঃ)। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের মত অভিনেতা এবং বিনোদিনী, গঙ্গামণির মত অভিনেত্রীরা মিলিয়া গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্য লীলার' যে অপূর্ব অভিনয় করেন (২রা অগষ্ট, ১৮৮৪) তাহাতেই ষ্টার থিয়েটার রাতারাতি প্রসিদ্ধ হইল। স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হন। নিমাইর ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় অদ্ভুত সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

গুরুমুখ রায়ের মৃত্যুর পর কয়েকজন বাঙ্গালী অভিনেতা 'ষ্টার থিয়েটার' ক্রয় করেন (১৮৮৭ খ্রীঃ)—কিন্তু তাঁহারা অর্থাভাবে এই রঙ্গালয় চালাইতে পারিলেন না। মতিলাল শীলের বংশধর গোপালচন্দ্র শীল ইহা ক্রয় করিয়া 'এমারেল্ড থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ মাসিক ৩৫০ টাকা বেতন এবং এককালীন নগদ বিশ হাজার টাকা অগ্রিম বোনাস বাবদ লইয়া এই থিয়েটারে যোগ দিলেন, এবং এই বোনাসের টাকা হইতে ১৬,০০০ টাকা ষ্টার থিয়েটারের

নূতন জমি ক্রয় করিবার জন্য দান করিলেন। পুরাতন ষ্টার থিয়েটারের একদল অভিনেতা তখন অর্থ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে মফঃস্বলে অভিনয় প্রদর্শন করিয়া ঘুরিতেছিলেন। এই দুই উপায়ে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ হইলে তাঁহারা হাতীবাগানে নূতন বাড়ী নির্মাণ করিয়া আবার 'ষ্টার থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করিলেন। গিরিশচন্দ্রও এমারেল্ড থিয়েটার ছাড়িয়া 'ষ্টার থিয়েটারে' যোগ দিলেন এবং ইহা আবার বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিল। গোপালচন্দ্র শীল 'এমারেল্ড থিয়েটার' ছাড়িয়া দিলে নূতন একদল ইহার ইজারা লইলেন। ১৮৯৬ সনে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া 'ক্লাসিক থিয়েটার' খোলেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্তবংশীয় বিখ্যাত অ্যাটর্নি ও দার্শনিক পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরেন্দ্রনাথ পেশাদার থিয়েটার খোলায় কলিকাতায় অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অমরেন্দ্রনাথ নিজে সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন এবং কুসুমকুমারী নামে প্রসিদ্ধ একজন অভিনেত্রী তাঁহার সঙ্গে যোগ দেন। অমরেন্দ্রনাথের এক ভাগিনেয় খুব নৃত্য-কুশল ছিলেন। ইঁহাদের সম্মিলিত চেষ্টায় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটকের অভিনয় যেরূপ দীর্ঘকাল যাবৎ জনপ্রিয় ছিল ইহার পূর্বে সেরূপ সৌভাগ্য বা প্রতিপত্তি আর কোন অভিনয়ের হয় নাই। কিছুদিনের জন্য গিরিশচন্দ্রও এই রঙ্গালয়ে যোগদান করেন। বিংশ শতকের প্রথম দশকেও ক্লাসিক থিয়েটারের খুব সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। অমরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে একখানি সাপ্তাহিক ('রঙ্গালয়') ও একখানি মাসিক ('নাট্যমন্দির') পত্রিকা প্রকাশিত করেন।

এই সময়ে বিডন ষ্ট্রীটে অবস্থিত 'মিনার্ভা থিয়েটার'ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। গিরিশচন্দ্রও একাধিকবার এই রঙ্গালয়ে যোগদান করেন, এবং ইহা ছাড়িয়া 'ক্লাসিক থিয়েটার' ও 'ষ্টার থিয়েটারে' যোগ দেন। প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রারম্ভে কলিকাতায় মাত্র এই তিনটি পেশাদার থিয়েটারই প্রসিদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে একমাত্র 'ষ্টার থিয়েটার'ই পুরানো নামে পুরানো রঙ্গালয়ে এখন পর্যন্ত টিকিয়া আছে। আর দুইটি হস্তান্তর হইয়া পরিবর্তিত নামে কিছুদিন টিকিয়া ছিল, পরে লোপ পাইয়াছে।

এই তিনটি থিয়েটারকে বঙ্গীয় নাট্যশালার প্রথম যুগের প্রগতির সীমা নির্দেশক বলা যাইতে পারে। গিরিশচন্দ্র ঘোষই ছিলেন এই যুগের অভিনয় শিল্পের নির্দেশক ও নিয়ামক। তিনি নিজে উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন এবং অভিনয়ের প্রয়োজনবোধে বহু সংখ্যক সামাজিক ও ধর্মমূলক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই যুগে

বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা অনেক ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভক্তিমূলক নাটক রচনা করিয়া বাংলার নাট্যজগতে নূতন রস ও প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ, অমৃতলাল (বসু ও মিত্র) প্রভৃতির নিপুণ অভিনয়ের দ্বারা তাহা দর্শকের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিত। সমসাময়িক রাজনীতি ও সামাজিক ঘটনা লইয়া অনেক ব্যঙ্গাত্মক নাটক রচিত হয়। হাস্যরসের দুই জন প্রসিদ্ধ অভিনেতা অমৃতলাল বসু ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী অভিনয়ের দ্বারা তাহা জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। গিরিশচন্দ্রের রচিত নাটক, দীনবন্ধু, মধুসূদন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের নাটক, এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির উপন্যাসগুলির নাট্যে রূপায়ন এই যুগের রঙ্গমঞ্চের প্রধান উপজীব্য ছিল। নাট্যশালার কল্যাণে বাংলা সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্মৃতপ্রায় নৃত্যশিল্পও বাংলায় রঙ্গালয়ের মাধ্যমেই পুনর্জন্ম লাভ করে। বঙ্গীয় নাট্যশালার এই দুইটি অবদানও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

কলিকাতার অভিজাত সম্প্রদায় সঙ্গীত ও নাট্যের ভক্ত এবং অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারা একাধিক সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—কিন্তু যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার ফলে সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়গুলি প্রায় বিলুপ্ত হইল তখন অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষভাগে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ও 'রঙ্গমঞ্চের' গৃহে 'সঙ্গীত সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু শীঘ্রই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং এবং আরও অনেক সদস্য পৃথকভাবে 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং পূর্বোক্ত 'সঙ্গীত সমাজ' 'সঙ্গীত সমিতি' নামে পরিচিত হইল। এদেশীয় রাজা, মহারাজা, জমিদার, বিলাত ফেরৎ ডাক্তার, ও ব্যারিষ্টার অনেকে 'সঙ্গীত সমাজের' সভ্য ছিলেন। সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে এখানে নাট্যাভিনয়েরও ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং ইহা নৃত্য, গীত ও অভিনয় এই তিনটি সুকুমার শিল্পের চর্চার কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।

'সঙ্গীত প্রকাশিকা' নামে স্বরলিপি-বহুল একখানি মাসিক পত্র 'ভারত সঙ্গীত সমাজে'র মুখপত্র ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত অভিনেতাদের শিক্ষা দিতেন এবং রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত অনেক নাটক এই সমাজেই প্রথম অভিনীত হয়। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় যথাক্রমে কেদার ও অবিনাশের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। লোকগীতি

আলোচ্য যুগের কাব্য বর্ণনা প্রসঙ্গে পূর্বেই (৪৩৯ পৃঃ) বলা হইয়াছে ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্ত, এই দুই কবির অন্তর্বর্তীকালে উচ্চশ্রেণীর কোন বাংলা কা রচিত হয় নাই—কবিগান, পাঁচালী, যাত্রা, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি লোকগীতি তখন কবিতার আশ্রয়স্থল ছিল। এগুলি এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। গ্রা বা ছোট শহরে, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকই এখন ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক- তবে ক্রমশঃ শহর অঞ্চলেও প্রধানতঃ যাত্রা ও কীর্তন আবার প্রচলিত হইতেছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি বা শেষ পর্যন্ত এক শতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকগীতি খুবই জনপ্রিয় ছিল। সম্ভ্রান্ত ও ধনী সম্প্রদায় হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেণীর লোকই এইগুলির বিশেষ ভক্ত ছিল। সুতরা ইহাদের সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়োজন আছে।

(ক) যাত্রাগান

যাত্রাগান এখনও প্রচলিত—সুতরাং ইহার সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা সকলেরা আছে। ইহা নাট্যাভিনয়ের অনুরূপ—তবে ইহার জন্য পৃথক রঙ্গমঞ্চ বা দৃশ্য পরিবর্তনের ব্যবস্থা নাই। খোলা জায়গায় চতুর্দিকে বিস্তৃত শ্রোতার দলের মধ্যবর্তী অপ্রশস্ত একটু চতুষ্কোণ আসরে যাত্রাদলের গায়ক ও বাদ্যকরেরা বসিত প্রয়োজন মত যথোচিত বেশভূষায় সজ্জিত অভিনেতারা বাহিরের নিকটবর্তী সাজঘর হইতে দর্শকদলের মধ্যবর্তী সরু পথ দিয়া আসরে প্রবেশ করিত। জাঁকজমকশালী পোষাকের জন্য যাত্রাদলের রাজা, ও বস্ত্রাবৃত কাষ্ঠখণ্ডে নির্মিত বিশাল ভীমের গদা প্রভৃতি যাত্রাদলের বৈশিষ্ট্যের লক্ষণগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরিত। আর একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে অভিনেতা গভীর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে করুণ সুরে বা তেজঃব্যঞ্জক ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে করিতে অকস্মাৎ থামিয়া গেলেন—অমনি তাঁহার চতুর্দিক হইতে গায়কের দল সেই ভাবব্যঞ্জক কোন গান গাহিতে আরম্ভ করিল—পনরো কুড়ি মিনিট এই 'জুরী গান' চলিত—ততক্ষণ অভিনেতার কোন কাজ নাই—নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়াইয়া থাকিত—অথবা বসিয়া তামাক খাইত। যাত্রার দলে পুরুষই স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণ করিত—সুতরাং কেবল কৃষ্ণ নহে, রাধিকাও অনেক সময় তামাক খাইতেছেন—ওদিকে লোকে মুগ্ধ হইয়া জুরীগান শুনিতেছে—এরূপ দৃশ্য যাত্রার একটি স্বাভাবিক অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। যাত্রাগান সাধারণতঃ দিনে হইত—তবে পূজাপার্বণোপলক্ষে

সন্ধ্যার পর আরম্ভ হইয়া প্রায় সারা রাত্র চলিত। প্রধানতঃ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কাহিনী অবলম্বনেই যাত্রাগানের 'পালা' রচিত হইত। যাত্রার অধ্যক্ষ অর্থাৎ 'অধিকারী' হস্তলিখিত (পরবর্তীকালে মুদ্রিত) পুঁথি হইতে প্রত্যেক অভিনেতাকে তাঁহার বক্তব্য অংশ মুখস্থ করাইতেন—এবং অভিনয়ের উপযোগী অঙ্গচালনা ও আবৃত্তি বিষয়ে তালিম দিতেন। সকলের সমক্ষে অভিনয় করিতে হইত—থিয়েটারের ন্যায় দৃশ্যপটের অন্তরাল হইতে অভিনেতাকে বক্তব্য কথা জোগাইবার অর্থাৎ প্রম্পট (prompt) করার সুযোগ ছিল না—সুতরাং প্রতি অভিনেতাকেই তাহার বক্তব্য অংশ ভালভাবে মুখস্থ করিতে হইত। এই সব যাত্রার 'পালা' বহু সংখ্যায় রচিত হইত—এবং যাত্রার অভিনয়ের উৎকর্ষ দ্বারাই এগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করিত। সুতরাং খ্যাতিটা বেশীর ভাগই যাত্রার অধিকারী পাইতেন—পালা-রচয়িতার নাম খুব কম লোকেই জানিত। যাত্রার গানগুলি যাত্রা অভিনয়ের পরেও বহুকাল লোকের মুখে মুখে শোনা যাইত। কিন্তু যাত্রাগানের ও পালার রচয়িতার কেহ সন্ধান রাখিত না। এইজন্যই তাঁহাদের নাম বিস্মৃতির সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে।

(খ) পাঁচালি

পাঁচালি গান বর্তমান যুগে বিলুপ্তপ্রায় হইলেও এককালে ইহা যাত্রার ন্যায়—অনেক স্থলে তাহা অপেক্ষাও বেশী—জনপ্রিয় ছিল। দূর দূরান্তর হইতে উচ্চ, নীচ সকল শ্রেণীর লোকই পাঁচালি শুনিতে আসিত। ইহার বিষয়-বস্তু ছিল হিন্দু-শাস্ত্রের ও ধর্মের—বিশেষতঃ শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের—উপাস্য দেব দেবীর কাহিনী বা আখ্যান। ইহা ছন্দোবদ্ধ কবিতায় রচিত হইত এবং সভায় সুর তান লয় সহযোগে গীত হইত। এইজন্য ইহার বিশেষত্ব ছিল কবিতার উৎকর্ষ ও সঙ্গীত নৈপুণ্য। সুতরাং যাত্রার পালা লেখকদের তুলনায় পাঁচালিকারদের অনেকের নামই এককালে সুপরিচিত ছিল এবং পাঁচালির পুঁথিও খুবই প্রচলিত ছিল। গ্রামের ছোট আসর হইতে শহরের বড় বড় বৈঠকে পাঁচালি গান হইত—কারণ ইহাতে যাত্রার ন্যায় সাজ পোষাক ও অন্যান্য সরঞ্জামের প্রয়োজন হইত না—একজন সুদক্ষ গায়ক অথবা আবৃত্তিকারক এবং পাঁচালির পুথি সংগ্রহ হইলেই পাঁচালির আসর বসান যাইত।

সে যুগের পাঁচালি রচয়িতাদের মধ্যে দাশরথি রায় বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু মন্তব্য করা হইয়াছে (৪৩৭ পৃষ্ঠা)।

দাশরথির পৈতৃক বাড়ী ছিল বর্ধমান জিলার অন্তর্গত বাঁদামুড়া গ্রামে, কিন্তু তিনি বাল্যকালে মামাবাড়ীতে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি নীলকুঠির কেরানী ছিলেন এবং আকাবাই নামে একটি রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। আকাবাই একটি ওস্তাদী কবিয়াল দল গঠন করেন এবং দাশরথি চাকুরী ছাড়িয়া এই দলের বাঁধনদার (অর্থাৎ কবিতায় পদ রচয়িতা) নিযুক্ত হন। একবার কবির লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বাঁধনদার ছড়া বান্ধিয়া দাশরথিকে অতি অশ্রাব্য গালাগালি করে তাহাতে মাতার নির্বন্ধানুযায়ী দাশরথি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখনও কবিগান রচনা করিবেন না।

অতঃপর দাশরথি পাঁচালি গান রচনা আরম্ভ করিলেন—এবং দাশু রায়ের পাঁচালি সারা বাংলা দেশে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিল। তাঁহার অনেক পাঁচালি গান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

দাশরথি যে অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্তমান রুচি অনুসারে দাশরথির অনেক উক্তি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। 'নলিনী-ভ্রমরোক্তি' গ্রন্থে ফুল ও ভ্রমরের ব্যঞ্জনায় কবি ও আকাবাইয়ের প্রেম-কলহটি বর্ণিত হইয়াছে—অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া ইহা এখন আর ভদ্র সমাজে প্রচলিত নাই। কিন্তু এই দোষ কেবল দাশরথির নহে সে যুগের তর্জা, কবিগান, পাঁচালি প্রভৃতি লোক সাহিত্যে রচনার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। তখনকার দিনে যে সমাজে ইহা বিশেষভাবে আদরণীয় ছিল তাহার শ্লীলতা ও অশ্লীলতার ধারণা বর্তমান যুগের মাপকাঠিতে নির্ধারণ করা সঙ্গত নহে। উনবিংশ শতকের সর্বপ্রকার লোকসাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে।

দাশরথির শ্যামা সঙ্গীত ও অন্যান্য কয়েকটি গান এই দোষ হইতে মুক্ত এবং ইহা উচ্চাঙ্গের ভক্তিভাবপূর্ণ সঙ্গীত হিসাবে খুবই মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। তবে তাঁহার অন্যান্য রচনায় যথেষ্ট কলানৈপুণ্য থাকিলেও ইহা নিছক সাহিত্য হিসাবে খুব উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। পূর্বে (পৃঃ ৪০৯) এই শ্রেণীর একটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার গানের সরল ও মধুর সুর এবং যমক ও অনুপ্রাসপূর্ণ ভাষা শ্রোতাদের মন মুগ্ধ করিত। পূর্বেই বলিয়াছি—কেহ কেহ তাঁহার রচনায় কালিদাস, নৈষধ ও ভারবির বিশিষ্ট গুণের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাইতেন—আবার কেহ কেহ তাঁহার কবিতা অগভীর শব্দ-সর্বস্ব বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। দাশরথি বহু পাঁচালির পালা রচনা করিয়াছিলেন—ইহার

সংগ্রহ দশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। দাশরথির পাঁচালি অপ্রচলিত হইলেও তাঁহার কয়েকটি ভক্তিমূলক গান এখনও প্রসিদ্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ "হৃদিবৃন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপতি"—, "দোষ কারো নয় গো শ্যামা" প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। "শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী" ও "শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন" প্রভৃতি তাঁহার রচিত পাঁচালির গান এখনও গীত হইয়া থাকে।

দাশরথির পাঁচালি প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন—যদিও আঠারো-উনিশ শতকের লোক-গীতির সকল শ্রেণীর সম্বন্ধেই ইহা অল্প-বিস্তর প্রযোজ্য। এই লোকগীতির মধ্য দিয়াই আমরা সর্বপ্রথম মধ্যযুগ হইতে আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের অস্ফুট পরিচয় পাই। মধ্য যুগের কাব্য সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল ধর্মমূলক পৌরাণিক কাহিনী। কবিরা যে সমাজে বাস করিতেন তাহার কোন আভাস তাঁহাদের রচনায় প্রতিফলিত হয় নাই। দাশরথি বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ সমর্থনের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করিয়া 'বিধবার বিবাহ' নামক একখানি পাঁচালির পালা রচনা করিয়াছিলেন এবং ভাষার গুণে তাঁহার অনেক ব্যঙ্গোক্তি সে যুগে খুব উপভোগ্য হইয়াছিল।

দাশরথি ব্যতীত আরও অনেকে পাঁচালির পালা রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ব্রজমোহন রায়, ঠাকুরদাস দত্ত, মনোমোহন বসু, রসিকচন্দ্র গোস্বামী, রসিকচন্দ্র রায়, নন্দলাল রায় এবং কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

(গ) কবি গান।

যিনি কবিতা রচনা করেন তিনিই কবি নামের অধিকারী। কিন্তু আলোচ্য যুগে 'কবিওয়ালা' নামে এক বিশিষ্ট কবি শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাঁহাদের রচিত কবিতা বা গান—'কবি গান' এই সংজ্ঞা দ্বারা চিহ্নিত হইত। যাত্রা গানের ন্যায় একটি খোলা যায়গায় কবিওয়ালারা (অন্ততঃ দুই জন) তাঁহাদের দলবল লইয়া উপস্থিত থাকিতেন। যাত্রা গানের ন্যায় কোন বিষয় বস্তু পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট থাকিত না। আসরে বসিয়াই জমিদার বা যাঁহার বাড়ীতে গান হইত তিনি অথবা অন্য কেহ এমন কোন একটি বিষয় প্রস্তাব করিতেন—যাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার সুযোগ আছে—তখন দুই কবিওয়ালা বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করিতেন। প্রথমে একজন যাহা বলিতেন তিনি শেষ করিয়া বসিবার পরই আর একজন উঠিয়া তাহার প্রতিবাদ ও যুক্তি খণ্ডন করিয়া নিজের পক্ষের

সমর্থন মূলক গান করিতেন। এমনও হইত যে এক কবি একটি সমস্যা উপস্থিত করিয়া অপরকে তাহার সমাধান করিবার জন্য দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিতেন। উত্তর প্রত্যুত্তর সকলই গানের মধ্য দিয়া হইত। মূল গায়েন বা কবি এক এক পদ গাহিতেন অমনি তাহার দোহার বা সঙ্গীগণ একাধিকবার তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেন। সুতরাং শ্রোতাদের পক্ষে এই সব উত্তর প্রত্যুত্তর বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হইত না এবং কবিওয়ালার কেবল কবিত্বশক্তি নহে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই সব উত্তর ও প্রত্যুত্তরকে বলা হইত 'চাপান' ও 'উতোর'। প্রথম কবি 'চাপান' দিতেন—প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কবি 'উতোর' গাহিতেন। প্রথমেই কবিওয়ালা নিমন্ত্রণকারী বাবুকে ধন্যবাদ দিতেন—অনেক স্থলে প্রতিপক্ষ ইহারও 'উতোর' দিতেন। একটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত দিতেছি। যজ্ঞেশ্বর নামে এক কবি জমিদার বাবুদের তোষামোদে তুষ্ট করিবার জন্য প্রথমেই জাড়া নামক তাঁহাদের গ্রামের উচ্চ প্রশংসা করিয়া ইহাকে বৃন্দাবনের তুল্য বলিয়া বর্ণনা করিলেন। প্রত্যুত্তরে অপর কবি আরম্ভ করিলেন :

"কেমন করে বললি জগা জাড়া গোলক বৃন্দাবন"—এইটিই হইল 'ধুয়া'—অর্থাৎ কবিতায় বিপক্ষের এক একটি যুক্তি খণ্ডনের পরই দোহারেরা এই লাইনগুলি গাহিত। প্রথমেই কবির উক্তির বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখান হইল—যে যদি ইহা বৃন্দাবন হয় তবে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ স্থানগুলি কোথায় ? তিনি গাহিলেন—"কোথায় রে তোর শ্যামকুণ্ড কোথায় রে তোর রাধাকুণ্ড—কেবল আছে মূলার ক্ষেত করগে তাহা দরশন।" উপসংহারে গাইলেন—"কবি গাবি পয়সা নিবি—খোসামুদি কি কারণ"। ইহার প্রতিটি লাইন পুনঃ পুনঃ উচ্ছ্বাসভরে দোহারেরা গাহিত—দর্শক ও শ্রোতারা বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতেন। কিন্তু অনেক সময় এই উত্তর প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়া এক কবি আর এক কবিকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিতেন, এমন কি অশ্রাব্য গালাগালি করিতেন। কবিওয়ালা দাশরথি প্রসঙ্গে তাহা বলিয়াছি।

কবি গানের চারিটি শ্রেণী বিভাগ ছিল : (১) 'মালসা'; (২) 'সখী সংবাদ'; (৩) 'বিরহ'; (৪) 'খেউড়'। 'মালসা' দেবদেবী বিষয়ক গান বুঝাইত—'সখী সংবাদ' ও 'বিরহ'—রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক, এবং ব্যক্তিগত নিন্দা ও অশ্লীল গালাগালিই 'খেউড়ের' উপজীব্য ছিল। কিন্তু ইহার প্রথম তিনটির মধ্য দিয়া পরবর্তীকালের 'রোমান্টিক সাহিত্যে'রও আভাস পাওয়া যায়—অর্থাৎ কেবল ধর্মশাস্ত্র বা পৌরাণিক কাহিনী নহে মানুষের সাধারণ মনোবৃত্তির বিচার ও

বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা প্রভাবান্বিত হইত। বহুকাল পূর্বে একটি কবির লড়াই শুনিয়াছিলাম—বিষয় ছিল লক্ষ্মী বড় না সরস্বতী বড়। এক কবি লক্ষ্মীর সমর্থনে বর্তমান যুগে ধনসম্পদ সমাজে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা, এবং আর এক কবি বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারা জগতের এবং মনুষ্যজাতির কি অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছে—তাহার বর্ণনা করিলেন।

'সখী সংবাদ' ও 'বিরহের' মধ্য দিয়া কেবল যে বৈষ্ণব গ্রন্থের রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী—মিলন, বিচ্ছেদ, উৎকণ্ঠা, প্রতীক্ষা—প্রভৃতি বর্ণিত হইত তাহা নহে, সাধারণ নরনারীর চিরন্তন প্রেম ইহার মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করিত। খেউড়ের মধ্য দিয়া সোজাসুজি ব্যক্তি ও সমাজের আলোচনা—প্রধানতঃ নিন্দা—হইত।

কবিদের মধ্যে সময়ের ক্রম অনুসারে প্রথমেই গোজলা গুইর নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইহার তিনজন কবিওয়ালা শিষ্য ছিলেন রঘুনাথ দাস, লালু নন্দলাল ও রামজী দাস। তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্যেরাই এদেশে কবি গানকে জনপ্রিয়তা ও মর্যাদার উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, নীলু, নৃসিংহ, রামপ্রসাদ ঠাকুর, হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (হরু ঠাকুর), ভোলা ময়রা, নিতাই বৈরাগী, রামানন্দ নন্দী, ভবানী বণিক এবং রাম বসু। অন্যান্য কবিদের মধ্যে কেষ্ট মুন্সী, ঠাকুরদাস সিংহ, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রূপচাঁদ পক্ষী, রামনিধি গুপ্ত এবং অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গীও কবিওয়ালা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কাহারো কাহারো মতে কেবল কবিত্ব শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে ইঁহাদের মধ্যে রাম বসুকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হয়। কারণ তিনি 'সখী সংবাদ' ও 'বিরহ' পর্যায়ের গানগুলির মধ্য দিয়া নরনারীর প্রেমের তীব্র আকুতি ও গভীরতা আন্তরিকতার সহিত রূপায়িত করিয়াছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :

"ওগো চিনেছি চিনেছি চরণ দেখে ঐ বটে সে কালিয়ে
চরণে চাঁদ ছাঁদ আছে দীপ্ত হয়ে
সে চরণ ভজে ব্রজেতে আমায় ডাকে কলঙ্কিনী বোলিয়ে।
ভুবনমোহন না দেখি এমন ঐ বই
রূপ কি অপরূপ আ মরি সই
কুলে শীলে কালি দিয়েছি আমি
কালরূপ নয়নে হেরিয়ে।"

কবিওয়ালা রামনিধি গুপ্তের নামও এককালে লোকের মুখে মুখে ফিরিত—'নিধুবাবুর টপ্পা' আজও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরানী ছিলেন এবং ৯৭ বৎসর (১৭৪১-১৮৩৮) জীবিত ছিলেন।

হরু ঠাকুরও এককালে খুব বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা নানা কারণে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁতী জাতীয় পূর্বোক্ত রঘুনাথ দাসের নিকট কবি গান রচনা শিক্ষা করিতে তিনি দ্বিধা বোধ করেন নাই—কিন্তু কবিওয়ালার মর্যাদা সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চ ধারণা ছিল। কথিত আছে যে একবার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে একদল কবিওয়ালা গান করেন। হরু ঠাকুরের গানে রাজা খুসী হইয়া তাঁহাকে একখানা শাল উপহার দিতেই হরু উহা তাঁহার ঢুলীর মাথায় জড়াইয়া দিলেন। রাজা অপমানিত বোধ করিয়া কৈফিয়ৎ চাহিলে বলেন যে তিনি সখের কবি, পেশাদার নন—গান গাহিয়া উপহার নেওয়া তাঁহার আত্মসম্মানে বাধে। রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া হরুকে নানাভাবে বিশেষ অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার সভাস্থ পণ্ডিতেরা খুব ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রাজা পণ্ডিতদিগকে একটি সমস্যা-পূরণ করিতে বলিলেন—তাঁহারা কয়েকদিনের সময় চাহিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ হরুকে ডাকাইয়া আনিয়া সমস্যাটি দিলেন—এবং হরু তৎক্ষণাৎ একটি গানের মাধ্যমে তাহা পূরণ করিলেন। চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল—পণ্ডিতেরাও তাঁহাকে যথোচিত সম্মান দিলেন।

কবিওয়ালাদের মধ্যেও রেষারেষির ভাব যথেষ্ট ছিল। হরু ঠাকুরেরই শিষ্য রাম বসু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া একটি বিদ্রোহী দল গঠন করেন এবং পদে পদে হরু ঠাকুরকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। হরু ঠাকুরের বিরুদ্ধে রাম বসু, নীলু ঠাকুর প্রভৃতি বিদ্রোহী শিষ্যদের প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে তিনি তাঁহার অপর এক শিষ্য ভোলানাথকে বেশী ভালবাসিতেন এবং কবি গানের সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব তাঁহাকেই শিখাইয়াছিলেন। এই বিশ্বাসের মূলে যাহাই থাকুক ভোলানাথ যে সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভোলানাথ জাতিতে মোদক ছিলেন এবং প্রাচীন কবিওয়ালাদের মধ্যে ভোলা ময়রার খ্যাতি আজও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তিনি ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পর্তুগীজ জাতীয় অ্যান্টনির নাম ও গান কেবল অশিক্ষিত গ্রাম্য জনের নহে, শিক্ষিত সমাজেও প্রচলিত ছিল। ইঁহাদের রচিত কয়েকটি সুপরিচিত গান সেই যুগের ধর্ম ও সমাজের উপর নূতন আলোকপাত করে। অ্যান্টনি পর্তুগীজ হইলেও

এক ব্রাহ্মণ জাতীয়া বিধবাকে বিবাহ করেন এবং হিন্দুর পূজা পার্বণ—দোল দুর্গোৎসব—প্রভৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু অ্যাণ্টনি কবি গানের প্রতি আসক্ত ছিলেন। প্রথমে মাঝে মাঝে তিনি কবি গানে অংশ গ্রহণ করিতেন—পরে নিজেই আলাদা দল গড়েন। সাহেব কবিওয়ালা বাঙ্গালী পোষাকে কবি গান গাহিতেছেন—ইহা সে যুগে এক অভিনব দৃশ্য ছিল; বলা বাহুল্য গানের আসরে বিপুল জনসমাগম হইত।

একবার খ্যাতনামা কবিওয়ালা ঠাকুর সিংহ আসরে 'চাপান' দিলেন:

"বলহে অ্যাণ্টনি আমি একটি কথা জানতে চাই।
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কোর্তা নাই॥"

অ্যাণ্টনি 'উতোর' দিলেন:

"এই বাংলায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি
হয়ে ঠাকরে সিংহের বাপের জামাই কোর্তা টুপি ছেড়েছি॥"

অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে 'শ্যালক' প্রতিপন্ন করিলেন এবং দর্শকেরাও খুব উপভোগ করিল।

কিন্তু এই সব গ্রাম্য রসিকতার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর ভাবের কবিতার দৃষ্টান্তও আছে।

একবার রাম বসু অ্যাণ্টনিকে 'চাপান' দিলেন:

"সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি
ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চুণ কালি।"

অ্যাণ্টনি 'উতোর' গাহিলেন:

"খৃষ্ট আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই॥
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে
আমার মানব জনম সফল হবে যদি ঐ রাঙ্গা চরণ পাই।"

আর একবার অ্যাণ্টনি গাইলেন:

"আমি সাধন ভজন জানিনা মা জাতিতে ফিরিঙ্গী।
দয়া করে তরাও মোরে হে শিবে মাতঙ্গী॥"

জবাব হইল (খুব সম্ভবতঃ ভোলা ময়রাই গাইলেন):

"আমি পারব নারে তরাতে, আমি পারব নারে তরাতে
যীশু খ্রীষ্ট ভজগে তুই শ্রীরামপুরের গির্জাতে।"

জাতি ও ধর্ম তুলিয়া কটাক্ষ করিতে কবিওয়ালারা অভ্যস্ত ছিল। ভোলা ময়রাকে একজন কবি ব্যঙ্গ করিয়া নাম সাদৃশ্যে ভোলানাথকে শিবের সঙ্গে তুলনা করিলে ভোলা ময়রা জবাব দিল :

"আমি সে ভোলানাথ নই, আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্যামবাজারে রই।
চিন্তামণির চরণ চিন্তি
ভাজনা খোলায় ভাজি খই।
আমি যদি সে ভোলানাথ হই।

ইহার শেষ লাইনটির মধ্যে একটু অশ্লীলতার আভাস আছে বলিয়া উদ্ধৃত করিলাম না—ইহার মর্মার্থ—

"তোরা সবাই শিবের মত আমায় পুজলি কই ?"

কবিওয়ালাদের যে প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—যে কোন প্রশ্নের তৎক্ষণাৎ জবাব দেওয়া—ভোলা ময়রার তাহা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

একবার এক ধনী ব্যক্তির বাড়ীর আসরে কর্তা ভোলা ময়রাকে আদেশ দিলেন যে বাংলা দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্যগুলি কি এবং কোথায় পাওয়া যায় তাহার বর্ণনা কর। এরূপ উদ্‌ভট প্রশ্নের জন্য কেহ প্রস্তুত থাকে না—এবং ইহার উত্তর দেওয়াও খুবই কঠিন। কিন্তু ভোলা ময়রা দমিলেন না—তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন :

"ময়মনসিংহের মুগডাল, খুলনার ভাল খই।
ঢাকার ভাল পাতক্ষীর, বাঁকুড়ার ভাল দই ॥
কৃষ্ণনগরের ক্ষীরপুরী (সরপুরিয়া) ভাল, মালদহের ভাল আম।
উলোর ভাল বাঁদর-বাবু, মুর্শিদাবাদের জাম ॥
রংপুরের শ্বশুর ভাল, রাজসাহীর জামাই।
নোয়াখালির নৌকা ভাল, চট্টগ্রামের ধাই ॥
শান্তিপুরের শালী ভাল, গুপ্তিপাড়ার মেয়ে।
মাণিককুণ্ডের মূলো ভাল, চন্দ্রকোণার ঘিয়ে ॥
দিনাজপুরের কায়েৎ ভাল, হাবড়ার ভাল শুঁড়ি।
পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভাল, ফরিদপুরের মুড়ি ॥
বর্ধমানের চাষী ভাল, চব্বিশ পরগণার গোপ।
পদ্মানদীর ইলিশ ভাল, কিন্তু বংশ লোপ ॥

হুগলীর ভাল কোটাল লেঠেল, বীরভুমের ভাল ঘোল।
ঢাকের বাদ্যি থামলেই ভাল—হরি হরি বোল॥"

ভোলা ময়রার অনেক গানেই সমসাময়িক সমাজের নানা চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভোলানাথ ও অ্যাণ্টনি দুজনের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু কবির আসরে কেহ কাহাকে খাতির করিতেন না। এক আসরে ভোলা অ্যাণ্টনিকে লক্ষ্য করিয়া গাহিলেন :

"পেদরু ফিরিঙ্গি বেটা পেক কাটা।
ব্যাটা কি সাহেব ফলিয়েছে।
ব্যাটা ছিল ভালো সাহেব ছিলো, হলো বাঙ্গালী।
এখন কবির দলে এসে মিলে ব্যাটা পেটের কাঙ্গালী॥ ইত্যাদি

ভোলানাথ ময়রা ছিলেন—এক আসরে অ্যাণ্টনি ছোট জাতের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করায় ভোলানাথ নিম্নলিখিত যে উত্তর দেন সে যুগের সামাজিক চিত্র হিসাবে তাহা বিশেষ মূল্যবান।

"বামুন বলে 'আমি বড' কায়েৎ বলে 'দাস'।
বদ্যি বলে 'দ্বিজ আমি' ঢাকা জেলায় বাস॥
যুগী বলে 'যোগী আমি', চাষা বলে 'বৈশ্য'।
শূদ্রও শূদ্রত্ব ছাড়ে যথা কালীঘাটের নস্য॥
বলে উগ্র 'নহি শূদ্র' ধরি তলোয়ার'।
হলে রাত্রি উগ্রক্ষত্রী ভয়ে পগার পার'॥
চাষা ধোপা 'সচ্চাষী' বলে কৈবর্ত 'মাহিষ্য'।
সবাই বড় হতে চায় কেউ কারো নয় বশ্য॥
অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গী বাচ্ছা না আছে তার কাছা কচ্ছা ব্যাটা বড় নচ্ছারের শেষ।
(তোর) বাপ মায়ের খবর নিলে কিছু না মেলে ধরাতলে ব্যাটার
যেমন ধর্ম কর্ম তেমন তার বেশ॥
আমি ময়রা ভোলা ভিজাই খোলা ময়রাই বারমাস।
জাতি পাতি নাহি মানি, ওগো মোর কৃষ্ণপদে আশ॥"

এই 'ছত্রিশ জাতি' অধ্যুষিত বাংলাদেশে সুপরিচিত জাতি-বিদ্বেষের একটি নিখুঁত বাস্তব চিত্রের উপসংহারে ভোলার এই সর্ব শেষ উক্তি সে যুগের পক্ষে অনন্যসাধারণ সরল উদার মনের পরিচায়ক এবং অনাগত ভবিষ্যতের অস্ফুট আদর্শের পূর্বাভাষ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ভোলানাথের জন্ম তারিখ ও জন্মস্থান সম্বন্ধে অনেকে গবেষণা করিয়াছেন —কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন। খুব সম্ভবতঃ কলিকাতা বাগবাজারেই ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং সেখানেই তাঁহার নিজের হাতে তৈরী লুচি সন্দেশ খই মুড়কি প্রভৃতির দোকান ছিল। বাল্যকালে তিনি কিছুদিন পাঠশালায় পড়াশুনা করিয়াছিলেন এবং ক্রমে বহু অর্থ উপার্জন করিয়া গ্রে স্ট্রীটে একটি বাড়ী নির্মাণ করেন। কেহ কেহ বলেন যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। সম্ভবতঃ ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৫১)। যাত্রা ও পাঁচালির ন্যায় কবিগানও বাংলাদেশের একটি নিজস্ব সম্পদ এবং আলোচ্য যুগে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই শ্রেণীর লোকগীতি কত প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কাহারও কাহারও মতে অন্ততঃ তিন শত বৎসর পূর্বেও কবিগান প্রচলিত ছিল। সুখের বিষয় এ সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন—উৎসুক পাঠক পাদটীকায় উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী হইতে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।[১১] বাংলাদেশের আর একটি নিজস্ব লোকগীতি—'আখড়াই গান'—কবিগানেরই একপ্রকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্করণ। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকে ইহার প্রচলন হয়। প্রথমে নদীয়া, শান্তিপুর ও পরে কলিকাতায় ও ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলে ইহা জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। প্রথমে কবিগানের ন্যায় ইহাতেও অশ্লীলতা দোষ যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। রামনিধি গুপ্ত— অর্থাৎ বিখ্যাত টপ্পাগায়ক নিধুবাবু—ইহাকে অনেকটা সুসংস্কৃত করেন এবং উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতে পরিণত করেন। কিন্তু ইহা জনপ্রিয় না হওয়ায় ইহার কিছু পরিবর্তন করিয়া অনেকটা লঘু সুরের হাফ আখড়াই প্রবর্তিত হয়। কবি গানের ন্যায় দুই দলের লড়াই ইহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল।[১২]

৩। সঙ্গীত

বাংলাদেশে যে প্রাচীন অর্থাৎ হিন্দুযুগেও সঙ্গীতের বিশেষ চর্চা হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। চর্যাপদগুলি যে গীত হইত তাহা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে[১৩] উল্লিখিত হইয়াছে। রাজতরঙ্গিনীর একটি শ্লোকে (৪।৪২৩) বাংলাদেশের এক মন্দিরে সঙ্গীতের উল্লেখ আছে (৮ম শতক) এবং চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বর তাঁহার মানসোল্লাস গ্রন্থে (১১২৭-৩৮ খ্রীঃ) কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কয়েকটি বাংলা গীতের অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

চর্যাপদের গীতগুলি কোন্ রাগরাগিণীতে গীত হইত, প্রত্যেকটি পদের পূর্বে

তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'ভৈরবী', 'পটমঞ্জরী', 'মল্লারী', 'কামোদ', 'মালশী' প্রভৃতি রাগের সঙ্গে কেবল একটি মাত্র পদে (৪৩ সংখ্যক) 'বঙ্গাল'-রাগের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে বর্তমান কালের 'কীর্তন', 'বাউল', 'রামপ্রসাদী' প্রভৃতি বাংলার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র সুরগুলির ন্যায় সে যুগেও সঙ্গীতে বাংলার নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে সেটির লক্ষণ কি তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু ৫০টি চর্যাপদের মধ্যে কেবল একটি পদে এই রাগের ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, ইহা বাংলাদেশেও খুব প্রসিদ্ধ ছিল না, এবং বাঙ্গালীরা ভারতের অন্যত্র উদ্ভূত বা প্রচলিত অনেক রাগরাগিণীর সহিত পরিচিত ছিল। উপরে উল্লিখিত প্রমাণগুলি হইতে ইহাও অনুমান করা যায় যে সঙ্গীতগুলি প্রধানতঃ ধর্মমূলক ছিল এবং মন্দিরের দেবদাসীরা উচ্চাঙ্গের রাগ-রাগিণীর ধারা প্রচলিত রাখিত।

হিন্দুযুগের শেষে রচিত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের পদগুলিরও রাগ ও তালের সহিত গীত হইত। রাগগুলির মধ্যে কর্ণাট, গুর্জরী, মালব প্রভৃতি দেশ সূচক নাম হইতেও পূর্বোক্ত অনুমান সমর্থিত হয়। প্রবাদ আছে যে জয়দেবের প্রণয়িনী পদ্মাবতী নৃত্য সহযোগে গান করিতেন। সুতরাং হিন্দুযুগের শেষ পর্যন্ত যে বাংলাদেশে নৃত্যগীতের খুব প্রচলন ছিল এবং বাংলার বাহিরে অন্য প্রদেশের রাগ ও তানের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মধ্যযুগে চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের পদগুলি জয়দেবের প্রবর্তিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রবন্ধ সঙ্গীতের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। অনতিকাল পরে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে পদাবলী কীর্তন গানের এত প্রচার হইয়াছিল যে 'কানু ছাড়া গীত নাই'—ইহা বাংলায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। কীর্তন গান এখনও বাংলাদেশে সুপরিচিত, সুতরাং তাহার রসমাধুর্যের বা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। শ্রীচৈতন্যের লীলা ও তৎপ্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাসের সহিত বাংলার এই নিজস্ব সঙ্গীতের ধারা অঙ্গাঙ্গীভাবে সংবদ্ধ।

শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণভক্তির ভাবাবেশে যে কীর্তনে নবদ্বীপবাসীদের এবং পরে শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে ভক্তদের মাতাইয়াছিলেন সেই সঙ্গীত সংকীর্তন নামে সুপরিচিত। সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত আগে নবদ্বীপে শ্রীবাসের গৃহে সংকীর্তন এবং নবদ্বীপের পথে তাঁহার নগর সংকীর্তন বাংলায় প্রেমধর্ম প্রচারের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। এই সংকীর্তন কেবল মাত্র নাম-কীর্তন অর্থাৎ 'নমঃ কৃষ্ণ

ষাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন' ইত্যাদির পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি। কৃষ্ণের নাম ধ্রুব মন্ত্রের মতন অবলম্বন করিয়া ভাবে আত্মহারা শ্রীচৈতন্য সংকীর্তন গাহিতেন। পুরীতে অবস্থানকালে রথযাত্রা উৎসবের সময় রথাগ্রে এই সংকীর্তন সহযোগে শোভাযাত্রার কথাও সুবিদিত।

কিন্তু পরবর্তীকালের সঙ্গীতজগতে যাহা পদাবলী কীর্তন নামে প্রচলিত হয়, তাহা প্রণালীবদ্ধভাবে সুগঠিত একটি সঙ্গীতরীতি। মর্মস্পর্শী সুরমাধুরী ও বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের আবেদনে পূর্ণ হইলেও পদাবলী কীর্তন একটি সাধনা-সাপেক্ষ সঙ্গীত পদ্ধতি। তৎকালীন উত্তর ভারতে সঙ্গীতের যে রীতি ও চর্চার ধারা প্রচলিত ছিল তাহারই সাক্ষাৎ প্রভাবে বাংলার পদাবলী কীর্তন প্রবর্তিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোধানের (১৫৩৩ খ্রীঃ) পঞ্চাশ বৎসর পরে নরোত্তম ঠাকুর এই সুসংস্কৃত কীর্তন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন।

শ্রীচৈতন্য-পরবর্তী কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের তিনজন নেতার অন্যতম নরোত্তম ঠাকুর রাজশাহীর খেতরি গ্রামের ভূম্যধিকারীর একমাত্র সন্তান ছিলেন। প্রথম যৌবনেই সাংসারিক সুখ সম্পদ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যান এবং সেখানে শ্রীচৈতন্যের শিষ্য লোকনাথ গোস্বামীর নিকটে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত সন্ন্যাসী হন। বৃন্দাবন শুধু পবিত্র তীর্থস্থান ছিল না, সেকালের ধ্রুবপদ সঙ্গীত-চর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। স্বামী হরিদাস, স্বামী কৃষ্ণদাস প্রমুখ সাধক-সঙ্গীত গুণীরা বৃন্দাবনে ধ্রুবপদ সঙ্গীতের যে ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন নরোত্তম তাহার সংস্পর্শে আসেন। তিনি একজন সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং তৎকালীন অনেক সাধু সন্তের ন্যায় তাঁহার ধর্মসাধনা ও সঙ্গীতসাধনা অঙ্গাঙ্গী ছিল। বৃন্দাবনে সঙ্গীতশিক্ষাপ্রাপ্ত নরোত্তম পরে ১৫৮২ খ্রীঃ খেতরিতে শ্রীচৈতন্যের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এক বিরাট বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খেতরির মহোৎসব নামে প্রসিদ্ধ সেই সম্মেলনে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার উপস্থিতিতে নরোত্তম এই নব্য রীতির পদাবলী কীর্তন প্রথম পরিবেশন ও পরিচালনা করেন। ধাতু, রাগ, ও তাল-সমন্বিত এবং ধ্রুব প্রবন্ধ গানের ভিত্তিতে গঠিত সেই পদাবলী কীর্তন গান গড়েরহাট পরগনার খেতরিতে অনুষ্ঠান করার জন্য গড়েরহাটি বা গরাণহাটি কীর্তন নামে সুপরিচিত হয়।

খেতরির মহোৎসবে নরোত্তমের নেতৃত্বে যে বিলম্বিত লয়ের কীর্তন পদাবলী গীত হইয়াছিল, তাহার দুইটি অংশ : অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ। প্রথমটীতে আলপ্তি বা আলাপ, অর্থাৎ কীর্তনের পদ বা কথা বর্জিত শুধু সঙ্গীতস্বরের বিন্যাস। কীর্তনের

সেই আলাপ অংশে ছন্দ ও তাল নাই। কীর্তনের দ্বিতীয় অর্থাৎ নিবদ্ধ অংশে পদ বা কথাবস্তুর সঙ্গে স্বরের মিলন এবং তাহার ভিত্তি স্বরূপ আছে তাল। তাহার স্বরের গঠন বিভিন্ন রাগকে অবলম্বন করে, যদিও কীর্তনের রাগ রূপায়নে কোন কোন ক্ষেত্রে রাগসঙ্গীতের সঙ্গে পার্থক্য দেখা যায়। কীর্তন পদাবলীর মূল পালাগানের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ গীতগোবিন্দের রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের আদর্শ হইতে গৃহীত; যথা—মান, দান, খণ্ডিতা, মাথুর, রাস, নৌকাবিলাস ইত্যাদি।

খেতরির সেই পদাবলী কীর্তনের প্রথম অনুষ্ঠানে অনিবদ্ধ অংশ গান করেন গোকুলানন্দ। তাঁর আলপ্তি বা আলাপ উদারা, মুদারা, তারা এই তিন গ্রামে বিন্যস্ত ছিল। গোকুলানন্দের আলাপের পরে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর অভিনন্দন স্বরূপ নরোত্তম ঠাকুরের কণ্ঠে মাল্যদান করেন। কীর্তন গানের পূর্বে গায়ককে মাল্যদানের প্রথা সেই অবধি প্রচলিত। অতঃপর নরোত্তম কীর্তনের নিবদ্ধ অংশ সুমধুর কণ্ঠে ভক্তিভাবের সঞ্চারে পরিবেশন করেন। পদাবলী কীর্তনের মনোরম আদর্শ সেই অনুষ্ঠান হইতে বাংলাদেশের সঙ্গীতজগতে প্রবর্তিত হয়। সেই কীর্তনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—মূল কৃষ্ণপদ গানের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ গৌরচন্দ্র চৈতন্যদেবের স্তুতি। শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তি ও স্মৃতিকে জাগাইবার মন্ত্রস্বরূপ এই গৌরচন্দ্রিকা আনুষ্ঠানিক পদাবলী কীর্তনের অঙ্গ রূপে প্রথম হইতেই প্রচলিত হয়।

নরোত্তম ঠাকুর এই ভাবে যে পদাবলী কীর্তন গানের প্রবর্তন করেন তাহা গরাণহাটি কীর্তন নামে পরে সুপ্রসিদ্ধ হয়। কালক্রমে চারিটি স্থানের নামানুসারে মনোহরশাহী, রেণেটি, মন্দারিণী ও ঝাড়খণ্ডী রীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদাবলী কীর্তন গান প্রচলিত হয়।

সমগ্রভাবে পদাবলী কীর্তন উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত একটি প্রাণবন্ত সঙ্গীতরীতিরূপে বাংলার সঙ্গীতজগতে প্রচলিত ছিল। পদ্ধতিগত পদাবলী কীর্তন-ধারার পরবর্তী পর্যায়ে সহজ সুরের লৌকিক কীর্তনের রূপ জনসাধারণের মধ্যে চলিত হয়, একথাও উল্লেখযোগ্য।

বাউল সম্প্রদায়ের বিবরণ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে (২৮৫-৬ পৃষ্ঠা)। বাউলেরাও প্রধানতঃ গীতের সাহায্যে তাহাদের ধর্মমত প্রচার করিত—এবং এই সমুদয় গীতের যে একটি বিশিষ্ট সুর ও তাল ছিল কীর্তনের ন্যায় এখন পর্যন্তও তাহা বাংলাদেশের একটি অমূল্য সম্পদ ও অতিশয় জনপ্রিয়। কীর্তন ও বাউল গান এখনও বাংলাদেশের গ্রামে ও ঘাটে পথে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখেও গীত হইয়া থাকে।

পরবর্তীকালে—মধ্যযুগের শেষভাগে ও আধুনিক যুগের প্রারম্ভে—শ্যামা-সঙ্গীত প্রভৃতি ধর্মমূলক গান রামপ্রসাদের ন্যায় সাধকদের কণ্ঠে তাঁহাদেরই প্রবর্তিত অভিনব সুরে গীত হইয়া, বাংলাদেশের সঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছে। বাউল ও এই সকল সাধকের নিজস্ব রীতিতে রচিত গীতে অতি উচ্চশ্রেণীর জীবন-দর্শন ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অতি সরলভাষায় এবং অশিক্ষিত গ্রামবাসীর পক্ষে সহজবোধ্য উপমার সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। সাধকশ্রেণীর স্বকীয় স্বতন্ত্র রীতিতে রচিত গীত ও সুর এবং পদাবলী কীর্তন ও বাউলের গান উনিশ শতক পর্যন্ত তিন চারিশত বৎসর একাধারে আনন্দ দান ও বাঙ্গালীর কৃষ্টি ও ধর্মভাব প্রসারে সহায়তা করিয়াছে।

উনিশ শতকে বাংলাদেশে কিভাবে নানা ক্ষেত্রে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সঙ্গীতেও এই নবজাগরণের পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতা শহরই সর্বভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের নূতন সৃষ্টি ও পুনরুজ্জীবনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। সৃষ্টিশীল বহুসংখ্যক সঙ্গীতজ্ঞ সমবেত হইয়া এই উভয় দিকেই খুব সাফল্য অর্জন করেন। ইহার ফলে রাজনীতির ন্যায় সঙ্গীত ক্ষেত্রেও ভারতীয় ঐক্যবোধের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলার রাগ-সঙ্গীত-সাধনা ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া তাহার ঐশ্বর্যসম্ভার আহরণ ও আত্মস্থ করিয়া পুষ্টিলাভ করে। অপর দিকে ভারতীয় সঙ্গীতের পুনরুজ্জীবন ক্রিয়া বাঙ্গালী মনীষার সৃজনশীলতার সংস্রবে নূতন প্রেরণা লাভ করে। ইহারই ফল স্বরূপ বাংলায় ধ্রুপদ, টপ্পা ও খেয়াল রীতির চর্চা আরম্ভ হয়। বাঙ্গালী শিক্ষার্থীরা বাংলার বাহিরে, বিশেষতঃ উত্তর প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান কলাবতের অধীনে, শিক্ষা লাভ করেন। আবার অভিজাত সম্প্রদায়ের নিমন্ত্রণে বাংলায় সমাগত পশ্চিম দেশীয় গুণীগণের শিক্ষাধীনে বাঙ্গালীরা সঙ্গীত চর্চার সুযোগ গ্রহণ করেন। নিধুবাবু নামে সুপরিচিত রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৮) ও কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (আ—১৭৫০-১৮২০) প্রথমোক্ত উপায়ে এবং রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) এবং রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩) দ্বিতীয় উপায়ে রাগ সঙ্গীতের এক এক অঙ্গের অধ্যায়ে আত্মনিয়োগ করেন। এইভাবে প্রথমোক্ত দুইজন 'টপ্পা', তৃতীয় জন 'খেয়াল' এবং শেষোক্ত জন ধ্রুপদ সাধক রূপে বাংলাদেশে রাগ-সঙ্গীতের এই তিন অঙ্গের পথিকৃৎ হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ পূর্বোক্ত রামনিধি গুপ্ত। ১৭৭৬ হইতে ১৭৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ১৮ বৎসর বিহারের ছাপরায় চাকুরী সূত্রে অবস্থান কালে স্থানীয় কলাবতের শিক্ষাধীনে টপ্পা সঙ্গীতে

অভিজ্ঞ হইয়া কলিকাতায় আসেন এবং নানা সঙ্গীতের আসরে স্বরচিত গান গাহিয়া 'টপ্পা'কে জনপ্রিয় করেন। হিন্দুস্থানী টপ্পার দ্রুত লয় ও প্রায় প্রতি কথায় জম্‌জমা, গিটকিরি অলঙ্কারের আধিক্য না মানিয়া তিনি মধ্য লয় এবং অল্প দোলায়িত তানের সহযোগে অভিনব বাংলা টপ্পা শোনাইয়া শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করিতেন। রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা", "মায়ার খেলা" প্রভৃতি রচনার কাল পর্যন্ত নিধুবাবুর সঙ্গীত বাংলার কাব্য-সঙ্গীত রচনাকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তাঁহার ৯৬ বৎসর বয়সে নিধুবাবু স্বীয় গানের সংকলন পুস্তক 'গীতরত্ন' প্রকাশ করেন। তিনি যে একজন কবিওয়ালা ছিলেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (৬১১ পৃঃ)।

কালী মির্জা নামে সাধারণে পরিচিত কালিদাস চট্টোপাধ্যায় কাশী ও লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণের নিকট দশ বারো বৎসর শিক্ষার পর ১৭৮০-৮১ খ্রীঃ বাংলাদেশে টপ্পাগানের যে ধারা প্রচলিত করেন তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ তাহা প্রসারিত করেন।

বর্ধমানের রাজা তেজচাঁদ তাঁহার দেওয়ান রঘুনাথ রায়কে রাগ সংগীত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দরবারে পশ্চিমা কলাবৎ নিযুক্ত করেন। রঘুনাথ শুধু খেয়াল গানের চর্চা করেন নাই, চারি তুক বা কলি বিশিষ্ট অসংখ্য বাংলা গানও রচনা করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ১৭৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বিষ্ণুপুর রাজসভায় সমাগত পণ্ডিতজী নামক জনৈক হিন্দু শিক্ষাচার্যের নিকট ধ্রুপদ সঙ্গীত চর্চা করেন এবং একদল কৃতী শিষ্য গঠন করিয়া বিষ্ণুপুরে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধ্রুপদ রীতি অনুশীলনের সঙ্গীত সম্প্রদায় গঠন করেন।

আঠারো শতক শেষ হইবার পূর্বেই বাংলাদেশে যে টপ্পা, খেয়াল ও ধ্রুপদের প্রবর্তন হয় উনিশ শতকে অনেক গুণী তাহার চর্চা অব্যাহত রাখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— ধ্রুপদ-গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮০৪-১৯০০), গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (১৮০৮-৭৬), রামদাস গোস্বামী (জন্ম ১৮২০), টপ্পা সাধক মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (জন্ম আ-১৮৩১) এবং সমসাময়িক ; একাধারে ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা সঙ্গীতে গুণী গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ও লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী। ইহাদের মধ্যে বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী কৃষ্ণনগর রাজসভার আনুকূল্যে কয়েকজন মুসলমান কলাবতের নিকট ধ্রুপদ শিক্ষা করিয়া ৫০ বৎসরেরও বেশী নিয়মিত ভাবে ব্রাহ্ম সমাজে গান

করিবার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে পারিবারিক সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া তিনি বালক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার প্রাপ্তবয়স্ক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের সঙ্গীত-শিক্ষা-গুরুর গৌরবময় পদ লাভ করিয়াছিলেন। ৯৬ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন মূল ধ্রুপদ পদ্ধতির সাধক, বাংলাদেশে সেই কেন্দ্রীয় সঙ্গীত ধারার প্রচারক ও বাহক, এবং বাংলায় সঙ্গীত-চর্চার গুরুত্বপূর্ণ পর্বে আচার্য স্থানীয়। তাঁহার কৃতী শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ স্বনামধন্য যদুভট্ট (জন্ম ১৮৪০) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। গঙ্গানারায়ণের ধ্রুপদ সাধনায় ও শিক্ষাদানের ফলে রাগসঙ্গীতের প্রধান রীতির চর্চা প্রস্তুতি পর্ব হইতে কিশোর যুগে উত্তীর্ণ হয় এবং যদুভট্ট সেই পরিণতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

বাংলার সঙ্গীত শিল্পে পূর্বোক্ত ধ্রুপদী রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্য চন্দ্রকোণার ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর (১৮২৩-৯৩) অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' অভিনয় উপলক্ষ্যে (১৮৫৮) তিনি যদুনাথ পালের সহ-যোগিতায় ভারতে প্রথম 'ঐকতান বাদ্য' প্রবর্তন করেন—এবং বাদকদের ব্যবহারের জন্য দণ্ডমাত্রিক প্রণালীতে যে স্বরলিপি রচনা করেন ভারতবর্ষে তাহাই প্রথম স্বরলিপি। ১৮৭২ সনে ইহা "ঐকতানিক স্বরলিপি" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত বিষয়ে তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন—"সঙ্গীত সার" (১৮৬৯), "গীতগোবিন্দের স্বরলিপি" (১৮৭১), "কণ্ঠ কৌমুদী" (১৮৭৫), এবং "আশুরঞ্জনী তত্ত্ব" (১৮৮৫) অর্থাৎ এস্‌রাজ যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষার পুস্তক। বাংলায় সঙ্গীত বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিকা "সঙ্গীত সমালোচনী" (১৮৭২) সম্ভবতঃ তাঁহারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০—১৯১৪) সঙ্গীত বিদ্যায় ক্ষেত্রমোহনকেই গুরুর পদে বরণ করিয়াছিলেন—এবং এই বিদ্যার প্রসারে গুরুর ন্যায় শিষ্যের অবদানও অবিস্মরণীয়। তিনি যে কত বিভিন্ন রকমে বাংলার সঙ্গীত বিদ্যা প্রসারে সহায়তা করিয়াছিলেন তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করা এই গ্রন্থে সম্ভবপর নহে—কেবল মাত্র সংক্ষেপে ইহার উল্লেখ করিব।

সঙ্গীতের ইতিহাস, বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীত ও নানা রীতির আলোচনার জন্য গ্রন্থরচনা; স্বরলিপি প্রচলনের জন্য পুস্তক প্রণয়ন; প্রণালীবদ্ধভাবে সঙ্গীত শিক্ষা-দানের জন্য প্রথম সুপরিকল্পিত বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; ইংরেজীতে পুস্তকাদি রচনা ও প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচার তথা মর্যাদালাভের প্রচেষ্টা; প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রাদির মূল্যবান সংগ্রহ-শালা স্থাপন (শৌরীন্দ্র-

মোহন কর্তৃক বহুব্যয়ে সংগৃহীত যন্ত্রগুলি নিয়াই পরে কলিকাতার সরকারী মিউজিয়মের বাদ্যযন্ত্র বিভাগটি গঠিত হয়) ; কলাবতের শিক্ষাধীনে স্বয়ং সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের বিদ্যালাভের সুযোগ দান ; বহু গুণীর পৃষ্ঠপোষকতা; প্রথম আলোচনা-ভিত্তিক সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনের প্রবর্তনা ; দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা রাগরাগিণীর চিত্রাবলী অঙ্কন ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা ; সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্র গ্রন্থের সংগ্রহ ও পুনর্মুদ্রণের আয়োজন, স্বলিখিত ও স্বপ্রকাশিত গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ ইত্যাদি শৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতজীবনের সংক্ষিপ্ত কর্মপঞ্জী।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এই দুইজনের অক্লান্ত চেষ্টা যে উনিশ শতকে বাংলায় সঙ্গীত বিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা পুনরুজ্জীবনের বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে সমকালীন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি প্রথম জীবনে ক্ষেত্র-মোহনের ছাত্র ছিলেন। সঙ্গীত বিজ্ঞানের নানা শাখায় তাঁহার গভীর ও মৌলিক গবেষণা ভারতীয় সঙ্গীতের মূল্যায়ন ও পুনরুদ্ধারে বিশেষ সহায়ক রূপে গণনীয়। ১৮৮৫-৮৬ খ্রীঃ দুই খণ্ডে প্রকাশিত তাঁহার 'গীতসূত্রসার' উনিশ শতকের তাবৎ ঔপপত্তিক সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা। ১৮৬৮ সালে মুদ্রিত 'সেতার শিক্ষা' পুস্তকটি উক্ত যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষা সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ। তাঁহার রচিত 'বঙ্গৈকতান' পুস্তকে প্রকাশিত (১৮৬৭) স্বরলিপিগুলি ভারতে প্রথম মুদ্রিত স্বরলিপি। কৃষ্ণধনের সেই স্বরলিপি ইউরোপীয় রেখামাত্রা প্রণালী অনুসারে লিপিবদ্ধ হওয়ায় ভারতীয় সঙ্গীতের সেবকসমাজে গৃহীত হয় নাই ; কিন্তু স্বাধীন চিন্তামূলক গবেষণারূপে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। সমগ্রভাবে সেকালের তাত্ত্বিক আলোচনা ভারতীয় সঙ্গীতকে শিক্ষিত সমাজে যে অধিকতর আদরণীয় করিয়াছিল, কৃষ্ণধনের গবেষণা তাহার অন্যতম বিশিষ্ট কারণ। তিনি সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় ক্রিয়াসিদ্ধ চর্চাও করিয়াছিলেন।

সঙ্গীতের আলোচনার উপসংহারে সঙ্গীতের সহায়ক বাদ্য যন্ত্র সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন।

প্রাচীন কাল হইতেই বাংলাদেশে নানা প্রকার বাদ্যের প্রচলন থাকায় যন্ত্র-সঙ্গীতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে বাদ্য যন্ত্রগুলিকে চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) তত = তন্ত্র জাতীয় অর্থাৎ তন্ত্র বা তাঁত বা তার সহযোগে যে সব বাদ্য বাদিত হয়। (২) শুষির = বায়ুর সাহায্যে যে সব যন্ত্র

বাদিত হয়। (৩) আনদ্ধ বা বিতত = চর্মবাদ্য। (৪) ঘন = ধাতু নির্মিত যন্ত্র।

বাংলায় উক্ত চারি প্রকার বাদ্য যন্ত্রের বহুল ব্যবহার ছিল। তন্ত্র জাতীয় বাদ্য রূপে বিভিন্ন বীণা যন্ত্রের প্রচলন ছিল। শুষির জাতীয় বাদ্যের মধ্যে বাঁশীই প্রধান ছিল। আনদ্ধ বা চর্মবাদ্য শ্রেণীতে ছিল মুরজ, মৃদঙ্গ, মর্দল, দুন্দুভি ইত্যাদি। ঘন বা ধাতুতে গঠিত বাদ্যের মধ্যে মন্দিরা, করতাল, কাঁসর ইত্যাদি যন্ত্রের প্রচলন ছিল।

উনিশ শতকে পাখোয়াজ ও সেতার বাদ্যে কয়েকজন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উত্তর প্রদেশের ভারত বিখ্যাত পাখোয়াজ গুণী লালা কেবলকিষণের শিষ্য শ্রীরাম চক্রবর্তী বাংলার সর্ববৃহৎ পাখোয়াজ বাদক গোষ্ঠীর আদি গুরু ছিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য প্রশিষ্যেরা এই বিদ্যায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

আঠারো শতকে আখড়াই গানের অনুষ্ঠানে ঐকতান বাদনের অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে সেতারেরও চলন ছিল। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে একক বাদ্যযন্ত্ররূপে সেতারের চর্চা ঢাকা, বিষ্ণুপুর ও কলিকাতায় স্বতন্ত্রভাবে প্রচলিত হয়। ঢাকায় ইহার পথিকৃৎ ছিলেন হরিচরণ দাস। বিংশ শতাব্দীতে ঢাকার প্রখ্যাতনামা সেতার বাদক ভগবান দাস তাঁহারই প্রপৌত্র। বিষ্ণুপুরের সেতার বাদনে অগ্রণী ছিলেন পূর্বোক্ত যদুভট্টের পিতা মধুসূদন দত্ত। ধনকুবের রামদুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সাতুবাবু নামে সুপরিচিত আশুতোষ দেব (১৮০৫-৫৬) কলিকাতায় একক সেতার বাদনের প্রথম যুগে খুব খ্যাতি লাভ করেন। পশ্চিমাঞ্চলের এক বিখ্যাত সেতার বাদক রেজা খাঁকে দীর্ঘকাল নিজের সঙ্গীত সভায় নিযুক্ত রাখিয়া তিনি রীতিমত ভাবে সেতার বাদন শিক্ষা করেন।

পরবর্তী কালে সেতার, বীণা ও মৃদঙ্গ বাদনে বাংলাদেশে অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীত ও বাদ্য বিষয়ে অনেকে বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ বাবাজীর নাম করা যাইতে পারে (জন্ম আনুমানিক ১৮৩০ খ্রীঃ)। তিনি একাধারে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি গায়ক এবং বীণা পাখোয়াজ ও তবলা প্রভৃতি যন্ত্রবাদক রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।[১৪]

পাদটীকা

১। এই অনুচ্ছেদটি প্রধানতঃ শ্রীঅমল মিত্র প্রণীত "কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয়" (প্রকাশ ভবন, ১৩৭৪) গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। বিস্তৃত বিবরণের জন্য এই গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' (সং সে ক) দ্বিতীয় সংস্করণ, ৬৯১ পৃঃ।

৩। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত "বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস" (নাট্য সাহিত্য) প্রথম খণ্ড, ৫৮৫ পৃঃ।

৪। সং সে ক, দ্বিতীয় খণ্ড, ২০৪ পৃঃ।

৫। ঐ ২০৫ পৃঃ।

৬। ঐ ২০৬ পৃঃ।

৭। ঐ

৮। ঐ (দ্বিতীয় সং ৬৯১ পৃঃ)

৯। 'নাট্য সাহিত্য'—১।৫৯৩

১০। এই রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা কাল হইতে গণনা করিয়া আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৯৭২ সনে 'বঙ্গীয় নাট্যশালা'র শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। ১৯২২ সনে ইহার 'স্বর্ণ জয়ন্তী' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১১। লোকগীতি সম্বন্ধে নিম্নে লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১২। এই অনুচ্ছেদটি প্রধানতঃ শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায় লিখিত একটি প্রবন্ধের সারমর্ম।

১৩। বাংলা দেশের ইতিহাস—প্রাচীন যুগ (পঞ্চম সং ১৪৭-১৫১ পৃঃ)।

১৪। এই অনুচ্ছেদটি প্রধানতঃ শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীত' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধের অনেক অংশ স্থানাভাবে এই অনুচ্ছেদে ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় নাই এবং বাংলাদেশে প্রাচীন যুগের সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁহার মত সর্বত্র গৃহীত হয় নাই। আধুনিক যুগের সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা ও মতামতের দায়িত্ব প্রধানতঃ তাঁহারই।

১। গ্রন্থ

১। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—কবিজীবনী। শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৫৮।

২। দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৮ম সংস্করণ, ১৩৫৬।

৩। মদনমোহন গোস্বামী—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র। কলিকাতা, ১৯৫৫।

৪। নিরঞ্জন চক্রবর্তী—ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা ১৯৫৮।

৫। S. K. De, *Bengali Literature in the Nineteenth Century.*
(কবিগানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে উল্লিখিত ৪নং গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

২। প্রবন্ধ

১। গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী—ভোলা ময়রা, ভারতী, ১৩০৪, বৈশাখ

২। পূর্ণচন্দ্র দে—ভোলা ময়রা, মাসিক বসুমতী, কার্তিক, মাঘ, ১৩৬৬।
এতদ্ব্যতীত Rev. J. Long প্রণীত *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* গ্রন্থে অনেক আদিরসাশ্রিত গান ও বইয়ের উল্লেখ আছে

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিল্প

১। মন্দির

এই গ্রন্থে যে যুগের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে সে যুগে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। প্রতি যুগেই রাজা, অভিজাত সম্প্রদায় এবং ধনশালী গুণী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা শিল্পকে সঞ্জীবিত করে। অবশ্য ব্যক্তিগত প্রতিভাও অনেক সময় শিল্পের নূতন রীতির উদ্ভাবন ও অন্যান্য প্রকারে শিল্পের উন্নতি সাধন করে। কিন্তু মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য—সুতরাং পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ বিষয়ে শিল্পপ্রতিভার স্ফুরণ সম্ভব হয় না। এই কারণেই হিন্দু যুগে মন্দির ও দেবমূর্তি এবং মুসলমান যুগে মসজিদ, সমাধি-ভবন ও রাজপ্রাসাদ প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। যে কারণে মুসলমান যুগে হিন্দু শিল্পের বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না, কিন্তু মুসলমান শিল্পের অনেক অনবদ্য সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল, অনেকটা সেই কারণেই—অর্থাৎ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবেই—আলোচ্য যুগে হিন্দু বা মুসলমান কোন শিল্পেরই তাদৃশ উন্নতি সম্ভবপর হয় নাই। মুসলমান নবাবদের ও আমীর ওমরাহদের ন্যায় যদি ইংরেজ রাজা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা ধনী ব্যবসায়ীরা স্থায়িভাবে বাংলা দেশে বসবাস করিতেন তাহা হইলে হয়ত এক নূতন আধুনিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইত। ইংরেজরা এ দেশে রাজ্যশাসন করিতেন মাত্র—কিন্তু ইহা তাহাদের দেশ নহে, পান্থশালার ন্যায় ক্ষণিক বাসস্থান মাত্র ছিল। সুতরাং মুসলমান যুগের ন্যায় নূতন কোন রীতির উদ্ভব হইয়া শিল্প-সম্পদ বৃদ্ধি পায় নাই। ফলে বাংলা দেশে আলোচ্য যুগে স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বা সেণ্ট পল গীর্জা ব্যতীত আর কিছু বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। ভাস্কর্যের বহু সুন্দর নিদর্শন—ইংরেজ শাসনকর্তাদের সুন্দর সুন্দর প্রস্তর মূর্তি—কয়েক বৎসর পূর্বেও কলিকাতার রেড রোডের শোভা বৃদ্ধি করিত; এখন তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু এগুলি বিলাতে নির্মিত—সুতরাং বাংলার শিল্প বলিয়া গণ্য করা যায় না। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালও বিদেশী শিল্পীর কীর্তি এবং আলোচ্য যুগের কিছু পরবর্তীকালে ইহার নির্মাণ-কার্য শেষ হয়।

কিন্তু নূতন শিল্পের গৌরব না থাকিলেও, মধ্যযুগের শিল্পধারা একেবারে

বিলুপ্ত হয় নাই। কারণ ইংরেজ আমলেও পূর্বোক্ত পৃষ্ঠপোষকতার সম্পূর্ণ অভাব হয় নাই। জমিদার ও ধনী ব্যবসায়ীর আনুকূল্যে এ যুগেও বহু সংখ্যক মন্দির ও মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে বাঙ্গালী মুসলমানেরা ধন, ঐশ্বর্য, ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে হিন্দুদের তুলনায় অনেক পরিমাণে অনুন্নত ছিল। এবং হিন্দু শিল্পীদের ন্যায় মুসলমান শিল্পীদের উপর ইংরেজ সংস্কৃতি বা শিল্পের প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। এইজন্য মুসলমান শিল্পের বিশেষ কোন উন্নতি বা পরিবর্তন হয় নাই। সুতরাং নূতন মসজিদের সংখ্যা বা শিল্পকলা সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিস্তৃত বিবরণের প্রয়োজন নাই। প্রধানতঃ হিন্দুর শিল্প সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করিব।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মধ্যযুগের মন্দিরের যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে আধুনিক যুগে তাহার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই যুগে রেখমন্দির নির্মিত হইয়াছিল কিনা নিশ্চিত বলা যায় না—তবে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। অপরদিকে নূতন এক শ্রেণীর মন্দির ক্রমশঃই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে সাধারণতঃ দালান মন্দির বলা হয়। এই শ্রেণীর মন্দিরের বৈশিষ্ট্য—সমতল ছাদযুক্ত একটি মাত্র কক্ষ ও সম্মুখে খিলানযুক্ত বারান্দা। বৃহৎ কক্ষটির ছাদের জন্য কড়ি বরগার ব্যবহার করিতে হয়—এবং আলোচ্য যুগের পূর্বে ইহার খুব বেশী প্রচলন ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ৪৬৬-৭) বর্ণিত মধ্যযুগে প্রচলিত কুটির দেউল—দোচালা, জোড়বাংলা, চৌচালা, ডবল চৌচালা ও বিভিন্ন শ্রেণীর রত্নমন্দির—এ যুগেও খুব প্রচলিত ছিল, এবং বর্তমান কালে বাংলাদেশের মন্দিরের অধিকাংশই এই সমুদয় শ্রেণীভুক্ত। ইহার মধ্যেও আবার ডবল চৌচালা মন্দিরের সংখ্যাই বেশী। কলিকাতা শহরের নানা স্থানে এই শ্রেণীর বহু মন্দির এখনও দেখিতে পাওয়া যায়—কালীঘাটের প্রসিদ্ধ মন্দির এবং দক্ষিণেশ্বরের শিব মন্দিরগুলি সকলই এই শ্রেণীভুক্ত। অন্য শ্রেণীর মধ্যে রত্ন-মন্দিরের সংখ্যা কম হইলেও একেবারে নগণ্য নহে। ওয়ার্ড সাহেব (Ward) উনিশ শতকের প্রথম ভাগে লিখিয়াছেন যে জোড়-বাংলা মন্দির এখন কদাচিৎ দেখা যায়।[১]

আধুনিক যুগের কুটির দেউলগুলিতে সাধারণতঃ বিশেষ কোন ভাস্কর্যের অলঙ্কার দেখা যায় না, তবে অনেকগুলি মন্দিরে 'টেরাকোটা' বা পোড়ামাটির অলঙ্করণ আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কতগুলি বা কোন্‌টি ১৭৬৫ সনের পরে নির্মিত তাহা বলা কঠিন। তবে সাধারণতঃ মধ্যযুগে অনাবৃত 'টেরাকোটা' অলঙ্করণের প্রচলন ছিল,

কিন্তু ১৭৬৫ সনের পরে শিল্পীর দক্ষতার হ্রাস, পৃষ্ঠপোষকদের উৎসাহের অভাব প্রভৃতি নানা কারণে 'টেরাকোটা' শিল্পের ক্রমশঃ অবনতি ঘটে এবং ইহার স্থানে অধিকতর সহজ প্রক্রিয়ার পঙ্কের অলঙ্করণ প্রচলিত হয়। দালান মন্দিরেই ইহা বেশী পরিমাণে দেখা যায়।

দালান মন্দিরের সমতল ছাদে যেমন আধুনিকতার স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়—ইহার সজ্জায়ও তেমনি ইউরোপীয় প্রভাব দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আয়োনিক' (Ionic) স্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষে বিজাতীয় অলঙ্করণ বা 'ফ্যানলাইট' (Fan-light), দেওয়ালে 'ভিনিশীয়' (Venetian) দরজা ও অর্ধ-উন্মুক্ত দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষমানা যুবতী নারীমূর্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে এইরূপ বিদেশীয় প্রভাব খুব কম মন্দিরেই দেখা যায়। এস্থলে বলা আবশ্যক যে মধ্যযুগেও হিন্দু মন্দিরে, গম্বুজ, খিলান প্রভৃতি অনুরূপ মুসলমান স্থাপত্যরীতির অনুকরণ বা প্রভাব দেখা যায়।

মধ্যযুগের ন্যায় এযুগেও ইটের মন্দিরে পোড়ামাটির অলঙ্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে—অনেক স্থলে পঙ্কের সজ্জা এককভাবে অথবা পোড়ামাটির (কদাচিৎ পাথরের) অলঙ্করণের আবরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে মধ্যযুগে ইটের মন্দিরে ফুলকারি বা জ্যামিতিক নকশার যেরূপ বহুল প্রচলন ছিল এ যুগে তাহা একেবারে পরিত্যক্ত না হইলেও অনেক কমিয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একই মন্দির গাত্রে কৃষ্ণলীলা, পৌরাণিক ও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীই অলঙ্করণের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক কোন কোন মন্দিরে বাস্তব জীবন এবং সামাজিক দৃশ্যও খোদিত হইয়াছে। পুরনারীদের প্রসাধন, কন্যা সম্প্রদান, গ্রাম্য জীবনের অনেক দৃশ্য, শিকার কাহিনী প্রভৃতি পূর্বকালের বিষয়বস্তুর সহিত ইউরোপীয় প্রভাবের চিহ্নস্বরূপ ফিরিঙ্গী ও ইঙ্গবঙ্গ সমাজের চিত্র ও তদনুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি পারিপার্শ্বিকও প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ধমান জিলার মৌখিরা, মেদিনীপুর জিলার কানাসোল ও বীরভূম জিলার হেতম-পুরের মন্দিরগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের গাত্রে সাহেব মেমদের মূর্তি যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

আলোচ্য আধুনিক যুগের মন্দিরের অলঙ্করণে আর একটি বৈশিষ্ট্য—'মিথুন-ভাস্কর্য।' ইহা সম্ভবতঃ উড়িষ্যার মন্দিরগুলির প্রভাব সূচিত করে। কারণ মেদিনীপুর ও হুগলী জিলার পশ্চিম অংশে, অর্থাৎ উড়িষ্যার পরিমণ্ডলের নিকটেই ইহার আধিক্য দেখা যায়—দূরবর্তী জিলাগুলিতে ইহা অপেক্ষাকৃত কম। তবে উড়িষ্যার মন্দিরগুলিতে ইহার যে পরিমাণ বাহুল্য, বাংলার দালান মন্দিরে

কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। এই অলঙ্করণের অভিনবত্ব ও আধুনিকত্ব উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী সমাজের রুচি পরিবর্তন সূচিত করে। কারণ ঠিক এই সময়কার কবি তর্জা প্রভৃতি লোক-সঙ্গীতেও যে অশ্লীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।[২]

আলোচ্য যুগের মন্দিরের আর একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মন্দিরগুলিতে অনেক সময় মন্দির প্রতিষ্ঠাতার নাম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু স্থপতি ও ভাস্করদের নাম কদাচিৎ দেখা যায়। আধুনিক মন্দিরের অনেক-গুলিতে, 'সূত্রধর' ও 'রাজ' বা 'মিস্ত্রী' প্রভৃতির নাম, পদবী (পাল, শীল, চন্দ্র, দত্ত, কুণ্ডু, দে, মাইতি, রক্ষিত) এবং বাসস্থান অর্থাৎ সাকিন বা গ্রামের নাম পাওয়া যায়। মেদিনীপুর জিলার মাংলোই গ্রামের রাসমঞ্চে খ্রীষ্টাব্দ, বাংলা সন ও শকাব্দযুক্ত লিপি এবং নদীয়া জিলার শিবনিবাস গ্রামের প্রতিষ্ঠালিপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রামের নামগুলি বিশ্লেষণ করিলে মনে হয় যে পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জিলার চেতুয়া-দাসপুর, হাওড়া জিলার থলিয়া-রসপুর, হুগলী জিলার থানাকুল-কৃষ্ণনগর, রাজহাটি, সেনহাটি, বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, বালসি, এবং বর্ধমান জিলার গুসকরা ও কেতুগ্রাম প্রভৃতি স্থানে স্থপতি ও ভাস্কর সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। অবশ্য তাহারা বঙ্গদেশের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত ও ফরমাশ অনুসারে বিভিন্ন রকমের ছোট বড় মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ ও ভাস্কর্যের সাজসজ্জা করিত। মনে হয় শিল্পীরা বিলাতী গিল্ডের (guild) অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। গ্রাম্যভাষায় ইহার নাম ছিল 'থাক'—যেমন 'বিরাশি' থাক, 'চুরাশি' থাক ইত্যাদি। মন্দিরনির্মাতা শিল্পী-গোষ্ঠী লোপ পাইলেও এই 'থাক' বা শ্রেণী বিভাগ এখনও কুম্ভকার প্রভৃতি মৃৎশিল্পীদের মধ্যে কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে।

মোটের উপর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পর স্থাপত্যে নূতন কোন রীতির উদ্ভব না হইলেও, কোন কোন মন্দিরে যে অভিনবত্ব দেখা যায় তাহা সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত বিভিন্ন শিল্পী-গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুর্শিদাবাদ জিলার বড়নগরে ও রাজশাহী জিলার নাটোরে নিম্নমুখী পদ্ম আকৃতির ছাদ-যুক্ত দুইটি মন্দির এবং নদীয়া জিলার শিবনিবাস ও কুমিল্লা শহরের দুইটি বৃহৎ অষ্টকোণ মন্দিরের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই যুগে নির্মিত মন্দিরগুলির মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

(ক) মুসলমান সৌধ

১। মুর্শিদাবাদে নবাব মীরজাফরের পত্নী মণি বেগম নির্মিত মসজিদ (১৭৬৭ সন)।

২। মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা একটি বৃহৎ ইমামবরা নির্মাণ করিয়াছিলেন। সীয়র-উল মুতাক্ষরীণ ও রিয়াজ-উস-সুলতান গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে। ১৮৪০ সনে ইহা অগ্নিদগ্ধ হয়—পরে ইহার স্থানে ১৮৪৭ সনে যে ইমামবরাটি নির্মিত হয় তাহা এখনও বর্তমান আছে। বাংলাদেশে ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ইমামবরা। ইহার সম্মুখ ভাগ ৬৮০ ফুট লম্বা—ইহার মধ্যে তিনটি মহল এবং প্রতি মহলে চতুষ্কোণ একটি বৃহৎ প্রাঙ্গন আছে।

(খ) হিন্দু মন্দির

১। মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে বডনগরে রাণী ভবানী (মৃত্যু-১৭৯৫) ও তাঁহার কন্যা অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করেন (কিরীটেশ্বরী—, ভুবনেশ্বরী—, রাজ-রাজেশ্বরী—, ও গোপাল-মন্দির)। ইহার মধ্যে ১৭৬০ সনে নির্মিত চারিটি দোচালা মন্দিরে পোড়ামাটির অলঙ্করণ আছে। কিরীটেশ্বরীর মন্দির ১৭৬৫ সনে নির্মিত হয়।

২। বাঁকুড়া[৩]

বিষ্ণুপুরের শ্রীধর মন্দির নামে পরিচিত নবরত্ন মন্দিরটি সম্ভবতঃ আঠারো শতকের শেষে অথবা উনিশ শতকের প্রথমে নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটিতে পোড়ামাটির ভাস্কর্য উৎকীর্ণ আছে। এই অলঙ্করণগুলি সংখ্যায় বেশী নহে—কিন্তু ইহার মধ্যে, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও পৌরাণিক চিত্র প্রভৃতি ছাড়াও সঙ্গিন-বন্দুকধারী গোরা সৈন্যের মূর্তি দেখা যায়।

বাঁকুড়া জিলায় সোনামুখীর শ্রীধর রত্ন-মন্দিরটি নানা কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, মন্দির গাত্রে (পশ্চাৎ দিকের দেওয়ালে) উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে এই মন্দিরটি রাধাকৃষ্ণের উপাসনার জন্য ১৭৬৭ শকাব্দ, ১২৫২ বঙ্গাব্দে (অর্থাৎ ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে) কানাক্রি রুদ্রদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং হরি নামক সূত্রধর কর্তৃক নির্মিত। এরূপ বিস্তৃত ও সঠিক বিবরণ অন্য কোন মন্দিরে পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, এটি পঞ্চবিংশতি-চূড় রত্নমন্দির। এই শ্রেণীর মন্দির সাধারণতঃ ত্রিতল হয়—এবং শীর্ষের কেন্দ্রীয় চূড়াটি ছাড়া প্রথম তলের উপর প্রতি কোণে তিনটি, দ্বিতীয় তলের প্রতি কোণে দুইটি এবং তৃতীয় তলের প্রতি কোণে একটি শিখর থাকে। সোনামুখীর মন্দিরটি দ্বিতল এবং প্রতি তলের প্রতি কোণে তিনটি করিয়া চূড়া আছে।

তৃতীয়তঃ, এই মন্দিরের পোড়ামাটির ভাস্কর্য খুবই উচ্চশ্রেণীর অলঙ্করণ।

এই সমুদয় কারণে উনিশ শতকের বাংলার শিল্পের ইতিহাসে সোনামুখীর মন্দির একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

বাঁকুড়া শহরের আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান বলিয়া খ্যাত ছাতনা গ্রামে বাসলি দেবীর তিনটি পঞ্চরত্ন মন্দিরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন দুইটি মন্দির পর পর ধ্বংস হওয়ায় প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ইষ্টক নির্মিত যে পঞ্চরত্ন মন্দিরটিতে বাসলি দেবী এখন রক্ষিত ও পূজিত হইতেছেন তাহাতেও কয়েক সারি 'টেরাকোটা' ভাস্কর্য নিবদ্ধ আছে। এগুলি শিল্প হিসাবে খুব উচ্চদরের না হইলেও, শতবর্ষ পূর্বেও যে অধুনা-লুপ্ত এই শ্রেণীর অলঙ্করণ বিদ্যমান ছিল তাহা প্রমাণিত হয়।

আধুনিক যুগের মন্দিরের পরিণতি হয় সমতল ছাদের এক-কুঠরি দালানে। বাঁকুড়া জিলায় ও অন্যান্য স্থানে সর্বপ্রকার বিশেষত্ববর্জিত এই সমুদয় মন্দির প্রমাণিত করে যে এই যুগে প্রাচীন ধর্মভাব থাকিলেও প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের শিল্পকলা প্রায় লোপ পাইয়াছে।

৩। চব্বিশ পরগণা[৪]

চব্বিশ পরগণায় আঠারো শতকের শেষভাগে নির্মিত কয়েকটি মন্দির আছে। ১৭৬৯ খ্রীঃ নির্মিত আমতলার নিকটে গোবিন্দপুর গ্রামের শিব মন্দিরটির আচ্ছাদনের ঠিক নীচেই পোড়ামাটির অলঙ্কৃত ফলক আছে। পদ্মাসনে উপবিষ্ট গণেশ, এ দেশীয় সৈনিক, দ্রুতবেগে পলায়মান মৃগের পশ্চাতে ধাবমান শিকারী, ময়ূর পৃষ্ঠে আসীনা ধনুর্বাণধারিণী রমণী প্রভৃতির যে সমুদয় মূর্তি ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ আছে তাহা শিল্প হিসাবে প্রশংসার যোগ্য।

নিকটবর্তী বাওয়ালী গ্রামে আট দশটি এবং বাখড়া গ্রামে একটি মন্দির আছে। ইহার মধ্যে ১৭৭১ সনে নির্মিত ডবল চৌচালা রাধাকান্ত মন্দিরটিতে এখনও কয়েকটি অলঙ্কৃত ফলক আছে। ইহাতে চণ্ডী, তাঁহার উপাসক দুই

সন্ন্যাসী ও শিবপূজারত তিনটি সন্ন্যাসীর মূর্তি খোদিত আছে। তবে ইহাদের শিল্প খুবই সাধারণ শ্রেণীর ও বিশেষত্ববর্জিত। ১৭৯৪ খ্রীঃ নির্মিত বাওয়ালীর একটি নবরত্ন মন্দিরও উল্লেখযোগ্য।

১৭৮৮ খ্রীঃ নির্মিত রাজারামপুরের একটি মন্দিরেও নানারূপ পোড়ামাটির অলঙ্কার আছে। রাম, রাবণ, বানর ভক্ষণে রত কুম্ভকর্ণ ও দেবকী প্রভৃতির সহিত কয়েকটি বাস্তব চিত্রও খোদিত আছে যথা—(১) অগ্নিকুণ্ডের দুই পাশে দুই বৃদ্ধ; (২) প্রসাধনে নিযুক্তা কয়েকটি রমণী ; (৩) ক্রয় বিক্রয়ের দৃশ্য, ইত্যাদি।

কামারপোল গ্রামে কয়েকটি ডবল চৌচালা মন্দির আছে। ঘনশ্যাম মন্দিরটির তারিখ ১২০৬ বঙ্গাব্দ। নিকটবর্তী বৃহত্তর রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটি সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন।

জয়নগরের নিকট ১৮০৫ খ্রীঃ নির্মিত একটি ডবল চৌচালা মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে ইহার অলঙ্করণের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ পদ্ম, পদ্মকোরক ও পদ্মপত্র। আচ্ছাদনের নীচে ক্ষুদ্র নরমুণ্ডও আছে।

দক্ষিণেশ্বরে ১৮৫৫ খ্রীঃ নির্মিত রাণী রাসমণির বৃহৎ নবরত্ন কালী মন্দির এবং বারাকপুরের তালপুকুর পল্লীতে উনিশ শতকের শেষভাগে তাঁহার কন্যার প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ নবরত্ন অন্নপূর্ণার মন্দিরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪। অন্যান্য জিলা

অন্যান্য জিলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দিরের তালিকা দিতেছি।[৫]

খুলনা জিলার সোনাবাড়িয়ার 'টেরাকোটা' অলঙ্কৃত, নবরত্ন শ্যামসুন্দর মন্দির (১৭৬৭ খ্রীঃ) ['যশোহর-খুলনার ইতিহাস' : পৃঃ ৮৬২]

পাবনা জিলার হাতিকুমরুলের পরিত্যক্ত নবরত্ন মন্দির (১৮ শতকের প্রথমার্ধ) ['পাবনা জিলার ইতিহাস']

নদীয়া জিলার শিবনিবাসে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত অতি বৃহৎ শিবমন্দির [১৭৬২ খ্রীঃ]

বর্ধমান জিলার গোহোগ্রামে 'টেরাকোটা'-সজ্জিত কুটির-দেউল (১৮৭১ খ্রীঃ)। ঐ জিলার কালনায় 'টেরাকোটা'-সজ্জিত দুইটি বিশাল পঞ্চবিংশতি-চূড় রত্নমন্দির (১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে) ও 'টেরাকোটা'-সজ্জিত প্রতাপেশ্বর শিবের কুটির-মন্দির (১৮৪৯ খ্রীঃ)। ঐ জিলার দেবীপুরে 'টেরাকোটা'-সজ্জিত লক্ষ্মীজনার্দনের কুটির-মন্দির (১৮৪৪ খ্রীঃ)।

বীরভূম জিলার সুরুলে 'টেরাকোটা'-সজ্জিত ডবল চৌচালা মন্দির (১৮৩১ খ্রীঃ)। ও ডাবুকে বিশাল চারচালা মন্দির (১৮৮০ খ্রীঃ)।

হুগলী জিলার বাঁশবেড়িয়ায় বহুরত্ন হংসেশ্বরী মন্দির (১৮১৪ খ্রীঃ) ও আঁটপুরে 'টেরাকোটা'-সজ্জিত ডবল চৌচালা মন্দির (১৭৮৬ খ্রীঃ)।

হাওড়া জিলার মাকড়দহে মাকড়চণ্ডীর বৃহৎ ডবল চৌচালা মন্দির (১৮২১ খ্রীঃ)।

মেদিনীপুর জিলার ধামতোড়ে 'টেরাকোটা'-সজ্জিত রত্নমন্দির (১৯৩১ খ্রীঃ)। (ইহার অপেক্ষা অর্বাচীন 'টেরাকোটা'-মন্দির সম্ভবতঃ আর নাই)।

পূর্বে যে 'টেরাকোটা' অলঙ্করণের পরিবর্তে ক্রমশঃ পঙ্কের কাজ অর্থাৎ মিহি চুনের পলস্তারায় ঢাকা এক ভিন্ন জাতীয় অলঙ্করণের প্রচলনের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার নিদর্শন স্বরূপ বাঁকুড়া জিলার পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের কয়েকটি ইটের মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এই সমুদয় মন্দিরে এই দুই শ্রেণীর অলঙ্করণের যুগপৎ প্রয়োগ, প্রথমটির বিদায় ও দ্বিতীয়টির আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ইংরেজের সংস্পর্শে মন্দির অলঙ্করণে ইংরেজী প্রভাব কিছু দেখা যায় ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মন্দির ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর স্থাপত্যে এই প্রভাব আরও বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। ইহার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন সমসাময়িক ইংলণ্ডের অনুকরণে প্রাচীন গ্রীক ও মধ্যযুগের গথিক স্থাপত্যশৈলী অনুসারে নির্মিত ধনীর বাসগৃহ ও প্রমোদভবন। একজন ইউরোপীয় লেখক মন্তব্য করিয়াছেন যে এই সমুদয় 'পাশ্চাত্য স্থাপত্যশৈলী অনুসারে নির্মিত বিরাট হর্ম্যগুলি দেখিলে কলিকাতা শহরকে সেন্ট পিটার্সবার্গ বলিয়া ভুল করা অসম্ভব নহে।'[৬] মূল মন্দিরে না হইলেও কোন কোন স্থলে ইহার সংলগ্ন দুর্গা-মণ্ডপে গ্রীক দেশীয় (Ionic) পদ্ধতির অনুকরণে নির্মিত স্তম্ভ ব্যবহার করা হইয়াছে। সে যুগের অনেক ধনীর প্রাসাদেও এইরূপ স্তম্ভ থাকায় ইহা ইউরোপীয় বাসভবন বলিয়া ভ্রম করার সম্ভাবনা ছিল। জাতীয় শিল্পের কতদূর অবনতি হইয়াছিল ইহা তাহার একটি চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

২। চিত্রশিল্প

মুঘলযুগে ভারতে যে নূতন চিত্রশিল্পের সূত্রপাত হয় তাহার প্রভাবে রাজস্থান, কাংড়া প্রভৃতি বহু অঞ্চলে নূতন নূতন রীতির চিত্রকলার প্রবর্তন হইয়াছিল।

কিন্তু বঙ্গদেশে এই শ্রেণীর কোন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পের উদ্ভব হয় নাই। আঠারো ও উনিশ শতকে এদেশে সাধারণতঃ পটচিত্রই চিত্রকলার প্রধান নিদর্শন ছিল। পট শব্দের অর্থ কাপড়—প্রাচীনকালে কাপড়ের উপর চিত্র আঁকা হইত—সুতরাং এইরূপ চিত্রিত কাপড়কেও পট বলা হইত। যাহারা এইরূপ চিত্র আঁকিত তাহাদের নাম ছিল পটুয়া। যদিও আধুনিক যুগে কাপড়ের পরিবর্তে কাগজের উপরই এই শ্রেণীর চিত্র অঙ্কিত হয়, তথাপি প্রাচীন সংজ্ঞার অনুকরণে ইহাও পট নামেই পরিচিত। এই পটগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) ছোট চৌকা পট—ইহাতে একখানি মাত্র ছবি থাকে। (২) পর পর অনেকগুলি চিত্রযুক্ত দীর্ঘ পট—ইহাদিগকে 'দীঘল পট' বা জড়ানো পট বলা হয়। বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে পটুয়াগণ সুদীর্ঘ কাগজে অঙ্কিত পর পর অনেকগুলি ছবির সাহায্যে একটি কাহিনী বিবৃত করিয়া গ্রামে গ্রামে এই ছবিগুলি দেখায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কাহিনী সুরসংযোগে আবৃত্তি করে। এইরূপ কাগজের পট কখনও কখনও ৩০।৪০ ফুট দীর্ঘ হয়। ইহার দুই প্রান্তে দুইটি বংশদণ্ড লাগানো থাকে এবং তাহার সাহায্যে ইহা গোল করিয়া জড়াইয়া রাখা হয়। দর্শকের সম্মুখে ইহা একটু একটু করিয়া খোলা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর ঐ অংশ সুরসহ বিবৃত করা হয়।

এই শ্রেণীর চিত্রের মধ্যে আঠারো ও উনিশ শতকে অঙ্কিত কলিকাতার শহরতলী কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কিত চিত্র-পটগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ এবং এখনও সুপরিচিত। কারণ ইহাদের সম্বন্ধে অনেক শিল্পী আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহার বহু নিদর্শনও নানা গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে।[৭] গুরুসদয় দত্ত লিখিয়াছেন: "বাংলার এই পল্লীবাসী পটুয়াশ্রেণীর চিত্র-শিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়।"[৮] ইহার রীতি, প্রকৃতি, ও শিল্প হিসাবে মূল্য সম্বন্ধে তিনি যে বিস্তৃত মন্তব্য করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"বাংলার এই নিজস্ব চিত্রপদ্ধতি বিশ্বমানবের আদিম যুগের সরল ভাব, পৌরুষের ভাব, অকৃত্রিমতার ভাব এবং সজীবতা, সরসতা ও তেজস্বিতার ভাব হারায় নাই। ইহা কেবল রেখার সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও ভাব-ব্যঞ্জক প্রয়োগ এবং অল্প কয়েকটি প্রাথমিক বর্ণের অমিশ্র ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। পরিপ্রেক্ষিতের মাপকাঠির খুঁটিনাটি ও আলোছায়ার লীলাখেলার চতুরতা ও বাহুল্য মিশাইয়া ইহা কখনও আপনার ব্যাকরণকে অযথা জটিল করিয়া তুলিবার প্রয়াস করে নাই। ইহার আকার-বিন্যাস এবং

বর্ণসমাবেশ ও সমন্বয় অতিশোভন ও অনিন্দ্যসুন্দর।...ইহাতে অঙ্কিত মনুষ্যগণের আকৃতি ও হাবভাব সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিমতা ও মুদ্রাদোষবিহীন এবং সাধারণ মানুষের সহজ ও জীবন্ত ভাবে পরিপূর্ণ। ইহার একটি চিত্রেও কোনও রকম ভাবের অপরিস্ফুটতা অথবা ধোঁয়াটে ধরণ নাই। সর্বোপরি বাংলার পল্লী-গ্রামের সরল প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষগণের চরিত্রের একটি অনির্বচনীয় ও অতুলনীয় নিজস্ব মাধুর্য রসে এই সকল চিত্রপটের রেখা, বর্ণ ও রূপকল্পনা ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লাবিত।”[৯]

এই বর্ণনার মধ্যে ভাবপ্রবণতা ও অতিরঞ্জন থাকিলেও ইহা হইতে বাংলার পটচিত্রের সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। এগুলির বিষয়বস্তু প্রধানতঃ কৃষ্ণ-লীলা, রামলীলা, গৌরাঙ্গ-লীলা, শিবপার্বতী-লীলা প্রভৃতি ধর্মমূলক ও দেব-দেবী বিষয়ক কাহিনী। অপেক্ষাকৃত আধুনিক পটগুলিতে শহরের বাস্তব জীবনের অনেক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। উনিশ শতকের ছবিগুলিতে সাহেবদের শিকার, ঘোড়দৌড় ও আদালতের দৃশ্য, মন্দিরযাত্রিনী বঙ্গবধূর দল, শ্যামাকান্তের ব্যাঘ্র শিকার, প্রণয়ী-প্রণয়িনীর আলিঙ্গন ও মানভঞ্জন, প্রসাধনরতা বীণাবাদিনী, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর নির্যাতন ও স্বামীর মুখে স্ত্রীর পদাঘাত প্রভৃতি, এবং নানাবিধ পশু, পক্ষী, মৎস্য (বিড়ালের মুখে চিংড়ী মাছ, রোহিত মৎস্য) এবং পাঁঠা বলি প্রভৃতি বাস্তব জীবনের বহু চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্তমান শতকের প্রথমে যে নূতন চিত্রশিল্পের উদ্ভব হয় তাহার ফলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য যামিনী রায় পটশিল্পকেও নবজীবন দান করেন। এই শিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে। আঠারো শতকের শেষভাগে কয়েকজন ইংরেজ চিত্রকর ভারতে আসিয়া এখানকার বাস্তব জীবনের চিত্র ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত করেন। ১৭৯৫ হইতে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে টমাস ড্যানিয়েল হিন্দুস্থানের বাস্তব জীবন ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলম্বনে অঙ্কিত ৮৪ খানি ছবি প্রকাশিত করেন। ইহার মধ্যে কলিকাতার কয়েকটি দৃশ্যও আছে এবং চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ এই দৃশ্যাবলীর গ্রন্থ কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে।[১০]

১৮৩২ খ্রীঃ প্রকাশিত '*Manners in Bengal*' গ্রন্থে Mrs. S .C. Belnos বাংলার সাধারণ জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন। একখানি ছবিতে দেখা যায় যে শ্লথবসনা একটি বাঙ্গালী বধূ ঘরের অভ্যন্তরে কাঠের উনানে ভাত চড়াইয়াছেন; পার্শ্বে দুইটি শিশু একটি ধামা হইতে কোন খাদ্যবস্তু তুলিতে

নিযুক্ত; কক্ষমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জলের ঘটি, শিল, নোড়া, ডালা, কুলা, কৌটা ও হুকা; শিকায় ঝোলান হাঁড়িকলসী; দড়িতে ঝুলান কাপড় এবং দেয়ালের গায়ে উচ্চস্থানে জালের মধ্যে হাতপাখা প্রভৃতি, এবং কক্ষের একধারে একটি চরকা এবং আরেক ধারে তালাবন্ধ কাঠের বাক্সের উপরে একটি বিড়াল।

এই সমুদয় বাঙ্গালীর বাস্তব জীবনের চিত্র সম্পূর্ণ অভিনব হইলেও অবশ্য ইউরোপীয় পদ্ধতিতেই অঙ্কিত। পূর্বোক্ত Mrs. Belnos অঙ্কিত ছবিতে রন্ধন গৃহের দ্রব্যগুলি নিখুঁত ভাবে অঙ্কিত হইলেও রন্ধনরতা শাড়ী পরিহিতা মহিলাটির মুখে ইউরোপীয় চিত্রকরের প্রভাব বেশ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এদেশীয় পটে বাস্তব জগতের চিত্র যে ইউরোপীয় চিত্রের অনুকরণ বা প্রভাবের ফল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ আঠারো শতকের পটে এইরূপ বাস্তব জীবনের চিত্র দেখা যায় না। উনিশ শতকেই ইহার আবির্ভাব হয় এবং এই যুগে সাহেবদের চিত্রও যে পটে অঙ্কিত হইত সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

একথা বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না যে প্রাচীন লোকগীতি, যাত্রা, পাঁচালি, কবিগান প্রভৃতি হইতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে যেরূপে উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব হয়, সেইরূপ পটুয়ার চিত্র প্রভৃতি হইতে ইউরোপীয় প্রভাবে উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলায় আধুনিক চিত্রকলার সূচনা হয়।

বাংলাদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষার প্রসারে প্রথমে ছোটখাট ইংরেজী স্কুল ও পরে প্রধানতঃ হিন্দু কলেজ যেরূপ সহায়তা করিয়াছিল, আধুনিক শিল্পকলার উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিল সেইরূপ পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটি বিদ্যালয়। ১৮৫৪ সনে কলিকাতা গরাণহাটায় 'The School of Industrial Art' স্থাপিত হয়। এখানে কারিগরী বা ব্যবহারিক (Industrial) শিল্পের সঙ্গে চিত্রকলা প্রভৃতি সুকুমার শিল্প শিখাইবারও ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে ইহা একটি সরকারী স্কুলে পরিণত হয়। পরে নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহা কলিকাতার বর্তমান 'School of Art'-এ পরিণত হয় (১৮৬৪)। প্রথমে ইংরেজ শিল্পীরাই ইহার শিক্ষক ও অধ্যক্ষ ছিলেন, ক্রমে এই স্কুলের এদেশীয় ছাত্রগণও বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইতেন। এই স্কুলের সঙ্গে যে একটি চিত্রশালা ছিল, তাহাতে প্রধানতঃ ইউরোপীয় চিত্রই সংগৃহীত হইত, এবং মাঝে মাঝে যে সমুদয় চিত্র প্রদর্শনী হইত তাহাতেও পাশ্চাত্য প্রণালীতে অঙ্কিত চিত্রই শোভা পাইত। এই

সমুদয়ের ফলে কয়েকজন বাঙ্গালীও ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্র অঙ্কনে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। ইহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিব। ১৮৬৯ সনে প্রিয়নাথ দাস কালি-কলমের রেখা দ্বারা বাস্তব জীবনের অনেক ছবি আঁকেন। এগুলির সহিত পূর্বোক্ত পটের ছবির তুলনা করিলেই দেখা যাইবে যে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কিন্তু ১৮৩২ সনে অঙ্কিত পূর্বোক্ত Mrs. Belnos-এর চিত্রের সহিত এগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ বাগচীও এইরূপ চিত্রাঙ্কনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। চুনিলাল দাসের লিথো-প্রিণ্ট (১৮৭৩), বি, এল, মুখার্জী ও হরিনারায়ণ বসুর আর্দ্র রং (water colour) মনোক্রোম (১৮৮৫, ১৮৮৭), শশী হেসের পেনসিলে আঁকা নারীমূর্তি (১৮৯৮) প্রভৃতি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রগুলি সমসাময়িক অভিজ্ঞ শিল্পীর উচ্চ প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশে ইউরোপীয় শিল্পের প্রভাবে সাহিত্যের ন্যায় শিল্পেও এক নূতন যুগের সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু ভারতের প্রাচীন চিত্রশিল্প পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না, এবং শিল্পীর দৃষ্টিও সেদিকে আকৃষ্ট হয় নাই।

১৮৯৬ সনে হ্যাভেল সাহেব (Earnest Benfield Havell) কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়ের (School of Art) অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমেই লক্ষ করিলেন যে এই বিদ্যালয়ে প্রাচ্য শিল্পকলার (Oriental Art) কোন স্থান নাই, শিক্ষা পদ্ধতিতে ও চিত্রপ্রদর্শনীতে কেবল ইউরোপীয় ছবিরই প্রাধান্য। তিনি তাঁহার প্রথম রিপোর্টেই প্রস্তাব করিলেন যে অতঃপর প্রাচীন ভারতের চিত্র-শিল্পকেই সর্বরকমে প্রাধান্য দেওয়া হইবে এবং ঐ বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা হইবে (Oriental art will be the basis of all instruction given)। ইহার ফলে শিল্পী ও 'কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়ের' ছাত্রগণের মধ্যে অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল এবং তাহারা প্রকাশ্যে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিল। রণদাপ্রসাদ গুপ্ত নামে একজন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন। তিনি ও একদল ছাত্র 'কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়' ত্যাগ করিয়া বউবাজারে এক নূতন শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৮৯৭)। রণদাপ্রসাদ অতি দক্ষতার সহিত এই বিদ্যালয় চালাইতেন এবং পরবর্তীকালে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিত্র অঙ্কনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের এক দল তাঁহার বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক হইলেন এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি এই বিদ্যালয়কে অর্থ দান করিত।

কিন্তু অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব এই সমুদয় প্রতিবাদে কর্ণপাত করিলেন না—বরং তিনি নূতন উৎসাহে অনেকটা মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেন। কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়ের প্রদর্শনী কক্ষে (Art Gallery) যে সমুদয় বিদেশী ছবি ছিল তিনি তাহার প্রায় সকলগুলিই বিক্রয় করিলেন এবং তাহার বদলে ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত মূল চিত্র ও তাহার অনুকরণগুলি ঐ কক্ষে স্থান পাইল। জনশ্রুতি এই যে অনেক পাশ্চাত্য প্রথায় নির্মিত মূর্তি তিনি নিকটবর্তী পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ছাত্র, জনসাধারণ ও সংবাদপত্রগুলিতে ইহার তীব্র নিন্দা হইল। আশ্চর্যের বিষয় যে বড়লাট লর্ড কার্জন হ্যাভেলের মূল দৃষ্টিভঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন করিলেন।

নূতন আদর্শে সহায়তার জন্য অধ্যক্ষ হ্যাভেল শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সহকারী অধ্যক্ষ (Vice-Principal) নিযুক্ত করিলেন (১৯০৫)। অবনীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিয়া জগতে সুপরিচিত এবং বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বিগত ৭ অগষ্ট (১৯৭১) তাঁহার শততম জন্মদিবসে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বহু সভা সমিতি ও অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৫ সনে শিল্পজগতে তাঁহার প্রতিষ্ঠার কেবল সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। হ্যাভেল সাহেব যে সেই সময়ে তাঁহার আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে সহকারী-অধ্যক্ষপদ গ্রহণে সম্মত করাইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞানের ও কৃতিত্বের পরিচায়ক।

জোঁড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারে সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র অবনীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া আর কোন বিদ্যালয়ে পড়েন নাই বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন নাই। কিন্তু বাড়ীতে বসিয়াই ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেন এবং কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্র না হইয়াও ইহার সহকারী অধ্যক্ষ (Assistant Superintendent) Mr. O. Ghilardi এবং Palmer সাহেবের নিকট ইউরোপীয় শিল্প পদ্ধতি শিক্ষা করেন। তিনি প্রাচীন ভারতের কলাশাস্ত্র অধ্যয়ন, এবং কেবল ভারতের নহে, পারস্য, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের চিরাগত অঙ্কন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়া এক সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করেন। অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবের উৎসাহে, পরিচালনায় ও নির্দেশ অনুযায়ী[১১] এই প্রাচ্য পদ্ধতিতে কয়েকখানি নূতন ধরণের ছবি আঁকিয়া তিনি চিত্রশিল্পী হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ১৯০২-৩ খ্রীঃ দিল্লী দরবারে যে চিত্র প্রদর্শনী হয় তাহাতে অবনীন্দ্রনাথের তিনখানি ছবি ছিল। ইহার মধ্যে 'শাহ্ জাহানের অন্তিমকাল'

(The Last Hours (or Days) of Shah Jehan) নামক ছবিখানি উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল এবং অবনীন্দ্রনাথ একটি স্বর্ণ পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।[১২]

হ্যাভেল সাহেবই বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথের অপূর্ব শিল্প প্রতিভার প্রথম বিশিষ্ট সমঝদার। লণ্ডন হইতে প্রকাশিত '*The Studio*' নামে একখানি শিল্পবিষয়ক পত্রিকায় হ্যাভেল দুইটি প্রবন্ধ লেখেন (১৯০২, অক্টোবর, ১৯০৩, জানুয়ারী সংখ্যা)। "Some Notes on Indian Pictorial Art" নামক প্রথম প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রই ছিল তাঁহার প্রধান আলোচ্য বিষয়, এবং নিদর্শনস্বরূপ যে কয়টি ছবি ছাপা হইয়াছিল তাহার সবগুলিই অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত। এগুলির নাম—

১। জেনানা মহল (In the Zenana—monochrome)

২। বুদ্ধ ও সুজাতা (পুরাপুরি রঙ্গিন)

৩। পথিক ও পদ্ম (The Traveller and the Lotus—monochrome)

৪। রাজকুমারীর পদ্ম (Princess' Lotus—রঙ্গিন)

৫। আঁধার রাতি (The Dark Night—রঙ্গিন)

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশৈলী যে সম্পূর্ণ অভিনব ইহা প্রথম হইতেই স্বীকৃতি লাভ করে। ইতালীয়, পারস্য, চীন, জাপান, মুঘল ও রাজপুত চিত্রশিল্পের যথেষ্ট প্রভাব থাকিলেও ইহা যে তাঁহার নিজের এক অপূর্ব সৃষ্টি এবং প্রকৃত শিল্পরসের প্রগাঢ় অনুভূতির পরিচায়ক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রেখা ও বর্ণ বিন্যাসের মধ্য দিয়া শিল্পী যে প্রাণের গভীরতা ও সরসতা এবং অনুভূতি ও ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় নাই। তাঁহার অঙ্কিত মূর্তিগুলির শারীরিক গঠন সুপরিচিত ইউরোপীয় শ্রেণীর ন্যায় বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নহে—এই মর্মে বিরুদ্ধ সমালোচনা, এমন কি নিন্দাও হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে এই নূতন শৈলীর ভাব ও ব্যঞ্জনার প্রকৃত স্বরূপ অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র হইতেই এই গূঢ় সত্য প্রকটিত হইল যে 'আর্ট' বা শিল্প কেবল প্রকৃতিসৃষ্ট বাস্তব রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। প্রাকৃতিক রীতি লঙ্ঘন করিয়াও শিল্পী নূতন নূতন সৌন্দর্যের সৃষ্টি দ্বারা মানুষের তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন। অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পরীতির পুনরুজ্জীবন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা পুরাপুরি সত্য নহে। প্রাচীন ভারতীয় চিত্র যে তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ ইহার অন্ধ অনুকরণ করেন নাই—করিলে তাঁহার শিল্প অসার ও প্রাণহীন হইত, জীবন্ত

হইয়া উঠিত না। জাপানে ওকাকুরা প্রভৃতি শিল্পী যেমন প্রাচীন ভিত্তির উপর নবীন সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছেন, বঙ্গদেশে তথা ভারতে, অবনীন্দ্রনাথও তাহাই করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতের পোষাকপরিচ্ছদ, আহারবিহার, সামাজিক ব্যবস্থা ও মানসিক চিত্তবৃত্তি যেরূপ কালানুযায়ী পরিবর্তনের ফলে অনেকটা ভিন্নরূপ ধারণ করিলেও ইহা পুরাতনের বিবর্তন মাত্র—এবং এগুলি সম্বন্ধেও যেমন প্রাচীনের হুবহু অনুকরণ বা পুনরুজ্জীবন অযৌক্তিক, অশোভন ও অসম্ভব, শিল্প সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা যাইতে পারে। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব এই যে তিনি ভারতের প্রাচীন শিল্প-সত্তাকে যুগোপযোগী রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।[১৩]

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য যুগের শেষে অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রীঃ অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভার কেবল মাত্র বিকাশ হয়—পরবর্তীকালে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ হয় এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি এ যুগেই অঙ্কিত হয়। নন্দলাল বসু, অসিত কুমার হালদার, সুরেন্দ্রনাথ কর, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শৈলেন্দ্রনাথ দে, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, যামিনী রায়, মহীশূরের কে, ভেঙ্কটপ্পা প্রমুখ তাঁহার বহু শিল্পশিষ্য এই পরবর্তী যুগে তাঁহার শিল্প পদ্ধতিকে একটি চিরস্থায়ী নূতন শিল্পশৈলীতে উন্নীত করেন। বাংলার শিল্পজগতের এই নবজাগরণ এই গ্রন্থের পরবর্তী ও শেষ খণ্ডে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

পাদটীকা

১। **"Yorā bungalos are not now frequently seen." Ward, W.,** ***A view of he History, Literature and Mythology of the Hindoos*** **(1817), II.** p. 8.

২। ৬০৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ।

৩। এই মন্দিরগুলির বিস্তৃত বিবরণের জন্য শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঁকুড়ার মন্দির' ও 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' দ্রঃ।

৪। শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'চব্বিশ পরগণার মন্দির' দ্রঃ।

৫। এই তালিকাটির জন্য আমি শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী।

৬। 'চব্বিশ পরগণার মন্দির', ৮১ পৃষ্ঠা।

৭। পটচিত্রের বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি দ্রঃ।

১। শ্রীগুরুসদয় দত্ত—পটুয়া সঙ্গীত (১৯৩৯)।

২। **W. G. Archer—Bazaar Paintings of Calcutta (1953)**

৮। দত্ত—পৃষ্ঠা ৸৶

৯। ঐ ১৷৴—১৷৶ পৃষ্ঠা।

১০। Thomas Daniell—*Oriental Scenery, 84 Views in Hindoostan*, Four volumes, London, 1795—1803.

১১। অবনীন্দ্রনাথ নিজেই কলিকাতা আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ পদ প্রার্থীর আবেদন পত্রে লিখিয়াছেন : "I have studied European Art under Messrs Ghilardi and Palmer and subsequently done original work in the Oriental style under the guidance and direction of Mr. Havell (*Centenary. Government College of Art and Craft*, Calcutta, P. 30)

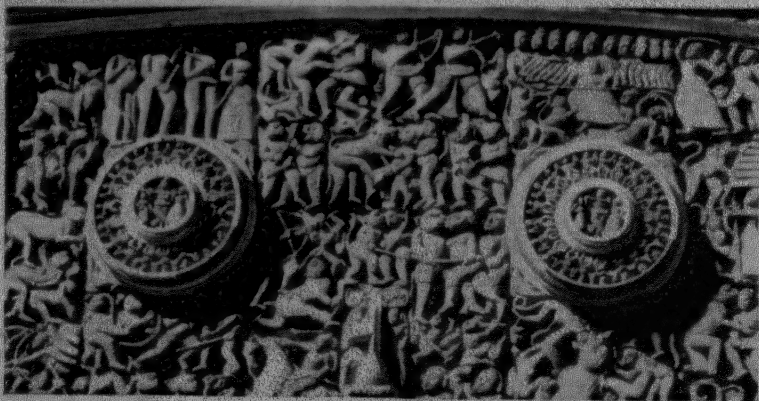
১২। Bombay Art Exhibition-এ তিনি Lady Olivant's Prize পাইয়াছিলেন। ঐ।

১৩। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের নিম্নোদ্ধৃত দুইটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "সেকাল ছেড়ে কোন শিল্প নেই" এটা ঠিক, কিন্তু একাল ছেড়েও কোন শিল্প থাকতে পারে না বেঁচে, এটাও একেবারে ঠিক"।

"শিল্পের গতি কালে কালে নতুন নতুন শিল্পীর মতি ধরে চলেছে, কোনো এক কালের বা এক শাস্ত্রের মত ধরে চলেনি, চলতে পারেও না।" (লীলা মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ, ৬৪ পৃঃ)

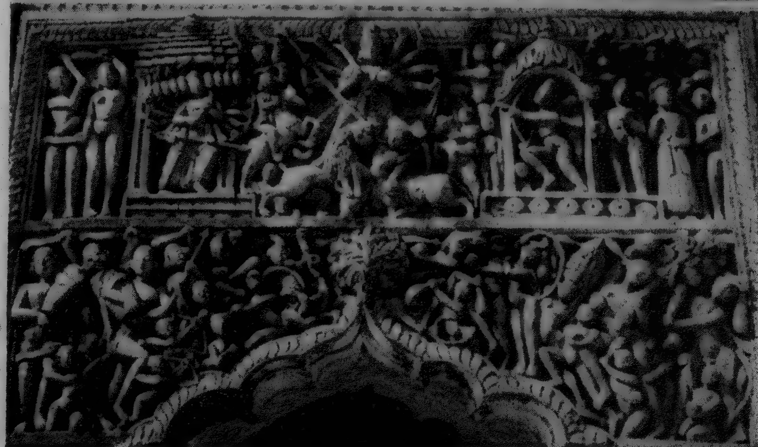


পঞ্চবিংশতিচূড় শ্রীধর মন্দির : সোনামুখী (বাঁকুড়া জেলা)



হুগলী জেলার আঁটপুরে অবস্থিত রাধাগোবিন্দজীউ মন্দির ও তাহার পোড়ামাটির ভাস্কর্য





প্রতাপেশ্বর শিবমন্দির ও তাহার পোড়ামাটির ভাস্কর্য : কালনা (বর্ধমান জেলা)



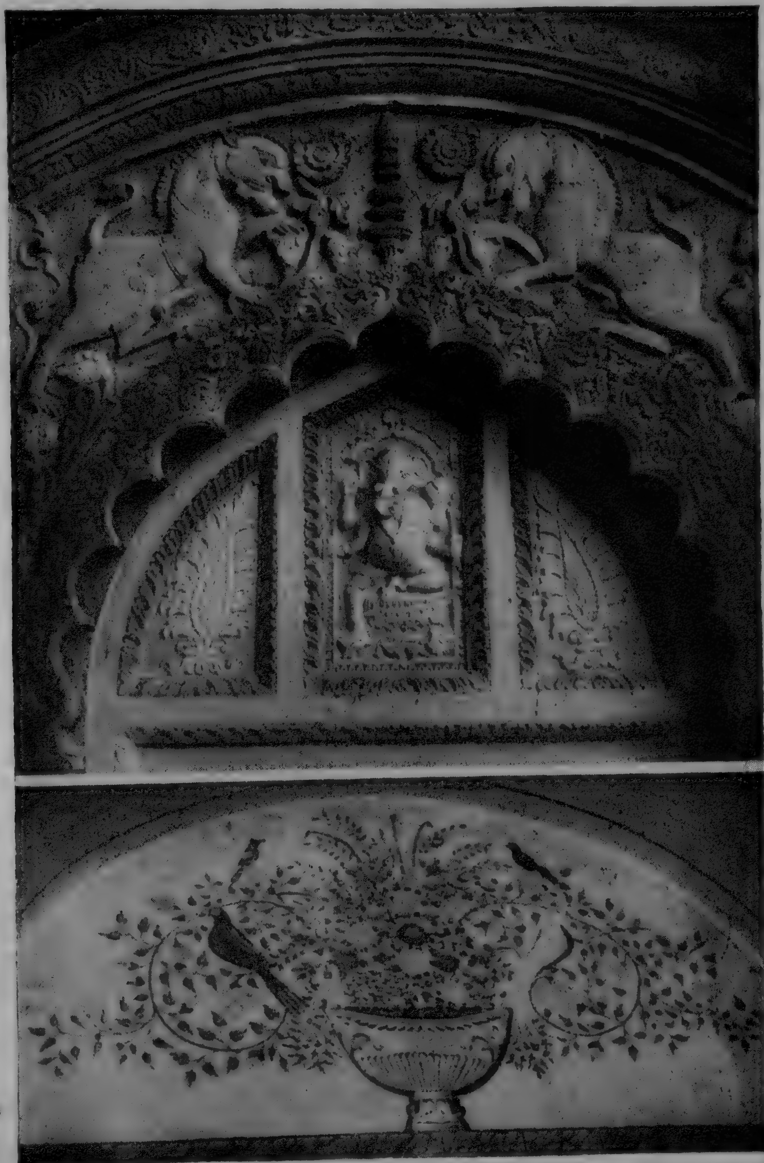
গণেশজননী : কামারপুকুরে (হুগলী জেলা) লাহা পরিবারের দালান-মন্দিরে
উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির ভাস্কর্য



গঙ্গা-ভগীরথ : কামারপুকুরে (হুগলী জেলা) লাহা পরিবারের দালান-মন্দিরে উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির ভাস্কর্য



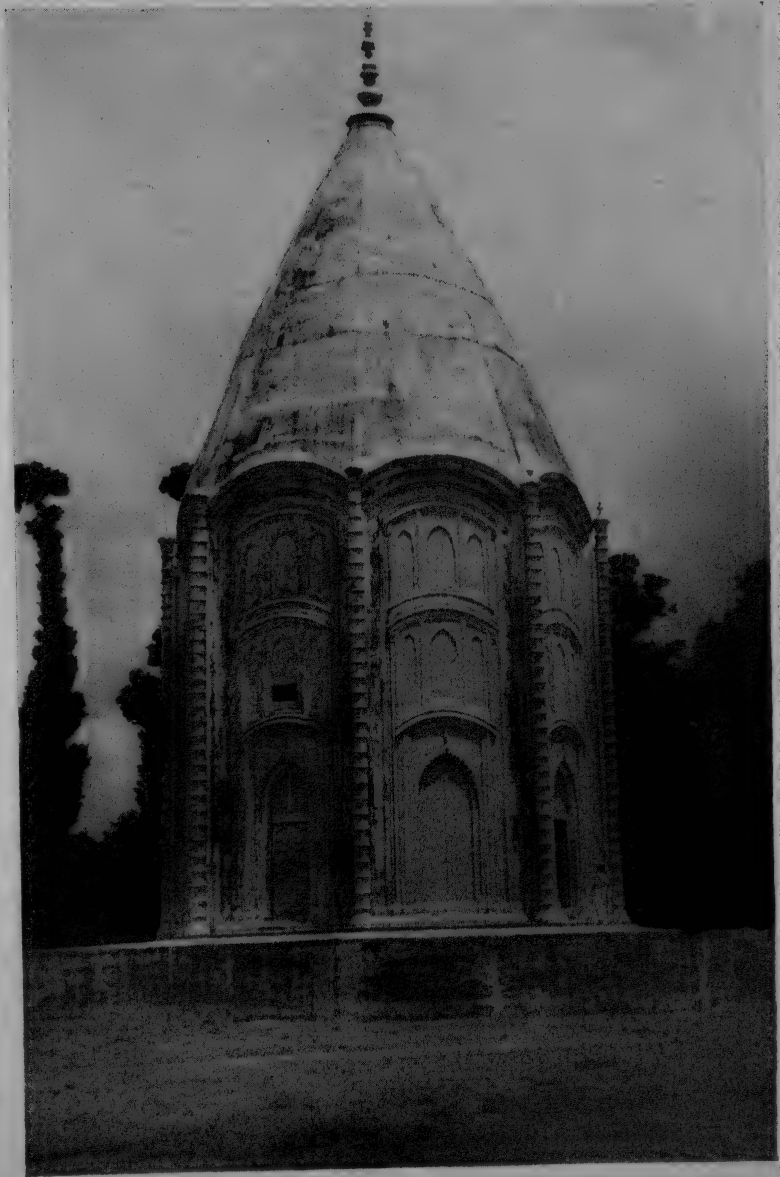
'টেরাকোটা' সজ্জায় বিদেশীয় প্রভাব : চন্দ্রনাথ শিবমন্দির, হেতমপুর
(বীরভূম জেলা)



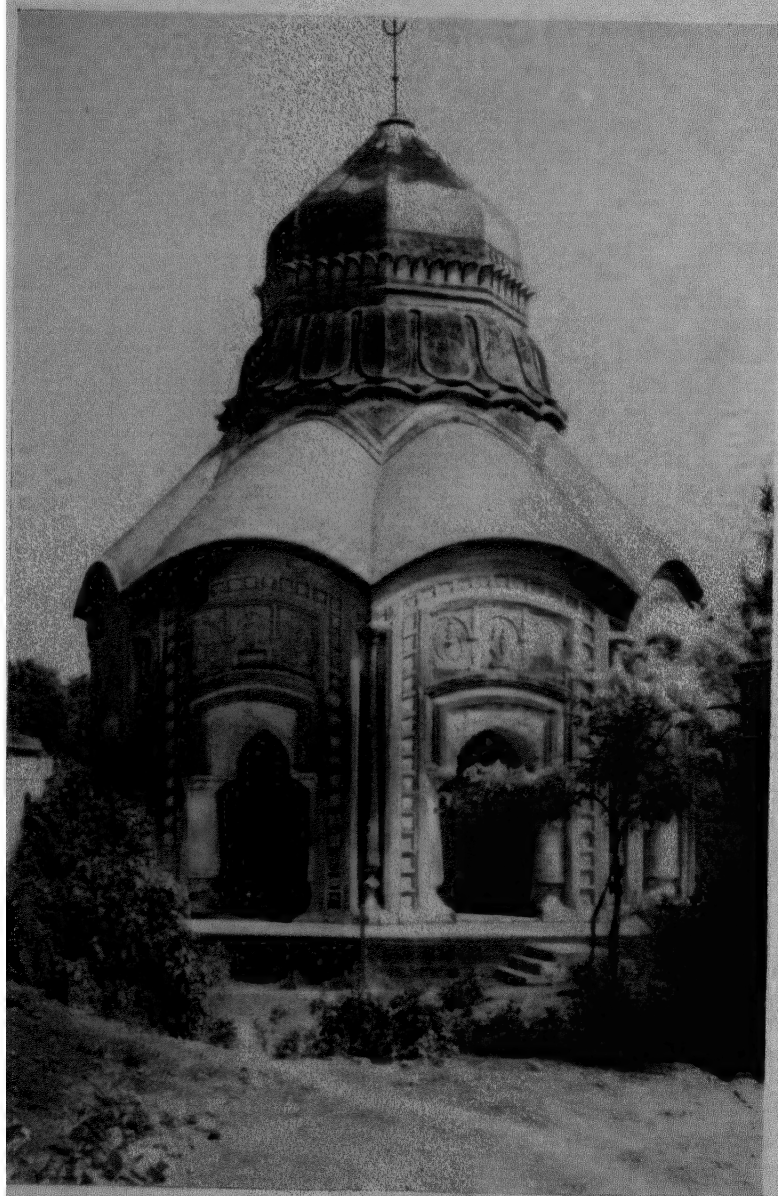
অর্বাচীন মন্দির-অলংকরণের নিদর্শন : (উপরে) কাশিমবাজার রেল-স্টেশনের নিকট ব্যাসপুর শিব-মন্দিরের পঙ্কের কারুকার্য ও (নীচে) গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের দেওয়াল-চিত্র



গৃহসজ্জার অত্যাধুনিক নিদর্শন—চুনবালির রমণীমূর্তি : রাজবলহাট
(হুগলী জেলা)



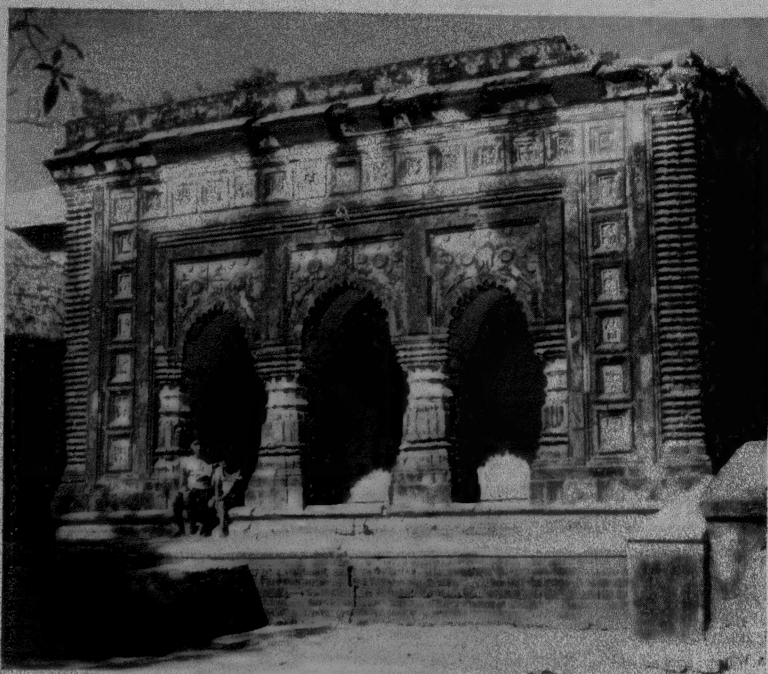
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত অষ্টকোণ শিবমন্দির : শিবনিবাস (নদীয়া জেলা)

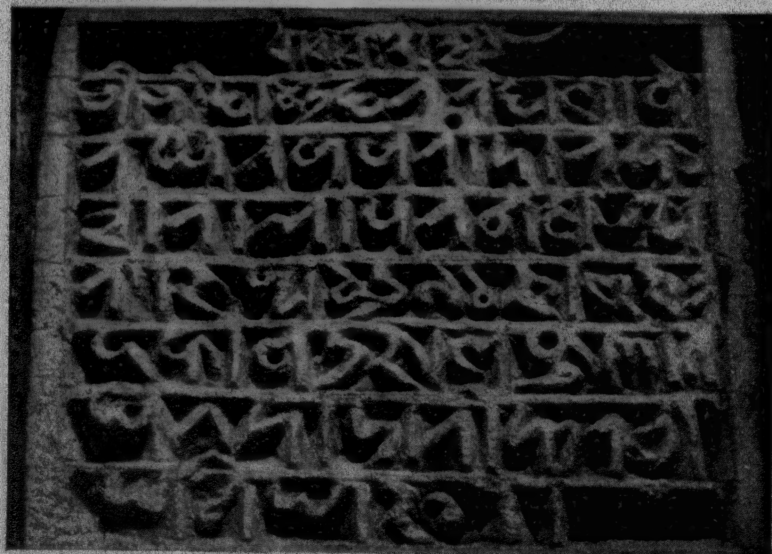


রাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত ভবানীশ্বর শিবমন্দির : বড়নগর (মুর্শিদাবাদ জেলা)



রাণী রাসমণির কন্যা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণা-মন্দির :
তালপুকুর (২৪-পরগণা)





হালদার পরিবারের দালান-মন্দির ও তাহার প্রতিষ্ঠালিপি : কোতুলপুর
(বাঁকুড়া জেলা)



মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার কাটান গ্রামে অবস্থিত অতি-আধুনিক দালান-মন্দিরের নিদর্শন



উনিশ শতকের দুর্গা-পট



অনুতপ্ত স্বামী : কালীঘাটের পটে সমাজচিত্র



নদীয়া জেলার উলা বা বীরনগরের চণ্ডীমণ্ডপের কাঠের কারুকার্য

নির্দেশিকা

ই

ঈ

উ

ঊ

এ

ঐ

ও

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ঝ

ট

ধ

ন

ফ

ব

য

ল

শ
